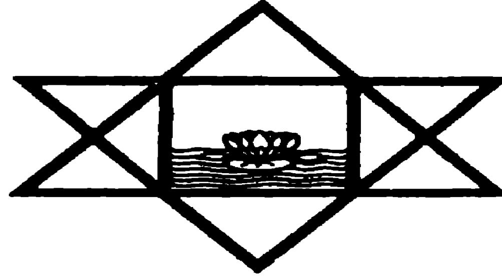
দিব্য-জীবন

The Life Divine

দ্বিতীয় খণ্ড (উত্তরার্ধ)

শ্রীঅরবিন্দ



শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি
কলিকাতা : পণ্ডিচেরী—২

প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি
কলিকাতা : পণ্ডিচেরী—২

অনুবাদক ঃ অনির্বাণ

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২২০০ ঃ ১৯৫৬

Fourth Five-year Plan—Development of Modern Indian Languages. The popular price of the book has been made possible through a subvention received from the Government of West Bengal.

মূল্য :

Price :

মুদ্রাকর শ্রীশ্যামলকুমার মিত্র
নালন্দা প্রেস ঃ কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড (উত্তরার্ধ)

দ্বিতীয় খণ্ড

বিদ্যা ও অবিদ্যা—
চিন্ময় পরিণাম

উত্তরার্ধ

বিদ্যা এবং চিন্ময় পরিণাম

পঞ্চদশ অধ্যায়

তত্ত্বভাব ও সম্যক-জ্ঞান

সত্যেন লভ্যো হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন।

মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।৫

আত্মাকে পেতে হবে সত্য আর সম্যক-জ্ঞান দিয়ে।

—মুণ্ডকোপণিষৎ ৩।১।৫

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু।...
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।

গীতা ৭।১,৩

সমগ্রভাবে আমাকে জানবে কি করে তা-ই শোন।... সাধকদের মধ্যে সিদ্ধ যারা, তাদের মধ্যে একজনও আমায় তত্ত্বত জানে কি না সন্দেহ।

—গীতা ৭।১,৩

এই তবে অবিদ্যার নিদান স্বরূপ এবং অধিকার। বিদ্যার সঙ্কোচ হতে তার উৎপত্তি, জীবের স্বরূপচেতনাকে সম্যক্‌ত্ব ও অখণ্ড তত্ত্বভাব হতে বিবিক্ত করা তার বিশিষ্ট ধর্ম। চেতনায় এই বিবিক্তভাবের উপচয়ই তার অধিকার নিরূপিত করে। কেননা, অবিদ্যা আমাদের আত্মস্বরূপ ও বহির্জগতের অখণ্ড সত্যস্বরূপকে আবৃত ক'রে জীবনের উপর বিছিয়ে দেয় বহিশ্চর প্রতিভাসের একটা দুরত্যয়া মায়া। অতএব বিদ্যার প্রতি অন্তরের উদ্যত অভীপ্সার লক্ষণ হবে ঠিক তার বিপরীত। সম্যক্‌-স্বভাবের উপচীয়মান মহিমার প্রতি চিত্তের মোড় সে ফিরিয়ে দেবে—ঘোচাবে সঙ্কোচের আবরণ, ভাঙবে খণ্ডবোধের রুদ্ধকারা, ছাড়িয়ে যাবে অবিদ্যার সুদূরবিসর্পিত অধিকার, তত্ত্বভাবের অখণ্ড সত্যস্বরূপকে আবার প্রদ্যোতিত করে তুলবে এই আধারেই। বর্তমানের এই বিবিক্ত ও সঙ্কুচিত চেতনার দৈন্যকে পরাভূত করে তখন জাগবে অকুণ্ঠিত সম্যক্‌-চেতনার সিদ্ধ মহিমা—যার মধ্যে ব্রহ্মসদ্‌-ভাবের অনাদি সত্যের সঙ্গে আত্মভাব ও জগদ্‌ভাবের সমগ্র সত্য অবিকল্পিত তাদাত্ম্যপ্রত্যয়ে নিত্য অনস্তমিত থাকবে। অখণ্ড সর্বতোমুখী সম্যক্‌-জ্ঞান পূর্ণব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধ স্বভাব। অতএব অধ্যাত্মচেতনায় তার স্ফুরণকে প্রাগভাবের নিরসনজনিত অভিনব একটা আবির্ভাব বলা চলে না। সম্যক্‌-জ্ঞান মনের সৃষ্ট অর্জিত অধিগত বা কল্পিত কোনও কৃত্রিম বস্তু নয়। তাই তার সিদ্ধরূপটির আবরণ উন্মোচন করেই মন তার সাক্ষাৎ পায়। অধ্যাত্ম-সাধনার চরম পর্বে আপনাহতে তার সত্য চেতনায় ফুটে ওঠে, কেননা আমাদেরই বৃহত্তর চেতনার গভীর গুহায় সে স্তব্ধ হয়ে আছে অধ্যাত্মচেতনার

স্বরূপধাতু হয়ে। তাকে পাওয়া তখনই অনিঃশেষ হয়, যখন বহিশ্চর চেতনাতে থেকেও তার দিকে আমাদের দৃষ্টি হয় অনিমেষ। অখণ্ড আত্ম-জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে আবার অখণ্ড জগৎজ্ঞানও আমাদের ফিরে পেতে হবে, কেননা বিশ্বের আত্মা যে আমাদেরই আত্মা। মনের কল্পিত বা অধিগত বিদ্যাও যে আছে এবং তার সার্থকতাও যে উপেক্ষণীয় নয়, তা মানি। কিন্তু আমরা এখানে অবিদ্যা হতে পৃথক করে যার বিদ্যা নাম দিয়েছি, সে কিন্তু শুদ্ধবিদ্যা বা সদ্বিদ্যা—বিদ্যাকঞ্চুক নয়।

অভঙ্গ অধ্যাত্মচেতনায় আছে সত্তার সর্বাবগাহী সম্যক্-বিজ্ঞান। অবান্তর সকল ভূমির সঙ্কলনে পরমকে সে যুক্ত করে অবমের সঙ্গে, তাই একটি অখণ্ড নিটোল পূর্ণতায় তার অক্ষুণ্ণ মহিমা ফুটে ওঠে। সে-চেতনার অনুত্তর শৃঙ্গে নির্বিশেষ পরমার্থসতের অতিচেতন অতএব অনুপাখ্য স্বয়ংসংবিৎ রয়েছে, আর তার প্রত্যন্ততম গহনে রয়েছে অচিতির সংবিৎ—যে তমোঘন অব্যক্ত হতে জীবপ্রকৃতির যাত্রা শুরু। কিন্তু অচিতির অব্যক্তগুহাতেও সে আবিষ্কার করে অদ্বিতীয় সর্বসতের আত্মসমাহিত স্বয়ংগূঢ় চৈতন্যের দীপ্তি। পরাবর সত্তার দুটি কোটির অন্তরালে বিচরণশীল এই সম্যক্-চেতনার স্বয়ংজ্যোতিতে বিশ্বের নিগূঢ় ব্যঞ্জনা উদ্ভাসিত হয়—তার সুনির্মল প্রজ্ঞাচক্ষু দর্শন করে বহুর মধ্যে একের রূপায়ণ, সান্তের অনন্ত বৈচিত্র্যে আনন্ত্যের তাদাত্ম্যবিভূতি, শাশ্বত কালাতীতের বক্ষে শাশ্বত কালের অন্তহীন বীচিভঙ্গ। এই অখণ্ড দর্শনে বিশ্বের অক্ষুণ্ণ তাৎপর্য আমাদের চেতনায় ঝলমল হয়ে ওঠে। তাতে বিশ্বের বিলুপ্তি ঘটে না, কিন্তু সর্বগ্রাহী প্রত্যয়ের আলোর ছোঁয়ায় সে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে তার অন্তর্গূঢ় অর্থের দীপ্তিতে। তাতে ব্যক্তিভাবের বৈশিষ্ট্য লোপ পায় না, কিন্তু জীবপুরুষ ও জীবপ্রকৃতির অপরূপ রূপান্তর ঘটে। কেননা, এই সম্যক্ দর্শনে আত্মভাবের স্বরূপসত্য তাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়, নির্জিত হয় দিব্যপুরুষ ও দিব্যপ্রকৃতি হতে তাদের বিবিক্তস্থিতির যত কুণ্ঠা।

সম্যক্-জ্ঞান থাকলে পরাবর ব্রহ্মের অখণ্ড পরমার্থসত্তাও আছে, কেননা এ-জ্ঞান ঋত-চিতের বিভূতি এবং ঋত-চিৎ পরমার্থসতের স্বরূপচৈতন্য। কিন্তু আমাদের বেলায় চেতনার ভূমি ও বৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গে পরমার্থসতের ভাবনা ও অনুভবের বদল হয়। চেতনার যেমন দৃষ্টি, যেমন ঝোঁক বা গ্রহণ-সামর্থ্য, তার কাছে তেমনি ফোটে ভাবের রূপ। তার দৃষ্টি কি ঝোঁক কখনও মর্মাবগাহী ও ব্যাবৃত্ত, কখনও-বা সর্বাবগাহী ব্যাপ্ত ও উদার। তাই একমাত্র অনুপাখ্য ব্রহ্মসদ্ভাবের অবিকল্পিত তত্ত্বকে স্বীকার করে আমাদের তত্ত্ব-ভাবনা ও তত্ত্বচেতনা হতে আত্মভাবের সিদ্ধির জন্যে জীবভাব ও জগদ্ভাবকে সম্পূর্ণ নিরাকৃত করা—এমন সাধনাও অসম্ভব নয়। শুধু তা-ই নয়, এ

যে একটা উচ্চকোটির দর্শন এবং আপন অধিকারের মধ্যে এর যে একটা অবিসংবাদিত প্রামাণ্য আছে, একথাও অনস্বীকার্য। এই দৃষ্টিতে দেখলে ব্রহ্মই জীবের তত্ত্বরূপ এবং জগতেরও তা-ই। আপাতপ্রতীয়মান জীবভাব জগতের ভূমিকায় একটা কালিক প্রতিভাস মাত্র। জগৎ তেমনি একটা বৃহত্তর এবং জটিলতর কালিক প্রতিভাস। বিদ্যা আর অবিদ্যা এই প্রতিভাসের অন্তর্গত; অতএব নির্বিশেষ অতিচেতনায় উত্তীর্ণ হতে গেলে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুয়েরই অধিকার ছাড়িয়ে যেতে হবে। তুরীয়ের পরমপ্রত্যয়ে অহন্তা আর ইদন্তা দুয়েরই চেতনা বিলুপ্ত হয়—জেগে থাকে শুধু নির্বিশেষের অবর্ণ জ্যোতি। নির্বিশেষ ব্রহ্মসদ্‌ভাবে আছে শুধু সর্ববিধ অনাত্মপ্রত্যয়ের অতীত একমাত্র আত্মতাদাত্ম্যের নিঃশব্দ কৈবল্য। সেখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের আভাসটুকুও নাই, অতএব উভয়ের একীভাবের সেতুস্বরূপ জ্ঞানেরও সত্তা নাই। তাই ত্রিপুটীর লয়ে কোনও প্রমাণ-প্রমেয়ভাবও থাকে না বলে ব্রহ্মকে বলা হয় অবাঙ্‌মানসগোচর।...এই নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের প্রতিবাদে অথবা তার আপূরণ করতে আমরা বলি : অবিদ্যা বস্তুত বিদ্যার সঙ্কুচিত ও সংবৃত্ত বৃত্তিমাত্র—খণ্ডচেতন জীবে বিদ্যা সঙ্কুচিত, আর অচেতন পদার্থে সংবৃত্ত। যে-দর্শনে শুধু ব্রহ্ম আছেন—জীব ও জগৎ নাই, তাকে বিদ্যা না বলে বলতে পারি উচ্চকোটির একটা অবিদ্যা। কেননা, সে-বিদ্যা নির্বিশেষ ব্রহ্মের দুয়ার অবধি পেঁছে থমকে গেছে—তার ওপারে যা আছে তার কাছে তা স্বসংবেদ্য, মনের অগোচর অতএব অপ্রমেয়। অবশ্য নির্বিশেষবাদকে ভাবনার সত্য এবং অধ্যাত্ম-অনুভবের পরমসত্যের একটা দিক বলতে আমাদের দ্বিধা নাই। কিন্তু তাবলে একেই অধ্যাত্মভাবনার সর্বগ্রাহী অখণ্ড প্রত্যয় বলতে পারি না, কেননা চিন্ময় অনুভবের পরমধামে এছাড়াও উদারতর ও গভীরতর দর্শনের সম্ভাবনা আছে।

ব্রহ্মের তত্ত্ব চেতনা ও জ্ঞান সম্পর্কে প্রচলিত নির্বিশেষবাদের প্রতিষ্ঠা প্রাচীন বেদান্তের একদেশিমতের 'পরে। কিন্তু বেদান্তের সমস্ত তাৎপর্য এতেই পর্যবসিত হয়নি। উপনিষদের প্রতিবোধদীপ্ত বাণীতে আমরা পাই নির্বিশেষ ব্রহ্মের বিবৃতি—অনুপাখ্য তুরীয়স্বরূপের অবর্ণ অনুভবের অনির্বচনীয় প্রত্যয়। কিন্তু সেইসঙ্গে তার প্রতিষেধরূপে নয়, অনুবৃত্তি-রূপে পাই বিশ্বভাবন দিব্য-পুরুষেরও বিবৃতি—বিশ্বাত্মা ও বিশ্বরূপে ব্রহ্মসম্ভূতির বর্ণাঢ্য অনুভবের জ্যোতির্ময় প্রতীতি। আবার পাই জীবের মধ্যে ব্রহ্মের অখণ্ড চিদাবেশের কথা। এও একটা অপরোক্ষ অনুভবের সত্য, সম্ভূতির বাস্তব সত্য—প্রতিভাসের বিকল্পনা নয়। প্রপঞ্চাতীত নির্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তাছাড়া আর-কিছুই কোথাও নাই—পরমার্থতত্ত্ব সম্পর্কে এমন একান্তবাদ উপনিষদের মূল সুর নয়। বরং তার মধ্যে আছে এক

সর্বাবগাহী অনেকান্তবাদের পরম ব্যঞ্জনা। বিশ্ব ও বিশ্বাতীতকে একই অখণ্ডতত্ত্ব ও একবিজ্ঞানের উদার আলিঙ্গনে বেঁধে নেওয়া—উপনিষদের এই সম্যক্-দর্শনের সুরটি আমাদেরও দর্শনের মূল সুর। কেননা, এ-দর্শনে অবিদ্যা বিদ্যার অর্ধচ্ছন্ন প্রতিরূপ, বিশ্ববিদ্যা আত্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। ঈশোপনিষদের মতে ব্রহ্মের সমস্ত বিভাবনাই অখণ্ড ও বাস্তব, ব্রহ্মের একটি-মাত্র বিভাবকে সত্য বলতে সে রাজী নয়। ঋষির দৃষ্টিতে ব্রহ্ম 'অনেজৎ' অথচ 'মনসো জবীয়ঃ'; 'সর্বস্য অন্তঃ' এবং 'অন্তিকে'—আধারে নিগূঢ়তম চিদাবেশরূপে, আবার 'সর্বস্য বাহ্যতঃ' এবং 'দূরে'—দেশ ও কালের অন্তহীন প্রসারে; ব্রহ্ম 'স্বয়ম্ভূ' অথচ 'সর্বাণি ভূতানি'; তিনি শুদ্ধ অশব্দ অকায় অস্নাবির অলক্ষণ, আবার তিনিই কবি ও অনীষী—'যাথাতথ্যতঃ' বিশ্বের বিধাতা। সেই পরম অদ্বয়স্বরূপই জগতে এই যা-কিছু দেখছি সব হয়েছেন। তিনিই সর্বানুস্যূত, তিনিই সর্বভূতাধিবাস। ঈশোপনিষদের মতে সেই বিজ্ঞানেই পূর্ণতা এবং মুক্তি—যা আত্মস্বরূপ অথবা তার সম্ভূতিরূপ কাউকেই প্রত্যাখ্যান করে না। মুক্ত পুরুষ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখেন—স্বয়ম্ভূ আত্মাই সর্বভূত হয়েছেন। তাঁর অন্তরাবৃত্ত চেতনা আত্মার মধ্যেই বিশ্বকে প্রতিষ্ঠিত দেখে—অনাত্মদর্শী অহংদুষ্ট সংকীর্ণ মনশ্চেতনার মত তাকে বিবিক্ত ও বহিঃস্থিত দেখে না। যারা অবিদ্যায় রত, তারা অন্ধতমসে প্রবেশ করে বটে—কিন্তু তার চাইতে গভীর অন্ধতমসে প্রবেশ করে, যারা বিদ্যার ঐকান্তিক অভিনিবেশে রত। কিন্তু ব্রহ্মকে যুগপৎ বিদ্যা এবং অবিদ্যার সমন্বয় ও সমাহাররূপে জানা, সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উভয়ের বিজ্ঞানদ্বারা পরমপদে উত্তীর্ণ হওয়া, বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মার যুগলবিভাবকে অখণ্ড উপলব্ধির দুটি দলে ফুটিয়ে তোলা, লোকোত্তরে প্রতিষ্ঠিত থেকে লোক-বিসৃষ্টির অনিরুদ্ধ স্বতঃসংবিতে উল্লসিত হওয়া—এই তো সম্যক্-জ্ঞানের স্বরূপ, এই তো অমৃতের সম্ভোগ। এই পূর্ণপ্রজ্ঞ অখণ্ড চেতনার 'পরেই দিব্য-জীবনের ভিত্তি, এরই সাধনায় তার সিদ্ধি। অতএব ব্রহ্মের নির্বিশেষ তথতার অর্থ অব্যাকৃত অদ্বয়ভাবের অসঙ্গ কৈবল্য অথবা নানাত্ব ও সান্তত্বের সংস্কারলেশহীন বিশুদ্ধ স্বয়ম্ভূসত্তার নির্বর্ণ আনন্ত্যমাত্র নয়। তার অর্থ, তিনি ইতি বা নেতি সর্ববিধ বিশেষণের অতীত এক অনির্বচনীয় বস্তু-সৎ। ইতিবাদ এবং নেতিবাদ দুইই তাঁর বিভাবের এক-একটি দিক মাত্র প্রকাশ করে। অতএব যুগপৎ ইতিভাব ও নেতিভাবের চরম প্রত্যয় দিয়েই আমরা তাঁর অনুপাখ্য স্বরূপের মহাভূমিতে পৌঁছতে পারি।

সুতরাং পরমার্থতত্ত্বের দুটি দিক পেলাম। একদিকে ব্রহ্ম নির্বিশেষ স্বয়ম্ভূ সন্মাত্র—অদ্বিতীয় ও শাশ্বত আত্মস্বরূপের নির্বিশেষস্থিতি মাত্র। নিষ্ক্রিয় আত্মভাবের পরমা প্রশান্তি অথবা প্রকৃতি হতে বিবিক্ত অক্ষরপুরুষের

অনুভবকে পুরোধা করে আমরা এগিয়ে যেতে পারি এই অলক্ষণ অব্যবহার্য নির্বিশেষ-ব্রহ্মের দিকে, নিরুদ্ধ করতে পারি মায়া বা প্রকৃতিরূপিণী সৃষ্টি-শক্তির সকল উচ্ছ্বাস, প্রপঞ্চবিভ্রমের চক্রাবর্তন হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে প্রবিষ্ট হতে পারি শাশ্বত শান্তি ও নৈঃশব্দ্যের অতল গহনে, ব্যক্তিভাবের নিরসন-দ্বারা আত্মহারা হয়ে যেতে পারি অদ্বিতীয় পরমার্থসতের মহাভাবে।... আরেকদিকে ব্রহ্ম পরিভূ—পরিভবন তাঁর স্বয়ম্ভূশক্তির সত্য বিলাস। তাঁর স্বয়ম্ভূ আর পরিভূ দুটি ভাব একই পরমার্থতত্ত্বের দুটি সত্য বিভাব। এই দুটি দর্শনের প্রথমটির ভিত্তি হল দার্শনিকের একান্তবাদ—যা আমাদের সমস্ত ভাবনার চরমকোটিতে একাগ্রচিত্তের পরমবিন্দুতে অব্যবহার্য নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রত্যয়কেই একমাত্র পরমার্থতত্ত্বরূপে স্থাপন করে। এই স্থাপনা হতে ন্যায়ত এবং ব্যবহারত সবিশেষ জগৎকে মিথ্যা প্রতিভাস অথবা অবস্তু-অসৎ জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করবার একটা দুরাগ্রহ দেখা দেয়। অন্তত মনে হয়, এ-জগৎ একটা কালকলনাময় অচিরস্থায়ী অবরসত্য মাত্র, শুধু প্রাকৃত ব্যবহারের তাগিদে আমাদের চেতনায় তার রূপ ফুটছে। অতএব তার প্রত্যয়কে নিরুদ্ধ করে মিথ্যাদৃষ্টি অথবা অবরসৃষ্টির দায় হতে আত্মাকে চিরমুক্ত করাই আমাদের পরমপুরুষার্থ। দ্বিতীয় দর্শনটির মূলে আছে ব্রহ্মের এই প্রত্যয় যে, তিনি ইতি অথবা নেতি কোনও বিশেষণে বিশেষিত হতে পারেন না বলেই নির্বিশেষ। ব্রহ্ম অব্যবহার্য—তার অর্থ এই যে, সম্বন্ধতত্ত্বের কোনও বিভাবই তাঁর অপ্রমেয় সন্ধিনী-শক্তির বীর্যকে সীমিত করতে পারে না। আমাদের ইতি অথবা নেতি, চরম বা অবম কোনও প্রত্যয়ের দ্বন্দ্বই তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে নিগড়িত কিংবা প্রসারকে সঙ্কুচিত করতে পারে না। আমাদের বিদ্যাতেও তিনি নিঃশেষিত হন না, আবার অবিদ্যাতেও আবৃত হন না—এমন-কি আমাদের **সত্তা ও অসত্তার** ভাবনাও তাঁর সীমা রচতে পারে না। অথচ ব্যবহার বা সম্বন্ধতত্ত্বের বৈচিত্র্যকে ধারণ পোষণ অথবা সর্জন করবার নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যও তাঁর আছে। একত্বের আনন্ত্যের সঙ্গে-সঙ্গে বহুত্বের আনন্ত্যে নিজেকে বিসৃষ্ট করবার বীর্য তাঁর নির্বিশেষ স্বভাবেই নিরূঢ় রয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁর অনুত্তর স্ব-ধর্মের লক্ষণ ও পরিণাম এবং এর ভবদ্রূপকে আমরা বিশ্বরূপের অকুণ্ঠিত লীলায়নে স্ফুরিত দেখি। স্বভাবত প্রপঞ্চের বিসৃষ্টিতে ব্রহ্মের যেমন কোনও পারবশ্য নাই, তেমনি তাকে বিসৃষ্ট না করবার দায়ও তাঁর নাই। আবার তাঁকে নিঃসত্ত্ব সর্বশূন্যও বলতে পারি না। কেননা, শূন্যব্রহ্ম ব্রহ্মই নন—আমাদের সর্বশূন্যতার কল্পনা তাঁকে মন দিয়ে জানবার কি ধরবার অসামর্থ্যের পরিচয় মাত্র। বিশ্বে যা-কিছু ভূত বা ভব্য, তার অনির্বচনীয় স্বরূপসত্যের তিনিই মূলাধার। নিখিলের স্বরূপ-সত্য এবং ভব্যার্থের আধার বলে আমাদের অন্তরে-বাইরে ভূতার্থের যা-কিছু

নিয়ত বিধান, তারও ভর্তা তিনিই। তাদের শাশ্বত সত্য অথবা নিরূঢ় বীজভাবের সম্ভাবনাকে তাঁর নির্বিশেষস্বভাবের অচিন্ত্য বৈভবে নিত্য তিনি বহন করেন। এই বীজীভূত ভূতার্থের অঙ্কুরণ অথবা এই শাশ্বতসত্যের নিগূঢ় বীর্যের বিভাবনাকে আমরা বিসৃষ্টি বলি এবং তাকেই প্রত্যক্ষ করি বিশ্বের আকারে।

অতএব ব্রহ্মভাবের ধারণায় কি উপলব্ধিতে জগদ্‌ভাবের প্রত্যাখ্যান বা প্রলয় ঘটাতেই হবে, এমন-কোনও অনতিবর্তনীয় বিধানের জুলুম আমরা মানি না। যদি মনে করি : এ-জগৎ তত্ত্বত অবাস্তব, শুধু অনির্বচনীয় মায়াশক্তির ইন্দ্রজালে এর প্রতিভাস, নির্বিশেষ ব্রহ্ম এর প্রতি উদাসীন, অথবা একে প্রভাবিত না করে কি এর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তটস্থ হয়ে আছেন, তাহলে এমন কল্পনা হবে আমাদেরই মনের বিকল্প। তার মূলে আছে তৎস্বরূপকে সীমার বাঁধনে বাঁধবার জন্যে ব্রহ্মচৈতন্যের 'পরে আমাদেরই মনশ্চেতনার অশক্তির একটা অধ্যারোপ। মনশ্চেতনা যখন স্বোত্তরভূমিতে উত্তীর্ণ হয়, তখন সে তার জ্ঞানের সাধন হারিয়ে ফেলে, ধীরে-ধীরে তলিয়ে যায় নিবৃত্তি বা উপশমের দিকে। তখন তার প্রাকৃতজগতের ধৃতিও শিথিল হয়ে পড়ে। এতদিন যাকে সে একমাত্র বাস্তব বলে জানত, তার বাস্তবতার ধারণা সে-ভূমিতে আর অনুবৃত্ত হয় না। প্রাকৃতমনের এই অশক্তিকে আমরা পরব্রহ্মে আরোপ করি। কল্পনা করি : তাঁর শাশ্বত অব্যক্তস্বরূপে এইধরনের একটা অশক্তি আছে। আমাদের কাছে এখন যা অবাস্তববৎ, তার প্রতি ব্রহ্মেরও একটা বিবিক্ত তটস্থতার ভাব আছে। আমাদের মনোনিবৃত্তিতে বা আত্মভাবের প্রলয়ে যেমন প্রপঞ্চের উপশম ঘটে, তেমনি প্রাতিভাসিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ব্রহ্মের নিরঞ্জন নির্বিশেষ স্বভাবেও আছে জগৎকে প্রত্যয়ারূঢ় করবার অথবা স্বাভাবিক স্ফুরত্তাদ্বারা তার ভর্তা হবার একটা অসামর্থ্য। অতএব তুরীয়ভূমিতে যেমন আমাদের কাছে তেমনি ব্রহ্মেরও কাছে জগৎ অবাস্তব। জগৎপ্রত্যয় যদি-বা সেখানে থাকে, তাহলেও তার সদ্‌ভাব অসদ্‌ভাবের কবলিত। অর্থাৎ জগৎপ্রত্যয় সেখানে মায়াকল্পিত ইন্দ্রজাল মাত্র।...কিন্তু ব্রহ্মে আর জগতে এমন-একটা দুস্তর ব্যবধান থাকবেই, এ-কল্পনা কি অপরিহার্য ? আমাদের প্রাকৃতচেতনার সাধ্য বা অসাধ্য দিয়ে অপ্রমেয় অপ্রাকৃত চেতনার বিচার বা পরিমাণ কি চলে কখনও ? প্রাকৃতচিত্তের কোনও ধারণাই স্বতঃসংবিতের পরমকোটিতে পৌঁছতে পারে না, অতএব তার রহস্যও সে ভেদ করতে পারে না। নিজের বন্ধনজাল হতে নিষ্কৃতি পেতে মনোময়ী অবিদ্যাকে বাধ্য হয়ে যে সর্বনাশের পথ বেছে নিতে হয়, ব্রহ্মকেও সেই পথ ধরতে হবে এমন কী দায় তাঁর আছে ? ব্রহ্মের তো নিজের কাছ থেকে পালাবার, অথবা যা-কিছু প্রত্যয়যোগ্য তার প্রতীতির প্রতি পরাঙ্‌মুখ হবার কোনও প্রয়োজন নাই।

ওই রয়েছে অব্যক্ত অবিজ্ঞেয় তত্ত্ব। আর এই-যে রয়েছে ব্যক্ত জ্ঞেয়তত্ত্ব—যার খানিকটা আমাদের অবিদ্যার কাছে ব্যক্ত। কিন্তু পরমপুরুষের দিব্যপ্রজ্ঞার কাছে তার সবখানিই ব্যক্ত, কেননা সে-প্রজ্ঞার অনন্তস্বরূপে যে তার তত্ত্বভাব বিধৃত। একথা সত্য বটে, আমাদের অবিদ্যা দিয়ে বা মনোময়ী বিদ্যার চরম প্রসার দিয়েও আমরা অবিজ্ঞেয়-সতের কোনও কিনারা করতে পারি না। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও মানতে হবে, বিদ্যায় হ'ক কি অবিদ্যায় হ'ক, আমাদের চিত্তের বৃত্তিও ওই অনির্বচনীয় তৎস্বরূপের বিচিত্র বিভূতি। কারণ তৎস্বরূপ ছাড়া আর-কিছুই যদি বিশ্বে না থাকে, তাহলে যেখানে যা-কিছু ফুটছে, সব তো তাঁরই বিসৃষ্টি। এই বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই তাঁর একত্বের নিরঙ্কুশ প্রকাশ—তাই তাঁর নানাত্বকে ছুঁয়ে আমরা একত্বের স্পর্শ পাই।...কিন্তু একত্ব এবং নানাত্বের সহভাবকে মেনে নিয়েও বুদ্ধির চরম রায়ে সম্ভূতির সত্য তিরস্কৃত হতে পারে এই অজুহাতে যে, ব্রহ্মের অন্যনিরপেক্ষ পরমার্থতত্ত্ব আর সাপেক্ষ জগতের প্রমাদী ও খণ্ডিত তত্ত্বভাবনার মধ্যে একটা ভেদ আছেই। অতএব সম্ভূতিকে প্রত্যাখ্যান করে অসম্ভূতিতে অবগাহন করাই আমাদের পরমপুরুষার্থ।

বিদ্যার উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে একটা দ্বৈতবোধ আমাদের চেতনায় দেখা দেবেই। এক আর বহু, অনন্ত আর সান্ত, সম্ভূতি আর অসম্ভূত নিত্য-সৎ, রূপী আর অরূপ, চিৎ আর জড়, পরম অতিচেতনা আর অবম অচেতনা—চিত্তের আঙিনায় এমনতর কত-না দ্বন্দ্বের ভিড়। এই দ্বন্দ্ববোধ হতে অব্যাহতি পাবার জন্য আমরা তার একটি কোটিকে বিদ্যার অধিকারে ফেলতে পারি, আর-একটিকে ঠেলে দিতে পারি অবিদ্যার এলাকায়। আমাদের চরম পুরুষার্থ তখন হবে সম্ভূতির অবরসত্য হতে পরাবৃত্ত হয়ে অসম্ভূতির উত্তরসত্যে আরূঢ় হওয়া, অবিদ্যা হতে ছিটকে পড়া বিদ্যার অধিকারে, অবিদ্যাচ্ছন্ন বহুর মায়াকে প্রত্যাখ্যান করে উত্তীর্ণ হওয়া একত্বের শাশ্বত ধামে—সান্ত হতে অনন্তে, রূপ হতে অরূপে, জড়বিশ্ব হতে চিন্ময়লোকে, অচিতির দুরাগ্রহ হতে অতিচেতন জীবনের স্বাতন্ত্র্যে আপন আসনকে অবিচল করে নেওয়া। জীবনসমস্যার এমনতর সমাধানে ধরে নিই—আমাদের দ্বন্দ্ববোধের দুটি কোটির মাঝে সর্বত্র অনপনেয় একটা বিরোধ, চরম ও পরম একটা অসামঞ্জস্য রয়েছে। যদি মানি, পরাবর দুটি কোটি ব্রহ্মেরই আত্মবিভূতির প্রকাশ : তবু বলব, তাঁর অবরবিভূতিতে আছে সত্যের ছন্ন বা বিকৃত রূপ, সুতরাং তার উপাসনায় আমরা কখনও তৃপ্তি অথবা সিদ্ধির চরম নিলয়ে উত্তীর্ণ হব না। অতএব বহুত্বের সকল ঝামেলা এড়িয়ে, সম্ভূতির জ্যোতির্ময় ঐশ্বর্যের অফুরন্ত সম্ভোগকেও ধিক্‌কৃত করে একাত্মপ্রত্যয়ের একাগ্র বিবিক্ততার দিকে আমাদের চলতেই হবে—বিচিত্র আত্মপরিণামের প্রলয় ঘটিবে। অনন্তের আহ্বান এসে আমাদের কানে পেঁছেছে,

আর-কি সান্তের বন্ধনে বাঁধা থাকতে পারি! সান্তের মধ্যে কোথায় তৃপ্তি, কোথায় শান্তি, কোথায় মুক্তির ঔদার্য? অতএব ভাঙো কারাগার, ছিঁড়ে ফেল আত্মপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির সকল বন্ধন, ফুৎকারে উড়িয়ে দাও অসীমের 'পরে কল্পিত যত সীমার মায়া, প্রতীক ও প্রতিমার যত কল্প-ছায়া, উপাধি ও বিশেষণের যত জঞ্জাল—সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও খন্ডবোধকে নিমজ্জিত কর আনন্ত্যের মহারসায়নে নিত্যতৃপ্ত আত্মার অব্যক্ত বৈপুল্যে। বিবেকীর কাছে রূপের সম্মোহন তুচ্ছ—তার মিথ্যা আকর্ষণের চঞ্চল মায়া আর তাঁকে ভোলাতে পারবে না। আঁধারের বুকে বারবার বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্তি, একই ছলনার অন্তহীন পুনরাবৃত্তি নৈরাশ্যে ক্লান্তিতে সকল হৃদয় ভরে দিয়েছে! অতএব মূঢ় প্রকৃতির এই চক্রাবর্তন হতে সবলে ছিনিয়ে নাও নিজেকে—ঝাঁপ দাও শাশ্বত সন্মাত্রের অরূপ অলক্ষণ অচলস্থিতির অনুত্তরঙ্গ পারাবারে। আত্মাকে লজ্জিত করেছে জড়ের স্থূলত্ব, লক্ষ্যহীন চঞ্চল প্রাণের ক্ষুব্ধতা অসহিষ্ণু করে তুলছে তাকে দিনে-দিনে, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের ছটফটি এনেছে বিপুল ক্লান্তি, তার সকল সাধনা ও লক্ষ্যের প্রতি এনেছে গভীর অনাশ্বাস। তাই বাঁধন ছেঁড়বার সময় এসেছে এবার—এসেছে চিৎস্বরূপের শাশ্বত নিরঞ্জন প্রশান্তির অতলে তলিয়ে যাবার দুর্বার আহ্বান। জেনেছি, অচিতি একটা সুপ্তির ঘোর—একটা অন্ধ-কারা, আর চেতনাও লক্ষ্যহীন পরিণামহীন একটা মূঢ় আবর্তন বা স্বপ্নের বিভ্রম মাত্র। অতএব উভয়ের মোহ হতে নিজেকে মুক্ত করে জাগতে হবে অতিচেতনার আনন্দজ্যোতির্ময় শাশ্বত ধামে, যেখানে অচিতির অন্ধতমিস্রা বা অবিদ্যাচেতনার প্রদোষচ্ছায়া নাই। ব্রহ্মপদই আমাদের পরম শরণ। তাকে ছেড়ে মিথ্যা এই জগৎ, মিথ্যা অবিদ্যার ছলনা—প্রকৃতির চক্রে যন্ত্রারূঢ় জীবের মিথ্যা এই অন্তহীন আবর্তন।...

আমরা কিন্তু বিদ্যা আর অবিদ্যার মাঝে অন্যোন্যবিরোধকে এমন একান্ত করে তুলি না। দুরূহ হলেও একটা মহত্তর ঔদার্যের ভূমিকায় আমরা সকল বিরোধের সমাধান ঘটাতে চাই। আমরা জানি, এক আর নানা, রূপ আর অরূপ, সান্ত আর অনন্ত পরস্পরের ব্যাবর্তক নয়—আপূরক। এমন-কি ব্রহ্মের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব যে পর্যায়ক্রমে আবৃত্ত হয়ে চলেছে, তাও নয়। বিসৃষ্টির বহুধাবিলাসে ব্রহ্ম নিঃশেষে আপন একত্বকে হারিয়ে ফেলেন, তারপর বহুত্বের গোলকধাঁধায় তাকে আর খুঁজে না পেয়ে বহুত্বকে গুটিয়ে নিয়ে আবার তাঁর একত্বের মহিমায় ফিরে যান—একথাও সত্য নয়। একত্ব আর নানাত্ব, রূপ আর অরূপ সমস্তই তাঁর নিত্যসহচরিত দ্বিদল বিভূতি। তারা অন্যোন্য-সাপেক্ষ—অন্যোন্যসমাধানহীন পর্যায়মাত্র নয়। আমরা তাদের মধ্যে একই তত্ত্বভাবের দুটি বিভাব দেখছি। তাই পৃথক অনুশীলনে নয়, কিন্তু উভয়ের যুগপৎ অনুধ্যানে আমাদের কাছে পূর্ণস্বরূপের জ্যোতির দুয়ার খুলে যায়।

অবশ্য পৃথক অনুশীলনও যে অন্যায্য, তা নয়। এমন-কি তাকে বিজ্ঞান-সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ বলতেও বাধা নাই। বিজ্ঞান যে সর্বত্রই একবিজ্ঞান মাত্র, তাতে সন্দেহ নাই। পরমার্থসতের আত্মবিস্মৃতিই যে অজ্ঞান, তাও সত্য। তার ফলে বহুর মধ্যে নিজেকে আমরা একান্ত বিবিক্ত বলে জানি, সম্ভূতির দিশাহারা গোলকধাঁধায় অন্ধ হয়ে ঘুরে মরি—এও মানি। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও মানতে হয় : সম্ভূতির মধ্যেই তো চিৎপরিণামের ধারা ধরে বিজ্ঞানের উন্মেষে জীবচেতনার অজ্ঞানের ঘোর কেটে যাচ্ছে। বহুত্বের বিলাসে এক পরমার্থসৎই যে সর্বভূত হয়েছেন—এই সংবিৎই ধীরে-ধীরে তার মধ্যে জাগছে। একের এই বহুবিভাবনাও তার কাছে অসম্ভব ঠেকে না—কেননা বহুর স্বরূপসত্য যে একের কালাতীত সদ্ভাবে পূর্ব হতেই নিহিত ছিল। ব্রহ্মের সম্যক্-জ্ঞানে তাঁর দুটি বিভাবই চেতনায় সুষম হয়ে ফুটে উঠবে—কেননা দুটির একটিকে মাত্র একান্তভাবে আঁকড়ে ধরলে, তাঁর সর্বগত স্বরূপ-সত্যের আর-একটি দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে পড়ে। সর্বসম্ভূতির অতীত অসম্ভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, সংসারে অনুস্যূত আসক্তি ও অবিদ্যার বন্ধন ছিন্ন করে আমরা স্বাতন্ত্র্যের অধিকার পাই। তখন সেই স্বাতন্ত্র্যদ্বারাই আমরা সম্ভূতিকে ও সংসারকে নিরঙ্কুশ হয়ে সম্ভোগ করি। অতএব সম্ভূতির বিজ্ঞানও ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ। এ-বিদ্যাও আমাদের চেতনায় অবিদ্যা হয়ে ওঠে। কেননা, আমরা নিত্যসত্যের একত্ববোধকে হারিয়ে অবিদ্যার অন্তস্তলে অভি-নিবিষ্ট হয়ে আছি—জানছি না, অন্বয়স্বরূপ অবিদ্যারও অধিষ্ঠানতত্ত্ব এবং তাৎপর্য, এঁরই আবেশে তার বিসৃষ্টি, এঁকে আশ্রয় করেই তার অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে।

বস্তুত ব্রহ্ম যে কেবল অব্যবহার্য অলক্ষণ স্বভাবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', তা নয়; বিশ্বের বহুধাবিসৃষ্টিতেও তিনি এক। মনের বিভজনবৃত্তিকে জেনেও তিনি স্বয়ং তার দ্বারা সীমিত হন না। তাই বহুত্বকে ব্যবহারকে ও সম্ভূতিকে স্বীকার করেও তাঁর অন্বয়ভাব তেমনি সহজ ও অব্যাহত—যেমন সে সহজ তাদের নিরসনে। অতএব তাঁর একত্বের মহিমাকে পরিপূর্ণ আস্বাদন করতে হলে বিশ্বের অন্তহীন আত্মরূপায়ণের বৈচিত্র্যে খুঁজতে হবে তার অনির্বচনীয় চর্বণা। কেননা সেই এক যখন বিশ্বরূপে বহু হয়েছেন, তখন এই বহুত্বের মধ্যেও তাঁর অখণ্ড একত্ব অনুস্যূত আছে। একত্বের আনন্ত্যদ্বারা বিধৃত এবং আবিষ্ট হয়ে চেতনায় অর্থপূর্ণ ও সার্থক হয়ে ফোটে বহুধাবিসৃষ্ট আনন্ত্যের রসরূপ। আবার একের আনন্ত্য নিষিক্ত হয়ে জারিত করে বহুর আনন্ত্যকে। এমনি করে আপন উচ্ছলিত বীর্যের ধারাকে ঢেলে দিয়েও অটল থাকা, আত্মবিপরিণামের অন্তহীন অজস্র বিভাবনাতেও উদ্‌ভ্রান্ত না হয়ে উন্মুখ অথচ অবিচল থাকা, আত্মবৈচিত্র্যের অকুণ্ঠ উৎসারণেও নিজের মধ্যে

অটুট থাকা—এই তো নির্মুক্ত পুরুষের অবন্ধ্য দেববীর্য, এই তো চিন্ময় পুরুষের আত্মবিদ্যাদ্বারা অমৃতের সম্ভোগ। আত্মার যে সান্ত আত্মবৈচিত্র্যের মধ্যে আত্মবিদ্যাহীন মন জড়িয়ে গিয়ে বৈচিত্র্যের মেলায় ছড়িয়ে পড়ে, তাও কিন্তু তাঁর আনন্ত্যের নিরাকৃতি নয়। বরং তার মধ্যে আনন্ত্যেরই অন্তহীন প্রকাশের সামর্থ্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে নইলে এ সান্তের মেলা অহেতুক বা অর্থহীন হত। অনন্তস্বরূপের মধ্যে যেমন আছে সত্তার স্বপ্রতিষ্ঠ অসীমতার আনন্দ, তেমনি আছে বিশ্বরূপে অন্তহীন আত্মবিশেষণের দ্বারা ওই অসীমতার দিব্য-সম্ভোগ। স্বরূপত অরূপ বলে যে দিব্য-পুরুষের অগণিত রূপায়ণের নিরঙ্কুশ প্রতিভা নাই, তা নয়। আবার রূপকে স্বীকার করলেই যে তাঁর দিব্যভাবের প্রচ্যুতি ঘটে তা নয়—বরং ওই আত্মকল্পিত রূপের আধারে তিনি ঢেলে দেন তাঁর সত্তার আনন্দ, তাঁর দেবত্বের মহিমা। সোনা কি আর সোনা রইল না কনককুণ্ডলে বা বিচিত্র মূল্যের স্বর্ণমুদ্রায় নিজেকে রূপান্তরিত করল বলে? যে-পৃথ্বীশক্তি হতে এই বহুরূপা জড়প্রকৃতির উদ্ভব তার অপ্রচ্যুত দিব্যভাব কি এই জীবধাত্রী ধরিত্রীতে এই পর্বতে-কন্দরে নিজেকে সে আকারিত করেছে বলে হারিয়ে গেল? কুমারের হাতে কাদার তাল কি কামারের হাতে লোহার তাল হয়ে শিল্পের বিচিত্র উপকরণ জোটাতে কি তার কোনও বাধা আছে? উপনিষদ যাকে 'অন্ন' বলেছেন, সেই মৃৎশক্তি বা রূপধাতু—স্থূল-সূক্ষ্ম মৃন্ময়-মনোময় যা-ই সে হ'ক না কেন—সে তো চিৎসত্তার রূপবিগ্রহ। চিৎপুরুষের আত্মরূপায়ণের উপাদানরূপে কল্পিত না হলে তার সৃষ্টিই যে অসম্ভব হত। জড়বিশ্বের আপাত-অচিতির তমোঘন গর্ভাশয়ে জ্যোতির্ময়ী অতিচিতির শাশ্বত যত সুব্যক্ত মহিমা নিহিত আছে। কালের কলনায় তাদের ধীরে-ধীরে ফুটিয়ে তোলাই তো প্রকৃতির ইষ্টসাধনার আনন্দ, তার কল্পাবর্তনের পরম প্রয়োজন।

তত্ত্ববস্তু ও তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপসম্পর্কে আরও যেসব সিদ্ধান্ত আছে, তারাও একটা আলোচনার দাবি রাখে। কেউ-কেউ বলেন : এ-জগৎ মনের প্রত্যক্‌বৃত্ত কল্পনামাত্র—এ কেবল 'বিজ্ঞানের' একটা প্রবাহ। বিজ্ঞান হতে স্ব-তন্ত্র স্বয়ম্ভূ পরাক্‌-বৃত্ত তত্ত্বও আছে—এ আমাদের মনের বিভ্রম শুধু। কেননা এধরনের কোনও স্ব-তন্ত্র পদার্থের সত্তা আজও আমাদের কাছে নিষ্প্রমাণ। এ-দর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত হবে—বিজ্ঞানই একমাত্র তত্ত্ব; অথবা সর্ববিধ সদ্বস্তুর প্রতিষেধ-হেতু অসৎ বা শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব। এক মতে বিজ্ঞানকল্পিত বস্তুর কোনও বাস্তব সত্তা নাই, তারা কল্পনার একটা আকার শুধু। এমন-কি তারা যে-আলয়বিজ্ঞান বা চিত্তের পরিকল্পনা, সেও বিজ্ঞানসন্তান ছাড়া কিছুই নয়। চিত্তের অনন্ত বৃত্তির পরম্পরা কাল্পনিক যোগসূত্রে গ্রথিত হয়ে কালিক অনুবৃত্তির একটা বিভ্রম সৃষ্টি করে। কিন্তু এসব কল্পনার বস্তুত কোনও

ভিত্তি নাই—কেননা আগাগোড়াই তারা তত্ত্ব নয়, তত্ত্বের প্রতিভাসমাত্র। অর্থাৎ তত্ত্ববস্তুর স্বরূপ হল একাধারে চিৎসত্ত্ব ও স্পন্দধর্মের শাশ্বত শূন্যতা। পরিকল্পিত বিশ্বের প্রতিভাস হতে পরাবৃত্ত হয়ে ওই শূন্যতাতে অবগাহন করাই হল তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ। এই বিজ্ঞানে দুদিক হতে আত্মভাবের প্রলয় ঘটবে। পুরুষের নির্বাণের সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতিও নিবৃত্ত অথবা প্রলীন হবে—কেননা পুরুষ আর প্রকৃতিই হল আমাদের সত্তার দুটি দল, অতএব মহা-নির্বাণের সিদ্ধি আসবে উভয়ের নিরাকৃতিতে। চিৎসত্ত্ব এবং স্পন্দশক্তি দুইই যদি অতাত্ত্বিক হয়, তাহলে অচিতিই হল একমাত্র তত্ত্ব যার মধ্যে দেখা দেয় ক্ষণবিজ্ঞানের এই পরম্পরা। অথবা আত্মভাব ও ভাবপ্রত্যয়ের অতীত অতিচিতিই হল তত্ত্বের স্বরূপ।...কিন্তু এ-দর্শন সত্য হতে পারে, যদি প্রাকৃত-চিত্তকেই মনে করি আমাদের চেতনার সর্বস্ব। চিত্তলীলার বিবৃতি হিসাবে এর মধ্যে অপ্রামাণিক কথা কিছুই নাই, কেননা চিত্ত-চৈতসিকের ভূমিতে সমস্তই মনে হয় অশাশ্বত বিজ্ঞানধাতুর ক্ষণভঙ্গুর পরিকল্পনা। কিন্তু একেই তত্ত্ব-বস্তুর সম্যক্-দর্শন বলতে পারি না—যদি আত্মা এবং জগৎ সম্পর্কে আরও উদার ও গভীর উপলব্ধি সম্ভব হয়। সে-উপলব্ধির সাধন হবে তাদাত্ম্যবোধ, তার আশ্রয় হবে স্বাভাবিক তাদাত্ম্যসংবিৎযুক্ত দিব্যচেতনা এবং এই চেতনা হবে কোনও চিন্ময়পুরুষের শাশ্বত আত্মসংবিতের স্ফুরণ। এই তাদাত্ম্য-সংবিতের বিষয় ও বিষয়ী দুটি কোটির সত্তা চেতনার কাছে সামরস্যের অন্তরঙ্গতায় সত্য হয়ে ওঠে। তারা তখন হয় তাদাত্ম্য-চেতনারই স্বাঙ্গীভূত দুটি দল, অতএব তার সত্তার প্রামাণ্য সপ্রমাণ।

কিন্তু চিত্ত বা আলয়বিজ্ঞান যদি একমাত্র তত্ত্ব হয়, তাহলে বিশ্বের জড়ভাব ও জড়বস্তুর কথঞ্চিৎসত্তা থাকলেও সে-সত্তা হবে চিত্তের বিকল্প মাত্র। জগৎ তখন বিজ্ঞানধাতুর দ্বারা বিসৃষ্ট ও বিধৃত এবং অন্তকালে বিজ্ঞানেই তার প্রলয়। কারণ সৃষ্টিশক্তির অধিষ্ঠানরূপে কোনও পারমার্থিক সত্তা কি পুরুষ কিছুই যদি না থাকে, এমন-কি অসৎ বা শূন্যও যদি সৃষ্টির আধার না হয়, তাহলে সত্তা বা ভাবকে বিশ্বস্রষ্টা বিজ্ঞানের ধর্ম কিংবা স্বরূপ বলে মানতে হবে। কিন্তু যে-বিজ্ঞান কোনও সত্তার স্বধর্ম নয় অথবা স্বয়ং সত্তাস্বরূপ নয়, সে তো অবাস্তব। তাকে বলতে পারি মহাশূন্যের একটা নিরালম্ব দৃক্‌শক্তিমাত্র—অসৎ হতে মহাশূন্যে রচনা করে চলেছে অবস্তুর বিকল্পজাল! কিন্তু আর-সব সিদ্ধান্ত অপাঙ্‌ক্তেয় না হলে এ-সিদ্ধান্তকে স্বীকার করা তো সহজ নয়। সুতরাং বাধ্য হয়ে মানতে হয়, যাকে বিজ্ঞান বা চেতনা বলছি, সে এমন-কোনও পুরুষ কি সত্তার স্বরূপশক্তি যার চিন্ময় উপাদান হতেই বিশ্বের বিসৃষ্টি।

কিন্তু এমনি করে সত্তা ও চেতনার দ্বিদল তত্ত্বভাবে যদি ফিরে যাই,

তাহলে হয় বেদান্তের সিদ্ধান্ত অনুসারে মানতে হবে এক পূর্ব্য সৎপুরুষকে, অথবা সাংখ্যের সঙ্গে সায় দিয়ে মানতে হবে বহুপুরুষকে—যার কাছে বা যাদের কাছে বিজ্ঞান কি বিজ্ঞানধর্মী কোনও শক্তি তার এমনিতর বিকল্পনা উপস্থাপিত করছে। বহুপুরুষবাদ সত্য হলে বলতে হবে, প্রত্যেক পুরুষ আত্মচেতনার সীমার মধ্যে বিবিক্তভাবে—হয় বিশ্বরূপ নয়তো বিশ্বস্রষ্টা। তখন প্রশ্ন হয়, একই বিশ্বের মধ্যে তাদের অন্যোন্যসম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কেমন করে। বহু সরূপ পুরুষের ভোগক্ষেত্ররূপে সাংখ্য যেমন একটিমাত্র অচেতনা প্রকৃতিকে স্বীকার করেছে, তেমনি আমাদেরও মানতে হবে এক অদ্বিতীয় চেতনা বা শক্তি—যার আধারে বহু পুরুষের মনঃকল্পিত বিশ্বের অন্যোন্যসম্বন্ধ এবং সারূপ্য সিদ্ধ হবে। এ-সিদ্ধান্তের সুবিধা এই যে, এতে বহুপুরুষ ও বহুভূতের সত্তার সমর্থন মেলে, তাদের অনুভববৈচিত্র্যেও একত্বের দ্যোতনা পাওয়া যায়—অথচ সেইসঙ্গে প্রত্যেক ব্যষ্টিপুরুষের আধ্যাত্মিক প্রগতি ও নিয়তির বৈশিষ্ট্যও বাস্তব হয়। কিন্তু এক বিশ্বশক্তি বা বিশ্বচেতনা যদি নিজেকে বহুধা রূপায়িত করে তার বিশ্বরাজ্যে বহু পুরুষের ঠাঁই করে দিতে পারে, তাহলে এক অনাদি বিশ্বম্ভর পুরুষই-বা কেন বহু পুরুষের আধার বা রূপায়ণরূপে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না? বহুপুরষ তখন হবে তাঁর অখণ্ডসত্তার অংশকলা বা চিদ্বীর্য এবং বহুভূত অথবা চেতনার বহুরূপ হবে সেই পরমপুরুষের বহুরূপ।...তখন প্রশ্ন হবে, এই বহুত্ব এবং রূপায়ণ কি এক অখণ্ড পরমার্থসতের তত্ত্বরূপ, না তাঁর পুরুষবিধতার একটা কল্পিত প্রতিরূপ মাত্র? না মনের বিকল্পনায় এ কেবল তাঁর প্রতিচ্ছবি? এ-প্রশ্নের সমাধান নির্ভর করছে আরেকটা প্রশ্নের 'পরে। বিশ্বের মূলে কি রয়েছে আমাদের এই প্রাকৃতমনের প্রবৃত্তি—না আরও বৃহৎ ও গভীর কোনও চেতনার প্রবর্তনা, মন যার প্রেতির বহিশ্চর সাধনা বা বিসৃষ্টির অবলম্বন মাত্র? প্রথম কল্প সত্য হলে, মনঃকল্পিত ও মনোদৃষ্ট বাস্তবতা প্রত্যক্-বস্তু, প্রতীক-ধর্মী বা তত্ত্বের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। আর দ্বিতীয় কল্প সত্য হলে, বিশ্বপ্রকৃতি এবং তার আত্মভূত তাবৎ পদার্থ পরমার্থ-সতের যথাভূত তত্ত্বরূপ—তাঁর সন্ধিনী-শক্তির দ্বারা বিসৃষ্ট আত্মসত্তার বীর্যবিভূতি বা রূপায়ণ। সর্বগত ব্রহ্ম এবং তাঁর সৃষ্টিপরা শক্তি মায়া বা প্রকৃতির মধ্যে মন তখন ভাবনার একটা সেতু মাত্র।

আমাদের প্রাকৃতবুদ্ধিতে যে-চিত্তসত্ত্বের প্রকাশ, সে যে সত্তার একটা গৌণ বিভূতি মাত্র, তাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই চিত্তসত্ত্বে বা মনে অশক্তি ও অবিদ্যার লাঞ্ছন আছে। তাতেই প্রমাণ হয়, সে জন্য-শক্তি মাত্র—প্রবর্তিকা জনক-শক্তি নয়। স্পষ্টই দেখছি, প্রাকৃতমন যা-কিছু দেখে, তাকে জানে না বা বোঝে না, কিংবা তার স্বচ্ছন্দ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তার নাই। জ্ঞান ও

শক্তি মনের স্বভাবধর্ম নয়—তার দীর্ঘকালব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনার সঞ্চয় মাত্র। এ যদি তার আত্মশক্তির বিভূতি হত, তাহলে গোড়া হতেই তার জ্ঞানে কুণ্ঠা বা শক্তিতে পঙ্গুতা থাকত না। পুরুষের এই দৈন্যের মূলে হয়তো ব্যষ্টিমনের উপচরিত ও পরাক্-বৃত্ত জ্ঞান আর শক্তির বৈকল্য রয়েছে। হয়তো এই মনেরও পরে এক বিরাট্ মন আছে—সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বৈশ্বর্যের নিটোল পূর্ণতা যার ধর্ম। কিন্তু বিদ্যার অভীপ্সাবাহিনী অবিদ্যা আমাদের প্রাকৃতমনের স্বরূপ। সে শুধু ভগ্নাংশকে জানে, কেবল জোড়াতাড়া নিয়ে কারবার করে। এমনি করে সে অভঙ্গের কোঠায় পৌঁছতে চায়। কিন্তু বস্তুর স্বরূপ বা সমগ্ররূপ কোনটিই তার দখলে নাই। বিশ্বমনেরও এই ধর্ম হলে, শুধু বিশ্বব্যাপ্তির জোরে সে হয়তো আপন খণ্ডভাবের সমাহারকে জানতে পারবে—কিন্তু তবু বস্তুর স্বরূপজ্ঞান তার থাকবে না এবং স্বরূপজ্ঞানের অভাবে তত্ত্বের সম্যক্-জ্ঞানও সম্ভব হবে না। কিন্তু যে-চেতনায় স্বরূপের সম্যক্-বিজ্ঞানের স্বারসিক সামর্থ্য আছে এবং স্বরূপাবগাহনের শক্তিতে যে-চেতনা সত্তার মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তার সমগ্রতায় প্রসারিত হয় এবং সমগ্রভাব হতে অংশে-অংশে পরিব্যাপ্ত, তাকে আর কোনমতেই মন বলা চলে না। তাকে আমরা বলব পূর্ণসিদ্ধ ঋত-চিৎ, যার মধ্যে আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞানের স্বভাবশক্তি স্বরসবাহী হয়ে আছে। এই ঋত-চিতের ভূমিকা হতেই আমরা তত্ত্বভাবের প্রত্যক্-বৃত্ত পরিচয় গ্রহণ করব। চেতনা হতে স্ব-তন্ত্র পরাক্-বৃত্ত কোনও তত্ত্বভাব যে অসম্ভব, একথা সত্য। অথচ পরাক্-বৃত্তিরও একটা সত্যতা আছে। সে-সত্যের তাৎপর্য এই : বস্তুর তত্ত্বভাব তার অন্তর্গূঢ় কোনও স্ব-ভাবের মধ্যে নিহিত রয়েছে। অতএব ভূয়োদর্শন দ্বারা মন তার তত্ত্বরূপের যে-কল্পনা ও ব্যাখ্যা করে, তার সঙ্গে আসল সত্যের কোনও নৈসর্গিক সম্পর্ক নাই। মনের বিকল্প বিশ্বসম্পর্কে মনেরই প্রত্যক্-বৃত্ত কল্পরূপ বা আলেখ্য। কিন্তু বিশ্ব বা বিশ্বভূত তো কল্পরূপ কি আলেখ্য নয় শুধু। তত্ত্বত তারা চেতনার বিসৃষ্টি। কিন্তু সে-চেতনা সত্তার অবিনাভূত, তার ধাতু সত্তার স্বরূপধাতু এবং সেই ধাতুতে তার জগৎ গড়া। অতএব তার জগৎও তারই মত সত্য। এইভাবে দেখলে জগৎকে আর চেতনা বা বিজ্ঞানের প্রত্যক্-বৃত্ত বিসৃষ্টি বলতে পারি না। তখন দেখি, বস্তুর প্রত্যক্স্থিতি আর পরাক্স্থিতি দুইই বাস্তব —তারা একই পরমার্থসতের দুটি বিভাব মাত্র।

অবশ্য বৈখরী বাকের আপেক্ষিকতা ও অপূর্ণ ব্যঞ্জনাশক্তির সঙ্গে সায় দিয়ে বলতে পারি, একদিক থেকে দেখতে গেলে জগতের সব-কিছুই প্রতীক মাত্র। তৎস্বরূপ আমাদের সর্বাধার হলেও এই প্রতীকের ভিতর দিয়েই তাঁর দিকে এগিয়ে যাবার পথ রয়েছে। একত্বের আনন্ত্য যেমন একটা প্রতীক, বহুত্বের আনন্ত্যও তা-ই। আবার বহুভাবনার প্রত্যেকটি ভাবের ইশারা যখন

একের দিকে, তথাকথিত প্রত্যেকটি সান্তভাব যখন অনন্তের প্রতিচ্ছবি, পুরঃক্ষিপ্ত রূপায়ণ বা তার ব্যঞ্জনাবাহী কল্পছায়া—তখন বিশ্বে যা-কিছু আছে কি ঘটছে, প্রাণ বা মনের রূপায়ণে যা-কিছু ব্যাকৃত হচ্ছে, সেসমস্তই একটা প্রতীক বা দ্যোতনা মাত্র। মনের প্রত্যক্-বৃত্তির কাছে সত্তার আনন্ত্যও যেমন একটা প্রতীক, অসত্তার আনন্ত্যও তা-ই—দুয়েরই মধ্যে আছে অনির্বচনীয় অব্যক্তের নিগূঢ় ব্যঞ্জনা। পরব্রহ্মের ব্যক্তমধ্য স্থিতির এক প্রান্তে অচিতির আনন্ত্য, আরেক প্রান্তে অতিচিতির আনন্ত্য। আমরা আছি দুয়ের মাঝখানটিতে। একটি প্রত্যন্তসীমা হতে আরেকটি প্রত্যন্তের দিকে চলেছে আমাদের অভিযান এবং সেই চলার বেগে অব্যক্ত আমাদের চেতনায় ব্যক্তরূপ ধরছে। তার তাৎপর্যকে প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করে সত্যধৃতির কলায়-কলায় উপচিত করাই আমাদের সাধনা। এমনি করে আত্মসত্তার ক্রমোন্মীলনের ভিতর দিয়ে একদিন আমরা পৌঁছব অনুত্তরের অনুপাখ্য চেতনায়—আত্মভাব ও জগদ্‌ভাবের পরম প্রত্যয়ে। সেদিন বুঝব, যা-কিছু আছে আর যা-কিছু নাই—দুইই সেই চিরগুণ্ঠিতের গুণ্ঠনমোচনের অনির্বচনীয় ছন্দোদোলা, কেননা তাঁর পরিপূর্ণ তত্ত্বের প্রকাশ শুধু তাঁর শাশ্বত পরম স্বয়ংজ্যোতির বর্ণরাগহীন নৈঃশব্দ্যে।

কিন্তু এমনি করে প্রতীকের ভিতর দিয়ে সব-কিছুকে দেখাও মনোময় দর্শনের একটা ভঙ্গি। অসম্ভূতির সঙ্গে বাহ্যসম্ভূতির সম্পর্ককে মন এই ধারাতে বুঝতে চায়। মনের কাছে বিসৃষ্টির সত্যের একটা চলচ্চিত্র হিসাবে এর প্রামাণ্যকে অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও মানতে হয় যে, বস্তুর প্রতীকরূপকে স্বীকার করলেই তারা অর্থপূর্ণ সঙ্কেতমাত্রে পর্যবসিত হয় না—গণিতের বস্তুশূন্য সঙ্কেতের মত। জ্ঞানের সাধন হিসাবে এমন সঙ্কেতের ব্যবহার বস্তুনিষ্ঠ মনের পক্ষে অপরিহার্য। তবু প্রতীক তার কাছে ভাবের দিক দিয়ে বাস্তব হলেও বস্তুর দিক দিয়ে অবাস্তব। কিন্তু বিশ্বের রূপ ও ভাবনা অবাস্তবের আভাসযুক্ত প্রতীক নয় শুধু—তারা ব্রহ্মবস্তুর তথাভূত সম্ভূতি। তারা তৎস্বরূপের আত্মরূপায়ণ এবং তাঁর সদ্‌ভাবের স্পন্দ ও বীর্য। বিশ্বের প্রত্যেকটি রূপের আবির্ভাবের পিছনে অন্তর্যামী তৎস্বরূপেরই কোন বীর্যবিভূতির প্রেতি আছে। বিশ্বের প্রত্যেকটি ভাবনার মূলে আছে সন্মাত্রেরই কোনও সত্য-ভাবনার স্পন্দ—তাঁর বিসৃষ্টি-লীলার কোনও প্রবর্তনা। বিশ্বের মধ্যে এমনি করে যাথাতথ্যত অর্থের বিধান আছে বলেই মন তার একটা প্রামাণিক তাৎপর্য খুঁজে পায়, প্রত্যক্‌চেতনায় তার কল্পরূপ গড়তে পারে। আমাদের মন মুখ্যত বিশ্বের দ্রষ্টা এবং বোদ্ধা, গৌণত সে স্রষ্টা—অবশ্য সিদ্ধ সৃষ্টির প্রবর্তনাকে অনুসরণ করেই। মনের সমস্ত প্রত্যক্-বৃত্তির এই বিশেষত্ব যে, তার মধ্যে পরমার্থসতের কোনও-না-

কোনও সত্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। প্রতিবিম্বের বিম্বস্থানীয় যা, তার স্ব-তন্ত্র একটা সত্তা আছে। সেই স্বাতন্ত্র্য কখনও প্রকাশ পায় জড়বস্তুর প্রত্যক্‌-স্থিতিতে, কখনও-বা মনোগ্রাহ্য অথচ অতীন্দ্রিয় জড়োত্তর তত্ত্বভাবের আকারে। অতএব মনকে বিশ্বের আদিবিধাতা বলতে পারি না। মন বস্তুত একটা অবান্তরবিভূতিরূপে সত্তার কতকগুলি ভূতার্থের গ্রাহক এবং প্রমাপক। তটস্থ সাধনরূপে ভব্যার্থকে ভূতার্থে পরিণত করে সৃষ্টির সে সহায় হলেও, সত্যকার সৃষ্টিবীর্য আছে একমাত্র চিতি-শক্তির—যে-শক্তি বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক চিৎস্বরূপে নিত্যসমবেত।

তত্ত্ববস্তু ও তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তও আছে। কেউ-কেউ বলেন : পরাক্‌ তত্ত্বই একমাত্র পূর্ণ সত্য এবং পরাক্‌-বৃত্ত অর্থাৎ বিষয়-নিষ্ঠ জ্ঞানেরই অবিসংবাদিত প্রামাণ্য আছে। এই মতে জড়ের সত্তা বিশ্বের আদি সত্য, চিদ্‌বস্তু বা জীবচেতনার সত্তা সংশয়িত। চেতনা চিত্ত চিৎ কি জীবাত্মা বিশ্বে লীলায়িত জড়শক্তির একটা সাময়িক পরিণাম। যা-কিছু স্থূল কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তার তত্ত্বভাবে একটা ন্যূনতা আছে—কেননা জড়ের পরাক্‌-বৃত্তির 'পরেই সমস্ত প্রামাণ্যের নির্ভর। জড়াশ্রয়ী মনের কাছে জড়াতীতের সত্তা সিদ্ধ করতে তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাক্ষ্যের প্রয়োজন। উপযুক্ত সমীক্ষা ও পরীক্ষার দ্বারা বাহ্য জড়পদার্থের সঙ্গে তার গোত্রসম্পর্ক প্রমাণিত হলে তবেই সে তত্ত্বলোকে প্রবেশের ছাড়পত্র পাবে।...কিন্তু এ-সিদ্ধান্তে সম্যক্‌-দর্শনের ঔদার্য নাই বলে একে পুরাপুরি মেনে নেওয়া কঠিন। এ শুধু দেখে অস্তিত্বের একটা বিভাব—এমন-কি তার একটা খণ্ডদেশ মাত্র। তার বাইরে যা-কিছু, তা-ই তার কাছে নিস্তত্ত্ব নিরর্থক অতএব বিচারেরও অযোগ্য। একান্ত-জড়বাদীর কাছে একটা মাটির ঢেলা কি তালের বড়া যতখানি সত্য, তার তুলনায় প্রেম বীর্য মনস্বিতা প্রতিভা বা মহত্ত্ব কিছুই কিছু নয়। মানুষের অদম্য হৃদয়-মন এই যে অজানা বিশ্বের সহস্র শঙ্কিলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের আপন হাতের মুঠায় আনছে, তার কাছে এই পৌরুষেরও কোনও মূল্য নাই। কেননা এ তো তার দৃষ্টিতে একটা পরতন্ত্র অবরসত্য মাত্র—বস্তুতন্ত্রতাহীন ক্ষণিকার চমক ছাড়া একে আর কি বলবে সে? আমরা মনের ঘোরে যাদের এত বড় করে দেখছি, তারা তার কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় আধারের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়বস্তুর ঠোকাঠুকির ফল ছাড়া কিছুই নয়। অতএব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নিয়ে যতক্ষণ ভাবের কারবার, ততক্ষণই তার প্রামাণ্য। ভাবের সার্থকতা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সার্থক আবর্তনায়। মানুষের আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, সে এই পরিদৃশ্যমান অতিবাস্তব জড়প্রকৃতির একটা অবস্থান্তর। ...কিন্তু এও বলা চলে : বিষয়ী আছে বলেই বিষয়ের সার্থকতা—গ্রাহক আত্মা-দ্বারা গৃহীত হয়ে গ্রাহ্যবস্তুর যা-কিছু মর্যাদা। কালের পথে অভিযাত্রী

আত্মার ক্ষেত্র নিমিত্ত বা সাধন হল এই গ্রাহ্যবিষয়ের মেলা। অতএব বিষয়ীর আত্মবিসৃষ্টির আধাররূপেই বিষয়ের অভিব্যক্তি। এই পরাক্ বিশ্ব চিৎ-স্বরূপের আত্মসম্ভূতির একটা বহির্ব্যঞ্জনা মাত্র। এ তাঁর লীলায়নের আদিচ্ছন্দ বা আদ্যপীঠ হলেও একেই সত্তার স্বরূপসত্য বলা চলে না। বিষয় আর বিষয়ী ব্যক্তব্রহ্মের অন্যোন্যসাপেক্ষ ও তুল্যমূল্য দুটি বিভাব। বিষয়ের রাজ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রামাণ্য যতখানি, চেতোগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় বিষয়েরও প্রামাণ্য ততখানি—তাকে আগেভাগেই কুহক বা চিত্তবিভ্রম বলে উড়িয়ে দেবার অধিকার কারও নাই।

বস্তুত বিষয় আর বিষয়ী দুটি অনপেক্ষ তত্ত্ব নয়। চিৎশক্তির সহায়ে একই পরমার্থসৎ বিষয়ের দ্রষ্টারূপে যেমন নিজের দিকে তাকিয়ে আছেন, তেমনি বিষয়ীর দৃশ্যরূপে নিজেকে নিজের কাছে উপস্থাপিত করছেন। একদেশিমত অনুসারে, যা শুধু চেতনায় আছে, তার কোনও বাস্তব সত্যতা থাকতে পারে না। আরও নিখুঁত করে বলতে গেলে, শুধু অন্তশ্চেতনা কি অন্তরিন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে যার সত্তা প্রমাণিত হয়, কিন্তু বহিরিন্দ্রিয়ের কাছে যা নিরাধার বা অবাস্তব, তার কোনও বাস্তবতা মানতে আমরা বাধ্য নই। অথচ বহিরিন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য তখনই নির্ভরযোগ্য হয়, যখন বিষয়ের সংবেদনকে চেতনার কাছে তারা ধরলে পরে চেতনা অর্থের বিধান করে তার মধ্যে—ইন্দ্রিয়সংবিতের বাইরের খোলসটাকে অন্তরের বোধির প্রত্যয়ে ভরে তুলে বুদ্ধির যোগাযোগে তাকে সার্থক করে। নইলে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য সবসময় অপূর্ণ। তাকে অতি-নিশ্চিত বলে গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলেও মানা চলে না। কেননা একে তো ইন্দ্রিয় খণ্ডদর্শী, তাছাড়া তার মধ্যে প্রমাদের নিত্য সম্ভাবনা। বস্তুত দৃশ্যজগৎকে জানবার আমাদের কোনও উপায় নাই—চৈতন্যের দৃক্‌শক্তি ছাড়া। বহিরিন্দ্রিয় সেই দৃক্‌শক্তির সাধন মাত্র। দৃক্‌শক্তির শুধু কাছে নয়, দৃক্‌শক্তির মধ্যেই জগতের যে-রূপ ফুটে ওঠে, তাকেই আমরা জানি। মনোময় বা অতীন্দ্রিয় দৃশ্যের সম্পর্কে এই বিশ্বত-শ্চক্ষুর সাক্ষ্যকে যদি অপ্রমাণ বলে উড়িয়ে দিই, তাহলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যের সম্পর্কে তার সাক্ষ্যকেই-বা সপ্রমাণ বলে মানি কোন্ নজিরে? যদি অন্ত-শ্চেতনার অতীন্দ্রিয় দৃশ্য মিথ্যা হয়, তাহলে বহিশ্চেতনার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যই-বা মিথ্যা হবে না কেন? অবশ্য উভয়ক্ষেত্রে প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হবে বোধন বিবেক ও প্রবৃত্তিসামর্থ্যের দ্বারা। কিন্তু তাবলে সত্য যাচাইএর ধরন উভয়ত্র এক হতে পারে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যবস্তুর বেলায় যে প্রমাণপদ্ধতি নিখুঁতভাবে সার্থক, অতীন্দ্রিয় রাজ্যে তা একেবারে অচল। বহিরিন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে আন্তর অনুভবের বিচার চলতে পারে না—কেননা অন্তরের আছে দর্শনের একটা নিজস্ব ধারা, প্রামাণ্যসিদ্ধির একটা অন্তরঙ্গ উপায়। তেমনি

অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকেও জড়াশ্রয়ী বা ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী মনের আদালতে হাজির করা চলে না—যদি না সে জড়ের রাজ্যে স্বেচ্ছায় এসে ধরা দেয়। তখনও তার সম্পর্কে মনের অপটু রায়কে সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করবার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না। জড়াতীত বস্তুর তত্ত্ব নিরূপিত করতে চাই আরেকধরনের ইন্দ্রিয়, চাই তার স্বরূপ ও স্বভাবের অনুকূল বিতর্ক ও বিচারের একটা নতুন ধারা।

তত্ত্বেরও বিভিন্ন ভূমি আছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগৎ তার একটা ভূমি মাত্র। অপরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলে বহিরাবৃত্ত জড়াশ্রয়ী মনের কাছে জড়ের জগৎ সত্য। কিন্তু যা প্রত্যক্-বৃত্ত এবং জড়াতীত, প্রাকৃতমনের তাকে পুরাপুরি জানবার কোনও উপায় নাই। এক্ষেত্রে তার সম্বল শুধু লক্ষণ ও তথ্যের নানান্ টুকিটাকি এবং তাদের ধরে কতগুলি খোঁড়া অনুমান—প্রতি পদে যাদের ভুল হবার আশংকা আছে। কিন্তু বহির্জগতের ঘটনাবলী যেমন সত্য, তেমনি সত্য অন্তরের বৃত্তি ও অনুভবের জগৎ—সেখানেও চলছে চিৎ-শক্তির বিচিত্র ভাবনা। জীবের মন অপরোক্ষ অনুভব দিয়ে আপন অন্তরের কিছু-কিছু খবর যদিও-বা রাখে, তবু অপরের চিত্তে কি ঘটছে তার কিছুই সে জানে না—শুধু নিজের সঙ্গে তুলনা করে কিংবা বাইরে থেকে দেখে-শুনে আভাসে-ইঙ্গিতে খানিকটা তার আঁচ করে মাত্র। অতএব অন্তর্দৃষ্টিতে আমার কাছে আমি সত্য হলেও অপরের জীবন আমার দৃষ্টির অগোচর। আমার ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের 'পরে তার যে-চাপ পড়ে, তা-ই দিয়ে আমি পরোক্ষভাবে তাকে সত্য বলে জানি। জড়াশ্রয়ী মন তার এই সীমার বাঁধনে বন্দী রয়েছে। তাই শুধু জড়কে বিশ্বাস করা তার একটা মজ্জাগত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এইজন্যই মনের সীমিত অনুভব কি বুদ্ধির আমলে যা আসে না, তার অর্জিত সংস্কার বা বিদ্যার মাপকাঠিতে যাকে মাপা যায় না, তার বিরুদ্ধে মনের সংশয় ও তর্কবুদ্ধি সবসময় উদ্যত হয়েই থাকে।

কিছুদিন ধরে অহংকেন্দ্রীণ চেতনার রায়কে প্রামাণ্যের আসন দেওয়া একটা রেওয়াজ হয়েছে। সমস্ত সত্যের যাচাই হওয়া চাই আপামর-সাধারণের ব্যক্তিগত মন-বুদ্ধি ও অনুভবের বিচারে, বারোয়ারি অনুভবের দরবারে পরীক্ষায় পাস না হলে কোনও সত্যই প্রামাণ্যের সনদ পাবে না—পরোক্ষে বা অপরোক্ষে এমন-একটা মতকে স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তত্ত্ব অথবা বিদ্যাকে এমনতর মাপকাঠিতে বিচার করা স্পষ্টতই ভুল। কেননা, এতে আমাদের প্রাকৃতমনের সীমিত অনুভব ও সামর্থ্যকে সর্বেসর্বা করে যা অতীন্দ্রিয় বা প্রাকৃতবুদ্ধির অগোচর তাকে একেবারে আমলেই আনা হয় না। ব্যক্তির চেতনাই সব-কিছুর একমাত্র বিচারক, এ-ধারণার চরমে আছে অহন্তার প্রমাদ বা জড়নিষ্ঠ মনের একটা কুসংস্কার—গণমতের অমার্জিত স্থূল প্রমত্ত বুদ্ধিতে যার পরিচয়। সত্যের এইটুকু বীজ এর মধ্যে আছে যে, চিন্তার

ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের একটা স্বাধীনতা রয়েছে—আপন সামর্থ্য অনুযায়ী জ্ঞান আহরণ করবার অধিকারকে বলতে পারি সর্বজনীন। কিন্তু ব্যক্তির বিচারকে প্রামাণ্যের মর্যাদা তখনই দিতে পারি, যখন জানি, তার শেখবার বা বৃহত্তর জ্ঞানের দিকে নিজেকে উন্মীলিত করবার আগ্রহ বরাবর সজাগ রয়েছে। যুক্তি দেখানো হয় যে, জড়বিজ্ঞানের মাপকাঠি বর্জন করে ব্যক্তিগত বা সর্বজনীন বস্তুনিষ্ঠ প্রামাণ্যবিচারের অপেক্ষা না রেখে আমরা যদি চলি—তাহলে বঞ্চনার ঘোরে পদে-পদে আমাদের বুদ্ধি যেমন আচ্ছন্ন হবে, তেমনি নিষ্প্রমাণ সত্য ও খেয়ালী চিত্তের ছায়াবাহিনী এসে মানুষের বিদ্যার এলাকা ছেয়ে ফেলবে।...কিন্তু বিদ্যার এষণায় প্রমাদ ও বঞ্চনার, ব্যক্তিচিত্তের সংস্কার ও কল্পনার ভেজাল কোথায় নাই? বস্তুনিষ্ঠ জড়বিজ্ঞানের সাধনাতেও কি তাদের ছোঁয়াচ লাগে না? ভুল হতে পারে—এই যুক্তিতে কি সত্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টাকেই আমরা ছেড়ে দেব? অন্তর্জগতের সত্যকে জানতে হলে আমাদের অধ্যাত্মগবেষণার পথ ধরতে হবে—তার অনুকূল ভূয়োদর্শন ও প্রামাণ্যসিদ্ধিকে করতে হবে পথের দোসর। যে-পদ্ধতিতে জড়জগতের জড়পদার্থের বিশ্লেষণ অথবা জড়শক্তির রীতের বিচার চলে, সে-পদ্ধতি এখানে খাটবে না—এখানে চাই নতুন ধরনের সাধনপন্থার উদ্ভাবন ও সমীক্ষা।

ইওরোপে একবার বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার পথকে রুখে দাঁড়িয়েছিল ধর্ম-সংস্কারের তামস মূঢ়তা। সেই মূঢ়তাই আবার পেয়ে বসবে আমাদের, যদি প্রাক্তন কোনও সংস্কারের বশে আগেভাগেই জিজ্ঞাসার কণ্ঠরোধ করে আমরা সত্য আবিষ্কারের সম্ভাবনাকে সঙ্কুচিত করি। মানুষের অন্তর্জগতেও অজানা সত্যের এক বিপুল ভাণ্ডার আছে—তাকে জানবার তপস্যাকেও বলতে পারি তার পরমপুরুষার্থ। স্বয়ম্ভু আত্মার অনুভব, বিশ্বচেতনার অসীম প্রসার, মুক্ত আত্মার অনুত্তরঙ্গ প্রশান্তি, চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সাক্ষাৎ সমাযোগ, অপরোক্ষসন্নিকর্ষ দ্বারা চেতনার সঙ্গে চেতনা বা বিষয়ের সম্প্রয়োগহেতু তাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান—এমনতর কত ঐশ্বর্য অধ্যাত্মসিদ্ধির ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। কিন্তু তাবলে প্রামাণ্য যাচাই করতে কি তাদের প্রাকৃতমনের আদালতে হাজির করা চলে—যে-মন এসব অনুভবের কোনও খোঁজই রাখে না, নিজস্ব বোধের অভাব বা অসামর্থ্যই যে-মনের কাছে তাদের অনস্তিত্ব কি অপ্রামাণ্যের সবচাইতে বড় প্রমাণ? মন শুধু জড়াশ্রিত ভূয়োদর্শনের ভিত্তিতে স্থূল-জগতের কোনও সত্য কোনও সূত্র বা আবিষ্কারকে গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু সেখানেও শিক্ষার বনিয়াদ পাকা না হলে ঠিক-ঠিক বোঝবার কি বিচার করবার অধিকার তার জন্মায় না। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের মত দুরূহ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের নাড়ীবিচার করা কি অশিক্ষিত অগণিতজ্ঞের কর্ম? অবশ্য সমস্ত তত্ত্বানুভবের সত্যতা যাচাই হবে প্রবৃত্তিসামর্থ্যের একই ধরন

দিয়ে। তাই যেমন করে বহির্জগতের তথ্যের প্রামাণ্য সবার কাছে সিদ্ধ হয়, তেমনি করে অন্তর্জগতের সত্যও সপ্রমাণ হবে অনুশীলনলভ্য অপরোক্ষ অনুভবের বিচারে। কিন্তু তারও জন্য শিক্ষা চাই, দেখবার ও বোঝবার সামর্থ্য অর্জন করা চাই—যে-আত্মসাধনায় অনুভব এবং সমর্থপ্রবৃত্তির উদয় সম্ভব, তার অনুশীলন চাই। এই সহজবুদ্ধিগম্য কথাটাও যে এখানে তুলতে হচ্ছে, তার কারণ আর-কিছু নয়। কিছুদিন যাবৎ এই সহজ সত্যের বিপরীত একটা ধারণা মানুষের চিত্তকে বেদখল করে আছে। ধীরে-ধীরে তার জোর কমে এলেও, আজও মানুষের বিজ্ঞানসিদ্ধির অচিন্তনীয় সম্ভাবনাকে এইধরনের অন্ধসংস্কারই পঙ্গু করে রেখেছে। মানুষের মন সংস্কারমুক্ত থাকবে। কেন সে জড়াশ্রয়ী মনের কারাগারে নিজেকে অবরুদ্ধ রাখবে—শুধু বহির্জগতের নিরেট বাস্তবতার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আনাগোনা করবে? কেন সে দুর্দম আগ্রহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে না অন্তরের গহন সমুদ্রে—প্রত্যক্ষ করতে চাইবে না অধিচেতনা ও অতিচেতনার চিন্ময় সত্যকে? এমনি করেই না তার অবিদ্যার পাশ ছিন্ন হবে—তার আচ্ছন্ন চিত্ত মুক্তি পাবে পূর্ণচেতনার উদার ক্ষেত্রে, সত্য ও সম্যক আত্মবিদ্যা ও আত্মোপলব্ধির নীলাকাশে মেলে দেবে অবন্ধন দুটি তার পাখা?

সম্যক্-জ্ঞান হবে সর্বাবগাহী। চেতনা ও অনুভবের সকল রাজ্যে তার গতি অবাধ হবে, তার কাছে সকল রহস্যের আবরণ অনাবৃত হবে। এই বহিশ্চেতনার অন্তরালে অন্তশ্চেতনার এক বিপুল পারাবার প্রসারিত রয়েছে। ডুবতে হবে তারও গভীরে, সেখান থেকে আহৃত অনুভবকেও অখণ্ডতত্ত্বের মধ্যে যথাযোগ্য আসন দিতে হবে। অধ্যাত্ম-অনুভবের দিগন্তপ্রসার মানব-চেতনার একটা প্রকাণ্ড বৈশিষ্ট্য। তার গভীরতম গুহায় অবগাহন করে তার প্রত্যন্ততম সীমায় আপনাকে ব্যাপ্ত করে তবেই-না তার মনুষ্যত্বের সত্যকার সার্থকতা। জড়াতীতের জ্ঞানকে আমরা ভাবকালি ও রহস্যবিদ্যার এলাকায় ঠেলে দিই, রহস্যবিদ্যাকে কুসংস্কার ও আজগুবী কাণ্ড বলে নাক সিঁটকাই। কিন্তু যা রহস্যে আবৃত, সেও তো সত্তারই একটা অংশ। প্রাকৃতবিজ্ঞানের মত রসহ্যবিজ্ঞানও সত্যের সন্ধানী—কিন্তু তার সত্য জড়োত্তীর্ণ। প্রাকৃত-দৃষ্টির আড়ালে সত্তা ও প্রকৃতির যে নিগূঢ় বিধান গোপন রয়েছে, তাকেও সে আবিষ্কার করতে চায়—এই তার এষণার সত্য পরিচয়। মন প্রাণ সূক্ষ্মভূত ও তাদের সূক্ষ্মবীর্যের যে গুহাহিত ধর্মকে প্রকৃতি আজও বহিশ্চেতনায় প্রত্যক্ষগোচর করে তোলেনি, রহস্যবিজ্ঞান বেরিয়েছে তাদের মর্মসত্যের সন্ধানে। শুধু তা-ই নয়, সে চায় বিদ্যার প্রয়োগ। প্রকৃতির নিগূঢ় সত্য ও শক্তির সহায়ে মানুষের চিৎস্বভাবের ঈশনাকে প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের সীমিত প্রবৃত্তির ওপারেও প্রসারিত করা—এই তার আকূতি। চিৎজগৎ বহিশ্চর মনের কাছে একটা রহস্যলোক, কেননা সে-রাজ্যের অনুভব অপ্রাকৃত এবং

অতীন্দ্রিয়। কিন্তু এই রহস্যলোকেই আমরা চিন্ময় আত্মস্বরূপের সন্ধান পাই। শুধু তা-ই নয়, অধ্যাত্মচেতনার যে জ্যোতির্ময় বীর্য আধারে আবিষ্ট হয়ে উত্তারের পথে তাকে প্রচোদিত করে, জ্ঞানে ও কর্মে সঞ্চারিত করে সিদ্ধ-চিত্তের চিন্ময় ভাবনার বৈদ্যুতী, তারও উৎস আমরা খুঁজে পাই এই অলকায়। এখানকার তত্ত্ব জেনে তার সত্য ও শক্তিকে বিশ্বমানবের জীবনে ও কর্মে সংক্রামিত করা, এও তো প্রকৃতিপরিণামের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। বলতে গেলে প্রাকৃতবিজ্ঞানও তো রহস্যবিজ্ঞান। কেননা, সেও প্রকৃতির গোপন সত্যকে আবিষ্কার করে তার দৈনন্দিন ব্যাপারের স্তিমিত আড়ষ্টতার মধ্যে আনে প্রমুক্ত শক্তির স্বাচ্ছন্দ্য—মানুষের হাতে তুলে দেয় প্রকৃতির নিগূঢ় ক্রিয়াশক্তির নিরঙ্কুশ প্রয়োগের অধিকার। বিজ্ঞানের কীর্তিকেও তো বলতে পারি জড়-শক্তির একটা বিরাট ইন্দ্রজাল—কেননা সত্তার নিগূঢ় সত্য ও প্রকৃতির নিগূঢ় শক্তিকে স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করতে পারাই কি ঐন্দ্রজালিকের সত্য নিশানা নয়? ক্রমে এও বুঝি, জড়ের বিজ্ঞানকে পূর্ণ করতেও জড়াতীত বিদ্যার প্রয়োজন হয়, কেননা প্রকৃতির জড়ব্যাপারের অন্তরালে অজড়-শক্তিরই আবেশ প্রচ্ছন্ন আছে। সে-শক্তি প্রাণময় মনোময় কি চিন্ময়—অন্নময় নয়। তাই জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন দিয়ে কোনকালে তার সন্ধান মেলে না।

একমাত্র পরাক্-বৃত্ত তত্ত্বকে সত্য বলে মানব, এই জিদের পিছনে রয়েছে জড়কেই বিশ্বের মূলতত্ত্ব মনে করবার দুরাগ্রহ। কিন্তু জড় যে বিশ্বমূল নয়, সেকথা বৈজ্ঞানিকের কাছে আজ স্পষ্ট। তিনি জানেন, জড় শক্তির পরিণাম মাত্র। এমন-কি জড়শক্তির কীর্তিকলাপের আড়ালে এক অন্তর্গূঢ় মনঃশক্তি বা চিৎশক্তিরই বিভূতিস্পন্দ আছে, নইলে শক্তিরহস্যের কূল মেলে না—এমন-একটা সন্দেহও তাঁর মনে উঁকি দিতে শুরু করেছে। অতএব জড়কে বিশ্বের একমাত্র তত্ত্ব বলা আজকালকার যুগে আর শোভা পায় না। অতীতের জড়বাদ ছিল মানবচিত্তের একটা ঐকান্তিক অভিনিবেশের ফল। তখন বিশ্বের জড়ত্বের দিকটা নিয়েই সে মেতে উঠেছিল। এ-অভিনিবেশের একটা প্রয়োজন ছিল, সুতরাং তাকে আমল দিতে আমাদের আপত্তি নাই। সাম্প্রতিক জড়-বিজ্ঞানের বহু সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী তত্ত্বের আবিষ্কারেও তার সমর্থন রয়েছে। কিন্তু একদেশী একান্তবাদ দিয়ে বিশ্বের সমগ্র রহস্যের মীমাংসা কোনকালেই হবার নয়। তাই শুধু জড়ের তত্ত্ব ও প্রবৃত্তির খবর জানলেই আমাদের চলবে না—সেইসঙ্গে জানতে হবে প্রাণ ও মনের রহস্য, আবিষ্কার করতে হবে জড়ের আস্তরণের অন্তরালে যা-কিছু চেতনা বা চিৎসত্তার বীর্যরূপে গোপন রয়েছে। জ্ঞানের পরিক্রমা এমনি করে পূর্ণ হলে বিশ্ব-রহস্যের সমাধানও সর্বাঙ্গীণ হবে। এইজন্যই যেসব একান্তবাদে মনকে অথবা মন-প্রাণকে বিশ্বের একমাত্র তত্ত্ব বলে ঘোষণা করা হয়েছে, জড়বাদকে

তারা পেরিয়ে গেলেও আমরা তাদের যথেষ্ট উদার বলে ভাবতে পারি না। এমন একান্তবাদীর অভিনিবেশের ফলে প্রাণ-মনের অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের আবিষ্কার সম্ভব হলেও, তাতেই বিশ্বসমস্যার সর্বতোমুখ সমাধান হয় না। এমন-কি অধিচেতনসত্তার প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশের ফলে সাধক যদি বহির্জগৎকে অন্তর্জগতের একান্তসত্যের একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন প্রতীক বলে মনে করে, তাতে হয়তো অধিচেতনার তত্ত্ব ও প্রকৃতি উদ্ভাস্বর হয়ে উঠবে তার চেতনায়, অলৌকিক শক্তির প্লাবন নেমে আসবে তার আধারে। কিন্তু তাতেই অস্তিত্বের সকল রহস্যের সম্যক্‌ সমাধান বা ব্রহ্মের সম্যক্‌-বিজ্ঞান তার করায়ত্ত হবে না। আমরা চিৎকে জানি বিশ্বমূল। কিন্তু তাকেই একমাত্র তত্ত্ব ভেবে তার প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশবশত যদি জড়-প্রাণ-মনের তত্ত্বকে অস্বীকার করি, অথবা তাদের একটা অধ্যারোপ কি অবাস্তব চিৎপ্রতিবিম্ব মাত্র মনে করি, তাহলে তাতে আমাদের অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে স্ব-তন্ত্র ও মর্মাবগাহী অনুধ্যানের পরিচয় থাকবে বটে, কিন্তু তার ফলে জীব ও জগতের অখণ্ড স্বরূপসত্যের কোনও সন্ধান মিলবে না।

পরমার্থসতের প্রত্যেকটি বিভূতির তত্ত্বকে পৃথকভাবে অথচ এক মহাসমষ্টির অঙ্গরূপে জেনে, চিৎস্বরূপের অখণ্ড-সত্যের সঙ্গে সবাইকে সম্পৃক্ত করে জানা—এই হল সম্যক্‌-জ্ঞানের আদর্শ। আমরা এখন অবিদ্যাচ্ছন্ন, অথচ আমাদের জিজ্ঞাসা বহুমুখী। মানুষ সব-কিছুর সত্যকে জানতে চায়। কিন্তু তবু তার বিশেষ ঝোঁক এমন-একটি সর্বাধার প্রথমজ সত্যের প্রতি, যার আলোতে বিশ্বের সকল সত্য ব্যাখ্যাত হবে। এই সার্বভৌম সত্যের স্বরূপ নিয়ে তার কল্পনা-জল্পনার অন্ত নাই। কিন্তু এক সর্বগত অনাদি তত্ত্ববস্তুর আবিস্কারেই তার ঈপ্সিত তত্ত্বের সন্ধান মিলবে। সে-তত্ত্ব এমন হওয়া চাই, 'যস্মিন্‌ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'—যাকে জানলে এখানকার সব-কিছু জানা যায়। এই অনাদি তত্ত্ববস্তু সর্বভূত ও সর্বভাবের আধার এবং স্বরূপ হবে—তার মধ্যে থাকবে ব্যক্তির সত্য, বিশ্বের সত্য এবং বিশ্বোত্তীর্ণেরও সত্য। মানুষের মন ফিরছে এই তত্ত্বের সন্ধানে—জড় হতে শুরু করে একে-একে সবাইকে যাচাই করে চলছে তার জিজ্ঞাসার উত্তরায়ণ। অতএব তার প্রগতির মূলে রয়েছে সত্যোপলব্ধির আকূতি। এ-আকূতি সার্থক হবে, মানুষ যদি কোথাও না থামে—অনুভবের পরমভূমিতে তার জিজ্ঞাসাকে উত্তীর্ণ করে যদি সে চরমসত্যের মুখামুখি হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু অবিদ্যা হতে আমাদের যাত্রা শুরু। অতএব সবার আগে জানতে হবে অবিদ্যার স্বরূপরহস্য এবং তার অধিকারের সীমা। জড়বিশ্বে দেশ ও কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়ে আমরা প্রত্যেকে একটা অন্যোন্যবিবিক্ত জীবন যাপন করছি। সুতরাং অবিদ্যা দিয়েই আমাদের জীবনের অন্ধকার পরিবেশ

রচিত হয়েছে। এই আঁধারের মায়াকে যেদিক দিয়ে বিচার করি না কেন, তার মধ্যে দেখি বহুধাবৃত্ত আত্ম-অবিদ্যার ঘোর ঘনিয়ে উঠেছে। যে-পরব্রহ্মের মধ্যে নিত্যসত্ত্ব ও সম্ভূতিলীলার দুটি দল বিধৃত রয়েছে, আমরা তাঁকে জানি না। নিত্যের একদেশকে এবং সম্ভূতির কালকলনাকেই আমরা মনে করি অস্তিত্বের সমগ্র সত্য। এই হল আমাদের প্রথম বা 'মূলা' অবিদ্যা। পর-মাত্মার দেশ ও কালের অতীত অবিচল অক্ষরস্বরূপকে আমরা চিনি না, মনে করি দেশে ও কালে বিশ্বসম্ভূতির যে-ক্ষরলীলা তা-ই বুঝি সত্তার সমগ্র তত্ত্ব। এই হল আমাদের দ্বিতীয় বা 'বিশ্বগত' অবিদ্যা। আমাদের বিরাট স্বরূপকে আমরা চিনি না—জানি না আমরা বিশ্বরূপ ও বিশ্বচেতন, বিশ্বভাব ও বিশ্ববিভূতির সঙ্গে অন্তহীন সামরস্যে আমরা নিত্যযুক্ত। এই অহঙ্কার-বিমূঢ় দেহ-প্রাণ-মনের সংকীর্ণ পরিসরকেই মনে করি আমাদের আত্মা—তার বাইরে আর-সবাইকে ভাবি অনাত্মা। এই আমাদের তৃতীয় বা 'অহন্তামূঢ়' অবিদ্যা। অনন্তকাল ধরে আমাদের নিত্যসম্ভূতির খবর আমরা জানি না—সংকীর্ণ আয়ুষ্কাল দ্বারা সীমিত, ক্ষুদ্র দেশদ্বারা পরিচ্ছিন্ন এই দুদিনের জীবনকেই মনে করি আমাদের আদি মধ্য এবং অন্ত। এই আমাদের চতুর্থ বা 'কালাবচ্ছিন্ন' অবিদ্যা। আবার এই কালকলিত জীবনেও যে আমরা এক বিপুল চেতনার বিচিত্র-জটিল আবেশে আবিষ্ট রয়েছি, আমাদের এই বহি-শ্চেতনার অগোচরে যে অতিচেতনা অবচেতনা অন্তশ্চেতনা ও পরিচেতনার একটা বিশাল রাজ্য রয়েছে, তাও আমরা জানি না। বহিশ্চেতনার একান্ত-মনোময় বৃত্তির ক্ষুদ্র পুঁজিকেই আমরা মনে করি আমাদের সর্বস্ব। এই আমাদের পঞ্চম বা 'চিত্তগত' অবিদ্যা। আমাদের সম্ভূতির স্বরূপ আমরা জানি না। কখনও দেহকে, কখনও প্রাণকে বা মনকে, কখনও এদের দুটি বা তিনটির সমবায়কেই মনে করি আধারের উপাদান। যে মূল তত্ত্বের 'পরে আধারের নির্ভর, যার নিগূঢ় আবেশে তার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত, যার উন্মেষ ও বশিত্ব আধারের চরম নিয়তি, তার কোনও সন্ধান আমরা রাখি না। এই আমাদের ষষ্ঠ বা 'আধারগত' বা সাংস্থানিক অবিদ্যা। এই ছয়টি অবিদ্যার জালে জড়িয়ে আছি বলে আমরা জীবনের রহস্যকে বুঝি না, তাকে আপন বশে এনে ভোগ করতেও জানি না। আমাদের চিন্তা সঙ্কল্প সংবিত্তি বা কর্ম সমস্তই মোহগ্রস্ত—তাই জগতের অভিঘাতে পদে-পদে শুধু একটা ভুল বা খোঁড়া জবাব দিই। সুখ ও দুঃখ, আয়াস ও ব্যর্থতা, পাপ ও স্খলন, প্রমাদ ও বাসনার গোলকধাঁধায় ঘুরে মরি, কুটিল পথের বাঁকে-বাঁকে অন্ধের মত হাতড়ে বেড়াই শেষ লক্ষ্যের চঞ্চল মায়ার জন্যে। এই আমাদের সপ্তম বা 'ব্যাবহারিক' অবিদ্যা।

আমাদের অবিদ্যার ধারণা দিয়েই বিদ্যার ধারণা নিরূপিত হবে এবং

তাহতে বোঝা যাবে জীবের পুরুষার্থ কি, বিশ্বপ্রবৃত্তিরই-বা কি লক্ষ্য। কেননা, যুগপৎ বিদ্যার নিরসন এবং এষণাই আমাদের জীবনে অবিদ্যার মুখ্য পরিচয়। তখন সম্যক্-জ্ঞানের অর্থ হবে—এই সপ্ত-অবিদ্যার মধ্যে কোথায় ফাঁক বা আঁধার, তা জেনে তাদের পূর্ণ নিরাকৃতি এবং সেইসঙ্গে চেতনায় আত্মজ্যোতির সাতটি কমল ফুটিয়ে তোলা। আমরা তখন জানব : ব্রহ্মই সর্বমূলাধার। আত্মা বা চিন্ময়পুরুষ আছেন শাশ্বত অধিষ্ঠানরূপে—এ-বিশ্ব তাঁর সম্ভূতির লীলা, তাঁর চিদ্‌বিলাস। আত্মার স্বরূপজ্ঞানে বিশ্বের সঙ্গে আমরা একীভূত, অতএব অহংকল্পিত বিবিক্তবোধ একেবারেই মিথ্যা। চৈত্যসত্তাই আমাদের আত্মভাবের সত্য—সে-সত্তা মৃত্যু ও মর্ত্যের অধিকার ছাড়িয়ে শাশ্বত অমৃতস্বরূপে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। চিন্ময় অতিচেতন ও অতিমানস মূর্ধন্যজ্যোতির সঙ্গে এবং হৃৎশয় আত্মপুরুষের সঙ্গে সত্যের যোগে যুক্ত হয়ে আছে আমাদের দেহ প্রাণ এবং মন। অতএব আমাদের জীবনে বৃহৎসামের মূর্ছনা—আমাদের ভাবে সংকল্পে ও কর্মে ঋতময় প্রবৃত্তির উদার ছন্দ। আমাদের সমগ্র প্রকৃতির রূপান্তরে ফুটে উঠেছে পরাবর চিন্ময় দিব্য-পুরুষের অখণ্ড স্বরূপসত্যের জ্যোতির্ময় ব্যঞ্জনা।

কিন্তু এ-জ্ঞান তো বুদ্ধিগম্য নয়, অতএব চেতনার বর্তমান ছাঁচ বজায় রেখে তো একে সর্বতোভাবে আয়ত্ত করা যাবে না। এর জন্য চাই আধার ও চেতনার রূপান্তর, চাই অপরোক্ষ অনুভব হতে সঞ্চারিত দিব্যসম্ভূতির বীর্য। এতেই বুঝি, বিশ্বসম্ভূতির মধ্যে পরিণামের একটা ছন্দঃপরম্পরা আছে—প্রাকৃতমনের অবিদ্যা তার একটা ধাপ মাত্র। অতএব সম্যক্-জ্ঞান আসবে সত্ত্ব ও প্রকৃতির সংকল্পিত পরিণামের ধারা ধরে। তার জন্য অন্যান্য প্রকৃতি-পরিণামের মত চাই কালক্রমের একটা মন্থর লয়।...কিন্তু কালের এই মন্দাক্রান্তা গতির বিরুদ্ধে বলা চলে : প্রকৃতির পরিণাম এবার সচেতন ও সজাগ হয়ে ঘটছে। সুতরাং এখনও-যে সে আগেকার অবচেতন পরিণামের রীতি অনুসরণ করবে, একথা সত্য নয়। যখন চেতনার রূপান্তর হতে সম্যক্-জ্ঞান সিদ্ধ হবে, তখন তার সাধনায় আমাদের সংকল্প ও প্রযত্নেরও একটা স্থান নিশ্চয় থাকবে। অর্থাৎ আপন স্বভাবের অনুকূল সাধনপন্থা আবিষ্কার করে তাকে প্রয়োগ করবার স্বাতন্ত্র্যও তারা পাবে। তখন সচেতন আত্ম-রূপান্তরদ্বারা আমাদের মধ্যে বিকশিত হবে সম্যক-বিজ্ঞানের পূর্ণ শতদল।... এইবার তাহলে দেখতে হবে, প্রকৃতির এই অভিনব পরিণামের স্বরূপ কি এবং তাহতে সম্যক্-জ্ঞানের কোন্-কোন্ ছন্দ উন্মিষিত হবে। অর্থাৎ যে-চেতনা দিব্য-জীবনের আধার হবে, তার স্বরূপ কি হবে—কি করে সে-জীবনকে আমরা ফুটিয়ে তুলব অথবা আপনাহতেই কোন্ আনন্দের স্পন্দবেগে সে ফুটবে? এই মাটির বুকে মূর্তি ধরবে সে কোন্ রূপে?

ষোড়শ অধ্যায়

সম্যক্-জ্ঞান পুরুষার্থ ও দৃষ্টিচতুষ্টয়

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৪।৭

হৃদয়ে তার জড়িয়ে ছিল যেসব বাসনা, তাদের যখন সে ঝেড়ে ফেলে, তখন মর্ত্য হয় অমৃত এবং এইখানেই ব্রহ্মকে করে সম্ভোগ।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪।৪।৭)

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৪।৬

ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্মে সে যায় মিশে।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪।৪।৬)

অথায়মশরীরোঽমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৪।৭

অশরীর ও অমৃত প্রাণ এবং তেজই ব্রহ্ম।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪।৪।৭)

অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো মাং স্পৃষ্টোঽনুবিত্তো ময়ৈব।
তেন ধীরা অপি যন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং লোকমিব ঊর্ধ্বং বিমুক্তাঃ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৬।৪।৮

অণুপ্রমাণ সে পুরাণ পথ রয়েছে বিতত। আমি ছুঁয়েছি তাকে—পেয়েছি তার সন্ধান। সেই পথে ব্রহ্মবিৎ ধীরেরা চলে যান এখান হতে বিমুক্ত হয়ে ঊর্ধ্বতন স্বর্গলোকে।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪।৪।৮)

মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।
নিধিং বিভ্রতী বহুধা গুহা বসু মণিং হিরণ্যং পৃথিবী দদাতু মে।
যে গ্রামা যদরণ্যং যাঃ সভা অধি ভূম্যাম্।
যে সংগ্রামাঃ সমিতয়স্তেষু চারু বদেম তে॥

অথর্ববেদ ১২।১।১২,৪৪,৫৬

ভূমি আমার মাতা—পুত্র আমি পৃথিবীর।...তাঁর বহুবিচিত্র নিধি আর গুহাহিত ধন পৃথিবী দিন আমাকে।...তোমার চারুতার কথা বলতে পারি যেন হে পৃথিবী, বলতে পারি যে-মাধুরী আছে তোমার গ্রামে আর অরণ্যে, আছে তোমার সভায় সংগ্রামে আর সমিতিতে।

—অথর্ববেদ (১২।১।১২,৪৪,৫৬)

সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্নী উরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু।
যার্ণবেঽধি সলিলমগ্র আসীদ যাং মায়াভিরন্বচরন্মনীষিণঃ॥
যস্যা হৃদয়ং পরমে ব্যোমন্ত্ সত্যেনাবৃতমমৃতং পৃথিব্যাঃ।
সা নো ভূমিস্ত্বিষিং বলং রাষ্ট্রে দধাতূত্তমে॥

অথর্ববেদ ১২।১।১,৮

ভূত ও ভব্যের ঈশ্বরী যে-পৃথিবী, বিশাল লোক বিছিয়ে দিন তিনি আমাদের তরে।...যিনি অর্ণবে ছিলেন সলিল হয়ে সবার আগে, বিজ্ঞানের মায়ায় যাঁর পথ অনুসরণ করলেন মনীষীরা, যাঁর হৃদয়টি আছে পরম ব্যোমে সত্যে আবৃত এবং অমৃত হয়ে, সেই ভূমিই আমাদের মধ্যে তেজ ও বল বিধান করুন ওই লোকোত্তর রাষ্ট্রে।

—অথর্ববেদ (১২।১।১,৮)

ত্বং তমগ্নে অমৃতত্ব উত্তমে মর্ত দধাসি শ্রবসে দিবেদিবে।
যস্তাতৃষাণ উভয়ায় জন্মনে ময়ঃ কৃণোষি প্রয় আ চ সূরয়ে॥

ঋগ্বেদ ১।৩১।৭

তুমিই সে-মর্ত্যকে, হে অগ্নি, অনুত্তর অমৃতে কর প্রতিষ্ঠিত—দিব্যশ্রুতির উপচয়ের তরে দিনে-দিনে; যার তৃষ্ণা জেগেছে উভয়-জন্মের তরে, সেই সূরির তরে ফুটিয়ে তোল দেবতার আনন্দ আর মানুষের সুখ।

—ঋগ্বেদ (১।৩১।৭)

নঃ...দেব দিতিং চ রাস্বাদিতিমুরুষ্য।

ঋগ্বেদ ৪।২।১১

হে দেবতা, দিতিকে ঢেলে দাও আমাদের মধ্যে—আগলে রাখ অদিতিকে।

—ঋগ্বেদ ৪।২।১১)

চেতনার ঊর্ধ্বপরিণামের তত্ত্ব এবং ধারা কি, তা আলোচনা করবার আগে আরেকবার দেখা যাক—আমাদের দ্বারা উপস্থাপিত পূর্ণজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরমার্থসৎ ও লোকবিসৃষ্টির মূল তত্ত্বগুলি কি: বিসৃষ্টির অর্থ-ক্রিয়াকারিতা ও স্পন্দবিভূতির কোন্ ব্যঞ্জনাকে বাস্তব বলে স্বীকার করেও তাকে জগৎ- ও জীবন-রহস্যের অকুণ্ঠ সমাধানের নিমিত্ত বলে মানতে পারব না: কারণ, বিজ্ঞানের সত্যই জীবনসত্যের ধারক—সে-ই পুরুষার্থের স্বরূপ নির্দেশ করে। বিশ্বপরিণামের মূল কথা হল, এই পৃথিবীতে পূর্ব্য অচিতির গহনে গুহাহিত স্বরূপসত্যের ক্রমিক উন্মেষ। অচিতির সম্পুটিত কোরক হতে থরে-থরে চেতনা তার সহজপ্রকাশের সেই দল মেলছে। অবশেষে একদিন তারা তার মর্মকোষে ফুটিয়ে তুলবে অখণ্ড বিশ্বতত্ত্ব ও অকুণ্ঠ আত্মজ্ঞানের বিকচ সুষমা। যে-সত্য হতে এই পরিণামের প্রবর্তনা, যাকে রূপ দেওয়া তার লক্ষ্য, তারই স্বরূপপ্রকৃতি বিশ্বপরিণামের ধারাকে নিরূপিত করবে—পর্বে-পর্বে নিয়ন্ত্রিত করবে তার সার্থক পদক্ষেপ।

প্রথমেই বলেছি, ব্রহ্ম সব-কিছুর উৎস আশ্রয় ও অন্তর্গূঢ় তত্ত্বভাব। নির্বিশেষ ব্রহ্ম অনির্দেশ্য অনির্বচনীয়—মনের ভাব কি ভাষা দিয়ে তাঁকে প্রকাশ করা চলে না। সমস্ত পরমতত্ত্বের মত তিনি স্বয়ম্ভূ ও স্বপ্রকাশ। কিন্তু আমাদের মনঃকল্পিত ইতিবাদ কি নেতিবাদের ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি ভাবনা দিয়ে তাঁকে সীমিত বা নিরূপিত করা যায় না। অথচ আমাদের অধ্যাত্মচেতনায় তাদাত্ম্যবোধের এমন-একটা বিজ্ঞানময় বৃত্তি আছে, যা এই ব্রহ্মতত্ত্বের মর্মে অবগাহন করে তার স্বরূপ ও বিভূতি উভয়েরই উদ্দেশ পায়।

এই তাদাত্ম্যবোধের কাছে সব-কিছুই স্বপ্রকাশ। এই বিজ্ঞানদৃষ্টিতে সবার স্বরূপসত্যের পরিচয় মেলে, তাদের গুহাচর রহস্য অনাবৃত হয়—পরমার্থসতের বাস্তব বিভূতিররূপে তারা চেতনায় প্রতিভাত হয়। পরমার্থসতের মৌল-বিভূতি বা নিত্যধর্মরূপে দেখলে ব্যক্তবিশ্বের তত্ত্বও স্বয়ম্ভূ ও স্বপ্রকাশ। কারণ বিশ্বের যা-কিছু মূল তত্ত্ব, তা ব্রহ্মের কোনও শাশ্বত ও নিত্যসমবেত সত্যধর্মের অভিব্যক্তি মাত্র। বিশ্বতত্ত্বে যা-কিছু জন্য বা কালাবচ্ছিন্ন, প্রাতি-ভাসিক হলেও তারা কোনও-একটা তত্ত্বভাবের আশ্রিত এবং তারই বীর্যবিভূতি ও রূপায়ণ। অতএব তত্ত্বভাবের আশ্রিত বলে সেও তত্ত্বরূপ—তারও তাৎপর্যে অন্তর্নিহিত সত্যের অভিব্যঞ্জনা আছে। তাই আমরা তাকে তত্ত্বই বলব—যদৃচ্ছাবশে আবির্ভূত অমূলক বিভ্রম বা তুচ্ছ বিকল্পের মেলা বলে উড়িয়ে দেব না। এমন-কি তত্ত্বকে যা আবৃত ও বিরূপ করে, অচিতির সত্য পরিণাম বলে তারও একটা কালোপহিত তত্ত্বভাব আছে। প্রাকৃত জগতে মিথ্যা সত্যকে, অশিব শিবকে আচ্ছন্ন এবং বিকৃত করে। কিন্তু এসব বিপরীতভাবনা আপন অধিকারে অতিবাস্তব হলেও বিশ্ববিসৃষ্টির তারা গৌণ সাধন শুধু, স্বরূপ-সত্য নয়। বিশ্বের শাশ্বত স্পন্দে তারা কালকৃত রূপ কি বীর্যের একটা আনুষঙ্গিক প্রকাশ মাত্র। অতএব ব্রহ্মের অধিষ্ঠানবশত এই বিশ্ব তাঁর আত্মবিসৃষ্টিরূপে সত্য। আর বিশ্ব সত্য বলে যা-কিছু তার মধ্যে আছে, তাও সত্য—কেননা তারাও বিরাটেরই ব্যাকৃতি মাত্র।

ব্রহ্মের দুটি বিভাব, একটি তাঁর স্বয়ম্ভূরূপ, আরেকটি তাঁর সম্ভূতিরূপ। স্বয়ম্ভাব তাঁর প্রথমজ তত্ত্ব। সম্ভূতি তাঁর অর্থক্রিয়াকারী পরিণামী তত্ত্ব। সম্ভূতি স্বয়ম্ভূতত্ত্বের স্পন্দবীর্য ও পরিণাম, তার ক্রতু ও ব্যাকৃতি—অরূপ অক্ষর স্বরূপসত্তার ক্ষরধর্মী নিত্যপরিণামী বিচিত্র রূপায়ণ। অথচ প্রবাহ-রূপে সেও শাশ্বত। অতএব যেসব সিদ্ধান্তে সম্ভূতিকে অনন্যাশ্রয়রূপে কল্পনা করা হয়, তারা অর্ধসত্য মাত্র। সত্যের একটি বিভাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তারা ঐকান্তিক অভিনিবেশদ্বারা বিসৃষ্টির খানিকটা তত্ত্ব আহরণ করে—এইমাত্র তাদের সার্থকতা। কিন্তু এও সম্ভব হয়, সম্ভূতির মূলে স্বয়ম্ভাব অবিনাভূত হয়ে রয়েছে বলে। স্বয়ম্ভূই সম্ভূতির স্বরূপধাতু—তার 'অণোরণীয়ান্' অবয়বে, তার 'মহতো মহীয়ান্' বিস্তারে আছে তার নিত্য সমাবেশ। সম্ভূতির স্বরূপজ্ঞান পূর্ণ হয়, যখন নিজেকে সে স্বয়ম্ভূ-রূপে জানে। সম্ভূতিবাহিত জীবাত্মা যখন পরব্রহ্মকে জেনে তাঁর শাশ্বত অনন্তস্বরূপে সমাহিত হয়, তখনই আত্মজ্ঞানের পরিপূর্ণতায় সে অমৃতত্বের অধিকার পায়। এই অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আমাদের পরমপুরুষার্থ। কেননা, শাশ্বত অমৃতত্ব যদি আমাদের স্বরূপের সত্য হয়, তাহলে তার আকূতি হবে আমাদের রূপায়ণেরও ঋতম্ভরা প্রেতি ও তার ধ্রুব নিয়তি। এই স্বরূপ-

সত্য আমাদের আত্মায় সিসৃক্ষার অনিবার্য প্রবেগরূপে ফোটে। আবার সেই সত্যই জড়ের অন্তর্নিহিত শক্তি, প্রাণের প্রেতি প্রবৃত্তি বাসনা ও এষণা, মনের সংকল্পে আকূতি প্রয়াস ও অভিপ্রায়। প্রথম হতে যা তার গর্ভাশয়ে অন্তগূঢ় হয়ে আছে, তাকে তিলে-তিলে স্ফুরিত করাই তো প্রকৃতিপরিণামের মর্মনিহিত নিগূঢ় প্রবর্তনা।

অতএব যেসব দর্শন বিশ্বোত্তীর্ণ তত্ত্বকে একমাত্র সত্য বলে মানে, তাদের সঙ্গেও আমাদের কোনও বিরোধ নাই। এমন-কি মায়াবাদকেও আমরা সপ্রয়োজন বলে স্বীকার করি, যদিও তার চরম সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমাদের মিল নাই। সম্ভূতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনোময় পুরুষ স্বয়ম্ভূ সত্যের গহনে যখন ঝাঁপ দিতে চায়, তখন অধ্যাত্মসিদ্ধির প্রয়োজনে বিশ্বকে তার দেখতে হয় যেন কুয়াসায় ছাওয়া। এই ঐকান্তিক অন্তরাবৃত্তির অন্যতম সাধন হল মায়াবাদ। কিন্তু সম্ভূতিও যখন সত্য, শাশ্বত অনন্তস্বরূপের আত্মশক্তিতে যখন তার অনতিবর্তনীয় স্ফুরত্তা নিহিত রয়েছে, তখন সম্ভূতিকে মায়া বলে উড়িয়ে দিলে তো জীবনদর্শন পূর্ণ হয় না। সম্ভূতির মধ্যে থেকেও জীবাত্মা আপনাকে স্বয়ম্ভূস্বভাব জেনে সম্ভূতির ভর্তা হতে পারে, আপন অনন্ত-স্বরূপে অচলপ্রতিষ্ঠ থেকেও সান্ত আত্মভাবের অন্তহীন রূপায়ণে আপনাকে লীলায়িত করতে পারে, কালাতীত শাশ্বত সদ্‌ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের সত্ত্ব ও ক্রিয়াকে অনুভব করতে পারে, শাশ্বত মহাকালের স্বরূপস্থিতি ও সম্ভূতিস্পন্দের যুগলবিলাসরূপে। সম্ভূতি যে স্বয়ম্ভূর দিব্যক্রতু—এই উপলব্ধিই সম্ভূতিবিজ্ঞানের চরম সত্য। স্বয়ম্ভূর অন্তগূঢ় স্ফুরত্তার তত্ত্বভাব রূপ ধরেছে সম্ভূতিতে এবং তাতেই তার নিটোল পূর্ণতা। অতএব সম্ভূতি-বিজ্ঞানকেও অখণ্ড সত্যদর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মানতে হবে, কেননা সম্ভূতির তত্ত্বেই আমরা বিশ্বের চিন্ময় তাৎপর্য ও জীবের আত্মবিভাবনার পূর্ণায়ত একটি রূপ খুঁজে পাই। যে-তত্ত্বব্যাখ্যায় বিশ্ব ও জীব উভয়েই নিরর্থক বলে সাব্যস্ত হয়, তাকে একদেশী ব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই বলতে পারি না—তার সমাধানকে অস্তিত্বরহস্যের সত্য সমাধান বলেও মানতে পারি না।

তাছাড়া আমরা এও বলেছি : ব্রহ্মের নিরূঢ় তত্ত্বভাব আমাদের অধ্যাত্ম অনুভবে ফোটে অখণ্ড সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের অবিকল্পিত প্রত্যয়ে। এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যেমন বিশ্বোত্তীর্ণ স্বয়ম্ভূ তত্ত্ব, তেমনি আবার অখিল বিশ্বভাবনার অন্তগূঢ় মর্মসত্যও বটে—কেননা যা স্বয়ম্ভাবের তত্ত্ব, তা-ই হবে সম্ভূতিরও তত্ত্ব। বিশ্বের যা-কিছু, সমস্তই তৎস্বরূপের বিসৃষ্টি। এমন-কি যা-কিছু আপাতদৃষ্টিতে তাঁর বিরোধী বলে প্রতীয়মান, তারও মধ্যে তিনি আবিষ্ট হয়ে আছেন এবং তাঁর নিগূঢ় প্রবর্তনায় তাঁকেই সে অনতি-বর্তনীয় পরিণামের ছন্দে ফুটিয়ে তুলছে। এমনি করে অচিতির হৃদয়ে থেকে

তার মধ্যে তিনি অন্তর্গূঢ় চেতনার উন্মেষের আকূতি জাগিয়ে তুলছেন, আপাত-অসতের অব্যক্তকে রোমাঞ্চিত করছেন নিগূঢ় চিৎসত্তার বিদ্যুন্ময় শিহরনে, অসাড় জড়ত্বের মূর্ছাভঙ্গে তাকে চকিত করে তুলছেন গুহাহিত আনন্দের বিচিত্র আন্দোলনে—অবরচেতনার দুঃখ-সুখের দ্বন্দ্ববিধুরতা হতে নির্মুক্ত করে চিন্ময় আত্মভাবের সুনিবিড় রসচেতনায় তাকে উল্লসিত করছেন।

স্বয়ম্ভূ-সৎ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। কিন্তু তাঁর একত্বও আনন্ত্যে উচ্ছলিত, কেননা তার মধ্যে আছে আত্মভাবনার অন্তহীন বৈচিত্র্য। যিনি এক, তিনিই সর্ব—যিনি স্বরূপসত্তা, তিনিই আবার সর্বসৎ। অন্তহীন বহুত্বে একের আত্মরূপায়ণ, আর শাশ্বত একত্বে বহুর সংহতি—দুটি একই তত্ত্বের যুগল বিভাব এবং এরই 'পরে বিসৃষ্টির প্রতিষ্ঠা। বিসৃষ্টির এই প্রথমজ ঋতের প্রবর্তনাতে স্বয়ম্ভূসৎ আমাদের কাছে বিশ্বচেতনার তিনটি ভূমিকায় আবির্ভূত হন—তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ সন্মাত্র, তিনি বিশ্বাত্মা, আবার বহুত্বের লীলায়নে তিনি জীবাত্মা। কিন্তু তাঁর বহুত্বের বিলাসে চেতনার প্রাতিভাসিক খণ্ডতা দেখা দেয়—অর্থক্রিয়াকারী অবিদ্যার আকারে। ওই অবিদ্যার বশে বহু বা জীব তার শাশ্বত স্বয়ম্ভূ একত্বের সংবিৎ হারিয়ে ফেলে, বিশ্বাত্মার সঙ্গে তার তাদাত্ম্যের নিবিড় প্রত্যয় ভুলে যায়। অথচ এই তাদাত্ম্যবোধ তাদের সত্তার স্বরূপ, জীবলীলার আশ্রয় ও ব্যবহারের বনিয়াদ। কিন্তু অন্তর্গূঢ় অদ্বৈত-চেতনার সংবেগ তাকে ভুলে থাকতে দেয় না, আত্মস্বরূপের অলক্ষ্য প্রভাব এবং প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামের দুর্নিরীক্ষ্য প্রবর্তনা সম্ভূতিবাহিত জীবকে অবি-দ্যার তমোজাল বিকীর্ণ করে আবার দিব্য-পুরুষের পরমসাম্যের জ্যোতির্ময় সংবিতে ফিরে যেতে প্রচোদিত করে—যাতে বিশ্বময় ঘটে-ঘটে চিন্ময় তাদাত্ম্য-ভাবনার হারানো সুরটি আবার সে ফিরে পায়। নিজেকে শুধু বিশ্বের অন্ত-র্ভুক্ত জেনে তার তৃপ্তি নাই। আত্মবিস্ফারণের দ্বারা বিশ্বকেও যে তার নিজের মধ্যে অনুভব করতে হবে—বিশ্বম্ভর পুরুষকে জানতে হবে নিজেরই পরতর আত্মা বলে। এমনি করে নর-কে বৈশ্বানর হতে হবে এবং সেই চিন্ময় সংবেগের প্রবর্তনায় নিজের বিশ্বোত্তীর্ণ তুর্যাতীত স্বরূপটি চিনতে হবে। তাই জীব বিশ্ব ও বিশ্বোত্তীর্ণ—তত্ত্বভাবের এই ত্রিপুটীকে আত্মতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্বের অখণ্ড বিবৃতির অঙ্গীভূত করে প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামের চরম তাৎপর্য নিরূপণ করতে হবে।

যেসব দৃষ্টিতে বিশ্বোত্তীর্ণের কোনও খবর নাই, তাদের অখণ্ড সত্যদৃষ্টি বলতে পারি না। সর্বব্রহ্মবাদে ব্রহ্ম আর বিশ্ব একাত্মক। এও সত্যদৃষ্টি—কেননা ব্রহ্মই এই যা-কিছু সব হয়েছেন। কিন্তু ব্রহ্মের বিশ্বোত্তীর্ণ ভাবকে ভুলে বিশ্বের সঙ্গে ব্রহ্মের সে সমীকরণ করে যখন, তখন আর সর্বব্রহ্মবাদকে

পূর্ণ সত্য বলতে পারি না।...আবার যেসব দৃষ্টি বিশ্বকেই শুধু মানে এবং জীবকে বিশ্বশক্তির একটা অবান্তর সৃষ্টি বলে হিসাব থেকে বাদ দেয়, তারাও পূর্ণসত্যকে দেখে না। বিশ্বপ্রবৃত্তির কেবল তথ্যের দিকটাকে তারা বড় করে তোলে—এই তাদের ভুল। প্রাকৃত জীবলীলাকে বিশ্বশক্তির উচ্ছিষ্ট বলতেও পারি, কিন্তু তাতে তার সম্পূর্ণ সত্যরূপটি উদ্ঘাটিত হয় না। কারণ প্রাকৃতজীব বা প্রকৃতি-স্থ পুরুষ বিশ্বশক্তির পরিণাম হলেও জীবাত্মারই সে প্রাকৃত বিগ্রহ, অন্তরাত্মা বা অন্তরপুরুষেরই প্রকট বিভূতি। জীবাত্মা তো জীবকোষের মত নশ্বব পদার্থ নয়, অথবা বিশ্বাত্মার একটা প্রলয়ধর্মী অংশ-মাত্রও নয়—কেননা তার অনাদি অমৃতভাবের তত্ত্ব বিশ্বোত্তীর্ণের মর্মকোষে প্রতিষ্ঠিত। সত্য বটে, বিশ্বাত্মা নিজেকে জীবাত্মার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেন। কিন্তু এও সত্য যে. জীব ও বিশ্ব দুয়ের আশ্রয়ে বিশ্বোত্তীর্ণ তত্ত্ব-ভাবের বিসৃষ্টি ঘটছে। তাই জীব পরমপুরুষেরই সনাতন অংশ—প্রকৃতির একটা খন্ডভাব মাত্র নয়।...আবার যে-দৃষ্টি বলে, কেবল জীবের চেতনাতেই বিশ্বের সত্তা রয়েছে, সেও একাঙ্গী দর্শন মাত্র। অধ্যাত্মচেতনার যে-ব্যাপ্তিবোধ সমগ্র বিশ্বকে আপন চেতনার কুক্ষিগত দেখে, শুধু সেই পরিব্যাপ্ত অনুভবে এ-দৃষ্টির প্রামাণ্য। কিন্তু বিশ্ব বা ব্যক্তিচেতনা কাউকেই তো একমাত্র পরমার্থসত্য বলতে পারি না—কেননা তাদের উভয়ের নির্ভর যে রয়েছে বিশ্বোত্তীর্ণ দিব্য-পুরুষের 'পরে।

এই দিব্য-পুরুষ বা সচ্চিদানন্দ যুগপৎ পুরুষবিধ এবং অমানব। একদিকে তিনি শুদ্ধসন্মাত্র—নিখিল সত্য শক্তি বীর্য ও ভাববস্তুর উৎস এবং প্রতিষ্ঠা। আবার আরেক দিকে তিনিই তুর্যাতীত চিন্ময়পুরুষ—পুরুষোত্তমরূপে নিখিল চেতনপুরুষের তিনি 'বন্ধুরাত্মা', সর্বভূত তাঁর পৌরুষেয়বিভূতির উল্লাস। কারণ, তিনিই সর্বভূতের পরমাত্মা, সর্বগত অন্তর্যামী অধিষ্ঠান-তত্ত্ব। এই গুহাশয় পুরুষকে জানাই জীবের নিয়তি। তাই বিশ্বশক্তির নিগূঢ় আকূতি চিন্ময়পরিণামের ধারা বেয়ে ওই লোকোত্তর মহাসঙ্গমতীর্থের অভিমুখে ধাবিত হয়েছে। আত্মস্বরূপের এই বিপুল সত্যকে জীবের জানতে হবে এবং সেই বিজ্ঞানে আপ্যায়িত করতে হবে তার সমগ্র সত্তা। তার অপরা প্রকৃতিকে উত্তীর্ণ করতে হবে দিব্যপ্রকৃতির পরম ধামে. সত্তাকে রূপান্তরিত করতে হবে দিব্য-পুরুষের চিন্ময় সত্তায়। তার এই চেতনাই হবে পরম-পুরুষের দিব্যচেতনা, এই আনন্দই উছলে উঠবে তাঁর অন্তহীন আত্মরতির রসোল্লাসে। শুধু তা-ই নয়, দ্যুলোকের ওই মুক্তধারা তার ভূলোকের সম্ভূতিতে নেমে আসবে—তার সমস্ত সাধনা হবে ওই পরমসত্যের লীলাবিভূতি। চিন্ময় আত্মস্বরূপজ্ঞানে জীবনদেবতাকে হৃদয়ে জড়িয়ে তাঁর আলিঙ্গনে সে আত্মহারা হয়ে বাঁধা পড়বে—প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করবে তাঁর চিন্ময় বীর্যের অমোঘ

প্রশাসন, তার সমস্ত জীবন ও কর্ম হবে অনিঃশেষ আত্মনিবেদনের ডালি।... এইদিক দিয়ে ঈশ্বরবাদী ও দ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতেও অখণ্ডসত্তার একটা সত্য মহিমা ফোটে। ঈশ্বর যেমন শাশ্বত তত্ত্ব, জীবও তাই; তেমনি তাঁর শক্তিরও শাশ্বত সদ্‌ভাব ও বিশ্বপ্রবৃত্তি দুইই সত্য। কিন্তু জীব ও শিবের পারমার্থিক তাদাত্ম্যকে দ্বৈতবাদী যদি অস্বীকার করেন, তবে তাঁর দৃষ্টি হয় একদেশী। জীব ও শিবে পরমসামরস্যও সম্ভব। প্রেমেরও চরম কোটিতে অখণ্ডচিন্ময় রসে বিগলিত আত্মার পরমসাম্যের অনুভব আছে—আছে চেতনার সঙ্গে চেতনার, সত্তার সঙ্গে সত্তার আত্মহারা সম্মেলনের রসোদ্‌গার। এই অন্বয়ানুভূতির নিবিড় মাধুর্যকে দ্বৈতবাদী যদি উপেক্ষা করেন, তবে তাঁর দর্শনকে কি সম্যক্‌-দর্শন বলতে পারব?

স্বয়ম্ভূসতের লীলাবিভূতি এ-জগতে সংবৃত্তির রূপ ধরেছে। আবার এই সংবৃত্তি হতেই দেখা দিল বিবৃত্তির সূচনা—তাই অস্তিত্বের কুমেরুতে দেখছি জড়, সুমেরুতে দেখছি চিৎসত্তা। আত্মসংবৃত্তির অবসর্পিণী ধারায় রয়েছে বিসৃষ্টির সাতটি স্তর—চিৎপরিণামের সাতটি পর্ব। বিম্বরূপে হ'ক আর প্রতিবিম্বরূপেই হ'ক তারা আমাদের অনুভবগম্য—এমন-কি আধারে তাদের সদ্‌ভাব ও জারণাকে আমরা করামলকবৎ প্রত্যক্ষও করতে পারি। সাতটি পর্বের প্রথম তিনটি হল প্রথমজ অনাদিতত্ত্ব। তারা বিশ্বচেতনার ত্রিপুটী—তারা আমাদের পরমপুরুষার্থ। তাদের পরমধামে আরূঢ় হলে অনুভব করি চিন্ময় তত্ত্বভাবের পরম ও চরম আত্মবিভাবনা, অথবা পূর্ব্য আত্মবিসৃষ্টির এক লোকোত্তর চমৎকার। তার পুরোধারূপে রয়েছে ব্রহ্মসদ্‌ভাবের পরম একত্ব, ব্রহ্মচৈতন্যের অমোঘ বীর্য এবং ব্রহ্মানন্দের নিরঙ্কুশ উল্লাস। এখানকার মত তারা সেখানে আচ্ছন্ন কি বিরূপ নয়, কেননা চেতনার পরমব্যোমে এই মহাত্রিপুটীর ভাস্বর অনুভব অনাবৃত স্বরূপমহিমাতে জ্বলে ওঠে। তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অতিমানস ঋতচিতের তুরীয় তত্ত্ব। অন্তহীন বহুভাবনার একত্বকে রূপায়িত ক'রে আনন্ত্যের আত্মবিভাবনাকে সে স্ফুরিত করে—এই তার বীর্য। সচ্চিদানন্দ আর অতিমানস—এই দিব্যচতুষ্টয়ীতে প্রকট হয়েছে ব্রহ্মের শাশ্বত আত্মসংবিতে প্রতিষ্ঠিত আত্মবিসৃষ্টির পরম পরার্ধ। এইসব পরমতত্ত্বের স্বধামে অথবা বিশুদ্ধ তত্ত্বভাবের অপরোক্ষ অনুভবের কোনও রাজ্যে উত্তীর্ণ হলে, আমাদের চেতনায় স্বাতন্ত্র্য ও জ্ঞানের চরম চরিতার্থতা ঘটে।...মন প্রাণ ও জড় নিয়ে তাঁর আত্মবিসৃষ্টির অপরার্ধ। এরা আমাদের নিত্যপরিচিত প্রাকৃতভূমি। স্বরূপত এরা ঊর্ধ্বতত্ত্বের বিভূতি। কিন্তু আপন চিন্ময় উৎস হতে বিবিক্ত হয়ে প্রকাশ পেলেই এদের মধ্যে দেখা দেয় অখণ্ড আত্মভাব হতে খণ্ডিত ভাবনায় একটা আপাতিক অবস্খলন। এই বিবিক্তভাব ও অবস্খলন হতে সৃষ্ট হয় বিদ্যার কঞ্চুক—যা বিশ্বের যে-কোনও

সীমিত বিভাবের প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশবশত তার অখণ্ড অধিষ্ঠান-তত্ত্বকে ভুলে যায়। এই হল বিশ্বগত ও জীবগত অবিদ্যার তত্ত্ব।

আমাদের প্রাকৃত জীবন জড়ভূমির অন্তর্গত। এই জড়ভূমিতে চিৎশক্তির অবসর্পিণী ধারা সবার শেষে অচিতিতে পর্যবসিত হয়েছে। অচিতির কবল হতে সত্তা ও চিতিশক্তির ক্রমিক উন্মেষ হল প্রকৃতিপরিণামের তত্ত্ব। এই অপরিহার্য পরিণামের আদিপর্বে ঘটে জড় ও জড়বিশ্বের একান্তপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। তারপর জড়ের মধ্যে দেখা দেয় প্রাণ ও জড়বিগ্রহ প্রাণী। তারও পরে প্রাণের মধ্যে ফোটে মন, দেখা দেয় জড়বিগ্রহ প্রাণনধর্মী মননশীল জীব। জড়ের বিগ্রহে মনের বীর্য এবং সংবেগ যত উপচে উঠবে, ততই তার মধ্যে অপরিহার্য হয়ে দেখা দেবে অতিমানস বা ঋত-চিতের সম্ভাবনা। অচিতির অন্তর্গূঢ় বীজসত্তার অবন্ধ্য প্রেতি এবং সেই সত্তাকে প্রকট করবার স্বাভাবিক নিয়তি সে-আবির্ভাবের প্রেরণা জোগাবে। অতিমানসের আবির্ভাবে অতি-মানস জীবদেহেই চিৎসত্তার আত্মবিদ্যা ও সর্ববিদ্যার ভাস্বর মহিমা আবির্ভূত হবে। একই নিয়মে পরা প্রকৃতির অনুত্তরণীয় নিয়তির বশে এই জগতে দেখা দেবে অখণ্ড-সচ্চিদানন্দের লীলাঘন বিগ্রহ। পার্থিবপরিণামের আজ যে-ছক দেখছি—এ-ই তার তাৎপর্য, এই নিয়তির অনুশাসনে বিধৃত তার তত্ত্ব, তার ক্রিয়া এবং পর্বায়ণ। দীর্ঘযুগের পরিণামের ফলে মন প্রাণ ও জড় প্রকৃতির এই তিনটি বিভূতি আজ সিদ্ধ হয়েছে। আমরা তাদের ভাল করেই চিনি। কিন্তু অতিমানস আর সৎ-চিৎ-আনন্দের মহাত্রিপুটী এখনও নিগূঢ় হয়ে আছে যবনিকার অন্তরালে, এখনও তারা সিদ্ধরূপে আধারে প্রকট হতে বাকী। আমরা শুধু আভাসে-ইঙ্গিতে তাদের পরিচয় পাই। কেননা প্রকৃতির অবরস্পন্দের ছোঁয়াচ লেগে এখনও তাদের ক্রিয়া আধারে খণ্ডিত এবং মন্থর—তাই তাদের চিনতে পারা খুব সহজ নয়। কিন্তু তাদেরও উন্মেষ সম্ভূতিবাহিত জীবচেতনার দিব্যনিয়তির অঙ্গীভূত। অতএব এই পার্থিব প্রাণলীলায়, এই জড়ের বুকে সিদ্ধবীর্য নিয়ে স্ফুরিত হবে শুধু মনই নয়—ফুটবে মনেরও ওপারে যা-কিছু আছে, মাটির কোলে নেমে এসেও আজও যারা ঢাকা আছে তার আঁচলের আড়ালে।

আমাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে, সম্যক্-জ্ঞানের ছকে মনকে আমরা পরমার্থ-সতের বিভূতি বলে জেনেছি এবং তার সৃষ্টিসামর্থ্যকে স্বীকার করে বিসৃষ্টির লীলায় তার একটা স্থানও করে দিয়েছি। আবার এও বলেছি, প্রাণ এবং জড়ও চিৎস্বরূপের বিভূতি—সুতরাং তাদের মধ্যেও সৃষ্টির তপস্যা স্ফুরিত হচ্ছে। কিন্তু যে-দৃষ্টিতে কেবল মনেরই সৃষ্টির সামর্থ্য আছে, অথবা প্রাণ কি জড়ই বিশ্বের একমাত্র বা প্রধান তত্ত্ব, তাকে সম্যক্-জ্ঞান না বলে বলতে পারি অর্ধসত্য। মানি, জড়ের প্রথম উন্মেষে জড়ই বিশ্বব্যাপারের মুখ্য

আশ্রয় হবে। জড়ের রাজ্যে জড় সর্বেসর্বা, সে-ই সবার আদি উপাদান ও অন্ত—একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু গবেষণার ফলে এও জানি, জড় আসলে অজড় শক্তির পরিণাম। আবার শক্তিও শূন্যসঞ্চারী স্বয়ম্ভূ কোনও তত্ত্ব নয়—বরং গভীর সমীক্ষার শেষে দেখি, সে যেন নিগূঢ় চিৎসত্তার স্পন্দমাত্র। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানীর অপরোক্ষ অনুভবে এ-প্রতীতি একটা সুনিশ্চিত সত্য, অনুমান মাত্র নয়। জড়ের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির যে-সংবেগ, যোগীর তত্ত্বদৃষ্টিতে তা চিদ্‌বীর্যের স্পন্দন। অতএব জড়কে কখনও বিশ্বের প্রথমজ পরমতত্ত্ব বলতে পারি না। আবার যে-দৃষ্টিতে চিৎ আর জড় সত্তার অন্যোন্যাবিবিক্ত দুটি মেরুমাত্র, তাকেও সত্য বলে মানতে পারি না। আমরা বলি : জড় চিদাধার এবং চিতেরই আ-কৃতি, অতএব জড়ের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠা চিৎসত্তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

আবার এও সত্য, প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উন্মেষে প্রাণ যেন হয় বিশ্বজিৎ। জড়কে যখন সে কবলিত ক'রে আপন বিসৃষ্টির সাধন করে, তখন মনে হয় সে-ই যেন সৃষ্টির আদিরহস্য—বিশ্বজুড়ে দিকে-দিকে তারই বিচ্ছুরণ, ঘটে-ঘটে জড়ত্বের আড়ালে সে-ই যেন আপনাকে আবৃত করে রেখেছে। এই প্রতীতিও সত্য, অতএব একেও সম্যক্-জ্ঞানের অঙ্গীভূত বলতে আমাদের দ্বিধা নাই। প্রাণ পরমার্থতত্ত্ব না হলেও সে তার একটা রূপায়ণ ও সিদ্ধবীর্য—জড়ের বুকে সৃষ্টির প্রেতি জাগিয়ে তোলা তার কাজ। প্রাণ তাই আমাদের কর্মস্ফূর্তির নিমিত্ত—এই পৃথিবীতে তার স্ফুরন্ত নাড়ীতে আমাদের ঢালতে হবে ব্রহ্মসদ্‌ভাবের বিদ্যুদ্‌বাহিনী ধারা। প্রাণ দেবাত্মশক্তির একটা বিভূতি এবং সে-শক্তি প্রাণনশক্তির চাইতে বড়। তাই প্রাণকে ব্রহ্মবীর্যের স্রোতোবহ মানতে কোনও বাধা নাই। কিন্তু তাবলে প্রাণতত্ত্বকেই সর্বভূতের উৎস এবং মূলাধার বলতে পারি না। প্রাণের সৃষ্টির তপস্যা অপূর্ণ অনীশ্বর ও অসার্থক থেকে যায়, এমন-কি নিজের সত্য রূপটিও সে চিনতে পারে না—যতক্ষণ নিজেকে সে দিব্যপুরুষের স্বরূপশক্তি বলে না জানে, যতক্ষণ নিজের প্রবৃত্তিকে সূক্ষ্ম এবং ঊর্ধ্বস্রোতা করে নাড়ীতে-নাড়ীতে সে পরা-প্রকৃতির চিন্ময় সংবেগ সঞ্চারিত করতে না পারে।

এমনি করে মনের উন্মেষে প্রকৃতির মধ্যে মনেরই আধিপত্য দেখা দেয়। মন তখন প্রাণ ও জড়কে তার আত্মপ্রকাশের সাধন এবং আত্মপুষ্টি ও ঐশ্বর্যের নিমিত্ত করে। ধরন দেখে তখন মনে হয়, মনই যেন একমাত্র পরমার্থতত্ত্ব। বিশ্বের শুধু সাক্ষীই নয়—সে তার স্রষ্টাও যেন। কিন্তু এও জানি, মন পরতন্ত্র এবং তার সামর্থ্য সীমিত। বস্তুত মন অতিমানসেরই পরিণাম, অথবা পৃথিবীর বুকে চিন্ময় অতিমানসের জ্যোতির্ময়ী ছায়া মাত্র। মহত্তর বিজ্ঞানের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েই তার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য সে খুঁজে

পায়। অবিদ্যাচ্ছন্ন, অপূর্ণ, দ্বন্দ্ববিধুর বৃত্তি ও শক্তিকে দেবশক্তির সিদ্ধ-বীর্যে এবং ঋতচিন্ময় বৃত্তির সৌষম্যে রূপান্তরিত করতে পারলেই মন সার্থক হয়।...এমনি করে অপরার্ধের সমস্ত শক্তি অবিদ্যার জালে জড়িয়ে আছে। শাশ্বত আত্মসংবিতের পরার্ধভূমি হতে জ্যোতির্ময় শক্তির প্লাবনে তাদের দিব্য রূপায়ণ ঘটলেই তারা আত্মস্বরূপের সন্ধান পেতে পারে।

অচিতি হল পরমার্থসতের এই তিনটি অবরশক্তির ভিত্তি। মনে হয়, অচিতিই যেন তাদের উৎস এবং আয়তন। অঙ্গারপর্ণী অচিতির বিপুল প্রসারিত বক্ষের 'পরে রয়েছে সমগ্র জড়বিশ্বের ভার : তার অন্ধশক্তির বিধূননে আবর্তিত হয়ে চলে বস্তুপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গ—তার স্তিমিত স্ফুরণ যেন চেতনার আদিবিন্দু, বিশ্বব্যাপী প্রাণসংবেগের উৎসমুখ। অচিতির মধ্যে এই ঈশনা ও প্রবর্তনা দেখতে পান বলে আধুনিক যুগের কোনও-কোনও দার্শনিক তাকেই বিশ্বের আদ্যা শক্তি ও বিধাত্রী মনে করেন। অবশ্য একথা সত্য, চেতনাহীন জড়ের উপাদানে অচিৎশক্তির আলোড়ন হতে বিশ্ব-পরিণামের শুরু। অথচ তার ফলে কিন্তু চেতন আত্মাই স্ফুরিত হচ্ছে—অচেতন কোনও সত্ত্ব নয়। অচিতি আর তার আদ্যলীলার মর্মে-মর্মে সন্ধিনীশক্তির ঊর্ধ্বস্রোতা বীর্যের ক্রমিক উপচয় দিগ্ধ হয়ে আছে এবং তাকে আবিষ্ট ক'রে আছে সংবিৎশক্তির অনিরুদ্ধ সংবেগ—যাতে ধীরে-ধীরে বিশ্বের প্রগতির পথে অচিতির তামসী নিরোধশক্তির বলায়িত বাধা খসে যায়, হিরণ্যপাণি সবিতার জ্যোতিঃসায়কে বিদ্ধ হয়ে এলিয়ে পড়ে তার তমিস্রার নাগকুণ্ডলী। এমনি করে দিনে-দিনে আধারে জড়ত্বের সঙ্কোচ শীর্ণ হয়ে আসছে। অবশেষে একদিন তার সকল বন্ধন মুক্তি পাবে লোকোত্তরের উদার ব্যাপ্তিতে—বৃহতের ঋতভৃৎ চেতনা বীর্য ও ভাবের দ্বারা আপ্লুত হয়ে এই দেহ-প্রাণ-মনেরও দিব্য রূপান্তর ঘটবে। সম্যক্-জ্ঞান বিভিন্ন দৃষ্টির সমস্ত সত্যকে স্বীকার করে, আপন-আপন অধিকারে তাদের প্রামাণ্যকেও নিষ্পক্ষ মর্যাদা দেয়। কিন্তু সেইসঙ্গে সে তাদের সঙ্কীর্ণতা ও খণ্ডনবৃত্তি দূর করতে চায় এবং এক বৃহত্তর সত্যের উদার ভূমিকায় খণ্ডসত্যের সৌষম্য ও সমাধান খোঁজে—যাতে সেই সত্যের আলোকে আমাদের সত্তার বহুমুখী সম্ভাবনা সহস্রদল মেলে ফুটতে পারে সর্বগত অদ্বৈতভাবের সুষমা নিয়ে।

এইবার আমাদের আরেকটু এগিয়ে যেতে হবে। এতক্ষণ ধরে যে দার্শনিক তত্ত্বের বিবৃতি দিয়েছি, এবার তাকে শুধু ভাব ও অন্তরবৃত্তির অধিনায়ক না করে জীবন-পথের দিশারী করতে হবে—তার কাছে আত্মানুভব ও বিশ্বানুভবকে ব্যবহারে ছন্দিত করবার সঙ্কেতটিও শিখতে হবে। পরমার্থ-সম্পর্কে আমাদের অর্জিত জ্ঞান অথবা বিশ্বের তত্ত্ব ও অস্তিত্বের তাৎপর্য-সম্পর্কে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমগ্র জীবনাদর্শকে নিয়ন্ত্রিত করে।

মানুষের পুরুষার্থের কল্পনাও এই দার্শনিক দৃষ্টিকে আশ্রয় ক'রে গড়ে ওঠে। লোকোত্তরের দর্শন সদ্‌বস্তুর প্রবৃত্তি ও তজ্জনিত পরিণামের প্রসঙ্গ ছেড়ে তার মূল তত্ত্ব ও ধর্মসমূহের একটা সুনিশ্চিত পরিচয় চায়। অথচ যে-কোনও বস্তুর প্রবৃত্তি ও পরিণাম নির্ভর করে তার মূলতত্ত্বের 'পরে। নিত্যের যে-সত্যকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি, জীবনের লীলার দিক তার অনুরূপ হবে—তার লক্ষ্য এবং ধারায় থাকবে তারই প্রবর্তনা। নইলে দার্শনিক তত্ত্ববিচার হবে অকর্মা বুদ্ধির একটা কসরত মাত্র। আগেভাগেই ব্যাবহারিক ইষ্টসিদ্ধির অন্যায় কোনও উপরোধ না শুনে বুদ্ধি শুধু সত্যের খাতিরে সত্যের সন্ধান করবে, একথা মানতে পারি। কিন্তু তবু সত্যের সন্ধান পেলে তাকে অন্তর্জীবনে এবং বাইরের কর্মেও যে রূপ দিতে হবে—একথাই-বা অস্বীকার করি কি করে? বুদ্ধির সত্য যদি জীবনের সত্য না হয়ে ওঠে, তাহলে বুদ্ধির দরবারে তার মান থাকলেও সম্যক্-দর্শনের কারবারে তার কোনও স্থান নাই। যে-সত্যে জীবনের ছোঁয়া নাই, সে তো বুদ্ধির কৌশলে সমস্যার পূরণ মাত্র। তাকে সত্য না বলে বলব অতত্ত্বের মরীচিকা—মরা-কথার যাদুঘর। অতএব নিত্যের সত্যে জীবনের লীলার সত্য বিধৃত থাকবে। দুয়ের মধ্যে কোনও অন্যোন্যসম্বন্ধ নাই—একথা মানতে আমরা রাজী নই। তত্ত্বজিজ্ঞাসার দ্বারা জীবনসত্যের যে পরম অর্থ পেলাম, অস্তিত্বের যে ঋতময় প্রথমজ রূপ দেখলাম, তার অকুণ্ঠ অভিব্যক্তিকে আমাদের ব্যবহারে ও জীবনাদর্শেও স্বীকার করতে হবে।

এইদিক দিয়ে বিচার করলে দেখি, পরমার্থতত্ত্ব সম্পর্কে চারটি বিভিন্ন ধারণার অনুরূপ পুরুষার্থ বা জীবনদর্শনেরও চারটি প্রস্থান আছে। এই প্রস্থান- বা দর্শন-ভেদকে আমরা বলতে পারি—বিশ্বোত্তর, বিশ্বগত ও ঐহিক, অপার্থিব বা পারত্রিক, এবং সমবায়- সমন্বয়- বা সম্যক্-দর্শন। শেষের দর্শনটিতে পূর্বের তিনটি কিংবা যে-কোনও দুটি দর্শনের সমন্বয়সাধনার প্রয়াস আছে। কিন্তু প্রথম তিনটি দর্শনের মধ্যে একটা অহিনকুল-সম্পর্ক রয়েছে। বলা বাহুল্য, শেষের দর্শনটিই আমাদের সিদ্ধান্ত। এ-জীবনকে আমরা সম্ভূতির লীলা বলে মানি, অথচ স্বয়ম্ভূর দিব্যভাবকে জানি তার উৎস এবং পরম অয়ন। এ-জীবন চিন্ময় পরিণামের একটা অবিচ্ছেদ ধারা—সৃষ্টির লীলাকমলের একে-একে দল-মেলা যেন। বিশ্বোত্তর তার ঊর্ধ্বমূল ও প্রতিষ্ঠা, পরলোক তার নিমিত্ত ও সেতু, আর বিশ্ব এবং ইহলোক তার সাধনার ক্ষেত্র। আর মানুষের প্রাণ-মন তার উত্তরায়ণের বিষুববিন্দু, যেখান হতে আদিত্যের উত্তর ও উত্তম জ্যোতির অভিমুখে তার অভিযান। সবার আগে প্রথম তিনটি দৃষ্টির আলোচনা করব, দেখব সম্যক্-দর্শনের সঙ্গে কোথায় তাদের তফাত এবং তার সত্য এদের সত্যকে কতটুকুই-বা আত্মসাৎ করতে পারে।

বিশ্বোত্তর-দর্শনে পরমার্থ-সৎ একমাত্র সদ্‌বস্তু। এই দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ দুইই যেন কতকটা ঝাপসা ঠেকে, উভয়কেই মনে হয় বিভ্রম বলে—এই হল এ-দর্শনের একটা বৈশিষ্ট্য। অথচ মায়াবাদ বিশ্বোত্তর-দর্শনের মূল চিন্তাধারার অপরিহার্য পরিণতি নয়। মানবজীবন একটা অর্থহীন প্রলাপ মাত্র—এই হল এ-পক্ষের চরম কথা। জীবন জীবচেতনার একটা বঞ্চনা, বাঁচবার আকূতি হতে সৃষ্ট একটা মৃগতৃষ্ণিকা, কিংবা প্রমাদ বা অবিদ্যার একটা ছলনা। পরমার্থসতের স্বচ্ছ প্রকাশকে কি করে সে যেন আচ্ছন্ন ও আবিল করেছে। একমাত্র বিশ্বোত্তরই সত্য; অথবা পরব্রহ্মই সব-কিছুর আদি ও অবসান—মাঝখানটায় শুধু মায়ার খেলা, যার মধ্যে সার বা সত্য বলে কিছুই নাই। অতএব আমাদের একমাত্র কর্তব্য হল, আন্তরপরিণামের ফলে কিংবা চিৎসত্তার কোনও নিগূঢ় বিধানের অনুবর্তনদ্বারা ঐহিক বা পারত্রিক জীবনের সকল বঞ্চনা হতে মুক্ত হওয়া। এতেই প্রাজ্ঞের জীবনসাধনার একমাত্র সার্থকতা। অবশ্য যতক্ষণ মায়ার রাজ্যে আছি, ততক্ষণ মনে হয় মায়া সত্য—এই অর্থহীন প্রলাপেরও যেন একটা অর্থ আছে। যতক্ষণ এই বঞ্চনাকে সত্য ভাবি, ততক্ষণ তার তথ্য আর বিধির জালে আমরা জড়িয়ে থাকি। তবু মানতে হবে, মায়িক তথ্য তথ্যই—তত্ত্ব নয়। তার সত্যতা ব্যাবহারিক—পারমার্থিক নয়। তত্ত্বজ্ঞান বা পরমার্থদৃষ্টির এতটুকু আভাস পেলে বুঝি, মায়ার বিধান যেন বিশ্বজোড়া পাগলাগারদের বিধান। পাগল হয়ে যতক্ষণ গারদে থাকব ততক্ষণ তার আইন-কানুন মানতে হবে, আপন-আপন রুচি-মাফিক তার সুযোগ-দুর্যোগের সকল ঝুঁকি বইতেই হবে। কিন্তু সবসময় আমাদের লক্ষ্য থাকবে, কি করে এই পাগলামির ঘোর কাটিয়ে সত্য ও জ্যোতির অবন্ধন ভূমিতে উত্তীর্ণ হব।...এই ধরনের আপসরফাহীন যুক্তির কঠোরতাকে যতই মোলায়েম করে নিই, জীবত্ব ও জীবনের দাবিকে আপাতত যতই রেয়াত করে চলি, তবু নৈতিবাদের সংস্কার হতে চিত্তকে মুক্ত করতে পারি না। ব্যাবহারিক জীবনে যা-ই করি না কেন, জানি আমাদের পারমার্থিক জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল আত্মজ্ঞানের ক্ষিপ্রতম উপায় অবলম্বন করে সোজাসুজি মহানির্বাণের পথ ধরা—ব্রহ্মের মধ্যে জীব ও জগতের প্রলয় ঘটিয়ে নিজেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। বৌদ্ধেরা নির্ভীকভাবে এমনিতর আত্ম-বিলোপের আদর্শ জোরগলাতেই ঘোষণা করেছেন। তার একটু রকমফের ক'রে বেদান্তীরা বলেছেন আত্মোপলব্ধির কথা। কিন্তু জীবের আত্মোপলব্ধি সত্য হবে, যদি ব্রহ্মের বৃহত্ত্বের মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করে তার স্বরূপের সত্যকে সে ফিরে পায়। তার জন্য ব্রহ্ম আর জীব উভয়কেই অন্যোন্যসম্বন্ধ তত্ত্ববস্তু বলে জানতে হবে। অথচ বেদান্ত জগৎকে বিলুপ্ত করে দিয়ে ব্রহ্মের মধ্যে অবাস্তব বা কালাবচ্ছিন্ন জীবের আত্মপ্রতিষ্ঠা খোঁজে। সে-আত্মপ্রতিষ্ঠায়

যেমন তার মিথ্যা আত্মভাবনার প্রলয় ঘটবে, তেমনি জীবসত্তা ও জগৎসত্তার শেষ রেশটুকু জীবচেতনার আকাশ থেকে মুছে যাবে। অথচ এদিকে ব্রহ্মের অনুশাসনে বিশ্বব্যাপ্ত শাশ্বত অবিনাশী অবিদ্যার অধিকার তেমনি অক্ষুণ্ণ থাকবে—তেমনি নিরুপায় ও অনুত্তরণীয় হয়ে চলবে জগৎ জুড়ে এই প্রমাদের মেলা!

কিন্তু বিশ্বোত্তর সত্যকে মানতে গেলে জগৎকে যে মিথ্যা বলতে হবে—এ-সিদ্ধান্ত একেবারে অপরিহার্য নয়। ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদে ব্রহ্মের সম্ভূতিকেও তত্ত্ব বলে মানা হয়েছে। অতএব সত্যের রাজ্যে সম্ভূতিরও একটা স্থান আছে। সম্ভূতির সত্যেই জীবনে ঋতের বিধান দেখা দেয়, আধারে নিহিত আত্মরতির একটা সার্থকতার সন্ধান মেলে, পৃথিবীর ধূলি হয় মধুময়, চেতনায় নিহিত ক্রিয়াশক্তির চরিতার্থতা ঘটে সার্থক কর্মের উদ্যাপনে। কিন্তু সম্ভূতির ঋত এবং সত্য ব্যক্তির জীবনে একবার চরিতার্থ হলে আবার তাকে চরম আত্মোপলব্ধির অনুপাখ্যতায় ফিরে যেতে হয়। কেননা শাশ্বত আত্মস্বরূপের কালাতীত তত্ত্বভাবে অবগাহন করা, সর্ববন্ধবিনির্মুক্ত হয়ে আপন পূর্বস্বরূপে ফিরে যাওয়া—এই তো জীবের পরম পুরুষার্থ। সম্ভূতির চক্র প্রবর্তিত হয় স্বয়ম্ভূর শাশ্বত বিন্দু হতে, আবার তার নিবৃত্তিও ঘটে সেই মহাবিন্দুতে।...অথবা পরব্রহ্মকে যদি পুরুষ বা পুরুষোত্তম বলে মনে করি, তাহলে বিশ্ব তাঁর একটা সাময়িক লীলা মাত্র—বিশ্ব জুড়ে খেলার ছলে তাঁর এই সম্ভূতি ও জীবযাত্রার বিলাস। এক্ষেত্রে জীবনের একমাত্র তাৎপর্য নিহিত রয়েছে স্বয়ম্ভূসতের সম্ভূত হবার আকূতিতে। চৈতন্যে নিরূঢ় সংকল্প ও শক্তির প্রেতি বিচ্ছুরিত হতে চাইছে সম্ভূতির আনন্দময় উচ্ছলনে। কিন্তু স্বয়ম্ভূর এই আকূতি জীবকে যখন ছেড়ে যায়, অথবা তার পুরুষার্থসিদ্ধিতে আকূতির নিবৃত্তি ঘটে, তখন সম্ভূতির লীলাও তার আধারে থেমে যায়। অথচ বিশ্বব্যাপার চলতেই থাকে—ব্রহ্মাণ্ডবিসৃষ্টির নৃত্যচ্ছন্দে কখনও যতিভঙ্গ হয় না। কেননা, সম্ভূতির আকূতিতে একটা শাশ্বত সংবেগ আছে—শাশ্বতসতের সে নিত্যসমবেত সত্যসংকল্প বলেই।...এ-দর্শনের একটা মারাত্মক ত্রুটি এই যে, এর মধ্যে জীবের কোনও স্ব-তন্ত্র বাস্তব সত্তা স্বীকার করা হয়নি বলে, তার ব্যাবহারিক কি পারমার্থিক প্রবৃত্তির একটা স্থায়ী মূল্য বা তাৎপর্যেরও কোনও ইঙ্গিত মেলে না। পূর্বপক্ষী হয়তো বলবেন: ব্যক্তিসত্তার এমনতর একটা চিরন্তন তাৎপর্য বা শাশ্বত সদ্ভাবের সন্ধানে ফেরা আমাদের অবিদ্যাচ্ছন্ন বহিশ্চর চেতনার প্রমাদ শুধু। জীবত্ব যে পরমশিবের কালকলিত বিভূতি মাত্র—এই কি তার মর্যাদা ও সার্থকতার পক্ষে যথেষ্ট নয়? তাছাড়া শুদ্ধ নির্বিশেষ সন্মাত্রের বেলায় সার্থকতা কি মর্যাদার কোনও কথাই তো উঠতে পারে না। ব্যবহারের দিক থেকে বিশ্বের প্রত্যেক

বস্তুর একটা বিশেষ মূল্য আছে, যদিও সে-মূল্য কালকলনার সৃষ্টি। কিন্তু কালকলিত বলেই তাকে চরম বা পরম মূল্যের গৌরব দিতে পারি না—বলতে পারি না, কালেরও বীচিভঙ্গে শাশ্বত ও স্বতঃসিদ্ধ কোনও অর্থের ব্যঞ্জনা আছে।...মনে হয়, এ-যুক্তির বুঝি আর জবাব নাই। কিন্তু তবু আমাদের মন মানে না। ব্যক্তিসত্তার উপর যতখানি জোর দিই, তার কাছে যতখানি দাবি করি—এমন-কি ব্যক্তির সিদ্ধি ও মুক্তিকে যেভাবে মূল্যবান মনে করি, তাতে তার গুরুত্বকে একেবারে উপেক্ষা তো করতে পারি না। বলতে তো পারি না, জীবলীলা বিশ্বলীলার একটা গৌণব্যাপার মাত্র—শাশ্বত সন্মাত্রের বিশ্বব্যাপী সম্ভূতিচক্রের মহা আবর্তনের মধ্যে জীবকুণ্ডলীর এই রচন ও মোচন একান্তই অকিঞ্চিৎকর।

তারপর ঐহিক-দর্শনের কথা। এ-দর্শন বিশ্বোত্তর দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত, কেননা এর মতে জগৎ সত্য। শুধু তা-ই নয়—একমাত্র জগৎই সত্য এবং সে-জগৎ এই জড়ের জগৎ। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি শাশ্বত সম্ভূতি ছাড়া আর-কিছু নন। আর ঈশ্বর না থাকলে প্রকৃতিই একমাত্র তত্ত্ব এবং চিরন্তন সম্ভূতি তারও স্বভাব—এখন প্রকৃতিকে আমরা যা-ই ভাবি না কেন। প্রকৃতি হয়তো জড়কে নিয়ে শক্তির একটা খেলা, হয়তো সে বিশ্বপ্রাণের অমিত বৈপুল্য, অথবা জড় ও প্রাণের বুকে একটা নৈর্ব্যক্তিক বিরাট মনের স্পন্দন—এই তার স্বরূপ। পৃথিবী সম্ভূতিলীলার সাময়িক রঙ্গভূমি মাত্র, আর মানুষ হয়তো সে-লীলার চরম চমৎকার কিংবা তার ক্ষণেকের খেলা। মানবব্যক্তি তো নশ্বর বটেই, মানবজাতিরও আয়ুষ্কাল পৃথিবীর আয়ুর একটা ভগ্নাংশ মাত্র। পৃথিবীর বুকে প্রাণের খেলা আরও-একটু দীর্ঘ হয়তো। কিন্তু তাহলেও সৌরজগতের তুলনায় কি পৃথিবীকে চিরায়ুষ্মতী বলা চলে ? সৌরজগৎই-বা কদিনের—একদিন তারও আয়ু ফুর'বে অথবা সম্ভূতির মধ্যে তার হৃদয়-স্পন্দন স্তব্ধ হবে, তার সৃষ্টির আবেগ নিরুদ্ধ হবে। এই ব্রহ্মাণ্ডও হয়তো একদিন শূন্যে মিলিয়ে যাবে, অথবা আবার সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে যাবে মহাশক্তির বীজভাবনায়। কিন্তু সম্ভূতির তত্ত্ব শাশ্বত—অনন্ত অস্তিত্বের এই ছায়ার মায়ায় একটা আপেক্ষিক নিত্যতা তো তার আছেই।...কালের প্রবাহে চৈত্যসত্তারূপে মানুষব্যক্তির একটা স্থায়িত্ব কল্পনা অসম্ভব নয়। হয়তো তার পক্ষে প্রেতলোক বা লোকান্তর বলে কিছু নাই, অথচ এই পৃথিবীতে বা ব্রহ্মাণ্ডকটাহে নতুন-নতুন শরীর ধরে বারবার সে আসছে। তার এই নিরন্ত সম্ভূতির মূলে আছে এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোনও সুখাবতীর দিকে অবিরাম অভিযান, অথবা নিত্য-উপচীয়মান পূর্ণতার সিদ্ধি বা সাধনার আকৃতি। কিন্তু ঐহিক সত্তাকে একান্ত ভাবলে চৈত্য-সত্তার স্থায়িত্বের কল্পনা টেকে না। মানুষের জল্পনা কখনও-কখনও এই

সূত্র ধরে খানিকটা এগিয়ে যেতে চেয়েছে, কিন্তু কোনও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। সম্ভূতির রঙ্গমঞ্চে বারবার নামতে হলে একটা বৃহত্তর অপার্থিব সত্তার নেপথ্য যে নিতান্তই আবশ্যক, একথার যৌক্তিকতা সে অস্বীকার করেনি।

একমাত্র পার্থিবজীবনকে যারা সত্য বলে মানে, অথবা ভাবে জড়জগতে জীব দুদিনের অতিথি মাত্র (কেননা অন্যান্য গ্রহে মননধর্মী জীবের সত্তা একেবারে অসম্ভাবিত নয়)—তাদের পক্ষে জীবনসাধনার দুটিমাত্র পথ খোলা আছে। মানুষ মরবেই জেনে হয় নিবৃত্তিধর্মের চর্চা করে মুখ বুজে সয়ে যাও মরণের মার, নয়তো ব্যক্তি বা সমাজের সংকীর্ণ জীবনাদর্শের অনুশীলনে প্রবৃত্তিধর্মকে সজাগ করে তোল নিজের মধ্যে। মানুষ শুধু ব্যক্তিস্বার্থের জাবর কেটে বা কোনরকমে দিন-গুজরান করে যদি তৃপ্ত না থাকতে পারে, তাহলে তার সামনে ন্যায়ধর্মের অনুমোদিত একটিমাত্র সাধনার উদার ক্ষেত্র উন্মুক্ত রয়েছে। সম্ভূতির বিধানকে মানুষ দার্শনিকের মত খুঁটিয়ে বুঝুক। তারপর বুদ্ধি দিয়ে হ'ক বা বোধি দিয়ে হ'ক, অন্তরের ধ্যানলোকে হ'ক বা বহির্জীবনের কুরুক্ষেত্রে হ'ক—যে-সম্ভাবনা ব্যক্তি বা জাতির মধ্যে সম্পুটিত রয়েছে, নিজের বা স্বজাতির কল্যাণের জন্য সম্ভূতির বিধান মেনে তাকে সে ফুটিয়ে তুলুক। হাতের কাছে যে-ভূতার্থকে পেয়েছে, তার সমস্তটুকু রস আদায় করে সে সাধ্য বা সম্ভবৎ ভব্যার্থের উচ্ছ্রিত মহিমার দিকে হাত বাড়াবে—এই হল তার জীবনব্রত। কালের দীর্ঘবিলম্বিত লয়ে, ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীর কর্মসঞ্চয়ের দ্বারা পরিপুষ্ট জাতিধর্মের ক্রমিক উপচয়ে এ-ব্রতের পরম সিদ্ধি একমাত্র সমষ্টিমানবের পক্ষেই সম্ভব। ব্যষ্টিমানব তার পরিমিত আয়ুষ্কালের মধ্যে সেই মহাসিদ্ধির অনুকূলে তার যতটুকু সাধ্য তা করে যেতে পারে মাত্র। বিশেষত, তার ভাব এবং কর্ম জাতির বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনকল্যাণের এবং ভবিষ্য প্রগতির বেদিতে একনিষ্ঠ সাধকের পূজোপচার হতে পারে। জীবনকে একদিক দিয়ে সার্থক ও মহৎ করে তোলবার সামর্থ্যও তার আছে। মহাবিনাশের করাল আঁধারে দুদিনেই যে তার ব্যক্তিজীবনের খদ্যোতিকা মিলিয়ে যাবে, এ-ধ্রুবসত্যকে জেনেও তার দীর্ঘ-আসেবিত ভাব ও সংকল্পের বীর্যকে সে দিকে-দিকে ছড়িয়ে দিতে পারে, তার অগ্নিগর্ভ ভাবনাকে অনাগত মানবের বিপুল উত্তরাধিকার এবং দায়রূপে রেখে যেতে পারে। তাছাড়া গোষ্ঠীমানবের অচিরস্থায়িত্ব নিয়ে ক্ষুব্ধ হওয়াও আমাদের সাজে না—অবশ্য ঝানু জড়বাদীর কাছে যদি ইতিমধ্যে মাথা না বিকিয়ে থাকি। কারণ মানবদেহ আর মানবমনের আকারে যতদিন বিশ্বসম্ভূতির ফুল ফুটবে, ততদিন মানুষের ভাবনা ও সঙ্কল্পের অভিযানকে ঠেকাবে কে? তখন ওই প্রগতির ধারাকে অনুসরণ করে চলাই কি আমাদের নৈসর্গিক ধর্ম

এবং অনুত্তম ব্রত হবে না? যতদিন পৃথিবীতে মানুষ আছে, ততদিন তার প্রগতি ও কল্যাণের তপস্যাই আমাদের ঐহিক জীবনের পুরুষার্থ। মানুষের সাধনার বিপুল ক্ষেত্র এবং সাধ্যের স্বাভাবিক অবধিও তা-ই। সুতরাং জড়ীয় উৎকর্ষের স্থায়িত্ববিধান এবং গোষ্ঠীজীবনের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব সম্পাদনের তপস্যার দ্বারাই আমাদের জীবনাদর্শের স্বরূপ ও অধিকার নিরূপিত হবে। যদি বলি, মানবহিতের দায়ই-বা আমাদের কোথায়—কেননা ও তো শুধু আলেয়ার পিছনে ছোটা : তাহলেও ব্যক্তির দায় তো একটা আছেই। ব্যক্তির সিদ্ধিকে যথাশক্তি পূর্ণরূপ দেওয়া, অথবা আত্মপ্রকৃতির অনুকূলে জীবনকে সার্থক করে তোলা—এই কি মানুষের পুরুষার্থ হতে পারে না?

তারপর আছে পারত্রিক-দর্শন। এ-দৃষ্টিতে জড়বিশ্ব সত্য হলেও, পৃথিবী ও মানবজীবন দুইই যে অচিরস্থায়ী—একথা মেনে নিয়েই হবে এষণার শুরু। ইহলোক নশ্বর হতে পারে, কিন্তু এছাড়াও অন্য লোক বা অন্য ভূমি আছে। তারা যদি শাশ্বত নাও হয়, তবু তাদের আয়ুষ্কাল ভূলোক হতে বেশী তো বটেই। মানুষের দেহ মরণধর্মী, অথচ এই দেহেই আবার অমর আত্মার নিবাস। তাই পারত্রিক-দর্শনের মূল কথা হল আত্মার অমরত্বে এবং দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস। অমরত্বে বিশ্বাস থাকলেই ভূলোক বা পৃথিবী ছাড়া কোনও ঊর্ধ্বভূমির অস্তিত্ব মানতে হবে। কেননা, বিদেহী আত্মাকে টিকে থাকতে হলে জড়বিশ্ব তার আশ্রয় হতে পারে না এইজন্যে যে, এখানকার সকল কারবার চলছে জড়ের আধারে জড়কে নিয়ে শক্তির লীলায়নে—এখন, সে-শক্তি অন্নময় প্রাণময় মনোময় কি চিন্ময় যা-ই হ'ক না কেন। তাইতে কল্পনা জাগে : মানুষের সত্যধাম এপারে নয়, ওপারে—এ-পৃথিবীতে সে দুদিনের অতিথি মাত্র, তার অমরজীবনে এ শুধু ক্ষণেকের মেলা। বস্তুত সে অমরাবতীর অধিবাসী—শাশ্বত চিন্ময় মহিমা হতে স্খলিত হয়ে ঝরে পড়েছে এই মৃন্ময়ীর বুকে।

প্রশ্ন হবে, জীবাত্মার এই চ্যুতি ও স্খলনের স্বরূপ হেতু বা পরিণাম কি? কোনও-কোনও ধর্মের মতে, জড়দেহধারী জীবরূপে পৃথিবীর বুকে সৃষ্ট হবার পর মানুষের মধ্যে নবজাত একটি দিব্য আত্মাকে যুক্ত বা সঞ্চারিত করা হয় সর্বশক্তিমান বিধাতার ব্যাহৃতিমন্ত্রে। এ-মত চিরাগত ও বহু প্রাচীন হলেও আজ আর এতে মানুষের তেমন আস্থা নাই। একটিবারমাত্র মানুষের দেহধারণ ঘটে। অতএব তার মুক্তিসাধনারও এই একটিমাত্র সুযোগ। মরণান্তে পাপ-পুণ্যের হিসাব খতিয়ে পুণ্যের ভাগ বেশী হলে তার কপালে ঘটে অনন্ত স্বর্গসুখ, আর পাপের ভাগ ছাপিয়ে উঠলে অনন্ত নরকযন্ত্রণা। বিশেষ-কোনও ধর্মমত, উপাসনাপদ্ধতি বা পয়গম্বরকে মানা না-মানার 'পরেও তার ভাগ্যলিপি নির্ভর করতে পারে। অথবা তার কপালে সব ব্যবস্থাই হয়তো

আগেভাগে ঠিক হয়ে আছে খোশখেয়ালী খোদার মরজিতে! অবশ্য এধরনের পারত্রিক-দর্শন যুক্তিতে এতই কাঁচা যে তাকে অপ্রমাণ অন্ধবিশ্বাসের পর্যায়ে ফেলতে দ্বিধা হয় না।...*দেহধারণের সঙ্গে-সঙ্গে* আত্মার জন্ম হয়, একথা মেনে নিয়েও কল্পনা করা যেতে পারে : পার্থিবজীবনের অবসানে জীবাত্মার অস্তিত্বের বাকী অংশ কাটে অপার্থিব কোনও উত্তরভূমিতে। তখন অন্নময় কোশের আদিম আচ্ছাদন খসিয়ে গুটিকাটা প্রজাপতির মত আনন্দজ্যোতিতে রঙিন পাখা মেলে সে উড়ে বেড়ায়। জীবের এটি সার্বভৌম নিয়তি। অথবা এর চাইতেও সুন্দর কল্পনা : পার্থিবদেহে অবতীর্ণ হবার পূর্বে অপার্থিব লোকে আত্মা শাশ্বত মহিমায় বিরাজমান ছিলেন। তারপর পৃথিবীর পঙ্কে অবস্খলিত হয়ে আবার তিনি স্বর্লোকের জ্যোতির্ময় ধামে উত্তীর্ণ হন। জীবাত্মার প্রাক্‌সত্তাকে যদি স্বীকার করি, তাহলে চিৎজগতের অন্তত একটা নৈমিত্তিক ব্যাপাররূপে আরেকটা সম্ভাবনার কথা মনে জাগে। আত্মা হয়তো লোকান্তরের অধিবাসী হয়েও বিশেষ-কোনও প্রয়োজনে মানুষের শরীর ও প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করে এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু এ-বিধানকে মর্ত্যজীবনের সর্বজনীন বিধান বলা চলে না, অথবা জড়বিশ্বসৃষ্টির একটা সংগত অজুহাত বলেও মানা যায় না।

কেউ-কেউ বলেন, পৃথিবীতে জীব একবার মাত্র আসে। মরণের পর অপার্থিব লোকের স্তরে-স্তরে তার আত্মার পুষ্টি এবং উদয়ন চলে। আপন জ্যোতির্ময় পূর্বমহিমায় ফিরে যাবার পথে লোকান্তরের পরম্পরা তার ক্রমিক অভ্যুদয়ের সোপানমালা। এই জড়বিশ্ব, বিশেষ করে এই পৃথিবী তাহলে স্রষ্টার দিব্য জ্ঞান বীর্য বা খেয়ালের খুশিতে সৃষ্ট বিচিত্রসম্ভারপূর্ণ একটা রঙ্গমঞ্চ—যেখানে জীবের জীবননাট্যের একটি প্রবেশক অভিনীত হবে। অভ্যস্ত শিক্ষা ও সংস্কার অনুযায়ী এ-জগৎকে তখন বলতে পারি জীবের পরীক্ষা বা পুষ্টির ক্ষেত্র, অথবা তার আত্মিক স্খলন ও নির্বাসনের ভূমি।... এদেশের কারও-কারও মতে এ-জগৎ দিব্য-পুরুষের প্রমোদকানন—এখানে অপরা প্রকৃতির পরিবেশে প্রাপঞ্চিক অর্থ নিয়ে তাঁর লীলার বিলাস চলছে। জন্ম-জন্মান্তরের দীর্ঘধারায় জীব তাঁর লীলার নিত্য সহচর। লীলাবসানে লীলাময়ের স্বধামে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর শাশ্বত সামীপ্য ও সাযুজ্য লাভই তার নিয়তি। এ-মতে সৃষ্টিব্যাপার ও জীবের অধ্যাত্মসাধনার যুক্তিসংগত একটা তাৎপর্য তবু খুঁজে পাওয়া যায়—যা এইধরনের ভবচক্র বা জীবগতির বর্ণনায় অন্যত্র হয় অনুল্লিখিত অথবা অস্পষ্টভাবে সূচিত হয়েছে মাত্র।...কিন্তু সর্বত্র পারত্রিক-দর্শনের মূলসূত্র তিনটি : প্রথমত ব্যষ্টি মানবের আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত, এই বিশ্বাসেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণামরূপে পৃথিবীতে আত্মার সাময়িক অবস্থান অথবা স্বরূপচ্যুতির কল্পনা এবং সেইসঙ্গে বিশ্বাস

করা—আত্মার স্বধাম এই পৃথিবীর ওপারে, স্বর্লোকে। তৃতীয়ত, শীলপালন ও অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলনকে মুক্তিপথের উপায় জ্ঞানে তাকে জড়জগতে জীবের একমাত্র পুরুষার্থ বলে প্রচার করা।

তত্ত্বদর্শনের এই তিনটি মূল ধারার প্রত্যেকের সঙ্গে জীবনদর্শনেরও একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি যুক্ত আছে। বিভিন্ন দর্শনে এই তিনটি মূল ধারারই রকমফের দেখি। তাদের কেউ নিয়েছে মধ্যপথ, কেউ-বা ধরেছে সমন্বয়ের পথ। সবারই উদ্দেশ্য. সমস্যার জটিলতাকে আপন রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে সহজ করা। কারণ, তিনটি দর্শনের যে-কোনও একটিকে একান্তভাবে আঁকড়ে থাকা দুচারজন একনিষ্ঠ সাধকের পক্ষে সম্ভব হলেও, সাধারণ মানুষ কখনও একটি মতকে পুরাপুরি বা চিরদিনের মত তার জীবনপথের দিশারী করতে পারে না—কেননা তার স্বভাবের দুয়ারে পোঁছয় জীবনের সকল রসেরই সমান দাবি। প্রবৃত্তির বিচিত্র সংঘাতে মানুষের জীবন জটিল হয়ে আছে। তাছাড়া প্রবৃত্তি যার নজির খোঁজে, সেই বোধিকে নিয়েও তার টানাটানি চলে নানাদিকে। এই গণ্ডগোল হতে বাঁচতে গিয়ে মানুষ কখনও দুটি বা তিনটি দর্শনেরই একটা জগাখিচুড়ি পাকায়, কখনও তার চিত্ত তাদের দ্বিধায় দোলে কি সংঘর্ষে ক্ষতবিক্ষত হয়, আবার কখনও হয়তো চলে সর্বসমন্বয়ের একটা পঙ্গু প্রয়াস। প্রায় সবমানুষের সাধারণ ঝোঁক পড়ে ঐহিক-দর্শনের দিকে। মানুষের বেশীর ভাগ শক্তি ব্যয়িত হয় পার্থিবজীবনের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে, অভাব-পূরণ বা স্বার্থের সাধনায়, কি কামনার তর্পণে। ব্যক্তিজীবনের বা জাতীয়জীবনের ঐহিক আদর্শকে সফল করে তোলাই হয় তার জীবনব্রত। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। কেননা পৃথিবীর জীব বলেই মানুষকে দেহের পরিচর্যা করতে হয়, প্রাণময় ও মনোময় সত্তার পুষ্টি এবং তৃপ্তি খুঁজতে হয়, ব্যষ্টি- আর গোষ্ঠী-জীবনের উন্নত ও মহান আদর্শকে রূপ দেবার জন্য কৃচ্ছ্রতপা হতে হয়। কেননা, মানুষ বিশ্বাস করে, প্রগতির সাধারণ নিয়মে একদিন সে মনুষ্যত্বের চরমধাপে পোঁছবে অন্তত তার কাছাকাছি তো যাবেই। এই আকূতি আর তপস্যা মানুষের স্বধর্ম—এর দিকে তার স্বভাবের ঝোঁক, এতেই তার পুষ্টি। এছাড়া কি মনুষ্যত্বের সাধনা তার পূর্ণ হতে পারত? আমাদের 'পরে পৃথিবীর দাবিই বুঝি সবার বড়। যে-জীবনদর্শন তাকে অন্যায়ভাবে উপেক্ষা বা খর্ব করে, অথবা অসহিষ্ণু হয়ে লাঞ্ছিত করে—তার মধ্যে আরেকদিকের সত্য বা প্রয়োজনের তাগিদ যত বড়ই হ'ক, অধ্যাত্ম-পরিণামের পর্বাবিশেষে বিশেষ-রুচির মানুষের কাছে তার আদর্শ যতই উপাদেয় হ'ক, তবু তাকে মানুষের পরিপূর্ণ ও সার্বভৌম জীবনদর্শন বলে তো মানতে পারব না। মাটির ডাকে সাড়া দেওয়া প্রকৃতিপরিণামের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। অতএব মানুষ যাতে তাকে অবহেলা না করে, তার দিকে প্রকৃতির কড়া

নজর রয়েছে। আমাদের ধ্রুবনিয়তিতে যে-দিব্যভাবনার ছক আঁকা আছে, তার বিচিত্রপর্বের আদিপর্ব হল এই পার্থিবপ্রকৃতির আরতি। এর যাতে অবমাননা না হয়, দেহ আর মনের সুদৃঢ় ভিত্তিতে যাতে চিন্ময় বিগ্রহের রঙ্-মহল গড়ে ওঠে, তার জন্য তার সতর্কতার সীমা নাই—কেননা এই 'পার্থিবং রজঃ'-ই হল মহাপ্রকৃতির অনাগত মহিমার ভিত্তি এবং কাঠামো।

অথচ এই মাটির মানুষেই যে একটা-কি আছে, যা তার মর্ত্য-স্বভাবের আদ্যচ্ছন্দকে উঠেছে ছাপিয়ে—এমন বোধও প্রকৃতি আমাদের অন্তরে সঞ্চরমাণ রেখেছে। এইজন্যই ঊর্ধ্বলোকের আহ্বানকে উপেক্ষা করে শুধু এই মাটির বুক আঁকড়ে থাকার অনুশাসনকে আমরা বেশিদিন বরদাস্ত করতে পারি না। লোকোত্তরের একটা অস্পষ্ট অথচ প্রাতিভ সংবিৎ, দেহ-প্রাণ-মনের সংস্কারমুক্ত একটা বৃহত্তর আত্মচেতনার অনুভব পৃথিবীর ধূলিতে আচ্ছন্ন হয়েও আবার ফিরে এসে আমাদের সকল চিত্ত জুড়ে বসে। সাধারণ মানুষ এই অধ্যাত্ম-বোধের দাবিকে সহজেই মেটাতে পারে—জীবনের বিশেষ-একটা লগ্নকে কিংবা গলিতনখদন্ত বার্ধক্যের জীর্ণ অবকাশকে তার উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রে, অথবা প্রাকৃত স্বভাবের দুরধিগম্য অথচ তারই আধারে গুহাহিত এই অপ্রাকৃত ভাবের প্রতি একটা মূঢ় শ্রদ্ধার ক্লৈব্যকে মাত্র লালন ক'রে। দু-চার জন অধ্যাত্মচেতা আবার এই লোকোত্তরের আহ্বানকেই তাদের জীবনপথের একমাত্র দিশারী করে, আধারের দিব্যভাবকে পরিপুষ্ট করবার আকাঙ্ক্ষায় মর্ত্যভাবকে সাধ্যমত খর্ব এবং নির্জিত করে। এমন যুগও এসেছে জগতে, যখন 'ইহ'র চেয়ে 'অমুত্র'র সর্বনাশা ডাক মানুষের চিত্তকে উতলা করেছে—স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝে অকরুণ দ্বিধায় ত্রিশঙ্কুর মত সে আন্দোলিত হয়েছে। মর্ত্যের জীবনে তার সোয়াস্তি নাই, কেননা আত্মপ্রকৃতির উদার স্বাচ্ছন্দ্য প্রতি পদক্ষেপে এখানে কুণ্ঠাবিকৃত। আবার স্বর্গের আকৃতিও তার নিষ্ফল তপস্যার বিড়ম্বনায় ক্লিষ্ট হয়েছে, কেননা বিশুদ্ধ স্বর্গসুখ যে প্রাংশুলভ্য ফলের মত—উদ্বাহু হলেই কি বামনেরা তার নাগাল পায়? এমনি করে আধারে দেখা দিয়েছে স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝে অস্বস্তিকর একটা মিথ্যা বিরোধ। তার ফলে, হয় আমরা প্রকৃতিপরিণামের স্বাভাবিক নির্দেশকে উপেক্ষা করে অবাস্তব একটা আদর্শ বা সাধনপথ খাড়া করেছি, নয়তো আমাদেরই প্রকৃতিতে নিহিত রয়েছে যে সর্বসমন্বয়ী সাম্যের বিধান, তার প্রতি অন্ধ হয়ে একপক্ষের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়েছি।

কিন্তু মনন যত গভীর হবে, সূক্ষ্মতর বিজ্ঞানের উন্মেষ যত সহজ হবে, ততই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যাবে ইহ আর অমুত্রকে ছাড়িয়েও অনন্তের দিগন্তনিলীন অনুত্তরভূমির জ্যোতির্ময় ইঙ্গিত। আমরা জানব, ঐহিক ও পারত্রিক বিশ্বেরও পরপারে আছে বিশ্বোত্তীর্ণের তুর্যাতীত ধাম—

আমাদের অস্তিত্বের সুদূরতম গঙ্গোত্রী। ওই সুদূর দুর্গমের ডাক এসে অন্তরে পৌঁছয় যখন, তখন আত্মার উদগ্র অভীপ্সায় কখনও সমিন্ধ বীর্যের দুর্দম প্রবেগ অথবা সত্য সঙ্কল্পের তীব্র উন্মাদনা জাগে। কখনও শাণিত বুদ্ধির ক্ষুরধার বিবেক নিয়ে আসে তত্ত্বদর্শীর নির্বিকার ঔদাসীন্য। কখনও-বা জীবনের বিভীষিকায় আতঙ্কিত অথবা আশাভঙ্গের বেদনায় বিধুর প্রাণে প্রবল বিতৃষ্ণার ঢেউ ফেনিয়ে উঠে। অন্তরের এইসব গোপন প্রেতি তখন চিত্তে ইহবিমুখীনতার একটা গভীর সুর জাগায়। মনে হয় : ওই সুদূর লোকোত্তর ছাড়া বিশ্বের সবই অসার—সবই মিথ্যা। এ-জগৎ শুধু স্বপ্নছায়া, নিষ্ঠুর কুৎসিৎ তিক্ততায় ভরা এই পৃথিবী, অবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্ত স্বর্গসুখও অকিঞ্চিৎকর, সাংসারচক্রের লক্ষ্যহীন আবর্তনে বারবার দেহধারণ একটা অভিশাপ। এ-বিষাদযোগ সাধারণ মানুষকে পীড়িত করলেও উদ্বুদ্ধ করে না—শুধু তার জীবনে সঞ্চারিত করে অতৃপ্ত অস্থিরতার একটা ধূসর ছায়া। অথচ জীবনাসক্তিকেও সে বর্জন করতে পারে না। কিন্তু অসাধারণ মানুষ সত্যের চকিত আভাস পেয়ে তার সন্ধানে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। তখন বৈরাগ্যের ওই সর্বনাশা উন্মাদনা হয় তার অধ্যাত্মপথের পাথেয়, তার তীব্রসংবেগ 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতনে' তাকে করে উদ্দীপিত। এক-এক যুগে অথবা এক-এক দেশে বৈরাগ্যের ধুয়া এত প্রবল হয়েছে যে, সমাজের একটা বড় অংশ ঝুঁকে পড়েছে সন্ন্যাসের দিকে—তার প্রতি সবার সত্যকার টান থাক্ বা না থাক্। যারা ঘর ছাড়তে পারেনি, তারা ঘরে রয়েছে সংসারের অবাস্তবতা সম্পর্কে একটা লজ্জিত বিশ্বাসকে মনের গোপনে লালন ক'রে। চারদিক হতে 'এ-সংসার ধোঁকার টাটি'—এই বৈরাগ্যের গাথা সে-বিশ্বাসের আরও ইন্ধন যুগিয়েছে। তার ফলে জীবনের প্রতি মানুষের আগ্রহ শিথিল হয়েছে, তার সাধনা ক্রমেই তুচ্ছ ও বীর্যহীন হয়েছে। এমন-কি প্রকৃতির সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়ার বশে সংসার-বৈরাগ্যের আদর্শই সংসারের প্রতি একটা মূঢ় সঙ্কীর্ণ আসক্তি এনেছে—মানুষ ভুলে গেছে সহজ আনন্দে দিব্য-পুরুষের প্রপঞ্চোল্লাসের উদার ছন্দে সাড়া দিতে, ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থের চরিতার্থতার কাছে বিরাট মানবকল্যাণের প্রগতিশীল আদর্শ অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে, একের জীবন একান্ত হয়ে সবার জীবনকে পঙ্গু করেছে, সমষ্টির হিতকল্পে বিশ্বের কুরুক্ষেত্রে কর্মযোগীর অকুণ্ঠ আত্মদানের উদ্দীপনাকে নির্বাপিত করেছে।... এইখানেই মনে হয়, বিশ্বোত্তর তত্ত্বের বিবৃতিতে কোথায় যেন থেকে গেছে একটা ফাঁক—হয়তো একটা অতিরঞ্জন, নয়তো প্রমাদী চিত্তের কল্পিত একটা বিরোধ। তাইতে সামরস্যের দিব্য আনন্দ হতে আমরা বঞ্চিত হয়েছি—সৃষ্টির সমগ্র তাৎপর্যকে, স্রষ্টার অখণ্ড সত্যসঙ্কল্পের ব্যঞ্জনাকে ভুল বুঝেছি।

সামরস্যের সঙ্কেত তখনই খুঁজে পাব, যখন বিশ্বলীলার বিপুল সৌষম্যের

সঙ্গে আমাদেরও নানা গ্রন্থিজটিল মানবপ্রকৃতির সমগ্র সুরটিকে মিলিয়ে নিতে পারব। আমাদের আধার বিচিত্র উপাদানে গড়া—বহুমুখী অভীপ্সায় সে সঙ্কুল। তার প্রত্যেকটি অংশের ন্যায়সংগত দাবিকে পূর্ণ করা, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা দিয়ে ঐক্য ও সৌষম্যের মূল ছন্দ আবিষ্কার করা—এইতো আমাদের সাধনার লক্ষ্য। সমন্বয় বা অভঙ্গসমাহার এই আবিষ্ক্রিয়ার সাধন হবে। আর ক্রমিক পুষ্টি যখন মানবাত্মার স্বধর্ম, তখন প্রকৃতিপরিণামের পর্বে-পর্বে সমন্বয়ের সাধনাই হবে ইষ্টসিদ্ধির সোপান। এদেশের প্রাচীন সংস্কৃতিতে এমনিতর একটা ব্যবস্থার প্রয়াস ছিল। প্রাচীন ভারত মানুষের চারটি পুরুষার্থ মেনেছিল : প্রথমত অর্থ বা মানুষের প্রাণধর্মের অনুকূল উপ-করণের সঞ্চয়, দ্বিতীয়ত কাম, তৃতীয়ত ধর্ম বা সাধনজীবনের অভীপ্সা, চতুর্থত মোক্ষ—অধ্যাত্মযোগের যা চরম লক্ষ্য ও নিয়তি। প্রথম দুটিতে মানুষের দেহ প্রাণ ও হৃদয়ের দাবি মিটবে। তৃতীয়টিতে ঈশ্বর জগৎ ও জীবের স্বধর্ম জেনে তার শীল- ও ধর্ম-সাধনার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হবে এবং শেষেরটিতে শান্ত হবে তার লোকোত্তরের আকূতি—অবিদ্যাচ্ছন্ন পার্থিব-জীবনের বন্ধনমুক্ত হয়ে সে নির্বৃতির চরম অধিকার পাবে। এই জীবনা-দর্শকে মেনে দেখা দিল চতুরাশ্রমের কল্পনা—জীবনব্যাপী শিক্ষানবিশির চারটি পর্ব। প্রথম দুটি পর্বে শীল ও ধর্মের অনুশীলনে সংযমিত চিত্তের দ্বারা মানুষের নৈসর্গিক কামনা ও প্রবৃত্তির তর্পণ, তৃতীয় পর্বে সংসার হতে সরে গিয়ে অধ্যাত্মজীবনের জন্য প্রস্তুতি এবং শেষ পর্বে জীবনাসক্তি বর্জন করে চিন্ময় স্বরূপে অবগাহন। অবশ্য জীবনযাত্রার এই শাস্ত্রশাসিত ছককে সর্বজনীন বলবার বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, একটি ব্যক্তির সীমিত আয়ু-ষ্কালের মধ্যে এই চতুষ্পর্বা সাধনাকে সিদ্ধির কোঠায় উত্তীর্ণ করা সবার পক্ষে সম্ভব কিনা সন্দেহ। তার জবাবে বলতে হল : মোক্ষপর্বই মানুষের পরম পুরুষার্থ। এই পর্বে পৌঁছতে গিয়ে সকল ঘাঁটিই সে পেরিয়ে আসে জন্ম-জন্মান্তরের দীর্ঘ পরম্পরার ভিতর দিয়ে।...প্রাচীন ভারতের এই সমন্বয়ের আদর্শে ছিল আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা, পরিপ্রেক্ষিতের ঔদার্য, একটা সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য ও পূর্ণতার পরিকল্পনা। তার ফলে মানুষের জীবন-তন্ত্রীও উঁচু ঘাটে বাঁধা হয়েছিল। কিন্তু এ-ব্যবস্থা শেষপর্যন্ত জখম হল বৈরাগ্যসাধনার মাত্রাছাড়া ঝোঁকে। তাতে সমাজব্যবস্থার সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেল, জীবনের অংগনে দেখা দিল প্রবৃত্তিমুখী আর নিবৃত্তিমুখী আদর্শের তুমুল দ্বন্দ্ব। সমাজের একদিকে রইল প্রবৃত্তি ও কামনায় ক্ষুব্ধ গৃহস্থের প্রাকৃত জীবন—শীল ও ধর্মের গৈরিক আভাসে রাঙানো। আরেকদিকে দেখা দিল সন্ন্যাসীর অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত অন্তর্মুখী জীবন—ইহবিমুখ বৈরাগ্য যার ভিত্তি। বিরোধের বীজ কিন্তু সমন্বয়ের প্রাচীন কল্পনাতেই নিহিত ছিল।

তার আদর্শানুসারে জীবনের মুখ ফেরানো থাকবে বৈরাগ্যের দিকে। অতএব কালক্রমে বৈরাগ্যের সুর এদেশে যে চড়া হয়ে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? জীবন হতে মহাভিনিষ্ক্রমণকে যদি পরমপুরুষার্থ করি, সার্থক জীবনের কোনও উন্নত ও উদার কল্পনা যদি চিত্তকে উদ্বুদ্ধ না করে, জীবনের মর্মমূলে যদি পরমদেবতার আর-কোনও কল্যাণময় ইঙ্গিত খুঁজে না পাই, তাহলে মানুষের বুদ্ধি ও সঙ্কল্পের দুর্দম আবেগ জীবনকে বর্জন করে মোক্ষের সংক্ষিপ্ত রাস্তাটাই তো খুঁজে বার করবে—কেন সে মিছিমিছি ভবচক্রের গোলকধাঁধায় ঘুরতে যাবে? আর মোক্ষের পাকদণ্ডিটা যদি নিতান্তই তার পক্ষে দুরারোহ হয়, তাহলে অহংবিমুক্তির আশা ছেড়ে অহংএরই ষোড়শোপচার পূজায় সে লেগে যাবে—জানবে এর চেয়ে বড় আর-কোনও পুরুষার্থই তার নাই! এমনি করে সংসারে আর সন্ন্যাসে, মৃন্ময়ে আর চিন্ময়ে জীবন দুভাগ হয়ে পড়ে। তখন উল্লম্ফন ছাড়া দুয়ের ব্যবধান পার হবার আর উপায় থাকে না। তাইতে মনুষ্যপ্রকৃতির দুটি বিভাবের মধ্যে সৌষম্য কি সমন্বয় ঘটাবার কল্পনা ব্যর্থ হয়।

যদি জানি : নিখিল বিশ্ব এক চিন্ময় ঊর্ধ্বপরিণামের অভিযাত্রী, জন্ম হতে জন্মান্তরে আধারে উন্মিষিত হচ্ছে পরমপুরুষের অমৃত জ্যোতির শতদল। এই দল-মেলার আয়োজনে মানুষ তাঁর মুখ্য সাধন, মনুষ্যজীবনেরই শিরোবিন্দুতে দেখা দেয় উত্তরায়ণের মহাসংক্রান্তি।—তাহলেই সাংসারজীবনের সঙ্গে অধ্যাত্মজীবনের সুষম সমন্বয়ের ছন্দটি আমরা খুঁজে পাব। কারণ, এই উদার দৃষ্টিতে মনুষ্য-প্রকৃতির সমগ্ররূপটি আমাদের কাছে ধরা পড়বে। ভূলোক দ্যুলোক আর লোকোত্তরের প্রতি যে তার অন্তরের ত্রিস্রোতা আকর্ষণ, তার যথাযথ মর্যাদা দেওয়াও তখন সম্ভব হবে। কিন্তু এই তিনটি আকর্ষণের মাঝে যে-অন্যোন্যবিরোধ রয়েছে, তার সম্যক সমাধান হতে পারে শুধু এই কথাটি জেনে যে : দেহ-প্রাণ-মনকে আশ্রয় করে চেতনার যে অবর-ত্রিপুটী রয়েছে, তার চরম সার্থকতা তখনই ঘটবে—যখন চিন্ময় উত্তরজ্যোতির বীর্যে ও আনন্দে আপ্লুত এবং রূপান্তরিত হয়ে সে নতুন ভঙ্গিতে দেখা দেবে। এই উত্তরজ্যোতি প্রকৃতির অবর-ছন্দকে যদি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে কিন্তু তার স্বভাবের ঋতম্ভরা প্রেতি সার্থক হয় না। তার সত্যধর্ম হল অপরা প্রকৃতির ঈশ্বর হয়ে তাকে উপর দিকে টেনে তোলা, ন্যূনতার আপূরণ করে তার গোত্রান্তর এবং রূপান্তর ঘটানো—এককথায় অন্নময় প্রাণময় আর মনোময় প্রকৃতিকে চিন্ময় এবং অতিমানস করে তোলা। ঐহিক-দর্শনের দাবি আজ মানুষের মনে প্রবল হয়েছে; মানুষকে, পার্থিব জীবনকে, সমষ্টিমানবের উজ্জ্বল ভবিষ্যের প্রত্যাশাকে সে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে—জীবনসমস্যার সমগ্র সমাধান সম্পর্কে তার জিজ্ঞাসাকে নিরন্তর উদ্যত রেখেছে। ঐহিক-

দর্শন এইটুকু উপকার আমাদের করেছে। কিন্তু ঐকান্তিক অভিনিবেশের আতিশয্যে মানুষের অধিকারকেও সে খর্ব করেছে—জীবনের অন্তর্গূঢ় সর্বোত্তম ও উদারতম সম্ভাবনার প্রতি তার দৃষ্টিকে অন্ধ করেছে, আর এই ন্যূনতাতে নিজেও সে লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে। মানুষের মধ্যে এবং বিশ্বপ্রকৃতিতে মনই যদি চরমতত্ত্ব হত, তাহলে হয়তো তার এ-পরাভব ঘটত না। তবু তার অধিকার সঙ্কুচিত হত, ভবিতব্য সংকীর্ণ হত, অনাগতের দিগ্বলয়ে সুদূরের হাতছানি থাকত না। কিন্তু মন যদি চেতনার আংশিক উন্মীলনমাত্র হয়, তাকে ছাড়িয়েও যদি মানুষের সাধ্যায়ত্ত বৃহত্তর কোনও শক্তির সঞ্চয় থাকে বিশ্বপ্রকৃতির ভাণ্ডারে, তাহলে ওপারের কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের এপারের সিদ্ধিই যে ওই অন্তর্গূঢ় শক্তির উন্মীলনের 'পরে নির্ভর করবে, তাতে কি সন্দেহ আছে কারও? তখন গূঢ় শক্তির উন্মেষই কি আমাদের ঊর্ধ্বায়নের একমাত্র পথ হবে না?

বৃহৎ চেতনার বৈপুল্যের দিকে নিজেকে উন্মীলিত না করলে প্রাণ ও মনের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য কখনই ফুটতে পারে না। উপনিষদের ভাষায়, মন এই বৃহৎ জ্যোতির দ্বারপাল মাত্র। এ-জ্যোতি চিৎস্বরূপের আত্মজ্যোতি। এ শুধু সর্বোত্তর নয়, সর্বাবগাহীও বটে। বৃহতের চেতনা ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়—ছাড়িয়ে গেছে বিশ্বকেও। তাই সে প্রাণ ও মনকে গ্রাস করে আপন জ্যোতির্মণ্ডলে তুলে নিতে পারে, তাদের সর্ববিধ এষণার সত্য ও চরম সার্থকতা ঘটাতে পারে। কারণ এই দিব্যচেতনাতেই আছে বিজ্ঞানের অলৌকিক দিব্য-সামর্থ্য, আছে অকুণ্ঠ বীর্য ও সংকল্পের চির উৎস, আছে প্রীতি রতি ও কান্তির অফুরন্ত প্রসর ও অতল গহনতা। আমাদের দেহ প্রাণ ও মন জ্ঞান বীর্য ও আনন্দের নির্বারিত প্লাবনের জন্য বুভুক্ষিত হয়ে আছে। বৈরাগ্যের প্রলয়মন্ত্রসাধনায় তাথেকে তাদের বঞ্চিত করা—সে তো হবে তাদের আত্মভাবের পূর্ণতম ঐশ্বর্যকে কার্পণ্যোপহত করা। অধ্যাত্মচেতনার অদ্বিতীয় অবর্ণ শুভ্রতার প্রতি যার ঐকান্তিক আগ্রহ, চিদাত্মার সিসৃক্ষাকে সে কুণ্ঠিত করতে চায়—এই আধারে উপচীয়মান দেবতার বর্ণবিভূতির প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে সে পরাঙ্‌মুখ করে। এই সর্বনাশা দর্শনের কাছে প্রকৃতির পরিণাম অর্থহীন ও লক্ষ্যশূন্য—কেননা আজ পর্যন্ত প্রকৃতিতে যা-কিছু ফুটেছে তার মূলোৎপাটন করাই তো তার পরম পুরুষার্থ। তাই তার কাছে আমাদের জীবনায়ন শুধু উদ্‌ভ্রান্ত লক্ষ্যহীনতায় অবিদ্যার গহনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনও উপায়ে বেরিয়ে আসা, অথবা অর্থহীন বিশ্বসম্ভূতির ঘূর্ণিচক্রে জড়িয়ে গিয়ে আবার তাহতে ছিটকে পড়া।...এর মধ্যে লোকৈষণা এসে আরও গোল বাধায়। লোকৈষণা হল অন্তরিক্ষচারী। তাই লোকোত্তর ভূমিতে সত্তার পূর্ণসিদ্ধিকে সে যেমন ব্যাহত করে অদ্বৈতোপলব্ধির পরমপ্রত্যয়কে কুণ্ঠিত ক'রে, তেমনি

প্রাকৃতভূমিতেও তাকে খর্ব করে—জড়বিশ্বে চিৎসত্তার অন্তর্ভাব এবং আত্মার স্থূলশরীর গ্রহণের গভীর তাৎপর্যের প্রতি আমাদের বোধশক্তিকে যথাযথ জাগ্রত না ক'রে। কিন্তু অখণ্ড একাত্মপ্রত্যয়ের উদার উন্মেষে আবার আমরা সাম্যের হারানো সুর ফিরে পাই। তার জ্যোতিতে আত্মসত্তার সমগ্র সত্য আমাদের চেতনায় ঝলমল হয়ে ওঠে—এক অবিচ্ছেদ সম্বন্ধের সূত্রে গাঁথা পড়ে বিশ্বপ্রকৃতির সকল পর্ব।

এই অখণ্ড সম্যক্-দর্শনে বিশ্বোত্তীর্ণ ব্রহ্মতত্ত্বকে আমরা পরমার্থসৎ বলে জানি। তাঁর উপলব্ধিতে আমাদের চেতনার পরম স্ফূর্তি। কিন্তু বিশ্বোত্তীর্ণ তত্ত্ব হতে আবার বিশ্বভাব বিশ্বচেতনা বিশ্বক্রতু ও বিশ্বপ্রাণের বিকিরণ। সে-বিকিরণ তাঁরই পরিমণ্ডলে—তাঁর বাইরে নয়, তাঁর আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-উন্মীলনের বিলাসরূপে—আত্মবিরোধী তত্ত্বরূপে নয়। অতএব বিশ্বোত্তীর্ণের বিশ্বভাব একটা অর্থহীন খেয়াল বা বিভ্রম কি আকস্মিক প্রমাদ নয়। এর মধ্যে আছে এক চিন্ময় সত্যের গভীর ব্যঞ্জনা। চিৎস্বরূপের বিচিত্র আত্মবিভাবনা এর অপ্রাকৃত তাৎপর্য—দিব্য-পুরুষ নিজেই তাঁর আত্ম-রহস্যের কুঞ্চিকা। চিৎস্বরূপের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি আমাদের মর্ত্যজীবনের লক্ষ্য। কিন্তু পরমার্থসতের চেতনা অন্তরে স্ফুরিত না হলে এ-লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব নয়, কেননা সেই পরমের বিদ্যুন্ময় স্পর্শেই তো আমাদেরও আধারে শিউরে উঠবে পরা গতির চেতনা। আবার বিশ্বতত্ত্বকে বাদ দিয়ে কি এই আত্ম-উন্মীলন সম্ভব হবে? আমাদেরও যে বিশ্বময় ছড়াতে হবে, কেননা বিশ্বভাবে অনুপ্রবিষ্ট না হলে আমাদের জীবভাবও যে অসম্পূর্ণ থাকবে। সর্বের ভাব হতে নিজেকে বিযুক্ত করে জীব যখন অনুত্তরে পৌঁছতে চায়, তখন পরা সংবিতের উত্তুঙ্গ শিখরে তার আত্মসংবিৎ হারিয়ে যায়। কিন্তু সর্বসংবিৎকে আত্মসংবিতে ধারণ করলে নিজেকে যেমন সে পুরা-পুরি ফিরে পায়, তেমনি অনুত্তরের স্পর্শমণির ছোঁয়াকেও বাঁচিয়ে রাখে। অনুত্তর এবং আত্মার প্রত্যয়কে সে তখন আপূরিত করে বিশ্বভাবের পূর্ণতায়। অতএব বিশ্বোত্তর, বিশ্ব এবং ব্যষ্টির অদ্বৈত উপলব্ধিই হল চিৎস্বরূপের পরিপূর্ণ আত্মস্ফুরণের অপরিহার্য সাধন। কারণ বিশ্ব যেমন চিৎস্বরূপের সমগ্র আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র, তেমনি ব্যষ্টির ভিতর দিয়েই এই বিশ্বে তাঁর কলায়-কলায় আত্ম-উন্মীলনের পরম ছন্দ স্ফুরিত হয়। কিন্তু তাহলে জীব পরম-শিবের অংশ হয়েও নিত্য এবং সত্য। শুধু তা-ই নয়, অন্তরের নিগূঢ় যোগে বিশ্ব এবং বিশ্বোত্তরের সঙ্গে তাদাত্ম্যভাবনাতেও সে যোগযুক্ত। তাই আত্ম-ভাবের অখণ্ড স্বরূপোপলব্ধিতে ব্যষ্টিজীব যেমন বিশ্বাত্মক হবে, তেমনি হবে বিশ্বোত্তীর্ণও।

আবার পৃথিবী ছাড়া আরও-যে লোক আছে, এও সত্য। আমরা যে

শুধু জড়ের ভূমিতে আবদ্ধ রয়েছি, তা নয়। জড় ছাড়া চেতনার আরও-সব ভূমি আছে। আমাদের সঙ্গে তাদের নিগূঢ় যোগ আছে এবং ইচ্ছা করলে সেসব ভূমিতে আমরা পৌঁছতেও পারি। এই আধারেই খোলা রয়েছে লোকোত্তর জ্যোতির দুয়ার—অথচ আমরা তার সন্ধান জানি না, দুয়ার ঠেলে ওপার হতে এই আধারে দ্যুলোকের ঋতম্ভরা দ্যুতি ফুটিয়ে তুলতে পারি না। এতে কি আমাদের অখণ্ড সত্তার মহিমাকে খর্ব এবং খণ্ডিত করা হয় না?...কিন্তু উত্তরচেতনার দিব্যধামই যে সিদ্ধজীবের একমাত্র স্বধাম, তা নয়। অথবা কোনও অপরিণামী নিত্যলোকেই যে বিশ্বে চিৎস্বরূপের আত্মবিভাবনার চরম বা সমগ্র অর্থটি মূর্ত হয়ে উঠেছে, তাও নয়। এই জড়বিশ্ব, এই মাটির পৃথিবী, এই মানুষের জীবন—এও তাঁর আত্মবিভাবনার অঙ্গীভূত, এরও অন্তরে গোপন রয়েছে দিব্যসম্ভূতির অমর মহিমা। সে-সম্ভূতির ছন্দ পরিণামের ছন্দ এবং তার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত লোকের অমূর্ত সম্ভাবনা মূর্ত হবার প্রতীক্ষায় নিহিত রয়েছে। অতএব মর্ত্যজীবন অসার দুঃখহত অদিব্যভাবের পঙ্ককুণ্ডে আত্মার নিমজ্জন নয়; অথবা লোকোত্তর মহাশক্তির সৃষ্ট এই দুঃখনাট্যের সে-ই যে নির্মম দর্শক, কিংবা বিশ্বশক্তির দুর্বোধ বিধানে শরীরী জীবের দুঃখভোগ ও দুঃখ-পরিহারের সাধনাই যে জীবনের তাৎপর্য, তাও নয়। এ-জীবন চিৎস্বরূপেরই দলে-দলে আপনাকে উন্মীলিত করবার রঙ্গভূমি। চিন্ময় দীপ্তি বীর্য ও আনন্দের পরম ঐশ্বর্যের দিকে তাঁর অভিযান, কিন্তু চিন্ময় আত্মপরিণামের বহুমুখী বৈচিত্র্যকেও তার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ফুটিয়ে চলেছেন। পার্থিব-সৃষ্টির অন্তরে এক সর্বদর্শী আকূতি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আমরা যেখানে দেখছি বিরোধ ও জটিলতার জঞ্জাল, তারও অন্তরালে এক দিব্য পরিকল্পনা রূপ ধরেছে বহু-বিচিত্র সিদ্ধির অবন্ধন উল্লাসে। এই বহুভাবনার ঐশ্বর্যকে স্ফুরিত করাই জীবাত্মার অভ্যুদয় এবং প্রকৃতির তপস্যার লক্ষ্য।

ভূলোকেরও ওপারে উত্তরচেতনার দিব্যধামে জীব আরূঢ় হতে পারে একথা যেমন সত্য, তেমনি উত্তরলোকের দিব্যশক্তি ও বৃহত্তর চেতনার বিপুল বীর্য এই মর্ত্যভূমিতে যে একদিন রূপায়িত হবে—এ-সম্ভাবনাও সমান সত্য। চিৎশক্তির এমনিতর মর্ত্যে অবতরণের জন্যই তো আত্মার শরীরগ্রহণ। পরাসংবিতের নিত্যবিভূতিরূপে চেতনার উত্তরভূমিসমূহ যেমন সত্য, তেমনি তাঁর পরিণামবিভূতিরূপে এই পার্থিবচেতনার ভূমিও সত্য। আমাদের পার্থিবসত্তা সম্ভূত হয়েছে পরমসত্তার ওই লোকোত্তর বীর্যকে আপন আধারে ধারণ করবে বলে। আজ তার খণ্ডিত ছন্ন রূপ দেখছি। কিন্তু তার এই আদিপর্বকেই চরম ভাবা, মনুষ্যত্বের পঙ্গু প্রকাশকেই প্রকৃতি-পরিণামের অন্তিম অধ্যায় মনে করা—এ কি কেবল আমাদের দিব্যসম্ভূতির

অবন্ধ্য ক্রতুকে অস্বীকার করা নয়? মানুষের জীবনকে এত ক্ষুদ্র করে দেখলে তো চলবে না—তার অর্থকে দেখতে হবে আরও বৃহৎ করে, আধারের অন্তর্গূঢ় ঐশ্বর্যের বিপুল সম্ভাবনাকে তার মধ্যে রূপায়িত করতে হবে। অমরত্বের মহিমাতেই আমাদের মরধর্ম সার্থক হয়েছে। দ্যুলোকের দিকে হিরণ্যবক্ষকে উন্মীলিত করেই ভূলোক পাবে দিব্যজ্ঞান ও দিব্যভাবনার অখণ্ড অধিকার। জীবও আত্মস্বরূপের সম্যক্ পরিচয় এবং আপন জগতের 'পরে দিব্য ঈশনার অধিকার পাবে, যখন উত্তরচেতনার দিব্যধামে আরূঢ় হয়ে সে অনুত্তর জ্যোতির পরম অনুভবে এবং শাশ্বত দিব্য-পুরুষের সত্তা ও বীর্যের আবেশে জারিত হবে।

পৃথিবীতে আমরা যে এসেছি এবং আছি, জীবপ্রকৃতির চিন্ময়পরিণাম তার চরম তাৎপর্য না হলে এমনিতর অভঙ্গসমাহারের সিদ্ধি অসম্ভব হয়। জড়ের মধ্যে যে প্রাণ মন ও চিৎসত্ত্বের ক্রমিক আবির্ভাব ঘটল, তাইতে প্রমাণ হয়, চিৎশক্তির সমস্ত বিভূতির অভঙ্গসমাহার অর্থাৎ জড়ের অন্তর্নিহিত চিদাত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশই জড়লীলার চরম অভিপ্রায়। তাই, চিৎসত্তার পরিপূর্ণ আত্ম-সংবৃত্তি এবং পরিণামের পর্বে-পর্বে তার আত্ম-বিবৃত্তি—এই দুটি অয়ন আমাদের জড়াশ্রিত জীবনে সম্মিলিত হয়েছে। সত্তার প্রকাশ যেমন ঘটতে পারে নিরাবরণ নিত্যস্বরূপের অকুণ্ঠ জ্যোতিতে, তেমনি স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃপূর্ণ নিত্যবিভূতির অন্তহীন বৈচিত্র্যে সে দল মেলতেও পারে। ঊর্ধ্বলোকে সম্ভূতির এই শেষের ধারা দেখা দেয়। সেখানে বিসৃষ্টির পর্বে-পর্বে নিত্যসিদ্ধ বৈভবের শাশ্বত পূর্ণপ্রকাশ—এখানকার মত কালিক পরিণামের ছন্দোদোলা সেখানে নাই। প্রত্যেকটি বিভূতি সেখানে স্বয়ংপূর্ণ হলেও সে-পূর্ণতাকে ঘিরে আছে একটি বিশিষ্ট জগদ্ভাবের দিগ্বন্ধনমন্ত্র। কিন্তু এছাড়াও আত্মপ্রকাশের আরেকটি ছন্দ আছে, যা আত্ম-এষণাতে ব্যক্ত হয়। আপনাকে নিগূহিত করে আবার আপনাকে খুঁজে পাবার তপস্যা—এমনিতর কালতরঙ্গিত অবসর্পণ ও উৎসর্পণেও তাঁর আত্মরূপায়ণের লীলা চলতে পারে। এই বিশ্বে সেই লীলাই দেখছি—যার আদিপর্বে আছে চেতনার সংবৃত্তি অথবা মৃৎএর গহনে চিৎএর আত্মনিগূহন।

অচিতির অন্ধতমিস্রায় চিৎএর আত্মসংবৃত্তি, এই হল কালকলনাময় সম্ভূতির আদ্যলীলা। আর তার মধ্যলীলায় দেখা দিল অবিদ্যার পরিবেশে চিতিশক্তির ঊর্ধ্বপরিণাম, যার মধ্যে বিজ্ঞানের অর্ধস্ফুট কোরক আপন পূর্ণসুষমার সম্ভাবনাকে খুঁজে ফিরছে। সেই এষণাই আমাদের প্রকৃতিতে নানা বিরুদ্ধবৃত্তির সংঘাত ঘনিয়ে তুলছে। এখনও যে আমরা অপূর্ণ, কলায়-কলায় ফুটতে পেয়েও এখনও যে আমরা পূর্ণিমার কূলে পৌঁছইনি, আজও যে পথের সন্ধানে ব্যাকুল পথিকের দিন কেটে যায়—তাইতে প্রমাণ

হয়, এখনও সংক্রান্তিযুগের গণ্ডিকে আমরা পার হয়ে যেতে পারিনি। এই এষণার চরম পর্বে, সম্ভূতির অন্ত্যলীলায় দেখা দেবে চিৎস্বরূপের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসংবিতের বিদ্যুন্ময় ঝলক—তাঁর দিব্যভাব ও দিব্যচেতনার স্বরূপবীর্য। ...বিশ্বপ্রাণের মধ্যে চিৎস্বরূপের ক্রমিক আত্মরূপায়ণের এই তিনটি পর্ব। তার মধ্যে আজ-পর্যন্ত দেখা দিয়েছে দুটি পর্বের আবর্তন। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এরও পরে আরেকটা চরম পর্বের উদয়ন বুঝি অসম্ভব। কিন্তু যুক্তিবুদ্ধি বলে, দুটি পর্বের উত্তরকাণ্ডরূপে চরম পর্বের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। কারণ, অচিতি হতে চেতনার উন্মেষ যদি সম্ভব হয়, তাহলে অংশত-ব্যক্ত চেতনার পূর্ণ অভিব্যক্তিই-বা সম্ভব হবে না কেন? পার্থিব-প্রকৃতির বুকে জ্বলছে সাধনসিদ্ধ দিব্য-জীবনের উৎশিখ অভীপ্সা এবং এই অভীপ্সাই বহন করছে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে পরমপুরুষের দিব্যক্রতুর দ্যোতনা। অবশ্য সাধকের আরও অভীপ্সা আছে এবং তাদের সাধনাও সিদ্ধির কূলে পৌঁছয়। কেউ চায় প্রপঞ্চোপশম প্রশান্তিতে অথবা নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মার প্রলয়, কেউ-বা চায় শাশ্বত সামীপ্যের আনন্দে আত্মহারা হতে। তাদের আকূতিও পূর্ণ হয়—কেননা অনন্তস্বরূপের বৈভবও যে অনন্ত, অতএব আত্মভাবের বহুধা রূপায়ণে তিনি তো নিঃশেষিত হন না। কিন্তু মর্ত্যের বুকে তাঁর সম্ভূতিলীলার যে-পসরা মেলা আছে, তার অনাদি আকূতি ওই প্রলয় বা নিষ্ক্রমণের সিদ্ধিতে কখনও সার্থক হয় না—কেননা তাহলে বিশ্ব জুড়ে এই দীর্ঘপর্বা প্রকৃতিপরিণামের কী প্রয়োজন ছিল? এ-জগৎ যদি জীবের উত্তরায়ণের আয়তন হয়, তাহলে সে-অভিযানের সিদ্ধিও ঘটবে এইখানে। তখন অনবদ্য সম্ভূতিলীলায় স্বয়ম্ভূসতের আত্মবিচ্ছুরণকে বলব বিশ্বকমলের এমনিতর দল-মেলার একমাত্র নিগূঢ় তাৎপর্য।

সপ্তদশ অধ্যায়

বিদ্যার পথে—জীব জগৎ ও ঈশ্বর

তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।৮।৭

তুমি হচ্ছ তা-ই, শ্বেতকেতু।

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ (৬।৮।৭)

ব্রহ্মৈব জীবঃ সকলং জগচ্চ।

বিবেকচূড়ামণি ৪৭৯

জীব ব্রহ্মই—সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম।

—বিবেকচূড়ামণি (৪৭৯)

প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং...যয়েদং ধার্যতে জগৎ।
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।

গীতা ৭।৫,৬

আমার পরা প্রকৃতিই হয়েছে জীব এবং সেই প্রকৃতি ধরে আছে এই জগৎ।... সে-ই সর্বভূতের যোনি।

—গীতা (৭।৫,৬)

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী, ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি...
নীলঃ পতংগো হরিতো লোহিতাক্ষঃ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।৩,৪

তুমিই পুরুষ, তুমিই স্ত্রী—তুমিই কুমার অথবা কুমারী; জরাজীর্ণ হয়ে লাঠি ভর দিয়ে চল বাঁকা হয়ে; নীল পাখি, সবুজ পাখি, লালচোখের পাখি—সে তো তুমিই।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৪।৩,৪)

তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।১০

তাঁরই অবয়ব যারা, তারাই ছেয়ে আছে এই নিখিল জগৎ।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৪।১০)

ব্রাহ্মী সত্তাই বিশ্বের অদ্বিতীয় চিন্ময় তত্ত্ব। 'সেই চিৎস্বরূপ জড়ের আপাত-অচিতির গহনে অন্তর্নিগূহিত হয়ে আছেন। তাঁর এই বীজভাব হতেই দেখা দিয়েছে বিশ্বপরিণামের অঙ্কুর। ব্রহ্ম স্বরূপত শাশ্বত সৎ চিৎ এবং আনন্দ। অতএব পরিণম্যমান বিশ্বেও তাঁর সৎ-চিৎ-আনন্দের দিব্য স্বভাব স্ফুরিত হবে। কিন্তু প্রথম হতেই তাঁর স্বরূপসত্যের বা সমগ্রসত্যের স্ফুরণ ঘটবে না। পরিণামের পর্বে-পর্বে দেখা দেবে কখনও তাঁর প্রকট কখনও-বা ছন্ন রূপ। অচিতির অব্যক্ত হতে অচিৎশক্তির প্রবর্তনায় পরিণামের আদিপর্বে ব্রহ্মের সদ্‌ভাব জড়-ধাতু হয়ে ফুটল। যে-চেতনা তার আড়ালে প্রচ্ছন্ন ও সংবৃত্ত হয়ে ছিল, তার প্রথম ছন্মরূপকে ফুটতে দেখলাম প্রাণের

কম্পনে—সে জীবন্ত কিন্তু অবচেতন। তারপর দেখা দিল চেতনপ্রাণের কুণ্ঠিত রূপায়ণে জড়বিগ্রহের পরম্পরায় ওই প্রাণেরই নিজেকে পাবার তপস্যা—যার মধ্যে একে-একে বিকসিত হল তার পূর্ণতর আত্মপ্রকাশের নৈসর্গিক ছন্দ। প্রাণের লীলায়নে চেতনা অন্নময় নিষ্প্রাণ অচিতির আদিম অসাড়তাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে—আপনাকে প্রকাশ করতে চাইছে আত্মরূপায়ণের স্ফুটতর মহিমায়। তার এই তপস্যার অপরিহার্য পরিণতি দেখা দিল অবিদ্যাতে। অবিদ্যার সূচনাতে পাই মনোময় প্রত্যক্ষের সম্মুগ্ধপ্রত্যয়ের সঙ্গে জড়িয়ে বিষয় ও বিষয়ীর একটা প্রাণময় সংবিৎ মাত্র। গোড়ার দিকে এই প্রাণজপ্রত্যক্ষ জড় ও অপর প্রাণের অভিঘাতে উদ্বুদ্ধ একটা অন্তঃসংজ্ঞা বা আন্তর সংবেদনকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। সংজ্ঞার এই কার্পণ্যের ভিতর দিয়ে চেতনা তার আত্ম-সত্তার নিরূঢ় আনন্দরূপটি যথাসাধ্য ফুটিয়ে তুলতে চায়। কিন্তু তার সে-প্রয়াস পর্যবসিত হয় শুধু সুখ ও দুঃখের দ্বন্দ্ববিধুর বেদনায়। অবশেষে মানুষের আধারে চেতনার এই তপস্যা মনের রূপ ধরে—তাতে বিষয় ও বিষয়ীর সংবিৎ আরও স্পষ্ট হয়। কিন্তু তাতে চেতনার ষোড়শকল সামর্থ্যের একটি কলামাত্র ফোটে। সে যেন চিদাকাশে সম্ভাবিত জ্যোতির্মহিমার প্রথম রশ্মি-রেখা। এই অরুণোদয় মধ্যাহ্নতপনের দ্যুতিতে স্ফুরিত হবে—এই তো প্রকৃতিপরিণামের চরম কথা।

মানুষ বিশ্বে আপন দখল পাকা করতে চায়—এই তার সাধনার আদি-কাণ্ড। কিন্তু তার উত্তরকাণ্ড হল নিজেকে ফুটিয়ে তুলে অবশেষে নিজেকেও ছাড়িয়ে যাওয়া। তার খণ্ডিত সত্তাকে বৃহতের পরিপূর্ণ সত্তায় আপূরিত করতে হবে, খণ্ডচেতনাকে রূপান্তরিত করতে হবে সম্যক্-চেতনায়। প্রকৃতিকে সে জয় করবে বটে; কিন্তু সমগ্র বিশ্বকে একত্বের সুরসুষমায় গাঁথতে হবে —এও তো তার দায়। শুধু ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটালেই চলবে না, সমগ্র বিশ্বে সেই ব্যক্তিত্বকে ব্যাপ্ত করে বিশ্বাত্মার অনুভব পেতে হবে, বৈশ্বানরের চিন্ময় আনন্দে উল্লসিত হতে হবে। তার চিত্তে যা-কিছু অস্পষ্ট অজ্ঞান ও প্রমাদ-গ্রস্ত, তাকে পরিমার্জিত পরিশুদ্ধ ও রূপান্তরিত করে উত্তীর্ণ হতে হবে জ্ঞান কর্ম সংকল্প বেদনা ও চারিত্রের জ্যোতির্ময় বৃহৎসামের পরম ঔদার্যে। তার প্রকৃতি এই লোকোত্তর সিদ্ধির আকূতিই বহন করছে—মহাশক্তি এই আদর্শে তার বুদ্ধিকে অনুপ্রাণিত করেছে, তার প্রাণ ও মনের নাড়ীতে-নাড়ীতে ঢেলে দিয়েছে এই এষণার বৈদ্যুতী। কিন্তু সিদ্ধি আসবে তার সত্তা ও চেতনার প্রসারে। আপনাকে তার বৃহৎ ও সার্থক করতে হবে—বহিশ্চর প্রকৃতির আপাতপ্রবৃত্তির সাময়িক সঙ্কোচ হতে নিজেকে নির্মুক্ত ক'রে চেতনায় জাগাতে হবে তারই গুহাচর চিদাত্মার জ্যোতির্বিশাল মহিমা। যা-কিছু তার মধ্যে সংবৃত্ত হয়ে আছে, তাকে বিবৃত্ত ও বিস্ফারিত করতে হবে আত্মপরিণামের

কলায়-কলায়—এই তার বিসৃষ্টির তাৎপর্য। এই প্রত্যাশা আছে বলেই প্রকৃতিতে মানুষের আবির্ভাবের একটা গভীর সার্থকতা রয়েছে। আজ বাইরে থেকে দেখছি, মানুষ যেন অস্তিত্বের পটে ক্ষণিকার লেখা মাত্র—স্থূল দেহের কারাগারে সঙ্কীর্ণ চিত্তের শৃঙ্খলে সে বন্দী। কিন্তু এই মানুষকেই খুঁজে বার করতে হবে তার অন্তরের সত্য মানুষটি—বৈশ্বানর পুরুষরূপে যিনি নিজের ও নিজস্ব পরিবেশের ঈশ্বর। দার্শনিকের পরিভাষা বর্জন করে আরও স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি : মাটির মানুষকে চিন্ময় মানুষ হয়ে ফুটতে হবে, মৃত্যুর সন্তানকে হতে হবে 'অমৃতস্য পুত্রঃ'—এই তার দিব্য নিয়তি। এইজন্যেই বলেছিলাম, মানুষের আবির্ভাব প্রকৃতিপরিণামের যেন একটা বর্তনি। এইখান থেকেই পার্থিবপ্রকৃতি দিব্যপ্রকৃতির দিকে মোড় নিয়েছে।

তাইতে বুঝি, এই অপার্থিব সিদ্ধির অনুকূল যে-জ্ঞানযোগ, সে কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বের সঞ্চয় নয়। আত্মা ও জগৎ সম্পর্কে খাঁটি খবর সংগ্রহ করে একটা খাঁটি মত-বিশ্বাস খাড়া করতে পারলেই সব হল না। বহিশ্চর মন অবশ্য জ্ঞান বলতে তা-ই বোঝে। ব্রহ্ম জীব ও জগৎ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলাতে বুদ্ধির জিজ্ঞাসা তৃপ্ত হতে পারে। কিন্তু তাতে আত্মার পিপাসা মেটে না—কেননা এমনতর পরোক্ষজ্ঞানে তো আমরা আনন্ত্যের চিন্ময় তনয় হব না। প্রাচীন ঋষিরা জ্ঞান বলতে বুঝতেন আত্মায় পরমার্থের অপরোক্ষ-অনুভবে চেতনার রূপান্তর। 'ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্ম এব ভবতি' : পরাৎপরকে জেনে পরাৎপর হওয়া—এই তো জ্ঞানের লক্ষণ। এইজন্যেই ব্যাবহারিক জীবন ও কর্মকে শুধু সত্য ও ঋতের বুদ্ধিকল্পিত সংস্কার অনুযায়ী কিংবা সার্থক সাংসারিক বুদ্ধির হুকুমে পরিচালিত করা, অথবা শীলপালন ও প্রাণবাসনার তৃপ্তিসাধন করা কখনও আমাদের চরম পুরুষার্থ হতে পারে না। আমাদের লক্ষ্য হবে আত্মসত্তার চিন্ময় মর্মসত্যে অবগাহন করা—অখণ্ড সচ্চিদানন্দের শাশ্বত পরমস্বভাবে উত্তীর্ণ হওয়া।

ওই পরমসত্তাই আমাদের সমগ্র সত্তার প্রতিষ্ঠা এবং আয়তন—এই আধারে তাঁরই উন্মেষ চলছে তিলে-তিলে। তাঁর সত্তায় আমাদের সত্তা, তাঁর চেতনায় আমাদের চেতনা, তাঁর চিন্ময়ী শক্তিতে আমাদের শক্তি—তাঁরি আনন্দ উপচে পড়ছে আমাদের সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দপ্রবেগে, আমাদের শক্তি ও চেতনার উল্লাসে : এই হল আমাদের জীবনের মর্মকথা। কিন্তু এই সৎ-চিৎ-আনন্দ-শক্তি আরেক ছন্দে বাইরে ফোটে—অবিদ্যার লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত হয়ে। আমাদের অহন্তা সেই চিন্ময় পুরুষ নয়—দিব্য-পুরুষের দিকে তাকিয়ে যে বলতে পারে 'সোঽহমস্মি!' আমাদের চিত্ত ব্রাহ্মী চেতনা নয়, সঙ্কল্প তাঁর চিৎশক্তির মুক্তধারা নয়। আমাদের সুখে-দুঃখে—এমন-কি হর্ষ ও উল্লাসের চরম কোটিতেও তাঁর অমেয় আনন্দের উপমা নাই। ব্যাবহারিক জীবনে এখন

পর্যন্ত আমাদের অহন্তাই আত্মস্বরূপের ভান করছে—আমাদের অবিদ্যায় চলছে বিদ্যার এষণা, সঙ্কল্প খুঁজছে সত্যভাবনার নিরঙ্কুশ সংবেগ, কামনা ফিরছে সদানন্দের সন্ধানে। আত্মার স্বরূপ না জেনেও তার পরিচিতিতে যে অর্ধচ্ছন্ন ভাবকের মন্ত্রবর্ণ মুখর হয়ে উঠেছিল, তার প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি—'নিজেকে ছাড়িয়ে গিয়েই নিজেকে পাওয়া' এই তো আমাদের জীবনের নিয়তিকৃত কৃচ্ছ্র তপস্যা। এমনি করে আত্মাহুতির কঠিন দায়কে আমরা বহন করে চলেছি দূরদর্শ স্বারাজ্য-মহিমার আকর্ষণে। আমাদের ঊর্ধ্বে ও অন্তরকন্দরে, অনন্তচেতনা ও শাশ্বতপ্রজ্ঞারূপিণী মহাযোগিনীর সস্মিত দৃষ্টিতে ঘনিয়ে উঠেছে এক আলোর আড়াল অনির্বচনীয়া দৈবী মায়ার রহস্যে গহন হয়ে—আর চেতনার অধস্তলে অবিদ্যারূপিণী ডাকিনীর কুটিল অধরে উদ্যত হয়ে আছে এক অনাদি জিজ্ঞাসা। এই উভয়ের রহস্যকে ভেদ করে আত্মস্বরূপের সত্য পরিচয় নেওয়া—এই আমাদের একমাত্র সাধনা। অহমিকার গণ্ডি ভেঙে নিজের সত্যস্বরূপকে ফিরে পাওয়া, সত্তার মূলাধারকে আবিষ্কার করে তার ভাবনায় নিত্যনন্দিত হওয়া আধারের স্বত-উচ্ছল আনন্দের নির্ঝরণে —এই তো আমাদের পার্থিবজীবনের পরম তাৎপর্য। এরই নিগূঢ় আকূতি বয়ে আমরা বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে জীবের ভূমিকা নিয়ে নেমে এসেছি।

আমাদের বুদ্ধিজন্য বিদ্যা এবং ব্যাবহারিক কর্মও মহাপ্রকৃতির বিধান।' এই বিদ্যা ও কর্মের দ্বারা অন্তর্গূঢ় সত্তা চৈতন্য বীর্য ও ভোগশক্তির যতটুকু আমাদের অপরা প্রকৃতিতে রূপায়িত হয়েছে, ততটুকুকেই আমরা বাইরে বিচ্ছুরিত করতে পারি। তাদের দিয়ে আমাদের আত্মরূপায়ণ ও আত্ম-বিচ্ছুরণের উত্তরসাধনা চলে, নিজের মধ্যে ভব্যার্থের বিপুল সঞ্চয়কে ভূতার্থে রূপান্তরিত করবার অক্লান্ত প্রয়াস চলে। কিন্তু এই প্রাকৃত বুদ্ধি ও মনোময়ী বিদ্যা কিংবা কর্মসংবেগকে আমাদের চেতনা ও শক্তির একমাত্র সাধন বলতে পারি না। আমাদের আত্মপ্রকৃতিতে সন্ধিনী-শক্তির ভূতভব্যবিধায়িকা বিভূতির লীলা চলছে। তাই, কি চেতনার ঋতায়নে, কি শক্তির প্রযোজনায় তার বৈচিত্র্য ও জটিলতার অন্ত নাই। এই গ্রন্থিজটিল জালের যে-কোনও একটি সূত্রকে সহজভাবে নিজের হাতের মুঠায় যদি পাই, তবে তাকে ধরে তার অন্তর্নিহিত মহত্তম ও সূক্ষ্মতম সম্ভাবনাকে রূপ দেওয়াই হবে আমাদের জীবনব্রত। এমনি করে আত্ম-আবিষ্কারের দ্বারা যে ঋদ্ধি এবং বীর্য আমাদের অধিগত হবে, তাকে একটিমাত্র লক্ষ্যের সাধনায় নিয়োজিত করতে হবে। সে লক্ষ্য এই : আত্মসম্ভূতির অনিরুদ্ধ প্রবেগে আপনাকে আমরা উৎসারিত করব, আনখশিখ চিন্ময় হয়ে উপচে পড়ব সিদ্ধ আধারের ঐশ্বর্যে এবং আত্মসংবিৎ ও বিশ্বসংবিতের নীরন্ধ্র অনুভবে, সন্ধিনী-শক্তির সার্থক রূপায়ণে আনন্দনিবিড় হবে আমাদের চেতনা। আর, এই সম্ভূতির বীর্যকে

সিদ্ধকর্মের অধৃষ্য প্লাবনে আমরা বইয়ে দেব জগতের ’পরে, দিব্যভাবনার অবন্ধ্য প্রেতিতে তাকে উপচিত ও উদ্বেল করে তুলব লোকোত্তর সিদ্ধির তুঙ্গশৃঙ্গের অভিমুখে, আনন্ত্যের বিশ্বব্যাপ্ত অবন্ধন ঔদার্যে তাকে প্রসারিত করব। মানুষের যুগ-যুগান্তব্যাপী তপস্যায়, তার ধর্মে কর্মে সমাজে শিল্পে বিজ্ঞানে ও শীলাচারে—এককথায় জীবনের বিচিত্র সাধনায় তার অন্নময় প্রাণময় মনোময় ও চিন্ময় সত্তার যে প্রকাশ ও পুষ্টির আয়োজন, সে যেন মহাপ্রকৃতির বিপুল তপোনাট্যের এক-একটি অঙ্ক। আমাদের খর্ব দৃষ্টি তার অর্থকে যত সঙ্কুচিত করেই দেখুক না কেন, তবু এই উত্তরায়ণের তপস্যাই জীবনের সত্যকার প্রতিষ্ঠা এবং তাৎপর্য। তাই প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা ‘বিদ্যা’ বলতে বুঝতেন শুধু বুদ্ধি দিয়ে জানা নয়, কিন্তু জীব হয়েও সমগ্র সত্তা দিয়ে শিবত্বের বিশ্বভাবন চিন্ময় ব্যাপ্তি এবং পরম আনন্ত্যের অনুভবে দীপ্ত হওয়া। শুধু তার খণ্ডিত অনুভবে নয়, আনন্ত্যকে করামলকবৎ অধিগত করে তাতে নিরন্তর বাস করা, তাকে জেনে তা-ই হয়ে আধারের অণুতে-অণুতে চেতনার তন্ত্রে-তন্ত্রে উল্লসিত বীর্যে তাকে ফুটিয়ে তোলা—একেই তাঁরা বলতেন অমৃতত্ব, একেই জানতেন মানুষের দিব্যভাবনার চরম আদর্শ বলে।

কিন্তু প্রাকৃতমানুষের চিত্তের গঠন, তার অধ্যাত্ম এবং অধিভূত দৃষ্টির ধরন অন্যরকম। দেহ আর ইন্দ্রিয়ের সঙ্কোচবশত গোড়া হতেই যা-কিছু স্থূল আপেক্ষিক ও আপাতিক তার সঙ্গে সে জড়িয়ে আছে। তাই প্রকৃতি-পরিণামের বিশাল কম্বুরেখায় তাকে বাধ্য হয়ে প্রথমত মন্থরগতিতে অন্ধের মত হাতড়ে-হাতড়ে এগোতে হয়। সত্তার সমগ্র পরিচয় তার দৃষ্টিতে অদ্বৈত-সুষমায় প্রথমেই ফুটে ওঠে না। সে তার মধ্যে দেখে নানাত্বকে, যাকে তার জিজ্ঞাসা তিনটি মুখ্য পদার্থে বা তত্ত্বে পর্যবসিত করে। প্রথম পদার্থটি জীবাত্মা বা সে নিজে; আর দুটি প্রকৃতি ও ঈশ্বর। প্রাকৃত অজ্ঞানদশায় শুধু প্রথমটির সঙ্গে তার অপরোক্ষ পরিচয় আছে। নিজেকে সে বিশ্ব হতে আপাতবিযুক্ত বলে অনুভব করে, অথচ বিশ্ব হতে কোনকালেই তার যোগ ছিন্ন হবার নয়। আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত হতে চেয়েও সে ব্যর্থকাম হয়, কেননা সবাইকে ছেড়ে তার আত্মলাভ স্থিতি বা সিদ্ধি কোনও-কিছুই সম্ভব-পর নয়। অস্তিত্বের প্রতি পদক্ষেপে অপরের সহায়তা তার চাই, চাই বিশ্ব-সত্তা ও বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য।...দ্বিতীয় পদার্থটিকে সে জানে পরোক্ষ উপায়ে—মন ও স্থূল ইন্দ্রিয় এবং তাদের বিষয়জনিত বিকার দিয়ে। এই জানার পরিধিকে প্রসারিত করবার জন্য তার অক্লান্ত প্রয়াস। নিজের বাইরে সত্তার এই-যে পরিশেষ, তাকে এড়িয়ে যাবার জো নাই। অথচ একদিকে তার সঙ্গে অবিনাভূত হয়েও আরেকদিকে তার থেকে সে বিবিক্ত। এই পরিশিষ্ট সত্তা হল প্রকৃতি বা বিশ্বজগৎ অথবা স্ব-ভিন্ন জীবব্যক্তি, যারা তার দৃষ্টিতে

যুগপৎ আত্মসদৃশ হয়েও বিসদৃশ। গাছপালা পশুপাখির সঙ্গে পর্যন্ত তার এমনিতর প্রকৃতিগত সাম্য ও বৈষম্যের সম্পর্ক। মনে হয়, প্রত্যেক জীব যেন স্বতন্ত্র—স্বভাবের পথ ধরে আপন মনে চলেছে। অথচ সবাইকে নিয়ে প্রকৃতিপরিণামের একটা বিরাট কম্বুরেখা আবর্তিত হয়ে চলেছে, যার মধ্যে মানুষের সঙ্গে আপন কোঠায় আর-সকলেও স্থান পেয়েছে।...তারও পরে মানুষ আভাসে আর-একটি বস্তুর সন্ধান পায়—যদিও তার সম্পর্কে তার জ্ঞান নিতান্তই পরোক্ষ এবং সীমিত। শুধু নিজেকে এবং নিজের সত্তার আকৃতিকে দিয়ে সে এই তৃতীয় বস্তুটির একটা অস্পষ্ট পরিচয় পায়। কখনও জগতের মধ্যে, তার দিগন্তলীন লক্ষ্যের ইশারায় যেন তার চকিত আভাস মেলে : এ-জগৎ যেন কাকে চায়, অস্ফুট প্রকাশের বেদনায় যেন গড়তে চায় কার আকার। কিংবা কোনও অদৃশ্য তত্ত্বভাবের বা গুহাচর অনন্তের গোপন ছন্দে তার অজ্ঞাতসারে অকল্পিত রূপের মেলা গড়ে ওঠে। বিশ্বের এই গভীর আকৃতিও মানুষের চিত্তে কখনও ওই রহস্যময় অজানার ছায়া ফেলে।

এই-যে অজানা বস্তুটি, এই-যে 'তার্তীয়ং কিং স্বিদ্'—একে মানুষ নাম দিয়েছে ঈশ্বর। ঈশ্বর বলতে সে বোঝে এমন একটা-কিছু বা একজন, যিনি পরাৎপর চিন্ময় সর্বময় সর্বকারণ। কখনও একটি বিভূতিতে সে তাঁর প্রকাশ কল্পনা করেছে, কখনও-বা তাঁর মধ্যে দেখেছে সর্ববিভূতির সমাহার। এখানে যা-কিছু অপূর্ণ বা খণ্ডিত, তাঁর সমগ্রতায় তারা পূর্ণতা পেয়েছে। এই বিশ্বের লক্ষ-কোটি বিশেষের আশ্রয় পরম-নির্বিশেষ তিনি—তিনি সেই অজানা, যাঁকে জানলে বুদ্ধির কাছে সকল জানার সত্য রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

আত্মা বিশ্ব ও ঈশ্বর—এই তিনটি পদার্থকে ঘিরে তত্ত্বজিজ্ঞাসা জেগেছে মানুষের চিত্তে। আবার এই তিনটিকেই সে প্রত্যাখ্যান করেছে। কখনও সে আত্মার বাস্তবতাকে নিরাকৃত করেছে, কখনও বলেছে জগৎ নাই, কখনও-বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেছে। কিন্তু সে-প্রতিষেধের অন্তরালেও তার দুর্নিবার জ্ঞানের পিপাসা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। চিরকাল, এই তিনটি পরম পদার্থের একটা অদ্বৈতসমাহার সে চেয়ে এসেছে, তার জন্য দুটিকে একের মধ্যে তলিয়ে দিতে বা ছেঁটে ফেলতেও তার আপত্তি নাই। এইজন্যে কখনও সে বলেছে : একমাত্র আমিই রয়েছি কারণরূপে—এ-জগৎ আমারই বিজ্ঞানের কল্পনা শুধু। কখনও-বা বলেছে : প্রকৃতিই সত্য—বিশ্বজগৎ প্রকৃতিশক্তির খেলা; আত্মা প্রকৃতির পরিণাম মাত্র এবং ঈশ্বর সেই আত্মার একটি কল্পনা। আবার কখনও উদাত্তকণ্ঠে সে ঘোষণা করেছে : একমাত্র ব্রহ্মই সত্য; এ-জগৎ মিথ্যা—ব্রহ্মের 'পরে বা আমাদের 'পরে আরোপিত অনির্বচনীয়া মায়ার খেলা! কিন্তু এইধরনের নেতিমূলক অদ্বৈতসিদ্ধিতে কোনকালেই মানুষের সকল জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি বা সমগ্র সমস্যার সমাধান ঘটেনি। এসব সিদ্ধান্তের

প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে প্রামাণ্য এবং নৈশ্চিত্যের তর্ক উঠতে পারে—বিশেষত যে-সিদ্ধান্তের প্রতি ইন্দ্রিয়শাসিত বুদ্ধির সুস্পষ্ট একটা পক্ষপাত আছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের প্রামাণ্যকে আমল দিয়ে ঈশ্বরকে মানুষ বেশিদিন দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, কারণ তাঁকে বাদ দিয়ে তার সত্যের এষণা হয় বন্ধ্যা, তার নিজেরই চরম ও পরম স্বরূপটি হয় তিরস্কৃত। দর্শনের জগতে নিরীশ্বর প্রকৃতিবাদকে আমরা স্বল্পায়ু বলেই জানি, কেননা একে মেনে মানুষের অন্তরের রহস্যবুদ্ধি কোনমতেই তৃপ্ত হতে পারেনি। মানুষের মনোময়ী বিদ্যা নিজেকে যে-বেদের সন্ধানে উৎসর্গ করেছে, তার সঙ্গে যার মিল নাই—কি করে তাকে বেদের শিরোভাগ বলে মানতে পারি? যেখানেই জীবনবেদের সঙ্গে কল্পিত বেদের এই গরমিল দেখা দিয়েছে—সেখানে সমস্যার সমাধানে তার্কিকের তর্কনৈপুণ্যের পরিচয় যতই নিবিড় হ'ক মানুষের অন্তর্যামী শাশ্বত সাক্ষিপুরুষ কিছুতেই তাকে পরা বিদ্যার চরম বাণী বলে মানতে পারেন নি।

আজ কিছুতেই মানুষ ভাবতে পারে না যে নিজের কাছে নিজে সে পর্যাপ্ত। জগৎ হতে বিবিক্ত অথবা শাশ্বত সর্বময়ও সে নয়। অতএব তাকে দিয়ে বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যা চলতে পারে না, কেননা তার দেহ-প্রাণ-মন যে বিশ্বেরই একটা অণুপ্রমাণ অবয়ব মাত্র। আবার পরিদৃশ্যমান বিশ্বকেও সে ভাবতে পারে না স্বতঃপর্যাপ্ত, কেননা অদৃশ্য জড়শক্তির আইন-কানুন দিয়ে বিশ্ব-তত্ত্বের সুসংগত একটা সমাধান মেলে না। জগতের মধ্যে মানুষের নিজের মধ্যে এমন অনেক-কিছুই আছে যা জড়শক্তির এলাকার বাইরে—সত্য বলতে জড়শক্তি যার একটা বহিরাবরণ বা মুখোস মাত্র। মানুষের বুদ্ধি বোধি ও হৃদয়বৃত্তিও এমন এক অদ্বয়পুরুষ বা অদ্বয়তত্ত্বের ছোঁয়া চায়, যার সঙ্গে জীব-শক্তি ও বিশ্বশক্তির একটা সম্পর্ক স্থাপন করে তারা সাধার এবং সার্থক হতে পারে। গুহাচর অনুভব অন্তহীন সান্তের আধাররূপী এক পরম আনন্ত্যের আভাস আনে। এই দৃশ্য বিশ্বের অন্তরে ও অন্তরালে এক অদৃশ্য অনন্ত তাকে ঘিরে আছে, যা বিশ্বের বহুধাবৈচিত্র্যকে অন্যোন্যসম্পৃক্ত অদ্বৈত-স্বভাবের সুরসুষমায় গেঁথে তুলছে। মানুষের মন ফেরে এক পরম নির্বি-শেষের সন্ধানে, যার আশ্রয়ে অগণিত সান্ত সবিশেষের স্থান হবে। সে চায় বিশ্বমূলে এক পরমার্থতত্ত্ব, সৃষ্টির প্রবর্তক এক অপ্রমেয় বীর্য শক্তি বা পুরুষ—যে হবে বিশ্বের অসংখ্যেয় ভূতগ্রামের স্রষ্টা এবং ভর্তা। যে-নামই সে তাকে দিক না, তবু তার চাই একটা পরাৎপর বস্তু, একটা চিন্ময় সত্তা, একটা কারণতত্ত্ব, একটা শাশ্বত আনন্ত্য নিত্যস্থিতি বা অখণ্ড পূর্ণতা—যার দিকে উন্মুখ হয়ে আছে সবার হৃদয়, নিত্যকাল যে-সর্বের মধ্যে রয়েছে নিখিলের অদৃশ্য সমাহার, যে-সর্বাধারকে ছেড়ে কারও সত্তাই সম্ভাবিত নয়।

অথচ জীব ও জগৎকে বাদ দিয়ে শুধু নির্বিশেষ ব্রহ্মকে মানলেও তার চলবে না। কেননা, জীবনসমস্যা ও বিশ্বসমস্যা হতে তাহলে ছিটকে পড়ে জীব ও জগৎকে সে দুর্বোধ একটা প্রহেলিকা অথবা উদ্‌ভ্রান্ত একটা রহস্য করে তুলবে। একান্ত-ব্রহ্মবাদে তার বুদ্ধির আংশিক তর্পণ অথবা শান্তি-পিপাসার চরিতার্থতা ঘটে—যেমন নাকি স্থূলসেবী বুদ্ধি লোকোত্তরকে অস্বীকার করে জড়প্রকৃতিকে পরমদেবতার আসনে বসিয়ে সহজেই তৃপ্তি মানে। কিন্তু এ-সমাধানে মানুষের হৃদয়, তার চিত্তের সংবেগ, তার সত্তার বীর্যবত্তম সান্দ্রতম ভাগ অর্থহীন উদ্‌ভ্রান্ত এবং অসার্থক থেকেই যায়। মনে হয়, তারা যেন শুদ্ধসন্মাত্রের শাশ্বত প্রশান্তির ভূমিকায় আকস্মিক মূঢ়তার একটা চঞ্চল প্রেতচ্ছবি, অথবা বিশ্বের শাশ্বত অচিতির পটে একটা অর্থহীন ছায়ার মায়া। আর বিশ্ব? সে তো অনন্তের সযত্নরচিত অনুপম মিথ্যার জাল শুধু। তার হিংস্র-বর্বর আততায়িতায় জীব অতিষ্ঠ, অথচ আসলে সে স্বতোবিরোধ-কণ্টকিত একটা আকাশকুসুম মাত্র। তত্ত্বত একটা দুঃখালয় দ্বন্দ্বজর্জর প্রহেলিকা হয়েও বাইরে সে সেজে আছে অপরূপ বিস্ময় ও আনন্দের মোহিনী-মূর্তিতে। অথবা বিশ্ব হয়তো একটা অন্ধ অথচ ব্যাহিত শক্তির অর্থহীন অপ্রমেয় উচ্ছ্বাস—জীব তার বুকে কালোৎক্ষিপ্ত বৈষম্যের বুদ্বুদ মাত্র—অচিতির বিরাটবক্ষে কেন তার আবির্ভাব কে জানে!...কিন্তু জীবে ও জগতে যে প্রাণ ও চেতনা মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে, এ-কল্পনায় তার কোনও সার্থক পরিণাম তো খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই মানুষের মন সমন্বয়ের সেই যোগ-সূত্রটি চায়, যাকে ধরে জগৎ সার্থক হবে জীবে এবং জীবও সার্থক হবে জগতে এবং উভয়ের পরম সার্থকতা ঘটবে ব্রহ্মে—কেননা চরম দৃষ্টিতে ব্রহ্মই তো নিজেকে যুগপৎ জীবে ও জগতে অভিব্যক্ত করছেন।

জীব জগৎ ও ব্রহ্ম—এই তিনটি তত্ত্বের অন্বয়-সমন্বয়ের স্বীকৃতি ও অনুভবে পরা বিদ্যার সত্যরূপ ফোটে। এই পরম ত্রিপুটীর একত্ব এবং অভঙ্গসমাহারের উপলব্ধিকে লক্ষ্য করে মানুষের উপচীয়মান আত্মসংবিতের কমলদল উন্মিষিত হচ্ছে। এই মহাসামরস্যের দিব্যধামেই তার পরম তৃপ্তি ও চরম পূর্ণতা। একত্বের বিজ্ঞান ছাড়া এ-তিনের জ্ঞান কখনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এদের অবিপ্লুত অবিনাভাবের 'পরে প্রত্যেকের অভঙ্গপূর্ণতার প্রতিষ্ঠা। আবার প্রত্যেককে পূর্ণভাবে জানলেই আমাদের চেতনায় তাদের ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটে। তখন সর্ববিজ্ঞানের উদার পরিবেশে অখণ্ডৈকরস হয়ে মিলিত হয় জানার সকল ধারা। নইলে তিনের মধ্যে অন্যোন্যভেদের সৃষ্টি ক'রে, একটির প্রতি একান্ত অভিনিবেশবশত আর-দুটিকে নিরাকৃত ক'রে আমরা শুধু অদ্বৈতের একটা পঙ্গু ধারণা পাই। অতএব মানুষকে বিদ্যাবিবৃদ্ধির তপস্যা করতে হবে নিষ্পক্ষ হয়ে। আত্মবিদ্যা বিশ্ববিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার সম্যক উপচয়ে

সে ত্রিবিদ্যার অন্যোন্যসম্পুটিত অদ্বৈতভাবনার মহাসঙ্গমতীর্থে উত্তীর্ণ হবে। এই সমগ্রবিজ্ঞানে তার জ্ঞানযজ্ঞের পূর্ণাহুতি। যতক্ষণ সে আত্মা জগৎ ও ব্রহ্মের একদেশকে মাত্র জানবে, ততক্ষণ তার সে অপূর্ণ জ্ঞান হতে ভেদের সৃষ্টি হবে। দৃষ্টির এই ন্যূনতা দূর হবে অন্বয়সমন্বয়ের উদারভূমিতে তিনটি তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধিতে। তখনই তাদের সত্যের সমগ্র রূপ মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত হবে—অপসৃত হবে অস্তিত্বের অনাদিরহস্যের যবনিকা।

অবশ্য একথার এমন অর্থ নয় যে, ব্রহ্ম স্বয়ম্পূর্ণ স্বয়ম্ভূ তত্ত্ব নন। ব্রহ্ম আপনাতে আপনি আছেন—জীব কি জগৎকে আশ্রয় করে নয়। অথচ জীব ও জগৎ ব্রহ্মকে ধরেই আছে—আপনাতে আপনি থাকবার সাধ্য তাদের নাই। ব্রহ্মসত্তার সঙ্গে জীব ও জগতের সত্তা এক হয়ে আছে—তাদের স্বয়ম্ভাবের এইমাত্র তাৎপর্য। কিন্তু তবু তারা ব্রহ্মশক্তির বিসৃষ্টি এবং তাঁর শাশ্বত সদ্ভাবে তাদের চিন্ময় তত্ত্বভাব কোনও-না-কোনও উপায়ে নিহিত আছে—নইলে তাদের বিসৃষ্টি সম্ভব হত না, অথবা বিসৃষ্ট হয়েও তারা অর্থহীন হত। এখানে যাকে নররূপে দেখছি, বস্তুত সে নারায়ণের ব্যষ্টিবিগ্রহ। এক পরমদেবতাই বহুধা বিভাবিত হয়ে হয়েছেন সর্বভূতান্তরাত্মা (কঠোপনিষদ ৫।১২)। আবার, আত্মাকে এবং জগৎকে জেনেই মানুষ ব্রহ্মকে জানতে পারে—নইলে তাঁকে জানবার আর-কোনও উপায় নাই। নিরাকৃত করতে হবে ব্রহ্মের বিসৃষ্টিকে নয়—মানুষের নিজের অবিদ্যা এবং অবিদ্যাপরিণামকে, যাতে তার সমগ্র আধারকে তার চেতনা শক্তি ও আনন্দসত্তার সবখানিকে আত্মনিবেদনের পূর্ণ উপচাররূপে সে ব্রাহ্মী স্থিতির অনুত্তর ধামে তুলে ধরতে পারে। জীব ব্রহ্মের বিভূতি বলে, নিজেকে আলম্বন ক'রে তার এ-ভাব যেমন সিদ্ধ হতে পারে, তেমনি হতে পারে বিশ্বকে আলম্বন করেও—কেননা বিশ্বও তাঁর বিভূতি। শুধু নিজের ভিতর দিয়ে যে-পথ, সাধককে তা নিয়ে যায় অনিরুক্তের অতল গহনের দিকে—ব্যষ্টিচেতনার নিমজ্জন বা নির্বাপণ দ্বারা। আবার শুধু বিশ্বের ভিতর দিয়ে যে-পথ, তাকে ধরে সে বিরাট-পুরুষের নৈর্ব্যক্তিক স্থিতিতে অথবা চিৎশক্ত্যালিঙ্গিত লীলাময় পুরুষের বিশ্ববিগ্রহে ব্যক্তিত্বের প্রলয় ঘটাতে পারে। এমনি করে, হয় সে প্রলীন হয় বিশ্বাত্মাতে, কিংবা নিজেকে বিশ্বশক্তির তটস্থ বাহনরূপে রূপান্তরিত দেখে। কিন্তু আত্মভাব ও জগদ্ভাবের সম্যক্ ও সমরস উপলব্ধিতে সে উত্তীর্ণ হয় উভয় ভাবের পরপারে এবং দিব্য-পুরুষকে ধারণ করে 'সর্বভাবেন'। এই উত্তরণে দুটি ভাবই তার মধ্যে পূর্ণতা পায়। দিব্য-পুরুষকে যেমন সে সমগ্র সত্তা দিয়ে অধিগত করে, তেমনি তাঁর সত্তা চৈতন্য আনন্দ শক্তি জ্যোতি ও বিজ্ঞান-দ্বারা নিজেও আবৃত অনুবিদ্ধ জারিত এবং আবিষ্ট হয়। এমনি করে তাঁকে সে পায় নিজের মধ্যে—পায় বিশ্বে। বিশ্বপ্রজ্ঞার সন্দীপন দ্যুতিতে তার

চেতনায় তখন ভেসে ওঠে—কেন সে-প্রজ্ঞার প্রবর্তনায় তার সৃষ্টি হল, আবার কেমন করে তারই সিদ্ধিতে জগৎসৃষ্টির প্রয়োজন সার্থক হল। এসব তত্ত্বের অবন্ধ্য বীর্য বাস্তবে প্রকটিত হবে—অতিমানসী পরমা প্রকৃতির পরমধামে চেতনার উত্তরণে এবং এই বিসৃষ্টির মধ্যে তার শক্তির অবতরণে। সে-পূর্ণ-সিদ্ধি আজ যদি-বা সুদূর এবং দুশ্চর, তবু এই অন্ন-প্রাণ-মনোময়ী প্রকৃতিতে ওই চিন্ময়ী দ্যুতির প্রতিফলন বা স্বীকৃতিতে সত্যের বিজ্ঞানকে এখনও অন্তশ্চিন্তিত-স্বাভীষ্ট একটি রূপ দেওয়া চলে।

কিন্তু এই চিন্ময় সত্য ও পরমপুরুষার্থের জ্ঞান মানুষের চেতনায় পরিণামের অনেক ধাপ পার হয়ে ফোটে। প্রকৃতির উদ্যোগপর্বে মানুষের সাধনার বিষয় হয় তার ব্যক্তিসত্তার বীর্যময় পূর্ণপ্রতিষ্ঠা—নিজেকে সুব্যক্ত সমৃদ্ধ ও স্বরাট করে তোলা তার লক্ষ্য। এইজন্যে প্রথম তাকে নিজের অহংকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। এই অহংসর্বস্বতার যুগে, জগৎ কি আর-কেউ তার চাইতে বড় নয়—বরং তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধন ও সহায়রূপেই তাদের যা-কিছু মূল্য। তখন ভগবানকেও সে নিজের চেয়ে বড় ভাবতে পারে না। তাই ধর্মবোধের প্রথম উন্মেষে দেখি, ঈশ্বর বা দেবতাকে মানুষ তার কামনা-তর্পণের পরম সাধনরূপে কল্পনা করেছে। যেন মানুষ আছে বলেই দেবতারা আছেন। এ-জগৎকে দোহন করে মানুষের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা মেটাতে হবে—দেবতারা সেই কাজে তার দোসর। এই অহংসর্বস্বতায় অন্যায় ও অত্যাচারের স্থূলহস্তের অবলেপ আছে। কিন্তু তবু তাকে অপরা প্রকৃতির অনর্থ বা প্রমাদ বলে তিরস্কৃত করলে চলবে না—কেননা বিশ্বব্যবস্থায় তারও একটা স্থান আছে। অহংএর পুষ্টিতে মানুষের আত্মোদ্বোধনের প্রথম পর্ব। জগতের পিণ্ডিতচেতনার দ্বারা অভিভূত হয়ে এতদিন অবচেতনার রসাতলে সে তলিয়ে ছিল—প্রকৃতির যান্ত্রিক আবর্তনকে মূঢ়ভাবে অনুবর্তন করা ছাড়া তার কোনও উপায় ছিল না। আজ অহংকে আশ্রয় করে আপনাকে সে ফিরে পেল, সবলে নিজেকে ছিনিয়ে নিল অন্ধপ্রকৃতির দাসত্ব হতে। প্রকৃতি হতে বিবিক্ত হয়ে মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্ধর্ষ বীর্যদ্বারা তার সুপ্ত যত শক্তি জ্ঞান ও সম্ভোগের সামর্থ্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তাদের দিয়ে জগৎকে নির্জিত করতে হবে—প্রকৃতিকে আনতে হবে হাতের মুঠায়। চিন্ময়পরিণামের এই প্রথম প্রয়োজনটি সিদ্ধ করবার জন্যই উগ্র অহমিকা দিয়ে মহাশক্তি একধরনের বিবেকখ্যাতির আয়োজন করেছেন তার মধ্যে। এমনি করে তার ব্যক্তিসত্তা ও বিবিক্ত সামর্থ্যকে পুষ্ট না করলে ভবিষ্যতের মহাতপস্যার বীর্য সে কোথা হতে পাবে, কি করে দেবতার উদার বিপুল ব্রতকে উদ্‌যাপিত করবে? অবিদ্যার মধ্যে নিজেকে স্বরাট্ করেই না সে বিদ্যার মধ্যে বৈরাজ্যের অধিকার পেতে পারে।

অচিতি হতে প্রবর্তিত চিন্ময়পরিণামের আদিবিন্দুতে দুটি শক্তি কাজ করছে। একটি অচিতির 'পরে অন্তর্নিহিত বিশ্বচেতনার নিগূঢ় চাপ, আরেকটি বহিশ্চর জীবচেতনার প্রস্ফুট ক্রিয়া। নিগূঢ় বিশ্বচিৎ প্রাকৃত-জীবের কাছে তার অধিচেতনাকে আশ্রয় করে নিগূঢ়ই থেকে যায়। বাইরে তার শক্তি ফোটে অন্যোন্যাবিবিক্ত ভূত ও বস্তুর সৃষ্টিতে। কিন্তু ব্যষ্টিজীবের দেহ মন ও বিবিক্ত ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করবার সঙ্গে-সঙ্গে সে চিৎশক্তিরও বিচিত্র ব্যূহ গড়ে তোলে। এইসব চিৎশক্তি বিশ্বপ্রকৃতির ভাবময় বিপুল রূপায়ণ হয়েও দেহমনরূপী বাস্তব ভোগায়তন হতে বর্জিত। তাই তারা ব্যষ্টির গোষ্ঠীকে আশ্রয় করে। বিশ্বচিৎ তাদের জন্য একটা গোষ্ঠী-মন, নিত্যপরিণামী অথচ নিত্য-অনুবৃত্ত একটা গোষ্ঠী-দেহ গড়ে তোলে। স্পষ্টই বোঝা যায়, গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যষ্টিপুরুষেরা যত আত্মসচেতন হবে, গোষ্ঠী-পুরুষের চিৎসত্তাও ততই উজ্জ্বল হবে। অতএব গোষ্ঠী-পুরুষের শক্তি যেভাবেই বাইরে ছড়াক, তার অন্তরের পুষ্টির অপরিহার্য সাধন কিন্তু হবে ব্যষ্টিপুরুষের পুষ্টি এবং তপস্যা। এইখানে দেখা দেয় ব্যষ্টি জীবচেতনার দুটি বৈশিষ্ট্য। প্রথমত তাকেই আশ্রয় করে বিশ্বচিৎ ব্যূহচিৎএর মেলা সৃষ্টি করে এবং ব্যষ্টিচেতনার সহায়ে তাদের প্রবর্তিত করে প্রকাশ ও প্রগতির দিকে। দ্বিতীয়ত, জীবের মাধ্যমে প্রকৃতিকে সে অচিতি হতে অতিচিতিতে উত্তীর্ণ করে—উত্তরায়ণের পথে তাকে পাঠায় অনুত্তরের সুদূর দিগন্তে।...গণ-চেতনাকে বলতে পারি অচিতির প্রতিবেশী। গণমন অবচেতন—নিঃশব্দ আঁধারের পথে তার চলাফেরা। দিনের আলোকে তাকে প্রকাশ করতে তাকে ব্যূঢ় ও কার্যক্ষম করতে চাই ব্যক্তিমনের প্রেষণা। গণচেতনা যখন নিজের ঝোঁকে চলে, তখন তার বাইরে ফোটে অধিচেতনার অস্ফুট বা অর্ধস্ফুট আকার-প্রকারহীন প্রেতির সঙ্গে জড়িত অবচেতনার একটা প্রবেগ। তাই তার মধ্যে দেখা দেয় অন্ধ বা আচ্ছন্নদৃষ্টি ঐক্যমত্যের একটা জুলুম, যা বারোয়ারি হট্টগোলের অজুহাতে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ন করে। তার ভাবের মূলে প্রেরণা জোগায় তথাকথিত আপ্তের উপদেশ, দলের জিগির, হুজুগের মন্ত্র, অতিসাধারণ খেলো চিন্তা বা বাজারচলতি সংস্কার। আর তার কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে হয় সহজবুদ্ধি ও অন্ধ আবেগ, নয়তো জাতিধর্ম, পালের হুকুমত কি যূথচিত্তের সংস্কার। গণচিত্তের ক্রিয়া অসাধারণ কার্যকরী হতে পারে, যদি এক বা একাধিক শক্তিশালী পুরুষ তার বাহন মুখপাত্র রূপকার কি অধিনায়ক হয়। কখনও-বা তার সমূহ উত্তালতা দুর্নিবার প্রচণ্ডতায় সমাজের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে—বরফের ধসের মত কি ঝড়ের মত। গণচেতনার চাপে ব্যক্তিত্বকে এমনি করে দাবিয়ে রাখা কি খেলার পুতুল করা একটা জাতি বা সম্প্রদায়ের অভীষ্টসিদ্ধির বিশেষ অনুকূল হয়—যদি অধিচেতন

গোষ্ঠী-পুরুষ তার ভাব ও দেশনার বাহনরূপে অনতিবর্তনীয় সংস্কারের একটা কাঠামো গড়ে তুলতে পারে, অথবা হাতের কাছে একটা দল কি কৌম বা কোনও মোড়লকে পায়। প্রকৃতির এই গোপন রহস্যকে আয়ত্ত করেই যুগে-যুগে দেখা দিয়েছে ক্ষাত্রবীর্যশাসিত বিরাট রাষ্ট্র, প্রাচীন সংস্কৃতির কঠিন নিষ্পেষণে ব্যক্তির প্রাণকে পিষ্ট করে সামাজিক জুলুমের নাগপাশ, অথবা দিগ্বিজয়ী বীরের পৃথিবী-টলানো রুদ্রতাণ্ডব। কিন্তু এমনি করে জাতি সমাজ বা ব্যক্তির ইষ্টসিদ্ধি কেবল মানুষের বাইরের জীবনটাকে নাড়া দেয়। কোনমতেই তাকে আমাদের সত্তার সর্বোত্তম বা চরম সার্থকতা বলতে পারি না। · আমাদের মধ্যে আছে মন, আছে চেতনা, আছে চিৎসত্তা। এই চেতনার উন্মেষ যদি না ঘটে, মন যদি না দল মেলে, প্রাণ আর মন যদি গুহাশায়ী চিৎপুরুষের প্রমুক্তি ও সম্পূর্তির সাধন এবং তাঁর আত্মবিভাবনার সার্থক বাহন না হয়—তাহলে শতসহস্র জুলুম বা বিপ্লবের অভিঘাতেও আমাদের জীবনতন্ত্রীতে সত্যের সুরটি কিছুতেই বাজবে না।

কিন্তু মানসিক উৎকর্ষ ও চেতনার উন্মেষ—এমন-কি গোষ্ঠীর মন ও চেতনার পুষ্টিও নির্ভর করে ব্যক্তির 'পরে, ব্যক্তির যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাতন্ত্র্যের 'পরে। গণচিত্তে আজও যা অস্ফুট তাকে স্ফুটরূপে জাগিয়ে তোলা, আজও যা অবচেতনার রহস্যপুরীতে গুহাহিত হয়ে আছে অথবা অতিচেতনার তুরীয়লোক হতে নেমে আসেনি তাকে রূপ দেওয়া—ব্যক্তিরই একক তপস্যার দায়: গোষ্ঠী-চেতনা আছে সংপিণ্ডিত হয়ে—রূপব্যাকৃতির ক্ষেত্ররূপে। তার মধ্যে ব্যক্তিচেতনাই সত্যদ্রষ্টা রূপকার বা স্রষ্টা। ভিড়ের মধ্যে ব্যক্তি তার অন্তরের বিশেষ প্রেতি হারিয়ে ফেলে—গণদেহের একটা কোষরূপে তাই সে গোষ্ঠীর ভাব সঙ্কল্প বা ঝোঁকের দ্বারা চালিত হয়। এইজন্যেই ব্যক্তিত্বের একটা বিবিক্ত সাধনা তার পক্ষে অপরিহার্য। পঞ্চভূতের বিশ্বব্যাপী খেলার মধ্যে তার ব্যক্তিদেহের যেমন একটা অনন্যসাধারণ পরিচয় আছে—তেমনি গোষ্ঠী-জীবন ও গোষ্ঠী-চিত্তের একরঙা জমিতেই তাকে জীবন ও মনের বিশিষ্ট একটি বর্ণরাগ ফোটাতে হবে, সবার থেকে পৃথক হয়ে তার স্বকীয়তাকে স্পষ্টরেখায় আঁকতে হবে সমাজের বুকে। এমন-কি এর জন্যে নিজেকে পেতে তার নিজের মধ্যে গুটিয়ে যেতে হবে। এমনি করে আপনাকে পেলেই অনুভবের চিন্ময়লোকে সবাইকে সে আপন করে পাবে। ব্যক্তিত্বের বনিয়াদ পাকা না হতেই সে যদি প্রাণ ও মনের স্থূল পরিবেশে একত্বের সাধনা করতে চায়, তাহলে গণচেতনার মূঢ়তায় অভিভূত হয়ে তার প্রাণ-মন-চেতনার সম্যক স্ফূর্তি না-ও ঘটতে পারে—তার জীবন পর্যবসিত হতে পারে গণদেহের কৌষিকী সত্তায়। গোষ্ঠী-পুরুষের বল ও প্রভাব তার ফলে দুর্দম হলেও তার মধ্যে সাবলীলতার স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে

না, বা প্রকৃতিপরিণামের সহজ ছন্দ দেখা দেবে না। তাইতো দেখি, বলিষ্ঠ প্রাণ মন ও চেতনা নিয়ে যে-সমাজে মহারথী সমাজপতির আবির্ভাব ঘটেছে, সেইখানেই মানুষের পক্ষে প্রগতির পথে পর্বসংক্রমণ নিরঙ্কুশ হয়েছে। এইজন্যই বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের মধ্যে ব্যষ্টির অহংকে উদ্দীপ্ত করেছে, যাতে সে গোষ্ঠীর অচেতনা বা অবচেতনার মূঢ়তা হতে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে প্রাণ মন হৃদয় ও আত্মার গভীর স্বাতন্ত্র্যে আপন স্বকীয়তাকে সমুজ্জ্বল করতে পারে। তখন পরিবেশের সঙ্গে একসা হয়ে আপন শক্তিকে সে বন্ধ্যা করে রাখে না—নিজের সঙ্গে ছন্দে গেঁথে আপন বৈশিষ্ট্যের বীর্যকে তার মধ্যে সঞ্চারিতই করে। কারণ ব্যক্তিসত্তা বিশ্বসত্তার অঙ্গীভূত হলেও তার একটা অতিশয় বা ব্যতিরেক আছে। অনুত্তর হতে তার মর্মে চিৎসত্তার অবতরণ ঘটেছে। কিন্তু তাকে সদ্য-সদ্যই উদ্দীপ্ত করে তুলতে সে পারে না—কেননা একদিকে সে যেমন বিশ্বের অচিতির অতি কাছে, তেমনি আবার অতিচিতির উৎস হতেও অনেক দূরে। তাই চিন্ময়রূপে নিজেকে প্রকট করবার পূর্বে বাধ্য হয়ে তাকে প্রাণময় ও মনোময় অহংএর ভিতর দিয়ে আসতেই হয়।

তবু বলব, ব্যক্তির অহংপ্রতিষ্ঠা কখনও আত্মজ্ঞান হতে পারে না। চিন্ময় সত্যজীব তো দেহের অহং প্রাণের অহং বা মনের অহং নয়। তবু জীবের মধ্যে অহন্তার এই-যে আদিপর্ব, মুখ্যত এ তার আচ্ছন্ন শক্তি সংকল্প ও আত্মভাবনার পরিণাম মাত্র। জ্ঞানের স্থান এর মধ্যে গৌণ। তাই এমন সময় আসে, যখন মানুষ তার আচ্ছন্ন অহংভাবের চর্মভেদ করে আত্মভাবের মর্মমূলে অবগাহন করতে চায়। মনের মানুষটিকে তার খুঁজে বার করতেই হবে, নইলে প্রকৃতির পাঠশালায় প্রথমপাঠের পর্বও যে তার শেষ হবে না—এর পরের পাঠ নেওয়া তো দূরের কথা। ব্যাবহারিক জ্ঞান ও কর্মকুশলতায় যতই সে টন্‌টনে হ'ক, নিজেকে না জানলে সে তো পশুর একটা উন্নত সংস্করণ ছাড়া কিছুই নয়। তাই প্রথমত তাকে জানতে হবে মনের তত্ত্ব—বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে কি তার নৈসর্গিক উপাদান। দেহ প্রাণ চিত্ত চৈতসিক ও অহঙ্কার—এই নিয়ে তার অন্তর্জীবন। কিন্তু মানুষ যে এমনিতর কতগুলি নৈসর্গিক উপাদানের খেলা শুধু—এ বললে তার পূর্ণ পরিচয় হয় না। শুধু অহন্তার প্রতিষ্ঠা এবং তর্পণই যে তার লক্ষ্য—এও তো সত্য নয়। হয়তো জীবনের পরিপূর্ণ অর্থ সে খুঁজবে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বা মানবগোষ্ঠীতে। এ হবে তার বিশ্বাত্মভাবসাধনার প্রথম পাঠ। হয়তো সে-অর্থ খুঁজবে সে পরমা প্রকৃতির মধ্যে বা ঈশ্বরে। এ হবে তার ব্রহ্মাত্ম-ভাবের প্রথম সোপান। কিন্তু সত্য বলতে দুটি পথ ধরেই সে চলতে চায়। চলতে গিয়ে প্রতিমুহূর্তে তার চরণ টলে, কেননা সাধনার দ্বৈতমার্গে

যেসব খণ্ডসত্যের আবিষ্কার সে করেছে, তাদের সঙ্গে যথাসাধ্য মিল রেখে একে-একে জীবনসমস্যার যত সমাধান সে উপস্থিত করুক, তার কোনটাতেই তার চিত্ত নিশ্চিত একটা অবলম্বন পায় না।

মানুষের এই-যে নিরন্তর ব্যাকুল এষণা, এর মধ্যে ঘুরে-ফিরে সেই একই সুর বাজছে—জানতে হবে, পেতে হবে, ভাবতে হবে নিজেকেই। তার বিশ্ব-বিদ্যা আর ব্রহ্মবিদ্যা আত্মবিদ্যারই সাধন মাত্র। ও-দুটি সাধনার পথ ধরে নিজেকেই সে পূর্ণ করে তুলতে চাইছে—চরিতার্থ করতে চাইছে তার ব্যক্তি-সত্তার পরম পুরুষার্থকে। বিশ্ব এবং প্রকৃতি যদি সাধনার লক্ষ্য হয়, তাহলে তার ফলে আত্মজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে আসবে প্রাণময় ও মনোময় ভূমির 'পরে স্বারাজ্য এবং বিশ্বসংসারের 'পরে আধিপত্য। আর লক্ষ্য যদি হয় ঈশ্বর, তখনও আসবে আত্মার স্বারাজ্য ও বিশ্বের বৈরাজ্য—কিন্তু আত্মা ও বিশ্বের সম্পর্কে থাকবে একটা অপ্রাকৃত চিন্ময়ভাবের প্রদ্যোতনা। অথবা হয়তো দেখা দেবে অধ্যাত্মসাধকের সেই সুপরিচিত ও সুনিশ্চিত মুক্তি-এষণা—যার চরমে আছে লোকোত্তর বৈকুণ্ঠধামে আত্মার নিত্যস্থিতি, কিংবা পরমাত্মার গহনে আত্মার বিবিক্ত নিমজ্জন, অথবা আত্মার অনুপাখ্য শূন্যতায় তার পরিনির্বাণ। কিন্তু যে-পথই সে ধরুক, বিবিক্তভাবে নিজেকে জানা এবং নিজের পুরুষার্থকে সিদ্ধ করাই ব্যক্তির সকল সাধনার চরম লক্ষ্য। বিশ্বহিতৈষণা বিশ্বমৈত্রী মানবসেবা—এমন-কি আত্মবিসর্জন বা আত্মবিলোপের উন্মাদনায় পর্যন্ত আছে ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধির ঐকান্তিক আকূতির একটা সূক্ষ্ম ছদ্মরূপ। মনে হতে পারে, এ শুধু প্রকারান্তরে মানুষের অহমিকার সম্প্রসারণ। অতএব বিবিক্ত অহংভাবই মানুষের আত্মভাবের মর্মসত্য। অহঙ্কার কিছুতেই মানুষকে ছাড়ে না, যে-পর্যন্ত আনন্ত্যের শাশ্বত অনুপাখ্যতায় নিজেকে নির্বাপিত করে তার কবল হতে সে নিষ্কৃতি না পায়।...কিন্তু মানুষের ব্যক্তিসত্তার পিছনে আছে আরেকটা গভীর রহস্য—আছে চিন্ময় নিত্যজীব বা পৌরুষেয় সত্তার নিগূঢ় ব্যঞ্জনা, যাকে আশ্রয় করে বিশ্বলীলায় জীবের জীবত্ব সার্থক হয়েছে।

জীবের হৃদয়ে চিন্ময়পুরুষরূপে তিনিই সন্নিবিষ্ট। তাই সংসার হতে জীবব্যক্তিরই মুক্তি ঘটে—জীবসমষ্টির নয়। সমষ্টির পূর্ণতা সাধিত হয় তার অঙ্গীভূত ব্যষ্টির পূর্ণতাতে। জীব তৎস্বরূপ বলেই নিজেকে পাওয়া তার পরম প্রয়োজন। পরমদেবতার কাছে চরম আত্মনিবেদনে নিজেকে সঁপে দিয়ে, পুরাপুরি দেবার মধ্যে সে-ই তো জানে নিজেকে পুরাপুরি পাবার মধু। অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় অহন্তার প্রলয়ে—এমন-কি চিন্ময় অহন্তারও প্রলয়ে অরূপ অসীম জীবাত্মাই তো অনুভব করে আপন আনন্ত্যে অবগাহনের শান্তি ও আনন্দ। অনাত্মভাব, সর্বাত্মভাব অথবা নির্বিশেষ তুরীয়াত্মভাব—

অধ্যাত্ম অনুভবের যে-কোনও ভূমিতে জীব-ব্রহ্মই তো সিদ্ধ করেন এই পরম-সামরস্যের চমৎকার বা অনির্বচনীয় যোগের রহস্য—তাঁর শাশ্বত ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বিরাট বিশ্বাত্মসত্তা অথবা পরম-অদ্বয় অনুত্তরসত্তার অনুপম তাদাত্ম্যের অকল্প্য অনুভব। অহংকে ছাড়িয়ে যেতেই হবে, কিন্তু তাবলে আত্মাকে তো ছাড়িয়ে যাওয়া যায় না। ছাড়াতে গেলেই যে তাকে ছড়িয়ে দিয়ে পেতে হয় বিশ্বময়, পেতে হয় অনুত্তরের পরমধামে। কারণ, আত্মা তো অহং নয়। আত্মা সর্বময়, আত্মা অদ্বয়স্বরূপ। অতএব আত্মাকে পেতে গিয়ে এই আধারেই সবাইকে পাই, পাই সে পরম একককে। তখন ঘটে-ঘটে ভেদ আর বিরোধ ঘুচে যায়, থাকে শুধু আত্মার চিন্ময় তত্ত্বভাব—ভেদের অবসানে সত্তার প্রমুক্তিতে যা সবার সঙ্গে জড়িয়ে যায়, ছড়িয়ে থাকে একের বুকে।

আজ যে মানুষ বহিশ্চর আপাতিক আত্মভাবের সঙ্গে না জড়িয়ে বিশ্ব বা ঈশ্বরের তত্ত্ব ধরতে পারছে না, এই মোহ দূর না হলে আত্মবিদ্যার পরের পাঠ তার কোনকালে আয়ত্ত হবে না। তার প্রথম পর্বে তাকে জানতে হবে : এই বর্তমান জীবনই তার সর্বস্ব নয়। কালাবচ্ছেদেও একটা নিত্যসত্তা তার আছে—তার আভাস জাগে আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে তার অন্তরের অস্পষ্ট অথচ অনতিবর্তনীয় সংস্কারে। তত্ত্বভাবের নিরেট অনুভব দিয়ে এই সংস্কারকে পাকা করতে হবে। যখন সে বুঝতে পারে : এই ভূলোকেরও ওপারে আরও-অনেক লোক আছে, এ-জন্মের পূর্বে ছিল এবং পরেও থাকবে আরও-অনেক জন্ম—জন্মান্তর না থাকলেও আত্মার একটা প্রাগ্‌ভাবী এবং পরভাবী সত্তা আছে; তখনই কালগত অবিদ্যাকে নির্জিত এবং বর্তমানের অভিনিবেশকে পরাভূত করে শাশ্বত আত্মভাবের আনন্ত্যে তার সত্তা প্রসারিত হয়।...তারপর, দ্বিতীয় পর্বে তাকে জানতে হবে : তার বহিশ্চর জাগ্রৎচেতনা সত্তার একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তাকে ডুবতে হবে অচিতির পাতালপুরীতে, আলোড়িত করতে হবে অবচেতনা ও অধিচেতনার অতল গহন, উত্তীর্ণ হতে হবে অতিচেতনার উত্তুঙ্গ ভূমিতে। এই সাধনায়, তার চিত্তগত-অবিদ্যার আবরণ খসে পড়বে।...সাধনার তৃতীয় পর্বে সে আবিষ্কার করবে : তার দেহ-প্রাণ-মনরূপী যন্ত্রকে চালাবার জন্যে তার মধ্যে আরও-কেউ আছে। তার প্রকৃতিকে ধরে আছে শুধু এক নিত্য-উপচীয়মান মৃত্যুঞ্জয় জীবাত্মাই নয়, আছে এক শাশ্বত নির্বিকার কূটস্থ চিদাত্মাও। তাকে জানতে হবে, কি তার চিন্ময়-বিগ্রহের উপাদান এবং সেই এষণার ফলে আবিষ্কার করতে হবে অবরসত্তার আর উত্তরসত্তার যোগসূত্র কি—বুঝতে হবে তার আধারের সমস্ত বৃত্তি চিৎসত্তার বিলাস মাত্র। এমনি করে তার সাংস্থানিক-অবিদ্যার আবরণ খসে পড়বে।...চিদাত্মার আবিষ্কারে ব্রহ্মের স্বরূপ তার কাছে অনাবৃত হয়। সে দেখে—কালকলনার অতীতে আত্মার কূটস্থ প্রকাশ। আবার বিশ্বচেতনার

উন্মেষে সেই আত্মাকেই সে দর্শন করে বিশ্বপ্রকৃতি ও সর্বভূতের অধিষ্ঠান চিন্ময় পরমার্থতত্ত্বরূপে। ধীরে-ধীরে ব্রহ্মের নির্বিশেষ ভাব অথবা অনুভব তার চিত্তকে অধিকার করে—সে দেখে আত্মা জীব ও জগৎ তাঁরই বিচিত্র বিভূতি। তখন তার চেতনা হতে বিশ্বগত অহন্তাবচ্ছিন্ন ও মূলা অবিদ্যার আড়ষ্ট বন্ধনও শিথিল হয়ে খসে পড়ে। এমনি করে তার আত্মবিদ্যার মহিমা কলায়-কলায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। তার ছাঁচে জীবনকে ঢালতে গিয়ে তার ভাব ও কর্মের সমগ্র ধারাতে ক্রমে একটা গোত্রান্তর এবং রূপান্তর দেখা দেয়। ব্যাবহারিক অবিদ্যার যে-ঘোর তার প্রকৃতিকে আড়ষ্ট এবং পুরুষার্থকে কুণ্ঠিত করেছিল, তার বাঁধন তখন আলগা হয়ে যায়। এমনি করে সপ্তপর্বা অবিদ্যার প্রলয়ে তার সম্মুখে খুলে যায় দেবযানের জ্যোতির দুয়ার—সীমিত ও খন্ডিত সত্তার অনৃত এবং সন্তাপ হতে সে উত্তীর্ণ হয় ঋতম্ভরা অখন্ডসত্তার নিষ্কণ্টক অধিকার ও অক্ষুণ্ণ সম্ভোগে।

এই উদয়নের পথে সাধকের মধ্যে জীব জগৎ ও ব্রহ্মের অবিনাভাবের চেতনা পর্বে-পর্বে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। প্রথমত সে উপলব্ধি করে : ব্যক্তমধ্য দশাতে বিশ্ব ও প্রকৃতির সঙ্গে সে একাকার হয়ে রয়েছে। দেহ-প্রাণ-মন, কালের পরম্পরায় জীবভাবের পরিণাম, চেতনভূমির অবরপ্রান্তে অবচেতনা আর পরমপ্রান্তে অতিচেতনা—এদের নিয়ে বিচিত্র সম্বন্ধের যে জালবোনা চলেছে, তার সমষ্টিফলই তার বিশ্ব এবং প্রকৃতি। সেইসঙ্গে এও সে উপলব্ধি করে : বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে অথবা তার অধিষ্ঠানরূপে যে-তত্ত্ব অনুস্যূত রয়েছে, তার আবেষ্টনে ব্রহ্মের সঙ্গে সে অবিনাভূত হয়ে রয়েছে। কারণ দেশকালাতীত নির্বিশেষ চিন্ময় যে-আত্মস্বরূপ বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত এবং প্রকৃতির ভর্তা, আমরা তাঁকেই ব্রহ্ম বলি—অতএব অধিষ্ঠানতত্ত্বে অবগাহন করে জীবও হয় ব্রহ্ম-জ এবং ব্রহ্মভূত। নিজেকে তখন সে অনুভব করে নির্বিশেষ চিদাত্মারূপে—দেখে আত্মবিক্ষেপদ্বারা সে-ই বহুরূপে বিশ্বে প্রজাত এবং প্রকৃতিতে নিগূহিত হয়েছে।...দুটি উপলব্ধিতেই নিজের আত্মাকে সে সর্বভূতের আত্মারূপে উপলব্ধি করে। বিশ্বাত্মভাবে এবং ব্রহ্মাত্মভাবে সে-উপলব্ধির দুটি বিভাব ফোটে। বিশ্বাত্মভাবে তার অনুভব সবিশেষ : কেননা জড়ে প্রাণে মনে চেতনায়—এককথায় প্রত্যেক বিশ্বতত্ত্বের যে-কোনও পরিণামে শক্তির লীলায় তত্ত্বের বিন্যাসে এবং পরিণামের সংস্থানে যত বৈচিত্র্যই দেখা দিক, সেসমস্ত বৈচিত্র্যকে অঙ্গীকার করেই সর্বভূতের সঙ্গে সে এক হয়ে রয়েছে। আবার ব্রহ্মাত্মভাবে এই অনুভবই নির্বিশেষ হয় : কেননা এক ব্রহ্ম, এক আত্মা, এক চিৎসত্তাই সবার শাশ্বত আত্মস্বরূপ এবং তাদের বহুভঙ্গিম বৈচিত্র্যের উৎস ভোক্তা ও সূত্রধার। অতএব ব্রহ্মের অনুভূতিতেও সে সবার আত্মভূত। এমনি করে অবশেষে সে ব্রহ্ম এবং জগতের

অবিনাভাবে পৌঁছয়। কারণ, সে অনুভব করে, নির্বিশেষ ব্রহ্মই সবিশেষ জগতে পরিণত হয়েছেন, বিশ্বের সমস্ত তত্ত্ব চিৎসত্তার বিভূতি বা বিসৃষ্টি, সর্বভূতমহেশ্বরের সন্ধিনী- ও সংবিৎ-শক্তিই প্রকৃতিরূপে বিশ্বে লীলায়িত। আত্মবিদ্যার পথে ধাপে-ধাপে উঠতে গিয়ে এমনি করে আমরা সেই পরমতত্ত্বে উত্তীর্ণ হই—যাকে জানলে আত্মার অবিনাভূতরূপে সবাইকে জানা হয়, যাকে পেলে সর্বাত্মভাবের নিবিড় উল্লাসে নিজের মধ্যে সবাইকে পাওয়া হয়।

তেমনি এই অদ্বৈতানুভবে বিশ্ববিদ্যাও মানুষের চিত্তে একই সত্যার্থ-প্রকাশের বিপুল ব্যঞ্জনা ফোটায়। কারণ, বিশ্বপ্রকৃতিকে শুধু জড় প্রাণ ও শক্তিরূপ বলে ভাবলেও তাদের সঙ্গে মনশ্চেতনার কি সম্পর্ক, তা তাকে তলিয়ে বুঝতেই হবে। কিন্তু একবার মনের স্বরূপতত্ত্ব জানতে পারলে বিশ্বের উপরভাসা তত্ত্ববিচারকে ছাড়িয়ে আরও গভীরে না ডুবে তার উপায় নাই। তখন সে দেখবে : শক্তির সকল ক্রিয়ায়, জড় ও প্রাণের সকল খেলায় অন্তর্গূঢ় ইচ্ছা- ও জ্ঞানা-শক্তির প্রবর্তনা কাজ করছে। মানুষের জাগ্রতে অব-চেতনায় ও অতিচেতনায় ওই একই শক্তির লীলায়ন। অবশেষে জড়বিশ্বের মৃন্ময় দেহে একদিন সে তার চিন্ময় দেহীকে আবিষ্কার করবে। বিশ্বপ্রকৃতির পর্বে-পর্বে যে-সর্বাত্মভাবের নিবিড়তায় তার চেতনা উল্লসিত হবে, তার চরমে সে আবিষ্কার করবে নিখিল প্রতিভাসের অন্তরালে এক পরমা প্রকৃতির স্বরূপসত্য। দেশকালে অভিব্যক্ত হয়েও সে-প্রকৃতি দেশকালের অতীত এক চিৎস্বরূপের পরম বীর্য। এ সেই দেবাত্মশক্তি যাকে আশ্রয় করে আত্মা হয়েছেন 'সর্বাণি ভূতানি', নির্বিশেষ আপনাকে ফুটিয়ে তুলছেন অশেষ বিশেষে। অতএব সুপ্রবুদ্ধ চেতনার দৃষ্টিতে বিশ্বপ্রকৃতি জড়শক্তি প্রাণশক্তি ও মনঃশক্তির বৈচিত্র্যেই লীলায়িত নয়—স্বরূপত সে সর্বভূতমহেশ্বর পরম-দেবতার কবিক্রতুর বীর্য, স্বয়ম্ভূ শাশ্বত অনন্তের আত্মভূত চিৎশক্তি।

মানুষের সকল জিজ্ঞাসা ছাপিয়ে যে-ব্রহ্মজিজ্ঞাসা একদিন একটা অনতি-বর্তনীয় পরম জিজ্ঞাসা হয়ে ওঠে, তার শুরু কিন্তু হয়েছে প্রকৃতিতত্ত্বের অস্পষ্ট এষণা হতে—মানুষের নিজের মধ্যে গুহাহিত অদৃষ্ট রহস্যের বোধ হতে। আধুনিক বিজ্ঞান বলে, ধর্মবোধের অঙ্কুর দেখা দেয় অসভ্য মানবের বিশ্বময় প্রাণের ভাবনায়, ভূতপ্রেত দৈত্যদানার উপাসনায়, প্রাকৃত শক্তিতে দেবত্বের আরোপে। একথা সত্য হলেও, মানবচিত্তের এই আদিম সংস্কারে পাই শিশু-কল্পনার অস্ফুট দ্যোতনায় অবচেতনেরই একটা প্রচ্ছন্ন প্রত্যয়। মানুষের অজ্ঞানাচ্ছন্ন চেতনায় অচিন্ত্যশক্তির সঙ্গোপন প্রভাব সম্পর্কে একটা আকারপ্রকারহীন অনুভব সঞ্চারিত হয়েছে। আমরা যাকে অচেতন বলে জানি, তারও মধ্যে সে দেখেছে চেতনসত্ত্ব-সুলভ ইচ্ছা ও জ্ঞানের আভাস। দৃশ্যের পিছনে অদৃশ্যকে, শক্তির যে-কোনও লীলায়নে চিৎসত্তার অন্তর্গূঢ় আবেশকে

অস্পষ্টরূপে সে কল্পনা করেছে—এই তার প্রত্যয়ের তাৎপর্য। বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের আদর্শে বিচার করলে এই আদিম প্রত্যয়কে যদিও নিতান্ত ঝাপসা এবং পঙ্গু মনে হবে, তবু তার মধ্যে মানুষের হৃদয়-মনের চিরন্তন এষণার যে-রূপটি ফুটে উঠেছে, তার সত্য ও সার্থকতাকে কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। আমাদের সকল জিজ্ঞাসা—এমন-কি বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসারও শুরু হয় নিগূঢ় সত্যের অজ্ঞানাচ্ছন্ন অস্পষ্ট অনুভব হতে। অবিদ্যার কুহেলিকার স্তিমিত দৃষ্টি দিয়ে আমরা প্রথম দেখি সত্যের কঞ্চুকাবৃত ছদ্মরূপ, তারপর ধীরে-ধীরে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার জ্যোতির্ময় আলেখ্য। মানুষ যখন নারায়ণকে নরের রূপে কল্পনা করে, তখনও সে-আরোপে থাকে এই সত্যের স্বীকৃতি যে, নারায়ণেরই স্বরূপতত্ত্বের 'পরে রয়েছে নর-স্বরূপের নির্ভর, বিশ্বনিখিল এক অখণ্ডচেতনারই অখণ্ডবিগ্রহ। নরের অপূর্ণতার মধ্যে আছে নারায়ণেরই মর্ত্যবিসৃষ্টির সাম্প্রতিক পূর্ণতার পরিচয় এবং আজ নরের আধারে যা অপূর্ণ, নারায়ণের স্বরূপে রয়েছে তারই পরম পূর্ণতা। নর যে সর্বত্র নিজেকে দেখে এবং নিজেরই উপাসনা করে নারায়ণরূপে—এও সত্য। কিন্তু এখানেও দেখি, তার অন্ধ অবিদ্যা হাতড়ে-হাতড়ে অবশেষে এই গভীর সত্যের অস্পষ্ট ছোঁয়া পেয়েছে : তার সত্তা আর ব্রহ্মসত্তা এক, এখানে পড়েছে ওখানকারই খণ্ডিত প্রতিচ্ছবি। অতএব নিজের বৃহৎ স্বরূপকে সর্বত্র আবিষ্কার করার অর্থ হল ব্রহ্মকে সর্বত্র দর্শন করা, আর এই দর্শনই তাকে নিয়ে যাবে নিখিলের স্বরূপসত্যের তোরণদ্বারে।

আপাতিক বৈচিত্র্য ও বিরোধের পিছনে রয়েছে একের সুর—এই হল মানুষের ধর্ম ও দর্শনে প্রস্থানভেদের মর্মকথা। প্রত্যেক ধর্মে ফুটেছে অখণ্ড অনাদি সত্যের একটা ইঙ্গিত বা প্রতিরূপ, এক অনন্তবিচিত্র মহিমার একটি বিশেষ বিভাব। কত বিচিত্র রূপেই-না মানুষ সেই একের পরিচয় পেয়েছে। কখনও জড়বিশ্বকে সে অস্পষ্টভাবে পরমদেবতার কায়ারূপে দেখেছে, প্রাণকে তাঁর নিঃশ্বসিতের বিরাট ছন্দ বলে জেনেছে, বিশ্বের সব-কিছুকে ভেবেছে এক বিরাট মনের ভাবনা, অথবা সবার অন্তরালে এক মহত্তর সূক্ষ্মতর চিৎসত্তার নিগূঢ় আবেশকে বিশ্ব-বিসৃষ্টির অভাবনীয় উৎসরূপে অনুভব করেছে।...কখনও ঈশ্বরকে সে অবিমিশ্র অচিতি বলে কল্পনা করেছে। আবার কখনও তাঁকে জেনেছে অচেতন বিশ্বের মূলে এক পরমচেতনারূপে। বৈরাগ্যের তীব্রসংবেগ পৃথিবীর সকল মায়া কাটিয়ে দেহ-প্রাণ-মনের প্রলয় ঘটিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে সে অতিচেতনার অনুপাখ্য স্বরূপসত্তায়। অথবা ভেদ-ভাবকে নির্জিত করে অনুভব করেছে—তিনিই যুগপৎ চেতনায় ও অতি-চেতনায় বিলসিত, এবং জীবনসাধনায় এই পরমদর্শনের উদার সত্যকে নিঃ-শঙ্কচিত্তে বরণ করে নিয়েছে।...কখনও মানুষ তাঁর বিশ্ববিগ্রহের উপাসনা

করেছে হিরণ্যগর্ভ বিরাট্ পুরুষরূপে। আবার কল্পনাপোঢ় প্রত্যক্ষবাদের দোহাই দিয়ে কখনও যদি ঈশ্বরকে শুধু বিশ্বমানবের বেষ্টনীতে সে সঙ্কুচিত রেখেছে, তেমনি তাঁকে আরেক ঝটকায় বিশ্ব ও প্রকৃতি হতে পাঠিয়েছে দূর-নির্বাসনে—দেশকালাতীত অক্ষরতত্ত্বের সর্বনাশা অনুভবের উন্মাদনায়। কখনও-বা মানুষ তাঁর মধ্যে নিজেরই বিচিত্র সুন্দর বা বিস্ফারিত অহমিকার আরতি করেছে, তাঁতে আরোপ করেছে তার ঈপ্সিত গুণ ও মহিমার অখণ্ড সমাবেশ, অথবা তাঁর দিব্যবিভূতিকে প্রকট দেখেছে লোকোত্তর শক্তি প্রীতি কান্তি সত্য ঋত ও প্রজ্ঞার চিন্ময় অনুভবে।...কখনও তার কাছে তিনি বিশ্ব-প্রকৃতির ভর্তা, জগতের পিতা ও ধাতা। কখনও তিনিই প্রকৃতিস্বরূপা—জগন্মাতা, অথবা নিখিলের চিত্তচোর—বিশ্বজনের প্রাণের বঁধু। কখনও-বা নিখিলকর্মের অন্তর্যামী নিয়ন্তার প্রণিধান নিয়ে কর্মযোগে চলেছে তাঁর উপাসনা।...অদ্বিতীয় একেশ্বরের কাছে মানুষ যেমন ঢেলেছে তার প্রাণের নতি, তেমনি লুটিয়ে পড়েছে তাঁর বহুধাবিচিত্র দেবমহিমার বেদিমূলে। অবতারী দেবমানবরূপে তাঁর চরণে অঞ্জলি দিয়েছে যেমন, তেমনি আবার বিশ্বমানবের বিগ্রহে এক পরমদেবতার অর্চনা করেছে। অথবা সম্বুদ্ধ চিত্তের উদার ভাবনায় বিশ্বের সর্বত্র অনুভব করেছে সেই একেরই অখণ্ডসত্তা—যাঁর আবেশ তার চেতনায় কর্মে ও জীবনে এনেছে বিশ্বভূতের সঙ্গে তাদাত্ম্যের পরম প্রত্যয়, অনন্ত দেশে ও কালে যা-কিছু আছে তার সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করেছে, প্রকৃতির চিৎ অচিৎ সকল শক্তির অনুভবকে তার চেতনায় ফুটিয়েছে আত্ম-শক্তির বিলাসরূপে।...এমনি করে মানুষ যে-পথ ধরেই চলেছে, পথের শেষে পেয়েছে সে একই পরমসত্যের অনুভব। কেননা এসবই তো সেই চিন্ময়-আনন্ত্যের বিচিত্র বিভূতি—যাঁর দিকে ধাবিত হয়েছে নিখিল চিত্তের সকল এষণা। বিশ্বের সবই সেই পরম অদ্বয়তত্ত্ব যখন, তখন মানুষের সাধনায় স্বভাবতই অন্তবিহীন বৈচিত্র্য দেখা দেবে। এমনি করে বিচিত্রভাবে না জানলে সর্বতোভাবে তাঁকে জানা যাবে না বলেই তো তাঁর আরতির এই বিপুল আয়োজন। কিন্তু জ্ঞানের তুঙ্গতম শৃঙ্গে আরূঢ় না হলে কি তার সর্বতো-ব্যাপ্ত অদ্বৈতরূপটি কেউ চিনতে পারে? সবার উঁচুতে থেকে সবচাইতে বড় করে দেখাই হল চরম প্রজ্ঞাদৃষ্টি—কেননা তখন অনুভবের এক চরম ক্ষেপে ধরা পড়ে সকল বিচিত্র জ্ঞানের অনন্য এবং উদার রহস্য। বিজ্ঞানী তখন দেখেন : সমস্ত ধর্মের অভিযান এক পরমসত্যের দিকে, সকল দর্শনে একই চরমতত্ত্বের বিভিন্ন ভূমি হতে দর্শনজনিত প্রস্থানের বৈচিত্র্য, এক পরা বিদ্যায় সমস্ত বিদ্যার পরিসমাপ্তি। ইন্দ্রিয় দিয়ে মন দিয়ে অতীন্দ্রিয় অনুভব দিয়ে আমরা যে-তত্ত্বকে খুঁজছি, তার সর্বতোমুখ সম্যক অনুভবটি ফোটে—যখন ব্রহ্ম জীব জগৎ, এবং জগতের সব-কিছুকে একাত্মক বলে জানি।

ব্রহ্মই চিন্ময় পরমতত্ত্ব—কালাতীত আত্মা হয়েও তিনি কালাত্মা। তিনি প্রকৃতির ভর্তা, বিশ্বের স্রষ্টা এবং আধার, সর্বভূতে অনুস্যূত থেকে সর্ব-জীবের উৎস এবং পরম অয়ন—এই হল মানুষের ব্রহ্মানুভবের চরমকোটিতে অনুত্তর সত্যের পরম পরিচয়। এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম আবার অশেষ বিশেষে আপনাকে রূপায়িত করেন, চিন্মাত্রস্বরূপ হয়েও বিশ্বমন বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্ব-জড়ে তাঁর বিরাট বিগ্রহ রচনা করেন। মহাপ্রকৃতি তাঁর শক্তিস্বরূপা বলে তার সকল বিসৃষ্টিতে ফোটে তাঁর চিদাত্মস্বরূপের বিচিত্র বিভাবনা—সন্ধিনী-শক্তির আধারে সংবিৎশক্তিকে উপলক্ষ্য করে হ্লাদিনীশক্তির উল্লাসরূপে। এই পরমসত্যের অনুভবের দিকেই মানুষকে নিয়ে চলেছে তার বিশ্ব- ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের তপস্যা। বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে যেদিন ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ণযোগ ঘটবে, সেইদিন তার এ-তপস্যার সিদ্ধি। পরব্রহ্মের এই সত্যই বিশ্বচক্রের নাভি—এ তার প্রতিষেধ বা নিরাকৃতি নয়।...তাঁর স্বয়ম্ভূ-সত্তাই ধরেছে সম্ভূতির রূপ। আত্মারূপে তিনিই হয়েছেন বিশ্বের সব-কিছু—আত্মারূপে তিনিই সর্বভূতের শাশ্বত কীলকস্বরূপ। এই অনুভব আমাদের চেতনায় সোঽহংমন্ত্রে জ্বলে ওঠে। বিশ্বের শক্তি সেই স্বয়ম্ভূ সন্মাত্রের চিন্ময়ী মহাশক্তি। এই শক্তির বিলাসে বিশ্বপ্রকৃতিতে আত্মরূপের অগণিত বিভাবনায় তিনি আপনাকে বিভাবিত করছেন। আবার প্রত্যেক ব্যষ্টিরূপে বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক মহিমার আবেশকে অব্যাহত রেখেই আধারে তিনি ঢেলে দেন আত্মসত্তার সবখানি। তখন একের মধ্যে, সবার মধ্যে, সবার সঙ্গে একের অন্যোন্যসঙ্গমে তাঁর নিত্য-সদ্ভাব ও অকুণ্ঠ বীর্যের রসোল্লাস অনুভূত হয়। তাঁর দিব্যপ্রকৃতির এ-বিভূতি তাঁর স্বরূপসত্যের আরেকদিক। ব্রহ্মাধিষ্ঠিত ও শক্ত্যাশ্রিত জীবের অখণ্ড আত্মবিদ্যার সাধনা একেই লক্ষ্য করে চলেছে।...পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা, পূর্ণ আত্মবিদ্যা ও পূর্ণ শক্তিবিদ্যা—এই তিনটি বিদ্যার ত্রিবেণীসঙ্গমে রয়েছে জীবের পরমপুরুষার্থসিদ্ধির মহাতীর্থ। এরই মধ্যে আমরা খুঁজে পাই বিশ্বমানবের অক্লান্ত সাধনার বৃহৎ ও পরিপূর্ণ তাৎপর্য। মানুষের প্রবুদ্ধ চেতনায় যখন ব্রহ্ম আত্মা ও প্রকৃতির অবিনাভাবের আভাস ফুটবে, তখনই তার পূর্ণসিদ্ধির সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হবে, বৃহৎসামের সুরমূর্ছনা তার আধারে ঝঙ্কৃত হবে। এই হবে তার সত্তার লোকোত্তম ও মহত্তম ভূমি, তার দিব্যচেতনা ও দিব্যজীবনের পরমা স্থিতি। এই মহাভূমির সূচনাতেই তার জীবনে স্ফুটিত হবে আত্মজ্ঞান জগৎজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের পথে উত্তরায়ণের আদাবন্দু।

অষ্টাদশ অধ্যায়

উত্তরায়ণের পথে—উদয়ন ও সমাহরণ

যৎ সানোঃ সানুমারুহৎ তদিন্দ্রো অর্থং চেততি...॥

ঋগ্বেদ ১।১০।২

যখন সানু হতে সানুতে আরোহণ করে সে...তখন ইন্দ্র তাকে দেন তার সেই লক্ষ্যের চেতনা।

—ঋগ্বেদ (১।১০।২)

দ্বিমাতা হোতা বিদথেষু সম্রাল্-অগ্রং চরতি ক্ষেতি বুধ্নঃ॥

ঋগ্বেদ ৩।৫৫।৭

দুটি মায়া তাঁর—বিদ্যার সিদ্ধিতে সম্রাট তিনি; অগ্রভূমিতে করেন বিচরণ, বাস করেন ঊর্ধ্বমূলে।

—ঋগ্বেদ (৩।৫৫।৭)

পৃথিব্যা অহমুদন্তরিক্ষমারুহমন্তরিক্ষাদ্দিবমারুহম্।
দিবো নাকস্য পৃষ্ঠান্ স্বর্জ্যোতিরগামহম্॥

যজুর্বেদ ১৭।৬৭

পৃথিবী হতে উত্থিত হয়ে আমি অন্তরিক্ষে করলাম আরোহণ; অন্তরিক্ষ হতে উঠলাম দ্যুলোকে; দ্যুলোকের পৃষ্ঠ হতে স্বর্জ্যোতিতে গেলাম আমি।*

—যজুর্বেদ (১৭।৬৭)

পার্থিবপ্রকৃতি বিশ্বপরিণামের কোন্ পর্বে এসে আজ দাঁড়িয়েছে এবং কোন্ চরম লক্ষ্যের দিকে তার অভিযান উদ্যত বা সম্ভাবিত হয়েছে, এতক্ষণে তার একটা যথাসম্ভব স্পষ্ট ধারণা আমরা পেয়েছি। এইবার আমাদের বুঝতে হবে : পরিণামের কোন্ সূত্র ধরে কি রীতিতে আজ প্রকৃতি তার বর্তমান স্থিতিতে এসে পেঁাছেছে। আবার, হয়তো-বা ওই রীতির একটুখানি হের-ফের করে পরিণামের চরম পর্বে মনোময়ী অবিদ্যার কবল হতে কি করে সে অতিমানসী চেতনা ও সম্যক-বিজ্ঞানের পরমভূমিতে উত্তীর্ণ হবে।...আমরা দেখেছি, বিশ্বশক্তির সামান্যবিধানের মধ্যে নিয়তিকৃতনিয়মের একটা বাঁধুনি থাকে, কেননা তার মূলে আছে বস্তুর স্বভাবসত্যের প্রবর্তনা। সত্যের তত্ত্ব-ভাবের কোনও বিপর্যয় ঘটে না, যদিও তার কৃতিতে দেখা দেয় অবান্তর বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য—এ আমাদের অজানা নয়। একটা কথা গোড়াতেই স্পষ্ট : জগদ্‌ব্যাপার যখন অন্নময় অচিৎ হতে প্রকৃতির চিন্ময় পরিণামের খেলা, অর্থাৎ এখানে জড়কে আধার করেই যখন চিৎস্বরূপ পর্বে-পর্বে আপনাকে রূপায়িত

* এখানে আছে চারটি ভূমির কথা : জড় প্রাণ শুদ্ধ-মন ও অতিমানস।

করছেন, তখন এই রূপায়ণের মধ্যে একটা ত্রিপর্বা প্রগতির ছন্দ দেখা দেবে। জড় রূপের ক্রমিক পরিণমনে আধারের ক্রমসূক্ষ্ম ও জটিল রূপায়ণ, যাতে তা উপচীয়মান চেতনাসংহতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং সমর্থ প্রবৃত্তির জটিলতাকে স্বচ্ছন্দে বহন করতে পারে—এই হল চিন্ময়পরিণামের একান্ত অপরিহার্য অন্নময় ভিত্তি। তারপর এই ভিত্তির 'পরে দেখা দেবে পর্বে-পর্বে চেতনার একটা ঊর্ধ্বপরিণাম বা উদয়ন—ক্রমিক উন্মেষের উৎসর্পিণী কম্বুরেখার আকার নিয়ে। পরিশেষে ঊর্ধ্বভূমিতে আরোহণ করবার সময় অবরভূমির উন্মেষিত তত্ত্বকে আত্মসাৎ করে তার অল্পবিস্তর রূপান্তর ঘটানো, যাতে সমগ্র আধারে এবং প্রকৃতিতে একটা নবজন্মের দ্যোতনা ও অভিনব সমাহরণের ঐশ্বর্য জাগে—এই হল প্রগতির তৃতীয় পর্ব, যাকে ছেড়ে দিলে প্রকৃতিপরিণামের কোনও সার্থকতাই থাকে না।

এই ত্রিপর্বা পরিণামের ফলে অবিদ্যাশক্তি বিদ্যাশক্তিতে রূপান্তরিত হবে, জীবনের মর্মমূলে নিহিত অচিতির জায়গা দখল করবে পূর্ণচেতনার পূর্ণিমা—আজ যার জ্যোৎস্নাসুধায় আমাদের অতিচেতন ভূমিই প্লাবিত শুধু। নবোন্মেষিত তত্ত্বের জারণাশক্তির ফলে উদয়নের প্রত্যেক পর্বে পূর্ব-প্রকৃতির একটা আংশিক বিপরিণাম দেখা দেবে। অচিতি পরিণত হবে অর্ধ-চেতনা বা অবিদ্যার আলো-আঁধারিতে—যার মধ্যে ক্রমে জ্ঞান এবং শক্তির আকৃতি উদ্বেল হয়ে উঠবে। কিন্তু এর মধ্যে উদয়নের বিশেষ-কোনও পর্বে আধারের নবীন নিয়ন্তারূপে অচিতি ও অবিদ্যার জায়গায় দেখা দেবে বিদ্যাতত্ত্ব বা ঋতময় চেতনার নিরাবরণ দ্যুতি—মৃন্ময়ী প্রকৃতি হবে চিন্ময়ী। অচিতির পরিবেশে প্রকৃতির সংমূঢ় পরিণাম হল জীবনের আদিপর্ব। তার মধ্যপর্ব অবিদ্যাকৃত পরিণাম। কিন্তু অন্ত্যপর্বে ঋতম্ভরা চেতনায় চিৎসত্তার প্রমুক্তি ঘটবে। তখন বিদ্যাশক্তিকে আশ্রয় করে চলবে আধারের চিন্ময়পরিণাম। আজ পর্যন্ত প্রকৃতিকে পরিণামের এই ধারা অনুসরণ করে চলতে দেখেছি। প্রগতির ভবিষ্যধারাও যে এর অনুরূপ হবে, চারিদিকে তার প্রচুর নিশানা ছড়ানো আছে। যা ফুটবে, প্রথমে তা বীজরূপে নিগূহিত হবে। তারপর সেই বীজ-ভাবকে ভিত্তি করে উন্মিষন্ত অন্তর্গূঢ় শক্তির চাপে দেখা দেবে উদয়নের কতগুলি দ্বন্দ্বসংকুল পর্ব। এবং অবশেষে পরমা শক্তির উন্মেষে ঊর্ধ্বভূমির স্তরগুলি দ্বন্দ্বহীন স্বাচ্ছন্দ্যের লীলায় ফুটে উঠবে। প্রকৃতির উত্তরায়ণের মানচিত্র এই।

আরও স্পষ্ট করে বলি। প্রকৃতিপরিণামের গোড়াতে পূর্বসিদ্ধ একটা মৌলিক সত্ত্ব বা উপাদান মানতে হয়, যাকে আশ্রয় করে তার অন্তস্তলে সংবৃত্ত কোনও-একটা বিশেষ তত্ত্ব স্ফুরিত হবে। এই অভিনব তত্ত্বটি মৌলিক তত্ত্বে অন্তর্গূঢ় না থেকে আগন্তুকও হতে পারে। কিন্তু তাহলে তার মধ্যে

খানিকটা ধর্মবিপরিণাম ঘটা আশ্চর্য নয়, কেননা এক্ষেত্রে আধারশক্তি প্রবল বলে মৌলিক তত্ত্বের বহিরঙ্গ যা-কিছু তার এলাকায় ঢুকবে, তাকে সে আপন স্বভাবের রঙে খানিকটা ছুপিয়ে নেবেই। এমন-কি এ যদি অকল্প্য-পরিণামও হয়, অর্থাৎ পরিণামের প্রত্যেক পর্বে যদি এমন অকল্পিত বিভূতির আবির্ভাব ঘটে, যা উপাদানতত্ত্বের সহজাত ধর্ম ছিল না কিন্তু বাইরের অতিথি হয়েও আজ ঘরের লোকের মত তার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, তাহলেও প্রকৃতিপরিণামের মূল রীতির কোনও বিপর্যয় হবে না—অর্থাৎ অতিথির গায়েও ঘরোয়া গন্ধ কতকটা হবেই। কিন্তু আধারে অভিনব যে তত্ত্ব কি বিভূতির স্ফুরণ হবে, সে যদি আগেই অসংহত বা অব্যক্ত অবস্থায় তার মধ্যে সংবৃত্ত থেকে থাকে, তাহলেও উন্মেষকালে আধারতত্ত্বের স্বভাব ও ধর্মের দ্বারা অল্পবিস্তর অনুরঞ্জিত তাকে হতেই হবে। কিন্তু এ-অনুরঞ্জন একতরফা হবে না—কেননা আধারতত্ত্বের মধ্যে উন্মিষন্ত তত্ত্বও আপন বীর্য ও স্বভাবের প্রেতি নিষিক্ত করবে এবং তাতেও তার খানিকটা বিপরিণাম ঘটবে।...এক্ষেত্রে অন্যোন্য-বিপরিণাম ছাড়া আরেকটা ব্যাপার ঘটতে পারে। প্রকৃতিপরিণামের ঊর্ধ্বে উন্মিষন্ত তত্ত্বের নিত্যস্থিতির একটা ভূমি থাকতে পারে, যেখানে অক্ষুণ্ণ মহিমায় সে প্রতিষ্ঠিত। এই স্বধাম হতে শক্তিপাতের দ্বারা অভিনব তত্ত্বটি আধারকে যদি কবলিত করতে চায়, তাহলে তার পক্ষে আধারের মুখ্য উপাদান বা নিয়ন্তা হওয়াও কিছু আশ্চর্য নয়। তখন সে ঘরের লোকই হ'ক আর অতিথিই হ'ক, যে-ভূমিতে সে বাসা বাঁধবে, তার চেতনা ও ক্রিয়ার মধ্যে পর্যাপ্ত অথবা আমূল রূপান্তর সে আনবেই। কিন্তু যে-আধারতত্ত্বকে সে আত্ম-পরিণামের মাতৃকারূপে বেছে নিয়েছে, তার ধর্মে-কর্মে কতখানি বিপর্যয় বা বিপরিণাম ঘটবে, তা নির্ভর করবে অভিনবের নিরূঢ় সামর্থ্যের সংবেগের 'পরে। অনাদি সন্মাত্রের স্বরূপবীর্য না হয়ে সে যদি কেবল তার জন্য ধর্ম বা সাধন বীর্য হয়, তাহলে আধারের আমূল রূপান্তর ঘটানো যে তার সাধ্যাতীত হবে, একথা বলাই বাহুল্য।

এখানে দেখছি, প্রকৃতির পরিণাম শুরু হয়েছে জড়বিশ্বকে আশ্রয় করে। জড়ই হল এখানকার আধার, পূর্ব্য উপাদান ও পূর্বসিদ্ধ নিমিত্তসামান্য। মন আর প্রাণ উন্মেষিত হয়েছে এই জড়ের বুকে। কিন্তু তাদের ক্রিয়াশক্তি সীমিত ও বিকৃত হয়ে দেখা দিয়েছে, কেননা প্রতি পদেই জড়ধাতুকে তাদের সাধনরূপে ব্যবহার করতে হয়েছে এবং জড়প্রকৃতিকে আপন ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করেও তার শাসনের বাঁধন থেকে কোনকালেই তারা মুক্তি পায়নি। জড়-ধাতুর অনেকটা রূপান্তর তারা ঘটিয়েছে, কেননা তাদের ছোঁয়া পেয়েই জড়-ধাতু প্রথম হয়েছে জীবন্ত ধাতু, পরে হয়েছে চেতন ধাতু। জড়ের অসাড়তা স্থাণুত্ব ও অচেতনাতে তারা চেতনা বেদনা ও প্রাণনের স্পন্দন এনেছে। কিন্তু

তাতেও কি জড়ের আমূল রূপান্তর সিদ্ধ হয়েছে? জড়কে তারা একেবারে প্রাণময় চিন্ময় করতে পারেনি। তাই জগতে প্রাণপ্রকৃতির উন্মেষ ব্যাহত হয়েছে মৃত্যুর দ্বারা, উন্মিষন্ত মনের মধ্যে পড়েছে জড় এবং প্রাণের স্পষ্ট ছাপ। মন স্বচ্ছন্দে পাখা মেলতে পারে না, কেননা তার মূলে আছে অচিতির টান, আছে অবিদ্যার বেড়াজাল। প্রাণশক্তির স্বৈরাচার তাকে তাড়িয়ে ফেরে আপন প্রয়োজনে, জড়শক্তি তাকে যন্ত্রের শামিল করে তোলে—অথচ তাকে ছেড়ে আত্মপ্রকাশের সাধ্যও তার নাই। এতেই প্রমাণ হয়, মন কি প্রাণ কেউ আদ্য সৃষ্টিশক্তি নয়। পরিণামের লীলায় তারা জড়েরই মত পরম্পরিত ও শ্রেণীকৃত অবান্তরসাধন মাত্র। আদ্যশক্তি জড়শক্তি না হলে তাকে খুঁজতে হবে প্রাণ ও মনেরও ওপারে। কেননা একটা গুহাহিত গভীর তত্ত্ব কোথাও আছেই—এখনও প্রকৃতিতে যার রূপায়ণ প্রত্যাশার বিষয় মাত্র।

সৃষ্টি বা পরিণামের মূলে একটা আদ্যশক্তির প্রেষণা রয়েছে—একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু জড় বিশ্বের আদ্যধাতু হলেও আদ্যশক্তিকে কোনমতেই অচিৎ জড়শক্তি বলা চলে না, কেননা তাহলে বিশ্বে প্রাণ বা চেতনার স্থান হবে কেমন করে? অচিতি হতে চেতনার উন্মেষ অথবা নিষ্প্রাণ শক্তিবেগ হতে প্রাণের উন্মেষ একটা অসম্ভব কল্পনা মাত্র। আবার প্রাণ অথবা মনও যখন বিশ্বের মূল তত্ত্ব নয়, তখন এক নিগূঢ় চিৎশক্তিকেই বিশ্ববিধাত্রী আদ্যা শক্তি বলে মানতে হবে। তার চিদংশ হবে প্রাণচেতনা ও মনশ্চেতনার চাইতেও বৃহৎ, আর তার শক্ত্যংশ হবে জড়শক্তির চেয়েও মৌলিক। মনের চাইতে সে বড়, তাই তাকে বলব অতিমানস চিতিশক্তি। আবার বিশ্বের রূপধাতু হয়েও জড় যখন জড়াতিরিক্ত কোনও স্বরূপধাতুর বীর্য, তখন তাকে চিৎস্বরূপের বীর্য বলেই মানতে হবে—কেননা চিৎসত্ত্বই সর্বভূতের পরম সত্ত্ব ও চরম ধাতু। মন আর প্রাণশক্তিতেও সিসৃক্ষার বীর্য আছে। কিন্তু তাতে প্রথম প্রৈতির অবন্ধ্য সামর্থ্য নাই বলে তার ক্রিয়া গৌণ এবং খণ্ডিত। তাই দেখি, প্রাণ ও মন যে কেবল আধারের জড়ধাতুর শাসন মেনে চলে তা নয়, তার সত্ত্ব ও শক্তির যথেষ্ট বিপরিণামও ঘটায়। কিন্তু তাহলেও এই বিপরিণাম এবং প্রশাসনের ধারা ও পরিমাণ সর্বাধিবাস ও সর্বাধার চিৎ-পুরুষের ঈশনায় নিরূপিত হয়। তাঁর মধ্যে রয়েছে যে গুহাহিত অন্তর্জ্যোতি, অতিমানসের যে-প্রবেগ, বিজ্ঞানশক্তির যে রহস্যময় প্রবর্তনা, আত্মবিদ্যা ও সর্ববিদ্যার যে অবাঙ্‌মানসগোচর ঐশ্বর্য—প্রাণ ও মনের লীলায়নের কাণ্ডারী হয় সে-ই। অতএব আধারের পূর্ণ রূপান্তর ঘটতে পারে একমাত্র চিৎ-পুরুষের স্বধর্মের অকুণ্ঠিত স্ফুরণে। তাঁর অতিমানস বা বিজ্ঞানঘন স্বরূপবীর্য জড়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সহস্রদল মহিমায় ফোটে যখন, তখনই রূপান্তরসিদ্ধি পূর্ণায়িত হয়। তখন মনোময় পুরুষকে সে করে অতিমানস 'অমানব পুরুষ', অচেতনকে করে সচেতন,

অন্নময় আধারকে করে চিদ্‌ঘন বিগ্রহ, বিজ্ঞানঘন চেতনার জ্যোতিঃপ্লাবনে আমাদের প্রাকৃত সত্ত্ব ও প্রকৃতির পরিণমনের রীতিতে ঘটায় আমূল রূপান্তর। একেই বলি চিৎপ্রকাশের চরম পর্ব। অন্তত এখান হতেই শুরু হয় গোত্রান্তরিত প্রকৃতির নব পরিণামের তপস্যা—যা অবিদ্যাশক্তিকে বিদ্যাশক্তিতে এবং অচিতির মূলকে বিজ্ঞানধাতুতে পরিবর্তিত করে।

জড়বিশ্বে চিৎসত্তার এই ক্রমিক আত্মোন্মীলনে যে পরিণামের ধারা আবর্তিত হয়ে চলেছে, প্রতি পদে তাকে একটা বিষয়ের হিসাব রেখে চলতে হয়। জড়ধাতুর রূপায়ণ ও ক্রিয়ার মধ্যে চিৎশক্তি যে নিজেকে সংবৃত্ত করে রেখেছে, একথা ভুললে তার চলে না। আধারে সংবৃত্ত ও নিগূহিত চেতনা এবং শক্তিকে জাগিয়ে তুলে তার উত্তরায়ণের অভিযান শুরু হয়। তারপর তত্ত্বে-তত্ত্বে চক্রে-চক্রে চলে গুহাহিত শিববীর্যের সমৃদ্ধতর উদয়ন। কিন্তু শক্তির ঊর্ধ্বসংক্রমণে তবুও অনেক জটিলতা থাকে। উত্তারের পথে প্রত্যেকটি চক্রে বা ভূমিতে ক্রিয়াশক্তির ধর্ম কি বেগ নিরূপিত হয় শুধু তার স্বধামোচিত শুদ্ধধর্মের স্বচ্ছন্দ প্রেতি বা স্বভাবধর্মের তীব্রসংবেগ দ্বারাই নয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে চিন্ময় শক্তির বাহনরূপী মৃন্ময় আধারেরও খানিকটা প্রভাব। চিৎশক্তি জড়কে কতখানি বশে এনেছে, চিৎসত্ত্বের কতটুকু সিদ্ধি জড়ের মধ্যে নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছে—এককথায় জড়ের ঘরে চিৎশক্তির মর্যাদা কতখানি, তারও পরিমাণ দেখে বিচার করতে হয় আধারের চিন্ময় রূপান্তর সহজ হল কিনা। এইজন্যই চিৎশক্তির সার্থক প্রবৃত্তির বেলায় দেখি, দুদিকের হিসাব মিলিয়ে তার কাজ চলছে। একদিকে রয়েছে ঊর্ধ্বপরিণামের বশে চিৎ-প্রকাশের একটা নিশ্চিত বরাদ্দ—এই হল তার জমার দিক; আর খরচের দিকে আছে উন্মিষিত চিৎশক্তির 'পরে অচিতির প্রভাব, কেননা এখনও অচিতি তাকে নাগপাশের আড়ষ্ট বন্ধনে জড়িয়ে আছে, তার প্রকাশকে অন্ধশক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন অনুবিদ্ধ এবং স্তিমিত করে রেখেছে। তাই দেখি, চিৎসত্ত্বের শক্তি হয়েও প্রাকৃত মন তার শুদ্ধস্বভাবের স্বাতন্ত্র্য পায়নি—অচিতির আবেষ্টনে সে অনচ্ছ এবং কুণ্ঠিত। তবু অন্ধতামসকে বিদীর্ণ করে জ্ঞানের আলো ফুটিয়ে তোলবার জন্যে তার বিরামহীন তপস্যা চলেছে। বাস্তবিক সব-কিছুই নির্ভর করছে চেতনার কতখানি সংবৃত্ত আর কতখানি বিবৃত্ত, তার 'পরে। অচিৎ জড়ে চেতনাকে দেখি পূর্ণসংবৃত্ত; তারপর জড়ের আধারে প্রাণের প্রথম উন্মেষে চিত্তহীন জীবের আবির্ভাবে তাকে দোল খেতে দেখি অচিৎ সংবৃত্তি আর সচিৎ বিবৃত্তির মধ্যে। তারও পরে দেখি তার জাগ্রত পরিণাম—জীবদেহে বন্দী মনের সঙ্কীর্ণ ও কুণ্ঠিত প্রচারে। সবার শেষে, চেয়ে আছি তার অন্তিম পরিণামের দিকে, যখন মনোময় সত্ত্ব ও প্রকৃতির স্থূল বিগ্রহেই জাগবে অতিমানসের সুপ্রবুদ্ধ চেতনা।

চিৎপরিণামের প্রত্যেক পর্বে তারই প্রতিরূপ এক-একটি ভূতগ্রাম দেখা দেয়। একে-একে আবির্ভূত হয় শুদ্ধজড়ের বিগ্রহ ও জড়শক্তি, উদ্ভিদ, পশু, পশুপ্রায় মানুষ, পুরা মানুষ, অল্প-বিস্তর পরিণত চিন্ময়-সত্ত্ব। কিন্তু পরিণামের ধারা অবিচ্ছেদ বলে তাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান কোথাও নাই। তাই পূর্বকান্ডকে আত্মসাৎ করে দেখা দেয় প্রগতি বা রূপায়ণের উত্তরকান্ড। এমনি করে পশুর দ্বারা কবলিত হয় সজীব এবং অজীব জড়ের ধর্ম, আবার মানুষ গ্রাস করে পশুত্ব এবং সজীব ও অজীব জড়ত্ব—এই তিনটিকেই। অবশ্য পর্বসংক্রান্তির মাঝে-মাঝে অহল্যা প্রকৃতির বুকে হলাকর্ষের বিদারেরেখা দেখা দেয়—যা তার চিরাচরিত অভ্যাসের ফল। কিন্তু এতে একটি পর্বের সঙ্গে আরেকটি পর্বের প্রভেদই সূচিত হয়। হয়তো তার উদ্দেশ্য সিদ্ধপরিণামের পিছিয়ে-আসাটুকু বারণ করা—পরিণামের অবিচ্ছেদ সূত্রকে ত্রুটিত করা নয়। চিৎপরিণামের এই পর্বসংক্রান্তি ঘটে—কখনও অতিসূক্ষ্ম ক্রমায়ণের দুর্লক্ষ্য শম্বুগতিতে, কখনও-বা আকস্মিক মণ্ডূকপ্লুতিতে। আবার কখনও সংক্রমণের মূলে থাকে শক্তিপাত—অর্থাৎ প্রকৃতির উত্তরভূমি হতে নেমে আসে চিদ্-বিভূতির একটা বিশেষ সংবেগ। কিন্তু যেমন করেই হ'ক, গুহাশায়ী গৃহ-পতিরূপে জড়ের আধারে যে-চেতনা অন্তর্গূঢ় হয়ে রয়েছে, তার পক্ষে এতে অবরভূমি হতে উত্তরভূমিতে ঊর্ধ্বায়নের পথ নিষ্কণ্টকই হয়। সে যা ছিল, তাকে সে-যা-হয়েছে তার রসে জীর্ণ করে অতীত ও বর্তমান উভয়কেই সে ভবিষ্যের কোঠায় টেনে তোলবার আয়োজন করে। তাইতে দেখি, জড়সত্ত্ব জড়রূপ জড়শক্তি ও জড়ভূত দিয়ে সে তার বিসৃষ্টির গোড়াপত্তন করে। মনে হয়, সে বুঝি জড়ের মধ্যে অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু এখন জানি, ওই আপাতসুপ্তির ঘোরেও সে অবচেতন স্পন্দের বাহন হয়ে ধীরে-ধীরে জড়ের মধ্যে ফুটিয়ে তোলে প্রাণ ও প্রাণী, জাগায় মন ও মানব। অতএব এরই অনুবৃত্তিস্বরূপ নিশ্চয় সে এবার ফোটাবে অতিমানস এবং অতিমানব। দীর্ঘযুগবাহী পরিণামের ধারা বেয়ে আজ প্রকৃতি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে মানুষকে মনে হয় তার সৃষ্টির চরম বিভূতি। কিন্তু বাস্তবিক মানুষে পৌঁছেই তো চিৎপরিণামের শেষ হয়নি। উত্তরায়ণের পথে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে মহাবিষুবের সংক্রান্তিবিন্দুতে, এই তার বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির পরিণামে যদি একটা অবিচ্ছেদ অনুবৃত্তি থাকে, তাহলে তার যে-কোনও পর্বে দেখা দেবে অতীতের মুখ্য পরিণামসমূহের একটা প্রত্যক্ষগোচর সমাহার, বর্তমানের সাধ্য পরিণামসমূহের একটা সম্ভূতি এবং ভবিষ্য-পরিণামের একটা সম্ভাবনা—যার মধ্যে অনুন্মিষিত শক্তি ও সত্ত্বের সার্থক আবির্ভাবে বিসৃষ্টির ষোড়শকলা পূর্ণ হবে। বিশ্ব জুড়ে আমরা এই ব্যাপারই দেখছি। অতীত যুগের ইতিহাস অবচেতনার অতিমন্থর কৃচ্ছ্রতপস্যার ইতিহাস—যার ফল তল-

স্পর্শী হতে পারেনি। প্রকৃতিপরিণামের এই হল অচেতন পর্ব। বর্তমান যুগকে বলতে পারি তার ক্রমসচেতন মধ্য পর্ব। প্রগতির ধারা এখানে চলেছে যেন একটা অনিশ্চিত কম্বুরেখার অনুসরণে। সন্ধিনীশক্তির নিগূঢ় প্রেতি মানুষের বুদ্ধিকে এবার পরিণামের সাধনরূপে গ্রহণ করেছে, কিন্তু তাকে তার কর্মসচিব করেও সকল বিস্রম্ভের অধিকারী করেনি। ঠিক এই ধারা ধরে ভবিষ্যযুগে দেখা দেবে চিৎসত্তার উত্তরোত্তর সচেতন পরিণাম, যার চরম পর্বে বিজ্ঞানঘন তত্ত্বের উন্মেষে তার ক্রিয়া হবে আত্মসংবিতের পরিপূর্ণ প্রদ্যোতনায় স্বচ্ছন্দ।

এই বিজ্ঞানঘন উন্মেষের গোড়ার বনিয়াদ হল জড়বিগ্রহের বিসৃষ্টি। তারও আদিকাণ্ডে দেখা দিল অচিৎ ও অজীব জড়-সংঘাত, তার পরে সজীব ও সমনা জড়-সংঘাত। ধীরে-ধীরে ফুটল চেতনার উপচীয়মান বীর্যকে অনায়াসে প্রকাশ করবার উপযোগী আধারের উত্তরোত্তর সম্যক্-সংহতি— চিদাধার জড় ক্রমে হয়ে উঠল সূক্ষ্মতর চিদ্‌বিলাসের বাহন। আধুনিক বিজ্ঞান জড়ের দিক থেকে এই আকৃতিপরিণামের ইতিহাসকে খুঁটিয়ে আলোচনা করেছে, কিন্তু তার আন্তর চিৎপরিণামের দিকটাতে তার নজর পড়েনি। সে-সম্পর্কে যেটুকু গবেষণা হয়েছে, তারও বেলায় চেতনার জড়ীয় ভিত্তি ও জড়ীয় সাধনের কথাটাই বড় হয়েছে—প্রগতির পথে স্বভাবধর্মের তাগিদে চেতনার ক্রিয়া কেমন করে ফুটছে, তার কথা বিশেষ-কিছুই হয়নি। প্রকৃতির পরিণামে একটা অবিচ্ছেদ অনুবৃত্তি আছেই। জড়কে আত্মসাৎ করে যেমন প্রাণের প্রকাশ, তেমনি অবমানস প্রাণকে আত্মসাৎ করে দেখা দেয় মন। আবার ইন্দ্রিয়-প্রাণময় মনকে গ্রাস করে দেখা দেয় বুদ্ধিময় মন। তবু পরিণামের একটি পর্ব হতে আরেকটি পর্বে চেতনার উৎক্রমণে আমরা একটা দুরত্যয় ব্যবধান দেখি। মনে হয় উল্লঙ্ঘন বা সেতুবন্ধন কোনও উপায়েই এ-সাগর ডিঙানো অসম্ভব। কি করে যে প্রকৃতি এ-সাগর লঙ্ঘন করেছিল অতীত যুগে অথবা আদপেই করেছিল কিনা, তারও কোন প্রত্যক্ষ ও সন্তোষজনক প্রমাণ আমরা খুঁজে পাই না। এমন-কি আকৃতিপরিণামের বেলাতেও, যেখানে সুস্পষ্ট তথ্যের সঙ্কলন প্রচুর, সেখানেও এমন কতগুলি লুপ্তপর্ব আছে, যারা চিরকাল লুপ্তই থেকে যাবে। কিন্তু চিৎপরিণামের বেলায় বিচ্ছেদের রেখাটা আরও গভীর। মনে হয় সেখানে সংক্রমণ ঘটেনি, ঘটেছে রূপান্তর। এ-ধারণার কারণ সম্ভবত আমাদের দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা। যা অবমানস বা অব-চেতন অথবা আমাদের চিত্তভূমি থেকে পৃথক কি নীচের ধাপে, আমরা তার মধ্যে ঢুকতে পারি না কিংবা তাকে ভাল করে বুঝতে পারি না। তাই চিৎ-পরিণামের প্রত্যেক ধাপে এবং দুটি ধাপের সীমান্তে যে অগণিত সূক্ষ্ম পর্ব-ভেদ, তা আমাদের চোখেই পড়ে না। জড়বিজ্ঞানী জড়ের তথ্যকে তন্নতন্ন

বিচার করেও প্রকৃতিপরিণামের অনেক ফাঁক ও লুপ্তপর্ব আজও খুঁজে পাননি। কিন্তু পরিণামের ধারাবাহিকতায় অবিশ্বাস করবার কোনও কারণও তিনি দেখেন না। আমরাও যদি আন্তরপরিণামকে তেমনি করে খুঁটিয়ে দেখতে পারতাম, তাহলে বিপুল বিচ্ছেদের মধ্যে অনুবৃত্তির সেতুবন্ধন করা নিশ্চয়ই অসম্ভব হত না।...কিন্তু তবু পর্বে-পর্বে বস্তুতই যে-একটা মৌলিক ব্যবধান আছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। অনেকসময় ব্যবধানটা এতই বিরাট যে, একটি পর্বের তুলনায় তার উত্তরপর্বকে মনে হয় একটা নতুন সৃষ্টি বা অলৌকিক রূপান্তর। কিছুতেই ভাবতে পারা যায় না যে, প্রকৃতির এ একটা স্বচ্ছন্দানুমেয় স্বাভাবিক পরিণতি, কিংবা অনায়াস পরম্পরার সোপান বেয়ে পা গুনে-গুনে সে এক পর্ব হতে আরেক পর্বে হাজির হয়েছে।

প্রকৃতিপরিণামের ঊর্ধ্বপর্বে অন্যোন্যব্যবধান হয় সংকীর্ণ কিন্তু গভীরতর। বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন, ধাতুতে আর উদ্ভিদে প্রাণের সাড়া স্বরূপত একইধরনের! কিন্তু আধারগত বৈষম্যের দরুন এই ক্রিয়ার প্রকাশে এতখানি পার্থক্য দেখা দেয় যে, ধাতুকে আমরা মনে করি নিষ্প্রাণ আর উদ্ভিদকে স্থান দিই আপাত-অচেতন অথচ প্রাণবান জীবের পর্যায়ে। উদ্ভিদ-জীবনের উচ্চতম কোটির সঙ্গে পশুজীবনের নিম্নতম কোটির তুলনায় ব্যবধানটা আরও গভীর হয়ে দেখা দেয়—কেননা পশুর মধ্যে আছে মন, আর উদ্ভিদের মধ্যে মনশ্চেতনার বিন্দুমাত্র আভাসও বাইরে ফোটেনি। উদ্ভিদের মনোধাতু অসাড় অপ্রবুদ্ধ, অথচ তার জীবনে প্রাণের সাড়া খুবই স্পষ্ট। মনে হয়, অবদমিত অবচেতন বা অবমানস হলেও ইন্দ্রিয়সংবেদনের একটা আকারপ্রকারহীন অথচ অতিতীব্র স্পন্দন তার আছেই। কিন্তু ইতর-জীবের আদিপর্যায়ে জীবনের শুরু হয় অবচেতনাকে নিয়ে—ব্যক্তচেতনার অপূর্ণ অভিব্যক্তিতে একটা নিজস্ব নতুন ধারার প্রবর্তন হয় তার মধ্যে। তাই তার প্রাণলীলাও উদ্ভিদের মত নির্বাধ ও স্বয়ংতন্ত্র নয়। অথচ তার মধ্যে মন জেগেছে, জীবনে চেতনার আবির্ভাবে দেখা দিয়েছে প্রকৃতিপরিণামের একেবারে নতুন একটা পর্ব। উদ্ভিদে আর পশুতে কায়সংস্থানের তারতম্য যতই থাকুক, উভয়ের প্রাণলীলার সারূপ্য ব্যবধানের গভীরতাকে পূরণ না করলেও তার বিস্তারকে সংকীর্ণ করেছে। আবার পশুর পরম কোটির সঙ্গে মানুষের অবম কোটিব তুলনায় উভয়ের মধ্যে ব্যবধান দেখা দিয়েছে ইন্দ্রিয়-মানস আর বুদ্ধিতে। এখানেও দেখি, ব্যবধানের বিস্তার যেমন কমেছে, তেমনি বেড়েছে তার গভীরতা। অসভ্য মানুষের আদিম প্রকৃতিকে যত অমার্জিতই বলি না কেন, তবু সে যে পশু হতে একেবারে অন্য পর্যায়ের জীব—একথা অনস্বীকার্য। পশুর মত অসভ্যতম মানুষেরও ইন্দ্রিয়মানস আছে, আছে প্রক্ষুব্ধ প্রাণের সংবেগ ও ব্যাবহারিক বুদ্ধির একটা কাঁচা

বুনিয়াদ। কিন্তু এছাড়াও তার মধ্যে দেখা দিয়েছে মনুষ্যবুদ্ধির সকল বৈশিষ্ট্যের আভাস। পরিমাণে যত স্বল্প হ'ক, তবু তার আছে বিতর্ক বিচার ও ভাবনার সামর্থ্য, নতুন-কিছু গড়বার সচেতন নৈপুণ্য, চরিত্র ধর্ম ও পরলোক সম্পর্কে চিন্তা ও বেদনা—এককথায় মনুষ্যজাতির যা-কিছু সাধ্য, সেসমস্তেরই একটা পরিষ্কার সূচনা। অসভ্য আর সভ্য মানুষের বুদ্ধির গড়ন একইধরনের—শুধু অতীতের শিক্ষা-দীক্ষার দৈন্যবশত অসভ্য মানুষের বুদ্ধি নতুন দিকে মোড় নিতে পারেনি, অথবা তার সামর্থ্য প্রবৃত্তি এবং তীক্ষ্ণতা যথেষ্ট পরিণতি লাভ করবার সুযোগ পায়নি।...এমনি করে প্রকৃতি-পরিণামে পর্বভেদ থ'কলেও, প্রজাপতি বা ঈশ্বর যে প্রত্যেকটি জীবজাতিকে দেহে এবং চেতনায় আলাদা-আলাদা সৃষ্টি করে জগতের আঙিনায় ছেড়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন, আর নিজের সৃষ্টির তারিফ করছেন—এ-কল্পনাও অশ্রদ্ধেয়। একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : হয়তো গূঢ়চেতন অথবা অচেতন এক মহাশক্তি ক্ষিপ্র বা মন্থর গতিতে সৃষ্টির পর্বে-পর্বে এই ভেদের পরম্পরা গড়ে তুলেছে—অন্নময় প্রাণময় অথবা মনোময় বিচিত্র যন্ত্রকৌশলের নিপুণ প্রয়োগে। হয়তো এককালে যা ছিল পর্বসংক্রমণের সোপান অথচ আজ হয়েছে প্রকৃতিপরিণামের পক্ষে নিরর্থক কি অবান্তর, তাকে আলাদা করে জিইয়ে রাখবার কোনও প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করেনি। তার পরিণামের ধারা-বাহিকতায় মাঝে-মাঝে দেখা দিয়েছে এক-একটা দুস্তর ফাঁক।...কিন্তু এ-সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত অনেকটা কল্পনার শামিল, কেননা তাকে সুপ্রতিষ্ঠ করবার মত মালমসলা এখনও আমরা হাতের কাছে পাইনি। বরং এমন হওয়াই সম্ভব যে, মৌলিক পর্বভেদের কারণ নিহিত রয়েছে পরিণামের অন্তর্গূঢ় শক্তির প্রবর্তনাতে, বাহ্যিক আকৃতিপরিণামের ধারাতে নয়। প্রকৃতি-পরিণামের সূত্র বাইরে না খুঁজে যদি ভিতরে খুঁজি অর্থাৎ চিৎপরিণাম দিয়ে যদি আকৃতিপরিণামের ব্যাখ্যা করি, তাহলে জাত্যন্তর-পরিণামের রহস্য বুঝতে আর কষ্ট হয় না। তখন মনে হয়, প্রকৃতিপরিণামের স্বাভাবিক ছন্দ অনু-সারেই তো আলোচিত পর্বভেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ব্যাপারটাকে জড়বিজ্ঞানীর বহির্দৃষ্টি দিয়ে না দেখে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখি, প্রকৃতিপরিণামের এক পর্বের সঙ্গে আরেক পর্বের তফাত ঘটছে এক ভূমি হতে আরেক ভূমিতে চেতনার উদয়নে—এই হল আসল তত্ত্ব। ধাতুর স্বভাব নিরূঢ় হয়ে আছে জড়ের নিষ্প্রাণ অচিতিস্বভাবে। যদি-বা প্রাণনের আভাস নিয়ে একটুখানি সাড়া তার মধ্যে জেগেও থাকে, অথবা উদ্ভিদের আধারে প্রাণোন্মেষের অস্ফুট সূচনা নিয়ে এতটুকু কাঁপনও লেগে থাকে তার বুকে, তবু প্রাণনের বিশিষ্ট ধর্মের বাহন যে সে নয়, সে যে বিশেষ করে জড়ধর্মী—একথা অনস্বীকার্য। তেমনি উদ্ভিদের স্বভাব বন্দী

রয়েছে প্রাণের অবচেতন প্রবৃত্তিতে। তাবলে সে যে জড়ের অধীন নয় কিংবা অন্তত তার কতগুলি সাড়া যে মননধর্মী নয়, তা কিন্তু বলা চলে না। উদ্ভিদের কতকগুলি বৃত্তি বস্তুতই অবমানস—আমাদের চিত্তগত সুখ-দুঃখ বা আকর্ষণ-বিকর্ষণের মৌল উপাদানের সঙ্গে তাদের একটা মিল রয়েছে। তবু উদ্ভিদকে যেমন জড়রূপ বলব না, তেমনি সম্ভবত মনশ্চেতন জীবও বলব না—তাকে বলব প্রাণেরই একটা রূপায়ণ। মানুষ আর পশু দুয়ের মধ্যেই মনের চেতনা আছে। কিন্তু পশু আটকা পড়েছে প্রাণময় মনে ও ইন্দ্রিয়মানসে, তার গণ্ডিকে পার হবার তার উপায় নাই। আর মানুষের ইন্দ্রিয়মানসের 'পরে পড়েছে বুদ্ধি-রূপী একটা নতুন তত্ত্বের আলো—যা বস্তুত অতিমানসের যুগপৎ বিকার এবং প্রতিবিম্ব। তুর্যাতীত বিজ্ঞানের একটি রশ্মি পড়েছে মানুষের ইন্দ্রিয়মানসের মুকুরে, কিন্তু তার বন্ধুরতায় সে-রেখা বাঁকা হয়ে আরেক রূপ ধরেছে। তার দরুন ইন্দ্রিয়মানসের তাঁবেদার হয়ে বিজ্ঞানধর্মকে হারিয়ে সে সংশয়ীর অজ্ঞান-ধর্ম কবুল করেছে। তাই সে জ্ঞানের সন্ধানী—কেননা তার জ্ঞানের ভাণ্ডার দেউলিয়া, অতিমানসের মত জ্ঞানস্বভাবে সে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত নয়।...এমনি করে প্রকৃতিপরিণামের প্রত্যেক পর্বে বিশ্বসৎ তার চেতনার বৃত্তিকে এক-একটা পৃথক তত্ত্বের বেষ্টনীতে বন্দী করেছে। অথবা উত্তমধর্মের দ্বারা না হ'ক অন্তত উত্তরধর্মের দ্বারা ভাবিত করেছে অবরধর্মকে—যেমন মানুষ আর পশুর বেলায়। এক তত্ত্ব হতে সম্পূর্ণ পৃথক আরেক তত্ত্বে এমনতর উৎপ্লবনের ফলেই প্রকৃতির পরিণামে দেখা দেয় পর্বের ভেদ, বিভাজনের গভীর রেখা বা দুস্তর ব্যবধান। তাইতে জাতিতে-জাতিতে সকল ধরনের ধর্মভেদ না হ'ক, স্বভাবের একটা মৌলিক ভেদের সৃষ্টি অপরিহার্য হয়।

কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, উত্তরোত্তর তত্ত্বসংক্রমণের ধারা ধরে এই-যে প্রকৃতির উদয়ন, এতে কিন্তু উত্তরভূমিতে আরোহণের ফলে অবরভূমি পরিত্যক্ত হয় না। আবার অবরভূমিতে স্থিতির অর্থও এ নয় যে তার মধ্যে উত্তরতত্ত্বের আবেশের কোনও আভাস নাই। পর্ববিচ্ছেদের দরুন পরিণামবাদের বিরুদ্ধে যে-আপত্তি উঠেছিল, এইদিক দিয়ে দেখলে তাকে আর তেমন গুরুতর মনে হয় না। কেননা, অবরপর্বে উত্তরপর্বের অংকুর যদি থাকে এবং সত্তার ঊর্ধ্ব-পরিণামে যদি অবরধর্মেরও ঊর্ধ্বপাতন ঘটে, তবে তাকে নিঃসংশয়ে আমরা প্রকৃতিপরিণামের পর্যায়ে ফেলতে পারি। অব্যাহত পরিণামের জন্য প্রয়োজন শুধু অবরপর্বের অনুশীলনদ্বারা এমন-একটা ভূমিতে তাকে উন্নীত করা, যেখানে উত্তরপর্বের প্রকাশ স্বচ্ছন্দ এবং আয়াসশূন্য হতে পারে। এই ভূমিতে এলে পর, কোনও ঊর্ধ্বতর ভূমি হতে শক্তিপাতের ফলে অবরপর্বের অল্পাধিক ক্ষিপ্র এবং সুনিশ্চিত রূপান্তর ঘটে—কখনও তড়িৎগতিতে, কখনও-বা দমকে-দমকে। প্রথমে হয়তো দুর্নিরীক্ষ্য শম্বুগতিতে অথবা অলক্ষ্য ফল্গুধারায়

উত্তরায়ণের অভিযান শুরু হয়। তারপর আকস্মিক দ্রুতবিসর্পণে উপান্ত-ভূমিতে এসে প্রকৃতি ঝাঁপিয়ে পড়ে পরিণামের আরেক পর্বে। মনে হয়, এমনিতর এক রীতিতে নিম্নভূমি হতে ঊর্ধ্বভূমিতে চেতনার সংক্রমণ ঘটেছে।

বস্তুত জড়পরমাণুর মধ্যেও প্রাণ মন ও অতিমানসের ক্রিয়া চলছে—শক্তির অবচেতন বা আপাত-অচেতন ছন্দোলীলায়, অদৃশ্য অতীন্দ্রিয় ও অন্তর্গূঢ় একটা প্রবর্তনা নিয়ে। তার অন্তরে এক অন্তর্বাসী চিৎসত্তার অধিবাস রয়েছে এবং তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে শক্তি ও আকৃতির একটা বহির্ব্যঞ্জনা—যাকে আমরা বলতে পারি পরমাণুর অন্তঃস্যূত এবং অন্তর্গূঢ় চিন্ময় নিয়ন্তৃশক্তি হতে বিবিক্ত একটা রূপময় বস্তুস্থিতি মাত্র। পরমাণুর এই বাহ্যশক্তি এবং বাহ্য-আকৃতি জড়ের ক্রিয়ায় আত্মভোলা হয়ে আছে। সে-ক্রিয়ায় তার এত প্রগাঢ় অভিনিবেশ যে, আত্মবিস্মৃতির অতলে তলিয়ে সে স্থাণুর রূপ ধরেছে, তার স্বরূপ বা কর্মের সকল চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। অতএব বলতে পারি, প্রকৃতির রাজ্যে পরমাণু আর অতিপরমাণুরা যেন চিরন্তন স্বপ্নচর বা নিশিতে-পাওয়া সত্ত্ববিশেষ। প্রত্যেক জড়ভূতের এই ধারা। তাদের প্রত্যেকের রূপের মধ্যে সংবৃত্ত এবং অভিনিবিষ্ট একটা রূপচৈতন্য রয়েছে—সুপ্তির ঘোরে অচেতন হয়ে কোন্‌-এক অজ্ঞাত অননুভূত আন্তরসত্তার প্রবেগে সে বাহিত হয়ে চলেছে। ওই আন্তরসত্তাকেই উপনিষদ বলেছেন 'প্রত্যেক সুষুপ্তে নিত্য-জাগ্রত সর্বভূতাধিবাস পুরুষ'। পরমাণুতে এই রূপচৈতন্য নিত্যসুষুপ্ত—কোনদিন সে জাগেনি বা জেগেও উঠবে না নিশিতে-পাওয়া মানুষের মত।... এই সুপ্তির উপরস্তরে দেখা দিল প্রাণ। অর্থাৎ অন্তর্গূঢ় চিৎসত্তার শক্তি এতখানি ঘনীভূত ও তীক্ষ্ণবীর্য হল যে তার মধ্যে ক্রিয়াশক্তির নতুন একটা ধারা প্রবর্তিত হল—জীবের জীবনীশক্তিতে আমরা অহরহ যার পরিচয় পাচ্ছি। বিশ্বের অভিঘাতে সে প্রাণের স্পন্দন দিয়ে সাড়া দেয়, যদিও সে-সাড়াতে মনের সংবিৎ নাই। অথচ তাকেই আশ্রয় করে উৎসারিত হল ক্রিয়া-শক্তির একটা ঊর্ধ্বতন ও সূক্ষ্মতর প্রবৃত্তি—বিশুদ্ধ জড়বৃত্তিতে যার কোনই আভাস ছিল না। সেইসঙ্গে তার মধ্যে অনাত্মীয়কে আত্মসাৎ করবার এক অভিনব সামর্থ্য দেখা ছিল। বিশ্বপ্রকৃতির দেওয়া জড় ও প্রাণের অভিঘাতকে গ্রহণ ক'রে অ-পূর্ব জীবনস্পন্দের বিচ্ছুরণে তাদের রূপান্তরিত করা হল তার একটা বৈশিষ্ট্য। শুদ্ধ জড়ময় সংঘাত দ্বারা এ-ব্যাপার কখনও সাধিত হতে পারে না। শক্তির অভিঘাতকে প্রাণ বা তৎসম কোনও বৃত্তিতে রূপান্তরিত করবার ক্ষমতা জড়ের নাই, কেননা জড়সংঘাতের গ্রহণশক্তি থাকলেও (অতীন্দ্রিয়দর্শনের সাক্ষ্য মানলে এধরনের গ্রহণশক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না) তা এমনি স্তিমিত যে, নিশ্চুপ হয়ে গ্রহণ করে নিঃসাড়ে সাড়া দেওয়াই তার সাধ্যের সীমা। তাছাড়া জড়বিগ্রহের নিষ্প্রাণ স্থূলত্বও

এমনি নিরেট যে, শক্তির সূক্ষ্মাতিক্ষ্ম অভিঘাতকে কোনও কাজে লাগাবার সামর্থ্যও সে রাখে না' জড়দেহ দিয়ে উদ্ভিদের প্রাণের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হলেও, প্রাণশক্তি সেখানে জড়কে প্রাণের মর্যাদা দিয়ে জড়সত্তার একটা অভিনব রূপান্তর ঘটিয়েছে।

তারপর পশুতে ইন্দ্রিয় এবং মন ফুটল, দেখা দিল চেতন জীবন। কিন্তু সেখানেও চিৎপ্রকাশের এই একই রীতি। পশুর আধারে সন্ধিনীশক্তি আরও ঘনীভূত ও তীক্ষ্ণবীর্য হয়ে একটা নতুন তত্ত্বের অবতারণা করল—অন্তত জড়ের রাজ্যে তাকে নতুন-একটা আবির্ভাব বলতেই হবে। অর্থাৎ পশুর মধ্যে জড় ও প্রাণকে ছাপিয়ে ফুটল মন। আত্মীয় এবং অনাত্মীয় সত্তা সম্পর্কে পশুর মানসসংবিৎ আছে। তার প্রবৃত্তির ধরনও অনেকটা সূক্ষ্ম এবং উন্নত, অনাত্মবিগ্রহ হতে অন্নময় প্রাণময় এবং মনোময় অভিঘাতের বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করবার সামর্থ্য এবং অধিকারও তার ব্যাপক। অন্নময় এবং প্রাণময় জগৎকে আত্মসাৎ ক'রে তাদের মধ্যে সে ইন্দ্রিয়সংবিৎ এবং ইন্দ্রিয়-মানসের রূপ ফোটায়। পশু বোধময়, কিন্তু সে-বোধ শুধু শরীর ও প্রাণের বোধ নয়—মনেরও বোধ। কেননা কেবল যে নাড়ীতন্ত্রের মূঢ় প্রবৃত্তিই তার রয়েছে, তা নয়—তার আছে সংজ্ঞা বেদনা ভাবনা বাসনা স্মৃতি ও সংস্কার, আছে প্রবৃত্তি ইচ্ছা ও হৃদয়ের সচেতন সংবেগ। এমন-কি খানিকটা ব্যাবহারিক-বুদ্ধিও তার আছে—ভূয়োদর্শন অনুষঙ্গ স্মৃতি অভাবের তাড়না এবং খানিকটা কুশলী প্রতিভা যার ভিত্তি। চাতুরী উপায়কুশলতা ও পরিকল্পনাশক্তিরও তার অভাব হয় না। একটা নতুন-কিছু আবিষ্কার করা এবং পরিবেশের সঙ্গে তাকে খানিকটা খাপ খাইয়ে নেওয়া অথবা নতুন পরিস্থিতির গরজে কোথাও-কোথাও তার অদলে-বদল করা—এদিকেও পশুর বুদ্ধি খেলে। একে অর্ধ-চেতন নিসর্গবৃত্তিও বলা চলে না। বস্তুত পশুবুদ্ধি মনুষ্যবুদ্ধির ভূমিকা-মাত্র।

কিন্তু মানুষের মধ্যে দেখি, সমস্ত ব্যাপারটা চৈতন্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মানুষ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাই তাকে নিমিত্ত করে ব্রহ্মাণ্ড নিজের কাছে আত্মপরিচয় ফুটিয়ে তোলে। পশুত্বের অবমকোটিতে পশুকে বলতে পারি স্বপ্নচর, কিন্তু উত্তরকোটির পশুকে তা বলা চলে না। অথচ তার মন জাগ্রত হলেও সঙ্কীর্ণ, কেননা তার বৃত্তি শুধু প্রাণের তাগিদ মেটাতেই ফুরিয়ে যায়। মানুষের মধ্যে মনশ্চেতনা আরও সজাগ। হয়তো প্রথম-প্রথম তার চেতনা হয় বহির্মুখ, আত্মসচেতনতার দৈন্যে কৃশ। কিন্তু ক্রমেই সে প্রবুদ্ধ হয়ে তার অন্তর্গূঢ় অখণ্ডসত্তার সম্যক পরিচয় নিতে পারে। উত্তরায়ণের আদিম দুটি পর্বের মত, এখানেও সন্ধিনীশক্তির চিন্ময় ঘনীভাবে আধারে নতুন শক্তি এবং সূক্ষ্মতর নতুন বৃত্তি আবির্ভূত হয়েছে। প্রাণময়

মন এখানে উঠে এসেছে বিচারশীল ও মননধর্মী চিত্তের ভূমিতে। ভূয়োদর্শন ও নবনির্মিতির সামর্থ্য আরও পরিপুষ্ট হয়েছে। তথ্যের সংকলন ও অন্বয়সাধন, কার্যকারণসম্বন্ধের চেতনা, কল্পনা ও রসসৃষ্টির প্রতিভা, অনুভূতির অতিসূক্ষ্ম সাবলীলতা, বুদ্ধির সমন্বয়সাধনী ও অর্থবিধারণী বৃত্তি প্রভৃতি চেতনার নানা বিভূতি প্রস্ফুট হয়েছে এই ভূমিতে। বুদ্ধি আর এখানে প্রতিবর্তী বা প্রতিঘাতী নয়—তার মধ্যে ফুটেছে মেধা ঈশনা ও আত্মবিবেকের সামর্থ্য। অবরপর্বের মত এখানেও চেতনার অধিকার ক্রমেই দূরাবগাহী হয়েছে, মানুষ পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের খবর আরও বেশী করে জেনেছে এবং সে-জ্ঞানকে রূপায়িত করেছে সচেতন অনুভবের মহত্তর ও পূর্ণতর ঐশ্বর্যে। অতএব এখানেও দেখি উদয়নের তৃতীয় সূত্রের একান্ত-প্রত্যাশিত প্রয়োগ : নিম্ন পর্বের ধর্মগুলিকে আপন ভূমিতে তুলে নিয়ে মন তাদের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়াকে বুদ্ধিধর্ম দ্বারা অনুষিক্ত করছে। পশুর মত মানুষেরও দেহ এবং প্রাণের সম্পর্কে একটা সচেতনতা আছে। শুধু তা-ই নয়, তার প্রাণের বোধ বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, তার দেহবোধ যেমন সজাগ তেমনি ভূয়োদর্শনদ্বারা সমৃদ্ধ। পশুর স্থূল শারীরবৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গে পশুর মনোময় জীবনকেও সে অধিকার করেছে। কোনও-কোনও বিষয়ে পশুর তুলনায় মানুষের মধ্যে খানিকটা ন্যূনতা দেখা দিলেও তাকে সে পূরণ করেছে অধিগত বৃত্তির উৎকর্ষসাধনদ্বারা। তার সংজ্ঞা ও সংস্কার, প্রবৃত্তি ইচ্ছা ও হৃদয়ের সংবেগ সমস্তই ভাববাসিত এবং বুদ্ধির দ্বারা দীপ্ত। পশুর মধ্যে যা ছিল ভাবনা-বেদনা-কামনার একটা মূঢ় এবং স্থূল আনাড়িপনামাত্র, তাকে সে শিল্পনৈপুণ্যের চরম চমৎকারে রূপান্তরিত করেছে। পশুও ভাবে, কিন্তু তার ভাবনা স্মৃতি ও সংস্কারের যন্ত্রমূঢ় অবশ আবর্তন শুধু। প্রকৃতির ইশারাকে যথাবৎ মেনে চলাই তার স্বভাব। যেখানে বিশেষ-কোনও কারণে পর্যবেক্ষণ ও পরিকল্পনশক্তির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন হয়, শুধু সেইখানেই তার মধ্যে সচেতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটা ঝলক দেখা দেয়। পশুতে ব্যাবহারিক বুদ্ধির আভাসমাত্র ফুটেছে। মানুষের বিচারবুদ্ধি হতে এখনও সে অনেক দূরে। পশুর উন্মিষন্ত চেতনা যেন মনোরাজ্যের অশিক্ষিত অনিপুণ কারিগর। কিন্তু মানব-আধারে সেই চেতনাই হয়েছে সুনিপুণ কারু। তার আশা, ভবিষ্যতে শুধু কলাবিৎ নয়, শিল্পাচার্য হবারও গৌরব সে অর্জন করবে—যদিও এ-আশাকে সফল করবার চেষ্টা তার আজও তেমন জোর ধরেনি।

পার্থিবপ্রকৃতির রাজ্যে আপাতত মানুষের মধ্যেই চেতনার চরম উন্মেষ দেখছি। এই উন্মেষের দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করলে তার মূলসূত্রটি আমরা ধরতে পারব। প্রথমত, চেতনার ঊর্ধ্বভূমিতে জীবনের অবরধর্মের

ওই-যে উন্নয়ন, সাক্ষিত্বের মর্মভেদী দৃষ্টিই কিন্তু তার নিয়ন্তা। ব্যক্তির আধারে অধিষ্ঠিত আছেন যে বিরাট পুরুষ অথবা উন্মেষের গূঢ়সংবেগে স্পন্দমান যে চিৎসত্তা, স্বারাজ্যের তুঙ্গশিখর হতে তাঁর মাহেশ্বরী দৃষ্টি অবসর্পিত হয় শৈলমূলের উপত্যকার দিকে। তাঁর সে-দৃষ্টিতে জ্বলে ওঠে চিতিশক্তির যুগলবিভূতি—ঈশানের উদার জ্ঞানাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয় ইচ্ছাশক্তির অনমনীয় দৃঢ়তা। রূপান্তরিত চেতনার ওই অভিনব প্রসার হতে, গোত্রান্তরিত দৃষ্টি ও প্রকৃতির ওই মুক্তচ্ছন্দ দিয়ে, অবরপ্রাণের যা-কিছু সম্ভাবনা তার নিগূঢ় বীর্যকে স্ফুরিত ক'রে আধারশক্তিকে তিনি করেন ঊর্ধ্বস্রোতা। অবরপ্রাণকে বিনষ্ট করতে চান না বলেই তাঁর এই ঊর্ধ্বায়নের তপস্যা। আনন্দের উচ্ছলনই তাঁর চিরন্তন সাধনা। সে-রাগিণী সাধেন তিনি সংবাদী-বিবাদী সকল সুরের অপরূপ সঙ্গতিতে—শুধু সংবাদী সুরের মধুর আলাপে নয়। তাই তাঁর হাতে জীবনযন্ত্রে অবরপ্রাণেরও অবহেলিত স্বরগ্রাম ঝঙ্কৃত হয়, আদিমকুণ্ঠার পীড়ন হতে মুক্ত হয়ে তাঁর নন্দনগীতিতে তারাও আনে কত-যে অশ্রুত শ্রুতির অনুরণন। কিন্তু এখানেও তাঁর একটা প্রতীক্ষা আছে। উত্তরভূমির ঐশ্বর্যকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করবার দায় অবরবৃত্তিরই। সে-স্বীকৃতির পরিচয় না পেলে তিনিও তাদের চির-আপন করে নিতে চান না। আবার স্বীকৃতিতে যদি বিলম্ব ঘটে, যদি তারা অমোঘ ইচ্ছার বিদ্রোহী হয়, তখন রুদ্রতাণ্ডবের প্রচণ্ড পীড়নে তাদের আপন বশে আনতেও তাঁর দ্বিধা নাই। শীলাচার আত্মনিগ্রহ ও তপস্যার এই হল অন্তর্নিহিত সত্যকার লক্ষ্য এবং তাৎপর্য। অন্নময় প্রাণময় ও অবরমনোময় জীবনকে বশে এনে তার সমস্ত বৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করে ঊর্ধ্বলোকের যোগ্য সাধনে রূপান্তরিত করা—যাতে তারা উত্তরমনের এবং পরিশেষে অতিমানসের বৃহৎসামের দিব্যরাগিণীতে রূপান্তরিত হতে পারে, এই তো জীবনসাধনার লক্ষ্য। জীবনকে পঙ্গু ও বিকলঙ্গ করে হত্যা করা—এ তো আমাদের পুরুষার্থ নয়। উত্তরায়ণের পথে অভিযানই সাধনার প্রথম এবং অপরিহার্য অঙ্গ বটে। কিন্তু সেইসঙ্গে যে সমাহরণেরও সাধনা চলবে—প্রকৃতি-স্থ পুরুষের এও একটা অনতিবর্তনীয় আকূতি।

বিজ্ঞান ও সঙ্কল্পের তলস্পর্শী দৃষ্টিতে অনুবিদ্ধ করে সব-কিছুকে তুলে ধরা এবং সুগভীর সমগ্র-ভাবনার দ্বারা সব-কিছুকে আরও সূক্ষ্ম সুকুমার ও সমৃদ্ধ করা—কবিক্রতু অন্তর্যামী পুরুষের প্রথম হতেই এই ধরন। উদ্ভিদ্‌স্থিত পুরুষের বলতে গেলে আছে নাড়ীসংবেদনময় একটা স্থূল দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিকে তার অন্নময় জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে, সাধ্যমত তাহতে সে অন্নপ্রাণময় একটা তীক্ষ্ণরসের আস্বাদন পেতে চায়। মনে হয়, নিঃশব্দ প্রাণকম্পনের এমন-একটা তীব্র উন্মাদনা তার মধ্যে আছে, যা আমাদের

কল্পনারও অগোচর। পাশব দেহ-মনের উন্নত ও সমর্থ আধারের চাইতে উদ্ভিদের জীবনাধার কত অপরিণত। তবু তার ওই মূঢ় অনুভবের তীব্রতাকে হয়তো পশুর আধার কোনমতেই সইতে পারবে না।...আবার পশুর জগৎ অন্ন-প্রাণময়—তাকে সে মনোবাসিত ইন্দ্রিয়দৃষ্টি দিয়ে দেখে এবং সাধ্যমত তাহতে ইন্দ্রিয়লভ্য রস আহরণ করে। বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়বোধ বা ইন্দ্রিয়বাসিত প্রক্ষোভ কি প্রাণবাসনার সুখময় তর্পণ হিসাবে দেখতে গেলে, সে-রসের তীব্রতা অনেক ক্ষেত্রে মানুষের ইন্দ্রিয়জ রসবোধকে ছাড়িয়ে যায়।...কিন্তু মানুষ তার জগতের দিকে তাকিয়ে আছে বুদ্ধি ও সঙ্কল্পের ভূমি হতে, অতএব অবরভূমির তীব্র মাদকতার আকর্ষণ তার নাই। ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন হতে সে দোহন করতে চায় আরও উন্নত ধরনের একটা উন্মাদনা—সে চায় বুদ্ধির রসবোধের শীলাচারের বা আধ্যাত্মিকতার পরিতর্পণ, সে চায় কর্মক্ষেত্রে মনের সচল তারুণ্য। এমনিতর ঊর্ধ্ববৃত্তির পরিশীলনে জীবনের সাধনাকে উন্নত উদার এবং স্থূলতা-বর্জিত করাই তার লক্ষ্য। পশূচিত বৃত্তি কি ভোগকে সে বর্জন করে না, কিন্তু চিত্ত-রসের সৌরভে বাসিত করে তাদের আরও সূক্ষ্ম স্বচ্ছ ও সংবেদনশীল করে তোলে। প্রাকৃতমানুষের হীনাবস্থাতেও এই উৎকর্ষের সাধনা চলে। কিন্তু মনুষ্যত্বের চেতনা তার মধ্যে যতই জাগ্রত হয়ে ওঠে, ততই আধারের অবরবৃত্তি-গুলিকে তপস্যার অনলে দগ্ধ করে সে চায় তাদের আমূল পরিবর্তন, অন্যথা আমূল পরিবর্জন। চিন্ময়জীবনে উত্তরণের সাধনায় এই হল মনের স্বাভাবিক ধরন।

কিন্তু উত্তরভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষ যে তার দৃষ্টিকে কেবল নীচে বা চারদিকেই প্রসারিত করে, তা নয়। তার একটি দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত হয় লোকো-ত্তরের দিকে, আরেকটি দৃষ্টি অনুবিদ্ধ হয় আন্তররহস্যের গভীর গুহায়। মানুষের চেতনায় শুধু বিরাটপুরুষের তলস্পর্শী দৃষ্টিই জাগ্রত হয়ে ওঠেনি, তাঁর ঊর্ধ্বদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টিও ফুটে উঠেছে। পশু অপরা প্রকৃতির কৃতিত্বেই তৃপ্ত। তার অন্তর্যামী চিন্ময়পুরুষের মধ্যে শিবদৃষ্টি থাকলেও তার প্রেরণা পশুর অগোচরে প্রকৃতিকেই উদ্বুদ্ধ করে—পশুকে নয়। একমাত্র মানুষ এই শিবদৃষ্টির তাৎপর্য বুঝে সচেতন হয় ওঠে। মানুষে বুদ্ধিযোগের আবি-র্ভাব ঘটেছে—লোকোত্তর বিজ্ঞানের আলো বাঁকাচোরা হয়েও পড়েছে এসে তার চেতনায়। তাই তার অন্তরে সচ্চিদানন্দের যুগলবিভাব সহজেই স্ফুরিত হয়। সে আর অপরা প্রকৃতির দ্বারা শাসিত অপরিণত চেতনপুরুষ নয় পশুর মত যে, প্রকৃতি তাকে তার মূঢ় যন্ত্রশক্তির ক্রীড়নক করে রাখবে। এবার তার অন্তরে জেগেছে নিত্যপরিণম্যমান চিন্ময়পুরুষের প্রেতি—প্রকৃতির স্বৈরাচারে সে বাধা এনেছে, তীক্ষ্ন করে তুলেছে আপন ইচ্ছার দাবি এবং পরিশেষে চেয়েছে প্রকৃতির ভর্তা হবার অধিকার। অবশ্য এখনও সে প্রকৃতির শাস্তা

হতে পারেনি, তার বন্ধনজালে জড়িয়ে এখনও সে চিরাগত যন্ত্রশাসনের লাঞ্ছনা ভোগ করছে। কিন্তু অনিশ্চয়তার অস্পষ্ট রেখায় হলেও তার চেতনায় ভাসে দিগন্তের কোলে স্বারাজ্যের ছবি : অন্তরে সে অনুভব করে সুদূর নীলিমার দিকে চিৎসত্তার অশান্ত পক্ষ-বিধূনন—এই অন্ধকারা ভাঙ্‌বার নিরন্ত প্রয়াস। দূরান্তের বার্তাবহ সমীরণে ভেসে আসে কোন্ রহস্যালোকের অশ্রান্ত গুঞ্জরণ, 'হেথা নয়—হেথা নয়—অন্য কোন্ খানে'। তার অন্তর-বেদিতে সমাসীন প্রকৃতি-পুরুষ কিছুতেই এই ধূলিধূসর সংকীর্ণতায় তাকে ক্লিষ্ট হতে দেবেন না। এই পৃথিবীর অন্নপ্রাণের বিত্তকে হাতের মুঠোয় এনে যখনই সে ভবিষ্য সম্ভাবনার দিগন্তের দিকে তাকাবার একটুখানি অবসর পেয়েছে, তখনই তার অন্তরে জ্বলে উঠেছে সুদূরসঞ্চারী অভীপ্সার শিখা—সে চেয়েছে শিখর হতে শিখরে সঞ্চরণ, চেয়েছে প্রমুক্তির উপচীয়মান স্বাচ্ছন্দ্য, চেয়েছে তার অবরপ্রকৃতির রূপান্তর। মানুষের এ-আকূতি অনতিবর্তনীয়, কেননা এ তো তার কুহকিনী কল্পনার বঞ্চনা নয় শুধু। অপূর্ণ হলেও পূর্ণ-তারই অভিমুখে তার জীবনের গতি—অতএব পূর্ণতার পরিণতি ও সিদ্ধির প্রতি অভীপ্সা তার স্বভাবধর্ম। তাছাড়া পৃথিবীর সকল জীবের মধ্যে একমাত্র সে-ই জানে তার মনোময় সত্তারও অন্তরালে কোন্ গভীর রহস্য লুকানো আছে—সে-ই পায় অন্তরাত্মার আভাস, মনেরও ওপারে দেখে অতিমানস ও চিদাত্মার বিজলীঝলক। সে-জ্যোতির দিকে আপনাকে মেলে ধরবার, জীবনে তাকে বরণ করবার, ঊর্ধ্বায়নের তপস্যায় তাকে আয়ত্ত করবার বীর্যও তার আছে। তাই প্রত্যেক মানুষের অন্তরে রয়েছে স্বোত্তরভূমিতে আরূঢ় হবার অদম্য পিপাসা, আত্মস্ফুরণের সচেতন সাধনায় মুহূর্তে-মুহূর্তে নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার একটা দুর্নিবার ব্যাকুলতা। এ শুধু ব্যক্তির অভীপ্সাই নয়—জাতির জীবনেও একদিন এই ঊর্ধ্বমুখী হোমের শিখা জ্বলে উঠতে পারে। জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে না হ'ক, জাতীয় জীবনের সামান্যধারায় একটা রূপান্তরের প্রেরণা আসা কিছুই অসম্ভব নয়। সুদৃঢ় সংকল্পের প্রবর্তনা যদি পিছনে থাকে, তাহলে যে-কোনও জাতিই বর্তমান আসুরী প্রকৃতির সমস্ত কলুষ হতে নিজেকে মুক্ত করে মনুষ্যত্বের উত্তরভূমিতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। দেবমানব বা অতিমানবের মহিমাকে আয়ত্ত করা যদি সাধ্য না-ও হয়, তবু তার কাছাকাছি পৌঁছবার জন্য চিত্তকে উদ্যত রাখা তার পক্ষে অসাধ্য নয়। যা-ই হ'ক না কেন, মানুষের উত্তরায়ণের তপস্যা, তার আদর্শের কল্পনা, অক্লান্ত সাধনার কাছে নিজেকে তার উৎসর্গ করা—এ সমস্ত তার ঊর্ধ্বপরিণামিনী আত্মপ্রকৃতিরই অনুত্তরণীয় প্রবর্তনা।

এই-যে আত্মোত্তরণের দ্বারা আত্মসম্ভূতির সাধনা, কোথায় এর শেষ

পরিণাম ? এক মনের মধ্যেই পরিণতির কত স্তর রয়েছে। আবার প্রত্যেক স্তরেই পরিণতির কত অবান্তর ধারা। এই উচ্চাবচ স্তরসমূহকে আমরা বলতে পারি মনোময় সত্তা ও চেতনার বিভিন্ন ভূমি এবং উপভূমি। এই সোপান বেয়ে উপরে ওঠাই হল আমাদের মনোময় সত্ত্বের পুষ্টির সাধন। এর যেকোনও ভূমিতে দাঁড়িয়ে আমরা নীচের ভূমির উপর খানিকটা ভর দিয়ে মাঝে-মাঝে উঠে যাই উপরের ভূমিতে, অথবা এইখানে থেকেই নিজেকে উন্মুখ করে রাখি উপর হতে শক্তিপাতের জন্য। বর্তমানে, বুদ্ধির নিম্নতম উপভূমিতে আমরা নিরাপদ প্রতিষ্ঠার আসন পেতে রেখেছি। একে অন্নমনোময় ভূমিও বলতে পারি, কেননা তথ্যের সাক্ষ্য এবং তত্ত্বের বোধের জন্য এখনও আমাদের অন্নময় স্থূল মস্তিষ্ক. স্থূল ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়মানসের 'পরে নির্ভর করতে হয়। তাইতে আমরা এ-জগতের অন্নময়কোষের জীব। আমাদের জীবন পরাক্-বৃত্ত, আমাদের কাছে পরাক্-দৃষ্ট বিষয়েরই কদর—অন্তরাবৃত্ত প্রত্যক্‌সত্তার অনুভব মোটেই আমাদের চেতনায় নিবিড় হয়ে ওঠেনি। চিরকাল তাই অন্তরের দাবির চাইতে আমরা বাইরের দাবিকে বড় করেছি।...কিন্তু জড়াসক্ত মানুষের একটা প্রাণময় কোশও আছে। তার মুখ্য উপাদান হল অবচেতনা হতে উৎক্ষিপ্ত প্রাণসংবিতের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নিসর্গধর্ম ও প্রবৃত্তির বিক্ষোভ, এবং সংজ্ঞা বেদনা বাসনা আশা ও তৃপ্তির চিরপরিচিত একটা জটলা। বলা বাহুল্য, এদের নির্ভর শুধু বাহ্যবিষয় ও বাহ্যসংস্পর্শের 'পরে। তাই যা-কিছু সদ্য সাধ্য কি সম্ভাবিত, যা-কিছু অভ্যস্ত বা মামুলী, তাদের নিয়ে শুধু ব্যবহারের জগতে এদের কারবার।...আবার জড়াসক্ত মানুষের একটা মনোময় কোষ আছে। কিন্তু সেও চিরাচরিত ও গতানুগতিক ব্যবহারের দাস, তারও দৃষ্টি নিবন্ধ বাহ্যবিষয়ের প্রতি। দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি প্রয়োজন আরাম তর্পণ ও বিনোদনের জন্য যা-কিছু দরকার, মনের ভাণ্ডারে তারই অনুকূল সঞ্চয়ের প্রতি তার আগ্রহ। জড়াসক্ত মন জড় এবং জড়জগৎকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। দেহ আর দৈহ্য-জীবন, ইন্দ্রিয়ানুভব আর ব্যাবহারিক প্রাকৃত স্বভাবের অনু-বর্তন—এরাই তার আশ্রয়। যা-কিছু এর বাইরে, তাকে সে গণ্য করে ইন্দ্রিয়-মানসের বনিয়াদে গড়া একটা অপরিসর হাওয়ার মহল বলে। জীবনের শিখরে প্রস্ফুটিত যা-কিছু লোকোত্তর ঐশ্বর্য, তাকে সে জানে অন্তর্জগতের তত্ত্ব বলে নয়—কল্পনা ভাবোচ্ছ্বাস ও আচ্ছিন্ন ভাবনার নিরর্থক অথচ মনোরম বিলাস বলে, যা অনেকটা আভূষণের কাজ করে মানুষের বাস্তব জীবনে। ভাবৈশ্বর্যকে একটা তত্ত্ববস্তু বলে কখনও-যদি সে মেনেও নেয়, তবু তাকে কিছুতেই সে বাহ্যবস্তুর মত নিরেট ভাবতে পারে না—কেননা ভাবের স্বরূপ-ধাতু জড়পদার্থের চাইতে বহুগুণে সূক্ষ্ম এবং অতীন্দ্রিয়, অতএব তার অভ্যস্ত বোধের এলাকার বাইরে। কাজেই তার কাছে ভাবের জগৎ জড়-জগতেরই

একটা মনোময় সংস্করণ, সুতরাং স্থূলের চাইতে তার মধ্যে বাস্তবতার গুরুত্ব অনেক কম।...মানুষ যে এমনি করে জড়কেই সবার আগে আঁকড়ে ধরবে, বহির্জগতের তথ্যরূপটাকেই কৌলীন্যের মর্যাদা দিতে যে কসুর করবে না, এটা অসঙ্গত কিছু নয়। কারণ এই বহিরাসক্তি দিয়েই প্রকৃতি আমাদের জীবনের প্রথম ভিত গড়েছে—তাই তাকে কোনমতেই সে শিথিল হতে দিতে পারে না। আমাদের মধ্যে অন্নময়কোষের দাবিটাকে অত্যন্ত প্রবল করে জগতে তাকে বহুল পরিমাণে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা সে করেছে, কেননা খানিকটা অসাড় হলেও জীবনের এই জড়ময় ভিত্তির 'পরেই তার উত্তরসাধনার নিরাপত্তা নির্ভর করছে। অন্নময়কোষে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেই মানুষের মধ্যে সে ঊর্ধ্বপরিণামের তপস্যা করবে—এই হল প্রকৃতির আকূতি। কিন্তু মানুষের মনোময় ব্যাকৃতিতে প্রগতির বীর্য নাই, কিংবা থাকলেও তার লক্ষ্য শুধু স্থূলের প্রগতি। অবশ্য এ আমাদের মনোরাজ্যের উপান্তভূমির কথা—যেখান হতে মানুষের মনোময় পরিণামের উজানধারা শুরু হল। এইখানেই যে সে-ধারার শেষ, একথা অশ্রদ্ধেয়।

এই জড়াসক্ত মনকে ছাড়িয়ে, স্থূল ইন্দ্রিয়সংবিতের আরও গভীরে আছে—যাকে আমরা বলতে পারি প্রাণাধার প্রজ্ঞা। তার বৃত্তি চঞ্চল প্রাণোচ্ছল এবং স্পর্শকাতর। চৈত্যপুরুষের প্রতি তার প্রচ্ছন্ন একটা অভিমুখীনতা আছে, জীবচেতনাকে একটা প্রাথমিক বিশিষ্ট রূপ দেওয়া তার প্রধান কৃতিত্ব—যদিও প্রাণের রজোবৃত্তিতে সে-রূপ ধূমল হয়ে ফোটে। এই চেতনাকে চৈত্যপুরুষ বলতে পারি না—তাকে জানি প্রাণময়পুরুষের একটা পুরঃক্ষেপ বলে। এই প্রাণাত্মার কাছে প্রাণলোকের বিষয়ের স্পর্শ ও অনুভব নিতান্ত বাস্তব। জড়ের ভূমিতে তাদের মূর্ত করে তোলাই তার সাধনা। প্রাণসত্তা প্রাণশক্তি ও প্রাণপ্রকৃতিকে সার্থক ও পরিতৃপ্ত করাকে সে মনে করে পরমপুরুষার্থ, তাই তার কাছে জড়ভূমি প্রাণপ্রবৃত্তির আত্মসমর্পণের ক্ষেত্র শুধু। জড়ের জগতে চাই শক্তির প্রকাশ, চারিত্রের সবলতা, হৃদয়ের প্রমত্ত উচ্ছ্বাস, উৎসর্পিণী আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনা, দুঃসাহসের পথে নিত্য-নূতন অভিযান। ব্যক্তিতে সমাজে এমন-কি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে চলবে জীবনের নতুন স্বাদ পাবার জন্যে জীবনকে নিয়ে বিচিত্ররকমের পরীক্ষা এবং দ্যূতক্রীড়া। এই বীর্য, এই রস, এই লক্ষ্য যদি না থাকবে, তাহলে প্রাণোল্লাসহীন নিস্তরঙ্গ মর্ত্যজীবনের কোথায় সার্থকতা? অধিচেতনভূমিতে অন্তর্গূঢ় হয়ে আছেন যে প্রাণপুরুষ, তিনিই প্রাণাধার মনের ভর্তা। সূক্ষ্ম প্রাণলোকের সঙ্গে এই মনের একটা প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ আছে। তার ফলে অতীন্দ্রিয়ের দুয়ার দিয়ে সহজেই সে জড়বিশ্বের অন্তরালস্থিত অদৃশ্য শক্তি ও ভাবের উচ্ছলন অনুভব করতে পারে। এই সূক্ষ্ম প্রাণাধার মন স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য ছাড়াই দেখতে পায়—অন্নময় মনের মত

তার সামর্থ্যকে তারা খর্ব করে না। এই ভূমিতে এলে, ব্যক্তি ও বিশ্বের অন্তঃপুরে লীলায়িত প্রাণশক্তির সত্যরূপটি দেহনিরপেক্ষ হয়ে জড়বিশ্বের সর্ববিধ প্রতীকের বন্ধনমুক্ত হয়ে আমাদের চেতনায় ফুটে ওঠে। অথচ এই প্রতীকগুলিকে আমরা বলি 'প্রাকৃতিক ব্যাপার'—যেন এর চাইতে বড় কোনও ব্যাপার প্রকৃতির সাধ্য নয়, যেন জড়ের নিরেট তত্ত্বের বাইরে আর-কোনও তত্ত্বেরই পুঁজি তার নাই।...জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, প্রাণাত্মবাদী মানুষের আধার গড়ে ওঠে ওই সূক্ষ্ম প্রাণলোকের শক্তিসন্নিপাতে। তাই তার ইন্দ্রিয় হয় তীক্ষ্ণ, বাসনা হয় উদ্দাম, কর্মের তাণ্ডবে সে দেয় শক্তির পরিচয়, হৃদয়ের আবেগে-উচ্ছ্বাসে হয় উদ্বেল, নিত্যচরিষ্ণু তার স্বভাব। জড়ভূমিকে সে অস্বীকার করে না—এমন-কি জড়ের দিকে তার প্রবল ঝোঁক। কিন্তু সদ্যঃকালীন ভূতার্থ নিয়ে অতিব্যাপৃত থেকেও এ-জগৎটাকে সমুখপানে একটা ঠেলা না দিয়ে সে পারে না—কেননা তার জীবনে চাই বিচিত্র অনুভবের সমারোহ, চাই নবীন উপলব্ধির তীক্ষ্ণ বীর্য, চাই প্রাণের প্রসার ও প্রাণের বীর্য, এক কথায় চাই জীবনধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং ব্যাপ্তি যা দিয়ে সঙ্কীর্ণ আধারের মধ্যে প্রকৃতি আনবে মহাসমুদ্রের কল্লোল। প্রাণপ্রবেগের তীব্রতম অভিঘাতে বিদ্রোহী মানুষ সকল শৃঙ্খল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়ে, নবীন দিগন্তের এষণায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মহাশূন্যের বক্ষে, তন্দ্রাতুর অতীত এবং মন্থর বর্তমানকে চকিত করে সে বাজায় অনাগতের পাঞ্চজন্য। তার মনোজীবন প্রায়ই প্রাণশক্তির পরতন্ত্র বলে প্রাণাবেগ ও প্রাণবাসনার তর্পণই হয় তার মনের ধর্ম। কিন্তু একবার মনোরাজ্যের দিকে তার ঝোঁক পড়লে সে হয় নবীন নবীর পূজারী—কল্পলোকের নূতন পথিকৃৎ। অথবা সে হয় ভাবের শহীদ, সুকুমারবেদী কলাবিদ, সঞ্জীবন জীবনমন্ত্রের কবি, মহাব্রতের প্রবক্তা বা একনিষ্ঠ সাধক। প্রাণাশ্রয়ী মন চরিষ্ণু বলে প্রকৃতিপরিণামের সে একটা শক্তিশালী সাধন।

প্রাণময় মনের উপরে অথচ তার চাইতে গভীর হয়ে প্রসারিত রয়েছে শুদ্ধ ভাবনা ও বুদ্ধির স্তর—যাকে বলতে পারি মনোময় ভূমি। এই ভূমিতে মনোজগতের বস্তুই একান্ত বাস্তব। মনোভূমির শক্তিতে আবিষ্ট যারা, তারাই হয় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ভাবের মানুষ, বাণীর সাধক, চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী, ভবিষ্যযুগের স্বপ্নপাগল। আজপর্যন্ত এই হল মনোময় জীবের প্রগতির সীমা। মনোময় মানুষেরও আধারে প্রাণময়কোষে আছে—যা প্রাণাবেগ ও প্রাণবাসনার দ্বারা আন্দোলিত এবং বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলাধার। তাছাড়া তার অন্নময়কোশেও ইন্দ্রিয়সংবিতের অবর সংস্কার আছে। আধারের এই দুটি অবর অংশ প্রায়ই তার মনোময় উত্তর অংশের সমকক্ষ হয়ে ওঠে বা তাকে আওতায় ফেলে রাখে। তখন মানব-আধারের সারভাগ হয়েও মন তার অখণ্ড প্রকৃতির শাস্তা ও রূপকার হতে পারে না। কিন্তু মানুষভাবের চরম

উৎকর্ষে এ-বাধা আর টেকে না—তখন মনের প্রজ্ঞা এবং সংকল্পশক্তিই অন্নময় ও প্রাণময় কোশকে আপন শাসনে রেখে নিয়ন্ত্রিত করে। আত্মপ্রকৃতির রূপান্তর ঘটাতে না পারলেও মনোময় মানুষ সৌষম্য ও শৃঙ্খলা তার মধ্যে আনতে পারে, মনোময় আদর্শদ্বারা ভাবিত করে তাকে সমত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, অথবা ঊর্ধ্বপ্রতনের প্রভাবে তার বৃত্তিসমূহকে মার্জিত ও পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারে। আমাদের বহুশাখ ও অব্যবসিত ব্যক্তিভাবনার রাজ্যে যে সংঘর্ষ ও বিপর্যয়, অথবা আধারের খণ্ডিত ও অর্ধসমাপ্ত কাঠামোর 'পরে দায়সারা-গোছের যে-জোড়াতালি, তার মধ্যে এমনি করেই দেখা দেয় একটা বৃহৎ সঙ্গতির ছন্দ। মানুষ তখন হয় তার মন-প্রাণের সাক্ষী ও নিয়ন্তা এবং বুদ্ধিপূর্বক তাদের পুষ্টিসাধনদ্বারা আপনাকে গড়ে তোলবার অধিকার পায়।

এই শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত মনের পিছনে আছে আমাদের অন্তর্বৃত্ত বা অধিচেতন মন। মনোভূমির সকল বস্তুই তার অপরোক্ষসংবিতের বিষয়। মনোজগতের বিচিত্র শক্তিসন্নিপাতের সে স্বাভাবিক আধার। সূক্ষ্ম ভাবনার যেসব অলৌকিক সংবেগ প্রতিনিয়ত প্রাণের ভূমিতে এবং জড়ের জগতে প্রহত হচ্ছে, তাদের প্রত্যক্ষ অনুভব কোনকালেই আমরা পাই না—শুধু অনুমানে-পাওয়া একটা আভাস ছাড়া। কিন্তু মনোময় মানুষের অধিচেতনায় এসব অস্পর্শ অগম ভাবনাও সুস্পষ্ট বাস্তবের রূপ ধরে। তখন মানুষের মধ্যে বা পার্থিব প্রকৃতিতে তাদের মূর্ত হবার দাবিকে সে আর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। অন্তররাজ্যে মন এবং মন-আত্মা দেহনিরপেক্ষ নিরবচ্ছিন্ন বাস্তবতা নিয়ে আমাদের চেতনায় ফুটতে পারে। তখন দেহে বাস করার মত সচেতন-ভাবে মনে বাস করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না। এমনি করে মনো-রাজ্যের অধিবাসী হওয়া, দেহরূপ বা প্রাণরূপ না হয়ে বুদ্ধিরূপ হওয়া—বলতে গেলে প্রকৃতির আরোহক্রমে এই আমাদের চরম স্থিতি। এর পরে বাকি থাকে শুধু প্রকৃতির চিন্ময়পরিণাম। প্রাণময় মানুষ কর্মী, বহির্জীবনে ক্ষিপ্রসিদ্ধির প্রবর্তক। তাই মনোময় মানুষেরই মত সে বীর্যশালী—এমন-কি অভিনবের পথিকৃৎরূপে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে অধিকতর সার্থক তার বীর্য। কিন্তু মনোময় মানুষের মধ্যে এমন ক্ষিপ্রসিদ্ধির চরিষ্ণুতা নাই। সে প্রজ্ঞা-বান মনস্বী এবং মুনি—তার মধ্যে স্বকৃৎ ও স্বরাট্ চিত্ত এবং সংকল্পের প্রবেগ আছে, আছে আদর্শের সিদ্ধি ও সাধনার সম্পর্কে একটা উদ্যত চেতনা। মানবতার ভূমিতে ঊর্ধ্বপরিণামিনী প্রকৃতির এ-ই মনে হয় স্বাভাবিক চরম-কোটি।...তিনটি মনোভূমি স্পষ্টত পৃথকস্বভাব হলেও আমাদের মধ্যে প্রায়ই তাদের একটা সাঙ্কর্য দেখা দেয়। তাই সাধারণবুদ্ধির বিচারে তারা চিত্ত-পরিণামের তিনটি জাতিরূপ মাত্র—এছাড়া আর-কোনও সার্থকতা তাদের নাই। কিন্তু বস্তুত তাদের মধ্যেও নিগূঢ় অর্থের একটা দ্যোতনা আছে, কেননা এই

তিনটি ভূমি উত্তরায়ণের পথে মনোময় সত্ত্বের আত্মপরিণামের তিনটি সোপান। শেষ সোপানে প্রকৃতি এসে পৌঁছেছে মননধর্মী মানুষে। তাই সর্বসাধারণের মধ্যে খাঁটি মনোময় মানুষের ক্বচিৎ আবির্ভাবকে বলা যেতে পারে প্রকৃতির সাম্প্রতিক সিদ্ধির চরম। এরও পরে এগোতে হলে, মনের মধ্যে চিৎতত্ত্বকে স্ফুরিত করে দেহে-প্রাণে-মনে তার বীর্যকে সঞ্চারিত করাই হবে প্রকৃতির তপস্যা।

আমাদের বহিশ্চর চেতনার ভূমিকাতেই প্রকৃতি মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় মানুষকে এতকাল ধরে গড়ে এসেছে। এ-সাধনার উৎকর্ষ ঘটাতে হলে প্রাকৃত-চেতনার গহনে প্রচ্ছন্ন অদৃশ্য উপাদানকে ব্যবহার করতে হবে তার অকৃপণ হয়ে। সত্তার গভীরে ডুবে হয় প্রকৃতিকে আবিষ্কার করতে হবে গুহাশায়ী চৈত্যপুরুষকে, নয়তো প্রাকৃত মনোভূমির ঊর্ধ্বে বোধিচেতনার বিজ্ঞানঘন জ্যোতির্লোকে আরূঢ় হয়ে বিশুদ্ধ চিন্ময়মনের ঊর্ধ্বপরম্পরাকে অতিবাহন করতে হবে—আনন্ত্যের সাক্ষাৎযোগে যুক্ত হয়ে পেতে হবে সর্বভূতাত্মভূতাত্মা অখণ্ড-সচ্চিদানন্দের বিদ্যুন্ময় সংস্পর্শ। এই আধারে, এই বহিশ্চর প্রাকৃত-সত্তার অন্তরালে আছে এক অন্তর্গূঢ় জীবসত্ত্ব, এক অন্তর্মন ও অন্তঃপ্রাণ—যা যুগপৎ ওই লোকোত্তরের দিকে এবং আমাদেরই হৃৎশয় গূঢ়াত্মার দিকে আপনাকে উন্মীলিত করতে পারে। এই উভয়তোমুখ উন্মীলনই হল প্রকৃতির নব-পরিণামের মর্মরহস্য। এমনি করে পাত্রকে অপাবৃত করে গুহাগ্রন্থিকে বিকীর্ণ করে দিক্‌চক্রবালকে উল্লঙ্ঘন করে চেতনা উত্তীর্ণ হবে উদয়াচলের তুঙ্গশিখরে, সম্যক্‌সমাহরণের মহাভূমিতে। তার ফলে, একদিন যেমন মনের আবির্ভাবে মানুষের প্রকৃতি মনোবাসিত হয়েছিল, তেমনি এই অভিনব জাত্যন্তরপরিণামও আধারের সকল শক্তিকে চিদ্‌বাসিত করবে। কারণ মনোময় মানুষই প্রকৃতির সৃষ্টিতপস্যার চরম সিদ্ধি নয়। যদিও মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকৃতির পরিণাম মোটের উপর যতখানি সার্থক হয়েছে, এতখানি আর-কোথাও হয়নি—মানুষের অধস্তন জীবের লৌকিক সিদ্ধিতেও নয় অথবা তার ঊর্ধ্বতন সত্ত্বের অলৌকিক অভীপ্সাতেও নয়। মানুষের কাছে প্রকৃতি লোকোত্তরের দুর্গম ভূমির ইশারা এনেছে, চিন্ময় জীবনের অভীপ্সায় আকুল করেছে তার হৃদয়, অন্তরে তার অঙ্কুরিত করেছে চিন্ময় দিব্যসত্ত্বের ভাবনা। চিন্ময় মানবের সৃষ্টিই বলতে গেলে মনুষ্যসৃষ্টির চরম চমৎকার—এ যেন প্রকৃতির অতিপ্রাকৃত একটা সাধনা। মানুষের মধ্যে সে ফুটিয়ে তুলেছে মনস্বী স্রষ্টা, চিন্তাবীর, মুনি, নবদর্শনের নবী অথবা যতচিত্ত সংশিতব্রত ছন্দোরসিক মনোময় পুরুষকে। কিন্তু এতেও তার তৃপ্তি হয়নি। তাই সত্তার ঊর্ধ্বে এবং গভীরে সমাহিত হয়ে সে চেয়েছে চৈত্যপুরুষ অন্তর্মন ও অন্তর্হৃদয়কে অনাবৃত করে আধারের পুরোধা করতে, চেয়েছে উত্তরভূমি হতে উত্তরমানস

ও অধিমানসের বীর্যকে এইখানে নামিয়ে আনতে এবং তাদেরই জ্যোতিঃশক্তিতে গড়তে চেয়েছে চিন্ময় মানবের বাহিনী—মানুষের সমাজে যোগী ঋষি সুফী নবী মরমী বিজ্ঞানী বা ভাগবত নামে যাদের পরিচয়।

মানুষ নিজেকে এমনি করেই ছাড়িয়ে যায়। যতক্ষণ বহির্মুখ চিত্ত নিয়ে শুধু মাটি আঁকড়ে পড়ে আছি, ততক্ষণ উপরপানে ডানা মেলবার শক্তি কোথায় আমাদের? তখন জাত্যন্তরপরিণামের সুদূরতম সম্ভাবনাও যে এই আধারে নিহিত আছে—এ-কল্পনাও তো বাতুলতা। প্রাণময় অথবা মনোময় মানুষ পার্থিবজীবনে অনেক তোলাপাড়া ঘটিয়েছে, মানুষকে পশুর পর্যায় হতে টেনে তুলেছে মনুষ্যত্বের বর্তমান ভূমিতে। কিন্তু তবু প্রকৃতিপরিণামের সুব্যবস্থিত বিধানকে ডিঙিয়ে কাজ করবার অধিকার তারা পায়নি। মনুষ্যত্বের পরিধিকে তারা প্রসারিত করতে পারে মাত্র, কিন্তু তাতেই বর্তমান মনুষ্য-চেতনার কি তার বিশিষ্টবৃত্তির রূপান্তর ঘটে না। প্রাণময় বা মনোময় মানুষের অপরিমিত অতিরঞ্জনদ্বারা নীট্শে-কল্পিত অতিকায় মানবত্বে আমরা পৌঁছতে পারি বটে, কিন্তু তাতে মনুষ্যজীবের অতিস্ফীতিই ঘটবে শুধু—আমূল রূপান্তর দ্বারা তাকে দেবতা করে তোলা যাবে না। কিন্তু প্রকৃতি-পরিণামের আরেকটা ধারা খুলে যায়—যদি অন্তরে অবগাহন করে আমরা অন্তরপুরুষের সালোক্য লাভ করি এবং তাঁকেই করি আমাদের জীবনের সাক্ষাৎ প্রশাস্তা। অথবা চিন্ময় বোধিলোকের মহাভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেইখান থেকে এবং তারই শক্তিতে প্রকৃতিকেও চিন্ময়ী করে তুলি।

চিন্ময় মানুষ জগতে বহন করে এনেছে এই নব-পরিণামের সূচনা—প্রকৃতির এই অভিনব ঊর্ধ্বমুখী আকূতির দ্যোতনা। কিন্তু শক্তিপরিণামের অতীত ধারা হতে বর্তমান ধারা দুটি বিষয়ে পৃথক। প্রথমত, এর মূলে আছে মনুষ্যচিত্তের সচেতন প্রবর্তনা। দ্বিতীয়ত, শুধু বহিঃপ্রকৃতির সচেতন প্রগতিতেই এ-পরিণামের সাধনা পর্যবসিত হয়নি—এর মধ্যে দেখা দিয়েছে অবিদ্যার তমঃসম্পুটকে বিদীর্ণ করে অন্তঃসমাধির দ্বারা আধারের নিগূঢ় অধিষ্ঠানতত্ত্বকে আবিষ্কার করবার এবং বহির্ব্যাপ্তি ও ঊর্ধ্বক্রান্তিদ্বারা বিশ্ব ও বিশ্বোত্তরকে অধিগত করবার প্রয়াস। এতকাল প্রকৃতি শুধু বহিশ্চেতনায় মিথুনীভূত বিদ্যা-অবিদ্যার গণ্ডিকেই প্রসারিত করে এসেছে। কিন্তু চিন্ময় তপস্যার লক্ষ্য হল অবিদ্যার প্রলয় ঘটানো—অন্তঃসমাহিত হয়ে আত্মাকে আবিষ্কার করা এবং বিশ্ব ও ব্রহ্মের সঙ্গে তাদাত্ম্যচেতনায় যুক্ত হওয়া। মানুষের মধ্যে প্রকৃতির মনোময় পরিণামের এই হল চরম সাধ্য। অথচ অবিদ্যাকে বিদ্যাশক্তিতে রূপান্তরিত করবার এ শুধু উদ্যোগপর্ব। আধারে চিন্ময় পরিণামের শুরু হয় অন্তরপুরুষ ও উত্তরমানসের সুস্পষ্ট শক্তি-সংক্রমণে। বাইরেও তার ক্রিয়া অনুভূত হয় এবং মন তাকে মেনেও নেয়।

কিন্তু রূপান্তরের পক্ষে এইটুকুই পর্যাপ্ত নয়। কেননা, এতে শুধু প্রদীপ্ত মনের ভাবচ্ছটার বিকিরণ ঘটে চেতনায়, অথবা মন অধ্যাত্মমুখী হয়, স্বভাবে একটা ধর্মভাব ফোটে এবং তার ফলে হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ ও সদাচারে মানুষের রুচি হয়। চিতের প্রতি চিত্তের প্রথম অভিসারেই কিন্তু তার গোত্রান্তর ঘটে না—তার জন্য আরও সাধনার প্রয়োজন। চেতনার বর্তমান গণ্ডিকে ছাপিয়ে, প্রকৃতির বর্তমান ভূমিকে অতিক্রম করে আমাদের ডুবতে হবে আরও গভীরে—তবেই রূপান্তরের সাধনা সার্থক হবে।

একটা কথা স্পষ্ট। গুহাহিত হয়েও ঊর্ধ্বশক্তির প্রবাহকে আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে ধারণা করি—এই পর্যন্তই আমাদের বর্তমান সিদ্ধির সীমা। কিন্তু গুহাশয়ন হতে অন্তঃশক্তির প্রবাহকে আধারের বহিঃকরণেও যদি অবিচ্ছেদে সংক্রামিত করতে পারি, অথবা লোকোত্তর ভূমির বিপুলতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এই মর্ত্যজীবনেই অলকানন্দার বীর্যপ্রবাহ নামিয়ে আনতে পারি—তাহলে এই আধারেই চিৎসত্তায় স্ফুরিত হয় একটা উজানধারার অভাবনীয় সংবেগ এবং তাইতে চেতনার মধ্যে দেখা দেয় একটা নবীন পর্যায়, একটা নবীন প্রবর্তনা—একটা নবভাবের নেত্রাঞ্জনে জগতের রূপ বদলে যায়, প্রাণ ও চেতনার মোহানা প্রশস্ত হয়, সত্তার অবরভূমিকে আত্মসাৎ করে তাদের রূপান্তর ঘটানোর সাধনা অনায়াস হয়। এমনি করেই প্রকৃতি-স্থ পুরুষ চিন্ময় পরিণামের দ্বারা এই আধারকে 'দেবায় জন্মনে' প্রস্তুত করেন। লক্ষ্য হতে যত দূরে থাকি না কেন, উত্তরায়ণের পথে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ সার্থক হতে পারে—প্রতি চরণপাতেই আমরা এগিয়ে যেতে পারি দিব্যভাবনার উত্তরোত্তর প্রসারের দিকে চেতনা ও শক্তির জ্ঞান ও সঙ্কল্পের বৃহত্তর ও দিব্যতর অভিব্যক্তির দিকে, আত্মভাবের অবাধিত অনুভব ও স্বরূপানন্দের উপচীয়মান উচ্ছলনের দিকে। এমন-কি প্রথম হতেই আমাদের আধারে ফুটতে পারে দিব্যজীবনের অমৃতবর্ণ মঞ্জরী। সমস্ত ধর্মে, সমস্ত রহস্যবিদ্যায়, চিত্তের অতিপ্রাকৃত (বিকৃত নয় কিন্তু) সমস্ত অনুভবে, অধ্যাত্মযোগের সমস্ত সাধনায় ও উপলব্ধিতে আছে চিৎসত্ত্বের নিগূঢ় আত্মোন্মীলনের অবিরাম অভিযানের ইশারা।

কিন্তু জড়ের মাধ্যাকর্ষণ এখনও বোঝা হয়ে চেপে আছে মানুষের চিত্তের 'পরে—অপরাজিত 'পার্থিবং রজঃ'-র টানকে এখনও মানুষ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। তাই আজও তার 'পরে মাস্তিষ্ক-মনের বা জড়াসক্ত-বুদ্ধির দৌরাত্ম্য চলছে। এমনি করে সহস্র পাকে জড়িয়ে আছে বলে ওপারের সুস্পষ্ট ইশারাতেও তার দ্বিধা কাটে না, কিংবা অধ্যাত্মসাধনার অতিনির্মম দাবিতে অল্পেই সে হাঁপিয়ে ওঠে। তাছাড়া এখনও মানুষের মধ্যে পুঞ্জীভূত রয়েছে বুদ্ধিহীন সংশয়, অপরিসীম জড়ত্ব, চিন্তা ও চেতনায় অপরিমেয় ভীরুতা

এবং গতানুগতিকতা। অভ্যাসের বাঁধা পথ হতে সরে আসতে বললেই এইসব বৃত্তি তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। অথচ যেক্ষেত্রেই মানুষ জয়শ্রীকে চায়, সেক্ষেত্রেই তাকে পায়—জীবনের পাতায়-পাতায় তার নজির ছড়ানো আছে। জড়বিজ্ঞান প্রকৃতির একটা নিতান্ত অবরশক্তির অনুশীলনের ফল, অথচ সেখানেও মানুষের সাফল্য কী অদ্ভুত। তবু সংশয়ের অভ্যাস মানুষকে ছাড়তে চায় না। তাই অভিনবের আহ্বান আসলে পরে কজনই-বা তাতে সাড়া দেয়? কিন্তু উত্তরায়ণের সিদ্ধি সমগ্র মানবজাতির সিদ্ধসম্পদ না হয়ে শুধু ব্যক্তির অর্জিত বিত্ত হয়ে থাকলে প্রকৃতির পরিণাম তো সার্থক হবে না। কেননা, ব্যক্তির সঙ্গে জাতিও যদি প্রগতির পথে এগিয়ে চলে, তবেই আত্মার জয়শ্রী অক্ষোভ্য হবে, জাতির কল্যাণে মহাকালের ভান্ডারে তার সঞ্চয় সুনিশ্চিত হবে। তখন কোনও কারণে যদি প্রকৃতির পরাবর্তনও ঘটে এবং তার ফলে তার সাধনায় শৈথিল্য দেখা দেয়, তাহলেও তার অন্তরপুরুষ প্রচ্ছন্ন স্মৃতির সহায়ে আবার জাতিকে টেনে তুলবেন উপরপানে। তখন অতীতের সঞ্চিত তপস্যার বীর্যে জাতির নবীন অভ্যুদয় আরও সহজ এবং দীর্ঘায়ু হবে। অতীত তপস্যার সংবেগ ও পরিণাম যে মনুষ্যজাতির অবচেতনায় সঞ্চিত থাকবে, এ কিছু অসম্ভব নয়। চিৎপুরুষের গোপন স্মৃতির পরিচয় পাই প্রকৃতির অবসর্পিণী প্রবৃত্তিতেও—যখন জাতির মধ্যে দেখা দেয় পিছু-হটবার একটা ঝোঁক। আসলে সে-ঝোঁকটা অবিলুপ্ত স্মৃতিরই একটা সংবেগ—যা আমাদের উপরেও যেমন তুলতে পারে, তেমনি আবার টেনে নামাতেও পারে। কে জানে অতীতের অগণিত সাধকের তপস্যায় কি সিদ্ধিই-বা অর্জিত হয়েছিল, আর আজ উদয়নের পরের পর্ব কতখানিই-বা আসন্ন? সমগ্র মানবজাতি যে মনোময় জীব হতে চিন্ময় জীবে রূপান্তরিত হবে—তা সম্ভব নয়, আবশ্যকও নয়। কিন্তু দেবজন্মের আদর্শকে সাধারণভাবে সবাই স্বীকার করবে এবং তার সাধনা ছড়িয়ে পড়বে জগৎময়, চিত্তের তীক্ষ্ম এষণাকে সচেতনভাবে সেই-দিকেই মানুষ নিয়োজিত করবে—এটুকুর অবশ্যই প্রয়োজন আছে আজকের অস্পষ্ট বাসনার ধারাকে সুস্পষ্ট সিদ্ধির সাগরসঙ্গমে নিয়ে যেতে। সর্ব-সাধারণে এ-ভাব ছড়িয়ে না পড়লে, শুধু দু-চারজন সাধকের সিদ্ধিতে মানুষের মধ্যে একটা নতুন থাক দেখা দেবে মাত্র। তখন সমগ্র মানবজাতি স্বেচ্ছায় নিজেকে এ-সাধনায় অপাঙ্‌ক্তেয় প্রমাণ করে আবার হয়তো পরিণামের অব-সর্পিণী ধারায় গড়িয়ে পড়বে, নয়তো স্থাণু হয়ে বসে থাকবে পথের প্রান্তে। কারণ এতকাল ধরে ঊর্ধ্বমুখী সাধনার একটা অবিচ্ছেদ প্রবাহই মানবজাতিকে সজীব রেখে এসেছে, সৃষ্টজীবের জীবনযজ্ঞে তাকে পুরোধার আসনে বসিয়েছে।

প্রকৃতিপরিণামের তাহলে এই ধারা। প্রথমে চাই পরিণামের একটা সুদৃঢ়

ভিত্তি, সেই ভিত্তি হতে আধারশক্তির উদয়ন এবং তার ফলে চেতনার রূপান্তর। তারপর রূপান্তরিত চেতনার লোকোত্তর মহাভূমি হতে অবরভূমিরও রূপান্তর এবং সমগ্র প্রকৃতিতে সম্যক্‌সমাহরণের একটা নবীন দীপনী। চিন্ময় পরিণামের ভিত্তি হল জড়। জড়কে অবলম্বন করে প্রকৃতির উদয়ন ঘটছে। তার প্রথমপর্বে অচেতন বা অর্ধচেতনভাবে প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত রূপান্তরের ফলে প্রকৃতির দ্বারাই সমাহরণের সাধনা। কিন্তু যখন পুরুষ এসে পূর্ণচেতন হয়ে প্রকৃতির কাজে যোগ দেয়, তখনই পরিণামের সমগ্র ধারাতে ঘটে অপরিহার্য একটা পরিবর্তন। জড়ের আধার তবুও থাকে, কিন্তু সে আর তখন চেতনার প্রবর্তক নয়। চেতনা তখন অচিতির অন্ধতামস হতে উৎসারিত হয় না, অথবা বিশ্বশক্তির অভিঘাতে অন্তর্গূঢ় অধিচেতনার উৎস হতে ফল্গুধারার মত বয়ে চলে না। অভিনব পরিণামের ভিত্তি হবে ঊর্ধ্বলোকের চিন্ময়ী স্থিতি অথবা অন্তরের অনাবরণ আত্মস্থিতি। উপর হতে প্রজ্ঞা ও ক্রতুর জ্যোতির্ময় অবতরণ আর অন্তর হতে তাদের স্বীকরণ—এই হবে পুরুষের বিশ্বানুভবের নিয়ামক। পুরুষের আত্মসমাহিত চেতনার সমগ্র ধারা তখন নীচ হতে ঊর্ধ্বপানে এবং বাহির হতে অন্তরের অভিমুখে প্রবাহিত হবে। যে পরমাত্মা এবং অন্তরাত্মা এখন সংবিতের বাইরে, তখন তিনিই হবেন আমাদের প্রতিষ্ঠা এবং স্ব-ভাব। আর অধুনাসংকুচিত বহিরাত্মা হবে তাঁর বহির্বাটিকা বা বিশ্বযোগের সাধন। অধ্যাত্মচেতনার কাছে সমগ্র বিশ্বজগৎ তখন আত্মস্বরূপের অঙ্গীভূত হয়ে রূপান্তরিত হবে অন্তর্জগতে। একত্ব এবং তাদাত্ম্যবোধের চেতনা ও বেদনা জগৎকে অন্তরঙ্গভাবনার নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরবে, চিন্ময় মনের বোধিদীপ্ত দৃষ্টি অনুবিদ্ধ করবে তাকে, প্রবুদ্ধ চিত্তের তন্ত্রে-তন্ত্রে তার সাড়া জাগবে চেতনার সঙ্গে চেতনার অপরোক্ষ সম্প্রয়োগে—এককথায় অভঙ্গসমাহারের লোকোত্তর সিদ্ধিতে বিশ্বের ভাবনা হবে বিরাট আত্মভাবনার অন্তর্ভুক্ত। এমন-কি, ঊর্ধ্ব হতে জ্যোতিঃসংবিতের অনিরুদ্ধ প্রবাহে আধারে অচিতির বনিয়াদও চিন্ময় ধাতুতে রূপান্তরিত হবে, তার অন্ধতমিস্রার গভীর গহনও হবে চিৎসত্তার তুঙ্গদীপ্তির কবলিত। এমনি করে এই আধারেই প্রকৃতি-পুরুষের অনবচ্ছিন্ন রূপান্তরের সামরস্যে ও সমাহরণে বৃহৎসামের অখণ্ড মূর্ছনা ঝঙ্কৃত হবে জীবনের পর্বে-পর্বে সম্যক্‌সংবিতের অবন্ধ্য প্রেতিতে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

সপ্তধা অবিদ্যা হতে সপ্তধা বিদ্যার পথে

অজ্ঞানভূঃ সপ্তপদা জ্ঞভূঃ সপ্তপদৈব হি।

মহোপনিষৎ ৫।১

সপ্তপদা অজ্ঞানভূমি; তেমনি সপ্তপদা জ্ঞানভূমিও।

—মহোপনিষদ (৫।১)

ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা ন ঋতপ্রজাতাং বৃহতীমবিন্দৎ।
তুরীয়ং স্বিজ্জনয়দ্বিশ্বজন্যঃ।
ঋতং শংসন্ত ঋজু দীধ্যানা দিবস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ।
বিপ্রং পদমঙ্গিরসো দধানা যজ্ঞস্য ধাম প্রথমং মনন্ত ॥
অশ্মন্ময়ানি নহনা ব্যস্যন্।
বৃহস্পতিরভিকনিক্রদদ্গাঃ...
অবো দ্বাভ্যাং পর একয়া গা গুহা তিষ্ঠন্তীরনৃতস্য সেতৌ।
বৃহস্পতিস্তমসি জ্যোতিরিচ্ছন্নুদস্রা আকর্বি হি তিস্র আবঃ ॥
বিভিদ্যা পুরং শয়থেমপাচীং নিস্ত্রীণি সাকমুদধেরকৃন্তৎ।
বৃহস্পতিরুষসং সূর্যং গামর্কং বিবেদ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ॥

ঋগ্বেদ ১০।৬৭।১-৫

ঋত হতে প্রজাত সপ্তশীর্ষ এই বৃহৎ ধীকে পেলেন তিনি—কোন্ তুরীয়কে জন্ম দিয়ে হলেন আবার বিশ্বজনীন।...দ্যুলোকের পুত্র যাঁরা বিশ্বপ্রাণের বীর সেনানী, ঋতের শংসন ও ঋজুচিত্তের ধ্যান দ্বারা বোধিদীপ্তির পদকে তাঁরা করলেন প্রতিষ্ঠিত, মননে রচলেন আবার যজ্ঞের প্রথম ধাম।...শিলাময় বাধাকে বিক্ষিপ্ত করে জ্যোতির্ময় গোযূথকে ডাক দিলেন বৃহস্পতি...যারা গোপনে ছিল অনৃতের সেতুর 'পরে নীচের দুটি লোক আর উপরের একটি লোকের মধ্যখানে। তমসার মধ্যে জ্যোতির এষণায় কিরণযূথকে উদ্ভিন্ন করলেন তিনি—তিনটি ভূমিকে করলেন অনাবৃত। আড়ালে লুকিয়ে থাকে যে-পুর, তাকে বিদীর্ণ করে উদধি হতে তিনটিকেই কেটে বার করলেন তিনি—জানলেন উষা আর সূর্যকে, জানলেন আলো আর আলোর জগৎকে।

—ঋগ্বেদ (১০।৬৭।১-৫)

বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানো মহো জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্।
সপ্তাস্যস্তুবিজাতো রবেণ বি সপ্তরশ্মিরধমৎ তমাংসি ॥

ঋগ্বেদ ৪।৫০।৪

বৃহস্পতি প্রথম জন্মালেন যখন মহাজ্যোতির পরমব্যোমে, বহুধা-জাত সপ্তাস্য সপ্তরশ্মি সেই দেবতা ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন যত অন্ধকার।

—ঋগ্বেদ (৪।৫০।৪)

বিশ্বপ্রকৃতি পরমার্থসতের চিদ্বিভূতি অতএব চিৎশক্তির উদ্দীপনই প্রকৃতিপরিণামের তত্ত্ব: জড় হতে প্রাণ, প্রাণ হতে মন, মন হতে চিৎ—এমনি করে তীব্রতর দীপ্তিতে চেতনার ব্যক্ত বিভূতি হতে অব্যক্তকে ফুটিয়ে তোলা—এই তার তাৎপর্য। আমাদেরও পরিণামের ধারা হবে এই। মনের অভিব্যক্তি

হতে চিন্ময় এবং অতিমানস বিভূতির অভিব্যক্তি হবে, আজকের অর্ধপাশব মানবতার কোরক হতে ফুটবে দেবমানব এবং দিব্যজীবনের মহিমা। আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে চিৎজগতের নূতন সানুতে, চেতনার ধাতু বীর্য এবং সংবেদন-শক্তিকে আরও উদার সূক্ষ্ম তীক্ষ্ন এবং গভীর করতে হবে, আধারকে তুলে ধরে প্রসারিত সাবলীলতায় উপচিত করতে হবে তার সহস্রদল সামর্থ্য, মন এবং তার অবরভূমিকে বৃহতের ভাবনায় জারিত এবং উদ্দ্যোতিত করতে হবে। প্রকৃতিপরিণামের যা স্বরূপ ও রীতি, আগামী রূপান্তরের দিনে প্রত্যাশিত বিপরিণাম সত্ত্বেও তার মধ্যে মৌলিক কোনও পরিবর্তন দেখা দেবে না—কেবল তার গতির সমারোহ আরও বিপুল নির্মুক্ত এবং স্বচ্ছন্দ হবে। চেতনা ও স্বভাবস্থিতির ঊর্ধ্বপরিণাম আর রূপান্তর কেবল-যে ধর্ম-কর্ম যোগযাগ এবং সর্ববিধ তপশ্চর্যার একমাত্র লক্ষ্য তা নয়, আমাদের জীবনধারাও চলেছে ওই আদর্শের অভিমুখে—তার সকল সাধনার মূলে আছে রূপান্তরসাধনার নিগূঢ় প্রবর্তনা। আজ দেহ প্রাণ ও মন হল আমাদের প্রাকৃতজীবনের আলম্বন। এদের মধ্যে পূর্ণমহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা—এই তার অবিরাম প্রয়াস। কিন্তু এখানেই তার সাধনার শেষ নয়। প্রাকৃতভূমির সিদ্ধিকে চিন্ময় উন্মেষের সাধনে রূপান্তরিত করে স্বোত্তরভূমিতে উত্তীর্ণ হবার আকূতি তার স্বভাবের মধ্যে নিহিত রয়েছে। আধারের কোনও একটা অংশ—হতে পারে তা আমাদের বুদ্ধি হৃদয় সঙ্কল্প বা প্রাণবাসনা—যদি নিজের অপূর্ণতায় কি সংসারের অব্যবস্থায় বিরক্ত হয়ে উত্তরভূমির সন্ধানে ছোটে এবং আধারের অপর বৃত্তিগুলি শুকিয়ে মরলেও তাদের দিকে ফিরে না তাকায়—তাহলে যে সমগ্র রূপান্তরের কথা এতবার বলে এসেছি, তা কখনও সিদ্ধ হতে পারে না। অন্তত এ-জগতে তার সিদ্ধির প্রত্যাশা তখন সুদূরপরাহত। জীবনের অখণ্ড তাৎপর্য কিন্তু এমন একদেশী নয়। আমাদের সমগ্র প্রকৃতিতে একটা ঊর্ধ্বমুখী তপস্যা আছে—অস্তিত্বের বর্তমান ভূমি হতে প্রতিনিয়ত সে উত্তীর্ণ হতে চাইছে একটা ঊর্ধ্বতন ভূমিতে। অথচ এই উদয়নের ফলে আত্ম-বিনাশ সে চায় না। অপরা প্রকৃতিকে নিরাকৃত এবং বিনষ্ট করে শুধু পরা প্রকৃতির একান্ত প্রতিষ্ঠা কখনও বিশ্বপরিণামের লক্ষ্য হতে পারে না। চিৎ-শক্তির উদ্দীপনায় দেহ-প্রাণ-মনের যন্ত্র-তন্ত্রণাকে ছাড়িয়ে চেতনা শুদ্ধবীর্যের স্বাতন্ত্র্য পাবে—এ-সাধনা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য হলেও শুধু এইটুকুই আমাদের পরমপুরুষার্থ নয়।

সত্তার সবখানিকে চেতনার একটা নতুন শিখরে উত্তীর্ণ করা আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু তার জন্যে আধারের চরিষ্ণু ভাগকে প্রকৃতির অব্যাকৃত অন্ধগহনে বিসর্জন দিয়ে ভারমুক্ত হয়ে চিন্ময় স্থাণুভাবের আনন্দে বিভোর হবার সাধনাই একমাত্র পথ নয়। অবশ্য এ-সাধনা সবসময়েই করা চলে এবং তাতে

চেতনায় মুক্তি ও বিশ্রান্তির বিপুল প্লাবনও নেমে আসে। কিন্তু আমাদের কাছে প্রকৃতির দাবি আরেকধরনের। সে চায়, বর্তমানের সবখানিই আমরা তুলে নেব ঊর্ধ্বচেতনার জ্যোতির শিখরে এবং চিৎস্বরূপের বিচিত্রবীর্যের বিভূতিরূপে তাকে উদ্ভাসিত করব। প্রকৃতির অভঙ্গ রূপান্তরসাধনই পুরুষের অনবচ্ছিন্ন আকূতি। এইজন্যেই বিশ্বের মর্মে-মর্মে নিহিত রয়েছে আত্ম-উত্তরণের অনির্বাণ আকুলতা। একটা অভিনব তত্ত্বে উত্তীর্ণ হলেই যে প্রকৃতির উদয়ন সার্থক হল, তা নয়। সিদ্ধির নতুন শিখরটি একটি ক্রম-সূক্ষ্ম গিরিকূট মাত্র নয়। আধারে শুধু একাগ্র অভিনিবেশের তীব্রতাই সে আনে না—আনে বিশাল ঔদার্য, রচে জীবনসাধনার বিপুল পরিবেশ, যার মধ্যে নবশক্তির রূপায়ণ ও লীলায়ন স্বচ্ছন্দ এবং অকুণ্ঠিত। এই-যে চেতনার উন্নয়ন ও পরিব্যাপ্তি, এতে শুধু-যে নবাধিগত তত্ত্বের স্বরূপশক্তির অনিয়ন্ত্রিত বিলাসের সুযোগ ঘটে, তা নয়। এতে ঊর্ধ্বভূমিতে উত্তরণদ্বারা আধারের অবরশক্তিরও প্রত্যুজ্জীবন সিদ্ধ হয়। চিন্ময়-বা দিব্য-জীবন মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় জীবনকে কেবল আত্মসাৎই করবে না—তাদের মধ্যে সে আনবে পূর্ণতর এবং উদারতর লীলায়নের স্বাচ্ছন্দ্য, যা প্রাকৃতভূমিতে ছিল তাদের সাধ্যের অগোচর। নিজেকে ছাড়িয়ে যাব বলে দেহ-প্রাণ-মনকে ধ্বংস করতে হবে, অথবা চিন্ময় রূপান্তরের ফলে তারা খর্ব এবং খিলবীর্য হবে—একথা সত্য নয়। বরং তারা হবে আরও বৃহৎ সমৃদ্ধ নিটোল এবং বীর্যময়। চিন্ময় পরিণামের সংবেগে এমন নববিভূতির উন্মেষ হবে তাদের মধ্যে, প্রাকৃতদশায় যাদের সিদ্ধি তো দূরের কথা—কল্পনাও ছিল সাধকের সামর্থ্যের বাইরে।

এমনি করে চেতনার উদ্দীপনে প্রসারণে ও সমাহরণে প্রকৃতির যে-ঊর্ধ্ব-পরিণাম সূচিত হয়, তার স্বরূপ হল সপ্তধা অবিদ্যা হতে অখণ্ড পরা বিদ্যার উন্মেষ এবং উদয়ন। তার মধ্যে সাংস্থানিক অবিদ্যাকে বলা চলে আর-সব অবিদ্যার জননী। এই অবিদ্যাই আমাদের সম্ভূতির সত্যরূপটিকে বহুধা-আবরণে আবৃত ক'রে আত্মভাবের সমগ্রসংবিৎকে আচ্ছন্ন করে। বর্তমানে যে-ভূমিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবং আত্মপ্রকৃতির যে-ধাতু আমাদের মধ্যে প্রবল, শুধু তাদের দিয়ে সত্তা ও চেতনাকে সীমিত করাই হল এ-অনর্থের মূল। আমরা আছি জড়ের ভূমিতে এবং সম্প্রতি আমাদের প্রকৃতিতে মানসী বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়মানসের ক্রিয়াই প্রবল। আবার মন-বুদ্ধিরও আশ্রয় এবং পাদপীঠ হল ওই জড়প্রকৃতি। এইজন্যই সাংস্থানিক অবিদ্যাতে বিশেষ করে ফোটে মানসী বুদ্ধি এবং তার বৃত্তিসমূহের জড়াভিমুখী একটা অভিনিবেশ। ইন্দ্রিয়ের সহায়ে জড়ের জগৎকে যেমনটি দেখা যায়, জড় ও প্রাণের মধ্যে আপোসের ফলে জীবনের যে-রূপ ফুটেছে, জড়াশ্রয়ী বুদ্ধির কারবার তাদের নিয়ে। এমনিতর লোকায়ত জড়বাদ বা জড়বাসিত প্রাণবাদের দোহাই দিয়ে যাত্রাপথের

শুরুতেই খুঁটি গেড়ে বসা—এ শুধু জীবনের বিপুল সম্ভাবনাকে আত্ম-সঙ্কোচের খোলে গুটিয়ে আনা। অথচ মানুষের এ একটা মজ্জাগত সংস্কার। অবশ্য একসময় এই আত্মসঙ্কোচ ছিল তার মর্ত্যজীবনের অপরিহার্য প্রথম সাধন। কিন্তু মূলা অবিদ্যা ক্রমে তাকে দীর্ঘপর্বা করে গড়েছে তার পায়ের শিকল। এখন চলতে গিয়ে এরই জন্যে প্রতিপদে তার গতি ব্যাহত হচ্ছে। অতএব বিশ্বমানবের যথার্থ প্রগতিসাধনার প্রথম অঙ্গই হল চিৎসত্তার সত্যবীর্য ও নিটোল পূর্ণতার এই বুদ্ধিকৃত সঙ্কোচ হতে নিজেকে উদ্ধার করা, জড়-প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণের দৈন্য হতে আত্মাকে মুক্ত করা। বাস্তবিক আমাদের অবিদ্যা তো নিরেট আঁধার নয় একেবারে—তাকে বলতে পারি চেতনার সঙ্কুচিত বৃত্তি। অবিমিশ্র জড়ের ভূমিতে অবিদ্যা হয়েছে পরিপূর্ণ অজ্ঞানের অমানিশা। জড় যে-ভূমির প্রধান তত্ত্ব, সেখানকার এই রীতি। কিন্তু আমাদের মধ্যে অবিদ্যা বিদ্যারই খণ্ডিত রূপ। তার ধর্ম সত্তার সঙ্কোচসাধন ও বিভাজন—বিশেষ করে সত্যকে মিথ্যার রূপ দেওয়া। এই সঙ্কোচ ও মিথ্যা-চার হতে অন্তর্গূঢ় চিন্ময় সত্তার সত্যলোকে উত্তীর্ণ হওয়াই আমাদের পুরুষার্থ।

জড় ও প্রাণের প্রতি মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহকে গোড়ার দিকে অসঙ্গত বা নিষ্প্রয়োজন বলতে পারি না, কেননা মানুষের প্রথম কাজ হচ্ছে জড়ের জগৎকে জানা এবং তাকে আয়ত্ত করা। তার জন্য প্রাকৃত মন-বুদ্ধির সহায়ে ইন্দ্রিয়মানসদ্বারা আহরিত বিষয়ানুভবের সাধ্যমত পরিশীলন তার মুখ্য সাধন। কিন্তু মানুষের প্রকৃতিপরিণামের এ কেবল উপক্রমণিকা। এইখানেই থেমে থাকলে তার সত্যকার প্রগতি পরাহত হবে। এর ফলে, আমরা যেখানে আছি, সেইখানে থেকেই বাইরের জগতে একটুখানি হাত-পা ছড়াবার জায়গা করে নিতে পারি মাত্র। তাতে মনের এইটুকু লাভ যে, জড়জগৎ সম্পর্কে তার ব্যাব-হারিক জ্ঞান খানিকটা পোক্ত হয় এবং পরিবেশের 'পরে অপর্যাপ্ত ও অনিশ্চিত একটা আধিপত্যও হয়তো জন্মায়। প্রাণবাসনাও তখন জড়শক্তি ও জড়বস্তুর আসরে ইচ্ছামত ঠেলাঠেলি আর দাপাদাপি করবার একটা সুযোগ পায়। কিন্তু জড়জগতের বৈষয়িক জ্ঞান যতই বাড়ুক—এমন-কি সুদূরতম সৌরজগতের সীমান্তে, পৃথিবীর কি সমুদ্রের গভীরতম তলদেশে অথবা জড়বস্তু ও জড়-শক্তির সূক্ষ্মতম বিভূতির রাজ্যেও যদি সে ছড়িয়ে পড়ে, তবুও তাতে সত্যকার লাভ আমাদের কিছুই নাই। কেননা জড়ের বিজ্ঞানই যে মানুষের একমাত্র পুরুষার্থ—একথাই-বা বলি কি করে? এইজন্যেই বিজ্ঞানের চোখধাঁধানো সিদ্ধির বিপুল সমারোহ সত্ত্বেও জড়বাদের গীতা ব্যর্থ হয়েছে মানুষের জীবনে। মানবসমাজের স্থূল আরামের অজস্র ব্যবস্থা করেও জড়বিজ্ঞান তাকে সত্যকার সুখ বা জীবনের পূর্ণতার একটা নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারেনি।

বাস্তবিক সত্যকার সুখ আছে সমগ্র আধারের সত্যকার পুষ্টিতে, জীবনের সকল পর্ব জুড়ে সিদ্ধার্থের জয়শ্রীতে, বহির্জগতের চাইতে অন্তর্জগতের নিরঙ্কুশ বশীকারে, বহিঃপ্রকৃতির প্রশাসনের চাইতে অন্তঃপ্রকৃতির স্বচ্ছন্দ প্রশাসনে। একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে শুধু বিষয়ের পরিধি বাড়ানোকে পূর্ণতা বলে না—পূর্ণতা আসে অভ্যস্ত ভূমির উৎক্রমণে। এইজন্যেই জড় এবং প্রাণের বনিয়াদে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবার পর চিৎশক্তির উদ্দীপনই হবে আমাদের সাধনা—তাকে সূক্ষ্ম গভীর ও বিশাল করাই হবে আমাদের ব্রত। তার জন্যে প্রথমে চাই মনোময় সত্ত্বের মুক্তি—মনোজীবনের আরও স্বচ্ছন্দ সুকুমার এবং আর্যজনোচিত লীলায়ন, কারণ জড়ের জীবনের চাইতে মনের জীবনই আমাদের কাছে বেশী সত্য। মানুষের অপরা প্রকৃতি চিন্ময়ী মহাপ্রকৃতির নৈমিত্তিক প্রকাশ হলেও এর মধ্যে মনই মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে, জড় নয়। মনোময় জীব বলেই আমাদের বিশিষ্ট পরিচয়—অন্নময় জীব বলে নয়। পুরাপুরি মনোময় জীব হওয়াই হল সিদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্যের অভিযাত্রী মানুষের প্রথম সাধনা। অবশ্য এতেই সিদ্ধি তার করায়ত্ত হয় না, অথবা আত্মারও মুক্তি ঘটে না। কিন্তু জড় ও প্রাণের অভিনিবেশ হতে মুক্ত করে এ তাকে লক্ষ্যের দিকে একধাপ এগিয়ে দেয়—অবিদ্যার নাগপাশকে শিথিল করবার ভূমিকা রচে।

মনোময়ী সিদ্ধির সত্যকার সার্থকতা হল—সত্তা চেতনা শক্তি সৌমনস্য ও আনন্দের উদ্দীপনে প্রসারণে ও সূক্ষ্মতর অভিব্যক্তিতে। আমাদের মধ্যে মনস্বিতা যত বাড়বে, এইসব দিব্যবিভূতির জোরও ততই বাড়বে। সেইসঙ্গে মনশ্চেতনার দৃষ্টি উদার এবং গভীর হবে, সামর্থ্য হবে অকুণ্ঠিত, তার সূক্ষ্মতা ও সাবলীলতা হবে অব্যাহত। তার ফলে জড় ও প্রাণের জগৎ আমাদের আরও আয়ত্ত হবে। আমরা তাকে আরও ভাল করে জানব, ভাল করে ব্যবহার করতে শিখব। তার মহিমা ও অধিকার আমাদের কাছে প্রশস্ততর হবে, তার প্রবৃত্তিতে দেখা দেবে ঊর্ধ্বপরিণামের ব্যঞ্জনা, তার দূরদিগন্তের কোলে থাকবে মহনীয় নিয়তির ইশারা। মনোময় স্বভাবেই মনুষ্যপ্রকৃতির বিশিষ্ট বীর্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আত্মোন্মেষের প্রথম পর্বে মানুষ আবির্ভূত হয় মনোবাসিত পশুরূপে। তখন পশুরই মত তার ঝোঁক পড়ে দৈহ্যসত্তার দিকে। মনকে সে তখন দেহ প্রাণের কামাচার ও স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে খাটায়। মন তখনও দেহ-প্রাণের পরিচারক ভৃত্যমাত্র—তাদের সর্বেসর্বা মালিক নয়। কিন্তু মানুষের মন বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে মনুষ্যত্বও বাড়ে। জড় ও প্রাণের মূঢ় নিয়ন্ত্রণকে ছাপিয়ে মনের আত্মভাব ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা যতই নিশ্চিত হয়, ততই মানুষের সামনে আরেকটা জগৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বন্ধনমুক্ত মন একদিকে যেমন প্রাণ ও জড়ভাবকে সংস্কৃত এবং ভাস্বর করে তোলে, আরেকদিকে তেমনি তার বিশুদ্ধ আকূতি প্রবৃত্তি ও জ্ঞানৈষণাও জীবনসাধনায় বিশেষ-

একটা মর্যাদা পায়। অবরভূমির পারবশ্য এবং অভিনিবেশ হতে মুক্ত হয়ে মন তখন জীবনে একটা সুশাসন ভাবসংশুদ্ধি ও ঊর্ধ্বমুখীনতার প্রেরণা এবং সমত্ব ও সৌষম্যের একটা সূক্ষ্মতর ছন্দ আনে। তার ফলে আধারের অন্নময় ও প্রাণময় ভাগেরও গতি-প্রকৃতি সুনিয়ন্ত্রিত হয়—এমন-কি মানসবীর্যের প্রভাবে তাদের যথাসম্ভব রূপান্তরও ঘটে। তখন তারা যুক্তি মেনে চলতে শেখে, প্রদীপ্ত সংকল্প ধর্মবুদ্ধি বা রসচেতনার অনুগত হতে আপত্তি করে না মূঢ়ের মত। মনোবীর্যের এ-সিদ্ধি যত সহজ হবে, ততই সমগ্র মানবজাতি মনুপুত্র বা মনোময় জীবের পর্যায়ে উন্নীত হবে।

এই জীবনদর্শনই ছিল প্রাচীন গ্রীক মনস্বীদের আদর্শ। এরই গৌরবোজ্জ্বল মহিমা চিরকাল মানুষকে হেলেনীয় জীবন ও সংস্কৃতির মুগ্ধ পূজারী করেছে। উত্তরকালে জাতির চেতনায় এর বোধ ম্লান হয়ে যায়। আবার যখন এ-বোধ ফিরে এল—এল শীর্ণ হয়ে, বহু আবর্জনার আবিলতা নিয়ে। প্রাচীন গ্রীসের আদর্শকে যারা গ্রহণ করল, তাদের বুদ্ধি তার অধ্যাত্মবাণীর মর্মগ্রহণ করতে পারল না—জীবনের দৈনন্দিন আচারে মোটেই তার ছন্দ ফোটাতে পারল না। অথচ মানুষের মন ও চারিত্রের পরে সে-সংস্কৃতির অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয় প্রভাবই কায়েম হয়ে রইল। গ্রীসের আধ্যাত্মিকতা ইওরোপের যে-চিত্তকে প্রক্ষুব্ধ করেছিল, তার মধ্যে ছিল কূলভাঙা প্রাণোচ্ছ্বাসের উদ্দামতা। আজও সে-চিত্ত আত্মতৃপ্তির একটা স্বচ্ছন্দ সরণি খুঁজে পায়নি। এই দোটানায় পড়ে ইওরোপ প্রাচীন গ্রীসের পরিপূর্ণ উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হল—তার মনের স্বারাজ্য, জীবনের সৌষম্য, সৌন্দর্য ও সমত্ববোধের সিদ্ধি কিছুই ইওরোপের চিত্তে সংক্রামিত হল না। কতগুলি উন্নত আদর্শের সন্ধান সে পেল বটে, জীবনের পরিসরও অনেকখানি বাড়ল। কিন্তু গ্রীক জগৎ হতে আহৃত অভিনব আদর্শবাদ তার কর্মে দূর থেকে প্রেরণা জোগাল শুধু—শাস্তা হয়ে তার রূপান্তর ঘটাতে পারল না। শেষপর্যন্ত মর্মগ্রহণ ও সাধনার অভাবে গ্রীসের আধ্যাত্মিকতা ইওরোপের চিত্তপ্রাঙ্গণের বাইরে পড়ে রইল। তার চরিত্রের 'পরে গ্রীক সংস্কৃতির খানিকটা প্রভাব থাকলেও, আধ্যাত্মিকতার রসায়ন হতে বঞ্চিত হয়ে দিনে-দিনে তা শিথিল এবং বীর্যহীন হল। তখন জড়াসক্ত বুদ্ধির অমিত ঐশ্বর্যের উপচয়ে প্রাণোচ্ছ্বাসের উন্মাদনাই জাতির জীবনে হল সর্বজয়া। তাতে প্রথম দেখা দিল অপরা বিদ্যার এবং কর্মকুশলতার একটা চোখ-ঝলসানো প্রাচুর্য। তার অতি-সাম্প্রতিক পরিণামরূপে দেখা দিয়েছে মারাত্মক-রকমের একটা আধ্যাত্মিক অস্বাস্থ্য এবং দক্ষযজ্ঞের পুনঃসূচনা।

কারণ সুস্পষ্ট। শুধু মনই তো আমাদের সত্তার সবখানি নয়। তাই বুদ্ধিবৃত্তির অকল্পনীয় প্রসারেও জ্ঞানের রাজ্যে সৃষ্ট হয় কেবল আলো-আঁধারির একটা দ্বন্দ্ব। মনের সহায়ে জড়বিশ্বের শুধু একটা উপরভাসা তত্ত্ব-

জ্ঞান—চলার পথে তার দেশনার মূল্য আরও কম। মানুষ মননধর্মী পশু হলে এ-ই হয়তো তার পক্ষে যথেষ্ট হত। কিন্তু যে মনোময় জীবের অন্তরে নিহিত রয়েছে চিন্ময় পরিণামের অভীপ্সা, সে কখনও এতে তৃপ্ত হতে পারে না। তাছাড়া শুধু জড়বিদ্যার বহির্মুখী জ্ঞান দিয়ে কি জড়প্রক্রিয়ার যন্ত্রাচারকে আয়ত্তে এনেই জড়ের তত্ত্বকে পুরাপুরি জানা অথবা জড়শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার করা কখনও সম্ভব নয়। জড়শক্তির সম্যক্-জ্ঞান ও সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য আমাদের জড়ের প্রতিভাস ও প্রক্রিয়ার তত্ত্বকে ছাপিয়ে অন্তর্দৃষ্টির সহায়ে জানতে হবে তার অন্তরে বা অন্তরালে কি আছে। কেননা, শুধু শরীর-মনই তো আমাদের স্বরূপ নয়। আমাদের মধ্যে আছে একটা চিন্ময় সত্তা ও চিন্ময় তত্ত্ব—আত্মপ্রকৃতির একটা চিন্ময় ভূমি। চিৎশক্তিকে উদ্দীপিত করে ওই ভূমিতে আমাদের পৌঁছতে হবে, ওই চিৎসত্তাকে দিয়েই জীবন ও কর্মের সুদূরাবগাহী প্রসার ঘটাতে হবে—বর্তমানের এই সঙ্কোচ ছাপিয়ে বিশ্বের উদার অঙ্গনে, অনন্তের নির্বাধিত ব্যাপ্তিতে। আবার ওই সত্তার আবেশেই এই ধূলায় ধূসর জীবনকে আবিষ্ট করতে হবে, চিন্ময় জীবনের সত্যে তার ম্লানতাকে দীপ্ত করে তাকে উৎসর্গ করতে হবে মহৎ ব্রত ও বিপুল পরিকল্পনার বেদিমূলে। যুযুৎসু প্রাণ ও মনের সকল সাধনা অসমাপ্ত থেকে যাবে, যতক্ষণ না অপরা প্রকৃতির মূঢ় দুরাগ্রহের শাসন হতে আমরা মুক্ত হব, এই প্রাকৃত সত্তাকে জারিত ও রূপান্তরিত করব চিৎসত্তার দিব্যভাবনায়, এই প্রাকৃত করণগুলিকে চালনা করতে শিখব চিৎশক্তির প্রেষণায় এবং চিদানন্দের উন্মাদনায়। তখনই আমাদের চিত্ত হতে সাংস্থানিক অবিদ্যার বন্ধন খসে পড়বে, যা এতদিন আমাদের জানতে দেয়নি কোন্ উপাদানে বা কি রীতিতে প্রাকৃতজীবনের কাঠামো গড়ে উঠেছে। এই অজ্ঞানই তখন আমাদের আত্মভাব ও আত্মসম্ভূতির তাত্ত্বিক ও অর্থক্রিয়াকারী বিজ্ঞানের শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। আমরা চিৎস্বরূপ—এই আমাদের আত্মভাবের তত্ত্ব। কিন্তু সম্প্রতি মন আমাদের মুখ্য সাধন এবং কায়-প্রাণ গৌণ সাধন—আর জড়জগৎ আমাদের অনুভবের একমাত্র ক্ষেত্র না হলেও তার আদিক্ষেত্র। কিন্তু তবু এ আমাদের সাম্প্রতিক স্থিতিমাত্র। মনের অপূর্ণ লীলায়নেই যে আমাদের সম্ভাবিত সামর্থ্যের অবসান, একথা সত্য নয়। কেননা আমাদের এই আধারে অমনীভাবের বহু বিভূতি সুপ্ত হয়ে আছে অথবা অলক্ষ্যে স্তিমিতভাবে কাজ করে চলেছে। তারা আমাদের অন্তর্গূঢ় চিৎস্বভাবের আসন্নচর। আমাদের অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় বর্তমান জীবনে যা-কিছু স্ফুরিত হয়েছে, তার চাইতেও বিপুল জীবনস্পন্দের কত বিচিত্র ছন্দ, কত জ্যোতির্ময় সাধন, চিদ্-বীর্যের কত অপরোক্ষ বিভূতি স্তব্ধ হয়ে আছে এই আধারের উত্তরভূমিতে। আত্মপ্রকৃতির প্রসারণে এইসব বীর্যবিভূতি ও সাধনসম্পত্তি আমাদের উন্মিষিত

সত্তার অঙ্গীভূত হতে পারে—ওই উত্তরভূমি হতে পারে আমাদের প্রবুদ্ধ চেতনার স্বধাম। কিন্তু তার জন্যে জ্যোতিঃপথের অস্পষ্ট চেতনা নিয়ে সহসা সমাধিভূমিতে উৎক্ষিপ্ত হওয়া, অথবা চিন্ময় আনন্ত্যের স্পর্শে আকারপ্রকারহীন ভাবরসে বিগলিত হওয়াই সাধকের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যেভাবে প্রকৃতির স্বভাবছন্দে প্রাণ ও মনের উন্মেষ হয়েছে, তেমনি করে এই আধারে ওই চিন্ময় মহিমা দল মেলবে—আপন আনন্দের ছন্দে আপনিই গড়ে তুলবে তার দিব্য-সাধনের আয়োজন। তখনই আমরা আমাদের জীবসত্ত্বের সত্য উপাদানের পরিচয় পাব এবং তাকে অধিগত করে অবিদ্যার কুণ্ঠাকে পরাভূত করব।

কিন্তু চিত্তগত অবিদ্যাকে পরাভূত না করলে সাংস্থানিক অবিদ্যার পরাভব সুনিশ্চিত এবং সর্বতোভাবে ফলপ্রসূ হয় না, কেননা অবিদ্যার এই দুটি পর্যায় আমাদের আধারে ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে আছে। মানুষের জাগ্রৎচেতনা তার সমগ্রসত্তার একটা তরঙ্গভঙ্গ বা সংকীর্ণ বহিরুচ্ছ্বাসমাত্র। কিন্তু তাকেই আমাদের সর্বস্ব মনে করা হল চিত্তগত অবিদ্যার লক্ষণ। অব্যাকৃত অথবা অনতিব্যাকৃত অনুভবের একটা স্বতঃপ্রবাহ ক্ষণভঙ্গের তরঙ্গে বয়ে চলেছে। একদিকে বহিশ্চর স্মৃতির সচল বৃত্তি, আরেকদিকে অন্তশ্চর চেতনার তটস্থ বৃত্তি হয়েছে তার ধারক এবং পোষক। সেইসঙ্গে সাক্ষিরূপিণী বুদ্ধি তার খণ্ডে-খণ্ডে সংযোগ ও সমন্বয় ঘটিয়ে তাকে একটা সুস্পষ্ট আকার দেবার চেষ্টা করছে—এই তো আমাদের জাগ্রৎচেতনার পরিচয়। কিন্তু এর পিছনে রয়েছে হৃৎশয় পুরুষের অতীন্দ্রিয় সত্তা ও শক্তির আবেশ,—নইলে চেতনার এই বহির্ব্যক্তি কোনমতেই সম্ভব হত না। জড়ে আমরা দেখি শুধু ক্রিয়া-শক্তির লীলা। আবার বস্তুর কেবল বহিরাকৃতিকে দেখি বলে সে-ক্রিয়াও আমাদের দৃষ্টিতে অচেতন। জড়ের আধারে গুহাশায়ী চেতনা অন্তর্গূঢ় এবং অধিচেতন—জড়ের অচেতন আকৃতিতে অথবা অভিনিবিষ্ট শক্তিতে তার প্রকাশ নাই। কিন্তু মামাদের মধ্যে চেতনা অর্ধচ্ছন্ন অর্ধজাগ্রত। তার চার-দিকে চিরাভ্যস্ত আত্মসংকোচের বেষ্টনী—সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে কুণ্ঠিত চরণে তার আনাগোনা। কেবল মাঝে-মাঝে অন্তরের গহন হতে ক্ষণিকার চমকে যেন কিসের আভাস জাগে, কোন্ অজানার উৎপ্লাবন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আধারের গণ্ডি ভেঙে বাইরে তারা ছড়িয়ে পড়ে, অনুভবের সংকীর্ণ মণ্ডলকে খানিকটা প্রসারিত করে। কিন্তু ওপারের এই চকিত আবির্ভাবে আমাদের বর্তমান সামর্থ্যের দৈন্য ঘোচে না—আধারে বিপ্লবী রূপান্তর ঘটে না। তার জন্য চাই এই আধারেই অন্তর্নিবিষ্ট অথচ অপরি-স্ফুট জ্যোতি ও শক্তির বিচ্ছুরণ, প্রবুদ্ধ চেতনার পরিবেষে সহজ করে তোলা চাই তাদের লীলায়ন। আজ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে যা অবচেতন বা

অন্তশ্চেতন ও পরিচেতন বা অতিচেতন হয়ে আছে, চিৎ-শক্তির সেই নিগূঢ় বৈদ্যুতিকে তার স্বধাম হতে স্বচ্ছন্দে এই আধারে নামিয়ে আনা—এই তো আমাদের সাধনা। কিন্তু এইখানেই তার শেষ নয়। প্রচেতনার পথে আরও এগিয়ে ঝাঁপ দিতে হবে অন্তরের গহন গভীরে—চিন্ময় অনুবেধের সুকৌশল সাধনায় এই আধারেরই অন্তর্গূঢ় ঊর্ধ্বভূমিতে আরূঢ় হতে হবে এবং তার রহস্যরাজিকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসতে হবে ব্যুত্থিতচেতনার বহিরঙ্গনে। শুধু কি তা-ই? চাই চেতনার আরও গভীর আমূল রূপান্তর। জীবনের বহির্বাটিতে আর আসর না জমিয়ে বিবিক্তসেবী এবং গুহাশায়ী হওয়া চাই। অন্তঃস্থ ও অন্তঃস্বরূপ হয়ে প্রকৃতির মহেশ্বররূপে তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা চাই, অন্তর্যামিত্বের সহজস্থিতিকে করা চাই বহির্বৃত্ত কর্মধারার উৎসমূল।

প্রাকৃত মন ও জীবনচেতনার তলায় আছে বলে আমরা যাকে অবচেতনার অন্বর্থক নাম দিতে পারি, তার অধিকার কিন্তু আমাদের দৈহ্য আধারের অন্নময় ও প্রাণময় ভাগ পর্যন্তই পরিব্যাপ্ত। এই অবচেতনা সত্তার একটা ধূমাচ্ছন্ন অবরবিভূতি মাত্র। তার 'পরে মনের কোনও প্রভাব নাই, কেননা মন কোনকালেই অধ্যক্ষরূপে অবচেতনার বৃত্তিকে শাসন করতে পারে না। আমাদের দেহকোষে নাড়ীতন্ত্রে বা সপ্তমধাতুতে নিগূঢ় থেকে যে অব্যক্তচেতনা তাদের প্রাণন এবং স্বতঃসংবেদনকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাকে বলতে পারি অবচেতনারই একটা রূপ। সে-চেতনা চরিষ্ণু হয়েও মানস অনুভবের অগোচর। তাছাড়া ইন্দ্রিয়মানসের পাতালপুরীতে যেসব অলক্ষ্য ব্যাপার ঘটছে তারাও এই অবচেতনার অন্তর্ভুক্ত। পশু এবং উদ্ভিদের ইন্দ্রিয়চেতনার 'পরেই তার বিশেষ অধিকার। ঊর্ধ্বপরিণামের ফলে সে-এলাকা আমরা ছাড়িয়ে এসেছি বলে আজকাল আমাদের ব্যক্তচেতনায় অবচেতনার ক্রিয়াকাণ্ডের বিশেষ-কোনও তোড়জোড় নাই—যদিও চেতনার অন্তস্তলে নিমজ্জিত থেকে তার প্রচ্ছন্ন ধূমায়ন এখনও চলছে। এই প্রচ্ছন্ন লীলার অধিকার মনের একটা অন্তর্গূঢ় এবং অবগুণ্ঠিত তলদেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। আমাদের অতীতের যত সংস্কার ও বহির্মনের যত উচ্ছিষ্ট-আবর্জনা সেইখানেই তলিয়ে যায়। সুপ্তি বা অমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ওই গুহাশয়ন হতে তারা কখনও-কখনও চেতনার উপরতলায় ভেসে ওঠে—স্বপ্নের আকারে, মনের যন্ত্রচালিতবৎ বৃত্তিতে ও কল্পনায়, প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবেগে কি প্রতিক্রিয়ায়, দেহের নানা বিকারে বা নাড়ীতন্ত্রের বিপর্যয়ে, অথবা নানা ব্যাধি দৌর্মনস্য ও চিত্তবিকারের আকারে। সাধারণত আমাদের জাগ্রত বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়মানস অবচেতনার ভাণ্ডার হতে প্রয়োজন অনুসারে কিছু উপকরণ সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু সে-উপকরণের উৎস প্রকৃতি বা প্রবৃত্তি সম্পর্কে

সচরাচর কোনও চেতনাই আমাদের থাকে না। তাই তাদের স্বরূপ বোঝবার চেষ্টা না করে জাগ্রতচেতনার সংস্কার দিয়ে আমরা তাদের তর্জমা করি। অবচেতনার এই উদ্বেলন এবং দেহ-মনে তার আলোড়ন প্রায়ই একটা অপ্রত্যাশিত অনীপ্সিত বা স্বত-উৎসারিত ব্যাপার—কেননা অবচেতনার কোনও জ্ঞান নাই বলে তাকে বশে রাখবার সামর্থ্যও আমাদের নাই। কেবল অপ্রাকৃত কোনও উপায়ে—বিশেষত অসুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়—এই অসূর্য অথচ অতিক্রিয় অন্নময় ও প্রাণময় লোকের খানিকটা প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা পাই এবং তাতে প্রাকৃতচেতনার অন্তস্তলে অন্ন-প্রাণময় অবমানুষ মানসের যন্ত্রমূঢ় গূঢ়সঞ্চারের কতকটা আভাস মেলে। তখন বুঝি, আমাদের চেতনার গোষ্ঠীতে থেকেও এ যেন আমাদের অনাত্মীয়, কেননা এ তো আমাদের পরিচিত মনোরাজ্যের অধিবাসী নয়।...অবচেতনার রহস্য শুধু এইটুকুতেই নিঃশেষিত হয়নি—আরও অনেক-কিছু সঞ্চিত আছে তার ভাণ্ডারে।

অবচেতনার গহনে সোজাসুজি নেমে গিয়ে খানাতল্লাস চালানো সম্ভব নয়। কেননা তা করতে গিয়ে আমরা এক কিম্ভূতকিমাকারের রাজ্যে পেঁছব, অথবা সুপ্তি জড়সমাধি বা আচ্ছন্নচেতনার ধূমলোকে মূর্ছিত হয়ে পড়ব। প্রাকৃতমনের গবেষণা কি অন্তর্দৃষ্টি অবচেতনার নিগূঢ় প্রবৃত্তি সম্পর্কে একটা পরোক্ষ এবং আনুমানিক জ্ঞানই আমাদের দিতে পারে। অবচেতনার অন্ধপুরে প্রচ্ছন্ন অন্ন-প্রাণ-মনোময় প্রকৃতির অপরোক্ষ এবং সম্যক্ পরিচয় জানতে হলে, হয় চিত্তকে গুটিয়ে আনতে হবে অধিচেতনায়, নয়তো তাকে উৎক্ষিপ্ত করতে হবে অতিচেতনায়। আবার লোকোত্তর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে, অন্তরের ছায়াগহন লোকে অন্তর্দৃষ্টিকে নিহিত বা প্রসারিত করেই অবচেতনাকে প্রশাসন করবার সামর্থ্য মিলতে পারে। অথচ অবচেতনার সংবিৎ ও প্রশাসন আমাদের সাধনজীবনের পক্ষে অপরিহার্য। কারণ, অচিতির চেতনাভিমুখী প্রবৃত্তির পথে ফোটে অবচেতনা; আধারের অবরভাগের সে-ই হল মূলাধার এবং প্রবর্তক। অপরিবর্তনীয় দুরাগ্রহরূপে যা-কিছু আমাদের মধ্যে অনড় হয়ে আছে, বুদ্ধির দীপ্তিহীন যত নিরর্থক ভাবনা বারবার যন্ত্রের মত আবর্তিত হয়ে চলেছে, সংজ্ঞা বেদনা প্রেতি ও প্রবৃত্তির যত অনুত্তরণীয় স্বৈরাচার, স্বভাবের যত অনায়ত্ত এবং দৃঢ়মূল সংস্কার—তারা অবচেতনারই আশ্রিত এবং তারই রসে পুষ্ট। এমন-কি আধারে যা-কিছু পাশব বা পৈশাচিক, তাদেরও বাসা অবচেতনার ওই অন্ধকূপে। ওই নিগূঢ় সত্তার গভীরে অবগাহন করে দিব্যচেতনার রশ্মিপাতে তাদের আপন বশে আনা অধ্যাত্মজীবনের পূর্ণসিদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য। কেননা অবচেতনার রূপান্তর না ঘটলে, জীবপ্রকৃতির সম্যক্ রূপান্তর সিদ্ধ হয়েছে—এমন কথা আমরা বলতে পারি না।

আধারের যে-অংশকে অন্তশ্চেতন এবং পরিচেতন বলেছি, তার শক্তি

আরও বেশী। অতএব তার রহস্যের উদ্ভেদ করা আরও আবশ্যক। এই অধিচেতনার রাজ্যে আছে আন্তর বুদ্ধি, আন্তর ইন্দ্রিয়মানস, আন্তর প্রাণ—এমন-কি আন্তর ভূতসূক্ষ্মময়-বিগ্রহের উদার প্রবৃত্তি, যা আমাদের জাগ্রৎচেতনার আধার এবং উপজীব্য। নিগূঢ় অধিচেতনাকে বহিশ্চেতনার এলাকায় আনতে পারি না বলেই আধুনিক ভাষায় তাকে বলি Subliminal। কিন্তু যখন এই অন্তর্গূঢ় আত্মসত্তায় অবগাহন করে তার পরিচয় গ্রহণ করি, তখন দেখি আমাদের জাগ্রতের জ্ঞানবুদ্ধি বেশির ভাগ ওই গুহাহিত স্বরূপসত্তা বা বীজভাবের একটা চয়নিকা মাত্র। অন্তরের অন্তস্তলে আমরা যা হয়ে আছি, আমাদের বাইরে ফুটেছে তার একটা উৎক্ষেপ, অথবা একটা অনার্য বিকলাঙ্গ ও বহির্মুখ সংস্করণ মাত্র। অধিচেতনার প্রভাবে অচিতির পরিণমনে আমাদের বহিশ্চেতনার বিসৃষ্টি। তার লক্ষ্য, পৃথিবীতে আমাদের বর্তমান জড়াশ্রয়ী মনোময় জীবনের প্রবৃত্তিকে সার্থক করা। চিৎশক্তির আত্মসংবৃত্তিজনিত অবসর্পণের ফলে যে বিশাল প্রাণলোক ও মনোলোকের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের চাপে জড়কে উদ্ভিন্ন করে প্রাণ ও মনের উন্মেষ সম্ভাবিত হয়েছে। অচিতি আর প্রাণ-মনের ওই শুদ্ধভূমির মাঝখানটায় আমাদের আধারে নিগূঢ় অধিচেতনার স্থান। বহির্জগতের অভিঘাতে আমাদের চেতনায় যে বহির্মুখ সাড়া জাগে, তার প্রেরণা আসে ওই প্রচ্ছন্ন অধিচেতনার সূক্ষ্ম প্রবৃত্তি হতে। এমন-কি অনেক ক্ষেত্রে তারা বহির্মনের লিপিতে লেখা অধিচেতনারই ভাষা মাত্র। আমাদের প্রাণ-মনের একটা বৃহৎ অংশ বহির্জগতের নিরপেক্ষ হয়ে স্বাতন্ত্র্যের স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে বিচরণ করে—বহির্জগৎকে আপন বশে আনবার জন্য হানাও দেয় তার দুয়ারে। আমরা তাকে ব্যক্তিসত্ত্ব বলি এবং একটা স্ব-তন্ত্র সত্তা মনে করি। কিন্তু বাস্তবিক এই ব্যক্তিসত্ত্বও ওই অন্তশ্চেতনার রহস্যগহন হতে উৎসারিত একটা বীর্যবিভূতি—তার গুহাহিত অনুভাব ও প্রেতির একটা ব্যামিশ্র রূপায়ণ মাত্র।

আবার এই অধিচেতনাই পরিচেতনা হয়ে আমাদের আধারকে ঘিরে আছে। পরিচেতনার সূক্ষ্মতন্ত্রে বেজে ওঠে বিরাট মন বিরাট প্রাণ এবং বিরাট ভূতসূক্ষ্ম-শক্তির দুর্লক্ষ্য কম্পনের বৈদ্যুতী। আমাদের বহিশ্চেতনা তাদের উদ্দেশ না পেলেও অধিচেতনা তাদের ধরে রূপান্তরিত করে বিচিত্র শক্তিকূটে; আমাদের অজ্ঞাতসারেই জীবনে এই শক্তিকূটের প্রবল প্রভাব পড়ে। বহিঃসত্তা আর আন্তরসত্তার ব্যবধানকে অনুবিদ্ধ করে যদি প্রাকৃত মনন- ও প্রাণন-শক্তির উৎসমূলে পৌঁছতে পারি, তাহলে আজ অবশভাবে তাদের দ্বারা চালিত না হয়ে আমরাই তাদের নিয়ন্তা হতাম। চেষ্টা করলে অনুবেধ এবং অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা কিংবা স্বচ্ছন্দ আনাগোনার ফলে ভিতরের খবর অনেকখানি জানা যায় বটে। কিন্তু তবু তার পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে বহির্মনের পর্দা সরিয়ে

অন্তরের অন্তঃপুরে ঢুকতে হবে এবং সেইখানে আন্তর প্রাণ-মনের গভীর গহনে অন্তরাত্মার নিগূঢ়তম পীঠে অচল আসন পাততে হবে—জাগ্রৎচেতনার আশ্রয় এই প্রাকৃতমনের মায়া কাটিয়ে তার ঊর্ধ্বস্তরে উঠতে হবে। এখনও আমাদের সম্ভাবিত ঊর্ধ্বপরিণাম বাইরের বাধায় প্রতি পদে ব্যাহত হয়ে কবন্ধের মত পড়ে আছে। তার নির্বাধ প্রসার ও নিরঙ্কুশ সিদ্ধি তখনই সম্ভব হবে, যখন আমরা অন্তঃপ্রজ্ঞ এবং অন্তর্যামী হব। কিন্তু বর্তমানের সম্ভাবিত সিদ্ধিকে ছাড়িয়ে যদি আরও ঊর্ধ্বে উঠতে চাই, তাহলে আজ যা আমাদের মধ্যে অতিচেতন, তার সংবিৎকে ফুটিয়ে তুলতে হবে এই আধারে—আরূঢ় হতে হবে চিৎসত্তার সুমেরুশিখরে, আনন্ত্যচেতনার সহজধামে।

চেতনার বর্তমান ভূমি ছাড়িয়ে অতিচেতনার উত্তুঙ্গভূমিতে মনেরও অনেক উত্তরপর্ব আছে—আছে অতিমানস শুদ্ধচিন্মাত্রের স্বারাজ্যের মণিকূট। উত্তরায়ণের অভিযাত্রীর পক্ষে প্রথম অপরিহার্য সাধনা হবে মনের ওই উত্তর-ভূমিতে চিৎশক্তিকে উত্তীর্ণ করা। এসব ভূমি যে দুরধিগম, তাও নয়। কেননা, আমাদের চিত্তের অধিকাংশ উদার বৃত্তির—বিশেষত যাদের মধ্যে বিপুলতর দীপ্তি এবং শক্তি, লোকোত্তরের শ্রুতি বোধি এবং প্রেতি আছে—আমাদের অগোচরে ওই উত্তরভূমি হতেই তাদের জোগান আসে। এসব ভূমির অবন্ধন বৈপুল্যে অবগাহন করে একবার সেখানে যদি স্থিতধী হতে পারি, তাহলে চিৎসত্তার নিত্যযোগ ও অকুণ্ঠ বীর্যের একটা অপরোক্ষ আভাস—এমন-কি অতিমানসেরও একটা পরোক্ষ বা স্তিমিত আভা চিত্তাকাশে নবীন ঊষার অরুণিমা ছড়িয়ে দিতে পারে। প্রথম সূচনাতেই এই দিব্যবিভা অপরাপ্রকৃতির শাসনভার আপন হাতে নিয়ে তাকে নতুন ছাঁচে ঢালবার আয়োজনও করতে পারে। চেতনার নবীন রূপায়ণে যে-বীর্য প্রাকৃত আধারে সঞ্চারিত হবে, তার প্রবেগ তখন ঊর্ধ্বপরিণামের সাধনাকে অনায়াস করবে এবং মনোময়ী প্রকৃতির আড়ষ্টতা হতে আমাদের উত্তীর্ণ করবে অতিমানসী ও চিন্ময়ী পরমা প্রকৃতির উদার ব্যাপ্তিতে। এই সব আপাত-অতিচেতন মনোভূমিতে আরূঢ় না হয়ে কিংবা তাদের মধ্যে অচলপ্রতিষ্ঠা লাভ না করেও, কেবল যদি তাদের দিকে আধারকে উন্মীলিত রাখি এবং তাদের সংবিৎ ও শক্তির ধারাসারে অভিষিক্ত হই—তাতেও আমাদের সাংস্থানিক ও চিত্তগত অবিদ্যার আংশিক নিরসন সম্ভব। এমনতর ঊর্ধ্বশক্তির অভিষেকে নিজেকে চিন্ময় জেনে চিন্ময় ভাবনার দ্বারা প্রাকৃতজীবন ও প্রাকৃতচেতনাকেও আমরা খানিকটা দিব্যজ্যোতির্ময় করে তুলতে পারি। তখন ওই জ্যোতির্মানসের বিপুল প্রসার হতে আমাদের জ্ঞাতসারেই স্বচ্ছন্দ যোগযুক্তির সহজ ধারায় আধারে নেমে আসে প্রতিবোধ এবং রূপান্তরের প্রেতি। খুব উন্নতস্তরের সাধক বা প্রবুদ্ধ অধ্যাত্মচেতার পক্ষে এ-অবস্থায় পৌঁছনো অসাধ্য নয়। কিন্তু তবু একে সিদ্ধির

উপক্রমণিকা ছাড়া আর-কিছুই বলব না। আধারের শক্তি ও চেতনাকে পূর্ণ-জাগ্রত করে সর্বাবগাহী আত্মবিদ্যার অখণ্ড অধিকার লাভ করতে হলে, প্রাকৃতমনের ভূমি ছাড়িয়ে অনেক ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে হবে। অতিচেতনায় সমাহিত হয়ে আমরা অমনীভাবের অনুভব পাই—এই সিদ্ধিই আমাদের করায়ত্ত হয়েছে। কিন্তু তাতে আমরা লোকোত্তর ভূমিতে উত্তীর্ণ হই শুধু বৃত্তিশূন্য জড়সমাধির নিশ্চলতা নিয়ে। চিন্ময় অনুত্তরের প্রশাসনকে যদি এই জাগ্রত জীবনেই মূর্ত করতে হয়, তাহলে প্রাকৃত সত্তা চেতনা ও শক্তিকে জাগ্রতচিত্তের সঙ্কল্প দিয়ে নবীন সত্তা নবীন চেতনা ও নবীন শক্তি-বিভূতির বিপুল ঔদার্যে টেনে তুলতে হবে, যথাসম্ভব অক্ষত রেখেই চিৎশক্তির জারণাদ্বারা তাদের রূপান্তরিত করতে হবে চিন্ময় দৈবী-সম্পদে এবং এমনি করে আমাদের এই মানুষভাবের কায়াবদল ঘটাতে হবে। প্রকৃতিতে পর্বসংক্রান্তির ফলে যেখানেই জাত্যন্তর-পরিণাম দেখা দিয়েছে, সেখানেই উদয়ন, আধার ও ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ এবং সমস্ত কলাবিভূতির সমাহরণ—এই তিনটি উপায়ে প্রকৃতির আত্ম-উত্তরণের তপস্যা সাধিত হয়েছে।

এমনি করে আধারের গোত্রান্তর ঘটাতে হলে কালগত অবিদ্যার সঙ্কোচকে পরিহার করা আমাদের অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ক্ষণভঙ্গের স্রোতে খদ্যোত-চেতনার দীপ জেবলে আমরা ভেসে চলেছি। জন্ম ও মরণ দ্বারা সীমিত একটিমাত্র জীবনের ওপারে আমাদের দৃষ্টি চলে না। যেমন পিছনপানে অতীতের গহনে আমাদের দৃষ্টি ঠেকে যায়, তেমনি সম্মুখে ভবিষ্যের যবনিকাকে সরিয়ে এগিয়ে যেতেও সে পারে না। তাই স্থূল স্মৃতির আড়ষ্ট বন্ধনে আমরা নশ্বরদেহের কারায় অবরুদ্ধ শুধু এই বর্তমান জীবনচেতনার আবেষ্টনে বাঁধা পড়েছি। কিন্তু এই কাল-কঞ্চুকের অন্তরঙ্গ আশ্রয় হল—বর্তমান জড়াসক্ত জীবনের প্রতি চিত্তের অভিনিবেশ। কাল-কঞ্চুক চিৎ-সত্তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। এ শুধু আমাদের ব্যক্ত জীবপ্রকৃতির প্রথম প্রেতির একটা অনিত্য সাধন মাত্র। জড়াসক্তি শিথিল বা নিবৃত্ত হলে স্বভাবতই চিত্তের সম্প্রসারণ ঘটে। তখন অধিচেতনা ও অতি-চেতনার দুয়ার দিয়ে এই আধারে নিগূঢ় অন্তঃপুরুষ এবং অধিপুরুষকে সে জানতে পারে। শাশ্বত কালে এবং কালাতীত শাশ্বতে আমাদের আত্ম-সত্তার নিত্যস্থিতি তখন প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় হয়। এই শাশ্বত দৃষ্টি অর্জন না করলে আত্মবিদ্যার কেন্দ্রবিন্দুটিকে আমরা খুঁজে পাব না। অধ্যাত্ম-দৃষ্টির উৎকেন্দ্রতাবশত আমাদের সমস্ত কর্মে ও চেতনায় এখন অযথাস্থিতির বৈকল্য জড়িয়ে আছে। তাই আত্মভাবের স্বরূপ লক্ষ্য এবং নিমিত্ত-পরিবেশকে যুক্তানুপাতের দৃষ্টিতে দেখা আমাদের সম্ভব হয় না। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসকে প্রত্যেক ধর্মেই খুব উঁচু একটা স্থান দেওয়া হয়েছে, কেননা

দেহাত্মবোধ এবং স্থূলের প্রতি অত্যাসক্তির হাত হতে বাঁচতে হলে এ-বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু শুধু বিশ্বাসের জোরেই আমাদের দৃষ্টিবিপর্যয়ের ঘোর কাটবে না। অমরত্বের প্রত্যয় যখন অনুভবে জীবন্ত হয়ে ওঠে, তখনই আমরা কালাবচ্ছিন্ন আত্মভাবের সত্য পরিচয় পাই। কালপ্রবাহে আত্মার নিত্যস্থিতি এবং কালাতীত ভূমিতে তাঁর শাশ্বত প্রতিষ্ঠা—এ-দুটি বিভাবই যে আত্মভাবের স্বরূপ, তার অবিকল্পিত প্রত্যক্ষ অনুভবকে আমাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা চাই।

কারণ, দেহের মৃত্যুতেও জীবব্যক্তি কোনরকমে টিকে থাকে—এ কখনও আত্মার অমরত্বের আসল অর্থ নয়। আত্মসত্তার অনাদি অনন্ত শাশ্বত সদ্ভাবই তার অমরত্ব। স্থূল জন্ম-মৃত্যুর যত পরম্পরার ভিতর দিয়ে চলি না কেন, লোকে-লোকান্তরে আত্মভাবের যত বিকার ঘটুক, সেসবকে ছাড়িয়েও অধিষ্ঠাত্রী চিৎসত্তার যে কালাতীত স্বরূপস্থিতি, সেইখানেই আমাদের আত্মা অমর। অবশ্য অমরত্বের একটা গৌণ অর্থ আছে—তাও মিথ্যা নয়। কারণ এমনিতর অবিপরিণামী অমরত্বের অনুষঙ্গক্রমে পিণ্ডপাতের পরেও জন্ম হতে জন্মান্তরে লোক হতে লোকান্তরে কালাবচ্ছিন্ন সত্তা ও অনুভবের একটা অবিচ্ছেদ অনুবৃত্তি আছে। কিন্তু এ-অনুবৃত্তি আমাদের কালাতীত সদ্ভাবেরই স্বাভাবিক পরিণাম। কেননা কালাতীতের নিস্পন্দ ছন্দই কালকলনার শাশ্বত ছন্দে আপনাকে হিল্লোলিত করে—এই হল সত্তার স্বরূপসত্য। অজাতি ও অসম্ভূতিতে রত আত্মার জ্ঞান হতে আমরা পাই কালাতীত অমৃতত্বের অনুভব। একটি আমাদের মধ্যে জাগায় অন্তর্গূঢ় কূটস্থ চিৎসত্তার অপরোক্ষপ্রত্যয়, আরেকটি আনে দেহ-প্রাণ-মনের সর্ববিধ বিকারের অন্তরালেও জীবাত্মার অভেদপ্রত্যয়ের অবিচ্ছেদ অনুবৃত্তি। এই শেষোক্ত অবস্থান প্রাকৃতস্থিতির অতিরেকমাত্র নয়—কালাতীতের কালিক অভিব্যক্তিরই সে নিশানা। প্রথম উপলব্ধিতে জন্ম-মৃত্যুর তামসী পরম্পরার বন্ধন হতে আমরা মুক্তি পাই—ভারতবর্ষের বহু সাধনপন্থার চরম লক্ষ্য তা-ই। আর এই উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে দ্বিতীয় উপলব্ধিটি আমাদের এনে দেয় চিৎসত্তার শাশ্বতকালব্যাপী জীবনোল্লাসের অমৃত অনুভব—যার মধ্যে অবিদ্যার ঘোর নাই, কর্মশৃঙ্খলের বন্ধন নাই, আছে শুধু সম্যক্-জ্ঞানের দীপনী, শুধু অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যের ঈশনা। কালাতীত সত্তার বিশুদ্ধ অনুভবে, আত্মসত্তার শাশ্বতকালে অনুবৃত্তির অনুভব নাও থাকতে পারে। আবার মরণোত্তর আত্মস্থিতির অনুভবসত্ত্বেও, আত্মসত্তার আদি বা অন্ত কল্পনা অসম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু দুটি অনুভব একই সত্যের এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। দুয়ের মধ্যেই এই সত্যটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে : ক্ষণভঙ্গের তাড়নায় তাড়িত এবং

সীমিত কালের বন্ধনে পঙ্গু না হয়ে শাশ্বত সদ্ভাবের দীপ্তিতে নিত্য সচেতন হয়ে থাকাই প্রেত্যভাবের যথার্থ তাৎপর্য। এমনিতর নিত্যবৃত্তিই দিব্যচেতনা ও দিব্যজীবনের প্রথম সাধ্য। এই নিত্যস্থিতির অন্তর্দশা হতে নিত্যসম্ভূতির লীলাকে আয়ত্তে এনে প্রশাসন করা—এই হল দ্বিতীয় সাধনাঙ্গ। এতে ক্রিয়াশক্তির বীর্য ফোটে, এবং তার অপরিহার্য পরিণামস্বরূপ স্বধা ও স্বারাজ্যের নিরঙ্কুশ মহিমা অধিগত হয়। জড়ের প্রতি একান্ত অভিনিবেশ হতে চিত্তকে নিবৃত্ত করেই এ-সাধনায় সিদ্ধি আসে। কিন্তু তার জন্য দৈহ্য-জীবনকে অবজ্ঞা বা প্রত্যাখ্যান করবার কোনও প্রয়োজন হয় না। অবশ্য চিত্ত এবং চিৎসত্তার অন্তর্লোকে ও ঊর্ধ্বলোকে নিরন্তর বাস করবার সাধনা এক্ষেত্রে অপরিহার্য। প্রাকৃতভূমিতে আমাদের জীবন যেন ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে আবর্তিত একটা অশাশ্বত ব্যাপারমাত্র। এই ক্ষণবিভ্রম হতে অমৃত-চেতনার শাশ্বতী স্থিতিতে আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। তার জন্য যুগপৎ ঊর্ধ্বভূমিতে আরোহণ এবং প্রত্যাহার দ্বারা অন্তর্ভূমিতে অবগাহন—এই দুটি সাধনাই একান্ত আবশ্যক। এমনিতর উদ্দীপনে চেতনা বিশুদ্ধসত্ত্বে রূপান্তরিত হয়। সেইসঙ্গে কালের উদার দিগন্তে চেতনার অভাবনীয় ব্যাপ্তি ও কর্মক্ষেত্রের অচিন্তিতপূর্ব প্রসার ঘটে, এবং ঊর্ধ্বস্রোতা অন্নপ্রাণ-মনোময় আধারের দিব্য উপযোগের কৌশল অধিগত হয়। তখন আত্মভাবকে আমরা জানি দেহাশ্রিত চেতনারূপে নয়, কিন্তু শাশ্বত চিৎসত্ত্বরূপে—যার কাছে লোক-লোকান্তর ও জন্ম-জন্মান্তর বিচিত্র স্বানুভবের বিলাস মাত্র। অনুভব করি : আমরা চিৎস্বরূপ—জীবচেতনার অবিচ্ছেদ প্রবাহে অগণিত কালপরম্পরার বীচিভঙ্গ তুলে বয়ে চলেছি আত্মবিভূতির নিত্য-উপচীয়মান লীলায়নে। আমরা কূটস্থ-নিত্য হয়েই নিত্যসম্ভূতির ঈশ্বর। শুধু কল্পনায় নয়, সত্তার অণুতে-অণুতে এই বিজ্ঞান যখন স্থিরপ্রতিষ্ঠা পায়, তখনই আমাদের জীবন হয় অন্ধ কর্মসংবেগের দাস নয়—কিন্তু অদ্বিতীয় গুহাহিত অন্তর্যামীর অনুগত, অথচ আত্মসত্তা ও আত্মপ্রকৃতির মহেশ্বর।

সেইসঙ্গে আমাদের অহং-কৃত অবিদ্যার বাঁধনও খসে পড়ে। আধারের কোথাও একটুখানি অহংএর ছোঁয়াচ থাকলেও দিব্যজীবন হয় অলভ্য হবে, নয়তো তার আত্মপ্রকাশে বৈকল্য দেখা দেবে। কারণ অহং আমাদের যথার্থ আত্মভাবের একটা বিকৃতি মাত্র—এই দেহ এই প্রাণ অথবা এই মনের সঙ্গে আত্মার অবিবেক ঘটিয়ে আত্মসঙ্কোচের মোহে সে আমাদের প্রবঞ্চিত করে। শুধু তা-ই নয় : অপর জীব হতে বিবিক্ত থাকাই অহংএর স্বভাব, অতএব ব্যক্তিগত অনুভবের জালে বন্দী করে এই অহংই বিশ্বব্যাপ্ত বৈশ্বানর সত্তার উদার অনুভব হতে আমাদের বঞ্চিত করে। ঈশ্বর হতে পরমাত্মা হতে বিচ্ছিন্ন

থেকে এই অহংই সর্বভূতাত্মভূতাত্মা অন্তর্যামী দিব্য-পুরুষের সংবিৎকে আবৃত করে। কিন্তু চেতনা যখন শুদ্ধচিতের উত্তুঙ্গ গভীর ও সর্বতোব্যাপ্ত দিব্যমহিমায় রূপান্তরিত হয়, আধারে তখন আর অহংএর ঠাঁই হয় না। ভূমার অনন্তবীর্য ব্যাপ্তিচেতনায় তার সঙ্কুচিত ও দুর্বল সত্তা কোথায় তলিয়ে যায় কে জানে? সীমার সংকোচ অহংএর প্রাণ, অতএব সীমার প্রসারণে তার মৃত্যু ঘটে। বিবিক্ত আত্মভাবের প্রাচীর ভেঙে পুরুষ তখন বেরিয়ে পড়ে বিশ্বাত্মভাবের উদার বৈপুল্যে—বিশ্বচেতনায় আবিষ্ট হয়ে সর্বভূতের দেহ প্রাণ মন ও আত্মার সঙ্গে সে অবিনাভূত হয়। অথবা কখনও সে অহমিকার ক্ষুদ্র বেষ্টনী হতে উৎক্ষিপ্ত হয় স্বয়ম্ভূ পরা সংবিতের শাশ্বত অনন্ত উত্তুঙ্গতম মহিমায়—যেখানে তার বিরাটভাব বা ব্যক্তিভাব কারও কোনও আভাস মেলে না। এমনি করে বিবিক্তভাবের দেয়াল ভাঙলে বিশীর্ণ অহং হয় ছড়িয়ে যায় বিশ্বচেতনার অমেয়তায়, নয়তো পরমব্যোমের তুঙ্গশৃঙ্গে নিরুদ্ধচেতনার মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়। প্রাকৃতসংস্কারবশে তার বৃত্তির কোথাও যদি একটুখানি রেশ বেঁচেও থাকে, তারও স্বভাবের দ্রুত পরিবর্তনে দেখা দেয় এক অভিনব অব্যক্ত-ব্যক্তচৈতন্যের আবেশ, যার দর্শন অনুভব ও কর্ম হয় যেন নিঃসত্ত্বাসত্ত্বের একটা লীলায়ন। কিন্তু অহংএর এমনিতর প্রলয়ে সত্যকার ব্যক্তিভাবের কখনও প্রলয় ঘটে না, কেননা আমাদের যথার্থ আত্মসত্তা চিন্ময় সর্বগত এবং অনুত্তরের অবিনাভূত। বিবিক্ত অহংএর বিলোপে চেতনায় যে-রূপান্তর আসে, তাতে অহংএর স্থানে আধারে পুরুষতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই পুরুষ একাধারে যেমন বিরাটের প্রতীক ও বিভূতি, তেমনি অনুত্তরের স্বরূপ ও বীর্য, এবং বিশ্বপ্রকৃতিই তার আয়তন।

ঠিক এইসময়ে সত্ত্বশুদ্ধির দীপনীর সঙ্গে বিশ্বচেতনার উন্মেষে বিশ্বগত অবিদ্যার প্রলয় ঘটে। কালাতীত অক্ষর আত্মভাবের তত্ত্ব আমরা জেনেছি—তিনি বিশ্বে অনুস্যূত হয়েও বিশ্বোত্তীর্ণ, এই বিজ্ঞানই কালের মঞ্চে দিব্যরসোল্লাসের অকৈতব অনুভবের ভিত্তি হয়, একের সঙ্গে বহুকে শাশ্বত একত্বের সঙ্গে শাশ্বত নানাত্বকে সঙ্গত করে, জীব ও শিবের মিলনে দূতী হয় এবং বিশ্বের অণুতে-অণুতে বিশ্বেশ্বরের সদ্‌ভাবকে চেতনায় অপাবৃত করে। তাইতে ব্রহ্মকে সর্বনিমিত্তের প্রবর্তক এবং সর্বব্যবহারের আধাররূপে জানি, নিজের মধ্যে নিরঙ্কুশ তৃপ্তির রসায়নে রসিত করে অনুভব করি বিশ্বের অমেয় বৈপুল্য—তার ঊর্ধ্বমূলের অব্যাহত আবেশকে জাগ্রত চেতনার দীপ্তিতে অনুভব করি। এই চিন্ময় অনুভবে বিশ্বকে সমুদ্ধৃত করে তার মধ্যে আমরা উপলব্ধি করি অনুত্তরে সমর্পিত সকল বিভূতির চরম চমৎকার।...এমনি করে আত্মবিদ্যার অন্তরঙ্গ সকল সাধন পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণসিদ্ধ হলে আমাদের

ব্যাবহারিক অবিদ্যার আঁধারও অপসৃত হয়। এই অবিদ্যার চরমপর্বে দেখা দিয়েছিল দুষ্কৃতি সন্তাপ অসত্য ও প্রমাদের জঞ্জাল এবং তাইতে ব্যামোহ ও সংঘর্ষে জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আত্মবিদ্যার পূর্ণপ্রতিষ্ঠায় ব্যাবহারিক অবিদ্যার সকল দুরিত দূর হয়ে জীবনের মূলে সম্যক্ সংকল্পের ঋতম্ভরা প্রবর্তনা সঞ্চারিত হয়, অকুণ্ঠ চিৎশক্তি ও আনন্দশক্তির অমৃত-প্লাবনে অনৃত ও অপূর্ণতার সব বঞ্চনা ভেসে যায়। আমাদের সত্তা চেতনা ও কর্মকে যদি ধর্ম্য এবং ঋতময় করতে হয়, মানুষের সংকীর্ণ ধর্মবুদ্ধির আড়ষ্ট সংকোচে পীড়িত না করে দিব্য-জীবনের উদার ও ভাস্বর মহিমায় তাদের মুক্তি দিতে হয় যদি, তাহলে তার অপরিহার্য সাধন হবে ব্রহ্মসাযুজ্য ও সর্বাত্মভাব। জবন তখন হবে অন্তর্যামীর দিব্য প্রশাসনে বিধৃত তাঁরই বহির্বৃত্ত আত্ম-রূপায়ণ—তার সকল ভাবনা সংকল্প ও কর্মের উৎস হবে চিন্ময়পুরুষের ঋতম্ভরা প্রেতি ও লোকোত্তর ধর্মের বিধান। এ-বিধান সত্যেরই স্বয়ম্ভূ স্বকৃৎ ও স্বতঃস্ফূর্ত বিভাবনা—অবিদ্যা-মনের কৃতি কিংবা কল্পনা নয়, এমন-কি তাকে বিধান না বলে বলা চলে সত্যের আত্মসংবিতের চিন্ময়ী বৃত্তি—তার সিদ্ধবিজ্ঞানের স্ব-তন্ত্র ও সাবলীল প্রবর্তনার জ্যোতির্ময় ছন্দ।

আত্মসচেতন চিৎপরিণামের এই হবে রীতি ও বিপাক : অবিদ্যার জীবন রূপান্তরিত হবে ঋত-চিন্ময় পুরুষের দিব্য-জীবনে, আধারের মনোময় ছন্দ পরিণত হবে অতিমানস চিন্ময় ছন্দে, সপ্তধা অবিদ্যার সংকোচ হতে সপ্তধা বিদ্যার প্রমুক্তিতে ঘটবে সত্তার স্বত-উন্মীলন। এমনিতর রূপান্তর প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামের স্বাভাবিক সিদ্ধি হবে, কেননা চিৎশক্তিকে অবরতত্ত্ব হতে পরতত্ত্বে এবং অবশেষে পরমতত্ত্বে উত্তীর্ণ করাই তার ব্রত। চিৎতত্ত্বই তার উৎসর্পণের পরম কোটি। প্রকৃতির মধ্যে এই তত্ত্বের প্রকাশে এবং প্রশাসনে জীবের ব্যক্তিভাব ও বিরাট্‌ভাব অবরভূমির অনৃত হতে চিৎস্বভাবের সত্যে উত্তীর্ণ হয় এবং আধারের সবখানি রূপান্তরিত হয় স্বয়ম্ভূ পুরুষের চিদ্-বিলাসে। এই রূপান্তরে চিন্ময়পুরুষরূপে আধারে সত্যজীবের আবির্ভাব হয়। সে-পুরুষ জীব হয়েও বিরাট, বিরাট হয়েও অতি-ষ্ঠা। তাঁর আবেশে জীবন হয় বিদ্যাশক্তির লীলায়ন--তাকে আর মনে হয় না বিবিচ্যবৃত্ত অবিদ্যা-শক্তির কল্পিত একটা বস্তুপুঞ্জের সংকলন বা সত্তার তরঙ্গ মাত্র।

বিংশ অধ্যায়

জন্মান্তরতত্ত্ব

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।...
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

গীতা ২।১৮,২০,২২,২৭

শরীরী নিত্য, কিন্তু তাঁর এইসব দেহ অন্তবান; ইনি জন্মান না কি মরেন না কোনকালেই—একবার হয়ে আবার যে হবেন না, তাও নয়। অজ নিত্য শাশ্বত পুরাণ ইনি; শরীর হন্যমান হলেও ইনি হত হন না। জীর্ণ বাস ছেড়ে দিয়ে যেমন আবার নতুন কাপড় পরে মানুষ, তেমনি জীর্ণ শরীর ছেড়ে দিয়ে আবার নতুন শরীরে সংগত হন দেহী। জন্মেছে যে, তার যেমন মরণ ধ্রুব, তেমনি যে মরেছে তারও জন্ম ধ্রুব।

—গীতা (২।১৮,২০,২২,২৭)

...আত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসংপ্রপদ্যতে॥
স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৫।১১, ১২

আত্মার জন্ম আছে, বৃদ্ধিও আছে। কর্মানুসারে দেহী পর পর নানা রূপ গ্রহণ করে অনেক স্থানে : স্থূল সূক্ষ্ম বহু রূপই দেহী বরণ করে নেয় আপন স্বভাবগুণে।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৫।১১,১২)

জড়বিশ্বের প্রথম আধ্যাত্মিক রহস্য হল জন্ম। আরেকটি রহস্য মৃত্যু, যা জন্মের রহস্যকে আরও ঘোরালো করেছে। প্রাণনকে বিশ্বের একটা স্বতঃসিদ্ধ তথ্য বলে মানতে কোনই দ্বিধা হত না, যদি জন্ম-মৃত্যুর রহস্যজালে তার আদি এবং অন্ত ঘেরা না থাকত। অথচ হাজারো প্রমাণ থেকে জানছি, জন্মেই প্রাণনের আদি নয় বা মরণেই তার শেষ নয়—জন্ম-মরণ তার রহস্যময় প্রগতির দুটি অবান্তরপর্ব মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মৃত্যু সকল ঠাঁই ছেয়ে আছে, তার বুকে জন্ম যেন প্রাণোচ্ছ্বাসের একটা আবর্তন—বিশ্বজোড়া নিষ্প্রাণ জড়ত্বের মধ্যে একটা নৈমিত্তিক অথচ অপরাজেয় ব্যাপার মাত্র। আরও

খ‍ুঁটিয়ে দেখলে মনে হয়, প্রাণ ব‍ুঝি জড়ের মধ্যেও সংবৃত্ত হয়ে রয়েছে—এমন-কি মহাশক্তির নির‍ূঢ় বীর্যর‍ূপে প্রাণই হয়তো জড়কে সৃষ্টি করে। জড়ের মধ্যে প্রাণ থাকলেও নিজের বৈশিষ্ট্যকে ফোটাবার বা নিজের সংঘাতর‍ূপটি ঠিকমত গড়বার উপয‍ুক্ত পরিবেশ না পেলে তার স্ফ‍ুরণ সম্ভব হয় না। কিন্তু জন্মের ভিতর দিয়ে প্রাণের যে-প্রকাশ, তার মধ্যে এমন-একটা রহস্য আছে, যাকে আর জড় বলা চলে না। সেইখানে দেখি চিৎস্পন্দনের প্রথম স‍ূচনা—অগ্নিশিখার মত জীবাত্মার একটা প্রবল উদ্দ্যোতনা যেন।

জন্মের পরিবেশ ও পরিণাম দেখে কেবলই মনে হয়, এ একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। এর অতীতে অজানা একটা প্রাক্‌সত্তা ছিল, এর বর্তমানে দেখছি বিশ্বব্যাপ্তির একটা স‍ূচনা ও জীবনকে আঁকড়ে থাকবার অনম্য সংকল্প। আবার ম‍ৃত্যুতেও এর অবসান দেখছি না—মনে হচ্ছে এক অজানা অনাগতের দিকে যেন তার ইশারা। জন্মের আগে কি ছিলাম, ম‍ৃত্যুর পরেই-বা কি হব—অন্যোন্যসাপেক্ষ এই দ‍ুটি প্রশ্নের জবাব খ‍ুঁজে মান‍ুষের ব‍ুদ্ধি হয়রান হয়েছে কোন্ আদ্যকাল হতে, কিন্তু এখনও তার শেষ উত্তরটি সে পায়নি। বাস্তবিক এর শেষ উত্তর ব‍ুদ্ধির এলাকার বাইরে। কেননা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, প্রশ্ন দ‍ুটির অধিকার ব্যাপ্ত হয়েছে স্থ‍ূল চেতনা ও স্থ‍ূল স্ম‍ৃতির অধিকার ছাড়িয়ে—এখন সে-স্ম‍ৃতি ও চেতনা জাতির হ'ক বা ব্যক্তির হ'ক। অথচ লোকান্তবের রহস্য সমাধান করতে গিয়ে ব‍ুদ্ধি দ‍ৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষগোচর তথ্যকেই কিন্তু আঁকড়ে ধরে। উপাদানের অপ্রতুলতা আর অনিশ্চয়তার ঘোরে ব‍ুদ্ধি এক অভ্যুপগম হতে আরেক অভ্যুপগমে ছিটকে পড়ে এবং পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটিকে নিশ্চিত সিদ্ধান্তের মর্যাদা দেয়। বস্তুত এ-সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে বিশ্বলীলার উৎস প্রকৃতি এবং লক্ষ্যের 'পরে। এ-সম্পর্কে যার যেমন রায়, তার 'পরে আমরা জন্ম জীবন ও মরণ নিয়ে, জীবাত্মার অতীত ও অনাগতের রহস্য নিয়ে যত বিচার এবং জল্পনা গড়ে তুলি।

প্রথমেই প্রশ্ন হয়, জীবের প্রাক্‌সত্তা এবং উত্তরসত্তা কি শ‍ুধ‍ু জড় ও প্রাণের ব্যাপার, না তা একটা বিশিষ্ট মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সত্তা? জড়-বাদীরা বলেন, জড়ই বিশ্বের মৌলিক তত্ত্ব। এদেশেও বর‍ুণপ‍ুত্র ভৃগ‍ু শাশ্বত-ব্রহ্মের ধ্যানে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন বিশ্বরহস্যের এই স‍ূত্র—'অন্নই ব্রহ্ম, কেননা অন্ন হতে জাত হয় সকল ভূত, অন্নেই থাকে বেঁচে এবং অবশেষে অন্নের দিকে ধাবিত হয়ে তাতেই হয় সংবিষ্ট।' এ যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের প্রশ্নের জবাব খ‍ুঁজতে আর বিশেষ মাথা ঘামাতে হবে না। অনায়াসে তখন বলব, আমাদের দেহের প্রাক্তন হল—বীজশক্তি ও অন্নরসের সহায়ে এবং অতীন্দ্রিয় অথচ জড়ীয় কোনও শক্তির প্রবর্তনায় বিভিন্ন জড়ভূত হতে দেহের উপাদানগ‍ুলিকে ব্যূহিত করা। আর আমাদের চেতনসত্ত্বের প্রাক্তন

হল—বংশানুক্রমের সূত্র ধরে অথবা অন্য-কোনও জড়াশ্রয়ী প্রাণন কি মননের ব্যাপারদ্বারা জড়সামান্যের মধ্যে একটা বিশিষ্ট ক্রিয়ার প্রবর্তনা—যার ফলে পিতামাতার দেহাশ্রিত বীজকোষ 'জীন্' ও 'ক্রোমোসোম'এর সহায়ে প্রকৃতি আমাদের ব্যক্তিসত্তা গড়ে তোলে। তেমনি দেহের মরণোত্তর পরিণাম হবে তার ভৌতিক উপাদানের বিকলন বা বিশরণ। আর চেতনসত্ত্বের পরিণাম হবে মানবজাতির জীবন-মনে তার কর্মের একটা সাধারণ ছাপ রেখে আবার সেই জড়ের বুকে ফিরে যাওয়া। এই ছাপ-রাখাকে যদি বল জীবের মরণোত্তর সত্তার নিশানা, তাহলে ওই হল আমাদের অমৃতত্বলাভের একমাত্র আশ্বাস। কিন্তু জড়সামান্যের সত্তা থেকে কি করে মনের সৃষ্টি হল তা যখন ভাল বোঝা যায় না, এমন-কি জড় একটা স্বয়ম্ভূ তত্ত্ব নয় বলে জড় দিয়ে জড়ের ব্যাখ্যাও যখন আজকাল অচল হয়ে পড়েছে, তখন লোকোত্তর তত্ত্বের এত সহজ মীমাংসাতে মানুষের বুদ্ধি কোনমতেই তৃপ্ত হতে পারে না।

কোনও-কোনও প্রাচীনধর্মের পুরাণকথায় একটা আজগুবী ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত আছে : ঈশ্বর তাঁর সত্তা হতে অবিরাম অমর জীবাত্মার সৃষ্টি করে চলেছেন; অথবা জড়প্রকৃতিতে কি জড় হতে তাঁরই সৃষ্ট জীবদেহে নিজের 'নিঃশ্বসিত' বা প্রাণনশক্তিকে সংক্রামিত করে অন্তঃশীলা চিৎশক্তির উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছেন তাদের মধ্যে। এ-সিদ্ধান্ত যদি পরম শ্রদ্ধেয় রহস্যাখ্যান হয়, তাহলে তার সত্য-মিথ্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও প্রয়োজন নাই—কেননা যা অবুঝ শ্রদ্ধার বস্তু, তাকে নিয়ে যুক্তিবিচার চলে না। তবুও মানুষ দার্শনিক যৌক্তিকতার দাবি ছাড়ে না। সেদিক দিয়ে এ-সিদ্ধান্ত একেবারেই নিষ্প্রমাণ, কেননা আমাদের উপলভ্যমান তত্ত্বের সঙ্গে এর কোনও সামঞ্জস্য নাই। একে মানবার আগে দুটি বিরোধের সমাধান চাই, নইলে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোনও ব্যক্তিই এর প্রসঙ্গে কান দেবেন না। প্রথম বিরোধ এই : ঈশ্বর প্রতিমুহূর্তে যে জীব সৃষ্টি করে চলেছেন, কালাবচ্ছেদে তাদের আদি আছে, কিন্তু অন্ত নাই; অধিকন্তু দেহের জন্মে জন্ম হলেও দেহের মরণে তাদের মরণ হয় না। দ্বিতীয় বিরোধ : জন্মের সময়ই দোষ-গুণ শক্তি-অশক্তি বা স্বভাবগত ঐশ্বর্য কি দৈন্যের একটা তৈরী বোঝা জীবের ঘাড়ে চাপানো হয়। এর কিছুই তার আত্মপরিণাম বা কৃতকর্মের বিপাক নয়, এমন-কি বংশানুক্রমেরও ফল নয়—এ শুধু খোদার খোদকারি, অথচ এর জন্যে এবং এই পুঁজি ভাঙিয়ে খেতে হয় বলেই স্রষ্টার কাছে তার জবাবদিহিও আছে!

দার্শনিক যুক্তির কতকগুলি ন্যায্য অভ্যুপগম আছে। সমস্ত তর্কের গোড়াতেই অন্তত সাময়িকভাবে তাদের মেনে নিতে কারও বাধা নাই। যারা তাদের মানতে চায় না, আমাদের সিদ্ধান্তকে মিথ্যা প্রমাণ করবার দায় আমরা স্বচ্ছন্দে তাদেরই ঘাড়ে ফেলতে পারি। একটি অভ্যুপগম এই : যার অন্ত

নাই, নিশ্চয় তার আদিও নাই। যার আদি আছে বা সৃষ্টি হয়েছে, তার অন্তও অবশ্যম্ভাবী—সৃষ্টি-ও স্থিতি-ব্যাপারের নিবৃত্তিতে কিংবা উপাদানসংযোগের বিঘটনে অথবা উদ্দেশ্যসাধনের পরিসমাপ্তিতে। এ-নিয়মের ব্যতিক্রম সম্ভব হয় শুধু জড়ের মধ্যে চিৎসত্তার অবতরণদ্বারা জড়কে চিন্ময় বা অমর করে তোলার বেলায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও চিৎসত্তা স্বয়ং অমর—কৃত্রিম বা সৃষ্ট পদার্থ নয়। যদি দেহকে চেতন করবার জন্য আত্মার সৃষ্টি হয়ে থাকে অর্থাৎ আত্মার আবির্ভাব শেষ পর্যন্ত দেহের 'পরেই নির্ভর করে যদি, তাহলে দেহের ধ্বংসে তার অস্তিত্ব অযৌক্তিক বা নিরাধার হবে।...দেহের ধ্বংসে তার প্রাণন-শক্তি বা ঈশ্বরের নিঃশ্বসিত আবার ঈশ্বরের মধ্যে ফিরে যাবে, এ-কল্পনা স্বাভাবিক। কিন্তু তার বদলে সে যদি অমর দেহী হয়ে টিকে থাকতে চায়, তাহলে তার জন্যে তাকে একটা সূক্ষ্ম বা চৈত্য শরীর আশ্রয় করতেই হবে। এই চৈত্যদেহ এবং তার দেহী যে জড়দেহের পূর্বভাবী হবে, তাতে সন্দেহ নাই। কেননা ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জড়দেহকে আশ্রয় করবে বলে চৈত্যদেহ এবং দেহীর সৃষ্টি হয়েছে—এ-কল্পনা অযৌক্তিক। জড়দেহ-সৃষ্টির মত একটা অচিরস্থায়ী ব্যাপারকে অবলম্বন করে শাশ্বত জীবের আবির্ভাব নিতান্তই অকল্পনীয়। মৃত্যুর পর জীবাত্মা বিদেহ অবস্থায় থাকে বললে মানতে হবে, দেহের সঙ্গে তার আশ্রয়াশ্রয়িভাব নিত্যসিদ্ধ নয়। অতএব মরবার পর জীবাত্মায় বিদেহস্থিতি যেমন স্বাভাবিক, তেমনি জন্মের পূর্বে কায়াহীন অবস্থায় থাকাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

আরেকটি অভ্যুপগম এই : প্রবহমান কালের মধ্যে যদি পরিণামের একটি পর্ব দেখতে পাই, তাহলে তার অতীতে আরও পর্ব ছিল—একথা অনস্বীকার্য। অতএব এ-জীবনে জীব যদি একটা পরিণত ব্যক্তিভাব নিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তাহলে এখানে হ'ক আর যেখানেই হ'ক, পূর্ব-পূর্ব জন্মে এর জন্য একটা প্রস্তুতির অধ্যায় নিশ্চয়ই তার ছিল। যদি বল, এখানে এসে জীব একটা তৈরী-করা জীবন ও ব্যক্তিভাবের খোলস পরেছে মাত্র—এ-খোলস সে নিজে গড়েনি, গড়েছে অন্ন-প্রাণ-মনোময় বংশানুক্রমের শক্তি—তাহলে মানতে হবে, জীব স্বয়ং নিরুপাধিক, তার মধ্যে বর্তমান জীবন বা ব্যক্তিভাবের কোনও ছোঁয়াচই নাই ; সুতরাং দেহ-মনের সঙ্গে তার যোগাযোগ যখন আকস্মিক, তখন বর্তমান দেহে বা মনে যা-কিছু ঘটছে, তার দ্বারা বস্তুত সে অপরামৃষ্ট। জীব যদি কৃত্রিমসত্ত্ব বা আভাসমাত্র না হয়ে বস্তুভূত এবং অমৃতস্বভাব হয়, তাহলে অবশ্যই সে নিত্য—অতীতে তার আদি ছিল না যেমন, তেমনি ভবিষ্যতে অন্তও থাকবে না। কিন্তু জীব নিত্য হলে, হয় সে জীবলীলাদ্বারা অপরামৃষ্ট নির্বিকার আত্মস্বরূপ, নয়তো সে কালাতীত শাশ্বত চিন্ময় পুরুষ—কালের প্রবাহে ফুটিয়ে চলেছে নিত্যপরিণামী ব্যক্তিভাবের চপল লীলা। এই

পুরুষভাবই যদি জীবের তত্ত্ব হয়, তাহলে জন্মমরণবিধুর জগতে তার ব্যক্তি-ভাবের প্রবাহকে রূপ দিতে সে পারে একমাত্র কায়পরম্পরার স্বীকৃতিতেই অর্থাৎ প্রাকৃত বিগ্রহে অবিচ্ছেদে কিংবা বারংবার প্রজাত হয়েই।

জড়বাদকে সত্য বলে না মেনলেও আত্মার অমরত্ব বা শাশ্বতবাদকে অনস্বীকার্য সিদ্ধান্ত বলতে আমরা বাধ্য নই। কেউ-কেউ বলেন : বিশ্বের মূলে আছে এক অদ্বয়তত্ত্ব—সর্বভূত তাহতে জাত, তাতেই জীবিত এবং তারই মধ্যে তাদের অবসান। এই অদ্বয়তত্ত্বের শক্তিপরিণামবশত জীবাত্মা একটা সাময়িক বা আপাতিক বিসৃষ্টিমাত্র।...প্রশ্ন হবে, সে-অদ্বয়তত্ত্বের স্বরূপ কি? আধুনিক দর্শনের কতগুলি আবিষ্কার হতে সিদ্ধান্ত হতে পারে, অচিতিই বিশ্বমূল অদ্বয়তত্ত্ব। অচিতির বুকে ক্ষণিকচেতনার আবির্ভাবকে আমরা জীবাত্মা বলি, —তার আদি যেমন অব্যক্ত অন্তও তেমনি অব্যক্ত, মাঝখানে শুধু দেখা যায় ব্যক্তমধ্যের একটা ঝলক। অথবা এক শাশ্বত সম্ভূতিতত্ত্বই বিশ্বমূল। বিশ্ব-ব্যাপিনী প্রাণশক্তিরূপে তার প্রকাশ—তারই স্পন্দলীলার পরাক্-প্রান্তে দেখা দিয়েছে জড় আর প্রত্যক্-প্রান্তে দেখা দিয়েছে চিত্ত। প্রাণশক্তির এ-দুটি বিভূতির ক্রিয়াব্যতিহারই আমাদের মানবজীবনের নিদানকথা।...এই হল অচিৎ-অদ্বৈতবাদ। চিদদ্বৈতবাদীদের একটা প্রাচীন সিদ্ধান্ত এই : এক অদ্বিতীয় অতিচেতন শাশ্বত নির্বিকার শুদ্ধসন্মাত্রই তত্ত্ব। এ-জগৎ চিত্ত ও জড়ের সমবায়ে গড়া। তাদের একটা সাময়িক ও প্রাতিভাসিক সত্তা থাকলেও বস্তুত তারা অবাস্তব, কেননা এক শাশ্বত নির্বিকার চিৎস্বরূপই অদ্বিতীয় তত্ত্ববস্তু। প্রাতি-ভাসিক জগতে জীবাত্মা সেই সন্মাত্রের মায়াশক্তির কল্পিত বা বিসৃষ্ট একটা বিভ্রমমাত্র।...আবার বৌদ্ধ অদ্বৈতবাদে সর্বশূন্য বা নির্বাণ পরমার্থতত্ত্ব। সেই শূন্যতার বুকে স্পন্দিত হচ্ছে এক শাশ্বত সম্ভূতির অন্তহীন পরম্পরা—আমরা তাকে বলি কর্ম। এই কর্মই সংজ্ঞা ভাবনা স্মৃতি কল্পনা ও অনুষঙ্গের ছেদহীন অনুবৃত্তিতে একটা শাশ্বত আত্মভাবরূপী বিভ্রমের জাল বুনে চলেছে।...উপরি-উক্ত তিনটি মতেই জীবনসমস্যার সমাধান হয়েছে প্রায় একই রীতিতে। চিদদ্বৈতবাদীর অতিচেতন ব্রহ্মও বলতে গেলে বিশ্বব্যাপারে অচিতির শামিল। ব্রহ্মের মধ্যে আছে কেবল তাঁর অবিকার্য স্বয়ম্ভূসত্তার সংবিৎ। জীব-জগতের সৃষ্টি এই স্বয়ম্ভাবে মায়ার কল্পিত একটা অধ্যারোপ-মাত্র। আত্মসমাহিত ব্রহ্মের সুষুপ্তিদশাই সৃষ্টির প্রবর্তিকা—ওই সুষুপ্তি* হতেই উন্মেষিত হয় চেতনার যত ক্রিয়া, প্রাতিভাসিক সম্ভূতির যত বিপরিণাম। আধুনিক অচিদদ্বৈতবাদীও বলেন, চেতনা অচিতির একটা ক্ষণস্থায়ী পরিণামমাত্র। তিনটি মতেই জীবাত্মার কোনও স্বারসিক শাশ্বত

* মাণ্ডূক্য উপনিষদে সুষুপ্তি প্রজ্ঞা; আত্মা সুষুপ্তিতে সমাহিত থেকেই সর্বেশ্বর এবং সর্বযোনি।

সত্তা নাই, অতএব তাকে অমৃতস্বভাব বলা চলে না। জীবাত্মা একটা চিদাভাস শুধু—কালাবচ্ছেদে তার আদিও আছে, অন্তও আছে। অচিতি অথবা অতি-চিতি হতে প্রকৃতির সহজশক্তি বা ব্রহ্মের মায়াশক্তি কি বিশ্বের কর্মশক্তির বশে জীবাত্মা একটা বিক্ষেপমাত্র—অতএব স্বভাবতই সে অশাশ্বত। তিনিট মতেই জন্মান্তর হয় বিভ্রম, নয়তো অনাবশ্যক। অচিতির আবর্তনে চেতন জীবের আবির্ভাব একটা আকস্মিক ঘটনা হলে, একবারের বেশী জন্মাবার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না—অতএব জন্মান্তরবাদ সেক্ষেত্রে অচল। আর-দুটি মতে জন্মান্তর হয় পুনরাবৃত্তির ফলে বিভ্রমের একটা জের-টানা শুধু, নয়তো সম্ভূতির যন্ত্রকূটে আবর্তমান অগণিত চক্রের মধ্যে আরেকটি চক্রের সমাবেশ মাত্র।

তিনটি মতের একটি মতে শাশ্বত-সন্মাত্র একটা প্রাণচঞ্চল সম্ভূতি, আরেকটি মতে অক্ষর অবিকার্য চিন্ময় সত্তা, এবং শেষ মতে নামরূপহীন অসম্ভূতি মাত্র। যে-মতই নিই না কেন, তিনটি মতেই জীবাত্মা কেবল চিদ্-বৃত্তির একটা নিত্যপরিণামী পিণ্ড বা চঞ্চল প্রবাহ। সম্ভূতি সত্য হ'ক বা বিভ্রম হ'ক, সমুদ্রের বক্ষে তরঙ্গের মত তার আধারে ক্ষণেকের জন্য জীবাত্মার আবির্ভাব হয়েছে। অথবা জীবাত্মা হয়তো সাময়িক চিদাধার মাত্র—শাশ্বত অতি-চেতনের সে একটা চেতন আভাস, প্রতিভাসের বিধৃতির জন্য যার সদ্ভাব একান্ত আবশ্যক। অতএব কোনমতেই সে শাশ্বতস্বভাব হতে পারে না, সম্ভূতির অনুবৃত্তির তারতম্যের 'পরে নির্ভর করছে তার অমরত্বের মেয়াদ। সে যে নিত্যসৎ বাস্তব পুরুষরূপে প্রতিভাসের প্রবাহ বা পিণ্ডের ভর্তা ও ভোক্তা—একথা সত্য নয়। নিত্যসৎ এবং বস্তুসৎরূপে প্রতিভাসের যে ভর্তা, হয় সে অদ্বিতীয় শাশ্বত সম্ভূতিমাত্র, নয়তো সে অদ্বিতীয় এবং শাশ্বত অপুরুষবিধ সত্তামাত্র, কিংবা সে শুধু শক্তির কর্মচঞ্চল অবিচ্ছেদ প্রবাহ। শাশ্বত চৈত্যসত্তার কল্পনা এই ধরনের সিদ্ধান্তে অপরিহার্য নয়। একই চৈত্যসত্তা যুগ-যুগান্তের আবর্তনে কায়া হতে কায়াতে, রূপ হতে রূপে অনুস্যূত হয়ে চলেছে এবং অবশেষে নিমিত্তবশত প্রথম প্রেতির সংবরণে তারও লীলাসংবরণ ঘটছে—একথা মনে করবার কি কোনও সংগত কারণ আছে? এমনও তো হতে পারে, বিগ্রহসৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে তার অনুরূপ চেতনার উন্মেষ হচ্ছে যেমন, তেমনি বিগ্রহের ধ্বংসে সে-চেতনাও বিলীন হয়ে যাচ্ছে—শুধু শাশ্বত হয়ে বিরাজ করছে রূপকৃৎ অন্বয়তত্ত্ব। অথবা, জড়ের সামান্য-উপাদানের সংকলনে যেমন দেহের সৃষ্টি, যেমন জন্মে তার আরম্ভ এবং মৃত্যুতে তার শেষ, তেমনি চিত্তের সামান্য-উপাদান হতেই চেতনারও সৃষ্টি—তারও জন্ম দিয়ে শুরু এবং মৃত্যু দিয়ে সারা। এক্ষেত্রেও অন্বয়তত্ত্বই একমাত্র শাশ্বত বস্তু—প্রকৃতি বা মায়ার শক্তিতে সে-ই উপাদানের সংকলন বা বিসৃষ্টি করছে।...

মোট কথা, উপরিউক্ত তিনটি মতের কোনটিতেই জন্মান্তরবাদ একটা স্বারসিক বা অপরিহার্য সিদ্ধান্তরূপে গণ্য হবার যোগ্যতা লাভ করেনি।*

অথচ কার্যত তিনটি সিদ্ধান্তের মধ্যে দেখি অনেক তফাত। প্রাচীন দুটি অদ্বৈতবাদেই জন্মান্তর বিশ্বলীলার অঙ্গীভূত, কিন্তু আধুনিক মতে জন্মান্তর অস্বীকৃত। সাম্প্রতিক দর্শনে স্থূলদেহই আমাদের সত্তার আধার। জড়বিশ্ব ছাড়া আর-কোনও লোক তার দৃষ্টিতে বাস্তব নয়। এখানে দেখছি, জীবন্ত দেহের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মনোময়ী একটা চেতনা। তার জন্মের সময় যেমন ব্যক্তিগত প্রাক্‌সত্তার কোনও নিশানা পাইনি, তেমনি মৃত্যুর পর ব্যক্তি-রূপে টিকে থাকবার কোনও প্রমাণও সে রেখে যায় না। জীবজন্মের পূর্বে দেখি প্রাণবীজবাহী জড়শক্তির অস্তিত্বমাত্র, অথবা নিদানপক্ষে প্রাণশক্তির একটা সংবেগ। পিতামাতার দেওয়া বীজে এই প্রাণ-শক্তিরই অনুস্যূতি এবং অনুবৃত্তি থাকে। কি-এক রহস্যময় উপায়ে ওই তুচ্ছাতিতুচ্ছ আধারেই সে অতীত প্রগতির যত পুঁজি সংকলিত করে, তারপর নতুন ব্যক্তিদেহে এবং ব্যক্তি-মনে একটা অভিনব বৈশিষ্ট্যের ছাপ মুদ্রিত করে দেয়। জীবের মৃত্যুর পর ওই জড়শক্তি বা প্রাণশক্তিই সন্তানে সংক্রামিত বীজশক্তির মধ্যে বেঁচে থাকে এবং তার অন্তর্নিহিতসংবেগে দেহ-মনের নতুন আধারে প্রগতির লীলা অনুস্যূত হয়ে চলে। শুধু সন্তানের মধ্যে আমরা যা সংক্রামিত করি তাছাড়া এখানে কিছুই আমাদের পড়ে থাকে না। অথবা জীবের যে জন্ম ও জীবনপরিবেশ, সে শুধু শক্তির বিশ্বব্যাপী লীলার একটা প্রাক্তন স্থিতি ও পরিমণ্ডল। জীবের জীবন ও কর্মপরিণাম সেই শক্তিলীলারই আরেকটা পর্ব মাত্র। সুতরাং জীবের জন্ম হতে মরণ পর্যন্ত যাকে আমরা ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য মনে করছি, আসলে তা বিশ্বশক্তির একটা দীর্ঘায়িত তরঙ্গদোলা। একটি তরঙ্গের অন্ত্য-কোটি হতে আরেকটি তরঙ্গের আদ্যকোটিতে যা অনুবৃত্ত হয়, বিশ্বলীলায় শুধু তাকেই জীবব্যক্তির জীবনব্যাপী প্রবৃত্তির পরিশেষ বলে জানি। যদৃচ্ছাবশেই হ'ক অথবা জড়শক্তির নিয়ম মেনেই হ'ক, যা-কিছু অপর জীবের প্রাণ-মনোময় উপাদান ও পরিবেশ গড়ে তোলে, জীবব্যক্তির মৃত্যুতে এ-জগতে তা-ই শুধু বেঁচে থাকে। বিশ্বের অন্ন-মনোময় লীলার পিছনে হয়তো একটা বিশ্ব-প্রাণের প্রেতি আছে। আমরা হয়তো সেই প্রাণসামান্যের ব্যক্তিরূপ, তার সম্ভূতির পর্বায়িত একটা প্রতিভাস। এই বিশ্বপ্রাণের পক্ষে একটা বাস্তব জগৎ ও

* কিন্তু বৌদ্ধমতে জন্মান্তর অবশ্যম্ভাবী, কেননা কর্মের তা অপরিহার্য পরিণাম। চেতনার আপাতিক অনুবৃত্তির মধ্যে সেতু হচ্ছে জীবাত্মা নয়—কর্ম। চেতনা ক্ষণে-ক্ষণে রূপ বদলায়, অথচ তার মধ্যে থাকে অনুবৃত্তির একটা প্রতিভাস—আমরা তাকেই ভাবি আত্মা। কিন্তু বাস্তবিক শাশ্বত আত্মা বলে এমন-কিছুই নাই, যা দেহের সঙ্গে জন্ম নিয়ে দেহের মরণে লোকান্তরিত হয়ে আবার আরেক দেহে আবির্ভূত হবে।

বাস্তব ভূতগ্রাম সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রতি ভূতে অভিব্যক্ত চেতন ব্যক্তিসত্ত্বকে দেখে বলতে পারি না, তার পিছনে শাশ্বত অথবা নিত্যানুবৃত্ত জীবাত্মা কি জড়োত্তীর্ণ পুরুষের চৈতন্যের কোনও অধিষ্ঠান আছে। দেহের মৃত্যুর পরেও যে একটা চৈত্যসত্তার অনুবৃত্তি চলবে—জগতের ধারা দেখে একথা বিশ্বাস করবার অনুকূলে কোনও যুক্তি আমরা পাই না। অতএব জন্মান্তরকে বিশ্বলীলার অঙ্গ বলে স্বীকার করা শুধু অযৌক্তিক নয়, অনাবশ্যকও বটে।

শুধু জড়সত্তা ও জড়বিশ্বের তথ্য নিয়ে গবেষণা করে আমরা স্বভাবত এই সিদ্ধান্তে পেঁছিই যে, জীবের মনোময় বা চৈত্যসত্তা নিতান্তই দেহ-নির্ভর। অথচ এ-যুগেরই নানা গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়ার ফলে দেখছি, জড়-নির্ভরতার 'পরে এতখানি ঝোঁক দেওয়াটা আমাদের উচিত হয়নি। জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে পূর্বসিদ্ধান্তকে এবার যদি পালটাতে হয়, যদি প্রমাণ পাই দেহের মৃত্যুর পরেও মানুষের ব্যক্তিসত্তা শুধু যে টিকেই থাকে তা নয়, ইহলোক এবং অন্যান্য লোকের মধ্যে আনাগোনাও করে—তাহলে নির্ভেজাল জড়বাদের গতি কি হবে? তখন অধুনাকল্পিত কালাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যবাদকে আরও সম্প্রসারিত করে মানতে হবে, বিশ্বপ্রাণের সকল সামর্থ্য যে শুধু জড়বিশ্বের সৃষ্টিতে নিঃশেষিত হয়েছে তা নয়, অথবা জীবের ব্যক্তিসত্তা শুধু-যে জড়-দেহের আশ্রয়ে টিকে আছে তাও নয়। তখন হয়তো আবার ফিরে যেতে হবে চৈত্যসত্তাদ্বারা অধ্যুষিত সূক্ষ্মদেহের প্রাচীন কল্পনায়। মানতে হবে, স্থূলদেহের মৃত্যুর পরেও তার অনুবর্তী সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় করে জীবাত্মা বা চৈত্যসত্তা মনশ্চেতনার বাহন হয়ে টিকে থাকে। অনাদি জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে যদি কুণ্ঠা হয়, তাহলে তার জায়গায় ক্রমোপচিত এবং নিত্যানুবৃত্ত মনোময় জীবব্যক্তিকে অন্তত মানা চলে। উপরি-উক্ত সূক্ষ্মদেহ, হয় জীবের এই জন্মের পূর্বেই সৃষ্ট হয়েছিল, কিংবা তার জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে কি জীবদ্দশাতেই সে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ হয় চৈত্যসত্তা জীবজন্মের পূর্ব হতেই সূক্ষ্মদেহে অন্য-কোনও লোকে ছিল, তারপর জীবজন্মের সঙ্গে দুদিনের প্রবাসী হয়ে ওই সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় করে পৃথিবীতে এসেছে। নয়তো এই জড়জগতেই জীবাত্মা জীবের সঙ্গে গড়ে ওঠে তিলে-তিলে এবং সেই সময়ে প্রাকৃতিক নিয়মে তার একটা চৈত্যদেহও সৃষ্ট হয়। মৃত্যুর পর এই চৈত্যদেহই পরলোকে যায় কিংবা পুনর্জন্মের ফলে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে।... মৃত্যুর পরেও জীবচেতনার অনুবৃত্তি সম্পর্কে এই দুটি কল্প উপস্থাপিত করা চলে।

আবার এমনও হতে পারে, মানুষের দেহে অনুপ্রবিষ্ট হবার পূর্বেই হয়তো একটা জীবসত্ত্ব বিশ্বপ্রাণের বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে গড়ে উঠেছে এবং

পরিণামের শেষ পর্বে সে ধরেছে মানুষের কায়া। অর্থাৎ মনুষ্যসৃষ্টির পূর্বে মানুষের আত্মা অপরাপর জীববিগ্রহের ভিতর দিয়ে বিবর্তিত হয়ে এসেছে। তাহলে মানতে হয়, মানুষের জীবসত্ত্ব পূর্বে পশুদেহের অধিবাসী ছিল। তার সূক্ষ্মদেহই জন্ম-জন্মান্তরের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করছে, সুতরাং দৈহিক পরিবর্তনের অনুরূপ পরিবর্তন স্বীকার করবার মত স্বাভাবিক সাবলীলতাও তার আছে।...নতুবা এমনও হতে পারে, মৃত্যুঞ্জয় ব্যক্তিসত্তা গড়বার আকূতি ও সামর্থ্য বিশ্বপ্রাণের আছে, কিন্তু প্রকৃতিপরিণামের ফলে মনুষ্যবিগ্রহের আবির্ভাব না ঘটা পর্যন্ত তার সে আকূতি সার্থক হয় না। মানুষের মধ্যে মনশ্চেতনার আকস্মিক উপচয় ব্যক্তিসত্তার ভিত্তি রচনা করে। সেইসঙ্গে সূক্ষ্ম মনোধাতুর একটা কোশ সৃষ্ট হয়—যা মনশ্চেতনার 'পরে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ ফেলে। এই মনোময় কোশ তখন মানুষের আন্তর বিগ্রহ এবং ব্যক্তিসত্তার আধার হয়—ঠিক যেমন তার স্থূল জড়বিগ্রহ জান্তব প্রাণ-মনের আধাররূপে বিবিক্ত একটা জান্তব সত্তা গড়ে তোলে।...এই দুটি সিদ্ধান্তের প্রথমটিকে মানলে বলতে হয়, পশুসত্তাও মৃত্যুজয়ী, দেহের ধ্বংস-সত্ত্বেও টিকে থাকবার সামর্থ্য তার আছে। জীবাত্মার মত একটা সূক্ষ্মসত্ত্ব তার মধ্যেও আছে এবং সেই জীবসত্ত্বই মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতে অন্য পশুবিগ্রহে আবির্ভূত হয়ে ক্রম-বিবর্তনের ফলে মনুষ্যবিগ্রহে জন্ম নেয়। পশুর আত্মা যে পৃথিবীর বন্ধন ছাড়িয়ে জড়োত্তর অন্য-কোনও লোকে উত্তীর্ণ হতে পারে, তা সম্ভব মনে হয় না। মনুষ্যজন্মের অধিকার যতদিন সে না পায়, ততদিন এই পৃথিবীতেই তার জন্মান্তরের আবর্তন চলে। পশুর মধ্যে ব্যক্তিভাবনার একটা সচেতন প্রয়াস থাকলেও তা এমন ঘাতসহ নয় যে, পৃথিবী ছাড়া অন্য-কোনও লোকের ধাক্কা সে সইতে পারে কিংবা নিজেকে তার বাহন করে গড়তে পারে।...দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে, দেহের মৃত্যুকে উৎরে যাবার সামর্থ্য দেখা দেয় একমাত্র মনুষ্যজীবের আবির্ভাবে। প্রাণপরিণামের ফলে ব্যক্তিসত্তার আবির্ভাবকে যদি জীবাত্মার প্রকৃতি বলে না মানি, যদি বলি জীবাত্মা একটা নিত্যবস্তু অপরিণামী তত্ত্ব এবং পার্থিব জীবন ও পার্থিব দেহ তার অনুবৃত্তির অপরি-হার্যসাধন—তাহলে জন্মান্তরবাদ হয় পিথাগোরাসের দেহান্তর-সংক্রমণবাদের অনুরূপ। কিন্তু জীবাত্মা যদি নিত্যবস্তু পরিণামী তত্ত্ব হয়, তাহলে মৃত্যুর পর তার লোকান্তরসংক্রমণ এবং পৃথিবীতে জন্মান্তরগ্রহণ—ভারতীয় দর্শনের এই সিদ্ধান্তকে সম্ভাব্য এবং নিশ্চিতপ্রায় বলে মানতে কোনও আপত্তি থাকে না।...কিন্তু তবু জন্মান্তরকে অপরিহার্য বলতে পারি না। কেননা এমনও হতে পারে, মানুষ-ব্যক্তি একবার লোকান্তরে যেতে পারলে আর সেখান থেকে তার ফিরে আসবার প্রয়োজন থাকে না। বিশেষ কারণে একান্ত বাধ্যবাধকতার মধ্যে না পড়লে স্বভাবত নবলব্ধ ঊর্ধ্বলোকে থেকেই প্রগতির পথে এগিয়ে চলবার

তার ঝোঁক হবে। পার্থিব প্রাণপরিণামের ঝামেলা হতে সে ছুটি পেয়েছে, আর তার সেখানে ফিরে যাবার কি দরকার ? মানুষ লোকান্তরে গিয়েও আবার ফিরে এসেছে এর যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই, তাহলেই লোকান্তরগতির কল্পনাকে আরও প্রসারিত করে মানতে পারি—এই পৃথিবীতে মানুষের বারবার ফিরে আসার সিদ্ধান্ত একটা অনতিবর্তনীয় সত্যই বটে।

কিন্তু জন্মান্তরবাদকে প্রাণপরিণামবাদের সঙ্গে জুড়ে দিলেও তার আধ্যাত্মিক গোত্রান্তর সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ প্রাণপরিণামের ফলে জন্মান্তর সম্ভাবিত হলেও তাতে জীবাত্মার তাত্ত্বিক সত্তা, শাশ্বত সদ্‌ভাব বা অমরত্ব কিছুই প্রমাণিত হয় না। জন্মান্তর মেনেও প্রাণবাদী হয়তো বলবেন, ব্যক্তি-সত্তা বিশ্বপ্রাণেরই একটা প্রাতিভাসিক সৃষ্টি—প্রাণচেতনার সঙ্গে জড়শক্তি ও জড়বিগ্রহের ঘাত-প্রতিঘাতে তার আবির্ভাব। জন্মান্তরের কল্পনায় এই ক্রিয়া-ব্যতিহারের রূপটি আরও সূক্ষ্ম বিচিত্র এবং ব্যাপক হয়েছে, তার ইতিহাসও এখন আরেকরকম দাঁড়িয়ে গেছে—আমাদের আগের ধারণার সঙ্গে এখনকার ধারণার এই-যা তফাত।...এথেকে একধরনের বৌদ্ধ প্রাণবাদে পৌঁছনোও আমাদের পক্ষে কঠিন নয়। বলতে পারি, কর্মই বিশ্বের তত্ত্ব—কিন্তু কর্ম বিশ্বব্যাপিনী প্রাণশক্তির লীলামাত্র। কর্মের বিপাকে ব্যক্তি-সত্তার একটা প্রবাহ জন্ম হতে জন্মান্তরে বিজ্ঞানসন্তানকে আঁকড়ে ধরে অনুবৃত্ত হয়ে চলেছে। তার জন্যে একটা আত্মবস্তু বা শাশ্বত ব্যক্তিসত্তা স্বীকার করা অনাবশ্যক। অতএব নিত্যচঞ্চল প্রাণময় সম্ভূতিই বিশ্বের একমাত্র মৌলিক তত্ত্ব।...এই কথাগুলির একটুখানি মোড় ঘুরিয়ে প্রাণবাদের আরেকটা বিকল্পে আমরা পৌঁছতে পারি। বলতে পারি : এক সর্বগত বিশ্বাত্মা বা বিরাট চিৎ-পুরুষই বিশ্বমূল, বিশ্বপ্রাণ তাঁর স্বরূপশক্তি বা নিমিত্ত মাত্র। এইধরনের চিন্ময় প্রাণাদ্বৈতবাদের একটুখানি কদর দেখা দিয়েছে আজকাল। এ-সিদ্ধান্ত অনুসারে জন্মান্তর সম্ভব হলেও অপরিহার্য নয়, কেননা এমনও হতে পারে, জন্মান্তর একটা প্রাতিভাসিক তথ্য কি প্রাণলীলার বাস্তব বিধান হলেও শুদ্ধ-সন্মাত্রের তত্ত্বভাব বা তার স্বারসিক বিভূতির ন্যায়সংগত পরিণামরূপে তাকে গণ্য করবার কোনও অধিকার আমাদের নাই।

বৌদ্ধদের মত মায়াবাদীরাও ধরে নিয়েছিলেন, পৃথিবী ছাড়াও জড়োত্তর ভূমি ও জগৎ আছে এবং আমাদের তাদের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠতাও আছে। মানুষ মৃত্যুর পর ঐসব লোকে গিয়ে আবার ওখান থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই ফিরে-আসার তথ্যটা খুব প্রাচীন আবিষ্কার হয়তো নয়। কিন্তু তাহলেও পরলোকের অস্তিত্ব এবং মানুষের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্কের কথা বহু-যুগের প্রাচীন ও সম্প্রদায়লব্ধ একটা বিশ্বাস। এ-বিশ্বাসের পিছনে আছে সুদূর অতীতের একটা প্রত্যয়, হয়তো-বা একটা অনুভব—অন্তত আবহমান

একটা সংস্কার তো বটেই। ব্যক্তিসত্তা শুধু জড়বিশ্বের ভোক্তা নয়—তার এই মর্ত্যজীবনেরও একটা পূর্বাপর আছে। জড়োত্তর চৈতন্যই বিশ্বমূল, জড় তার আশ্রিত একটা গৌণবিভূতি মাত্র : এইসব বিশ্বাসের 'পরে প্রাচীন বেদান্তের আত্মা এবং জগৎ সম্পর্কে মতবাদের ভিত্তি। এই সিদ্ধান্তকে সত্য মেনে প্রাচীনেরা শাশ্বত তত্ত্বভাবের স্বরূপ এবং প্রতিভাসমান সম্ভূতির মূল নির্ণয় করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুর পর লোকান্তরে জীবের গতি এবং সেখান থেকে পুনরাবৃত্ত হয়ে এই জগতে তার জন্মগ্রহণ—এ-দুটি তাঁদের সকল দর্শনেরই সাধারণ অভ্যুপগম ছিল। কিন্তু বৌদ্ধেরা পুনর্জন্ম মানলেও কোনও চিন্ময় সত্যপুরুষের সত্যকার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন না। পরবর্তী অদ্বৈতবাদে জীবাত্মাকে চিন্ময় তত্ত্ববস্তু মেনেও তার জীবভাবকে প্রাতিভাসিক বলা হয়েছে। সুতরাং তার মতে, জীবের জন্ম এবং জন্মান্তর বিশ্ববিভ্রমের অংগীভূত বিশ্বমায়ার একটা অর্থক্রিয়াকারী ছলনামাত্র।

বৌদ্ধেরা অনাত্মবাদী। অতএব তাঁদের সিদ্ধান্তে জন্মান্তরপ্রবাহ শুধু সংজ্ঞা কর্ম ও বিজ্ঞানের অনুবৃত্তিমাত্র। এই আবহমান বিজ্ঞানসন্তানের 'পরে আমরা অলীক একটা জীবাত্মার কল্পনা চাপাই এবং মনে করি লোক হতে লোকান্তরে সে আবৃত্ত হয়ে চলেছে। বস্তুত লোকান্তরও সংজ্ঞা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন সংস্থান ছাড়া কিছুই নয়। তার মধ্যে ক্ষণভংগের সচেতন অনুবৃত্তিই আত্মা এবং ব্যক্তিসত্তার একটা প্রতিভাস সৃষ্টি করে।...মায়াবাদীরা জীবাত্মা মানেন, এমন-কি জীবের একটা সত্যকার আত্মস্বরূপ মানতেও তাঁদের আপত্তি নাই।* কিন্তু সত্য বলতে 'আত্মস্বরূপ' তাঁদের একটা কথার কথা। কারণ, মায়াবাদীর মতে শাশ্বত সত্যজীব বলে কিছু নাই—'আমিও' নাই, 'তুমিও' নাই। সুতরাং জীবের সত্যকার আত্মস্বরূপই-বা থাকবে কোথা থেকে? এমন-কি বিশ্বাত্মা বলেও সত্যকার কিছু নাই—আছেন শুধু বিশ্বদ্বারা অনুপহিত এক অজ নির্বিকার শাশ্বত সদ্ব্রহ্ম—যাঁকে প্রতিভাসের অশাশ্বত বিকৃতির পরম্পরা ছুঁয়েও যায় না। জন্ম জীবন বা মরণ, জীবভাব ও বিশ্বাত্মভাবের যত অনুভব—সমস্তই শেষপর্যন্ত একটা ক্ষণেকের বিভ্রম বা মায়ার খেলা। এমন-কি বন্ধন ও মুক্তিও একটা মায়া—কেননা তারা কালাবচ্ছিন্ন প্রতিভাসের অংগীভূত। অহংএর মায়িক অনুভবের সচেতন অনুবৃত্তিতে দেখা দিয়েছে—আমরা যাকে বলছি 'বন্ধন'। আর তৎস্বরূপের অতিচেতনায় ওই অনুবৃত্তি ও চেতনার একান্ত উপশমই 'মুক্তি'। কিন্তু আসলে অহংও মহামায়ার একটা বিলাস, সুতরাং বন্ধন ও মুক্তিরই-বা বাস্তবতা কোথায়? বাস্তব বলে কোথাও

* মায়াবাদীরা আবার একজীববাদী। আত্মা এক—তিনি বহু নন বা বহু হতেও পারেন না; অতএব সত্যকার জীবব্যক্তি কোথাও নাই। এক সর্বগত আত্মাই দেহাবচ্ছেদে প্রত্যেক অন্তঃকরণকে অহংভাবদ্বারা উদ্ভাসিত করে তুলছেন; তা-ই জীবের জীবত্ব।

কিছু নাই—একমাত্র সেই তৎস্বরূপ ছাড়া। তিনিই ছিলেন, তিনিই আছেন এবং তিনিই থাকবেন। অথবা এও আমাদের মনোবিকল্পমাত্র—তিনি কালাতীত অজ অনির্বাচ্য, কালের পর্বভেদ দ্বারা তাঁকে বিশেষিত করতে যাওয়াও অজ্ঞানতা।

প্রাণাদ্বৈতবাদে তবু একটা সত্য বিশ্ব আছে। তার মতে জীবলীলা ক্ষণ-স্থায়ী হলেও মিথ্যা নয়। শাশ্বতপুরুষের অধিষ্ঠান না থাকলেও জীবব্যক্তির কর্ম ও অনুভবের একটা সার্থকতা আছে সেখানে, কেননা তারা সত্য সম্ভূতির সত্য পরিণাম। কিন্তু মায়াবাদে জীবের কর্ম বা অনুভবের কোনও সত্যকার অর্থক্রিয়া নাই, অতএব স্বপ্নগত পারম্পর্যের মতই তারা অবান্তর এবং নিরর্থক। এমন-কি মোক্ষও বিশ্বস্বপ্নের একটা পর্বমাত্র। বিশ্ববিভ্রমকে সত্য বলে মেনেছি বলেই ব্যষ্টি দেহভাবনা ও অন্তঃকরণের প্রলয়ে মোক্ষের কুহককেও সত্য বলে মানছি। বস্তুত কেউ কোথাও বদ্ধ নয়, মুক্তও নয়। বন্ধন-মুক্তি অহংকল্পিত বিভ্রমমাত্র—এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তাকে সে বিভ্রম স্পর্শও করে না। এই নেতি-ভাবনার যুক্তিযুক্ত পরিণাম এসে ঠেকে সর্বনাশা এক ঊষরতায়। কিন্তু নিঃশ্বাস রোধ করে মানুষ সেখানে কতক্ষণ থাকতে পারে? তাই সাধ্য ও সাধনার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আবার তাকে অনেক-কিছুই মানতে হয়। হ'ক এ-জীবন স্বপ্নছায়ার পরম্পরা, তবু এর মধ্যে বন্ধনের দুঃখ সত্য যখন, তখন মুক্তির আনন্দই-বা সত্য এবং সাধ্য হবে না কেন? অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপে বন্ধন নাই মোক্ষও নাই এবং জীবের জীবনও একটা মায়ার খেলা; কিন্তু তবু মায়ার হাতে এই মিথ্যার মারকে অস্বীকার করবার তো উপায় নাই। জীবের স্বরূপ যা-ই হ'ক, আপাতত তার জীবন সত্য হয়েছে বন্ধনের দুঃখেই। সেই দুঃখকে দূর করবার জন্য তার একমাত্র পুরুষার্থ হবে—জীবনকেই নিরাকৃত করবার সাধনা। জীবত্বের প্রলয় এবং বিশ্ববিভ্রমের অবসান ঘটানো—এই তার লক্ষ্য। অথচ এই লক্ষ্যে পেঁছবার আয়োজন করতে হবে জীবন দিয়েই—জীবনের যা-কিছু সার্থকতা এইখানে।

অবশ্য মায়াবাদ হল আধুনিক অদ্বৈতবাদের চরম কোটি। উপনিষদের প্রাচীন অদ্বৈতবাদ কিন্তু এতদূর এগোয়নি। ঔপনিষদ-সিদ্ধান্ত শাশ্বত-সন্মাত্রের কালকৃত বাস্তব সম্ভূতিকে অস্বীকার করে না, সুতরাং তার মতে জগৎ সত্য। জীবও কিছু কম সত্য নয়, কারণ প্রত্যেক জীব তত্ত্বত ব্রহ্ম-স্বরূপ। জীবের ভিতর দিয়েই ব্রহ্ম নাম-রূপে অভিব্যক্ত হয়েছেন এবং নিত্য আবর্তিত ভবচক্রে আরূঢ় থেকে বিশ্ববিসৃষ্টির রঙ্গপীঠে জীবলীলার ভর্তা হয়েছেন। জীবের কামনাতেই ভবচক্রের আবর্তন। কামনা তার পুনর্জন্মেরও প্রযোজক। শাশ্বত আত্মবিদ্যা হতে পরাঙ্মুখ তার চিত্ত যে কালিক সম্ভূতির লীলায় নিমগ্ন হয়ে আছে, এ-ও সংসারাবর্তনের অন্যতম হেতু। এই কামনা

ও অবিদ্যার নিবৃত্তিতেই জীবাধিষ্ঠিত শাশ্বতসন্মাত্র ব্যক্তিভাবনা ও ব্যষ্টি-অনুভব হতে আপনাকে প্রত্যাহৃত করে সমাহিত হন তাঁর কালাতীত ও গুণাতীত অক্ষরস্বভাবে।

কিন্তু জীবের বাস্তবতা কালাবচ্ছিন্ন। তার কোনও স্থির ভিত্তি নাই—এমন কি কালপ্রবাহে নিত্য আবর্তনের সম্ভাবনাও তার নাই। জন্মান্তর বিশ্বব্যাপারের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলেও, তাকে জীবভাব ও সৃষ্টি-প্রবর্তনার অন্যোন্যসম্বন্ধের অপরিহার্য পরিণাম বলা চলে না। কারণ উপনিষদের মতে ব্রহ্মের সিসৃক্ষার তর্পণ ছাড়া সৃষ্টির আর-কোনও লক্ষ্য নাই। সুতরাং ব্রহ্মের সৃষ্টিসংকল্প সংহৃত হলে সৃষ্টিও লুপ্ত হবে। অতএব তাঁর বৈরাজ-সঙ্কল্পের লীলায়নের জন্য জীবের কামনা বা জন্মান্তরকে মাঝখানে দাঁড় করাবার কোনও প্রয়োজন থাকতে পারে না। বরং জীবের কামনা হবে সৃষ্টিলীলার পরিণাম—তার অপরিহার্য হেতু-প্রত্যয় নয়। কেননা এই মতে জীব বিশ্ববিসৃষ্টির একটা বিভূতি—বিশ্বসম্ভূতির প্রাক্তন কোনও তত্ত্ব নয়। অতএব প্রত্যেক নাম-রূপে ব্যষ্টিত্বের একটা সাময়িক ভাবনাদ্বারাই ব্রহ্মের সৃষ্টিসঙ্কল্প সার্থক হতে পারে। বহু অশাশ্বত জীবত্বের পরম্পরায় একটি জীবনদীপের আলোতে বিশ্বের জ্যোতিরুৎসব চলছে—এই কল্পনাই এখানে পর্যাপ্ত। অবশ্য প্রত্যেক ঘটে অখণ্ডচৈতন্যের সত্ত্বানুরূপে আত্মরূপায়ণ চলবে, কিন্তু সে-রূপায়ণ প্রতি বিগ্রহের আবির্ভাবে আরব্ধ হয়ে তার নিবৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গেই নিবৃত্ত হবে। তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত জীবের পর জীবের পরম্পরা—একই সমুদ্রের বুকে *। এক-একটি চেতনবিগ্রহ বিশ্বচেতনার বক্ষ হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে দুলতে থাকবে যতক্ষণ তার আয়ুর মেয়াদ, তারপর সে ঢলে পড়বে অন্তহীন নৈঃশব্দ্যের বুকে। এর জন্যে নিত্য-অনুবৃত্ত ব্যক্তিচৈতন্যের কল্পনা একেবারেই অনাবশ্যক। একই পুরুষ নামের পর নাম নিয়ে বা রূপের পর রূপের সাজ প'রে লোক হতে লোকান্তরে আনাগোনা করছে—এ যেমন প্রতীয়মান বা সম্ভাবিত সত্য নয়, তেমনি একে যুক্তিসঙ্গত বলেও মনে হয় না। মোট কথা, জন্মান্তরকল্পনা ছাড়াও উপনিষদের জীব-ব্রহ্মবাদ সমর্থিত

* ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে Dr. Schweitzer বলেছেন, উপনিষদের বাণীর এই হল যথার্থ তাৎপর্য, জন্মান্তরবাদ পরের যুগের কল্পনা। কিন্তু প্রায় সমস্ত উপনিষদেরই অনেকজায়গায় জন্মান্তরের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্তত, মৃত্যুর পরেও ব্যক্তিসত্তার অনুবৃত্তি ও লোকান্তর-গতি উপনিষদের একটি অনুপেক্ষণীয় সিদ্ধান্ত। এসব উক্তির সঙ্গে উপরি-উক্ত ব্যাখ্যার কোনও মিল নাই। মর্ত্যের শরীরী জীবের পক্ষে লোকান্তরে গতি এবং স্থিতি যদি সম্ভব হয় ব্রহ্মসমাপত্তিতে মুক্তি যদি হয় তার চরম নিয়তি, তাহলে জন্মান্তরবাদ অপরিহার্য হয়ে পড়ে; সুতরাং তাকে পরবর্তী যুগের কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। লেখক স্পষ্টই পাশ্চাত্যদর্শনের সংস্কার ছাড়িয়ে উঠতে পারেননি, তাই প্রাচীন বেদান্তের অতিসূক্ষ্ম ও জটিল ভাবনার মধ্যে দেখেছেন শুধু সর্বেশ্বরবাদের ছায়া।

হতে পারে। জন্মান্তরবাদ সে-দর্শনের অপরিহার্য অংগ নয়। কিন্তু রূপায়ণের এক পর্ব হতে ঊর্ধ্বতন পর্বে উত্তরণই যদি জীবের অনতিবর্তনীয় নিয়তি হয়, তাহলেই জন্মান্তরবাদের একটা সত্যকার সার্থকতা আমরা খুঁজে পাই। তখন জড়ের গুহায় চিতের সংবৃত্তি এবং তার বিবৃত্তিই হয় পার্থিব জীবলীলার যথার্থ তাৎপর্য এবং জন্মান্তর হয় তার স্বাভাবিক সাধন। কিন্তু এমনতর উত্তরায়ণের কল্পনা ঔপনিষদ-দর্শনের অপরিহার্য সিদ্ধান্ত নয়।

এমনও কল্পনা করা চলে : ব্রহ্মই স্বেচ্ছায় নিজেকে প্রকট অথবা সত্যি বলতে প্রচ্ছন্ন করছেন জীবদেহে; নিজেরই সংকল্পবশে তিনি মনুষ্যযোনি ও পশুযোনির নিত্যানুবৃত্ত পরম্পরার ভিতর দিয়ে ব্যষ্টিজীবরূপে বিহার করছেন জন্ম হতে মৃত্যুতে, আবার মৃত্যু হতে নবজন্মের জয়ন্তীতে। তাঁর এ-জীবলীলা সত্যও হতে পারে, প্রাতিভাসিকও হতে পারে। স্বরূপত তিনি অদ্বিতীয় সন্মাত্র। কিন্তু তিনিই আবার পুরুষবিধ হয়ে সম্ভূতির বিচিত্র রূপলীলায় আবর্তিত হয়ে চলেছেন—হয়তো তাঁর খেয়ালখুশিতে, হয়তো-বা কর্মবিপাকের নিয়ম মেনে। অবশেষে চলার পথে পূর্ণচ্ছেদের সময় এল যেদিন, প্রতিবোধের আলোকে উদ্দীপ্ত হয়ে সেদিন তিনি ফিরে গেলেন তাঁর অদ্বৈত মহিমার অনুত্তর প্রত্যয়ে, ব্যষ্টি জীবলীলা হতে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে তাঁর অদ্বিতীয় তাদাত্ম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন।...কিন্তু এই আবৃত্তির আদিতে' তার অদ্বিতীয় তাদাত্ম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই আবৃত্তির আদিতে বা অন্তে কোথাও এমনকোনও সত্যের প্রশাসন নাই, যা তাকে অনুপেক্ষণীয় সার্থকতার একটা মর্যাদা দেবে। কেনই-বা ব্রহ্ম জীবরূপে আবর্তিত হতে যাবেন, তার কোনও হেতু আমরা খুঁজে পাই না। শুধু বলতে পারি, এ তাঁর লীলা। কিন্তু যদি বলি, চিৎস্বরূপই অচিতিতে সংবৃত্ত এবং গুহাহিত হয়ে আবার জীবের মধ্যে নিজেকে চিৎপরিণামের পর্বে-পর্বে ফুটিয়ে তুলছেন, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাতে একটা তাৎপর্য এবং সংগতি দেখা দেয়। পর্বে-পর্বে জীবের উদয়ন তখন হয় বিশ্বলীলার মর্মরহস্য এবং জীবাত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি হয় সম্ভূতির স্বারসিক সত্যের স্বাভাবিক ও অনতিবর্তনীয় একটা পরিণাম। চিৎপরিণামকে সিদ্ধ করতে হলে জন্মান্তর তার অপরিহার্য সাধন হবে। জড়-বিশ্বে চিন্ময় সত্ত্বের আবির্ভাবের জন্য এর চাইতে সার্থক নিমিত্তের প্রযোজনা এবং ক্রিয়াশক্তির প্রবর্তনা আমাদের কল্পনার অতীত।

জড়ের পরিণামকে এইভাবে দেখছি আমরা : বিশ্ব এক পরমার্থসতের স্বত-উৎসারিত আত্মরূপায়ণ, অতএব চিৎসত্ত্বই সর্বভূতের স্বরূপধাতু। বিশ্বে যা-কিছু আছে, তা চিৎস্বরূপের আত্মবিসৃষ্টির বিভূতি সাধন এবং বিগ্রহ। বিশ্বের বিচিত্র প্রতিভাসের পিছনে অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে এক অনন্ত সত্তা, অনন্ত চেতনা, অনন্ত শক্তি ও সংকল্প, অনন্ত আনন্দের নিরন্ত নির্ঝর। এই

পরমার্থ-সত্তের অতিমানস বা 'পুরাণী প্রজ্ঞা' রচনা করেছে বিশ্বের বিরাট ছন্দ—গৌণ বিভাবনার তিনটি ক্রমবিলম্বিত লয়ে, আমরা এখানে যাদের জানি মন প্রাণ এবং জড় বলে। বিশ্বের বিসৃষ্টিতে তাঁর যে আত্মনিগূহনের লীলা, তার অবম পর্ব হল জড়ের জগৎ—যার মধ্যে অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দ আপন প্রকাশকে সংবৃত্ত করে ধরেছেন নিজেরই আপাত-অচেতনার রূপে; তাকেই আমরা বলেছি অচিতি। এই অচিতি হতে ক্রমোন্মেষের ধারায় আবার ফিরে যাওয়া অখণ্ড আত্মসংবিতে—স্বভাবত এই হবে তার অনতিবর্তনীয় আদ্য প্রবর্তনা। একে অনতিবর্তনীয় বলছি এইজন্য যে, যা সংবৃত্ত হয়ে আছে তার বিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। যা বীজীভূত, তা যেমন একটা সদ্‌ভূত অর্থ, তেমনি আপন আপাতবিরোধী বিভাবনায় নিগূহিত শক্তির একটা সংবেগও বটে। সে-শক্তি আজ কুণ্ডলিত হয়ে থাকলেও তার অন্তরে-অন্তরে আত্মৈষণার প্রেতি নিগূঢ় হয়ে আছে—সে চায় নিজেকে উপলব্ধি করতে, লীলায়িত করতে। বীজশক্তি শুধু শক্তিরূপ নয়; যে-আধারে সে সংবৃত্ত, তার তত্ত্বরূপও ওই বীজের মধ্যে নিহিত আছে। এমনি করে অবিদ্যার অন্তরগহনে তার যে-আত্মস্বরূপ প্রচ্ছন্ন আছে, তাকে আবার খুঁজে বার করাই হবে তার অনবচ্ছিন্ন মর্মরহস্য, তার সকল প্রবৃত্তির অবিরাম প্রেতি। চেতন জীবের আধারকে আশ্রয় করে এই ফিরে-পাওয়া সম্ভব হয়। জীবের মধ্যেই উন্মিষন্ত চেতনা সহস্রদলে বিকসিত হয়ে জেগে ওঠে আপন তত্ত্বভাবের মহিমায়। অব্যাকৃত অবিদ্যাপ্রকৃতিতে না ছিল চেতনা, না ছিল ব্যক্তিভাবনার বৈশিষ্ট্য। ওই অব্যক্ত হতে যে-বিশ্বভাবের যাত্রা শুরু, তার সর্বোত্তম বিভূতি হবে পর্বে-পর্বে ব্যক্তিসত্তার ক্রমিক উপচয়। অতএব বিশ্বলীলায় জীব তুচ্ছ নয়, বরং জীবত্বের পরিপূর্ণ উন্মেষই সে-লীলার লক্ষ্য। জীবত্বের এই মহিমাকে সার্থক বলে মানতে পারি, যদি জানি পরমাত্মার জীবরূপ যেমন সত্য, তেমনি সত্য তাঁর বিশ্বরূপ—কেননা দুইই তাঁর আনন্ত্যের সত্য বিভূতি। তা-ই যদি হয়, তাহলে বুঝি—জীবভাবের পুষ্টি এবং জীবের আত্মোপলব্ধির সাধনা কি করে বিশ্বচেতন বিরাটের এবং পরব্রহ্মের উপলব্ধির অপরিহার্য সাধনরূপে গণ্য হতে পারে।...এই সিদ্ধান্তের প্রথম সূত্র হল—জীব সত্য এবং সনাতন। একথা মানলে জন্মান্তরকে আর বৈকল্পিক সম্ভাবনার কোঠায় ফেলে রাখা যায় না—তখন তাকে বলতে হয় আমাদের সত্তার মৌলপ্রকৃতির একটা অপরিহার্য পরিণাম।

চিৎশক্তির লীলায়নে প্রত্যেক বিগ্রহে একটা সাময়িক বা কাল্পনিক জীবসত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে—এ-সিদ্ধান্তে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয় না। জীবভাব যে দেহের আকারে চিদ্‌বিলাসের অবান্তর একটা বিভূতি শুধু, দেহের বিনাশে জীবভাবের অনুবৃত্তি যে বিকল্পিত অর্থাৎ দেহান্তরে কি

জন্মান্তরে তার আত্মভাবের কাল্পনিক অনুবৃত্তি চলতেও পারে না-ও চলতে পারে—এই বৈকল্পিক সিন্ধান্তের শৈথিল্যকে কোনমতেই আমল দেওয়া চলে না। অবশ্য প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, জীবের পরে জীবের আবির্ভাবে এই জীবভাবের অনুবৃত্তির কোনও কথাই ওঠে না। কেননা স্পষ্ট দেখছি, জীব-বিগ্রহের ধ্বংসে মিথ্যা বা ক্ষণস্থায়ী জীবভাবেরও ধ্বংস হচ্ছে—সে-ধ্বংস-লীলার আধাররূপে বিশ্বশক্তি বা বিশ্বসত্তার চিরন্তন একটা অধিষ্ঠান শুধু জেগে আছে। মনে হয়, বিশ্ববিসৃষ্টির সমগ্র তাৎপর্য এমনি করে শুধু ঢেউএর ওঠা-পড়াতেই পর্যবসিত হয়েছে।...কিন্তু জীবকে যদি নিত্যানুবৃত্ত তত্ত্ববস্তু বলে জানি, সে যদি ব্রহ্মের সনাতন অংশ বা বিভূতি হয়, তার চিতিশক্তির উপচয় যদি হয় অন্তর্গূঢ় চিৎপুরুষের আত্মপ্রকাশের সাধন—তাহলে বিশ্বলীলার একটা গভীরতর তাৎপর্য আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়। তখন দেখি, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের শাশ্বত বহুভাবের সঙ্গে শাশ্বত অদ্বৈতভাবের যে-বিলাস, এ-বিশ্বজগৎ তার ছন্দোময় প্রকাশ। আমাদের ব্যক্তিভাবের সকল বিপরিণামের পিছনে স্তব্ধ হয়ে আছেন এক সত্য পুরুষ বা শাশ্বত চিন্ময় জীবসত্ত্ব—যিনি আমাদের প্রবহমান ক্ষরভাবের ঈশ্বর। যে-অন্বয়স্বরূপ বিশ্বভাবনায় সম্প্রসারিত, তিনিই ঘটে-ঘটে নিজের ব্যষ্টিভাবনাকে নিরঙ্কুশ লীলায়নে প্রতিষ্ঠিত করছেন। ব্যষ্টিজীবে তাঁর সমগ্র সত্তাকে তিনি সর্বাত্মভাবের অন্বয় অনুভবে প্রকট করেন। আবার এই ব্যষ্টিজীবেই তিনি তাঁর বিশ্বোত্তীর্ণ মহিমা ফুটিয়ে তোলেন, প্রদীপ্ত করেন সেই অনির্বাণ আনন্ত্যচেতনা—'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। আত্মপ্রকাশের এই-যে ত্রিভঙ্গ, এই-যে বহুধাবিলসিত অদ্বৈতভাবনার অনুত্তর লীলা, এই-যে তাঁর অনির্বচনীয় মায়া অথবা আনন্ত্যের চিন্ময় সত্যের পুরুরূপা বিভূতি—এর জ্যোতির্ময়ী বর্ণচ্ছটা ধীরে-ধীরে জীবচেতনায় ফুটে ওঠে অনাদি অচিতির অব্যক্ত গহন হতে উন্মিষন্তী ঊষার অরুণরোগে।

অখণ্ড সচ্চিদানন্দের মধ্যে আত্মৈষণার আকৃতি না থেকে শুধু যদি লীলা-সম্ভোগের অফুরন্ত উল্লাস থাকত, তাহলে চিৎপরিণাম ও জন্মান্তরের বিধান অনাবশ্যক হত। অবশ্য চিৎস্বভাবের পরমকোটিতে এমন নিরঙ্কুশ রসোল্লাসও যে নাই, তা নয়। কিন্তু এ-জগতে তাঁর অদ্বৈতভাব সংবৃত্ত হয়েছে বিভজ্য-বৃত্ত মনের লীলায়, আত্মবিস্মৃতির অতল গভীরে তাঁর অবিকল্পিত একত্বের ধ্রুবা স্মৃতি হারিয়ে গেছে, বিবিক্ত ভেদভাবনার লীলাই উদগ্র হয়ে ফুটেছে সকল বিভূতির পুরোভাগে—যদিও এ-ভেদভাব প্রাতিভাসিক, কেননা ভেদে অভেদের তত্ত্বভাব তার অন্তরালে অখণ্ডিত মহিমায় নিগূঢ় হয়ে আছে। এই ভেদের লীলা মনঃকল্পিত খণ্ডতাবোধে চরমে উঠছে, যখন বিভজ্যবৃত্ত মন দেহকে আশ্রয় করে সহসা জেগে উঠেছে বিবিক্ত অহংএর চেতনা নিয়ে। খণ্ড-

লীলার নিবিড় ও নিরেট ভিত্তি রয়েছে জগৎজোড়া জড়কুণ্ডলীর বিবিক্ত বিগ্রহে, যার মধ্যে সচ্চিদানন্দের স্ফুরন্ত আত্মসংবিৎ আত্ম-অবিদ্যার প্রতিভাসে সংবৃত্ত ও আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এই অজ্ঞানকে আশ্রয় করে খণ্ডতাবোধ আরও নিরেট হয়, কেননা অদ্বৈতচেতনায় ফিরে যাবার পথকে সর্বদা এ রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু দুস্তর হলেও অজ্ঞানের বাধা সত্য বা অনপনেয় নয়, কেননা এই অজ্ঞানের অন্তরালে ঊর্ধ্বে ও মূলে আছে সর্ববিৎ চিৎস্বরূপের অধিষ্ঠান। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখি, আপাত-অজ্ঞান বস্তুত চিৎশক্তিরই একটা ঐকান্তিক অভিনিবেশ—আত্মবিস্মৃতির অতলে সে সমাহিত হয়ে আছে প্রকৃতির জড়লীলার অন্ধতমিস্রায় ঝাঁপ দিয়ে। এই জড়সমাধির সূত্রে বিশ্বের যে-বিসৃষ্টি, তার মধ্যে বিবিক্ত বিগ্রহকে আশ্রয় করে প্রাণলীলার শুরু হয়। তাই জড়ের জগতে পরমপুরুষের সঙ্গে বিশ্বযোগের সম্বন্ধে যুক্ত হতে ব্যষ্টিপুরুষকে একটা বিবিক্ত বিগ্রহ আশ্রয় করতে হয় অর্থাৎ তাকে জন্মাতে হয় শরীরী হয়ে। দেহকে ভিত্তি করে তারই আশ্রয়ে এ-জগতে তার প্রাণ মন ও চেতনার প্রগতিসাধনা শুরু হয়। পুরুষের এই শরীরধারণকেই আমরা বলি জন্ম। এই শরীরেই চলে তার আত্মবান হবার তপস্যা, বিশ্বের ও বিশ্বভূতের সঙ্গে তার অন্যোন্যসম্বন্ধের লীলায়ন। আবার সেই ব্রহ্মসাযুজ্যের লোকোত্তর ধামে ফিরে যাওয়া, তাঁর মধ্যে সবার যোগে যুক্ত হওয়া—এই পরমা সিদ্ধির দিকে তিলে-তিলে জাগ্রত চিত্তের যে-উদয়ন, তারও সাধনা চলতে পারে একমাত্র এই দেহের ক্ষেত্রে। জড়ের জগতে আমরা যাকে জীবনায়ন বলি, মানবাত্মার প্রগতিই তার একমাত্র লক্ষ্য এবং তারও সাধন হল আত্মার শরীরপরিগ্রহ। এই শরীরকে কীলক করেই চলে আত্মার যত তপস্যা—উত্তরায়ণের পথে জন্ম হতে জন্মান্তরের নিত্য-অনুবৃত্তির অবিচ্ছেদ যত সাধনা।

অতএব মর্ত্যভূমিতে আবির্ভূত হতে গেলে শরীরগ্রহণ ছাড়া পুরুষের আর-কোনও উপায় নাই। মনুষ্যযোনিতেই হ'ক বা অন্যান্য যোনিতেই হ'ক পুরুষের এই দেহধারণকে বিশ্বলীলায় পূর্বাপরসম্বন্ধহীন একটা আকস্মিক ব্যাপার বলা চলে না। এমনও বলতে পারি না—জীবাত্মা যেন হঠাৎ মর্ত্যের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এর জন্য যেমন অতীতের প্রস্তুতি ছিল না, তেমনি অনাগত সার্থকতারও কোনও সূচনা নাই। বিশ্ব জুড়ে চলছে সংবৃত্তি হতে বিবৃত্তির সাধনা। শুধু জড়বিগ্রহের বেলাতেই নয়, প্রাণ-মনের ভূমি হতে চিন্ময় ভূমিতে চেতন জীবের উদয়নের মধ্যেও দেখছি একটা দলমেলার তপস্যা। এক্ষেত্রে জীবাত্মার আকস্মিকভাবে মনুষ্যদেহধারণকে তার স্বভাবের নিয়ম বলে মানতে পারি না। এ কি অর্থহীন লক্ষ্যহীন খেয়ালখুশির একটা খেলা শুধু? বিশ্বপ্রকৃতিতে বা বস্তু-স্বভাবের মধ্যে এমন খেয়ালের স্থান কোথায়? চিৎস্বরূপের আত্মরূপায়ণের ছন্দে সহসা কেন এমনতর তালভঙ্গের একটা

অনাহূত উপদ্রব দেখা দেবে? স্পষ্টই যেখানে দেখছি, চিৎপরিণামের পর্বে-পর্বে প্রকৃতির উদয়ন বিশ্বলীলার স্বাভাবিক নিয়তি, সেখানে জীবাত্মার মূর্ত আবির্ভাবকে আকস্মিকতার কোঠায় ফেললে কি বিশ্বব্যাপী কার্যকারণের নিয়ম ভাঙা হয় না? অতীত ও অনাগত হতে বিচ্ছিন্ন একটুক্‌রা বর্তমানকে বিশ্বনিয়মের পর্বসন্ততির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যাবে কেমন করে? বিশ্বের জীবনস্পন্দে যে সার্থক ছন্দ অথবা প্রগতির যে-রীতি, ব্যক্তির জীবনস্পন্দেও তার অনুকৃতি এবং অনুবৃত্তি চলবে। অতএব বিরাটের ছন্দে ব্যক্তির জীবন যতিভঙ্গের একটা নিরর্থক জুলুম হবে না—বরং তাকে বিশ্বলীলার ধ্রুব-নিয়তির অপরিহার্য সাধন বলেই জানব।...আবার একথাও মানতে পারি না যে, মনুষ্যযোনিতে শুধু একবার জীবের জন্ম হয়, তার পূর্বে তার জীবন অনাদিকাল ধরে লোকান্তরেই কাটে—মাঝখানে এই প্রথম তার মর্ত্যলীলা এবং এই শেষও বটে। লোক হতে লোকান্তরে জীবাত্মার যাত্রাপথে এই জড়বিশ্বে শুধু একটিবার সে আনমনা হয়ে মাটির বুকে আসন পাতে, প্রকৃতি-পরিণামের ধারা দেখে একথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। মর্ত্যভূমিতে জীবাত্মার প্রগতিকে একটা হঠাৎ-সিদ্ধির পর্যায়েও ফেলতে পারি না। কেননা যে সর্বতো-মুখী বৃহৎ সার্থকতার দিকে সে চলেছে, তার সাধনা যেমন মন্থর, তেমনি দীর্ঘযুগসাপেক্ষ। তার জন্যে এই মাটির পৃথিবীকে একটিবার শুধু ছুঁয়ে গেলেই তো চলবে না। বিশ্বপ্রগতির একটি পর্ব হল মানুষের জীবন, যার ভিতর দিয়ে গুহাহিত বিশ্বম্ভর চিৎপুরুষ ধীরে-ধীরে তাঁর আকৃতিকে রূপায়িত করছেন এবং পরিশেষে দেহাশ্রয়ী ব্যষ্টি জীবচেতনার সম্প্রসারণ ও উদয়নে তাঁর বিপুল ব্রত উদ্‌যাপিত করছেন। কিন্তু উত্তরায়ণের একটি পর্বের পরিমণ্ডলে বার-বার জন্মান্তর দ্বারাই জীবাত্মার এই উদয়ন সিদ্ধ হতে পারে। শুধু চকিতের মত একবার এসে তাকে ছুঁয়ে আরেক পথে উধাও হয়ে গেলে পরিণামের সাধনায় কোনও ছন্দ বা সঙ্গতি থাকে না। জড়ের ঊর্ধ্বায়নের জন্যই চিৎশক্তি যদি জড়দেহকে স্বীকার করে থাকে, তাহলে সে-ঊর্ধ্বপরিণামের চরম পর্ব পর্যন্ত জড়ের সঙ্গে তাকে যুক্ত থাকতে হবে এবং তার জন্য বারবার ফিরে আসতে হবে এই মাটির বুকেই।

নিরঙ্কুশ খেয়ালের বশে অথবা কর্ম ও কর্মবিপাকের স্বচ্ছন্দ স্বতঃস্ফূর্ত বৈচিত্র্যবশত মানুষের আত্মা লোক হতে লোকান্তরে অবাধ আনন্দে প্রজাপতির মত বিহার করে চলেছে—এ-কল্পনাও যুক্তিযুক্ত নয়। চরমমুক্তিতে বা ক্রম-মুক্তির পথে মানবাত্মার এই জ্যোতিরভিযানের ছবি জড়োত্তর ভূমিতে সার্থক হলেও পার্থিব জীবনের প্রথম পর্বেই তা সম্ভব বলে মনে হয় না। পৃথিবীতে মানুষ অধ্যাত্মচেতনার একটা যুগ্মবিভাব নিয়ে জন্মায়। মানুষের আধারে একদিকে আছেন কূটস্থ চিন্ময় পুরুষ—যিনি তার বিশ্বোত্তীর্ণ শাশ্বত

তত্ত্বভাব, আরেকদিকে আছেন প্রকৃতি-স্থ চৈত্যপুরুষ—যিনি তার বিশ্বগত নিত্যতৃপ্ত ক্ষরভাব। কূটস্থ পুরুষরূপে জীব নির্গুণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—অনুমন্তা বা শাস্তার নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যে নিজেকে তিনি অজ্ঞানের অন্ধতামসে নিগূহিত করেছেন স্বেচ্ছায় সংসারভোগের জন্য। আত্মনিগূহন ছাড়া এ-ভোগ তার নিষ্পন্ন হত না। অথচ এরই মধ্যে তিনি চিৎপরিণামের অন্তর্যামী নিয়ন্তারূপে জেগে আছেন। আবার প্রকৃতি-স্থ পুরুষরূপে ব্রহ্মচক্রের সঙ্গে নিজেকে যোজিত করে তিনিই সংসারপরিণাম অঙ্গীকার করেছেন। প্রাকৃতবিগ্রহের দীর্ঘ পরম্পরায় আত্মভাবের যে-উপচয়, সে এই চৈত্যপুরুষেরই আত্মরূপায়ণের লীলা। বিশ্বপরিণামের রীতি ও ধারা ধরে চলছে তাঁর আত্মপরিমাণের নীরন্ধ্র সাধনা। কূটস্থরূপে বিশ্বোত্তীর্ণ হয়েও তিনি বিশ্বগত এবং বিশ্বব্যাপ্ত। আবার জীবাত্মারূপে তিনি বিশ্বরূপে সচ্চিদানন্দের সর্বগত বিভূতির অংশ এবং আত্মভূত। অতএব তাঁর আত্মরূপায়ণ বিশ্বরূপায়ণেরই পর্বসন্ততির অনুগত হবে—ব্রহ্মচক্রের আবর্তনের অনুবর্তী হয়ে চলবে তার উপচীয়মান আত্মানুভবের তপস্যা।

সর্বভূতের অন্তর্যামী বিরাট পুরুষ জড়বিশ্বের অন্ধতমিস্রায় নিগূহিত হয়ে আবার তাঁর প্রকৃতি-স্থ আত্মভাবকে জড়বিগ্রহের পরম্পরায় ফুটিয়ে তুলছেন—জড় প্রাণ চিত্ত ও চিৎসত্ত্বের ঊর্ধ্বগ সোপান বেয়ে। তাঁর প্রথম উন্মেষ জড়বিগ্রহের অন্তর্গূঢ় পুরুষরূপে—যাঁকে বাইরে থেকে মনে হয় অবিদ্যাতামসের সম্পূর্ণ কবলিত। তারপর অন্তর্গূঢ় পুরুষের ঈষৎ স্ফুরণের সূচনা নিয়ে তিনি প্রাণবিগ্রহে ফোটেন—অচিতি এবং ছায়াচ্ছন্ন অর্ধ-চিতির সন্ধিভূমিতে। বলা বাহুল্য ওই অর্ধচিতিই আমাদের অবিদ্যা। তারপর আরও এগিয়ে পশুচিত্তে আত্মসচেতনতার অস্ফুট আভাস নিয়ে তাঁর চিৎ-শক্তির উপচীয়মান দীপ্তি ফোটে। অবশেষে মানুষের মধ্যে বহিশ্চেতন অথচ অপূর্ণসংবিন্ময় পুরুষরূপে তাঁর উপান্ত্য আবির্ভাব ঘটে। প্রত্যেক পর্বেই অপরিণামী চিৎস্বরূপ অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত আছেন, আর প্রকৃতিতে ঘটছে তাঁর বিভূতিপরিণাম। এই প্রকৃতিপরিণামে বিশ্বগত এবং ব্যক্তিগত দুটি ধারা রয়েছে। বিশ্ব-বিরাটের মধ্যে আছে তার আত্মস্বরূপের একটা ক্রমায়ণ—বিশ্বভাবনার ছন্দোবদ্ধ একটা বৈচিত্র্য। এই ক্রম ও বৈচিত্র্যকে সে ফুটিয়ে তোলে আত্মবিভূতির সিদ্ধরূপায়ণের পরম্পরায়। ব্যষ্টিজীবাত্মা আবার এই বিশ্বগত ক্রমায়ণের ধারা ধরে এগিয়ে চলে—চিৎস্বরূপের বিশ্ব-ভাবনায় যা প্রাক্‌সিদ্ধ, তাকেই আধারে রূপায়িত করে। 'মনুঃ পিতা' বা বিশ্ব-মানুষ অথবা নিখিলমানব-বিগ্রহ বিরাট পুরুষ এই মানবজাতিতেই ফুটিয়ে তুলছেন শাশ্বত 'মনু'-শক্তিকে, যা আজ মনশ্চেতনার অবরভূমি হতে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে চলেছে অতিমানসচেতনার লোকোত্তর ভূমির

দিকে। এই শক্তিই একদিন মানুষের মধ্যে দিব্যভাবের ভাস্বর মহিমায় জ্বলে উঠবে, তার চেতনায় সর্বতোভাবী সত্যস্বরূপের অখণ্ড সংবিৎ আনবে—চিন্ময়ী বিশ্বব্যাপ্তির অনিরুদ্ধ ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলবে তার প্রকৃতিতে। ব্যষ্টি-মানুষ মনুশক্তির এই ধারাকেই অনুসরণ করে চলেছে। মানুষের পর্যায়ে উন্নীত হবার পূর্বে তার চেতনা প্রাণের অবরবিগ্রহে বিচরণ করে উপচীয়মান আত্মানুভবের বৈচিত্র্য সঞ্চয় করেছে। অদ্বিতীয় পরমার্থসৎ যেমন তাঁর বিশ্বভাবনার নিরঙ্কুশ লীলায় ওষধি ও পশুর অবরবিগ্রহে আপনাকে গুণ্ঠিত করেছেন, জীবসত্ত্বও তেমনি চিৎপরিণামের প্রাক্তন পর্বে ওই স্তরগুলি পার হয়েই আজ মানবাত্মার রূপ ধরেছে। তার চিৎসত্তা আজ বাইরে-ভিতরে মানব-ধর্মকে পুরাপুরি অংগীকার করেও এই উপাধির আবেষ্টনে নিজেকে অবরুদ্ধ রাখেনি—যেমন অতীতকালে ওষধি-বা পশুভাবের উপাধিকে স্বীকার করেও সে-বন্ধনে সে বাঁধা পড়েনি। আজ সে মানুষ হয়েছে। কিন্তু মানুষ-ভাবকে ছাড়িয়েও আত্মবিভাবনার উত্তরসিন্ধিতে পরা প্রকৃতির আকৃতিকে সার্থক করা নিশ্চয়ই তার সাধ্যের বাইরে নয়।

একথা স্বীকার না করলে বলতে হয়, যে চিৎসত্তা মানুষের সংসার-অনুভবের অধিষ্ঠাতা, মানুষের কায় এবং চিত্তই তাকে গড়ে তুলেছে। অতএব কায়-চিত্তই তার আশ্রয় বলে, মানুষভাবকে ছেড়ে নীচেও যেমন সে নামতে পারে না, উপরেও তেমনি উঠতে পারে না। আত্মাকে আর তখন অবিনশ্বর অমৃত-স্বরূপ বলে সিদ্ধান্ত করা চলে না। বলতে হয়, প্রকৃতিপরিণামের ফলে মনশ্চেতনার সংগে মানবদেহে যেমন তাঁর আবির্ভাব হয়েছে, তেমনি তাঁর তিরো-ভাবও হবে দেহ-মনের বিলুপ্তিতে। কিন্তু দেহ-মন চিৎসত্ত্বেরই বিসৃষ্টি—চিৎসত্ত্ব তো দেহ-মনের পরিণামজনিত কোনও বিকার নয়। চিত্ত ও রূপের যেসব উপাদানের যোজনায় স্কন্ধের উৎপত্তি হয়, তারা যে চিৎসত্ত্বেরও উৎপাদক, একথা সত্য নয়। বরং চিৎসত্ত্বের ভাবনাদ্বারাই চিত্ত ও রূপের উদ্ভব, এই সিদ্ধান্তই সংগত। অথচ বাইরে থেকে মনে হয়, চিৎসত্ত্ব যেন কায়চিত্তেরই পরিণাম। কিন্তু আসলে এই আপাতপরিণাম কোনও অভিনব বস্তুর সৃষ্টি নয়, সিদ্ধবস্তুরই ক্রমিক অভিব্যক্তিমাত্র। চিৎসত্ত্বের অভিব্যক্তির সংগে-সংগে ফোটে তার স্বাতন্ত্র্য এবং ঈশনা। তখন দেখি কায়-চিত্ত তার গৌণবিভূতি মাত্র, কেননা চিদভিব্যক্তির পরম কোটিতে কায়-চিত্তের সমস্ত বৈকল্য মার্জিত ও পরিশুদ্ধ হলে তারা চিৎসত্ত্বের সাক্ষাৎ বিগ্রহ এবং সাধনরূপে রূপান্তরিত হয়। আমরা জানি, চিৎসত্ত্ব এমন-একটা তত্ত্ব, কোনমতেই নাম-রূপ যার উপাদান হতে পারে না। বস্তুত চিৎসত্ত্বই জীবচেতনারূপী বিচিত্র বিভাবনায় আপনাকে নাম-রূপের বা চিত্ত-কায়ের বিচিত্র রূপায়ণে রূপায়িত করেন। মর্ত্যভূমিতে এই রূপায়ণ চলে চিৎপরিণাম ও প্রকৃতিপরিণামের পরম্পরায়। একদিকে যেমন

তিনি কায়ার পরে কায়া, রূপের পরে রূপ ফুটিয়ে চলেন—তেমনি আবার তার সঙ্গে জুড়ি মিলিয়ে রচেন চিত্তভূমির পরম্পরা। তাঁর বিচিত্র বিভাবনার সকল উল্লাস একটিমাত্র রূপে অথবা একটিমাত্র চিত্তে বা নামে বন্দী থাকবে, এ তো তাঁর স্বভাব নয়। এইজন্যেই জীবচেতনাকেও একমাত্র মনোময় মনুষ্যত্বের আড়ষ্ট বন্ধনে আমরা পঙ্গু করে রাখতে পারি না। এই দিয়ে যেমন তার শুরু নয় তেমনি এইখানে তার শেষও নয়। অতীতে যে-মানুষ ছিল অ-মানুষ, ভবিষ্যতে সে হবে অতি-মানুষ।

জন্ম-জন্মান্তরের ধারায় জীবাত্মা যে রূপ হতে রূপান্তরে আবর্তিত হয়ে অবশেষে মানবসুলভ ব্যক্তচেতনার ভূমিতে মনুষ্যোত্তর ঊর্ধ্বপরিণামের প্রেতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে—বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতিকে নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করলে এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হই। চোখের সামনে দেখছি, প্রকৃতিপরিণাম পর্বে-পর্বে এগিয়ে চলেছে এবং প্রত্যেক পর্বে অতীতের সমাহরণ ও রূপান্তরদ্বারা অভিনব পর্বের সূচনা সিদ্ধ হচ্ছে। আবার দেখছি, মানুষের বেলাতে এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি, কেননা পৃথিবীর পরিণামধারার সমগ্র ইতিহাস তারই মধ্যে সংকলিত হয়েছে। মানুষের আধারে যেমন অন্নময় উপাদান রয়েছে প্রাণশক্তির দ্বারা জারিত হয়ে, তেমনি রয়েছে মনোবাসিত প্রাণময় উপাদান। আবার তার ভাণ্ডারে চিদ্‌বাসিত মনোময় উপাদানেরও অভাব নাই। আজও মানুষের মনুষ্যত্বে পশুত্বের ছাপ রয়ে গেছে। তার সমগ্র প্রকৃতিতে এই একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : মানুষের মনোময় বৈশিষ্ট্য ফুটবে বলেই তার মধ্যে অন্নময় ও প্রাণময় ভূমি তৈরী করবার সাধনা চলছে—তার অতীতের পশুভাবেও দেখা দিয়েছে বিচিত্র-জটিল মনুষ্যভাবের প্রথম আয়োজন। কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয় না যে, যুগব্যাপী পরিণামের ফলে জড়-প্রকৃতি মানুষের দেহ প্রাণ ও পশু-মন সৃষ্টি করবার পর কোথাও থেকে সেই আধারে জীবচৈতন্যের আবির্ভাব হয়েছে। অবশ্য কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। তবু তার সমস্তটুকু ব্যঞ্জনাকে সত্য বলে মানতে পারি না। কারণ তাহলে বলতে হয়, জীবাত্মার সঙ্গে দেহের প্রাণের বা মনের একটা দুরতিক্রমণীয় বিরোধ বা ব্যবধান আছে। কিন্তু এও তো সত্য নয়। কেননা, দেহ তো কোথাও আত্মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, কিংবা কোনও দেহকেই তো বলা চলে না যে আত্মসত্তার বিগ্রহ সে নয়। বস্তুত জড় চিৎএরই বিভূতি এবং ঘনবিগ্রহ। চিংএর রূপায়ণ ছাড়া জড়ের সত্তাই সম্ভব নয়, কেননা যা ব্রহ্মভূত ও ব্রহ্মবিভূতি নয়, তার কোনও অস্তিত্বই যে কোনকালে থাকতে পারে না। জড় যদি চিৎসত্ত্ব দ্বারা ভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে প্রাণ-মনও যে তা-ই হবে—একথা আরও স্পষ্ট এবং সুনিশ্চিত। জড় এবং প্রাণ চিদাভাসযুক্ত না হলে জীবন্ত জড়বিগ্রহে

মানুষের আবির্ভাবও সম্ভব হত না। অথবা তার আবির্ভাব হত আকস্মিক একটা অঘটনরূপে—বিশ্বপরিণামের অঙ্গরূপে নয়।

অতএব শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য যে, পৃথিবীতে মানুষের জন্ম একটা সুদূরাগত জন্মপরম্পরার অনিঃশেষিত শেষ পর্ব। মানুষের ভূমিতে পৌঁছতে জীবাত্মাকে এই পৃথিবীতেই একটা প্রস্তুতির যুগ পার হয়ে আসতে হয়েছে অবরযোনির দীর্ঘ পরম্পরার ভিতর দিয়ে। জড়বিশ্বে প্রাণের সুতায় জড়বিগ্রহের যে মালা গাঁথা হয়েছে, জীবাত্মাকে তার প্রত্যেকটি ফুল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আসতে হয়েছে।...তখনই প্রশ্ন হয়, মানুষ হবার পরেও কি জীবের এই জন্মান্তরপ্রবাহ চলতে থাকে? চললে পর, কেমন করে কোন্ ধারায় রূপান্তরের কোন্ ছন্দে সে চলে? তাছাড়াও একটা প্রশ্ন আছে : একবার মানুষের ভূমিতে এসে জীবাত্মা আবার কি পশুযোনিতে ফিরে যেতে পারে? দেহান্তরসংক্রমনের প্রাচীন লোকাতত সিদ্ধান্ত এমনতর পিছু-হটাকে একটা সাধারণ ব্যাপার বলেই গণ্য করে। কিন্তু লোকপ্রবাদকে এক্ষেত্রে সমর্থন করা যায় না এইজন্যেই যে, পশুযোনি হতে মনুষ্যযোনিতে উত্তীর্ণ হবার সময় জীবচেতনার এমন-একটা জাত্যন্তরপরিণাম ঘটে যে তার ফলে আবার পশুর পর্যায়ে পুরাপুরি নেমে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব মনে হয়। ওষধির প্রাণময় চেতনা পশুর মনোময় চেতনায় রূপান্তরিত হলে যেমন একটা আমূল বিপর্যয় ঘটে, এ-রূপান্তর তারই সগোত্র। প্রকৃতি যদি পশুচেতনাকে মনুষ্য-চেতনায় উন্নীত করে এমনতর বৈপ্লবিক একটা পরিণাম ঘটিয়ে থাকে, তাহলে পুরুষ যে তার বাদী হবে, প্রকৃতির অন্তর্যামী কূটস্থপুরুষের সত্যসঙ্কল্প যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে—কিছুতেই তা সম্ভব নয়। কিন্তু ধরা যাক্, কোনও মানবাত্মায় জাত্যন্তরপরিণাম হয়তো দৃঢ়মূল হয়নি। অর্থাৎ পরিণামের পথে তার এতটুকু প্রগতি হয়েছে, যার ফলে মানবদেহ অধিকার ধারণ বা সৃষ্টি করবার সামর্থ্য জন্মালেও তার 'পরে জীবাত্মার কায়েমী স্বত্ব জন্মায়নি—অতএব মানবচেতনাকে নিষ্ঠাসহকারে আঁকড়ে ধরবার মত জোরও তার নাই। এক্ষেত্রে মানুষের আবার পশুযোনিতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু এমন অদৃঢ়মূল মানবাত্মার অস্তিত্বও বিরল।...আবার এমনও হয় : কোনও-কোনও মানুষের মধ্যে কোনও-একটা পশুবৃত্তি এতই উদ্দাম যে, তার বিশিষ্ট তর্পণের জন্য একটা পৃথক আধারের প্রয়োজন হয়। তখন মানুষ হবার পরেও দু-একবারের জন্য তার পশুজন্ম হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু তবু সে-জন্মান্তর তার প্রগতির সরল পথে ক্ষণেকের একটা আবর্তমাত্র। ...মোটকথা, প্রকৃতিপরিণামের ধারা এতই জটিল যে, এসম্পর্কে আমাদের কোনও মতুয়ারবুদ্ধি পোষণ করা মোটেই উচিত নয়। সুতরাং মানুষের পক্ষে পশুযোনিতে ফিরে যাওয়া একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু তাবলে

মনুষ্যলোকে উত্তীর্ণ জীবাত্মার যে অতিতুচ্ছ কারণে হামেশাই মানুষজন্মের মত পশুজন্ম হচ্ছে, লোকপ্রবাদের এই অতিরঞ্জনকে মেনে নেওয়া কঠিন। মানুষের পশুজন্ম সম্ভব হ'ক্ বা না হ'ক্, একবার যদি জীবাত্মা মানুষের ভূমিতে পৌঁছতে পারে, তাহলে তার পক্ষে আবার নতুন করে মানুষ হয়েই জন্মানোটাই মনে হয় স্বভাবের বিধান।

কিন্তু প্রশ্ন হবে, একবার মানুষ হয়ে জন্মানোই কি চিৎপরিণামের পক্ষে যথেষ্ট নয়? তার জন্য জন্মান্তর স্বীকার করবার কি প্রয়োজন? এর উত্তর সহজ। অতীতের উৎসর্পিণী জন্মপরম্পরার চরম সার্থকতা ঘটল মানুষ-জন্মে; সুতরাং চিন্ময় পরিণামের তাগিদেই এই ভূমিতে এখন জীবাত্মার স্থিতি হওয়া আবশ্যক। মনুষ্যলোকে একবার উত্তীর্ণ হলেই তো জীবাত্মার প্রগতিসাধনায় দাঁড়ি পড়ে না। মনুষ্যত্ববিকাশেরও অনেক স্তর আছে; জীবা-ত্মাকে তার সবগুলি পার হতে হবে। অসভ্য অশিক্ষিত নাগা বা কুকির মধ্যে কিংবা সমাজবন্ধনহীন গুণ্ডাপ্রকৃতির মানুষের মধ্যে যে-জীবাত্মা গুহাহিত হয়ে আছে, সে কি মনুষ্যত্বের সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে, নরোত্তমের আধারে সৎ-চিৎ-আনন্দের অকুণ্ঠ প্রকাশে কি ধন্য হয়েছে তার জীবন যে আর তার মানবদেহ গ্রহণ করবার প্রয়োজন নাই? প্রাণোচ্ছল ইওরোপীয়ান আত্মহারা হয়ে আছে উত্তাল কর্মজীবন বা ভোগজীবনের প্রমত্ততায়, কিংবা এসিয়াখণ্ডের মূঢ় চাষা ঘুরছে তার দৈনন্দিন গৃহস্থালির ঘানিগাছে। বলব কি, এরা দুজনেই জীবনসাধনার চরম সিদ্ধিতে পৌঁছে গেছে? এমন-কি প্লেটো বা শঙ্করের মত মানুষের জীবনেই যে চিৎপ্রকাশের বাসন্তসমারোহ শেষ হয়ে গেছে—একথাই কি জোর করে বলা চলে? আমরা হয়তো ভাবি মনুষ্যত্বের এই তো চরম, কেননা মানুষের মন ও চেতনা এধরনের সিদ্ধিকেও যে ছাপিয়ে উঠতে পারে, সে-ধারণা আমাদের নাই। কিন্তু অমাদের তথাকথিত সত্য ধারণাও তো বর্তমানের একটা ধোঁকা হতে পারে। মহত্তর না হ'ক, একটা বৃহত্তর সম্ভাবনাও যে মানুষের মধ্যে লুকিয়ে নাই, তা-ই বা বলি কেমন করে? হয়তো এইসব মহামানবের সিদ্ধির ভিতর দিয়েই ভগবান মানুষকে লোকোত্তর সিদ্ধির দিকে নিয়ে চলে-ছেন—এঁদের সাধনার সোপান বেয়েই একদিন আমরা হয়তো অকল্প্য জ্যোতি-র্লোকের তোরণদ্বারে পৌঁছব। অন্তত কোনও জীবাত্মা মানুষের বর্তমান সিদ্ধির চরম শিখরে যতদিন না পৌঁছতে পারছে, ততদিন তার জন্মান্তরগ্রহণের প্রয়োজনকে আমরা বাতিল করতে পারি না। মানুষ পৃথিবীতে এসেছে চিৎ-স্বভাবের উন্মেষদ্বারা অবিদ্যাকবলিত দেহ-মনের সংকীর্ণতা হতে বিজ্ঞানময় দিব্য-জীবনের ভাস্বর মহিমায় উত্তীর্ণ হবার জন্যই। এখানে থেকে অন্তত আধারের চিৎকমলকে তার ফুটিয়ে নিতেই হবে, আত্মস্বরূপকে জেনে পেতেই হবে চিন্ময় জীবনের আস্বাদন—তারপর না হয় শুরু হবে তার লোকান্তরে

নিত্যকালের নিশ্চিত অভিযান। এই তার পার্থিবসিদ্ধির প্রথম পর্ব। হয়তো এরও পরে আছে মর্ত্যজীবনেই চিন্ময় মহিমার সহস্রদল উন্মেষের সম্ভাবনা—মানুষের বর্তমান সিদ্ধিতে যার কোরকমাত্র দেখা দিয়েছে। মানুষের অপূর্ণতাকে যেমন প্রকৃতিপরিণামের চরম নিয়তি বলতে পারি না, তেমনি তার পূর্ণতাকেও বলতে পারি না চিৎপরিণামের শেষ পর্ব।

চিত্তপরিণামের চরমোৎকর্ষরূপে আজ মানুষের মধ্যে বুদ্ধিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু এইখানেই যদি তার প্রগতির ইতি না হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের লোকোত্তর সিদ্ধির সম্ভাবনা ধরে অসংশয়িত নৈশ্চিত্যের রূপ। প্রাকৃতচিত্তের এমন-সব শক্তি আছে, আজ যা শ্রেষ্ঠ মানবেরও পুরাদখলে আসেনি। সুতরাং চিত্তপরিণামের আরও উৎকর্ষের জন্য ব্যক্তিকেও বাধ্য হয়ে উৎসর্পিণী জন্মপরম্পরার ধারা ধরে চলতে হবে, নইলে চিত্তশক্তিকে আকার দেওয়া সম্ভব হবে কেমন করে? অতিমানসের বীর্য যদি মানুষের চেতনায় অন্তর্গূঢ় থেকে থাকে, তাহলে শুধু চিত্তোৎকর্ষের সিদ্ধিতেই তার প্রস্ফুরণ শেষ হয়ে যাবে না। যতক্ষণ মনোময়ী প্রকৃতি অতিমানসী প্রকৃতিতে না রূপান্তরিত হচ্ছে, এই মর্ত্যভূমির নায়করূপে যতক্ষণ অতিমানব বিগ্রহের আবির্ভাব না ঘটছে, ততক্ষণ পার্থিবলোকে জীবাত্মার অনাবৃত্তির কথা উঠতেই পারে না।

জন্মান্তরবাদের পক্ষে তাহলে এই হল দার্শনিক যুক্তি : পার্থিবপ্রকৃতির মধ্যে পরিণামের প্রবর্তনা যদি থেকে থাকে এবং এই নিত্যপরিণামিনী প্রকৃতিতে আবির্ভূত জীবাত্মার সত্তা যদি নিত্য হয়, তাহলে জন্মান্তরপরিগ্রহ তার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত এবং অপরিহার্য।...জীবাত্মা বলে কিছুই যদি না থাকে, তাহলে প্রকৃতিতে আছে একটা অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন ভূতপরিণামমাত্র; তার মধ্যে জীবের জন্ম একটা অর্থহীন ও আকস্মিক ব্যাপার শুধু।...আবার জীব যদি দেহের আদি ও অন্তের সঙ্গে বাঁধা চিৎশক্তির একটা কালাবচ্ছিন্ন রূপায়ণ হয়, তাহলে বিশ্বপরিণামকে বলব বিরাট পুরুষ বা বিশ্বাত্মার একটা উৎসর্পিণী লীলা—জাতির উৎকর্ষসাধনার দ্বারা সম্ভূতির চরম কোটিতে কি চিদ্‌বিভূতির প্রত্যন্ততম পর্বে পৌঁছনোই তার লক্ষ্য। এক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্মান্তর অসম্ভব হয়, নয়তো নিষ্প্রয়োজন।...যদি বলি, নিত্যবৃত্ত অথচ মায়িক জীবব্যক্তিতে সর্বসৎ আপনাকে প্রকট করছেন—তাহলে জীবের জন্মান্তর সম্ভব হলেও তা অবাস্তব। জন্মান্তরকে তখন অনতিবর্তনীয় অধ্যাত্মসাধন বলা দূরের কথা, প্রকৃতিপরিণামের একটা অপরিহার্য অঙ্গও বলা যায় না। এ-সিদ্ধান্ত অনুসারে, জন্মান্তরপ্রবাহ একটা বিভ্রমকে যথাসম্ভব দীর্ঘায়ত এবং দুরপনেয় করে তোলবার সাধন মাত্র।...যদি দেহনিরপেক্ষ অথচ দেহের অধ্যক্ষ এবং ভোক্তা জীবাত্মা কি পুরুষ বলে কেউ থাকেন, আর দেহ যদি হয়

তাঁর ইষ্টসিদ্ধির সাধন—তাহলে জীবের জন্মান্তরকে একটা সম্ভাবিত ব্যাপার বলে মনে হয়। কিন্তু পুরুষ প্রকৃতি-স্থ থেকেই চিৎপরিণামের আকূতিকে বহন না করলে, জন্মান্তর তখনও অপরিহার্য হবে না। তখন হয়তো ব্যষ্টি-দেহে ব্যষ্টি-আত্মার অধিষ্ঠান হবে একটা ক্ষণেকের ঘটনা—এই পৃথিবীর সঙ্গে তার অতীত বা ভবিষ্যতের কোনও যোগাযোগ থাকবে না। জীবাত্মার বিগত বা অনাগত পরিণামের সিদ্ধিকে তখন ঠেলতে হবে পৃথিবীর ওপারে—লোকান্তরে। ...কিন্তু দেহপরিণামের সঙ্গে যদি চিৎপরিণামেরও ছন্দের মিল থাকে এবং দেহাধিষ্ঠিত জীবাত্মা যদি একটা বাস্তব চিন্ময় তত্ত্ব হয়, তাহলে জন্মান্তর হবে চিৎপরিণামের অপরিহার্য সাধন। কেননা প্রকৃতি-স্থ পুরুষ একমাত্র এই উপায়েই তাঁর আত্মানুভবকে কলায়-কলায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন। জন্মের মত জন্মান্তরও একান্ত আবশ্যক। জন্মান্তর নইলে জন্ম হবে পরিণামের ইঙ্গিতহীন একটা সূচনা শুধু—এ যেন দীর্ঘযাত্রার জন্য পা বাড়িয়েই থমকে যাবার মত। জন্মান্তর আছে বলেই অপূর্ণ জীবের দেহপরিগ্রহের একটা সুদূরপ্রসৃত সার্থকতা আছে—তার অধ্যাত্মজীবনেরও পূর্ণতাসিদ্ধির একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

একবিংশ অধ্যায়

লোকসংস্থান

সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা
গুহাশয় নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ২।১।৮

এই তো সাতটি লোক, যার মধ্যে বিচরণ করে গুহাশায়ী প্রাণেরা—নিহিত হয়ে সপ্তগুণিত সপ্ত ধামে।

—মুণ্ডক উপনিষদ (২।১।৮)

পঞ্চ জনো মম হোত্রং জুষন্তাং গোজাতা উত যে যজ্ঞিয়াসঃ।
পৃথিবী নঃ পার্থিবাৎ পাত্বংহসোঽন্তরিক্ষং দিব্যাৎ পাত্বস্মান্।
তন্তুং তন্বন্ রজসো ভানুমন্বিহি জ্যোতিষ্মতঃ পথো রক্ষ ধিয়া কৃতান্।
অনুল্বণং বয়ত জোগুবামপো মনুর্ভব জনয়া দৈব্যং জনম্ ॥
সতো নূনং কবয়ঃ সং শিশীত বাশীভির্যাভিরমৃতায় তক্ষথ।
বিদ্বাংসঃ পদা গুহ্যানি কর্তন যেন দেবাসো অমৃতত্বমানশুঃ ॥

ঋগ্বেদ ১০।৫৩।৫, ৬, ১০

পঞ্চ-জনেরা আমার আহুতিকে গ্রহণ করুন—যাঁরা কিরণ-জাত এবং যজনীয়: পৃথিবী আমাদের রক্ষা করুন পার্থিব দুরিত হতে—অন্তরিক্ষ দ্যুলোকের দুরিত হতে বাঁচান আমাদের। অন্তরিক্ষে আতত প্রভাময় তন্তুকে কর অনুসরণ—জিইয়ে রাখ ধ্যানে-গড়া জ্যোতিষ্মান যত পথ; অতি সূক্ষ্ম নিষ্কলুষ কর্ম কর বয়ন, মনু হও—জন্ম দাও দিব্য জাতিকে।...সত্যের কবি তোমরা, শাণ দাও সেই বাইসে—যাদের দিয়ে অমৃতের পথকে কেটে বার করবে; তোমরা জান গুহ্যধাম যত—সৃষ্টি কর তাদের, যাদের ধরে দেবতারা পেয়েছিলেন অমৃতের অধিকার।

—ঋগ্বেদ (১০।৫৩।৫,৬,১০)

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্ শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥

কঠোপনিষৎ ৬।১

ঊর্ধ্বমূল অবাক্-শাখ এই সেই সনাতন অশ্বত্থ; সে-ই তো ব্রহ্ম, সে-ই তো অমৃত; তাতেই আশ্রিত সকল লোক, তাকে পেরিয়ে যায় না কেউ। এই হল সেই।

—কঠ উপনিষদ (৬।১)

জড়ের জগতে চেতনার ঊর্ধ্বপরিণাম এবং অবিচ্ছেদে বা বারংবার জীবের জন্মান্তর যদি একটা অবিসংবাদিত সত্য হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে : এই পরিণাম-লীলা কি শুধু জড়বিশ্বে ঘটছে—বিবিক্ত এবং অন্যনিরপেক্ষ একটা ব্যাপার-রূপে, না কোনও বিরাট বিশ্ববিধানের সঙ্গে এর যোগ আছে—জড়জগৎ যে-বিধানের একটা শাখামাত্র? এ-প্রশ্নের উত্তর পূর্বেই সূচিত হয়েছে—

অবরোহিণী চিৎশক্তির সংবৃত্তিপরিণামে। আমরা জানি, সংবৃত্তিপরিণাম ছাড়া বিবৃত্তিপরিণাম সম্ভব নয়। কিন্তু সংবৃত্তির প্রাক্‌সত্তা স্বীকার করলে লোকান্তরেরও প্রাক্‌সত্তা মানতে হয়—অন্তত সত্তার ঊর্ধ্বভূমিকে না মানলে চলে না। যা সংবৃত্ত রয়েছে তা-ই যদি শুধু বিবৃত্ত হতে পারে, তাহলে সংবৃত্ত এবং বিবৃত্ত তত্ত্বের অন্যোন্যসম্বন্ধও স্বতঃসিদ্ধ হবে। কল্পনা করতে পারি, ঊর্ধ্বতত্ত্বের অর্থক্রিয়াকারী সান্নিধ্যবশত অথবা পৃথ্বীচেতনার 'পরে তাদের চাপে, প্রাণ মন ও চিৎসত্ত্ব সংবৃত্তদশা হতে মুক্ত হয়ে জড়প্রকৃতিতে আপনাকে অভিব্যক্ত ও সম্প্রসারিত করবার সুযোগ পায়। কিন্তু এতেই যে তাদের অন্যোন্যসম্বন্ধ চুকে গেল, কিছুতেই তা সম্ভব বলে মনে হয় না। জড়-ভূমির সঙ্গে অন্যান্য জড়োত্তর ভূমির একটা নিগূঢ় অথচ অবিচ্ছেদ আদান-প্রদান যে চলছে—এমন সম্ভাবনাকে আমল দেবার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। ব্যাপারটাকে এবার আরও তলিয়ে বোঝা আবশ্যক। ইহলোক আর পর-লোকের সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্কটা কি ধরনের, জন্মান্তরবাদ ও প্রকৃতিপরিণাম-বাদের সঙ্গেই-বা তার কি সম্বন্ধ—স্বতন্ত্রভাবে এ-সমস্যার বিচার করবার এখন সময় হয়েছে।

ইহলোক আর পরলোকে কি সম্বন্ধ, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ-কেউ বলেন : নিরঞ্জন চিৎস্বভাব জীবাত্মা অতিচেতনার শুদ্ধাবাস হতে বিনা ভূমিকায় সহসা নিক্ষিপ্ত বা স্খলিত হয়েছে অনাদি অচিতির গহনে—অবিদ্যাচ্ছন্ন জগতে জীবের অবতরণকাহিনী হল এই। এখানে আসবার পর তার জড়প্রকৃতির আশ্রয়ে ঊর্ধ্ব-পরিণামের অভিযান শুরু হল। এই মতে ঊর্ধ্বে পরমার্থসৎ আর পার্থিবভূমিতে অচিতি—এছাড়া লোকান্তরের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। জড়জগৎ অচিতির বিসৃষ্টি। এখান হতে জীবের আবার স্বধামে ফিরে যাওয়া হবে তেমনি আকস্মিক একটা উৎক্ষেপে—জড়বিগ্রহ সংসারীর বন্ধনদশা হতে লোকোত্তর নৈঃশব্দের মধ্যে আত্মার চকিত নির্বাপণে। জড় আর চিতের মধ্যে আর-কোনও অবান্তর শক্তি বা তত্ত্ব নাই, জড়ভূমি ছাড়া আর-কোনও ভূমি নাই, জড়ের জগৎ ছাড়া আর-কোনও জগৎ নাই। কিন্তু এ-মতবাদে নিরাভরণ কল্পনার অতিসারল্য আছে বলেই একে দিয়ে বিশ্বব্যাপারের জটিলতার গ্রন্থিমোচন সম্ভব হয় না।

অবশ্য বিশ্ববিসৃষ্টির একাধিক নিমিত্তকারণের কল্পনা আমরা করতে পারি—যার প্রযোজনায় জগৎব্যবস্থার এমনতর চরম অনড় শৃঙ্খলার উৎপত্তি হয়েছে। বিশ্বক্রতু পুরুষের মধ্যে হয়তো এইধরনেরই একটা ভাবনা বা ব্যাহৃতির সংবেগ ছিল—জীবাত্মার মধ্যে ছিল জড়াশ্রয়ী অহংসর্বস্ব অবিদ্যা-জীবনের একটা কল্পনা বা আকূতি। কোনও দুর্বোধ অন্তর্গূঢ় বাসনাদ্বারা প্রণোদিত হয়ে শাশ্বত জীবাত্মা হয়তো জ্যোতির্ময় স্বধাম হতে অবিদ্যাজগতের

প্রসূতি অচিতির অন্ধতমসাচ্ছন্ন পথের অভিযাত্রী হয়ে লীলাচ্ছলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অথবা একটি ব্যষ্টি জীবাত্মাতেই নয়, আধুনিক বেদান্তীর 'হিরণ্য-গর্ভে' বা সমষ্টি জীবাত্মাতে এমনিতর একটা আকূতি জেগেছে। কারণ, ব্রহ্মাণ্ড বলতে আমরা বুঝি নৈর্ব্যক্তিক বা বহুপুরুষের সমবায়ঘটিত একটা ভাবনা, অথবা বিরাটপুরুষ কি অনন্তসন্মাত্রের বি-সৃষ্টি বা আত্ম-বিভাবনা। সুতরাং একটি জীব দিয়ে কখনও একটা ব্রহ্মাণ্ড গড়া চলে না। হয়তো জীবাত্মার এই আকূতির আকর্ষণেই অখিলাত্মা অচিতির নিগূঢ় বীর্য আশ্রয় করে ব্রহ্মাণ্ডকে গড়ে তুলতে নেমে এসেছেন।...তা নয়তো সর্ববিৎ অখিলাত্মাই সহসা তাঁর আত্মসংবিৎকে অচিতির অন্ধকারে নির্মজ্জিত করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন অন্তর্নিহিত জীবাত্মার ব্যূহকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর থেকে প্রাণ ও চেতনার ঊর্ধ্বায়নে শুরু হয়েছে জীবের ঊর্ধ্বপরিণাম—আমরা তাকেই বলি সংসার।... যদি বলি, জীবাত্মার প্রাক্‌সত্তা আমরা মানি না : জীব বিশ্বচেতনার একটা অতর্কিত স্ফুলিঙ্গ, কিংবা অবিদ্যার একটা বিজৃম্ভণমাত্র মাত্র। এক অনাদি অব্যাকৃত মূলা প্রকৃতি হতে নাম-রূপের ক্রমপরিণামে এই গণনাতীত জীবের কল্পনা—তার পিছনে রয়েছে শুধু ওই অবিদ্যার বা বিশ্বচেতনার সিসৃক্ষার প্রেতি।...তাহলে কল্পনা করতে হয়, অচিৎশক্তিময় উপাদানের অব্যাকৃত পিণ্ড-ভাব হতে জড়বিশ্বের প্রথম সূচনা এবং তার কালকৃত পরিণামে জীবাত্মার উদ্ভব।

শেষোক্ত মতে—অথবা পূর্বোক্ত যে-কোনও মতানুসারেই—আমরা মানতে পারি মাত্র দুটি লোক। একটি এই জড়বিশ্ব—অচিতির গহন হতে শক্তি বা প্রকৃতির অন্ধতমোময় সংবেগ হতে যার বিসৃষ্টি। হয়তো সে-সংবেগের মূলে আছে অন্তর্গূঢ় এবং অপ্রত্যক্ষ একটা আত্মসত্তার প্রেতি—যা বিশ্বপ্রকৃতির এই স্বপ্নসঞ্চরণবৎ প্রবৃত্তির অধ্যক্ষ। একে বলতে পারি অস্তিত্বের কুমেরুপ্রান্ত। তার সুমেরুতে আছে এক অতিচেতন অদ্বয় সন্মাত্রের স্বধাম, যার কূলে অচিতির ও অবিদ্যার কবল হতে মুক্ত হয়ে আবার আমরা ফিরে যাব। অথবা এও বলা চলে : এই জড়বিশ্বই শুধু আছে। জড়বিশ্বের অন্তর্গূঢ় আত্মভাব ছাড়া স্বয়ংসিদ্ধ অতিচেতনার কল্পনা নিষ্প্রমাণ। কিন্তু যদি দেখা যায়, চেতনার প্রাকৃত ভূমি ছাড়া আরও ভূমি আছে, এই জড়লোক ছাড়া আরও লোকের সন্ধান মিলছে, তাহলে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তকে বহাল রাখা কঠিন হয়। তর্কের মুখে অবশ্য বলা চলে, ওসব অন্তরিক্ষলোক পরে দেখা দিয়েছে। অচিতির গহন হতে জীবাত্মার উৎক্রান্তির সঙ্গে-সঙ্গে, অথবা তার ঊর্ধ্বপরি-ণামকে সহজ করবার জন্যেই তাদের আবির্ভাব। মোট কথা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অচিতিরই পরিণাম। হয় শুধু জড়বিশ্বের সৃষ্টিতে তার পরিণামের ধারা সমাপ্ত হয়েছে; অথবা এখান হতে আরোহক্রমে একে-একে বিবর্তিত হয়ে

চলেছে লোকান্তরের একটা সোপানমালা—যাকে বেয়ে জীব পরমার্থসৎএর চরম ধামে পেঁছতে পারে। কিন্তু আমরা বলি, বিশ্বজগৎ অতিচেতন সৎ-চিৎ-আনন্দেরই আত্মরূপায়ণের দল মেলা। অথচ পূর্বপক্ষীর মতে এ শুধু অচিতির মূঢ় পরিণাম—বিজ্ঞানভূমির একটা অস্পষ্ট লক্ষ্যের দিকে তার হোঁচট খেয়ে চলা। জীবাত্মার সৃষ্টি বা সৃতি দুইই একটা ভুলের ফসল। তার ফলে দেখা দিয়েছে অবিদ্যা বা বাসনার যে আদিম প্রেতি, যে-কোনও উপায়ে তার আত্যন্তিক নিরোধ দ্বারা জীবভাবের ধ্বংসসাধনই আমাদের পুরুষার্থ এবং অচিতির বিদ্যাভীপ্সারও এই তাৎপর্য।

এধরনের সিদ্ধান্তে ব্যষ্টিজীবকে বা মনকে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে তাদের গুরুত্বকে অযথা বাড়ানো হয়েছে। জীব কি জীবের মন কেউ খাটো নয়। তবু শাশ্বত অদ্বয় চিন্মাত্রই পরমার্থসৎ—তিনিই বিশ্বের আদ্যা শক্তি। যে-বিজ্ঞান হতে কল্পনার বিসৃষ্টি, তা মনের ব্যাপারমাত্র; তাকে বলতে পারি না পরমার্থসৎএর সদ্ভূতবিজ্ঞান—যা তাঁর অন্তর্নিহিত স্ব-ভাবের ঋতম্ভরা চেতনা এবং ওই ঋতচিতেরই সংবেগে আত্মবিভাবনার স্বতঃস্ফুরণ। জীবের বাসনাও তেমনি মনের আধারে প্রাণের ব্যাপারমাত্র। অতএব প্রাণ ও মন দুইই প্রাক্‌সিদ্ধ শক্তি এবং জড়বিশ্বের বিসৃষ্টিতে তাদের প্রভাবও অনস্বীকার্য। তা-ই যদি হয়, তাহলে আপন জড়োত্তর প্রকৃতির অনুরূপ স্বতন্ত্র লোকসৃষ্টিও তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। এই হল একদিককার কথা।...আবার আরেকদিকে বলতে পারি : চিৎস্বরূপের সত্যসংকল্পই বিশ্বসৃষ্টির আদিম প্রেতি—ব্যক্তির বাসনা দূরের কথা, বিশ্বমন বা বিশ্বপ্রাণের আকূতিও সৃষ্টির প্রবর্তক নয়। সৃষ্টি এক কবিক্রতুর আত্মবিভাবনা কি চিদ্‌বিলাস—তাঁর চিন্ময়ী সিসৃক্ষার সম্মূর্ছনা বা আত্মসংবিতের বিদ্যোতনা কিংবা তাঁর স্বকৃৎ আত্মশক্তির সিদ্ধ প্রবর্তনা, অথবা তাঁর স্বরূপানন্দের একটা বিশিষ্ট রূপায়ণ। কিন্তু বিশ্ব যদি ব্রহ্মের সর্বগত আনন্দের বি-ভাতি না হয়ে জীবের ক্ষুদ্র বাসনার পরিতর্পণ বা তার অহংমূঢ় সম্ভোগের জন্য কল্পিত হয়ে থাকে, তাহলে বিরাট্‌-পুরুষকে বা বিশ্বোত্তর দিব্য-পুরুষকে তার স্রষ্টা ও সাক্ষী না বলে মনোময় জীবকেই সেই আসনে বসাতে হয়। অতীত যুগে ব্যষ্টিজীবের একটা অতিকায় বিগ্রহ মানুষের চিন্তাজগতের পুরোধা হয়েছিল, তারই মহিমা তাই সবার মহিমাকে ছাপিয়ে গেছে। জীবত্বের গৌরবকে খর্ব না করে আজও তাকে স্রষ্টার আসনে বসানো যায় বটে; কেননা জড়প্রকৃতির আড়ালে চিৎস্বরূপের আত্মনিগূহনের মধ্যে তাঁর চিদ্রূপিণী স্বরূপশক্তির যে-লীলা, তাতে ব্যষ্টি-পুরুষেরও যে সায় আছে, একথা অনস্বীকার্য। পুরুষ অবিদ্যার জীবনকে স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার করেছেন—এও সত্য। কিন্তু তাহলেও জগৎকে ব্যষ্টিমনের সৃষ্টি অথবা তার চিত্তনাট্যের রঙ্গভূমি বলতে পারি না; কিংবা এ যে শুধু

জীবের অহমিকার সিদ্ধি-অসিদ্ধির লীলাক্ষেত্ররূপে কল্পিত, এও মানতে পারি না। ব্যক্তির চাইতে বিশ্ব বড়, ব্যক্তি বিশ্বেরই আশ্রিত—এই বোধ আমাদের মধ্যে জাগ্রত হলে ব্যক্তিপ্রাধান্যের সিদ্ধান্তে বুদ্ধির আর-কোনও সায় থাকে না। ব্রহ্মাণ্ডের লীলা এতই বিরাট যে, তাকে জীবশাসিত বলে কল্পনা করা অসম্ভব। একমাত্র বিশ্বশক্তি বা বিরাট্‌পুরুষই বিশ্বের স্রষ্টা এবং ভর্তা হতে পারেন। বিশ্বের তত্ত্বভাব তাৎপর্য অথবা লক্ষ্যও তার নিজের মানদণ্ডে নিরূপিত হবে—জীবের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের মাপে নয়।

অতএব যখন জগৎ হয়নি, তখনও বিশ্ববিসৃষ্টির যজ্ঞভাক্‌ এই ব্যষ্টি-জীবের সত্তা ছিল। আর অবিদ্যাকে অঙ্গীকার করবার এই-যে তার বাসনা বা অনুমতি, তার প্রবর্তনা তখনও জাগ্রত ছিল। যে বিশ্বোত্তীর্ণ অতিচেতনা হতে জীবের অভিব্যক্তি এবং অহন্তাসঙ্কীর্ণ জীবনের অবসানে যার বক্ষে তার বিশ্রাম, তার মধ্যেই ওই বাসনার বীজ নিহিত ছিল। একের মধ্যে বহুর অন্তর্ভাবকে বিশ্বের একটা মৌলিক তত্ত্ব বলে মানতেই হবে। অতএব কল্পনা করতে পারি, লোকোত্তর আনন্ত্যের মধ্যে একটা সঙ্কল্প সংবেগ বা চিন্ময়ী প্রেতির আলোড়ন জাগল এবং তার সংক্ষোভে বহু বা বিরাটের একদেশ অবক্ষিপ্ত হয়ে সৃষ্টি করল এই অবিদ্যার জগৎ। কিন্তু বহু যখন একের আশ্রিত, একের আত্মবিভূতি, একেরই সত্তায় সত্তাবান—তখন বিশ্বাবভাসের মূলেও অদ্বয়ভাবের আবেশ এবং প্রেতি রয়েছে। প্রত্যক্ষ দেখছি, বিশ্ব ব্যক্তির প্রাক্‌-ভাবী, তার শক্তিস্ফুরণের ক্ষেত্র। বিশ্বোত্তীর্ণ সত্যে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা হলেও বিশ্বই তার বিরাট্‌ভাবের আধার। অখিলাত্মার 'পরেই জীবাত্মার নির্ভর, তিনিই তার জীবাধার। কিন্তু অখিলাত্মা স্ব-তন্ত্র ও স্বরাট্‌ —এমন-কি তাঁকে ব্যষ্টিজীবের যোগফল বা ব্যষ্টিজীবচেতনার বহুধাবিকীর্ণ সঙ্কলনও বলা চলে না। অখিলাত্মা অখণ্ড বিশ্বচৈতন্যরূপে অখণ্ড বিশ্ব-শক্তির বিচিত্র লীলার নিয়ামক। বহুর একনির্ভরতার মৌলিক তত্ত্বটি এখানেও তিনি বিশ্বচ্ছন্দের বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় ফুটিয়ে তুলছেন। বহুর বিশ্বভাবনা একটা স্ব-তন্ত্র ব্যাপার, কিংবা অদ্বয়স্বরূপের অবন্ধ্য সঙ্কল্পের একটা অপবাদ—একথা অকল্পনীয়। এমন-কি বহুর উদগ্র বাসনার বিকর্ষণে অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ অগত্যা বা অনিচ্ছায় অচিতির অন্ধতমিস্রায় নেমে এসেছেন—এ-কল্পনাও অশ্রদ্ধেয়, কেননা এতে একের সঙ্গে বহুর আশ্রয়াশ্রয়ি-সম্বন্ধের সত্য বিপর্যস্ত হয়। অবশ্য একটা বিশেষ অর্থে বলতে পারি, বহুর সঙ্কল্প বা চিৎসংবেগ হতেই জগতের সাক্ষাৎ বিসৃষ্টি। কিন্তু তাহলেও সে-সংবেগের মূলে যে সচ্চিদানন্দের প্রথম সঙ্কল্পের প্রেতি নিহিত ছিল—একথা মানতেই হবে। কেননা তাঁর কামনার সংবেগ ছাড়া কোথাও কোনও সংক্ষোভের সৃষ্টি একান্তই অসম্ভব। এক্ষেত্রে বিশ্বক্রতু তাঁর কামনা বা সত্যসঙ্কল্প। চিৎস্বরূপে যা কবি-

ক্রতু, জীবের অহন্তায় তা-ই ধরে কামনা বা কামসঙ্কল্পের রূপ। যে অন্বয় অখিলাত্মা জীব-চেতনার ঈশ্বর এবং নিয়ামক, আত্মসঙ্কোচের স্বাতন্ত্র্যে তিনিই যদি অচিৎপ্রকৃতির কঞ্চুককে প্রথম না স্বীকার করেন, তাহলে জড়বিশ্বে অবিদ্যার গুণ্ঠনে নিজেকে আবৃত করা কি জীবের বেলায় সম্ভব হত ?

পরাৎপর বিরাট্‌পুরুষের ক্রতু বা সঙ্কল্পকে যদি জড়বিশ্বের আবির্ভাবের অপরিহার্য নিমিত্ত বলে স্বীকার করি, তাহলে কামনাকে আর সৃষ্টির প্রবর্তক বলতে পারি না। কেননা, সর্বসৎ অনুত্তর পুরুষ আপ্তকাম—তাঁর মধ্যে স্পৃহা কোথায় ? কোনও কাম্য তাঁর থাকতে পারে না এইজন্যই যে, কামনা অতৃপ্তি ও অপূর্ণতার সূচক। যা অনবাপ্ত বা অসম্ভুক্ত, তার অবাপ্তি বা সম্ভোগের পিপাসাই কামনা। কিন্তু অনুত্তর সর্বগত পুরুষের মধ্যে আছে সর্বাত্ম-ভাবের নিরঙ্কুশ আনন্দ—সে-আনন্দ তো কামনাবিকল হতে পারে না। কামনা অপূর্ণ অথচ উপচীয়মান অহন্তার ধর্ম এবং এই অহন্তাও বিশ্বলীলার একটা পরিণাম।...তাছাড়া, ব্রহ্মের সর্বসংবিৎ জড়ত্বের মূঢ়তায় নিজেকে যদি সংবৃত্ত করতে চেয়ে থাকে, তাহলেও তার মূলে আছে কোনও অতৃপ্ত বাসনার তাগিদ নয়—কিন্তু নবীন ভঙ্গিমায় তাঁর আত্মবিসৃষ্টির কোনও কল্পনা। আবার সর্বসতের আত্মবিভাবনার অন্তহীন সামর্থ্য যে শুধু জড়বিশ্বের বিসৃষ্টিতে অথবা অচিৎ হতে চিতের অভ্যুদয়েই পর্যবসিত হয়েছে—এও সত্য নয়। একথা মানতাম, যদি জানতাম জড়শক্তিই বিশ্বের আদ্যা শক্তি, জড়ত্বেই অব্যাকৃতের একমাত্র প্রথম ব্যাকৃতি। তখন জড়কে ভিত্তি করে অচিতির ভিতর দিয়ে নিজকে ফুটিয়ে তোলা ছাড়া সত্তার আর-কোনও উপায় থাকত না। তার ফলে আমরা পেতাম 'স্বতঃপরিণামী জড়ৈকব্রহ্মবাদ'। এই মতে বিশ্বস্থ সর্বভূত এক অন্বয়তত্ত্বের আত্মস্বরূপ বটে, কিন্তু তারা তাঁর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে এইখানেই। এই মর্ত্যলোকেই তাদের ঊর্ধ্বপরিণাম চলছে—অজৈব জৈব ও মনোময় বিগ্রহের পরম্পরায়। এমনি করে অতিচেতন অপরব্রহ্মলোকে তাঁর বিশ্বাত্মভাবে অবগাহন করে জীবনের অখণ্ড পূর্ণতাকে ফিরে পাওয়া—এই হল সর্বজীবের পরম পুরুষার্থ। এই মর্ত্যভূমিতেই সবার উন্মেষ হয়েছে—প্রাণ মন ও চিৎসত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছে এই জড়বিশ্বে অনুস্যূত অন্বয়-তত্ত্বের নিগূঢ় বীর্য হতে। সুতরাং এই জড়বিশ্বেই ঘটবে তাদের পরিপূর্ণ সার্থক পরিণাম। জড়লোক ছাড়া আর-কোনও অতিচেতন ভূমি কেথাও নাই—কেননা অতিচেতন পুরুষ বিশ্বাত্মক, বিশ্বোত্তীর্ণ নন। অতএব জড়োত্তর অন্তরিক্ষলোকের পরম্পরাও নাই, প্রাণ ও মনের প্রাক্‌সিদ্ধ কোনও সত্তাও নাই অথবা জড়ভূমির 'পরে জড়োত্তর কোনও তত্ত্বের প্রৈষাও নাই।

প্রশ্ন হবে, তাহলে প্রাণ ও মনের স্বরূপ কি ? উত্তরে বলব, তারা জড় ও জড়শক্তির পরিণাম। অচিতি হতে অতিচেতনার অভিমুখে চেতনার উত্ত-

রায়ণের পর্বে-পর্বে তাদের আবির্ভাব ঘটছে। অচিতি ও অতিচিতির মধ্যে চেতনা যেন সেতুর মত। অতিচেতনার স্বরূপজ্যোতিতে সমাহিত হবার পূর্বে চিৎসত্ত্বের অপূর্ণ আত্মসংবিৎই জীবচেতনা। বৃহত্তর প্রাণভূমি ও মনোভূমির সত্তা যদি প্রমাণিতও হয়, তবু তাদের বলব অতিচেতনার পথে অভিযাত্রী তটস্থ-চেতনার কল্পনার বিজৃম্ভণমাত্র।...কিন্তু মুশকিল এই, প্রাণ ও মন জড় হতে স্বরূপত এতই বিভিন্ন যে তাদের জড়ের পরিণাম বলা চলে না। জড় নিজেই যদি শক্তির পরিণাম হয়, তাহলে প্রাণ-মনকেও বলতে হবে সেই শক্তিরই উৎকৃষ্টতর পরিণাম। বিশ্বচিৎএর সত্তা যদি স্বীকার করি, তাহলে এই বিশ্ব-শক্তিকেও চিন্ময়ী না বলে উপায় নাই। তখন প্রাণ-মনও হবে ওই চিৎশক্তির স্ব-তন্ত্র পরিণাম এবং স্বরূপত চিৎসত্তারই আত্মবিভাবনার বীর্য। তাহলে, জড় এবং চিৎ ছাড়া আর-কোনও তত্ত্ব নাই—একথা অযৌক্তিক। আবার, জড় আর চিৎ অন্যোন্যবিরোধী দুটি তত্ত্ব এবং জড় চিদভিব্যক্তির একমাত্র বাহন বলে কেবল এই জড়বিশ্বই সত্য—এসব উক্তিও নিষ্প্রমাণ। জড়কে ভিত্তি করে যেমন চিদ্‌বিভূতির অভিব্যক্তি হয়, তেমনি শুদ্ধপ্রাণ ও শুদ্ধমনকে আশ্রয় করেও-বা হবে না কেন? অতএব, প্রাণলোক কি মনোলোকের সত্তাকে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এমন-কি জড়ের চাইতে সাবলীল এবং প্রসাদধর্মী ভূতসূক্ষ্মের উপাদানে গঠিত সূক্ষ্মলোকের সত্তাও অসম্ভব বলে মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে তখন তিনটি ওতপ্রোত বা অন্যোন্যসম্পৃক্ত প্রশ্নের উদয় হয়। প্রথম প্রশ্ন, জড়োত্তর লোকের অস্তিত্ব বস্তুতই সূচিত হয়, এমন-কোনও প্রমাণ আমরা পেয়েছি কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন, জড়োত্তর লোক থাকলেও তাদের স্বরূপ কি যেমনটি আমরা বলেছি ঠিক তেমন? অর্থাৎ তারা কি জড় আর চিতের মধ্যে আরোহ এবং অবরোহের সোপানমালায় গাঁথা? তৃতীয় প্রশ্ন, ক্রমানুগ হয়েও কি তারা স্ব-তন্ত্র এবং অপৃক্ত, না জড়লোকের সঙ্গে ঊর্ধ্বলোকের কোনও সম্পর্ক ও যোগাযোগ আছে?...বলতে গেলে মানবসৃষ্টির আদিযুগ হতে কিংবা জনপ্রবাদ ও ইতিহাসের জন্মদিন হতে মানুষ অতীন্দ্রিয়লোকের সত্তায় বিশ্বাস করে এসেছে। তাদের শক্তি ও সত্ত্বসমূহের সঙ্গে মানুষের যোগা-যোগ যে সম্ভব, একথা মানতেও তার দ্বিধা হয়নি। কেবল অতিসাম্প্রতিক যুক্তির যুগেই এ-সমস্ত বিশ্বাসকে সুচিরসঞ্চিত কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেবার কথা শুনতে পাই। অতীন্দ্রিয় তথ্যের আভাস বা প্রমাণকে আমরা গোড়া থেকেই অশ্রদ্ধেয় এবং গবেষণার অযোগ্য বলে বিনা বিচারে হাঁকিয়ে দিই, কেননা আমাদের কাছে জড় জড়ের জগৎ এবং জড়াশ্রিত অনুভবই একমাত্র স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সুতরাং জড়বাদের সঙ্গে যার গরমিল, সে-অনুভব আমাদের মতে মিথ্যা হতে বাধ্য। অভৌতিক যা-কিছু ঘটনা, তা হয় অমূলক-ভ্রম বা

প্রবঞ্চনা, নয়তো অতিবিশ্বাসী কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিত্তের আজগুবী কল্পনা মাত্র। তার মধ্যে দৈবাৎ যদি এক-আধটার সত্যতা অতিনিশ্চিত হয়ে ঘাড়ে চাপে, তাহলে তাকে অভৌতিক ব্যাপারের মর্যাদা না দিয়ে তার ভৌতিক ব্যাখ্যা করাই যুক্তিসঙ্গত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক প্রমাণের আমলে না আসা পর্যন্ত কোনও তথাকথিত অভৌতিক ঘটনার সত্যতাকে মানতে আমরা বাধ্য নই। ব্যাপারটা নিতান্তই অভৌতিক এমন লক্ষণ দেখা দিলেও, তাকে ততক্ষণ কোন-মতেই মেনে নেওয়া উচিত নয়, যতক্ষণ সম্ভাবিত সকল প্রকল্প বা জল্পনার দ্বারা তার ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস না হার মানছে।

কিন্তু অভৌতিক ব্যাপারের ভৌতিক ব্যাখ্যার দাবি স্পষ্টতই অযৌক্তিক। বলতে পারি, এও সেই 'ভূত'-গ্রস্ত মনের একধরনের কুসংস্কার, যে-মন শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়বস্তুকে তত্ত্ব বলে মানে এবং তার বাইরে যা-কিছু তাকেই কল্পনার অপবাদ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। অভৌতিক শক্তির আবেশ জড়জগতে সংক্রামিত হয়ে জড়ের স্থূল বিকারেও আত্মপ্রকাশ করতে পারে—এমন-কি স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচর হতেও তার বাধা নাই। কিন্তু এমনতর স্থূল অভি-ব্যক্তি যে তার হবেই, এমন-কোনও আইন নাই কিংবা এ তার স্বভাবও নয়। অভৌতিক শক্তির সুস্পষ্ট ছাপ বা প্রত্যক্ষ পরিণাম সাধারণত দেখা দেয় প্রাণ-সত্ত্বে এবং মনে, কেননা আমাদের আধারে প্রাণ-মনই মূলত সে-শক্তির সগোত্র। প্রাণ-মনের মাধ্যমে কদাচ-কখনও জড়ের জগতে এবং জড়াশ্রিত জীবনে তার পরোক্ষ প্রভাব এসে পড়ে। কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ তার থাকলেও, সে আমাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হবে এবং তার স্থূল বহিরিন্দ্রিয়ের গোচরতা হবে গৌণ। অবশ্য এই গৌণ গোচরতা অযৌক্তিক বা অসম্ভব নয়। সূক্ষ্মদেহ এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে স্থূলদেহ এবং স্থূল ইন্দ্রিয়ের নিবিড় অনুষঙ্গ যদি থাকে, তাহলে অভৌতিক ব্যাপারও আমাদের ভৌতিক অনুভবের আমলে আসতে পারে। আমরা যাকে প্রাতিভদর্শন বলি, এমনটি তার বেলাতেও ঘটে। অনেক অলৌকিক অনুভবেরও ঠিক এই ধারা। বহিরিন্দ্রিয় দিয়েই আমরা কিছু দেখি বা শুনি, অথচ চিত্তে তার অনুরূপ বা প্রতীকী এমন-কোনও ছায়া কি ব্যঞ্জনার বোধ জাগে না, যাতে তাকে আন্তর অনুভবের নিদর্শন বলে মনে করা যেতে পারে। অথবা কখনও-কখনও তাকে কোনও-একটা অব্যক্ত সূক্ষ্মধাতুর রূপায়ণ বলে স্পষ্টই বোঝা যায়। অতএব লোকান্তর যে আছে এবং তার সঙ্গে আমাদের একটা যোগাযোগও আছে, তার একাধিক প্রমাণ দুর্লভ নয়। কখনও তার বিভূতি বহিরিন্দ্রিয়গোচর হয়ে দেখা দেয়, কখনও-বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ে প্রাণে মনে অথবা অধিচেতনার অপ্রাকৃত ভূমিতে যোগজ-সন্নিকর্ষবশত তার প্রত্যক্ষ হয়। আমাদের স্থূল মনই আধারের সবখানি নয়। এমন-কি বহিশ্চেতনার প্রায় সবখানি জুড়ে থাকলেও তাকে আধারের সারাংশ

বলা চলে না। অতএব তত্ত্বজ্ঞানকে একমাত্র বহির্মনের সঙ্কীর্ণ পরিসরের অন্তর্ভুক্ত কিংবা তারি সীমিত ও সুপরিচিত প্রকারদ্বারা বিশেষিত মনে করা অন্যায়।

কেউ বলবেন : সূক্ষ্মদর্শন বা মানস অনুভবকে যাচাই করবার কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি কি মাপকাঠি যখন নাই, অথচ অসাধারণ অলৌকিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপারকে অবিচারে মেনে নেবার একটা প্রবল ঝোঁক আমাদের আছে, তখন এইসব দর্শনকে বিভ্রম বা বঞ্চনা জ্ঞানে এড়িয়ে যাওয়াই কি উচিত নয়? কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু ভুল করা বা ভুল বোঝা যে কেবল আমাদের অন্তর্মানস বা অধিচেতন বৃত্তির একচেটিয়া, তা তো নয়। বহির্মন এবং তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের আদর্শ ও পদ্ধতির মধ্যেও ভুল ঘটবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ভুলের সম্ভাবনা আছে বলেই অনুভবের একটা বৃহৎ ও প্রধান ক্ষেত্রকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে, এ-ই বা কেমন কথা? বরং এইজন্যই তো তাকে বিশেষ করে খুঁটিয়ে দেখে তার তত্ত্বনির্ধারণের নিজস্ব পদ্ধতি এবং সত্যকার মাপকাঠিটি খুঁজে বার করা আরও আবশ্যক। আমাদের প্রত্যক্-চেতনা হল পরাক্-অনুভবের আধার। সেই চেতনার স্থূল বিষয়াকারা বৃত্তিই সপ্রমাণ, আর-সমস্তই অশ্রদ্ধেয়—এও কি সম্ভব? অধিচেতনভূমি নিয়ে ঠিকমত গবেষণা চালাতে পারলে, তার দর্শন যে সত্য দর্শন, তার একাধিক বহিঃসংবাদী প্রমাণও মেলে। এইসব প্রমাণের বলে আমরা যখন অন্তররাজ্যের এবং জড়োত্তর লোক বা ভূমির সন্ধান পাই, তখন তাদের উপেক্ষা করা সংগত কি? অথচ এও সত্য যে, শুধু বিশ্বাসই তত্ত্বের প্রমাপক নয়—বিশ্বাসেরও একটা দৃঢ়তর ভূমি থাকলে তবেই তাকে সত্য বলে মানতে পারি। স্পষ্টই দেখছি, অতীতের বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসার ভিত্তি করা নিরাপদ নয়—যদিও তাদের একেবারে নাকচ করাও চলে না। বিশ্বাস মনের একটা বিকল্প, সুতরাং তার গঠনের ত্রুটি থাকতেও পারে। অনেকসময় বিশ্বাস অন্তর্জগতের কোনও ইশারার বাহন—তখন তার দাম অনেকখানি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের চিরাভ্যস্ত পরাক্-অনুভবের স্থূল ভাষায় তর্জমা করে সে-ইশারার সে বিকার ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে : অধ্যাত্ম লোকসংস্থানকে আমরা প্রাকৃত ভূসংস্থানে পরিণত করেছি। সূক্ষ্মধাতুতে গড়া চেতনার ঊর্ধ্বলোক আছে—এই কথাটা বুঝতে কল্পনা করি দেবলোকের আকাশচুম্বী সাতমহল, অন্তরের শিবকে বসিয়ে দিই বাইরের কৈলাসের চূড়ায়। জড়ের সত্যই হ'ক আর জড়োত্তর সত্যই হ'ক, তার প্রতিষ্ঠা শুধু মনের বিশ্বাসের 'পরে নয়—অন্তরের অনুভবের 'পরে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে সত্যের প্রকারভেদে অনুভবেরও প্রকারভেদ ঘটবে—বিষয়বস্তু স্থূল অধিচেতন বা চিন্ময় হলে অনুভবও হবে তার অনুরূপ। তাদের তাৎপর্য এবং প্রামাণ্যকে খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে বটে,

—কিন্তু করতে হবে ওই ভূমির আইন-কানুন ও সাক্ষী-সাবুদ দিয়ে। যে-ভূমি নিয়ে গবেষণা, চাই তারই অনুরূপ চেতনা। অবরভূমির চেতনা দিয়ে উত্তরভূমিকে যাচাই করবার চেষ্টা ধৃষ্টতা এবং আত্মবঞ্চনা। প্রত্যেক ভূমির উপযোগী চেতনা যদি আমাদের আয়ত্ত হয়, তাহলেই বিজ্ঞানের প্রসার নিঃসংশয় এবং সুপ্রতিষ্ঠ হবে।

মানুষের বিজ্ঞানসাধনার আদিযুগ হতে আজ পর্যন্ত জড়োত্তর ভূমির আভাসে-অনুভবের যে-ইতিহাস মেলে, তার সঙ্গে আমাদের নিজস্ব অনুভব মিলিয়ে লোকান্তরের একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ও ব্যাখ্যা খাড়া করা চলে। তার ফলে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয় যে, আমাদের প্রাকৃত অনুভবের বাইরে সত্তার ও চেতনার আরও বৃহৎ ভূমি আছে এবং মর্ত্যভূমির 'পরে তাদের প্রভাবও সামান্য নয়। পৃথ্বীতত্ত্বের সঙ্কীর্ণ পরিসরে বাঁধা পড়ে শুধু এই মর্ত্যভূমির সীমিত সত্তা ও শক্তিকে আমরা জেনেছি। কিন্তু এ-ই যে আমাদের শেষ নয়, অন্তরের সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ় অনুভবই তার প্রমাণ। এইসব মহা-ভূমি যে আমাদের সত্তা ও চেতনার সীমা ছাড়িয়ে দূরান্তরে আছে, তাও নয়। অবশ্য একটা স্বকীয়তা তাদের আছেই। সত্তার একটা বিশিষ্ট রূপায়ণ এবং অনুভবের বিশিষ্ট ধারাও তাদের আছে। কিন্তু তবু অদৃশ্য আবেশ ও অধি-ষ্ঠানদ্বারা এই মর্ত্যভূমিকে তারা জারিত করে রয়েছে—এর প্রত্যেকটি বস্তু ও ক্রিয়ার পিছনে আছে তাদের অধৃষ্য বীর্যের অনুভাব। জড়োত্তর-সন্নিকর্ষ-জনিত অনুভবের দুটি ধারা : একটি নিতান্তই প্রত্যক্‌বৃত্ত, তবু অত্যন্ত স্পষ্ট—ধরাছোঁয়ার বাইরে নয়; আরেকটি অপেক্ষাকৃত পরাক্‌বৃত্ত। প্রত্যক্‌-অনু-ভবে দেখি, পার্থিবচেতনায় যা আমাদের কাছে মর্ত্যপ্রাণের নিগূঢ় আকৃতি সংবেগ বা ব্যাকৃতিরূপে ফোটে, বাস্তবিক তা উৎসারিত হচ্ছে সাবলীল সিসৃক্ষায় স্পন্দমান এক সূক্ষ্মতর ও বৃহত্তর অব্যাকৃত প্রাণলোক হতে। সেখানকার পূর্বসিদ্ধ শক্তি এবং ভাবরাশিই আমাদের ভিতর দিয়ে এই জড়ের জগতে রূপ ধরতে চাইছে। কিন্তু এখানকার বাধাকে অতিক্রম করে সম্পূর্ণ রূপায়িত হতে তারা পারে না। এমন-কি তাদের এই আংশিক আত্মপ্রকাশও পার্থিবনিয়তির দ্বারা শাসিত ব্যাকৃতি ও পরিবেশের মধ্যেই ঘটে। সূক্ষ্ম-শক্তির এই অবক্ষেপ সাধারণত আমাদের অগোচর। এমন-কি অনেকসময় তার আবেশকে আমাদেরই প্রাণ-মনের বিসৃষ্টি বলে আমরা ভুল করি—যদিও বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বা সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দিয়ে চেষ্টা করেও নিজেকে তার প্রভাব হতে বাঁচাতে পারি না। কিন্তু বহিশ্চেতনার আলোড়ন হতে তটস্থ হয়ে অন্তরের গভীরে যখন তলিয়ে যাই, তখন সূক্ষ্মেন্দ্রিয়ের সুনিবিড় সংবিৎ দিয়ে অনুভব করি সূক্ষ্ম প্রাণলোকের স্বরূপ ও সংবেদন—সাক্ষিরূপে দেখে যাই তাদের গূঢ়শক্তির বিচিত্র প্রবৃত্তি। ইচ্ছামত তাদের গ্রহণ বর্জন বা রূপান্তরসাধন করা,

দেহে প্রাণে চিত্তে বা সঙ্কল্পে তাদের অবাধ সঞ্চরণের অধিকার দেওয়া বা তাদের নিরুদ্ধ করা—এসমস্তই তখন অনায়াস হয়।...এমনি করে অন্তরাবৃত্ত হয়ে সূক্ষ্মতর ও বৃহত্তর মনোলোকেরও সন্ধান পাই—যেখানে চলছে অকল্প্য-বিচিত্র মানস রূপায়ণের অজস্র উচ্ছলন, অপূর্ব সৃষ্টি ও সম্ভোগের নিরঙ্কুশ সাবলীলতা। মর্ত্যপ্রাণের 'পরে সূক্ষ্মলোকের আবেশের মত প্রাকৃতমনের 'পরেও অন্তর্বৃত্ত চেতনাকে শিউরে দিয়ে রহস্যলোকের শক্তির নির্ঝর ঝরে পড়ে। সাধারণত এই মানসলোকের অনুভব হয় প্রত্যক্-বৃত্ত। চেতনায় সে অভিনবের ভাবনা বা ব্যঞ্জনার প্রৈষারূপে ফোটে, চিত্তে আনে ভাবের উন্মাদনা, আধারে সঞ্চারিত করে তীব্রতর ইন্দ্রিয়সংবিতের আকূতি অথবা প্রাণোচ্ছল অনুভব ও কর্মপ্রেরণার বৈদ্যুতী। এই প্রৈষার বেশির ভাগ হয়তো আসে আমাদেরই অধিচেতন ভূমি হতে অথবা এই পৃথিবীর অন্তর্গত বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বমনের শক্তিভাণ্ডার হতে। অথচ তার মধ্যে লোকান্তর হতে উৎসারিত অপার্থিব ধর্মের একটা সুস্পষ্ট ছাপ যে আছে, তাও অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু ইহ-পরলোকের যোগাযোগ এইখানেই শেষ হয়ে যায়নি। অন্তঃসচেতন প্রাণ-মনের কাছে প্রবিবিক্ত অনুভবের এমন-একটা বিপুল রাজ্য খুলে যায়, যেখানে জড়োত্তর ভূমিসমূহ স্বতন্ত্র লোকরূপে আবির্ভূত হয়—শুধু প্রত্যক্-চেতনার অতিদেশরূপে নয়। তখন দেখি, এখানকার মত সেখানকার অনুভবও সংহত, তবে কিনা তাদের সংস্থান প্রবৃত্তি ও রীতি অবশ্য স্বতন্ত্র এবং তাদের আয়তনও অজড় ধাতু দিয়ে গড়া। পৃথিবীর মত সেসব লোকে এমনসব সত্ত্ব আছে, যাদের সাংসিদ্ধিক বা ইচ্ছাকৃত রূপও আছে। স্বভাব-কায় বা নির্মাণ-কায় দুইই গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু তাদের কায়ের উপাদান আমাদের মত নয়—সে আরও সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অজড় রূপময় ধাতু। সাধারণত ভূলোকের সঙ্গে এইসব লোক ও সত্ত্বের সাক্ষাৎভাবে কোনও সম্বন্ধ থাকে না, কিংবা তাদের কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাবও আমাদের জীবনে পড়ে না। কিন্তু অনেকসময় পরম্পরাক্রমে ভূলোকের সঙ্গে নিগূঢ়যোগে যুক্ত হয়ে বিশ্ব-শক্তির বাহন ও অবান্তর সাধনরূপে আমাদের চেতনাকে তারা সুস্পষ্টভাবে আবিষ্টও করে। কখনও-বা পৃথিবীর কাজে-কর্মে লক্ষ্যে বা ঘটনা-স্রোতে আপনাহতেই তারা মাথা গলায় এবং ইষ্টানিষ্টের দায় নিয়ে সুপথে কি বিপথে আমাদের চালনা করে। এমন-কি জড়োত্তর সত্ত্বের অধীন হয়ে কখনও-কখনও আবিষ্টের মত তাদের শুভাশুভ প্রয়োজনসিদ্ধির বাহন হতেও আমাদের আটকায় না। একেকসময় পৃথিবীর প্রগতিসাধনা হয় ওই শুভ বা অশুভ শক্তিসমূহের মহাসংঘর্ষের রঙ্গভূমি। তখন শুভশক্তিরা মানুষের ঊর্ধ্বপরিণামকে বা জড়বিশ্বে জীবচেতনার আত্মস্ফুরণের তপস্যাকে জয়যুক্ত এবং প্রভাস্বর করতে চায়, আর অশুভশক্তিরা তাকে চায় পরাবর্তিত ব্যাহত

নিগৃহীত এমন-কি বিধ্বস্ত করতে। উভয়বিধ শক্তি বা সত্ত্বের মধ্যে যারা জ্যোতির্ময়, মানুষের যারা হিতৈষী এবং মহাবীর্যশালী সহায়, তাদের আমরা বলি দিব্য; আর যারা মাঝে-মাঝে জগতে উস্কিয়ে তোলে কি সৃষ্টি করে একটা প্রলয়ঙ্কর বিপ্লবের উত্তালতা বা প্রবৃত্তির প্রমত্ত তাণ্ডব—যার প্রচণ্ড সংবেগ মানুষের সাধ্যকে ছাড়িয়ে যায়, আমরা তাদের বলি আসুর রাক্ষস বা পৈশাচিক। তাছাড়া আরেকধরনের সত্ত্ব বা শক্তির অনুভব মেলে—যারা ঠিক অপার্থিব নয়, কিন্তু এই ভূলোকেরই অন্তস্তলে অন্তর্গূঢ় হয়ে লুকিয়ে আছে। জড়োত্তরের ছোঁয়া পাওয়ার মত, যারা 'প্রেত' অর্থাৎ পার্থিবশরীর ছেড়ে লোকন্তরিত হয়ে অজড়ভূমিতে পেঁছেছে, তাদের চেতনার সঙ্গে আমাদের চেতনার যোগ ঘটানোও অসম্ভব নয়। এই যোগাযোগ প্রত্যক্-বৃত্ত বা পরাক্-বৃত্ত (অন্তত পরাক্‌কৃত)—দুইই হতে পারে। শুধু মানসযোগ বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ দিয়ে নয়, অধিচেতনার আরও গভীরে ডুবে কখনও-কখনও এইসব সূক্ষ্মলোকে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাদের রহস্য সাক্ষাৎভাবেও কিছু-কিছু জানা যায়। লোকান্তরের এমনিতর কতগুলি বাস্তব অনুভব প্রাচীন যুগে মানুষের কল্পনাকে উত্তেজিত করেছিল। কিন্তু মূঢ় ইতরজনের স্থূল সংস্কার চিরদৃষ্ট প্রাকৃতব্যাপারের সঙ্গে একটা গোত্রসম্পর্ক আবিষ্কার করে তাদের নিরেট বাস্তবতার অযৌক্তিক রূপ দিয়েছে। এতে আশ্চর্য কিছুই নাই, কেননা সব-কিছুকে স্বানুভবের অভ্যস্ত রূপে তর্জমা করা আমাদের মনের ধর্ম।

মোটের উপর, অতীতের সকল যুগেই লোকান্তর সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস ও অনুভবের এই একই ধারা। হয়তো তার নাম-রূপের কিছু-কিছু অদলবদল হয়েছে, কিন্তু সব দেশে এবং সব যুগে অনুভবের চেহারায় বিস্ময়কর একটা সাদৃশ্য আছে। অতীন্দ্রিয় জগৎসম্পর্কে মানুষের এই অনপনেয় বিশ্বাস ও স্তূপাকার অনুভবের সাক্ষ্যকে কী মর্যাদা দেব? শুধু অতর্কিত ঘটনার এলোমেলো ছোঁয়াচ থেকে নয়, একটুখানি অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা হতে এ-সম্বন্ধে খানিকটা অভিজ্ঞতা যে অর্জন করেছে, সে তো এদের কুসংস্কার বা অমূলভ্রম বলে উড়িয়ে দিতে পারেনা। সত্য বলতে এসব ব্যাপার অনেক-সময় এমন বাস্তব ও জীবন্ত, ক্রিয়া এবং ফলের দিক দিয়েও তাদের প্রামাণ্য এমন অনস্বীকার্য যে, তাদের সত্যতার পৌনঃপুনিক দাবিকে কোনমতেই ঠেকিয়ে রাখা চলে না। এ-দিকেও যে আমাদের অনুভবের একটা বিরাট রাজ্য পড়ে আছে, তার গুরুত্বকে স্বীকার করে জড়োত্তর তথ্যের একটা যুক্তি-যুক্ত ব্যাখ্যা দাঁড় করানো আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য।

একটা ব্যাখ্যা এই হতে পারে। লোকান্তর বা পরলোক মানুষের নিজেরই কল্পনার সৃষ্টি। তার ধারণা, মৃত্যুর পরেও সে লোকান্তরে বেঁচে থাকবে।

দেবতারা মানুষের মনগড়া। এমন-কি ঈশ্বরও তার সৃষ্টি, তার অসংস্কৃত চিত্তের একটা বিভ্রম—আজ এতদিন পরে সুসংস্কৃত মানুষ তার কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। চেতনার পরিণামের সঙ্গে-সঙ্গে এমনি করে সে বিচিত্র কল্পনার জাল বুনে চলেছে এবং নিজেরই স্বপ্নকারায় বন্দী হয়ে বাস করছে—কল্পনাকে অবাস্তব বস্তুরূপ দেবার মায়ামন্ত্র জানে বলেই। কিন্তু লোকান্তর তো শুধু কল্পনাই নয়। তাকে ততক্ষণ কল্পনা বলব, যতক্ষণ তার উপস্থাপিত বিষয়কে আমাদের স্বানুভবের এলাকায় আনতে পারব না।...তবু শেষপর্যন্ত তারা হয়তো আকাশকুসুম বা কল্পনাই। হয়তো তাদের দিয়ে সৃষ্ট্যুন্মুখী চিৎশক্তি আপন ভাবসংবেগকে মূর্ত রূপ দেয়। কল্পনার বীর্য মূর্তবিগ্রহে রূপায়িত হয়ে ভূতসূক্ষ্মময় ভাবলোকে হয়তো স্থায়ী হয় এবং সেখানে থেকে কল্পককে আবিষ্ট করে রাখে। লোকান্তরও সম্ভবত এমনিতর কল্পলোকের একটা পরম্পরা। কিন্তু প্রত্যক্‌চেতনার দ্বারা এইধরনের সূক্ষ্মতর সত্ত্ব-ও লোক-সৃষ্টি যদি সম্ভব হয়, তাহলে এই স্থূল জগৎই-বা চেতনার কল্পমায়া হবে না কেন? এমনও হতে পারে, চেতনা নিজেই অনাদি অচিতির একটা অলীক কল্পনা। এমনিতর যুক্তিতে আবার আমরা ফিরে যাই অন্ধতমিস্রায়। এ-জগতের সব-কিছুই তখন অতত্ত্বের করালছায়ায় পান্ডুর হয়ে যায়—তত্ত্বরূপে, অবশিষ্ট থাকে শুধু সর্বপ্রসাবিনী অচিতির উপাদান এবং অবিদ্যার নিমিত্ত। আর খুব সম্ভবত অস্তিত্বের আরেক কোটিতে থাকে অতিচেতন বা অচেতন নৈর্ব্যক্তিক একটা সত্তামাত্র—যার তটস্থস্থিতির নির্বর্ণতায় শেষপর্যন্ত মিলিয়ে যায় বর্ণরাগের যত সমারোহ।

কিন্তু কিছুই যেখানে ছিল না, সেখানে মানুষের মন যে শূন্যে-শূন্যে নিরাধার নিরুপাদান একটা জগৎ সৃষ্টি করতে পারে, একথা নিষ্প্রমাণ এবং অশ্রদ্ধেয়। সৃষ্টিসিদ্ধ জগতের 'পরেই মনের খানিকটা কারিগরি চলতে পারে—এ-ই তো আমরা জানি। মনের শক্তি অসাধারণ—এত অসাধারণ যে, আমাদেরও তা কল্পনার বাইরে। মনের ব্যাকৃতি নিজের কি পরের চেতনায় ও জীবনে বিপর্যয় ঘটাতে পারে, এমন-কি সময়বিশেষে অচেতন জড়কেও পরিচালিত করতে পারে। কিন্তু তাহলেও মহাশূন্যে সৃষ্টির আদিবিক্ষেপ একেবারেই তার সাধ্যাতীত। শুধু এইটুকু বলা চলে, মনের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ সত্তা ও চেতনার অভিনব ভূমির সন্ধান পায়। কিন্তু এইসব ভূমি মনের কাছে আনকোরা নতুন, মনের সৃষ্টি মোটেই তারা নয়—কেননা তাদের সত্তা সর্ব-সতের মধ্যে পূর্বসিদ্ধই ছিল। অন্তর্জগতের অনুভব যত বাড়ে, ততই মানুষ এই আধারেই নতুন-নতুন স্তরের সন্ধান পায়—অন্তশ্চেতনার প্রসারে গ্রন্থিভেদের ফলে পায় লোকোত্তর মহাভূমির আভাস। তাদের দ্বারা প্রভাবিত ও আবিষ্ট হয়ে এই পার্থিব মনে ও অন্তরিন্দ্রিয়েও সে অতীন্দ্রিয়ের

প্রতিচ্ছবি ধরে রাখতে পারে। লোকোত্তর অনুভবের প্রতীক প্রতিচ্ছবি বা ভাববিগ্রহকে সে সৃষ্টি করে বটে, নইলে অপ্রাকৃত অনুভব নিয়ে তার প্রাকৃত মনের কারবার চলতে পারে না। এই অর্থেই বলতে পারি, উপাস্য-দেবতার রূপকল্পনা মনেরই কীর্তি—নিজের মধ্যেই মানুষ নতুন ভূমি ও নতুন জগৎ সৃষ্টি করে, তার ঠাকুরকে সে-ই গড়ে তার স্বাভীষ্ট ভাবের আলো দিয়ে। অথচ এই রূপসৃষ্টি মিথ্যা নয়, কেননা এই কল্প-লোকের ভিতর দিয়ে পার্থিবচেতনায় সত্যলোকের শক্তিপাত ঘটে এবং তার আবেশে চেতনার মর্ত্যস্বভাবে দেখা দেয় জ্যোতির্ময় দিব্য রূপান্তর। যে-লোক থেকে শক্তিপাত হয়, তার বাস্তবতা কিন্তু মনের কল্পনানিরপেক্ষ। বস্তুত সাধনার ফলে এমনি করে অবিদ্যার আবরণ অপসৃত হলে, মর্ত্যজীবের চেতনায় চিন্ময় জগতের সত্যরূপ উন্মাটিত হয় মাত্র—সৃষ্ট হয় না। শক্তি-পাতের প্রবেগে চেতনার যে-রূপান্তর, তা-ই যথার্থ রূপসৃষ্টি। ঊর্ধ্বলোক বস্তুত আমাদেরই সত্তার ঊর্ধ্বভূমি। জড়ধর্মী অচিতির আবরণে তার সঙ্গে পার্থিবচেতনার সত্য সম্পর্ক এতকাল ঢাকা ছিল। এইবার তাকে আবিষ্কার করে এই মর্ত্যভূমিতেই অন্তর্জীবনের প্রসার ঘটানো—একেই বলি আত্মার লোকসৃষ্টি। অচিতির আবরণও মর্ত্য দেহীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন নয়। এ যেন চিৎসত্ত্বের ভ্রূণদশা। আপন বিপুল সম্ভাবনাকে আপাতত আড়ালে রেখে, চিৎশক্তির ঐকান্তিক অভিনিবেশকে এই মর্ত্য জীবনসাধনার আদিকাণ্ডে নিয়োজিত করা—এই তার লক্ষ্য। কিন্তু আদিকাণ্ডের আয়োজন উত্তরকাণ্ডের সিদ্ধিতে তখনই উত্তীর্ণ হবে—যখন প্রাণ-মন-চেতনার ঊর্ধ্বলোক হতে শক্তির স্রোত অচিতির আড়ালকে অন্তত অংশতও ভেঙে ফেলে কি দীর্ণ করে নির্বারিত ধারায় ঝরে পড়বে এই পার্থিব আধারের 'পরে এবং মর্ত্যজীবনের পর্বে-পর্বে তার চিন্ময় ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলবে।

এমনও কল্পনা করা চলে : এইসব ঊর্ধ্বলোকের সৃষ্টি হয়েছে জড়-বিশ্বের আবির্ভাবের পর। হয়তো প্রকৃতিপরিণামের তারা অনুকূল সাধন, নয়তো তর স্বাভাবিক ফল। জড়াসক্ত মনকে জড়োত্তর সত্তার অস্তিত্ব যদি মানতেই হয়, তাহলে তার পক্ষে এই ধারণাই সহজ। কেননা চিরপরিচিত জড়-বিশ্বকেই সে-মন সকল ভাবনা-সাধনার আদি বলে জানে—জড়কে সে বিশ্লেষণ করে খানিকটা হাতের মুঠাতেও এনেছে। প্রকৃতিপরিণামের যে-লীলা তার প্রত্যক্ষ, সে দেখছে জড়বিশ্ব তার রঙ্গপীঠ, অচিতি তার প্রবর্তনার আদিবিন্দু, অতএব অচিতিকে ও জড়জগৎকে সর্বাধার কল্পনা করা তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। বাস্তবিক জড়ের সঙ্গেই আমাদের মনের প্রথম পরিচয়—হাতের কাছে তাকেই জ্ঞানের নিশ্চিত বিষয়রূপে পেয়েছি। সুতরাং জড় ও জড়শক্তিকে আদি-সৎ জেনে, জড়োত্তর চিন্ময় তত্ত্বকে তার আশ্রিত এবং তাতেই

রূঢ়মূল ভাবতে আপত্তি কি ?* কিন্তু জড় হতে তাহলে লোকান্তরের সৃষ্টি হল কিসের শক্তিতে, কোন্ নিমিত্তের প্রযোজনায় ? বলতে পারি : অচিতি হতে যখন প্রাণ-মনের উন্মেষ হল, তখন নিখিল প্রাণীর অধিচেতনাতে তারাই লোকান্তরের এই পরম্পরা ফুটিয়ে তুলল। মানুষের মধ্যে যে-অধিচেতন-পুরুষ গুহশায়ী রয়েছেন, দেহের মৃত্যুতেও তাঁর মরণ হয় না—সুতরাং জীবনমরণব্যাপী তাঁর বিপুল চেতনায় এইসব জগৎ ভেসে ওঠে বলে তাঁর কাছে হয়তো তারা সত্য। অধিচেতনপুরুষই তাহলে লোক হতে লোকান্তরে বিচরণ করেন—বাস্তবতার একটা জন্য অথচ সুনিশ্চিত প্রত্যয় নিয়ে, এবং তাঁর অনুভবকে বহিশ্চেতন পুরুষের মধ্যে বিশ্বাস কি কল্পনার আকারে সঞ্চারিত করেন।...চৈতন্যকে যদি সৃষ্টির একমাত্র প্রবর্তিকা শক্তি মনে করি এবং বিশ্বের সব-কিছুকে যদি চৈতন্যের রূপায়ণ বলে জানি, তাহলে লোকান্তরের এই বিবৃতি অসম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু জড়াসক্ত মনের রায় মেনে তখন আর জড়োত্তর জগৎকে অবাস্তব বা অনতিবাস্তব বলা চলবে না। স্বীকার করতেই হবে, এই জড়ের জগৎ বা প্রাকৃত অনুভবের ভূমি যতখানি সত্য, লোকান্তরও ঠিক ততখানিই সত্য।

জড়সৃষ্টিই আদিসৃষ্টি, তার পরে অচিতির কোনও বৃহত্তর গূঢ়পরিণামের বশে ঊর্ধ্বলোকের উন্মেষ হয়েছে—এই কথাই যদি সত্য হয়, তাহলেও মানতে হবে, কোনও অখিলাত্মা পুরুষের আত্মস্ফুরণের সংবেগেই জড়োত্তরভূমির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। অবশ্য কি করে কি হল, আমরা তা জানি না। শুধু অনুমান করতে পারি, লোকান্তরসৃষ্টি এখানকার প্রকৃতিপরিণামের একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার বা বৃহত্তর বিপাক। জড়ভূমিতে আত্মপ্রকাশ করতে হলে অখিলাত্মার পক্ষে প্রাণ-মন-চেতনার অনায়াস স্ফুরণের জন্য একটা লোকোত্তর পরিবেশ আবশ্যক—যার উদার ভূমি হতে উত্তরশক্তি ও অজড় অনুভবের বীর্যকে জড়ের মধ্যে সঞ্চারিত করে তার ঊর্ধ্বপরিণামকে স্বচ্ছন্দ করা চলে।...কিন্তু লোকান্তরের প্রত্যক্ষ অনুভব এ-সিদ্ধান্তের বাদী হয়ে দাঁড়ায়। অতীন্দ্রিয়দর্শনের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই, জড়বিশ্বকে জড়োত্তর-লোকের প্রতিষ্ঠাভূমি বলা চলে না এইজন্যে যে, সেখানে সত্তার বিপুলতর ব্যাপ্তিতে চেতনার বৃহত্তর ও স্বচ্ছন্দতর লীলায়নে অনুভবের সকল আড়ষ্টতা ঘুচে যায় সহজ-প্রকাশের অনায়াস ছন্দে। তখন মনে হয় না, সূক্ষ্মলোক জড়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, বরং জড়োত্তরকেই মনে হয় জড়জগতের সকল প্রবৃত্তির উৎস—মনে হয় পুরাপুরি না হলেও জড়ের বিবর্তনও ওই জড়োত্তরের আশ্রিত। বাস্তবিক প্রাণ-মনের ঊর্ধ্বস্তর

---

* মনে হয় এ-কল্পনায় ঋগ্বেদের কোনও-কোনও মন্ত্রের সায় আছে। পৃথিবীকে সেখানে বলা হয়েছে বিশ্বভুবনের প্রতিষ্ঠা অথবা সপ্তলোককে বলা হয়েছে পৃথিবীরই সাতটি ভূমি।

হতে, অধিমানস হতে অমিত শক্তি ও বিভূতির প্রচ্ছন্ন প্রবাহ অজস্র ধারায় আমাদের 'পরে ঝরে পড়ছে। কিন্তু পার্থিবচেতনায় তার কয়েকটিকে মাত্র আমরা রূপ দিতে পেরেছি—আর-সমস্তই মূর্ত হবার জন্য যবনিকার অন্তরালে উপযুক্ত কাল ও নিমিত্তের প্রতীক্ষায় স্পন্দিত হচ্ছে। কেননা একথা অনস্বীকার্য যে, পার্থিব*-পরিণামে যখন চিদ্‌বিভূতির অখণ্ড উন্মেষের সূচনা রয়েছে, তখন নিশ্চয়ই ঊর্ধ্বশক্তির নিরঙ্কুশ প্রকাশও তার অঙ্গীভূত।

একবার লোকান্তরের অনুভব পেলে, আমাদের এই প্রাকৃতভূমিকে কিংবা পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে জীবননাট্যের অভিনয়কে একটা মুখ্যস্থান দেবার সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হয়। তখন আর বলতে পারি না, ঈশ্বর আমাদেরই চেতনার কল্পমায়া। বরং অনুভব করি, আমরাই জড়ের আধারে ঈশ্বরচৈতন্যের ক্রমোন্মেষের নিমিত্ত মাত্র। আমাদের কল্পনা দেবলোক গড়েনি; দেবতারা তারই বিভূতি, অথবা আমাদের মধ্যে যে দেবত্বের প্রকাশ, তা এই মর্ত্যভূমিতেই শাশ্বত অমৃতসিদ্ধির অনুদ্‌যাপিত সাধনার ব্যঞ্জনাবহ। তেমনি লোকান্তরও আমাদের সৃষ্টি নয়; বরং তারাই আমাদের বাহন করে এই মর্ত্যভূমিতে ফুটিয়ে তুলছে তাদের ভাস্বতী শ্রী ও শক্তিকে—প্রাকৃত শক্তির সাধ্য ও কল্পনার অনুরূপে। দিব্য প্রাণলোকের আবেশেই পৃথিবীতে আমাদের পরিচিত প্রাণের উন্মেষ ও রূপায়ণ। কিন্তু সে-আবেশ তো জড়ত্বের বর্তমান কুণ্ঠা ও অশক্তি হতে মর্ত্য আধারকে নির্মুক্ত করে স্তব্ধ হয়ে যায়নি—এখনও আমাদের মধ্যে তার নির্বারিত প্রাণোচ্ছ্বাসকে প্রস্ফুরিত করবার তপস্যা চলছে। এমনি করে মনোলোকের অবন্ধ্য আবেশে এখানে মনের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়েছে। তারপর তার প্রেতিতে আমাদের মধ্যে জেগেছে মনের উদয়ন ও প্রসারণের উদ্যত আকূতি—আমাদের ধীশক্তিকে নিত্য প্রচোদিত করে জড়ত্বের মধ্যে কুণ্ডলিত স্থূল মননের কারাপ্রাচীরকে ভেঙে ফেলবার এসেছে দুর্বার আহ্বান। আবার অতিমানস ও চিন্ময় লোকের প্রৈষাই এখানে চিদ্‌বীর্যের নিরঙ্কুশ স্ফুরণের আয়োজন করছে—এই পার্থিবচেতনাতে ধীরে-ধীরে উন্মুক্ত হচ্ছে জ্যোতির দুয়ার, এই মর্ত্য-আধারই অতিচেতনার দিব্য সোমরসকে ধারণা করবার যোগ্যতা লাভ করছে তিলে-তিলে। আপাত-অচিতি হতে আমাদের জীবনের যাত্রা শুরু—কিন্তু অতিমানসের ওই সংস্পর্শ এবং সংবেগই তার বুক আলো করে ফুটিয়ে তুলবে সর্বচিৎ অমৃতত্বের অন্তর্গূঢ় সংবিৎ। বিশ্বব্যাপী এই চিৎপরিণামের নিমিত্ত বা বাহন হল মানুষের চেতনা। অচিতি হতে চিজ্‌জ্যোতি ও চিদ্‌বীর্যের উদয়নের এই বিন্দুতেই প্রমুক্তির ধ্রুবজ্যোতির ইশারা দেখা

---

* অবশ্য 'পার্থিব' বলতে আমরা আমাদের এই অচিরায়ুষ্মতী পৃথিবীকে লক্ষ্য করছি না—বলছি বৈদান্তিক পৃথিবী বা পৃথ্বীতত্ত্বের কথা, যা জীবাত্মার জড়বিগ্রহের আবাসভূমি সৃষ্টি করে।

দিয়েছে। এইখানেই মনুষ্যচেতনার বিপুল সার্থকতা, কেননা প্রকৃতিপরিণামের পরমা-সিদ্ধিতে মনুষ্যত্বের উন্মেষ যে একান্ত অপরিহার্য একটা পর্ব—তার পরিচয় এইখানেই।

কিন্তু একটা কথা আছে। অধিচেতনভূমির কোনও-কোনও অনুভব হতে প্রশ্ন ওঠে : লোকান্তরসমূহ কি সর্বতোভাবে জড়সৃষ্টির প্রাগ্‌ভাবী ? এ-আশঙ্কার দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, মরণোত্তর অনুভব সম্পর্কে একটা কথা আবহমান চলে এসেছে যে, মৃত্যুর পরে অন্তত কিছুকাল ধরে জড়োত্তর ভূমিতেও এখানকার পরিবেশ প্রকৃতি ও অনুভবের অনুবৃত্তি চলতে থাকে। দ্বিতীয়ত, প্রাণলোকে এমন কতগুলি ব্যাকৃতির সন্ধান মেলে, যারা ভূলোকের অবরপ্রবৃত্তির অনুরূপ। যে অসত্য অনর্থ অশক্তি ও তামসিকতাকে স্থূল অচিতি পরিণামের ফল বলে জানি, প্রাণলোকের নিম্নস্তরেও তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই। এমন-কি যেসমস্ত অপশক্তি মানুষের জীবনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে, প্রাণলোকেই দেখি তাদের স্বাভাবিক নিবাসভূমি। ব্যাপারটা অসঙ্গতও নয়। কেননা প্রাণময় সত্তাকে আশ্রয় করেই তারা আমাদের বিক্ষুব্ধ করে, অতএব কোনও বৃহত্তর ও বীর্যবত্তর প্রাণসত্তার বিভূতি হওয়া তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রকৃতিপরিণামের মধ্যে মন ও প্রাণের অবসর্পণেই যে সত্তা ও চেতনার সঙ্কোচজনিত এই অবাঞ্ছনীয় বিকার দেখা দিয়েছে, তাও বলতে পারি না। কারণ অবসর্পণের স্বধর্ম হল বিদ্যার সঙ্কোচসাধন। তার ফলে সৎ-চিৎ-আনন্দের স্ফূর্তি সত্য-শিব-সুন্দরেরই সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে ঘটবে, বৃহৎসামের অকুণ্ঠ ঐশ্বর্য তাতে না থাকলেও অন্তত বেসুরা কিছুই থাকবে না—এটুকু আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি। আলোর মেলা ক্ষীণপ্রভ হ'ক, কিন্তু অনর্থ ও সন্তাপের আঁধার তাকে ছেয়ে ফেলবে কেন ? সূক্ষ্মপ্রাণ ও সূক্ষ্মমনের লোকে এইধরনের বিরুদ্ধশক্তির প্রকাশ ব্যাপক না হ'ক, অংশত স্ব-তন্ত্র হলেও সিদ্ধান্ত করতে হবে—দুটি কারণে এ-ব্যাপার সম্ভব হয়েছে। হয় ঊর্ধ্বলোকে অশিবের প্রতিষ্ঠা প্রকৃতির অবরপরিণামের একটা উৎক্ষেপ—অধিচেতন প্রকৃতির গহনে অশিবশক্তির প্রচ্ছন্ন সঞ্চয় একটা প্রবল উচ্ছ্বাসে ছাড়া পেয়েছে ওই ভূমিতে। নয়তো চেতনার অবরোহক্রমের পাশাপাশি একটা আরোহক্রমের অঙ্গরূপে পূর্ব হতেই ঊর্ধ্বলোকে তাদের আবির্ভাব ঘটেছে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত মানলে বলতে হবে, আরোহক্রমদ্বারা দুটি প্রয়োজন সিদ্ধ হচ্ছে। প্রকৃতি-স্থ পুরুষের চিন্ময় পরিণামের অনুষঙ্গে মর্ত্যের বুকে যে-সংঘর্ষ অপরিহার্য, সেই সম্ভাবিত সংঘর্ষই শিব এবং অশিবের জনক। আরোহক্রমে যদি এই শিব-অশিবের একটা পূর্ণায়তন প্রাক্তন প্রকাশ ঘটে, তাহলে একদিকে তাদের স্ব-তন্ত্র স্বভাবস্থিতিতে দেখা দেয় বিশ্ববিধানের একটা বিশেষ চরিতার্থতা—কেননা বিসৃষ্টির যে-কোনও ধারাতে আছে পরিপূর্ণ

আত্মপ্রকাশ ও নিরঙ্কুশ আত্মতর্পণের দুর্নিবার সংবেগ। সেইসঙ্গে ঊর্ধ্ব-লোকে প্রতিষ্ঠিত থেকে শিব-অশিব দুটি শক্তিই ঊর্ধ্বপরিণামী ভূতগ্রামের 'পরে তাদেরও বিশিষ্ট প্রভাব সঞ্চারিত করে।

এমনি করে প্রাণভূমির ঊর্ধ্বস্তরে নিহিত থাকে এই পার্থিবজীবনেরই আরও জ্যোতির্ময় এবং আরও তমোময় রূপবিভূতির বিপুল সঞ্চয়। সেখানকার পরিবেশ অব্যাহত প্রকাশের অনুকূল বলে তাদের স্ব-তন্ত্র স্ফুরণে কোনও বাধা থাকে না। পরিণাম সু বা কু যা-ই হ'ক্, তাদের জাতি-ধর্মের রূপায়ণে দেখা দেয় একটা নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাভাবিক পূর্ণতা—এমন-কি একটা ছন্দ-সুষমাও। আমাদের প্রাকৃতভূমিতে তাদের এমনতর অবিমিশ্র পূর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ সম্ভব নয়—কেননা এখানে চরম সমন্বয় ও সমাহরণের সুদূর আদর্শকে লক্ষ্য করে যে বহুমুখী পরিণামের তপস্যা চলছে, তার জন্যে ব্যামিশ্র শক্তির বিচিত্র সংঘাত আবশ্যক। আমরা যাদের সু বা কু মনে করি, ঊর্ধ্বলোকে তাদের বেলায় সে-সংজ্ঞা খাটে কিনা সন্দেহ। এখানে যাকে অসত্য অশিব বা তামসিক ভাবছি, ওখানে তারও একটা স্বরূপসত্য এবং স্বয়ং-সিদ্ধ সত্তা আছে। অতএব বিশিষ্ট জাতি-ধর্মের অভিব্যক্তিতেই তার পূর্ণ তৃপ্তি, কেননা ঊর্ধ্বলোকে সে-ধর্মের প্রকাশ অব্যাহত। স্বধর্মের অব্যাহত প্রকাশ স্বভাবতই আনে সিদ্ধিনীশক্তির একটা অবারিত উল্লাস—পরিবেশের সঙ্গে আত্মস্বরূপের একটা পরিপূর্ণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য। অশিবের মধ্যেও আছে আত্মচেতনার একটা ছন্দ, আত্মবীর্যের একটা মহিমা, আত্মস্বরূপের একটা আনন্দ। তার অসপত্ন সম্ভোগ আমাদের কাছে হেয় হলেও তার কাছে নিশ্চয়ই তা উপাদেয়। পার্থিবপ্রকৃতির পরিবেশে যে-প্রাণসংবেগ অসাধারণ অপ্রমেয় প্রতীপচারী বা অনৈসর্গিক, আপন ধামে সে-ও পায় স্বারাজ্যসিদ্ধির অথবা জাতি-ধর্মের নিরঙ্কুশ লীলায়নের অবাধ অবকাশ। আমরা যাকে দিব্য আসুরিক রাক্ষস বা পৈশাচিক আখ্যা দিই, আমাদের দৃষ্টিতে অতিপ্রাকৃত হলেও আপন-আপন অধিকারে তারা নিতান্তই স্বাভাবিক। এইসব উৎকট ভাব যাদের মধ্যে মূর্ত হয়েছে, তারা কিন্তু তাহতে স্বভাবের আনন্দ পায়, স্বরূপের সৌষম্যই আস্বাদন করে। এমন-কি বৈষম্য আয়াস অশক্তি বা সন্তাপের মধ্যেও প্রাণের একটা রসায়ন আছে, যাহতে বঞ্চিত হলে অচরিতার্থতার বেদনায় সে হৃতবীর্য হয়। প্রাণের গহনলোকে এইসব অলৌকিক শক্তির অবাধ অধিকার, সেইখানে তারা আপনমনে তাদের জীবনসৌধ গড়ে চলেছে। ওই পাতালপুরীতে অবগাহন করে যখন তাদের নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তির পরিচয় পাই, তখন বুঝি কোন্ উৎস হতে কিসের প্রয়োজনে তারা উৎসারিত, কেন মানুষের জীবনকে তারা জড়িয়ে আছে—আপন অপূর্ণতার প্রতি কেনই-বা মানুষের এত আসক্তি, সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্য জয়-পরাজয় হাসি-অশ্রুর দ্বন্দ্বে বিকল এই

জীবননাট্যের মাঝে কী রস সে পেয়েছে! পৃথিবীতে এইসব শক্তির প্রকাশ ব্যাহত, অতৃপ্তিবিধুর, সংঘর্ষ ও ব্যামিশ্রতার ঘোরে আচ্ছন্নপ্রায়। কিন্তু স্বধামের একান্তবিবিক্ত পরিবেশের মধ্যে ফোটে তাদের স্বভাব ও আত্মবীর্যের পরিপূর্ণ মহিমা এবং তাহতে অন্তর্দৃষ্টির কাছে তাদের নিগূঢ় তত্ত্ব ও প্রয়োজনের সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। মানুষের স্বর্গ-নরক বা জ্যোতির্লোক ও অসূর্যলোকের ছবিতে অবাস্তব কল্পনার যত খাদই মেশানো থাক্, তার আসল ভিত্তি কিন্তু এইসব দৈবী বা দানবী শক্তির স্বপ্রতিষ্ঠ অবিকৃত স্বরূপের প্রত্যক্ষ অনুভবে। অমর্ত্যজীবনের পারান্তর হতে এই জীবনের 'পরে ঝরছে তাদের শক্তির ধারা এবং তাইতে মানুষের মধ্যে আবর্তিত হয়ে চলেছে ঊর্ধ্বপরিণামের নিরন্ত প্রবাহ।

প্রাকৃতপ্রাণের বিভূতি যেমন বৃহত্তর প্রাণের লোকোত্তর ভূমিতে পূর্ণমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তেমনি মনের বিভূতিও বৃহত্তর মানসলোকে পেয়েছে আপন স্ব-ভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশের অখণ্ড অধিকার। মনের তত্ত্ব ও ভাবনা আমাদের পার্থিবচেতনাকে নিরন্তর আবিষ্ট রাখলেও তাদের রূপায়ণ হয় খণ্ডিত, কেননা বিভিন্ন শক্তি ও তত্ত্বের সংঘাত ও সংমিশ্রণের ফলে এখানে তারা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পায় না। এই সংঘাত ও সংমিশ্রণ তাদের পূর্ণতাকে বিকল করে, বিশুদ্ধ স্বভাবকে আবিল করে, শক্তিসংক্রমণকে করে বিকৃত এবং ব্যাহত। বস্তুত জড়োত্তর লোকসমূহ নিত্যসিদ্ধ—মর্ত্যলোকের মত তারা সাধ্য এবং পরিণামী নয়। চিৎশক্তির সংবৃত্তিপরিণামের সঙ্গে-সঙ্গে যেসব তত্ত্বের উদ্ভব হয়, এরা যেমন তাদের আধার—তেমনি বিবৃত্তিপরিণামের সংঘাতে যেসব বিচিত্র-শক্তির আবির্ভাব ঘটে, তাদেরও আশ্রয় এরাই। তারা এই উভয়-বিধ বিসৃষ্টির স্ব-ভাবস্থিতি ও নিরঙ্কুশ স্বারাজ্যসিদ্ধির ক্ষেত্র। প্রতিষ্ঠার এই নিত্যভূমি হতে তাদের প্রভাব ও প্রবৃত্তি বীজরূপে প্রকৃতিপরিণামের বিচিত্র-জটিল ধারায় নিক্ষিপ্ত হয়। লোকান্তরের অস্তিত্বের একমাত্র হেতু না হলেও একে বলতে পারি তার অন্যতম হেতু।

এইদিক থেকে দেখি, পরলোকসম্পর্কিত লোকাতত বিবৃতির মধ্যে প্রাকৃত-প্রাণের অসিদ্ধি সঙ্কোচ ও অপূর্ণতা হতে নির্মুক্ত উদার প্রাণময় পরিবেশের প্রতি একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। এসব বিবরণে প্রচুর কল্পনার খাদ আছে, কিন্তু বোধি ও প্রাতিভজ্ঞানের সোনাও যে নাই তা নয়। কোনও-না-কোনও ভূমিতে নির্মুক্ত প্রাণের সিদ্ধ অথবা সাধ্য রূপ যে আছে, এ-অনুভবের পরিচয় যেমন এদের মধ্যে পাই, তেমনি পাই অধিচেতনভূমির সত্যকার অভিজ্ঞতারও কিছু-কিছু নিদর্শন। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য ভূমি হতে যা-কিছুর দর্শন ও স্পর্শন মানুষ পায়, তাকেই সে পার্থিবচেতনার ভাষায় রূপান্তরিত করে। জড়োত্তর তত্ত্বকে জড়ের রূপে ও বিগ্রহে তর্জমা করে তাদের ভিতর দিয়ে আবার

সে তত্ত্বভাবের সংস্পর্শ পায় এবং তাকে খানিকটা মূর্ত এবং সার্থকও করে তোলে। মৃত্যুর পরেও যে প্রকারান্তরে এই পার্থিবজীবনের অনুবৃত্তি চলে—এ-অনুভবের মূলে এমনিতর তর্জমার একটা কারসাজি আছে। অথবা একে কতকটা বিদেহীর মানসসৃষ্টিও বলা যেতে পারে, কেননা মৃত্যুর পর লোকান্তরের তত্ত্বভাবে অনুপ্রবিষ্ট হবার পূর্বে পার্থিবজীবনের অভ্যস্ত অনুভবের সংস্কারকে কিছুকাল সে আঁকড়ে থাকে। কিংবা ইহলোক আর পরলোকের সন্ধিস্থলে এ শুধু তার বিশ্রামভূমি। লোকান্তরের যে-ভাব মর্ত্যজীবনে তাকে আকৃষ্ট করেছিল, প্রাণলোকের এই উপান্তভূমিতে তার সিদ্ধরূপের সন্ধান পেয়ে প্রাণপুরুষ হয়তো তার স্বাভাবিক আকর্ষণে এইখানে কিছুকাল অতিবাহিত করে। অবশ্য এসমস্তই সূক্ষ্মপ্রাণের ভূমি। কিন্তু পারলৌকিক শাস্ত্রে এছাড়াও অন্যান্য ভূমির কথা আছে, যদিও লোকাতত বিবৃতিতে তাদের কোনও উল্লেখ নাই। স্পষ্টই বোঝা যায়, এসব মনোময় কিংবা চিদাভাসিত-মনোময় ভূমির বর্ণনা—প্রাণভূমির নয়। অন্তরাবৃত্ত চেতনায় এসব ভূমিতে আরোহণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। অতএব বিশ্ববিসৃষ্টিতে আমরা যে লোকপরম্পরার অস্তিত্বের কথা বলছি, তা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু এই পরম্পরার বিবৃতি সবার বেলায় অবিকল এক নাও হতে পারে—কেননা অধ্যাত্মদৃষ্টির ভেদে অনুভবের ভেদ হওয়া যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সঙ্গতও। একটা বিশিষ্ট ভূমি হতে বিশিষ্ট পদ্ধতিতে কোনও বিষয়ের একধরনের বর্গীকরণকে যেমন প্রামাণিক বলতে পারি, তেমনি আরেক ভূমি হতে আরেক ধরনের বর্গীকরণকেই বা প্রামাণিক বলব না কেন ? লোকসংস্থানকে আমরা যে-দৃষ্টিতে দেখছি, তার সবচাইতে বড় সার্থকতা এই যে, এ-দৃষ্টি বিশ্বতত্ত্বের একেবারে মূলঘেঁষা এবং তাতে বিশ্বসৃষ্টির এমন-একটি তত্ত্ব রূপায়িত হয়েছে যা আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আলম্বন। এই দৃষ্টিতে আত্মপ্রকৃতির তত্ত্ব এবং বিশ্বপ্রকৃতির সংবৃত্তি ও বিবৃত্তির যুগলধারার পরিচয় দুইই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে এও বুঝতে পারি, লোকান্তরসমূহ জড়বিশ্ব ও পার্থিবপ্রকৃতি হতে বিযুক্ত কি বিবিক্ত তো নয়ই, বরং তাদের প্রভাব আ-বৃত এবং অনুবিদ্ধ করে আছে জড়ের জগৎকে। আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করতে না পারলেও তাদের নিগূঢ় শক্তি অলক্ষ্যে মর্ত্যের পরিণামকে রূপায়িত এবং নিয়মিত করছে। তাদের অন্তর্গূঢ় প্রভাবের স্বরূপ এবং প্রবৃত্তির কি ধারা, তা বোঝবার জন্যই লোকান্তরের জ্ঞান এবং অনুভবকে একটা বৈজ্ঞানিক কাঠামোর মধ্যে ফেলা দরকার।

পার্থিবপ্রকৃতির আশ্রিত হলেও আমাদের চিন্ময়-পরিণামের অধিকার যে সুদূরবিস্তৃত, এই সম্ভাবনাকে সার্থক করবার জন্যই লোকান্তরের অস্তিত্ব এবং প্রভাবের জ্ঞান আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। জড়বিশ্বই যদি অনন্ত-

সন্মাত্রের আত্মবিসৃষ্টির একমাত্র ক্ষেত্র হত, তাহলে বাধ্য হয়ে বলতে হত—জড় হতে চিৎ পর্যন্ত তার সমস্ত বিভূতির পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটছে একমাত্র এই মর্ত্যভূমিতে এবং তার জন্যে জড়ে অন্তর্গূঢ় অতিচেতনার আবেশ ছাড়া আর কোনও-কিছুর আবেশ বা আনুকূল্য নিষ্প্রয়োজন। কেননা, আপাত-অচেতন জড়শক্তিই যখন বিশ্বব্যাপারের আদি প্রবর্তক এবং আনন্ত্যের সকল বিভূতি তার মধ্যেই অন্তর্গূঢ় হয়ে আছে, তখন অচিতি এবং অতিচিতি ছাড়া আর-কোনও তত্ত্বকে স্বীকার করা কল্পনাগৌরব মাত্র। দার্শনিকের দৃষ্টিতে জড়তত্ত্বই তখন হবে বিশ্বসংস্থানের ভিত্তি এবং বিসৃষ্টির সকল বিভূতির পূর্ব্য নিমিত্ত ও উপাদান। হয়তো বিশ্বপরিণামের শেষ পর্বে চিৎসত্তা আপন স্বাতন্ত্র্য খানিকটা ফিরে পাবে। হয়তো-বা জড়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেও, তাকে সে আপন অনুত্তম স্বরূপবিভূতির অনতিবাধিত প্রকাশের সাবলীল সাধনরূপে অনেকখানিই রূপান্তরিত করবে। এখনকার মত চিৎপ্রবৃত্তির প্রতিকূল জড়ত্বের আড়ষ্ট বাধা তখন এমন দুরপনেয় থাকবে না। কিন্তু তবু জড় ছাড়া চিৎসত্তার আত্মবিসৃষ্টির আর-কোনও ক্ষেত্র থাকবে না। যতই সে উপরপানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক, তবু তার শিকড় থাকবে মাটির বুকে, জড়ের অনুষঙ্গকে ছাড়িয়ে আত্মপ্রকাশের একটা নতুন ধারা অবলম্বন করা কিছুতেই তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এমন-কি জড়ের মধ্যে থেকেও, তাকে ছাপিয়ে আত্মবিভূতির কোনও-একটি বৈশিষ্ট্যকে যে সে স্বরাট করে তুলবে, তাও চলবে না। একমাত্র জড়ই শেষপর্যন্ত থাকবে সমস্ত চিদ্‌বিভূতির একচ্ছত্র নিয়ামক। প্রাণ তখন আর জড়ের শাস্তা ও নিয়ন্তা হবে না, মনের কর্তৃত্ব স্রষ্টৃত্বের স্বাতন্ত্র্য থাকবে না —কেননা জড়ের সামর্থ্যদ্বারাই তাদের সকল সামর্থ্য সীমিত হবে। জড়শক্তির খানিকটা অদলবদল বা সম্প্রসারণ তারা করতে পারবে, কিন্তু তার আমূল রূপান্তর ঘটাতে বা জড়োত্তরের মাঝে তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। এক-কথায়, জড়ের তমঃশক্তির পরিবেশে সত্তার সকল বিভূতি চিরকাল আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে—কোনকালেই কারও স্বচ্ছন্দ বা অব্যাহত প্রকাশ ঘটবে না; প্রাণ মন বা চিৎ কারও স্ব-ধাম বা স্ব-ভাব বলতে কিছুই থাকবে না।...কিন্তু চিৎসত্তা যদি সৃষ্টির প্রবর্তক হয় এবং প্রাণ-মন যদি জড়শক্তির পরিণাম বা বিভূতি না হয়ে স্ব-তন্ত্র কোনও তত্ত্ব হয়, তাহলে চিৎস্বভাব ও চিদ্‌বিভূতির এই আত্ম-সঙ্কোচ যে অনুত্তরণীয় হবে—একথা বিশ্বাস করা সহজ নয়।

অনন্ত সন্মাত্র চিৎশক্তির লীলায়নে নিরঙ্কুশ হন যদি, তাহলে আত্ম-বিভাবনার গোড়াতে তাঁকে জড়ত্বের অচিতিতে আত্মসংবরণ যে করতেই হবে—এমন-কোনও বিধি থাকতে পারে না। বরং লোকসংস্থানের এমন বিসৃষ্টিও সম্ভব তাঁর পক্ষে, যার মধ্যে চিৎসত্তার অন্বয়স্বভাবই সর্বপ্রবর্তক ও সর্বযোনি, আত্মসংবিতের চিন্ময় পরিস্পন্দে যেখানে ফুটছে শক্তির বিলাস, নাম-রূপের

বৈচিত্র্য যেখানে অদ্বয় চিদানন্দেরই স্বরূপবিভূতি।...অথবা এমন লোক-সৃষ্টিও তিনি করতে পারেন, যেখানে তাঁর অকুণ্ঠিত চিৎশক্তি বা সত্যসঙ্কল্প আত্মরূপায়ণের স্বাতন্ত্র্যকে অপরোক্ষ আত্মবিসৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসে অনুভব করবে—জড়ের মধ্যে প্রাণের সিসৃক্ষার মত তা ব্যাহত কুণ্ঠিত ও মন্থর হবে না। সেখানে নিরঙ্কুশ আত্মরূপায়ণ হবে বিসৃষ্টির আদি প্রবর্তক এবং তার অকুণ্ঠ আনন্দময় প্রবৃত্তির চরম লক্ষ্য।...অথবা তাঁর সিসৃক্ষা সার্থক হবে এমন লোকের আবির্ভাবে, যেখানে অন্তহীন স্বরূপানন্দের নিরঙ্কুশ অন্যোন্য-সম্ভোগ একমাত্র লক্ষ্য। সে-লোকে চিদ্‌ঘন বহুর আবির্ভাব হবে—অথচ অন্তর্গূঢ় শাশ্বত একত্বের সম্পর্কে যেমন তারা সচেতন থাকবে, তেমনি তাদের সদ্যঃস্থিতির প্রতিটি মুহূর্ত থাকবে অদ্বৈতভাবনার আনন্দে নিত্যবাসিত। সে-লোকে আনন্দের স্বয়ম্ভূ উল্লাস হবে মূল তত্ত্ব এবং লীলার সার্বভৌম প্রযোজক।...অথবা এমন লোকেরও আবির্ভাব হতে পারে, যেখানে অতিমানস হবে আদিম তত্ত্ব। সেখানে অভেদে ভেদের বিচিত্র আনন্দরসায়নে সার্থক হবে চিন্ময় ভূতগ্রামের দিব্য ব্যক্তিভাবনার জ্যোতির্ময় স্বাতন্ত্র্যের লীলা।

বিসৃষ্টির ধারা যে এইখানে এসেই ফুরিয়ে যাবে, তা নয়। পার্থিব-ভূমিতে দেখছি, জড়াশ্রিত প্রাণের দ্বারা মনের স্বাতন্ত্র্য কুণ্ঠিত হয়েছে—প্রাণ ও জড়ের বিভিন্নমুখী বাধাকে কিছুতেই সে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। প্রাণও তেমনি সঙ্কুচিত হয়ে আছে জড়শক্তির পরিণামরূপী মৃত্যু অসাড়তা ও অস্থৈর্যের বৈকল্যদ্বারা। অথচ এমন লোক নিশ্চয়ই থাকতে পারে, যেখানে গোড়া হতেই প্রাণের বৈকল্য বা জড়ের বাধা দিয়ে সৃষ্টির পত্তন করা হয়নি। সে-লোকে মনই সর্বনিয়ন্তা, মনোধাতুকে বা জড়ধাতুকে আপন জগতের সাবলীল উপাদানরূপে ব্যবহার করতে তার কোনই বাধা নাই, অথবা জড় সেখানে স্পষ্টত বিশ্বমনের প্রাণরূপে আত্মরূপায়ণের পরিণামমাত্র। বস্তুত মর্ত্যভূমিতেও এই হল মনের নিগূঢ় পরিচয়। কিন্তু বহুকাল ধরে অবচেতনার কবলিত থেকে মন যেন কেমন অসাড় হয়ে যায়। তাই জড়ের বাঁধন হতে মুক্তি পেয়েও সে স্বরাট্‌ হতে পারে না—আধারের আড়ষ্টতা তাকে যেন পাকে-পাকে জড়িয়ে থাকে। অথচ শুদ্ধমনের লোকে সে স্বরাট্‌। সে-জগতের উপাদানও তার আপন বশে, কেননা জড়ধর্মী স্থূলজগতের উপাদানের চেয়ে সে-উপাদান অনেক সূক্ষ্ম ও সাবলীল।...তেমনি বিশুদ্ধ প্রাণলোকও থাকতে পারে। প্রাণ সেখানে স্বরাট্‌ বলে তার স্বচ্ছন্দ সাবলীল বিচিত্র বাসনা ও প্রবৃত্তির অকুণ্ঠিত প্রকাশে কোনও বাধা নাই, কেননা বিরুদ্ধশক্তির আঘাতে প্রতিমুহূর্তে ভেঙে পড়বার আশঙ্কা তার নাই। এইজন্যই তার সকল শক্তি শুধু আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাতেই ব্যয়িত হয় না কিংবা কেবল টানা-হেঁচড়ার ঝামেলায় পড়ে তার সিসৃক্ষা আত্মতর্পণ ও নবায়নের উদ্যত আকৃতিকে খর্ব রাখতে হয় না।...এমনি করে সৎ চিৎ আনন্দ

অতিমানস মন ও প্রাণ প্রত্যেকটি তত্ত্বই স্ব-তন্ত্রভাবে লোকসৃষ্টির প্রবর্তক হতে পারে—অসীমের আত্মরূপায়ণের বৈচিত্র্যে এ-সম্ভাবনা নিরূঢ় হয়ে আছে। শুধু একটি কথা মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটি বিভূতি স্বরূপত এক, কিন্তু তাদের লীলায়নের বীর্য এবং রীতি প্রতি ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র।

লোকান্তরের পরিকল্পনা যদি দার্শনিক মনের একটা বিকল্প অথবা সচ্চিদানন্দের এমন-একটা কল্পবীজ হত—যা আজও প্ররূঢ় বা রূপায়িত হয়নি কিংবা কোনকালে হবেও না, অথবা হলেও মর্ত্যলোকের জীবচেতনায় কখনও তার আভাস ফুটবে না, তাহলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু আমাদের চিন্ময় অতীন্দ্রিয় অনুভবের অনুকূল সাক্ষ্য অবিরাম বহন করে আনছে ঊর্ধ্বলোকের অবন্ধ্য ভূমির অবিচ্ছেদ এবং তত্ত্বত-অবিকল্পিত প্রত্যয়ের পরম্পরা। আধুনিক যুগে আমরা জড়ের শাসনকে শিরোধার্য করে নিয়েছি। জড় ইন্দ্রিয়ের ভিত্তিতে যে-অনুভব, একমাত্র তারই প্রামাণ্য আছে, বুদ্ধি সত্যনিরূপণ করতে পারে শুধু জড়ের অনুভবকে যাচাই করে, জড়ের সত্তাও অনুভবের বাইরে যা-কিছু তা শুধু প্রমাদ আত্মবঞ্চনা বা অলীক বিভ্রম মাত্র—এই হল আমাদের লোকাতত মত। কিন্তু এ-মতের প্রামাণ্যকে সবার উপরে স্থান দিতে আমরা বাধ্য নই। অতএব অতীন্দ্রিয় অনুভবের সাক্ষ্য মেনে জড়োত্তর ভূমির সত্তাকে স্বীকার করতে আমাদের কোনও বাধা নাই। বস্তুত পার্থিবলোকের ছন্দ হতে এসমস্ত ঊর্ধ্বলোকের ছন্দ আলাদা। এদের সম্পর্কে আমরা সাধারণত 'ভূমি' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। তাতেই বোঝা যায়, লোকান্তরের এক-একটি পর্ব সত্তারই এক-একটি পৃথক স্তর এবং প্রত্যেক স্তরে তত্ত্বের বিন্যাসের রীতিও স্বতন্ত্র। এখানকার দেশ-কালের সঙ্গে তাদের কোনও সঙ্গতি আছে, না দেশের সংস্থান ও কালের প্রবাহ তাদের বেলায় অন্যরকম—আপাতত তা নিয়ে আমাদের আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাই। শুধু এইটুকু জানলেই যথেষ্ট, লোকান্তরের উপাদান আরও সূক্ষ্ম এবং তাদের ছন্দঃস্পন্দনও পৃথক। ...কিন্তু একটা প্রশ্ন তবুও থেকে যায়। জড়োত্তরের প্রত্যেকটি ভূমি কি স্বয়ংপূর্ণ আলাদা একটা জগৎ? তাদের মধ্যে কি কোনও সাঙ্কর্য বা মেশামিশি নাই? কোনরকমেই কি তারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে না? না তারা এক অখণ্ড সত্তার পর্বায়িত এবং ওতপ্রোত একটা তন্ত্রসংস্থান, অতএব এক বিচিত্রজটিল বহুপর্বা বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ? তারা যে আমাদের মনশ্চেতনার গোচরীভূত হতে পারে, তাইতে মনে হয় দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিই সমীচীন। কিন্তু শুধু এতেই তার প্রামাণ্য নিঃসংশয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না। পার্থিবলোকের সঙ্গে ঊর্ধ্বলোকের প্রতিমুহূর্তের যোগাযোগ এবং শক্তিসংক্রমণ একটা অতিবাস্তব সত্য। অথচ আমাদের প্রাকৃত চিত্তে বা বহিশ্চেতনায় স্বভাবতই তার কোনও সাড়া জাগে না, কেননা বহিশ্চেতনার মোড় বিশেষ করে ফেরানো

আছে মাত্রাস্পর্শের আদান ও উপযোগের দিকে। কিন্তু চিত্ত যখন অধিচেতনার গভীরে তলিয়ে যায় অথবা এই জাগ্রৎচেতনাই মাত্রাস্পর্শের সীমা ছাড়িয়ে প্রসারিত হয়, তখনই আমরা অতীন্দ্রিয় ভূমির সূক্ষ্মস্পন্দনের সাড়া পাই। এমন-কি চিত্তের বিশেষ-কোনও অবস্থায় এই দেহে থেকেই মানুষ নিজেকে উর্ধ্বলোকে খানিকটা উপসংক্রান্ত করতে পারে। সুতরাং বিদেহ অবস্থায় এই উপসংক্রমণ যে আরও পূর্ণাঙ্গ হবে তা বলাই বাহুল্য—কেননা স্থূল শরীরের সঙ্গে মর্ত্যপ্রাণের নিবিড় বন্ধনের বাধা তখন থাকবে না। এই যোগাযোগ এবং ঊর্ধ্বসংক্রমণের একটা গভীর সার্থকতা আছে। এতে একদিক দিয়ে, স্থূল শরীর ধ্বংস হবার পরেও মানুষ যে সাময়িকভাবে জড়োত্তর ভূমিতে বাস করে—এই চিরাগত বিশ্বাসের অনুকূলে অন্তত তার সম্ভাব্যতার একটা প্রমাণ মেলে। আরেক দিক দিয়ে, আমাদের মর্ত্য আধারে ঊর্ধ্বলোক হতে শক্তিপাতের ফলে প্রাণ মন ও চিৎসত্তার যে লোকোত্তর শক্তি নিগূঢ় ও অবরুদ্ধ হয়ে আছে, তার প্রমুক্তির একটা আশ্বাস দেখা দেয়। জড়ের গুহায় এইসব শক্তি নিগূহিত আছে বলেই চিন্ময় পরিণাম প্রকৃতির সকল সাধনার একমাত্র লক্ষ্য। ঊর্ধ্বলোকের সত্তা ও অনুভাব সেই সাধনাকেই সিদ্ধির পথে এগিয়ে দেয়।

জড়োত্তর লোকের সৃষ্টি জড়বিশ্বের সৃষ্টির প্রাগ্‌ভাবী—পরভাবী নয়। কালিক প্রাগ্‌ভাব না মানলেও, অন্তত শক্তিসংক্রমণের দিক থেকে তাদের প্রাগ্‌ভাব অনস্বীকার্য। কারণ আরোহ আর অবরোহের দুটি ক্রম পাশাপাশি থাকলেও, আরোহক্রমের প্রমুখ বৈশিষ্ট্য হবে জড়ের মধ্যে ঊর্ধ্বপরিণামের পথকে সুগম করে দেওয়া। প্রকৃতিপরিণামের তপস্যাকে সার্থক করবার সিদ্ধবীর্যরূপে তপস্যার অনুকূল কি প্রতিকূল সবধরনের উপকরণ জোটানোই হবে তার কাজ। অতএব আরোহক্রমকে শুধু পার্থিবপরিণামের ফল মনে করলে চলবে না। কেননা এ-কল্পনা যুক্তির দিক দিয়ে যেমন অসম্ভব, তেমনি চিন্ময়-ভাবনা বা অর্থক্রিয়াকারী শক্তিপরিণামের দিক দিয়েও অসার্থক। অর্থাৎ নীচে থেকে জড়বিশ্বের চাপে ঊর্ধ্বলোকের বিসৃষ্টি হয়েছে—একথা সত্য নয়। এই নীচের চাপকে বোঝাতে গিয়ে কেউ হয়তো বলবেন : জড় অচিতিতে অন্তর্গূঢ় সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ উৎক্ষেপেই ঊর্ধ্বলোকের আবির্ভাব হয়েছে। কেউ বলবেন : এই উৎক্ষেপেরও একটা পরম্পরা আছে। ব্রহ্মের সন্ধিনীশক্তির প্রেতি অচিতি হতে যখন প্রাণ মন ও চেতনার উন্মেষ ঘটাল, তখনই তার মধ্যে ঊর্ধ্বভূমির কল্পনা জাগল—যেখানে প্রাণ-মন-চেতনার প্রবৃত্তি নিরঙ্কুশ হবে এবং মানুষেরও প্রাণময় মনোময় কি চিন্ময় সংস্কারসমূহ পুষ্ট হবার অবাধ অবকাশ পাবে। কিন্তু এসমস্ত কথাই অযৌক্তিক। আবার মানুষের আদর্শের স্বপ্ন কিংবা স্থূলচেতনার সঙ্কোচকে উল্লঙ্ঘন করে প্রতিমুহূর্তে

তার প্রাণচঞ্চল সিসৃক্ষার সম্মুখ অভিযান—এরাই যে ঊর্ধ্বলোকের স্রষ্টা একথাও সত্য নয়। এদিক দিয়ে মনুষ্যচিত্তের সৃষ্টিসামর্থ্যের শুধু এই পরিচয় আমরা পাই : মানুষ ভাবনার দ্বারা তার দৈহ্য-চেতনায় ঊর্ধ্বলোকের একটা প্রতিচ্ছবি গড়তে পারে এবং তাকে উপরের ছোঁয়ায় সাড়া দেবার যোগ্য করেও তুলতে পারে। ক্রমে জড়ভূমির সঙ্গে ঊর্ধ্বলোকের অন্তর্যোগের অনুভব তার চিত্তকে সচেতন ও তৎপর করে তোলে—এইটুকুই তার কৃতিত্ব। কখনও-কখনও মানুষের ঊর্ধ্বপ্রাণ ও ঊর্ধ্বমনের ক্রিয়ার পরিণাম কি উৎক্ষেপ ঊর্ধ্বলোকেও সংক্রামিত হয়। কিন্তু সে-উৎক্ষেপকে পার্থিবলোকের শক্তি-সংক্রমণ না বলে ঊর্ধ্বশক্তির প্রতিক্ষেপ বলাই সঙ্গত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বুঝতে হবে, উপর হতে পার্থিবমনের 'পরে যে-শক্তিপাত হয়েছিল, তা-ই আবার ফিরে গেল ঊর্ধ্বলোকে, কেননা মানুষের প্রাণ-মনের ঊর্ধ্বপ্রবৃত্তির প্রেরণা মূলত জড়োত্তর ভূমি হতেই আসে। তাছাড়া জড়োত্তর ভূমিতে কি তার উপান্তে মানুষের চিত্তের সংবেগ কখনও-কখনও অর্ধবাস্তব ভাবলোকের একটা আভাস গড়ে তোলে। কিন্তু তারা তার সচেতন প্রাণ-মনেরই সুকল্পিত একটা কঞ্চুক-মাত্র—সত্যকার কোনও জগৎ নয়। জীবদ্দশায় লোকান্তরের যে-রূপ আঁকতে সে চেষ্টা করে, সেই মনগড়া স্বর্গলোকের ছবিই এমনি করে তাকে ঘিরে কল্পনাবিজৃম্ভণের ফলে সৃষ্টি করে একটা ছায়ার মায়া। কিন্তু তথাকথিত উৎক্ষেপ আর এই কল্পমায়া—কোনটাতেই কোনও সত্য জগতের স্ব-তন্ত্র ও স্ব-প্রতিষ্ঠ বিসৃষ্টি হয় না।

অতএব এইসব ভূমি বা লোকসংস্থান যে অন্তত পরিদৃশ্যমান জড়বিশ্বের সমকালীন ও সহভাবী, তাতে কোনও ভুল নাই। আলোচনার ফলে এই সিদ্ধান্তেই আমরা পৌঁছেছি যে, জড়ের আধারে প্রাণ মন ও চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হলে লোকসংস্থানের প্রাক্‌সত্তা একটা অপরিহার্য নিমিত্ত। কারণ, জড়ের ভূমিতে এইসব জড়োত্তর বিভূতির উন্মেষ হয় দুটি সাপেক্ষ শক্তির সহযোগে —একটি অবরভূমির উৎসর্পিণী শক্তি আরেকটি উত্তরভূমির সঙ্কর্ষণী ও অবসর্পিণী প্রৈষশক্তি। অচিতির যেমন নিজের অন্তর্লীন বিভূতিকে প্রকট করবার দায় আছে, তেমনি ঊর্ধ্বভূমির উত্তরশক্তিরাজির মধ্যেও আছে এমন-একটা প্রৈষা—যা কেবল অচিতির এই দায়কেই যে নির্বাহ করে তা নয়, তার চরমসিদ্ধির বিশিষ্ট ধারাকেও বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। এমনতর একটা প্রৈষা ও সঙ্কর্ষণের শক্তি উপর হতে অবিরাম কাজ করছে বলেই, জড়-ভূমির 'পরে চিন্ময় মনোময় ও প্রাণময় লোকসমূহের দুর্লক্ষ্য অনুভাব অবিচ্ছিন্ন ধারায় সঞ্চারিত হচ্ছে। এই অবিচ্ছেদ প্রৈষা ও অনুভাবকে একটা অসম্ভব ব্যাপারও বলতে পারি না। কেননা, বিশ্বসংস্থানের সর্বত্র যদি আমাদের পূর্বকল্পিত সাতটি বিশ্বসূত্রের টানা-প'ড়েন দিয়ে একটা জটিল রহস্যের জাল

বোনা হয়ে থাকে, তাহলে ওই সাতটি শক্তির অন্যোন্যসঙ্গমজনিত সত্ত্বোদ্রেক ও ক্রিয়াব্যতিহার যে বিশ্বপরিণামের একটা অপরিহার্য বিধান হবে এবং ব্যক্তি-বিশ্বের স্বভাবের মূলে তার অনুস্যূতি থাকবে—একথা অনস্বীকার্য।

অধিচেতন পুরুষকে আশ্রয় করে উত্তরভূমির তত্ত্ব ও শক্তিসমূহের নিগূঢ় অনুভাব অবিশ্রান্ত ঝরে পড়ছে পার্থিব সত্তা ও প্রকৃতির 'পরে—কেননা অধিচেতন পুরুষকে বলতে পারি এইসব উত্তরভূমি হতে অচিতির জগতে চিতি-শক্তির একটা প্রসর্পণ, অতএব এখানে উত্তরশক্তির আস্রবের সে-ই হল যোগ্যতম বাহন। এই শক্তিসংক্রমণের বিশেষ-একটা পরিণাম ও তাৎপর্য আছে—একথা বলাই বাহুল্য। তার প্রথম পরিণাম, জড়ের বন্ধন হতে প্রাণ ও মনের প্রমুক্তি এবং তার শেষ পরিণাম মৃন্ময় আধারে চিন্ময় ভাবনার উন্মেষ—এই মর্ত্যের মানুষেই চিন্ময়ী প্রেতি ও অধ্যাত্ম জীবনচেতনার একটা স্ফুরণ। এর সংবেগে বহির্মুখ জীবনের প্রতি কিংবা তার সঙ্গে জড়িত বিচিত্র মনোময়ী আকৃতির চরিতার্থতার প্রতি তার একান্ত অভিনিবেশ শিথিল হয়ে পড়ে। তখন বহির্জগৎ ছেড়ে অন্তরের দিকে তার দৃষ্টি আবৃত্ত হয়, হৃদয়ের মণিকোঠায় সে আবিষ্কার করে তার চিন্ময় আত্মস্বরূপকে—মর্ত্যভূমির সকল সঙ্কোচ কাটিয়ে তার জাগ্রত অভীপ্সা তখন পাখা মেলে অমৃতলোকের দিকে। তার মধ্যে এই অন্তরাবৃত্ত সত্তার যতই উপচয় ঘটে, ততই তার প্রাণ মন ও চিৎসত্ত্বের সীমান্ত প্রসারিত হয়, প্রাণ-মন-চেতনার আদ্যচ্ছন্দের আড়ষ্ট বন্ধন শিথিল কি ত্রুটিত হয়ে মনোময় মানুষের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে ওঠে প্রাক্তন মর্ত্যজীবনের অগোচর এক অধ্যাত্মজগতের বিপুল স্বারাজ্যের ছবি। অবশ্য মানুষ যতদিন বহির্মুখ থাকে, ততদিন তার প্রাকৃতজীবনের সঙ্কীর্ণ ভিত্তির 'পরে ভাবনা ও কল্পনা দিয়ে আদর্শলোকের একটা আলগা কাঠামোই সে গড়তে পারে। কিন্তু ক্বচিদ্-উন্মীলিত দিব্যদর্শনের ঈশারা মেনে একবার যদি ভিতরপানে তার সাধনার মোড় ঘুরে যায়, তাহলে তার অন্তরগহনেই সে আবিষ্কার করে নির্মুক্ত প্রাণ ও চেতনার এক বিপুল রাজ্য। তখন তার অন্তরের অভীপ্সা আর উত্তরভূমির শক্তিপাত দুয়ের সংবেগে জড়-ত্বের উদ্রিক্ত সংস্কার অভিভূত হয় এবং অচিতির প্রভাব ক্ষীণতর হয়ে অব-শেষে শূন্যে মিলিয়ে যায়। মানুষের চেতনার খাতে তখন বইতে থাকে দ্যুলোকের উজানধারা, জড়কে ছেড়ে চিৎসত্তা হয় তার আধারের প্রবুদ্ধ অধি-ষ্ঠান এবং তার উত্তরবিভূতিসমূহ অকুণ্ঠ স্বারাজ্যের পরিপূর্ণ মহিমায় মুক্তি পায় প্রকৃতি-স্থ পুরুষের জীবনছন্দে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জন্মান্তর ও লোকান্তর ঃ কর্ম জীব এবং অমরত্ব

অস্মাল্লোকাৎপ্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতমানন্দময়-মাত্মানমুপসংক্রম্য ইমাঁল্লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্ ॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩।১০।৫

এই লোক হতে প্রয়াণকালে তিনি এই অন্নময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন; এই প্রাণময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন; এই মনোময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন; এই বিজ্ঞানময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন; এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন; এইসব লোকে কামরূপী হয়ে সঞ্চরণ করেন তিনি।

—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩।১০।৫)

অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি,
যৎক্রতুর্ভবতি তৎকর্ম কুরুতে, যৎকর্ম কুরুতে তদভিসংপদ্যতে।
তদেব সক্তঃ সহ কর্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য।
প্রাপ্যান্তং কর্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্মণে ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৪।৫,৬

তাইতো বলা হয়, পুরুষ কামময়। যেমন তাঁর কামনা, তেমনি তাঁর ক্রতু; যেমন তাঁর ক্রতু, তেমনি কর্মই করেন তিনি; আবার যেমন কর্ম করেন, তেমনি (ফলই) পান।...কর্মের* দ্বারা সক্ত হয়ে লিঙ্গশরীরে সেইখানে যান তিনি, তাঁর মন যেখানে রয়েছে নিষক্ত। তারপর সেই কর্মের অন্তে পেঁছে অর্থাৎ যা-কিছু এখানে করেন তিনি—তার শেষে, ওই লোক হতে আবার আসেন এই লোকে কর্মের জন্যে।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৪।৪।৫,৬)

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
...প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ ॥
সংকল্পাহংকারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব...দৃষ্টঃ ॥
বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় সঃ চানন্ত্যায় কল্পতে ॥
নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৫।৭-১০

গুণান্বিত এবং কর্ম ও ফলের কর্তা হয়ে সেই কৃতকর্মের ফল তিনি করেন উপভোগ; প্রাণাধিপ তিনি, সঞ্চরণ করেন নিজের কর্ম অনুসারে। সংকল্প এবং অহংকার-

---

* উপনিষদের এই শ্লোকের মতে ইহজন্মের কর্ম সমাপ্ত হয় লোকান্তরে—কর্মফলের বিপাকদ্বারা; তারপর জীব আবার পৃথিবীতে আসে নতুন কর্মের জন্য। পৃথিবীর জন্ম ও কর্ম, লোকান্তরে গতি, আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসা—এ-সমস্তেরই মূলে আছে জীবের নিজের চেতনা সংকল্প ও কামনা।

সমন্বিত তিনি, বুদ্ধির গুণ ও আত্মার গুণ দিয়ে তাঁকে যায় জানা। কেশাগ্র-শতভাগের শতভাগ যে-জীব, তিনিই হন আনন্ত্যের যোগ্য। তিনি স্ত্রী নন, পুরুষ নন—নপুংসকও নন তিনি; যে-যে শরীরকে আপন বলে গ্রহণ করেন তিনি, তারই সঙ্গে হন যুক্ত।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৫।৭-১০)

মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ ॥

ঋগ্বেদ ১।১১০।৪

মর্ত্য হয়েও অমৃতত্বকে পেলেন তাঁরা।

—ঋগ্বেদ (১।১১০।৪)

জন্মান্তর সম্পর্কে আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত তাহলে এই : পার্থিব-প্রকৃতিতে চিদভিব্যক্তির যে পূর্ব্য আকূতি ও সাধনা নিহিত রয়েছে, তার অপরিহার্য পরিণামরূপে জীব বারবার পার্থিবশরীরে ফিরে আসে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের অনুষঙ্গে আরও কতগুলি সমস্যা এবং অনুসিদ্ধান্ত জাগে, যাদের বিশদভাবে আলোচনা করা এখন আবশ্যক। প্রথম প্রশ্ন, জন্মান্তরের কি কি ধারা ? মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জন্মান্তর না ঘটলে একই ব্যক্তির জীবনধারায় একটা অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা বজায় থাকে না; তখন মৃত্যু আর পুনর্জন্মের মধ্যে খানিকটা অবকাশ মানতে হয়। এই অবকাশের সময়টাতে জীব লোকান্তরে থাকে। তখন প্রশ্ন ওঠে, জীবের লোকান্তরসংক্রমণের কি তত্ত্ব বা কি রীতি ? আবার এই পৃথিবীতেই-বা সে ফিরে আসে কেমন করে ? শেষ প্রশ্ন এই : জীবের চিন্ময় পরিণামেরই-বা কি ধারা ? জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে সংসারাভিযাত্রী জীবের প্রকৃতিতে যে-বিপরিণাম ঘটে, তারই-বা স্বরূপ কি ?

জড়বিশ্বের অভিব্যক্তিতেই লোকসৃষ্টি যদি নিঃশেষিত হত, অথবা জড়-বিশ্ব যদি একটা স্বয়ংতন্ত্র অসম্পৃক্ত লোক মাত্র হত, তাহলে প্রকৃতিপরিণামের অঙ্গীভূত জন্মান্তরের একমাত্র ধারা হত দেহান্তরপ্রাপ্তির একটা অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা। অর্থাৎ মৃত্যুর পরক্ষণে এই পৃথিবীতেই আবার জীবের জন্ম হত —মরণ আর পুনর্জন্মের মধ্যে কোনও অবকাশ থাকত না। তখন জন্মান্তর হত জড়প্রকৃতির একটা অপরিহার্য গতানুগতিক পরিণামের নিরবচ্ছিন্ন অনু-বৃত্তি—জীবের উপসংক্রান্তি হত তার সমান্তরাল একটা চিদ্ব্যাপার মাত্র। জড়ের কবল হতে জীব আর ছাড়া পেত না তখন। দেহযন্ত্রের সঙ্গে তার সংযোজন হত চিরন্তন, কেননা তার অবিচ্ছেদ আত্মাভিব্যক্তির একমাত্র সাধন হত দেহ। কিন্তু আমরা জানি, একথা সত্য নয়। মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মধ্যে লোকান্তর-স্থিতির একটা অবকাশ আছে, যাকে বলতে পারি একাধারে বিগত জীবনের জের এবং অনাগত পার্থিব জন্মের প্রস্তুতি। এই পার্থিবলোকের সঙ্গে জড়িয়ে আছে লোকান্তরের একটা পরম্পরা—ভূলোক যার সর্বকনিষ্ঠ

পর্বমাত্র। স্থূলের 'পরে সূক্ষ্মলোকের একটা অনতিবর্তনীয় অনুভাব নিয়ত সংক্রামিত হচ্ছে, কেননা দুয়ের মধ্যে নিগূঢ় যোগাযোগ এবং আদানপ্রদানের কোনকালেই বিরতি ঘটছে না। লোকান্তরসমূহ মানুষের অনুভবের বাইরেও নয়। অবস্থাবিশেষে এই দেহে থেকেই সে নিজের চেতনাকে তাদের ভূমিতে খানিকটা উৎক্ষিপ্ত করতে পারে—মৃত্যুর পর বিদেহ অবস্থায় আরও ভাল করে পারে। এখানে থাকতেই আত্মসংক্রামণের সামর্থ্য যদি তার আয়ত্ত হয়ে থাকে, তাহলে মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জীবাত্মার লোকান্তরে উৎক্রান্তি বা উৎক্ষেপ একটা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতিরূপে দেখা দিতে পারে। নইলে এ হয়তো কালিক পরিণামের একটা অপেক্ষা রাখে। কারণ অসংস্কৃত ও অপরিণত জীবাত্মার পক্ষে প্রাণলোক বা মনোলোকের বৃহত্তর ভূমিতে তার অমার্জিত প্রাণ-মনকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বাধ্য হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে তাকে এই পার্থিবলোকেই দেহান্তর-সংক্রমণের পথ ধরতে হয়—কেননা এছাড়া বর্তমানে আত্মভাবের অনুবৃত্তি আর-কোনও উপায়ে তার পক্ষে সম্ভব নয়।

মৃত্যু আর জন্মান্তরের মধ্যে একটা অবকাশ ও লোকান্তর-গতির দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, মানুষের প্রকৃতিতে বহুভাবের সংসৃষ্টি আছে। তার মধ্যে তার প্রাণময় ও মনোময় সত্তা ঊর্ধ্বলোকের সগোত্র, অতএব তার প্রতি এদের একটা আকর্ষণ থাকা খুবই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, মানুষের বিগত জীবনের ভাবসমষ্টির পরিপাক এবং অনাবশ্যক ভাবের বর্জনদ্বারা নতুন দেহে পৃথিবীতে নতুন করে ফিরে আসবার একটা প্রস্তুতি—এর জন্যেও মৃত্যুর পর একটা অবকাশের সার্থকতাই শুধু নয়, প্রয়োজনও আছে বিশেষ করে। কিন্তু জড়াসক্ত অর্ধপশু মানবের মধ্যে প্রাণ ও মনের স্বকীয়তা একটা বিশিষ্ট রূপ না ধরা পর্যন্ত ঊর্ধ্বলোকের এই আকর্ষণ অথবা অতীতের পরিপাক কোনটাই কার্যকরী হতে পারে না—এমন-কি তাদের অস্তিত্ব অথবা স্পন্দনের কোনও চেতনাও হয়তো তার মধ্যে থাকে না। যে-মানুষ অর্ধপশু, তার জীবনে আছে অমার্জিত অনুভবের আদিম সারল্য। তার প্রাকৃত সত্ত্বও এমনই অপরিপক্ক যে চিত্তপরিপাকের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করবার সাধ্য তার নাই। তাছাড়া ঊর্ধ্বলোকের আকর্ষণে সাড়া দেবার মত আধারের উত্তমাঙ্গগুলিও তার ভাল করে এখনও ফোটেনি। এ-অবস্থায় ঊর্ধ্বলোকের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় পুনর্জন্মের একমাত্র অর্থ হতে পারে—দেহান্তর-সংক্রমণের একটা অবিচ্ছিন্ন পরম্পরামাত্র। তখন লোকান্তরের অস্তিত্ব এবং আত্মার উৎক্রান্তি ও লোকান্তরবাস দুইই অসার্থক এবং নিষ্প্রয়োজন। কেউ-কেউ মনে করেন, উৎক্রান্তি সকল জীবাত্মার পক্ষেই একটা অপরিহার্য বিধান, সুতরাং মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই কারও দেহান্তর-সংক্রমণ ঘটে না। নতুন দেহ

নিয়ে অনুভবের নতুন রাজ্যে অবতীর্ণ হবার পূর্বে প্রস্তুতির একটা অবকাশ জীবাত্মার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। দুটি মতের মধ্যে একটা রফা হতে পারে : জীবাত্মা যতক্ষণ ঊর্ধ্বলোকে বাস করবার মত পরিপক্বতা লাভ না করছে, ততক্ষণ তার জন্য অব্যবহিত দেহান্তর-সংক্রমণের ব্যবস্থা; আর পরিপক্বদশায় ঘটে তার উৎক্রান্তি। তৃতীয় একটা সম্ভাবনার কথাও কেউ-কেউ বলেন : কারও-কারও আধ্যাত্মিক পুষ্টি এত দ্রুত ও বীর্যশালী হয়, চিন্ময় বিদ্যুতে তার সকল আধার এমনি ভরে ওঠে যে, লোকান্তরে কালক্ষেপণ তার পক্ষে অনাবশ্যক হয়। সুতরাং তার ঊর্ধ্বপরিণাম যাতে অযথা না বিলম্বিত হয়, তার জন্যে মৃত্যুর পরেই তার জন্মান্তর ঘটে।

যেসব ধর্ম জন্মান্তর মানে, তাদের আওতায় সাধারণের মধ্যে কতগুলি অযৌক্তিক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাকৃতচিত্তের স্বাভাবিক সংস্কারমূঢ়তা-বশত তাদের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টাও কেউ করে না। একটা অস্পষ্ট অথচ বেশ ব্যাপক ধারণা এই যে, বলতে গেলে মৃত্যুর পরেই জীবাত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তি ঘটে। অথচ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, ইহলোকে অনুষ্ঠিত পাপ-পুণ্যের ফলে মৃত্যুর পরে কিছুকাল তাকে স্বর্গে নরকে বা অন্য-কোনও লোকে থাকতে হয়। ভোগদ্বারা পাপ-পুণ্য ক্ষীণ হয়ে আবার যখন জীবের মর্ত্য-বাসের সময় হয়, তখনই সে পৃথিবীতে ফিরে আসে। দুটি মতের বিরোধ ঘোচে, যদি বলি প্রকৃতি-স্থ পুরুষের অধ্যাত্মপরিণামের তারতম্যবশত উৎ-ক্রান্তিরও উচ্চাবচতা ঘটে। অর্থাৎ সব-কিছু নির্ভর করবে, পার্থিবজীবনকে ছাড়িয়ে ওঠবার যার যতখানি সামর্থ্য হয়েছে তার 'পরে। কিন্তু প্রচলিত জন্মান্তরবাদে অধ্যাত্মপরিণামের কথাটা তেমন সুস্পষ্ট নয়। তার মধ্যে আভাসে এইটুকু স্বীকৃতি আছে যে, জীবাত্মাকে এমন-একটা জায়গায় পৌঁছতে হবে, যেখান থেকে পুনর্জন্মের সম্ভাবনাকে অতিক্রম করে তার শাশ্বত স্বধামে সে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু অনাবৃত্তির বিন্দুতে পৌঁছবার পথে অধ্যাত্ম-পরিণামের একটা সোপানায়িত ক্রম যদি না থাকে, তাহলে এলোমেলো আকা-বাঁকা পথেও তো সেখানে ওঠা চলে। তার ফলে, আমাদের কাছে উৎক্রান্তির রীতি হয় দুর্বোধ। অবশ্য এ সমস্যার নিশ্চিত সমাধান হবে অধ্যাত্ম অনুভব ও গবেষণা হতে—জল্পনা দিয়ে নয়। যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে শুধু এই বিচারই চলতে পারে, মৃত্যুর পর অব্যবহিত দেহান্তরপ্রাপ্তি, কিংবা লোকান্তরে বিশ্রামের পর স্বকায়কৃৎ জীবসত্ত্বের নবকলেবর ধারণ—এ-দুটির মধ্যে জীবাত্মার কোন্ গতিটি স্বাভাবিক বা পরিজ্ঞাত বিশ্ববিধানের অনুকূল।

সপ্তলোক ওতপ্রোত ও অন্যোন্যনির্ভর হয়ে রয়েছে এবং আমাদের অধ্যাত্ম-পরিণামও এই লোকসংস্থানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাইতে তত্ত্বত না হলেও কার্যত জীবাত্মার লোকান্তরে অবস্থান আবশ্যক হয়ে পড়ে। পৃথিবীর তীব্র

আকর্ষণে অথবা পরিণময়মানা প্রকৃতির অতিরিক্ত স্থূলত্ববশত এ-ব্যবস্থার সাময়িক ব্যতিক্রম হওয়া অবশ্য অসম্ভব নয়। উত্তরায়ণের পথে কোনও জীব একবার মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করবার পর, মনুষ্যপ্রকৃতিকে পুরোপুরি আয়ত্ত করতে বারবার তাকে মানুষ হয়েই যে জন্মাতে হবে, অমাদের এ-ধারণা অযৌক্তিক নয়। কারণ জীবাত্মাকে ভূলোকের এক স্তর হতে আরেক স্তরে উৎক্রান্ত হয়ে অবশেষে মানুষের স্তরে যখন পেঁছতে হয়, তখন আত্মপ্রকৃতির পূর্ণ পরিণতির জন্যই বারবার মনুষ্যযোনিতে জন্মানো কি তার একান্ত আবশ্যক নয়? একবারমাত্র স্বল্পকালের জন্য পৃথিবীতে মানুষ হয়ে আসাটা কি তার অধ্যাত্ম-পরিণামের পক্ষে পর্যাপ্ত বলে গণ্য হবে? মনুষ্যত্বস্ফুরণের প্রথম পর্বে মনুষ্যযোনিতে আবর্তিত হবার সময় কিছুকাল ধরে মৃত্যুর অব্য-বহিত পরেই দেহান্তর-সংক্রমণ জীবাত্মার পক্ষে সপ্রয়োজন মনে হতে পারে। হয়তো প্রাণবৃত্তির নিবৃত্তি বা উৎক্রান্তির সংগে-সংগে দেহরূপ ভৌতিক সং-ঘাতটি যেই ভেঙে পড়ে, অমনি মানবদেহেই জীবাত্মার নতুন করে জন্ম হয়। কিন্তু এমনতর অব্যবহিত জন্মান্তরদ্বারা অধ্যাত্মপরিণামের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? মানুষের অন্তর্গূঢ় জীবসত্ত্ব নয়—কিন্তু প্রকৃতির উপাশ্রিত তার চিত্তসত্ত্ব বা জীবভাবনা যদি অপরিণত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ এই জন্মের দেহ-প্রাণ-মনের অভ্যস্ত সংস্কারের অনুবৃত্তি ছাড়া আত্মভাবকে টিকিয়ে রাখা তার পক্ষে যদি অসম্ভব হয়, তাহলে লোকান্তরে অবকাশযাপন হয়তো নিষ্প্রয়োজন হবে। কারণ তখনও মানুষ স্বপ্রতিষ্ঠ হয়নি বলে, প্রাণ-মনের অতীত সংঘাতকে বর্জন করে লোকান্তরে থেকে নতুন সংঘাত গড়ে তোলা হয়তো তার সাধ্যে কুল'বে না। অতএব মৃত্যুর পরেই অপরিপুষ্ট ব্যক্তিসত্ত্বকে অভ্যস্ত খাতে বইয়ে দিতে নতুন দেহ নেওয়া ছাড়া তার উপায় নাই।...কিন্তু জীবাত্মা একবার যদি মনুষ্যকোটিতে পেঁছতে পারে, তাহলে তার চিত্তসত্ত্ব এমন অপরিপুষ্ট অবস্থায় থাকে কিনা সন্দেহ—কেননা ব্যষ্টিভাবনায় জীবের খুব আঁট না থাকলে তার মধ্যে মানুষী চেতনার উন্মেষ হওয়া অসম্ভব। মানুষ যত নিম্নস্তরের হ'ক, তবু সে মনোময় জীবসত্ত্ব। তার মন হয়তো নিতান্ত অপরিণত, অন্নময় ও প্রাণময় চেতনার স্থূল আড়ষ্টতায় খর্ব ও সঙ্কুচিত—হয়তো আত্মরূপায়ণের অবরমায়া হতে নিজেকে মুক্ত করবার ইচ্ছা বা সাধ্য কোনটাই তার নাই। তবু মানুষ যে মনোলোকের জীব—এতে কোনও ভুল নাই। অতএব অব্যবহিত দেহান্তরসংক্রমণ তার পক্ষে অনতিবর্তনীয় বিধান হতে পারে না।...অথচ একথাও অনস্বীকার্য যে, ক্ষেত্রবিশেষে তাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়। কখনও হয়তো পার্থিব স্তরের আকর্ষণ এতই দুর্বার হয় যে আবার তাকে সদ্য-সদ্য পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়, কেননা তার প্রাকৃত আধার তখনও পৃথিবী ছাড়া আর-কোনও ঊর্ধ্বস্তরে থাকবার যোগ্যতা বা স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করেনি।

কখনও-বা মর্ত্যের ভোগ তার এতই স্বল্পায়ু যে, তার অনুবৃত্তির জন্যই আবার তাকে আর-কোথাও কালক্ষেপ না করে এখানে ফিরতে হয়। প্রকৃতির জটিল জালে এমন কত গ্রন্থিই হয়তো আছে—কোথাও অনতিবর্তনীয় প্রয়োজনের তাড়া, কোথাও-বা অজানা কোনও অধঃশক্তির আকর্ষণ। তাইতে দুর্দম পার্থিব বাসনার ক্ষিপ্রাসন্ধির আকৃতি একই ব্যক্তিসত্তাকে লোকান্তরে বিশ্রামের অবকাশ না দিয়ে নতুন দেহে টেনে নামায়।...তবু চিৎপরিণামের ফলে জীবসত্ত্ব একবার যদি মনুষ্যকোটিতে পৌঁছয়, তাহলে জন্মান্তরে শুধু দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটবে না কিন্তু একটা অভিনব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষরূপে তার আবির্ভাব হবে —এইটাই সংগত ও স্বাভাবিক।

কারণ চৈত্যসত্তার পরিপুষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে আত্মপ্রকৃতির রূপায়ণে পুরুষের যেমন যথেষ্ট বশীকার জন্মাবে, তেমনি প্রাণময় ও মনোময় সত্তার বৈশিষ্ট্যকে স্বপ্রতিষ্ঠ করবার সামর্থ্যও দেখা দেবে। অতএব স্থূলদেহ-নিরপেক্ষ হয়েও, জড়ভূমি ও জড়জীবনের প্রতি দুর্বার অত্যাসক্তিকে বর্জন করে স্বকীয় জীবভাবকে টিকিয়ে রাখা তার পক্ষে তখন অসম্ভব হবে না। ভূতসূক্ষ্মের উপাশ্রিত লিঙ্গদেহকে আমরা অন্তরপুরুষের বিশিষ্ট কোশ বা আধার বলে জানি। এই লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করে চৈত্যপুরুষ মৃত্যুর পর স্থূল দেহ হতে প্রাণ ও মনকে নিয়ে লোকান্তরের পথে বেরিয়ে পড়েন। জীবভাবের ক্রমিক পুষ্টিতে এই চৈত্যসত্তা ও লিঙ্গদেহ দুয়েরই পুষ্টি হয় এবং তাদের লোকান্তর সংক্রমণের সামর্থ্যও বাড়ে। কিন্তু প্রাণলোকে ও মনোলোকে স্বচ্ছন্দে উৎক্রমণের জন্য জীবের প্রাণসত্ত্ব এবং মনঃসত্ত্বেরও যথেষ্ট পুষ্টি ও সংহতি আবশ্যক, যাতে ঊর্ধ্বলোকে গিয়ে দীর্ঘকাল তারা বিস্রস্ত না হয়ে টিকে থাকতে পারে। অতএব চৈত্যসত্তার যথাযোগ্য পরিণতি, লিঙ্গদেহের পরিপুষ্টি এবং প্রাণ ও মনঃসত্ত্বের উপযুক্ত সংহতি—এতগুলি নিমিত্তের যোগাযোগে মৃত্যুর পরেই দেহান্তর-সংক্রমণ না হয়ে জীবাত্মার লোকান্তরস্থিতি সম্ভব হবে এবং ঊর্ধ্বলোকের আকর্ষণ তার পক্ষে কার্যকরী হবে। কিন্তু শুধু এইটুকু ব্যবস্থা থাকলে, একই প্রাণ- ও মনঃ-সত্ত্ব নিয়ে জীব আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে—পুনর্জন্মের দরুন তার আত্মপ্রকৃতির কোনও স্বচ্ছন্দ পরিণাম ঘটবে না। অতএব লোকান্তরস্থিতির ফলে চাই চৈত্যসত্তারও বিশিষ্ট পরিণাম, যাতে অতীতের দেহের মত প্রাণ-মনের অতীত রূপায়ণকেও বর্জন করে নতুন জন্মে সবরকমে নতুন একটা আয়তন সে গড়ে তুলতে পারে। এইভাবে অতীতের বর্জন আর অনাগতের প্রস্তুতির জন্যই জীবাত্মাকে মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মাঝে খানিকটা সময় ভূলোকের অভ্যস্ত পরিবেশ ছেড়ে লোকান্তরে বাস করতে হয়, কারণ ভূলোক কোনমতেই বিদেহী জীবাত্মার স্থায়ী বাসভূমি হতে পারে না। ভূলোকের সন্নিহিত এবং তার অন্তঃপাতী প্রাণ ও মনের সূক্ষ্মান্তরে কিছুকাল

সে বাস করতে পারে বটে, কিন্তু পার্থিব আকর্ষণ নিতান্ত প্রবল না হলে দীর্ঘ-কাল সেখানে অবস্থান করাও তার সম্ভব নয়। জড়দেহ ছাড়বার পরেও জীবাত্মাকে টিকতে হলে অবশ্য জড়োত্তর ভূমিতেই থাকতে হবে। সে-ভূমি হয়তো হবে অধ্যাত্মপরিণামের অনুকূল কোনও সূক্ষ্মলোক। অথবা অধ্যাত্ম-পরিণামের প্রয়োজন না থাকলে সে হবে মরণ ও জন্মান্তরের অন্তরালে আত্মার একটা স্বাভাবিক বিশ্রামভূমি। কিংবা সে হবে তার চিরবাঞ্ছিত পরম ধাম, যেখান থেকে তাকে আর মর্ত্যপ্রকৃতির কোলে ফিরতে হবে না।

তাহলে জড়োত্তর ভূমির কোন্ স্তরে জীবের পান্থশালা বা তার অন্যতর আবাসস্থান হবে? হয়তো মনোময় লোকের কোনও স্তর মানুষের অমর্ত্য আবাসভূমি হতে পারে। কেননা মনোময় জীব বলে মানুষের আধারে যে-মনোলোকের আকর্ষণ সারাজীবন ক্রিয়া করেছে, মৃত্যুর পর দেহাসক্তির বাধা দূর হওয়াতে তার শক্তিই প্রবল হবে। তাছাড়া মনোময় জীবের পক্ষে মনো-লোকই যে তার নিবাসভূমি, এই কি স্বাভাবিক নয়? কিন্তু এ-সম্ভাবনাকে স্বতঃসিদ্ধ বলতে পারি না, কেননা মানুষের আধার বিচিত্র উপাদানে গড়া। তার মনোময় সত্তাকে জড়িয়ে আছে প্রাণময় সত্তা—এমন-কি অনেকসময় মনের চেয়ে প্রাণেরই প্রভাব তার 'পরে বেশী। তাছাড়া মনের পিছনে আছে জীবাত্মা, মন যার প্রতিভূমাত্র। তারও পরে তাকে ঘিরে আছে সূক্ষ্মলোকের বহু আবেষ্টন—জীবাত্মাকে স্বধামে পেঁাছতে হলে যাদের পার হয়ে যেতেই হবে। আবার ভূলোকের কাছাকাছি ক্রমসূক্ষ্ম কতগুলি স্তর আছে—তাদের বলতে পারি জড়জগতেরই প্রাণ- ও মনো-ধর্মস্পৃষ্ট কতকগুলি উপভূমি। এরা জড়-জগৎকে ঘিরে জড় আর জড়োত্তরের মাঝে সেতুরূপে ওতপ্রোত হয়ে আছে। মনঃসত্ত্বের অপরিণত অবস্থায় জীব যখন প্রাণ-মনের জড়ক্রিয়াতেই অভ্যস্ত, তখন মৃত্যুর পর এইসব অবান্তর-লোকে আটকে পড়াও তার অসম্ভব নয়। এমন-কি মরণ আর পুনর্জন্মের অবকাশটুকু শুধু এইখানেই সে কাটিয়ে দিতে পারে—যদিও সচরাচর এমনটি ঘটবার কথা নয়। তবে কখনও যদি পার্থিব-জীবনের আকর্ষণ এতই প্রবল হয় যে জীবের স্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতিকে তা নিরুদ্ধ বা ব্যাহত করে, তাহলে এইখানে সে আটকে যেতেও পারে। কারণ সাধারণত জীবাত্মার পারলৌকিক স্থিতি নিরূপিত হয় তার ঐহিক পরিণতির পরিমাণদ্বারা। পথ ভুলে মর্ত্যস্থিতিতে নেমে কিছুকাল এখানে কাটিয়ে মৃত্যুর পর অবারিত ঊর্ধ্বপ্রয়াণ লোকান্তরগতির তাৎপর্য নয়। তার সার্থকতা জড়ের গহন হতে চিৎশক্তির অতিমন্থর ও দুরূহ ঊর্ধ্বায়নকে সহজ করবার জন্য জীবাত্মাকে বারবার বিশ্রাম ও শক্তিসঞ্চয়নের অবকাশ দেওয়াতে। পার্থিব-পরিণামের সঙ্গে-সঙ্গেই ঊর্ধ্বলোক আর মানুষের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়—যা তার লোকান্তরস্থিতির মুখ্য নিয়ন্তা। ঊর্ধ্বলোকের এই নিগূঢ়

প্রভাবই মানুষের মরণোত্তর পথের দিশারী—কোথায় কতকাল কিভাবে সে কাটাবে তার ব্যবস্থাপক।

মৃত্যুর পরে এখানকার অভ্যস্ত সংস্কার বা বিশিষ্ট আকৃতির দ্বারা সৃষ্ট পারলৌকিক উপান্তভূমিতেও মানুষের কিছুকাল কাটতে পারে। ঊর্ধ্বলোকের কোনও তত্ত্বকে আশ্রয় করে কল্পনাশক্তির বলে মানুষ পুরাপুরি একটা লোক-সংস্থান সৃষ্টি করতে পারে—একথা পূর্বেই বলেছি। তীব্র বাসনার বশে অতিবাস্তববৎ কামলোকের তার পক্ষে সৃষ্টিও অকম্ভব নয়। স্বকল্পিত হলেও এইসব লোকের বাস্তবতা তাকে অভিভূত করে মৃত্যুর পর একটা কৃত্রিম আবেষ্টনীর মধ্যে কিছুকাল বন্দী করে রাখতে পারে। মনুষ্যমনের যে রূপকৃৎ কল্পনাশক্তি ইহজীবনে ছিল তার জ্ঞানার্জন ও জীবনশিল্প-সাধনার সহায় মাত্র, ঊর্ধ্বলোকে সেই কল্পনাই অবাধে বিস্ফুরিত হয়ে মানসী সৃষ্টির সামর্থ্য লাভ করে। অধ্যাত্মশক্তির সংবেগে যতদিন এই কল্পলোকের মায়া ভেঙে না পড়ছে, ততদিন তার কবলিত হয়ে কাল কাটানো জীবাত্মার পক্ষে আশ্চর্য নয়। এমনতর কল্পকৃতিকে বলা চলে জীবনশিল্পের একটা বৃহত্তর সাধনা। এর মধ্যে প্রাণলোক কি মনোলোকের কোনও তত্ত্বকে ভূলোকের অনুভবে রূপান্তরিত করে প্রাণন-শক্তির নির্মুক্ত বীর্যে জীবাত্মা তাকে এমন বিরাট ও দীর্ঘায়িত করে তোলে যে, অবশেষে তাকে অপার্থিব বলেই তার ধারণা হয়। এমনি করে জড়াশ্রিত প্রাণের সুখদুঃখের উদ্বেলনকে জড়োত্তর ভূমিতে উত্তীর্ণ করে সে তাদের পরিপূর্ণ ও দীর্ঘবিলম্বিত অবাধ আপ্যায়ন ঘটায়। অতএব জড়োত্তর ভূমির অন্তর্গত হলেও এইসব কল্পলোককে অবিশুদ্ধ প্রাণের অথবা অবর-মনেরই উপান্ত্য ভূমিরূপে গণ্য করতে হবে।

কিন্তু এছাড়াও আছে শুদ্ধ প্রাণলোক—বিশ্বপ্রাণের যারা স্বধাম এবং তার আদ্যকৃতি ও সংহত পরিণাম। তারা বিশ্বম্ভর প্রাণাত্মপুরুষের স্বভাবছন্দের লীলাভূমি। ভূলোকে প্রাণের উল্লাস যদি জীবাত্মাকে অতিমাত্রায় প্রভাবিত করে থাকে, তাহলে প্রাণলোকের সহজ ও অনুকূল আকর্ষণে এখানেও কিছুকাল তার স্থিতি হতে পারে—কেননা ইহলোকে জীব যার কবলিত ছিল, পরলোকেও তারই কবলিত হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। ভূলোকের উপান্তে বা কল্পলোকে বাস ঊর্ধ্বপ্রযাত্রীর পক্ষে একটা সংক্রান্তিপর্বমাত্র, কারণ সত্যকার জড়োত্তর লোকের প্রতিই তার চেতনার নিগূঢ় আকর্ষণ। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যেমন ঊর্ধ্বলোকে তার উৎক্রান্তি হতে পারে, তেমনি ঊর্ধ্বসংক্রমণের ভূমিকা-রূপে ভূতসূক্ষ্মময় পরিবেশেও তার কিছুদিন কাটতে পারে। এই সূক্ষ্ম পরিবেশকে তখন পার্থিবজীবনের অনুবৃত্তি বলে তার ধারণা হয়। শুধু এখানকার সূক্ষ্মতর উপাদানের গুণে তার স্বাতন্ত্র্য অনেকটা অব্যাহত এবং মন প্রাণ আর সূক্ষ্মশরীরের প্রবৃত্তি স্বচ্ছন্দ ও আনন্দময় হয়।

ভূতসূক্ষ্মময় লোক ও প্রাণলোকের ওপারে আছে মনোময় বা চিন্ময়-মনোময় লোকের পরম্পরা। এসব লোকে গতি কিংবা স্থিতি জীবাত্মার মৃত্যু ও জন্মের মাঝে যোজক হতে পারে। কিন্তু ভূলোকে থাকতেই মন বা চৈত্যসত্তার যথেষ্ট পুষ্টি না হলে এখানে এসে জীবের কোনও সংজ্ঞা থাকে না। সাধারণত এইসমস্ত ভূমিতে অন্তরাভব-স্থিতিই মানুষের পক্ষে চরম সুগতি। কেননা মর্ত্যভূমিতে মনের সীমা যে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি, বিদেহ অবস্থায় অধিমানস কি অতিমানস ভূমিতে আরোহণ করা তার সাধ্যের বাইরে। সাধনার ফলে মনোভূমি হতে উৎক্ষিপ্ত হয়ে এইসব লোকোত্তর ভূমিতে আরূঢ় হওয়া জীবাত্মার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু তখন, মর্ত্যভূমিতে জড়ের চিন্ময় পরিণামদ্বারা অধিমানস বা অতিমানস জীবনের আবির্ভাব যতদিন না হচ্ছে, ততদিন সেখান থেকে তার পুনরাবৃত্তি নাও ঘটতে পারে।

কিন্তু তবু স্বভাবের নিয়মে মনোময় ভূমি পর্যন্তই যে মানুষের মরণোত্তর গতি সীমিত থাকবে, একথা সম্ভবত সত্য নয়। কারণ মানুষ শুধু মনোময় নয়—সে চিন্ময়ও। জন্ম-মরণের পথে আনাগোনা করে চৈত্যপুরুষই—মন নয়। মনোময়পুরুষ চৈত্যপুরুষের আত্মবিভাবনার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গিমাত্র। সুতরাং শেষপর্যন্ত জীব মনোলোকের ঊর্ধ্বে চৈত্যসত্তার শুদ্ধভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েই জন্মান্তরের প্রতীক্ষায় থাকে এবং এইখানেই চলে তার অতীত অনুভবের পরিপাক ও অনাগত জীবনের প্রস্তুতি। ভূলোকে যদি স্বাভাবিক রীতিতে মনের যথেষ্ট পরিণতি ঘটে থাকে, তাহলে মৃত্যুর পর জীবাত্মা একে-একে ভূতসূক্ষ্মময় প্রাণময় ও মনোময় লোক পার হয়ে অবশেষে পৌঁছয় তার স্বধামে অর্থাৎ চৈত্যভূমিতে। প্রত্যেক লোকে সে অতিক্রান্ত জীবনের কালাবচ্ছিন্ন বহিশ্চর ও কৃত্রিম ব্যক্তিভাবনার সংস্কারশেষ নিঃশেষে বর্জন করে চলে—উৎক্রান্তির পথে অন্নময় কোশের মত প্রাণ-ময় ও মনোময় কোশকেও সে ঝেড়ে ফেলে। কিন্তু দেহ-প্রাণ-মনের সূক্ষ্মভাবে ব্যক্তিসত্ত্বের উপজীব্যরূপে অন্তর্লীন আশয় হয়ে অথবা ভবিষ্যের স্ফুরণোন্মুখ বীজরূপে তার অনু-বর্তন করে। মন যার অপরিণত,, সচেতন অবস্থায় সে প্রাণলোকের ওপারে পেতে পারে না। সুতরাং প্রাণময় স্বর্গ-নরক ভোগের পর হয় প্রাণলোক থেকেই তাকে ফিরতে হয় পৃথিবীতে, নয়তো স্বভাবের নিয়মে অন্তরাভব-দশার বাকী সময়টুকু কাটে তার অন্তর্গূঢ় কর্মপরিপাকের যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে। মৃত্যুর পর ঊর্ধ্বভূমিতে সচেতন থাকা বিশেষ সাধনাসাপেক্ষ—একথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু লোকান্তরস্থিতির এই বিবৃতি অধিচেতন ভূমির অনুভবদ্বারা সমর্থিত এবং কার্যত তার সার্থকতা অপরিহার্য হলেও, মানুষের তার্কিক মন

তাকে অনস্বীকার্য না বলে বলবে বিশ্বলীলার একটা সম্ভাবিত ছন্দোরূপ। প্রশ্ন হবে : তত্ত্বের দিক দিয়েই হ'ক বা প্রয়োজনের দিক দিয়েই হ'ক অন্তরাভবস্থিতিকে একটা অনতিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত বলে মানবার পক্ষে কি যুক্তি আছে? ...একটা যুক্তি খুবই স্পষ্ট। ঊর্ধ্বলোকের সঙ্গে পার্থিবপরিণামের যে গভীর যোগ আছে এবং জীবচেতনার ঊর্ধ্বপরিণামের সঙ্গেও যে তাদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে—একথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের প্রগতি সম্ভব হচ্ছে মর্ত্যভূমির 'পরে ঊর্ধ্বলোকের নিগূঢ় শক্তিপাতের ফলে। অচিতি বা অবচেতনার গহনে সবই রয়েছে—কিন্তু রয়েছে বীজরূপে। তাদের বিকাশ ঘটে উপরের চাপে। জড়প্রকৃতির আধারে আমাদের যে প্রাণময় ও মনোময় পরিণাম চলছে, তার প্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য ঊর্ধ্ব হতে অবিচ্ছিন্ন শক্তিপাতের প্রয়োজন আছে। প্রাণ ও মনকে চারদিক হতে ঘিরে আছে অজ্ঞান ও অচেতন জড়প্রকৃতির অসাড় বাধা। তাকে নির্জিত করে প্রগতির পূর্ণসংবেগকে কি আপন নিগূঢ় ঐশ্বর্যকে স্বচ্ছন্দে ফুটিয়ে তোলবার জন্য চাই জড়োত্তর সগোত্র শক্তির অন্তর্গূঢ় অথচ অবিশ্রাম আবেশ ও আধারের পারার্থ্য। এই নিগূঢ় গোত্রসম্পর্কের প্রৈষা এবং অধারের পারার্থ্য প্রধানত আশ্রয় করে আমাদের অধিচেতন সত্তাকে—বহিঃসত্তাকে নয়। অধিচেতনাই আমাদের চিৎশক্তির ভাণ্ডার। ওখান থেকে আমরা যে শুধু শক্তি আহরণ করি, তা নয়। অহরহ সংঘাতের ফলে আমাদের আধারে চেতনার যে স্ফুরণ হয়, তারও শক্তি সঞ্চিত এবং পুষ্ট হতে থাকে ওইখানে—বীর্যবত্তর ভবিষ্য-প্রকাশের উদ্যতি নিয়ে। অধিচেতনার সঙ্গে বহিশ্চেতনার এমনিতর ক্রিয়া-ব্যতিহার আছে বলেই, একবার জড়গ্রস্ত মনের অবরভূমিগুলি পার হয়ে গেলে মানুষের জীবনে অধ্যাত্মপ্রগতি দ্রুতবিসর্পী হয়।

অন্তরাভবস্থিতিতেও এই আবেশ ও পারার্থ্য অব্যাহত থাকে। কারণ, বিগত জীবনের ঠিক শেষ অনুচ্ছেদ থেকে তারই অনুবৃত্তিকে নবজাতক জীবনের নতুন ধারা বলতে পারি না। নতুন জন্ম সর্বদিক দিয়েই নতুন—সে শুধু অতীতের বহিশ্চর সত্ত্ব ও প্রকৃতির গতানুগতিক অনুসৃতি নয়। তার মধ্যে আছে অতীত ভাব ও প্রেতির সমানয়ন পরিবর্জন ও পরিপুষ্টি, অতীত বিত্তের নবীন বিন্যাস এবং অনাগতের জন্য অনুকূল উপাদানের নির্বাচন: নইলে অভিনবের প্রবর্তনা সার্থক প্রগতির পথে এগিয়ে চলতে পারে না। প্রত্যেক জন্মেই নতুন করে আমাদের যাত্রা শুরু, অতীতের পরিণাম হলেও সে তার মূঢ়সংস্কারের অন্ধ অনুবর্তন নয়। পুনর্জন্ম শুধু অন্তহীন পুনরাবৃত্তি নয়—অবিচ্ছেদ প্রগতিই হল তার মর্মচ্ছন্দ। চিন্ময় পরিণামের লীলায়নকে সার্থক করবার কৌশল সে। তার জন্যে আধারের উপকরণগুলিকে ঢেলে সাজবার যে-ব্যবস্থা, বিশেষত অতীত ব্যক্তিসত্তার বহু দুর্বার স্পন্দনকে

স্তব্ধ করবার যে-প্রয়োজন, তা কখনও মৃত্যুর পরে দেহ-প্রাণ-মনের প্রাক্তন তীব্রসংবেগের অবক্ষয় না ঘটলে সিদ্ধ হতে পারে না। এই অবক্ষয় অথবা নতুন রীতিতে ব্যূহনের জন্য, যে-ভূমির শক্তিপাতে সংবেগের উৎপত্তি সেই ভূমিতে গিয়ে অন্তর্মুক্তি বা ভারমোচনের সাধনা করতে হবে। কেননা সংবেগের পরিশীলন দ্বারাই তার অবক্ষয় সম্ভব—অতএব চেতনাকে তার সংস্কার হতে মুক্ত হয়ে নতুন ভাবে ভাবিত হবার জন্য সংবেগের জন্মভূমিতেই বাসা বাঁধতে হবে। তাছাড়া যখন অনুকূল উপাদানের সমাহরণদ্বারা নব-জন্মের ভূমিকারচনা ও তার প্রকৃতি-নিরূপণ চৈত্য-পুরুষের নির্দেশেই ঘটবে, তখন স্বধামে আত্মস্বরূপে বিশ্রান্ত হয়ে তিনি নিজের মধ্যে সকলকে সংহৃত করে প্রগতিনাট্যের নতুন অঙ্কের প্রতীক্ষা করবেন—এই তো স্বাভাবিক। এইজন্য মৃত্যুর পর একে-একে ভূতসূক্ষ্মলোক, প্রাণলোক ও মনোলোক পার হয়ে জীবাত্মাকে অবশেষে উত্তীর্ণ হতে হয় চৈত্যলোকে এবং সেখান হতে শুরু হয় তার মর্ত্যের অভিযান। এই ভূমিতেই তার পার্থিব উপাদানের সমাহরণ ও পরিপাক চলে এবং অন্তরাভবস্থিতির এই আবেশে তারা মর্ত্যজীবনে সহজ হয়ে ফুটতে পায়। এমনি করে মানুষের নবজন্ম হয় দেহীর বিশিষ্ট চিৎ-পরিণামের একটা অভিনব ঊর্ধ্বকুণ্ডলী, অথবা তার সংহৃত শক্তির পরি-স্ফুরণের নবীন ক্ষেত্র।

যখন বলি, জীবাত্মা পৃথিবীতে তার অন্নময় প্রাণময় মনোময় ও চিন্ময় সত্তাকে একে-একে ফুটিয়ে তুলছে, তখন তার অর্থ এ নয় যে এদের কোনও প্রাক্‌সত্তা ছিল না—এরা জীবাত্মার আনকোরা নতুন সৃষ্টি। বরং এসমস্ত তার চিৎস্বভাবের বিভূতি। তাদের পূর্বসিদ্ধ সত্তাকেই জড়প্রকৃতির আরোপিত নিমিত্ত-পরিবেশের মধ্যে সে স্ফুরিত করছে, এই তার কৃতিত্ব। তাই জীবাত্মার বিসৃষ্টিতে দেখা দিল একটা কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার পুরঃক্ষেপ—যা বস্তুত জড়ের ছন্দে ও জড়ের ভাষায় জীবের অন্তরাত্মারই রূপান্তর। পূর্বসূরিদের সিদ্ধান্তে সায় দিয়ে বলতে হবে, মানুষের মধ্যে যে শুধু অন্নরসময় পুরুষই আছেন তা নয়, তার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে আছেন প্রাণময় মনোময় চিতিময় অতিমানস ও পর-চিন্ময় পুরুষও।* মানুষের অধিচেতনায় অন্তর্গূঢ় কিংবা অতিচেতনায় অব্যাকৃত হয়ে আছে তাঁদের সমগ্র না হ'ক্‌ সুবিপুল আবেশ ও প্রৈষার বৈদ্যুতী। সেই বীর্যবিভূতিকে আধারের চিৎ-শক্তিতে জ্বালিয়ে তোলা, তাদের অগোচর প্রভাবকে প্রাকৃতচেতনার গোচরীভূত করা—এই তো মানুষের তপস্যা। কিন্তু এসব অপ্রাকৃত শক্তি মর্ত্য আধারে নিবিষ্ট থাকলেও তাদের প্রত্যেকের একটা স্বধাম আছে এবং সেখানথেকেই

* তৈত্তিরীয় উপনিষদ।

আমাদের উন্মুখ অধিচেতনায় তাদের আবেশ বা নিয়ামিকা শক্তি নেমে আসে। অধ্যাত্মপ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে এই আবেশ ও পারার্থ্য সম্পর্কে ক্রমেই আমরা সচেতন হয়ে উঠি। যদি বলি, আত্মপরিণামের সচেতন সাধনায় এইসব অপ্রাকৃত শক্তির যতখানি উপচয় ঘটে, তার 'পরেই আমাদের অন্তরাভবস্থিতির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে—যার মূলে রয়েছে মানুষের এই মর্ত্যজন্মকে আশ্রয় করে প্রকৃতির ঊর্ধ্বমুখী পরিণামের প্রেরণা, তাহলে কথাটা অযৌক্তিক হয় না। অবশ্য অন্তরাভবস্থিতির ক্রম ও পরিবেশ অত্যন্ত জটিল। প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস তার যেমন অতিসহজ ও নিরেট একটা বিবৃতি দিয়েছে, আসলে ব্যাপারটা তেমন সহজ নয়। তবু একথা সত্য যে, আত্মার জড়দেহ ধারণের মূলে এবং তার ধরনধারনের সঙ্গে লোকান্তরস্থিতির একটা গভীর সম্বন্ধ আছে। বস্তুত বিশ্ব জুড়ে পরিণাম ও ব্যতিষঙ্গের এক জটিল জাল বোনা রয়েছে—চিন্ময়ী মহাশক্তি যার গ্রন্থিযোজনা করেছেন আপন অন্তর্নিহিত প্রেতির ঋতচ্ছন্দের অনুসরণে, অনন্তের এই সান্ত-লীলার অপ্রাকৃত ন্যায়যুক্তির প্রবর্তনায়।

জীবাত্মার জন্মান্তর এবং সাময়িক লোকান্তর-গতির এই বিবৃতি যদি সত্য হয়, তাহলে এ-সম্পর্কে আমাদের আবহমান ধারণার সংস্কার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে—কেননা এই দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটার মূলে দেখা দেয় নতুন একটা তাৎপর্য। জন্মান্তরের দুটি দিক আছে বলে সাধারণের ধারণা—একটা তাত্ত্বিক, আরেকটি নৈতিক। তত্ত্বত জন্মান্তর ঘটে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে, কিন্তু নীতির দিক থেকে দেখলে জন্মান্তর ধর্মানুশাসন ও বিশ্বজনীন ন্যায়বিধানের অন্তর্গত। এই মতে জীব সত্য। পৃথিবীতে তার জন্ম হয় অবিদ্যা এবং বাসনার প্ররোচনায়। বাসনার ঝামেলায় শ্রান্ত হয়ে যতদিন না তার অবিদ্যা-সম্পর্কে চেতনা জাগছে এবং বিদ্যার উদয় হচ্ছে, ততদিন এই পৃথিবীতেই তাকে থাকতে হবে কিংবা এইখানেই বারবার আসতে হবে। বাসনা তাকে ফিরে-ফিরে নতুন শরীর নিতে বাধ্য করে। সুতরাং জীবকে ভবচক্রে আবর্তিত হয়ে চলতেই হবে, যতক্ষণ না জ্ঞানোদয়ে তার মুক্তি হচ্ছে। শুধু পৃথিবীই জীবাত্মার বাসভূমি নয়। এখানে অনুষ্ঠিত পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করতে মৃত্যুর পর লোকান্তরে তার নরক বা স্বর্গবাস হয়, তারপর পাপ-পুণ্যের অবক্ষয়ে আবার সে পৃথিবীতে ফিরে পার্থিব দেহ ধরে—কখনও মানুষরূপে, কখনও-বা তির্যক কি উদ্ভিদরূপে। কোন্ যোনিতে কি কপাল নিয়ে জন্ম হবে, তা স্বভাবতই নির্ভর করে তার অতীত কর্মের 'পরে। পুণ্যের জোর মোটের উপর বেশী হলে জীবের জন্ম হবে উচ্চযোনিতে, জীবনে নামবে সুখ সিদ্ধি বা অতর্কিত সৌভাগ্যের জোয়ার। আর পাপের ফলে জন্ম হবে নীচযোনিতে,—তার মধ্যে মানুষজন্ম হলে তার দুঃখ দুর্গতি ও সন্তাপের

আর অন্ত থাকবে না। আবার পূর্বজন্মে সুকৃতি-দুষ্কৃতির মিশ্রণ থাকলে, প্রকৃতিও পাকা হিসাবীর মত অতীত কর্মের বাটখারায় নিখুঁতভাবে ওজন করে সুখদুঃখের মিশ্র-ভোগের ব্যবস্থা করবে—সিদ্ধির সঙ্গে অসিদ্ধিকে, অতুল সৌভাগ্যের সঙ্গে দারুণ দুর্ভাগ্যকে অসঙ্কোচে জড়িয়ে দেবে। তাছাড়া জীবের তীব্র বাসনা বা দুর্বার সংকল্পও কখনও জন্মান্তরের নিয়ামক হয়। কর্মফল-বণ্টনের বেলায় প্রকৃতির হিসাব একেবারে চুলচেরা : যেমন কর্ম ঠিক তেমনি ফল, যেমন পাপ তেমনি সাজা, ঢিলটি মারলে ঠিক পাটকেলটি খেতে হবে—এই হল কর্মের অলঙ্ঘ্য বিধান। কর্মফলের বিধাতা একাধারে শুভংকর এবং ধর্মরাজ দুইই। কর্ম এবং কর্মফলের আর্যা যেমন তাঁর নখাগ্রে, তেমনি দণ্ড-বিধির ধারাও তাঁর উদ্যত হয়ে আছে বহুপূর্বের দুষ্কৃতি ও অপরাধের নিখুঁত বিচারের জন্য। অথচ রহস্য এই, তাঁর এজলাসে একই কর্মের দরুন আছে দণ্ড-পুরস্কারের ডবল বিধান : পাপের জন্য পাপীকে একবার তো নরকভোগ করতেই হবে, আবার সেই পাপের ফলে ইহলোকেও দুর্গতিভোগটা তার বাদ যাবে না। তেমনি পুণ্যাত্মার জন্য একবার স্বর্গসুখের ব্যবস্থা, আবার ওই একই পুণ্যকর্মের পুরস্কারস্বরূপ নতুন জন্মে সংসারসুখের অঢেল বরাদ্দ।

বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে জনমতের রায় বেশ সংক্ষিপ্ত ও জোরালো হলেও তার দার্শনিক মূল্য খুবই কম—তাতে জীবনরহস্যেরও কোনও মীমাংসা হয় না। বিরাট বিশ্ব অবিদ্যাচক্রে আবর্তিত একটা যন্ত্র শুধু, কোনরকমে এই যন্ত্রের খপ্পর হতে একবার ছিটকে পড়বার আশাটুকুই জীবের অবলম্বন—এ-কল্পনার একটা নিরুত্তর জিজ্ঞাসা থেকেই যায় : এমন জগৎসৃষ্টির কি কোনও প্রয়োজন ছিল? আবার সংসারটা যদি হয় কর্মফলক্ষয়ের একটা কারখানা শুধু যার মধ্যে মোয়া আর চাবুকের ব্যবস্থাটাই পাকা—তাতেও আমাদের বুদ্ধি খুশী হয়ে ওঠে না। জীবের আত্ম-পুরুষ যদি চিন্ময় অমৃত ও দিব্যধামবাসী হন, তাহলে এমনতর কেঠো নৈতিক-শিক্ষার জন্য মোয়া-চাবুকের ব্যবস্থা করে তাঁকে জগতে পাঠানোর কি-যে মহিমা, তাও চোখে পড়ে না। আত্মাই যদি অবিদ্যাকে অঙ্গীকার করে থাকেন, তাহলে কারও খেয়ালের বশে তা করেননি—করেছেন অবিদ্যাকে নিমিত্ত করে তাঁর অন্তর্গূঢ় কোনও-একটা বৃহত্তর তত্ত্ব বা সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য। পক্ষান্তরে, জীবাত্মা যদি অনন্ত-স্বরূপের পরা প্রকৃতি হয়, জড়ের গহনে তার আত্মনিগূহন এবং সে-তমিস্রাকে দীর্ণ করে চিন্ময় উন্মেষের তপস্যা যদি বিশ্বের একটা ঋতচ্ছন্দ বিধান হয়, তাহলে জীবের এই মর্ত্যজীবন ও তার তাৎপর্য শুধু মোয়া-চাবুকের দৌলতে ছেলে মানুষ করবার ব্যবস্থাতেই পর্যবসিত হবে না। আত্মবিসৃষ্টির উল্লাসে স্বেচ্ছাকল্পিত অবিদ্যার আবরণকে পরাভূত করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া, অচিতির অন্তর্নিহিত দিব্যবিভূতিকে তার আপন আধারেই অমৃত চেতনায়

চিন্ময় বীর্যে ও লোকোত্তর শুচি-শ্রীতে ভাস্বর করে তোলা—এই হবে জীবনের গভীর তাৎপর্য। কর্মবাদ এ-সাধনায় সিদ্ধি আনবে, এ-কল্পনা নিতান্তই ছেলেমানুষি। এমন-কি জীব যদি সৃষ্ট এবং পরতন্ত্রও হয়, প্রকৃতি-জননীর লালনে-তাড়নে শৈশব কাটলে তবে যদি সে অমৃতের অধিকার পায়, তবু তার অধ্যাত্মপ্রগতির মূলে থাকবে বৃহত্তর কোনও ঋতের বিধান —দণ্ড-পুরস্কারের মান্ধাতাযুগী বর্বরোচিত বিধান নয়। কর্ম-বিধানের এ-কল্পনার উদ্ভব হয়েছে মানুষের অবরপ্রাণের সংকীর্ণ সংস্কার থেকে—যার মধ্যে ক্ষুদ্র রাগ-দ্বেষ ও তুচ্ছ সুখ-দুঃখের আন্দোলনটাই একান্ত। কিন্তু এমনি করে সংকুচিত প্রাণের মাপকাঠিতে বিশ্ববিধানের লক্ষ্যকে মাপতে যাওয়া অবিদ্যামূঢ় মানবচিত্তের নিরর্থ জল্পনামাত্র। চিন্তাশীল বিবেকী চিত্ত কোন-মতেই তাকে যুক্তিসিদ্ধ বলে গ্রহণ করতে পারে না।

কিন্তু কর্মবাদেরও একটা বিচারসম্মত রূপ আছে। সেখানে সে অসম্ভাবনাদোষ হতে নির্মুক্ত হয়ে দেখা দেয় বিশ্ববিধানের বর্ণরাগ নিয়ে। কর্মবাদের পক্ষে যুক্তি এই। প্রথমত একথা অনস্বীকার্য যে, প্রকৃতির সমস্ত শক্তিরই স্বাভাবিক বিপাক আছে। সে-বিপাক সদ্য-সদ্য দেখা না দিলেও তা বিলম্বিত হয় মাত্র—লুপ্ত হয় না। জীবমাত্রেই স্বভাবনিহিত শক্তির বিচ্ছুরণে কর্ম করে এবং তার কৃত-কর্মের বিপাক বা পরিণাম হয় তার ভোগ্য। যে-বিপাক এ-জীবনে দেখা দিল না, তা তোলা থাকবে পরবর্তী কোনও জন্মের জন্য। অবশ্য একথাও সত্য যে, কর্মফলের সবটাই মানুষের একার ভোগে আসে না। হামেশা দেখছি, মানুষের জীবনকালেই তার কর্মের ফল অপরের ভোগে লাগে—মৃত্যুর পর তো কথাই নাই। তার কারণ, প্রকৃতির মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের একটা সংহতিতে সর্বত্র এক অবিভাজ্য প্রাণের প্রকাশ ঘটছে। তাই ইচ্ছা করলেও ব্যষ্টিজীব সমষ্টি হতে বিযুক্ত থাকতে পারে না। কিন্তু প্রাণ-প্রবাহের অনুবৃত্তি কেবল সমাজ বা বিশ্বের বেলায় সত্য না হয়ে জন্মান্তরের মাধ্যমে ব্যষ্টির বেলাতেও যদি সত্য হয়, ব্যষ্টির মধ্যেও যদি আত্মভাব ও আত্ম-প্রকৃতির বিশিষ্ট-পরিণামের একটা ধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে, তাহলে ব্যষ্টিজীবও নিজস্ব শক্তিপরিণামের ফল হতে কখনও বঞ্চিত থাকতে পারে না —অখণ্ড জীবনযাত্রার কোনও-না-কোনও পর্বে সে-ফল তার ভোগে আসেই। মানুষের আধার প্রকৃতি ও পরিবেশ সমস্তই তার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ আত্ম-শক্তির পরিণামমাত্র—তার মধ্যে অতর্কিত বা অবোধ্য কিছুই নাই। সে নিজেই নিজের বিধাতা। তার অতীতই বর্তমানের জনক, আবার এই বর্তমানই জন্ম দেবে তার ভবিষ্যকে। কর্মানুযায়ী ফলভোগ সবাইকে করতে হবে। মানুষের সুখদুঃখ সমস্তই কৃতকর্মের বিপাক মাত্র। এই হল কর্মবাদ বা স্বভাবশক্তির বিচ্ছুরণবাদ। এর মধ্যে যুক্তির যে-ব্যাপকতা আছে, অন্যান্য জীবনদর্শনে তা

নাই—কেননা এতে আমাদের সত্তা স্বভাব চারিত্র ও কর্মের অখণ্ডবিভূতির একটা তাৎপর্য আমরা খুঁজে পাই। কর্মবাদ অনুসারে, মানুষের অতীত ও বর্তমান কর্ম তার অনাগত জাতি আয়ু এবং ভোগ নিরূপিত করে। এসমস্তই তার আত্মশক্তির পরিণাম। অতীতে সে যা ছিল বা যা করেছে, তা-ই তার বর্তমানের সত্ত্ব এবং ভোগ সৃষ্টি করেছে। তেমনি বর্তমানে সে যা হয়েছে বা করছে, তা-ই গড়ে তুলবে তার অনাগতকে। মানুষ শুধু নিজেকেই সৃষ্টি করে না—সৃষ্টি করে তার ভাগ্যকেও।...এসমস্ত যুক্তিই বলতে গেলে অনস্বীকার্য। কর্মবাদ যে বিশ্ববিধানের একটা অপরিহার্য অঙ্গ—তা মানতেই হবে। কেননা জীবনপ্রবাহ জন্মান্তরের ধারা ধরে বয়ে চলেছে, একথা স্বীকার করলে কর্ম-বাদের সুস্পষ্ট সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় থাকে না।

কিন্তু এ-সিদ্ধান্তের দুটি অনুসিদ্ধান্ত আছে। তাদের অধিকার তত ব্যাপক ও প্রামাণিক নয় বলে আমাদের চিত্তে তারা সংশয়ের ছায়া ফেলে। হয়তো কিছু সত্য তাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু তার অতিরঞ্জনটাকেই কর্ম-বাদের মর্মসত্য বলে প্রচার করাতে দৃষ্টিবিকারের একটা বঞ্চনা দেখা দিয়েছে। প্রথম অনুসিদ্ধান্তটি এই। শক্তির পরিণাম নিরূপিত হয় শক্তির প্রকৃতি-দ্বারা। শুভশক্তির পরিণাম যেমন শুভ, অশুভশক্তির পরিণামও তেমনি অশুভ। দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্ত এই : কর্মের বিধান মূলত ন্যায়ের বিধান। অতএব শুভকর্মের ফলে সুখ ও সৌভাগ্য, এবং অশুভকর্মের ফলে দুঃখ দৈন্য ও দুর্গতি অনিবার্য। যেমন করেই হ'ক, বিশ্বজনীন ন্যায়ের অলঙ্ঘ্য বিধান প্রকৃতির সদ্যোভূত এবং প্রতীয়মান সমস্ত ব্যাপারের উপদ্রষ্টা ও নিয়ন্তা। সে-নিয়মনকে জীবনের প্রতিমুহূর্তে সুস্পষ্ট দেখতে না পেলেও সে-যে সমষ্টি-প্রকৃতির নিগূঢ় প্রবৃত্তির সর্বত্র বর্তমান, তাতে সংশয় নাই। হয়তো সে সূক্ষ্ম এবং অদৃশ্যপ্রায় অথচ দুশ্ছেদ্য সূত্ররূপে প্রকৃতির খুঁটিনাটি এলোমেলো সকল ব্যাপারকেই একটা ছন্দে গেঁথে তুলছে। প্রশ্ন হবে : কেবল শুভাশুভ কর্মের বিপাক ঘটবে—শুভাশুভ চিন্তা ও ভাবের কেন বিপাক ঘটবে না? তার উত্তর এই : ভাব চিন্তা ও কর্ম—সবারই বিপাক ঘটে। কিন্তু কর্ম জুড়ে আছে মনুষ্যজীবনের প্রায় সবখানি, কর্ম দিয়েই মানুষের সত্তার যাচাই হয় এবং শক্তির রূপায়ণ ঘটে—ভাব বা চিন্তা তার ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কর্ম তার ইচ্ছাধীন বলে মানুষকে কৃতকর্মের জন্যেই দায়ী করা চলে। তাই কর্মকেই তার ভাগ্যের নিয়ন্তা এবং তার অনাগতের সর্বাপেক্ষা নিরঙ্কুশ বিধাতা বলি। এই হল কর্মবাদের পূর্ণ পরিচয়।

কিন্তু প্রথমেই দেখছি, কর্মের বিধান যান্ত্রিক বিধানমাত্র। বিশ্বজগৎ অলঙ্ঘ্য নিয়তির একটা যন্ত্র না হলে, কর্মবাদ দিয়ে তার প্রাণলীলার সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যা হয় না। অনেকের ধারণা, বিশ্বব্যাপার শুধু নিয়তিকৃত নিয়মের

আবর্তন। এর অন্তরে কি অন্তরালে কোনও চিন্ময়পুরুষ বা সত্যসঙ্কল্পের প্রেতি নাই। আমাদের মানুষী বুদ্ধিও নিয়মের লীলা আবিষ্কার করতে পারলে খুশী—যুক্তির দাবিই তার কাছে সবার বড়। অতএব বিশ্ববিধান যদি গণিতের বিধানের মত নির্ভুল ও নিখুঁত হয়, তাহলে সে-ই তো সত্য-সুন্দরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হবে।...কিন্তু বিশ্বে শুধু নিয়মের খেলাই তো চলছে না—পুরুষের সত্তা ও চৈতন্যের প্রৈষাও যে আছে তার মধ্যে। বিশ্বে যেমন যন্ত্র আছে, তেমনি আছে চিন্ময় যন্ত্রী। যেমন আছে প্রকৃতি ও বিশ্ববিধান, তেমনি আছে বিশ্বম্ভর পুরুষেরও অধিষ্ঠান। প্রাকৃত জীবের মধ্যে আছে শুধু দেহ-প্রাণ-মনের ব্যাপ্রিয়া নয়—আছে তাদের ভর্তা ও ভোক্তা এক অধ্যাত্ম-সত্ত্ব। এই আত্মসত্তাকে বাদ দিয়ে জন্মান্তর বা কর্মবাদ কোনটাই দাঁড়াতে পারে না। প্রকৃতির যন্ত্রমাত্র না হয় আমরা যদি আত্মবান্ পুরুষ হয়ে থাকি, তাহলে হৃৎ-শয় সেই পুরুষই হবেন আমাদের শক্তিপরিণামের প্রমুখ নিয়ন্তা এবং কর্ম-বিধান হবে তাঁরই প্রবর্তিত একটা সাধন। অর্থাৎ আমাদের আত্মা কর্মের চেয়েও বড়। নিয়তির নিয়ম যেমন আছে, তেমনি আছে আত্মার স্বাতন্ত্র্য। নিয়মের খেলা আমাদের জীবনের বহিরঙ্গনে অর্থাৎ প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের ব্যাপারে, কেননা এরাই বলতে গেলে প্রকৃতির যন্ত্রলীলার পরবশ। সেখানেও আবার নিয়মের শাসন পুরাপুরি খাটে দেহ আর জড়ের 'পরেই। প্রাণের বেলায় জড়ের চাইতে নিয়মের জটিলতা বেশী, কিন্তু আড়ষ্টতা কম। যেখানে প্রাণের স্ফুরণ, সেখানেই প্রাকৃত ব্যাপারে যান্ত্রিকতার জায়গায় ফুটেছে সাবলীলতার ছন্দ। মনের সূক্ষ্মতর লীলায়নে এ-ভাবটি আরও পরিস্ফুট। প্রথম হতেই সেখানে দেখি একটা অন্তঃশীল স্বাতন্ত্র্যের আভাস। আর যত অন্তর্মুখী হই, ততই পাই আত্মার স্বৈরিতা ও ঈশনার পরিচয়। প্রকৃতি বিধি ও ব্যাপারের ক্ষেত্র শুধু, আসলে পুরুষই তার প্রবর্তক ও অনুমন্তা। সাধারণত তাঁর মধ্যে সাক্ষিস্বভাবের স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতির দ্যোতনা থাকলেও, ইচ্ছামাত্র তিনি আপন প্রকৃতিকে অবষ্টব্ধ করে তার মহেশ্বর হতে পারেন।

আমাদের অন্তঃস্থ চিৎসত্তা কর্মতন্ত্র, পুরুষ এ-জীবনে অতীত কর্ম-বিপাকের ক্রীড়নকমাত্র—একথা অশ্রদ্ধেয়। সত্যের লীলায়ন লঘু ও সাবলীল—আড়ষ্ট ও ভারগ্রস্ত কখনই নয়। অতীতের খানিকটা কর্মফল বর্তমানে যদি রূপায়িত হয়েও থাকে, তবুও জানি চৈত্যপুরুষই আমাদের পার্থিব নবজন্মের অধিনায়ক এবং তাঁরই অনুমতিক্রমে প্রকৃতির এই আয়োজন। তাঁর ঈক্ষণ যে শুধু প্রকৃতির আবশ্যিক বহিরঙ্গ ব্যাপারের পিছনেই আছে তা নয়, জীবনের মর্মে নিহিত দিব্য ক্রতু এবং অনুশাসনেরও মূলে রয়েছে তাঁর প্রবর্তনা। তাঁর সে-ক্রতু চিন্ময়, জড়তন্ত্র নয়। তাঁর অনুশাসন বুদ্ধিযোগের অনুশাসন, যন্ত্র-ব্যাপারকে সাধনরূপে ব্যাপারিত করে বলেই সে তার অধীন নয়। শরীর

পরিগ্রহ করে জীবাত্মা চাইছেন আত্মবিভাবনা ও স্বানুভবের আনন্দ। ওই আনন্দরূপটি এই জীবনে ফুটিয়ে তুলতে যা-কিছু প্রয়োজন—হ'ক তা অতীত জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত কর্মবিপাক অথবা ঈপ্সিত বিপাকের চয়নিকা ও অনুবৃত্তি, কিংবা আনকোরা নতুন সৃষ্টি—এককথায় যা-কিছু অনাগতের সৃষ্টি-সাধন, তাকেই তিনি মূর্ত করতে চাইবেন। তাঁর এ-আকৃতির গোড়ার কথা হল কোনও যান্ত্রিক বিশ্ববিধানের অনুবর্তন নয়, কিন্তু বিশ্বব্যাপারকে অঙ্গীকার করেই প্রকৃতির চিন্ময় পরিণাম দ্বারা অবিদ্যার কবল হতে তার প্রমুক্তি। অতএব এর মধ্যে একদিকে কর্মও যেমন সাধন হবে, তেমনি আরেকদিকে তার স্ব-তন্ত্র সাধক হবেন আমাদেরই অন্তর্যামী কবিক্রতু—দেহ প্রাণ ও মনের লীলায়নে যাঁর চিন্ময় সংকল্পের প্রকাশ। নিয়তি অন্ধই হ'ক বা আমাদের কর্মবিপাকের সৃষ্টিই হ'ক—মানুষের সত্তার শুধু সে একটা দিক। তার চাইতেও বড় হল অধিষ্ঠানপুরুষের চৈতন্য এবং ক্রতু। আমাদের ফলিত জ্যোতিষ ঘোরতর কর্মবাদী। তার মতে আকাশের তারায় অনাগত জীবনের ইতিহাস দুর্মোচন অক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু সেও স্বীকার করে, পুরুষকার দ্বারা দৈবকে প্রতিহত বা পরিবর্তিত করবার শক্তি মানুষের আছে—এমন-কি কর্মের অতিদুস্তর বিধানকে পালটে দিতেও সে পারে। এতে হিসাবের হের-ফের অনেকটা মেটে বটে। কিন্তু এই কথাটিও জুড়তে হবে তার সঙ্গে : নিয়তিও অত্যন্ত জটিল—মোটেই সে সরল নয়। আমাদের জড়সত্তাকে যে-নিয়তি নিয়মিত করছে, তার অধিকার ততটুকু বা ততক্ষণ, যতক্ষণ না জীবনে একটা বৃহত্তর বিধানের অধিকার দেখা দেবে। কর্ম আমাদের আত্মসত্তার স্থূল পরিণাম, অতএব সে আধারের জড় অংশের অন্তর্গত। কিন্তু এই বহিশ্চেতনার অন্তরালে রয়েছে যে প্রমুক্ত প্রাণ ও মনের স্ব-তন্ত্র শক্তি, তার আছে অভিনব একটা নিয়তিকে প্রবর্তিত করে আদিনিয়তিকে পরাবর্তিত করবার আশ্চর্য সামর্থ্য। আবার চৈত্যসত্তা ও আত্মসত্তার উন্মেষে চিন্ময় পুরুষরূপে যখন স্বপ্রকাশ হব, আমরা তখন হব নিয়তিরও নিয়ন্তা। অতএব কর্মকে—অন্তত কার্মণ-যন্ত্রবাদকে—আমাদের জীবনপরিবেশের একমাত্র নিয়ন্তা অথবা জন্মান্তর ও ভবিষ্যপরিণামের একমাত্র সাধন বলে কোনমতেই মানা চলে না।

শুধু তা-ই নয়। অধ্যাত্মপরিণামের গহন বৈচিত্র্যকে প্রচলিত কর্মবাদের অতিসরল সূত্র দিয়ে এত সহজে ব্যাখ্যা করা চলে না। কর্ম নিশ্চয়ই শক্তির পরিণাম, কিন্তু শক্তি তো একরকমের নয়। চিৎশক্তির প্রকাশভঙ্গি বিচিত্র এবং শতমুখী। ইন্দ্রিয়ব্যাপার ও জীবনযোনিপ্রযত্ন, প্রাণন মনন বাসনা প্রবৃত্তি ও উত্তেজনার আন্দোলন, সত্য জ্ঞান ও সৌন্দর্যের এষণা, ধর্মাধর্মের অনুশীলন, শক্তি প্রীতি হর্ষ সুখ সিদ্ধি ও ঋদ্ধির তপস্যা, প্রাণের বিচিত্র তর্পণ ও প্রসারের সাধনা, ব্যষ্টির বিত্তৈষণা বা লোকসংগ্রহের ব্রত, কায়িক আরোগ্য বল

সামর্থ্য ও আরামের আয়োজন ইত্যাদি কত বিচিত্র অনুভবে ও বহুমুখী প্রবৃত্তিতে চিৎশক্তির স্ফুরণ ঘটছে জীবনে। এই অতিজটিল বৈচিত্র্যকে কোনও-একটি বিশেষ তত্ত্বের কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করা, অথবা সবাইকে জোর করে পাপ-বৃত্তি ও পুণ্য-বৃত্তির দুটিমাত্র কোঠায় পুরে দেওয়া কখনও সমীচীন হতে পারে না। মনুষ্যকল্পিত ধর্মশাস্ত্রের বিধানকে বাঁচিয়ে চলবার দায় কখনও বিশ্ববিধানের নয়, অথবা তথাকথিত ধর্মানুশাসনকেই কর্মফলের একমাত্র নিয়ামক বলতে পারি না। শক্তির প্রকৃতি যদি তার পরিণামেরও প্রকৃতিকে নিরূপিত করে, তাহলে শক্তির বহুবিচিত্র ভেদের ফলে তার পরিণামভেদও অনিবার্য। সুতরাং সমষ্টির হিসাব কসতে গিয়ে ব্যষ্টির বৈচিত্র্যকে আমরা বাদ দিতে পারি না। সত্য ও জ্ঞানের এষণাতে যে-শক্তির স্ফুরণ হল, স্বভাবত তার পরিণাম (ইচ্ছা হলে পুরস্কারও বলতে পার তাকে) হবে সত্যভাবনার পুষ্টি এবং জ্ঞানের উপচয়। তেমনি মিথ্যার সাধনায় যে-শক্তি নিয়োজিত হবে, তার পরিণামে মিথ্যার কালিমা ও অবিদ্যার ঘোরই ঘনিয়ে উঠবে জীবনে। এমনি করে সৌন্দর্যের সাধনা সার্থক হবে গভীরতর সৌন্দর্যবোধে বা সৌন্দর্যের নিবিড়তর সম্ভোগে, অথবা জীবনে ও চারিত্রে শ্রী ও সুষমার অনবদ্য বিচ্ছুরণে। কায়সম্পদের সাধনায় সৃষ্ট হবে মল্লবীর; শীল ও ধর্মের সাধনায় উপচিত হবে চারিত্রের পুণ্যদীপ্তি, ধর্মবৃদ্ধির আনন্দচ্ছটা অথবা শুচি-সুন্দর জীবনের সারল্যমাখা লাবণ্য। আবার তেমনি পাপবৃত্তির অনুশীলনে পাপাসক্তিই গাঢ়তর, নিদারুণ বিকৃতি ও বিপর্যয়ে প্রকৃতি হবে বিপ্লুত—এমনকি অকুশল কর্মের আতিশয্য চরমে আনবে আত্মহা-র 'মহতী বিনষ্টিঃ'। কেউ যদি শক্তির সাধনা করে অথবা প্রাণের পুষ্টি চায়, সেও ব্যর্থকাম হবে না—তারও ভাণ্ডার পুরে উঠবে বীর্য ও যোগৈশ্বর্যের উপচয়ে। শক্তির এমনিতর যথাযোগ্য পরিণমন হল প্রকৃতির নিরূঢ় রীতি। প্রকৃতির কাছে যদি ন্যায্য বিধানের দাবি করি, তাহলে সাধনার অনুরূপ সিদ্ধির ব্যবস্থা করে ন্যায়ের মর্যাদাকে সে যে অক্ষুণ্ণ রেখেছে—একথা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি। ক্ষোপিষ্ঠকেই সে দেয় ক্ষিপ্রগতির পুরস্কার, কুশলী শূরবীরকেই সে পরায় সংগ্রামের বিজয়-মালা, কুশাগ্রধী জ্ঞানতপস্বীকেই সে করে জ্ঞানৈশ্বর্যের ভাণ্ডারী। যে নিতান্তই ভালমানুষ, অথচ মন্থর দুর্বল আনাড়ী বা নির্বোধ—লোকমান্য সাধুপুরুষ বলেই এসব বিত্তে তার অধিকার জন্মাবে না। এসব ঐশ্বর্যের প্রতি লোভ থাকলে তার জন্য রীতিমত সাধনা করে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে তাকে, নইলে শুধু ভালমানুষির জোরেই এদিক দিয়ে তার বরাত ফিরবে না। প্রকৃতির ব্যবস্থা অন্যরকম হলে, অন্যায়ের সমর্থক বলে তাকে গাল দেওয়া চলত। কিন্তু সাধনার অনুরূপ সিদ্ধির ব্যবস্থা করে সে তো এতটুকু অন্যায় করেনি। আমি পুণ্যের সাধনা করলে প্রকৃতি আমাকে চিত্তের প্রসাদই দেবে—এইটাই স্বাভাবিক

এবং যুক্তিসংগত। কিন্তু তার জন্যে আরেক জন্মে যদি একটা বড় চাকরি কি ব্যাঙ্কের মোটা তহবিল বা আয়েশী নিশ্চিন্ত জীবনের দাবি করে বসি, তাহলে পুণ্যকারীর প্রতি পক্ষপাতহেতু সে অন্যায় দাবি পূরণ করতে প্রকৃতি নিশ্চয় বাধ্য নয়। এমন পক্ষপাত মোটেই জন্মান্তরের তাৎপর্য নয়, অথবা বিশ্বজনীন কর্মবিধানের ভিত্তিও এমন শিথিল নয়।

অবশ্য আমাদের জীবনে নসিবের খেলা বা বরাতজোরের বরাদ্দও নিতান্ত কম নয়। তার ফলে কখনও হয়তো সাধনা করেও যেমন তার ফল পাই না, তেমনি কখনও অসাধনায় বা অল্পসাধনাতেই সিদ্ধি এসে দুয়ারে দাঁড়ায়। ভাগ্য-লক্ষ্মীর এই খেয়ালখুশির মূলে একাধিক কারণ থাকতে পারে। অতীতের গোপন ভাণ্ডার হতে খানিকটা জোগান যে তার এসেছে, তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু তাবলে অতীতের কোনও বিস্মৃত পুণ্যের জোরে এ-জন্মে আমার বরাত খুলে গেল, কিংবা আজকার দুর্ভাগ্য কোনও সুদূর অতীতের পাপের শাস্তি—একথা হজম করা শক্ত। এ-জগতে কোনও পুণ্যাত্মার লাঞ্ছনা দেখলে কি মানতে হবে, আজকার এই আদর্শ সাধুপুরুষটি আর-জন্মে ছিলেন একটি বজ্জাতের ধাড়ি—নবজন্মের জাত্যন্তর-পরিণামেও আজপর্যন্ত যার পাপের বকেয়া মিটল না ? না অসাধুকে লক্ষ্মীমন্ত দেখলে বলব, আর-জন্মে ইনি ছিলেন মহাপুরুষ, অকস্মাৎ স্বভাবের মোড় ফিরলেও অতীত পুণ্যের তহবিল থেকে এখনও তাঁর দৌলতের নগদ জোগান আসছে ? অবশ্য জীবনের এক ধারা হতে আরেক ধারায় এমন ডিগবাজি খাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু তবু এটাই সনাতন রীতি একথা কিছুতেই বলা চলে না। ব্যক্তিসত্তার আনকোরা-নতুন বিপরীত রূপায়ণকে অতীতের দণ্ড-পুরস্কারের ভাগী কল্পনা করলে, কর্মবাদ পর্যবসিত হয় অর্থহীন একটা যান্ত্রিক বিধানে। কর্মবাদের প্রচলিত ব্যাখ্যার এমনতর অনেক গলদ আছে। মোটকথা তার যুক্তিকে দুর্বল করেছে অতিসারল্য। কর্মফল দিয়ে শুধু প্রকৃতির দেনা-পাওনার একটা হিসাব-নিকাশ চলে—একথা বললে কর্মবাদের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে; কারণ এতে মনুষ্যকল্পিত একটা অগভীর ও উপর-ভাসা আদর্শবোধকেই বিশ্ব-বিধানের মাপকাঠি করা হয়। তার মধ্যে যুক্তির দুর্বলতা এতই স্পষ্ট যে, বাধ্য হয়ে কর্মবাদের এর চাইতে পোক্ত একটা ভিত্তি আমাদের খুঁজতে হয়।

যা অন্যত্র হয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। অর্থাৎ ভুল হয়েছে এইখানে যে, মানুষের প্রাকৃত-মনের মাপকাঠিতে আমরা বিশ্বের পুরাণী প্রজ্ঞার প্রমুক্ত উদার ও ব্যাপক লীলায়নকে বিচার করতে গিয়েছি। প্রচলিত কর্মবাদে, প্রকৃতির বহুবিচিত্র কর্মপরিণামের মধ্যে শুধু ধর্মাধর্ম বা পাপপুণ্য এবং বাহ্যিক সুখ-দুঃখ ও শুভাশুভ কি দৈহ্যপ্রাণের ভাল-মন্দ—এই দুটিমাত্র পরিণামকে স্বীকার করে তাদের মধ্যে একটা সমানুপাত দেখাবার চেষ্টা হয়েছে।

পুণ্যের পুরস্কার সুখ, আর পাপের শাস্তি দুঃখ—প্রকৃতির নিগূঢ় ন্যায়ের বিধানে শেষপর্যন্ত যেন এই দুটি ধারাই আছে! স্পষ্টই দেখছি, এই সহচার-কল্পনার মূলে আছে প্রাকৃত-মানুষের অবরপ্রাণের মূঢ় বাসনার প্রেরণা। অবর-প্রাণ চায় সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—দুঃখ-দুর্ভোগের ছায়াপাতেই সে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। অতএব প্রবৃত্তিকে দমন করে কুশলকর্মের উদ্‌যাপন এবং অকুশলকর্মের পরিবর্জনদ্বারা জীবনকে মহত্তর করবার দাবিকে সে যখন মেনে নেয়, তখন এই অনতিরোচক কৃচ্ছ্রতপস্যার পুরস্কারস্বরূপ বিশ্ববিধানের সঙ্গে সে একটা রফা করতে চায়—যার ফলে একদিকে যেমন জৈবতৃপ্তির কতগুলি উপকরণে তার তপঃক্লেশের গ্লানি দূর হবে, তেমনি আবার বিধাতার নির্দিষ্ট দণ্ডভয় আত্মত্যাগের দুশ্চর সাধনায় তাকে প্রবৃত্ত রাখবে। কিন্তু যথার্থই কুশলাভিগামী যিনি, দণ্ড-পুরস্কারের ভয়ে কি লোভে তিনি অকুশলবর্জন বা কুশলানুষ্ঠান করেন না। পুণ্যের দীপ্তিই পুণ্যাচরণের পুরস্কার, স্বভাবের বিচ্যুতিই পাপাচরণের দণ্ড—ধর্মের এই শাশ্বত বিধানকেই শুধু তিনি মানেন। পক্ষান্তরে, দণ্ড-পুরস্কারের কল্পনা ধর্মের স্বারসিক মর্যাদাকে লাঞ্ছিত করে মাত্র। পুণ্যাচরণ তখন পর্যবসিত হয় স্বার্থপর বেনিয়া-বুদ্ধির হীনতায়, পাপবিরতির সত্যকার প্রেতিকে স্থানচ্যুত করে মলিনচিত্তের প্ররোচনা। মানুষ দণ্ড-পুরস্কারের সৃষ্টি করেছে সামাজিক প্রয়োজনে—অপরিণতবুদ্ধিকে সমাজের অনিষ্টাচরণ হতে নিবৃত্ত করে হিতসাধনায় প্রবুদ্ধ করবার জন্য। কিন্তু মানুষের এই কুণ্ঠাহত পরিকল্পনা যে বিশ্বপ্রকৃতিরও বিধান কিংবা পরমার্থ সতের স্ব-ভাবের চরম স্ফূর্তি—একথা অশ্রদ্ধেয়। আমাদের অবিদ্যাকল্পিত পঙ্গু ও সঙ্কীর্ণ বিধিবিধানকে বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র-জটিল অথচ ঋতময় উদার ছন্দের স্থানে বসানো মনুষ্যসুলভ বুদ্ধির কাজ হলেও তাকে নিতান্ত ছেলে-মানুষিই বলব। মানুষের অধ্যাত্মপরিণাম ঘটছে 'হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' পরম-পুরুষের চিন্ময় শিবানুধ্যানের নিগূঢ় প্রেরণায়—বহিশ্চর প্রাণপ্রকৃতির 'পরে লৌকিক দণ্ড-পুরস্কারের বালকোচিত বিধানের বশে নয়। বহুমুখী বিচিত্র-জটিল অনুভবে ছাওয়া জীবাত্মার উত্তরায়ণের পথ। কর্মবাদ কি শক্তিপরি-ণামবাদকে তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হলে বিচিত্র-জটিলরূপেই তাকে কল্পনা করতে হবে—তার একান্ত-সরল অথবা একান্ত-আড়ষ্ট একদেশী বিবৃতি দিয়ে কোনও-কিছুকেই সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না।

তবে তত্ত্বের দিক দিয়ে সাধারণভাবে না হ'ক্, তথ্যের দিক দিয়ে ক্ষেত্র-বিশেষে প্রচলিত কর্মবাদকে খানিকটা সমর্থন করা যেতে পারে। শক্তি-পরিণামের ধারাগুলি বিবিক্ত ও স্ব-তন্ত্র হলেও তাদের মধ্যে ক্রিয়াসমাহার ও ক্রিয়াব্যতিহার অসম্ভব নয়, যদিও তার কোনও পুঙ্খানুপুঙ্খ সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া কঠিন। বহুব্যাপক প্রকৃতি-লীলার কোনও-একটা স্তরে পাপ-পুণ্যের

সঙ্গে স্থূল সুখ-দুঃখের একটা মোটামুটি যোগাযোগ বা ব্যতিষঙ্গ থাকতেও পারে। কিন্তু সেখানেও বিজাতীয় দুটি মিথুনের মধ্যে সঙ্গতি ও সমাযোগের একটা সীমা থাকবে, তাদের মধ্যে অযুতসিদ্ধির সম্বন্ধ কল্পনা করলে চলবে না। আমাদের বাসনায় কর্মপ্রেরণায় ও ব্যবহারে একটা সংমিশ্র প্রবৃত্তির বেগ আছে এবং তার পরিণামেও দেখা দেয় একটা ভাবের সাঙ্কর্য। মানুষের অবর-প্রাণ কায়িক বা মানসিক যে-কোনও সাধনার ফলে—হ'ক্ তা ধর্মের জ্ঞানের বুদ্ধির কি রসের সাধনা—একটা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পুরস্কার চায়। পাপের তো বটেই, এমন-কি অজ্ঞানের দণ্ডকেও সে অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করে। এই আকূতি ও আতঙ্কের জবাবে বিশ্বশক্তির ক্রিয়াতেও একটা অনুরূপ সাড়া জাগতে পারে, কেননা প্রকৃতির লক্ষ্য সুদূরাবগাহী হলেও আমাদের উপস্থিত প্রয়োজন বা দাবিকে খানিকটা মেনে চলতে তার আপত্তি নাই। মনুষ্যজীবনের 'পরে অদৃশ্যশক্তির ক্রিয়াকে যদি মানি, তাহলে আমাদের পিণ্ডগত অবর-প্রাণের অনুকূলে ব্রহ্মাণ্ডগত প্রাণপ্রকৃতিরও একটা অদৃশ্য লীলা থাকবে না কেন? কারণ পিণ্ডপ্রকৃতি আর ব্রহ্মাণ্ডপ্রকৃতি একই চিৎশক্তির দুটি সরূপ বিভূতি, অতএব তারা একই প্রেতির শাসনে একই পরিকল্পনা অনুযায়ী চলবে —এ কিছু অযৌক্তিক নয়। প্রায়ই দেখা যায়, মদোদ্ধত কোনও উগ্র প্রাণের অহমিকা যখন নির্মম দুর্নিবার বেগে তার কামনা বা সঙ্কল্পের সকল বাধা দলিত করে চলে, তখন চারদিকে তার প্রতিক্রিয়ারূপে উত্তাল হয়ে ওঠে লাঞ্ছিত মানবের চিত্তসঞ্চিত ঘৃণা বিদ্বেষ ও অস্বস্তির একটা পুঞ্জিত বিক্ষোভ। তার পরিণাম সদ্য-সদ্য দেখা না দিলেও একটা তুমুল ঝড়কে সে আসন্ন করে তোলে বিশ্বপ্রকৃতির বুকে। মনে হয়, প্রকৃতি যেন ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে—আর তার পক্ষে অন্যায়ের অনুকূলে সায় দিয়ে চলা সম্ভব নয়। তখন মদান্ধ পুরুষের দুর্বার প্রাণ বলাৎকারদ্বারা আপন বাসনার চরিতার্থতায় যে-শক্তিকে নিয়োজিত করেছিল, সেই শক্তিই হয় বিদ্রোহিণী—নির্যাতিতের বাহুকেই আশ্রয় করে বজ্রমুষ্টি হানে সে অহমিকার উদ্ধত শিরে, ধূলায় লুটিয়ে দেয় তার যত স্পর্ধা। মানুষের মদমত্ত প্রাণশক্তি নিয়তির পাষাণ-বেদিকায় আহত হয়ে শতধা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, প্রকৃতির মন্থর দণ্ডশক্তি বজ্রের বেগে নেমে আসে সার্থকম্মন্য অত্যাচারীর 'পরে। ঔদ্ধত্যের এই প্রতিক্রিয়া সদ্যঃসম্পাতী না হয়ে জন্মান্তরেও অনুবৃত্ত হতে পারে। বিক্ষুব্ধ শক্তির ক্ষেত্রে আবার যখন মানুষ ফিরে আসে, তখন হয়তো সে কর্মবিপাকের এই দারুণ বোঝা সঙ্গে করেই আনে। শুধু-যে বৃহৎ অহমিকার এই পরিণাম ঘটে, তা নয়—ক্ষুদ্র অহমিকার ক্ষুদ্র অপচারেও এমনিতর ছোটখাটো বিপর্যয় ঘটা অসম্ভব নয়। কারণ শক্তির অপপ্রয়োগে প্রতিক্রিয়া ও দণ্ডের বিধান সর্বত্রই এক। আপাতবশ্যা প্রকৃতির প্রতি বলাৎকারদ্বারা ইষ্টসিদ্ধি চায় যে

মনোময় পুরুষ, অবশেষে একদিন বিদ্রোহিণী প্রকৃতি তার জবাব দেয় অসিদ্ধি পরাভব ও বেদনার দহনে তাকে দগ্ধ ক'রে। কিন্তু তাহলেও কার্য-কারণের এই বিধান বিরাট বিশ্ববিধানের মধ্যে গৌণস্থান অধিকার করে আছে। তাকে অনতিবর্তনীয় শাশ্বত বিধান মনে করা কিংবা পরমপুরুষের বিশ্বকর্মের একমাত্র ঋতায়ন বলে গণ্য করা যুক্তিসংগত হতে পারে না। শুধু এইটুকু বলা চলে, বিশ্বের অন্তরতম বা পরম সত্যের স্বভাবস্থিতি আর জড়প্রকৃতির নিষ্পক্ষ গতানুগতিকতা—দুয়ের মাঝামাঝি এ একটা অবান্তর ব্যবস্থামাত্র।

আর যা-ই হ'ক্, দণ্ড-পুরস্কারের বিধানই প্রকৃতিলীলার মর্মকথা নয়। তার আসল তাৎপর্য বস্তুর স্বভাবধর্মের অন্যোন্যসম্বন্ধের স্ফুরণে। মানুষের অধ্যাত্মপরিণামের সঙ্গে এইটুকু তার সম্পর্ক—অনুভবের বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে বিশ্বের পাঠশালায় জীবাত্মাকে সে শুধু উত্তরায়ণের পাঠ দিয়ে যায়। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। এখানে হাত-পোড়াটা আগুনে হাত দেবার শাস্তি নয়, কিন্তু কার্যকারণ-সম্বন্ধজ্ঞানের ও অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের একটা উপলক্ষ্যমাত্র। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সকল কারবারের এই একই ধরন। বিশ্বশক্তির ক্রিয়া বিচিত্র এবং বহুমুখী। অবস্থাভেদে পাত্রভেদে অথবা প্রকৃতির নিগূঢ় অভিপ্রায়ভেদে একই শক্তির পৃথক-পৃথক ক্রিয়া হতে পারে। ব্যক্তির জীবনে শুধু যে আত্মশক্তির লীলায়ন তা নয়—অপরের শক্তি বা বিশ্বের শক্তিদ্বারাও সে প্রভাবিত। শক্তিবিপরিণামের এই দুর্জ্ঞেয় গহন বৈচিত্র্যকে শুধু ধর্ম-শাস্ত্রের সর্বনিয়ামক বিধান দিয়ে কিংবা তার কল্পিত ব্যক্তিজীবনের পাপ-পুণ্যের একটা খতিয়ান দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। মানুষের সুখ-দুঃখ হর্ষ-শোক বা সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যকে কেবল তার প্রাকৃত চিত্তের ভালমন্দ-বিচারের প্রবর্তক বা নিবর্তক মনে করাও সংগত নয়। জীবাত্মা জন্মান্তর স্বীকার করে কৃতকর্মের ফলভোগ করতেই নয়। জন্মান্তর তার আধ্যাত্মিক প্রগতি-সাধনারও উপায়—তার হর্ষ-শোক সুখ-দুঃখ সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য সমস্তই তার প্রগতি-অভিমুখী বৃহৎ সাধনার অঙ্গ। এমন-কি দ্রুতসিদ্ধির অনুকূল হবে জেনে জীবাত্মা দুঃখ দারিদ্র্য ও দুরদৃষ্টকে স্বেচ্ছায় বরণ করে—সিদ্ধি ঋদ্ধি ও সম্পদকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করে তপোবিঘ্নকর শৈথিল্যের নিদান ভেবে। সুখ ও সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা মানবপ্রাণের স্বাভাবিক বৃত্তি সন্দেহ নাই। অপার্থিব আনন্দের একটা স্থূল প্রতীক বা মলিন ছায়াকে ধরবার জন্যই দেহ-মনের এমন আঁকুপাঁকু। আপাত-সুখ অথবা স্থূল সিদ্ধি অবরপ্রাণের একান্ত রুচিকর হলেও—'ন হি বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'। স্থূল ভোগৈশ্বর্যই যদি জীবনের পরমার্থ হত, তাহলে জগৎব্যবস্থাও অন্যরকম হত। জন্মান্তরের প্রয়োজন শুধু কর্মানুযায়ী ভোগৈশ্বর্যের বাঁটোয়ারা নয়—অনুভববৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে উত্তরায়ণের পথে এগিয়ে যাওয়াই তার পরম তাৎপর্য। এই তার মর্মকথা,

আর-সব তার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা মাত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা সার্বজনীন ধর্মাধিকরণ নয়, কর্মবিধানও বিশ্বজোড়া দণ্ড-পুরস্কারের অনুশাসন নয় কিংবা বিশ্বনাথও সংহিতাকার বা ধর্মাধিকরণিকের পদে আসীন নন। বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রথমে দেখি একটা বিরাট শক্তির স্বতঃস্ফুরণ। তারপর তার বুকে দেখা দেয় চিৎশক্তির স্বত-উৎসারণ। অতএব শক্তির অভিব্যক্তি চিৎস্বরূপের আত্ম-পরিণামের লীলায়ন ছাড়া আর-কিছুই নয়। এই পরিস্পন্দে জন্ম-জন্মান্তরের যে-কম্বুরেখা, তাকে অনুসরণ করে চৈত্যপুরুষের অভিযান চলছে স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে কিংবা বিশ্বব্যাপিনী পুরানী প্রজ্ঞার প্রচোদনায়, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রসৃত বীচিভঙ্গচঞ্চল বিচিত্র শক্তিধারার সমাহারে রচিত হচ্ছে তাঁর আগামী জন্মের বিপচ্যমান প্রবৃত্তির বীজাশয়, নিয়মিত হচ্ছে প্রতি জন্মে তাঁর প্রগতির এক-একটি পদক্ষেপ বা ব্যক্তিভাবনার এক-একটি ভঙ্গিমা। হয়তো এই অভিযানে চলার নানান ছন্দ আছে—কখনও এগিয়ে-যাওয়া, কখনও পিছিয়ে-আসা, কখনও-বা মণ্ডলাকারে আবর্তন। কিন্তু তবু পুরুষের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ তাঁকে নিয়ে চলেছে প্রকৃতির মধ্যে আত্ম-উন্মীলনের ধ্রুব নিয়তির অভিমুখেই।

এইখানে মনে পড়ে জন্মান্তর সম্পর্কে স্থূলবুদ্ধির ভ্রান্তিপ্রসূত আরেকটি লোকায়ত ধারণার কথা। সাধারণত জন্মান্তরাভিযাত্রী জীবাত্মাকে কল্পনা করা হয় অপরিণামী অথচ সীমিত একটা ব্যক্তিসত্তা বলে। আমাদের জড়া-সক্ত মন তার সংকল্পিত প্রাতিভাসিক জীবনচেতনার বর্তমান গণ্ডি ছাড়িয়ে দৃষ্টিকে দূরে প্রসারিত করতে পারে না বলেই এই অনায়াস ও অমূলক ধারণার উৎপত্তি। ইতরজনের কল্পনায়, জন্মান্তরে শুধু যে একই আত্মা ও একই চৈত্যপুরুষের পুনরাবির্ভাব ঘটে তা নয়, অতীত দেহের আশ্রিত একই প্রকৃতির পুনরাবৃত্তি চলে এই জন্মেও। জন্মান্তরে দেহ এবং পরিবেশেরই যেটুকু বদল হয়—নইলে পুরুষের মন স্বভাব ধরন-ধারন ঝোঁক বা মেজাজ ইত্যাদি কোনও উপাধিরই অদলবদল হয় না। অর্থাৎ আগের জন্মের রাম-চরণ এ-জন্মেও দেহের সাজ বদলে সেই রামচরণ হয়েই ফিরে আসে। কিন্তু একথা সত্য হলে জন্মান্তরের কোনও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন বা তাৎপর্যও থাকতে পারে না। প্রলয়কাল পর্যন্ত সংকীর্ণ প্রাণ-মনের উপাদানে গড়া সীমিত ব্যক্তিসত্তারই একটা পৌনঃপুনিক সংস্করণ চললে তার ফলে কার কি ইষ্টসিদ্ধি হবে? দেহীকে তার স্বরূপসত্যের পূর্ণমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে শুধু অনুভবের নূতন ক্ষেত্র রচনা করলে চলবে না—তার ব্যক্তিসত্ত্বের রূপান্তরসাধনও করতে হবে। একই ব্যক্তিসত্ত্বের পুনরাবৃত্তির একটা সার্থকতা থাকতে পারে, যদি কোনও জন্মের অসম্পূর্ণ জীবনধারাকে সম্পূর্ণ করতে প্রাণ-মন-চেতনার একটি বিশিষ্ট রূপায়ণের ভিতর দিয়ে জীবের আবর্তন অত্যাবশ্যক হয়। কিন্তু

সর্বসাধারণের বেলায় একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির ব্যবস্থা একেবারেই অকেজো। রামচরণ যদি চিরকাল রামচরণই থেকে যায়, তাহলে তার জীবনধারা হবে পৌনঃপুনিক দশমিকের মত। একই স্বভাব একই রুচি একই প্রবৃত্তি অর্থাৎ বাইরে-ভিতরে একই ধরনের জীবনস্পন্দ আবহমান চলতে থাকলে ঋদ্ধি বা সিদ্ধি কোনও-কিছুর দিকে সে এগোতে পারবে না। এমনতর জন্মান্তরের আবর্তনে আছে শুধু চিরন্তন পুনরাবৃত্তির একটা অর্থহীন পরম্পরা—নাই অধ্যাত্ম-পরিণামের কোনও ইঙ্গিত। অবশ্য বর্তমান ব্যক্তিসত্তার প্রতি মূঢ় আসক্তিবশত এমন অবিচ্ছেদ আবৃত্তিই আমরা চাই—রামচরণ আর-কিছুই হতে চায় না রামচরণ ছাড়া। কিন্তু এ তার অবুঝ আবদার। এ-আবদার রাখতে গেলে তার জীবন শুধু পণ্ড হবে—সার্থকতার কলে তা কোনকালেই ভিড়বে না। বহিরাত্মার রূপান্তরসাধন ও আত্মপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ ঊর্ধ্বায়নদ্বারা চিৎসত্ত্বকে প্রস্ফুটিত করে তোলাতেই আমাদের জীবনের সত্যকার সার্থকতা।

আমাদের মধ্যে চৈত্যসত্ত্বই সত্যকার পুরুষ। স্থূল ব্যক্তিসত্ত্ব দেহ-প্রাণ-মনের সমাহারে বিসৃষ্ট তাঁর একটা সাময়িক পুরঃক্ষেপ মাত্র—তাকে কোনমতেই নিত্যপ্রতিষ্ঠ আত্মতত্ত্ব বলা চলে না। পুরুষের প্রেরণায় প্রতি জন্মে বিশিষ্ট অনুভবের উপযোগী এক-একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্ত্বের আবির্ভাব হয়—পুরুষের আত্মসত্তাকে উন্মীলিত করবার জন্য। দেহত্যাগের পর কিছুকাল অতীত প্রাণরূপ ও মনোরূপের একটা অনুবৃত্তি চলে। কিন্তু অবশেষে ওই দুটি কোশও খসে পড়ে, বাকী থাকে অতীতের সারভূত সংস্কার শুধু—যার খানিকটা আগামী জন্মে কাজে লাগতেও পারে নাও লাগতে পারে। অতীত ব্যক্তি-সত্ত্বের একটা নির্যাস পুরুষসত্ত্বের বহু উপাদানের অন্যতম হয়ে তাকে জড়িয়ে থাকে, তাঁর অগণিত ব্যক্তিভাবনার একটি ভাবনারূপে বহিঃস্ফুট দেহ-প্রাণ-মনের অন্তরালে অধিচেতনার গুহাশয়নে প্রচ্ছন্ন থাকে এবং সেইখান থেকে তার নিজস্ব সঞ্চয় হতে জুটিয়ে দেয় নবীন রূপায়ণের উপাদান। কিন্তু তাবলে নবরূপায়ণের সবটুকু সে নয়, বা পুরাতন প্রকৃতিকে অপরিবর্তিত আকারে ফুটিয়ে তোলবার দায়ও তার নাই। এমনও হতে পারে, বর্তমান রূপায়ণে অতীতের কোনও-কিছুর অনুবৃত্তি রইল না—তার মধ্যে দেখা দিল একটা বিপরীত স্বভাব ও বেমক্কা মেজাজ, অন্যধরনের সামর্থ্য বা আর-কোনও দিকের ঝোঁক। তার কারণ, হয়তো সুদূর অতীতের কোনও নিরুদ্ধ আশয় এ-জন্মে আপনাকে ফুটিয়ে তোলবার অবকাশ খুঁজছে। হয়তো-বা বিগত জন্মে কোনও বৃত্তির ক্রিয়া শুরু হয়েছিল মাত্র, কিন্তু আরও অনুকূল যোগাযোগের অপেক্ষায় তার রাস টেনে রাখতে হয়েছিল—এইবার তার ছাড়া পাবার সময় এসেছে। বর্তমানের পিছনে সমগ্র অতীত প্রচ্ছন্ন রয়েছে—তার উপচীয়মান সংবেগ ও উদ্যত সম্ভাবনা নিয়ে ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলবার জন্য। তবু তার সবখানি বর্তমানে মূর্ত ও

সক্রিয় হয়ে ওঠে না। অতীতের ভাণ্ডার ব্যক্তিভাবনার সার্থক বিচিত্র সঞ্চয়ে যত পূর্ণ হয়ে উঠবে, অনুভবের অকল্পনীয় ঐশ্বর্যের সমারোহ জীবনকে যতই ঘিরে থাকবে এবং তার মুখ্যফলরূপে নবজন্মের মালঞ্চে যতই ফুটবে বিদ্যা বীর্য চারিত্র কর্মণ্যতা ও বিশ্বতোমুখী সংবেদনের সহস্রদল সৌষম্যের অকুণ্ঠ সামর্থ্য, অভিনব ব্যক্তিসত্ত্বের বহির্ব্যক্তিতে প্রস্ফুরিত প্রাণমনোময় ও ভূত-সূক্ষ্মময় প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিভাবনার যতই বাহুল্য ঘটবে—ততই বৃহৎ ব্যক্তিত্বের উপচিত বৈভবে সে-জীবন উচ্ছল হবে, তার মনোময় পরিণামের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে উন্মনী ভূমির দিকে পাখা মেলবার পরম লগ্ন আসন্নতর হবে। একটি ব্যক্তির আধারে এমনতর বহু ব্যক্তিভাবনার জটিল সমাহরণ জীবাত্মার অধ্যাত্মপরিণামের এক অভিনব উত্তরকাণ্ডের সূচনা আনে—যেখানে কেন্দ্র-পুরুষের কীলককে আশ্রয় করে বহুভাবনার বিচিত্র ঐশ্বর্য সংহত হয় এবং আত্মপ্রকৃতির এই বহুভঙ্গিম লীলায়ন চলে এক সম্যক্-সৌষম্যের উদয়-তীর্থের দিকে। কিন্তু অতীতের সঞ্চিত বৈভব এমনি করে সন্নদ্ধ হবার সুযোগ পেলে, কখনও তা শুধু ব্যক্তিসত্তার পুনরাবৃত্তির রূপ ধরবে না—বরং এই সমাহরণকে আশ্রয় করে দেখা দেবে অভিনবের অভ্যুদয়ে জন্মান্তরের একটা বৃহত্তর সার্থকতা। জন্মান্তর কেবল অবিকৃত ব্যক্তিসত্তার পুনরাবৃত্তি বা অনুবৃত্তি ঘটাবার কৌশল নয়—বস্তুত তা প্রকৃতি-স্থ চিৎসত্তার উন্মীলনের একটা অপরিহার্য সাধন।

এই যদি জন্মান্তরের মর্মকথা হয়, তাহলে জাতিস্মরতাকে মিছামিছি এতখানি বাড়িয়ে দেখবার কোনও প্রয়োজন হয় না। প্রচলিত কর্মবাদে দণ্ড-পুরস্কারের ব্যবস্থাই আছে শুধু—নাই জীবের কলুষক্ষালনের কোনও দ্যোতনা। কিন্তু তা না হয়ে কর্মফল বণ্টনের মূলে যদি দেহীকে পুণ্যচরিত করে তোলবার একটা আকূতি থাকত, অতএব দণ্ড-পুরস্কারের ব্যবস্থাই যদি জন্মান্তরের প্রযোজক হত—তাহলে নতুন জন্মে অতীত জন্ম-কর্মের সমস্ত স্মৃতি হতে জীবকে বঞ্চিত করা একটা বিষম অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হত। কারণ, জাতিস্মর না হলে জীব কি করে বুঝবে অতীতের কোন্ পাপ বা পুণ্যের ফলে তার এ-জন্মের এই দুর্গতি বা ভাগ্যলক্ষ্মীর এই প্রসন্নতা? পাপ-পুণ্যের হিসাবের সঙ্গে লাভ-লোকসানের হিসাবও যে এমনি করে জড়িয়ে আছে, তা বোঝবারই-বা সুযোগ সে পাবে কোথায়? বরং সে ব্যাবহারিক জীবনে দেখতে পায় একটা উলটা ধারা। এ-জগতে পুণ্যাত্মাকে সুকৃতির জন্য লাঞ্ছিত এবং পাপীকে দুষ্কৃতির ফলে সমৃদ্ধ হতে হামেশাই দেখে-দেখে এই প্রতীক বিধানকে সত্য বলে মানবার প্রবৃত্তিই কি তার মধ্যে জোর ধরবে না? জীব জাতিস্মর না হলে অতীতের সুনিশ্চিত অব্যভিচারী অভিজ্ঞতার অভাবে কি করে সে বুঝবে, পুণ্যাত্মার এই দুর্ভোগ তাঁর অতীত দুষ্কৃতির সাজা এবং

পাপীর ওই অভ্যুদয়ও তার অতীতের সুচিরসঞ্চিত সুকৃতির দীপ্তচ্ছটা—অতএব প্রকৃতির বাঁটোয়ারাকে শিরোধার্য করে বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে শেষ-পর্যন্ত পুণ্যাচরণকে শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে স্বীকার করাই হবে প্রৌঢ়বিচারের একমাত্র পরিচয়? বলতে পার, বহিশ্চর মন জাতিস্মর না হলেও চৈত্যপুরুষের স্মৃতি তো অবিলুপ্ত। কিন্তু তাঁর অপ্রকট প্রচ্ছন্ন স্মৃতিতে বহিশ্চর মনের কি লাভ? ...যদি বল : এ-জীবনে যা-কিছু ঘটছে, সব জমা থাকছে চৈত্যপুরুষের স্মৃতির ভাণ্ডারে। দেহত্যাগের পর সে-স্মৃতির তলব পড়ে—তখন অতীত অনুভবের হিসাব খতিয়ে যা-কিছু শেখবার বা বোঝবার তা তিনি আয়ত্ত করে নেন। কিন্তু বিদেহীর এই অন্তরা-প্রবুদ্ধ স্মৃতিতে তার ভাবী জন্মের কোনও-একটা সুরাহা হয় কি? কেননা এত হিসাবনিকাশের পরেও তো আমরা পাপাসক্তি ও প্রমাদের কবলিত হতে দ্বিধা করি না—আমাদের ব্যবহার থেকে তো প্রমাণ হয় না যে অতীতের অনুভব হতে কিছুমাত্র অনুকূল শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি কোনওকালে।

কিন্তু উপচীয়মান বিশ্বাত্মবোধের উদ্বোধন দ্বারা অধ্যাত্মচেতনার অবিরত অভ্যুদয় যদি জন্মান্তরের তাৎপর্য হয় এবং প্রতি জন্মে অভিনব ব্যক্তিসত্ত্বের আবির্ভাব যদি হয় তার সার্থক সাধন—তাহলে বিগত জন্মের বা জন্ম-পরম্পরার অবিচ্ছিন্ন ও অখণ্ড স্মৃতি জীবাত্মার প্রগতির অনুকূল না হয়ে তার পায়ের বেড়ি বা চলতি পথের বিষম বাধা হবে। কারণ জাতিস্মরতা তখন হবে অতীতের সংস্কার চারিত্র ও অভিনিবেশকে জিইয়ে রাখবার একটা অনিবার্য প্রবৃত্তি এবং তার প্রবল পিছুটানে পদে-পদে অভিনব ব্যক্তিসত্ত্বের স্বচ্ছন্দ অভ্যুদয় ব্যাহত হবে, বিকল হবে তার অনুভবের স্ব-তন্ত্র রূপায়ণ। অতীত জীবনের আসক্তি-বিদ্বেষ বা অনুরাগ-বিরাগের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সুস্পষ্ট স্মৃতির জের এ-জীবনেও টানতে হলে ঝামেলার আর অন্ত থাকবে না। জাতিস্মরতা তখন নবজাতককে বহিশ্চর অতীতের নিরর্থক পুনরাবৃত্তি বা গত্যন্তরহীন অনুবৃত্তির আবর্তে আটকে রাখবে, অতীতকে এড়িয়ে চিৎসত্তার গহনে ডুবে অভিনবের সম্ভাব্যতাকে আবিষ্কার করবার পথে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। কেবল মনের তালিমেই যদি অধ্যাত্মসাধনার সার্থক পরিসমাপ্তি ঘটত, তাহলে পূর্বস্মৃতির একটা গুরুত্ব স্বীকার করতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু বাস্তবিক অধ্যাত্মপরিণাম ঘটে জীবাত্মার চৈত্যসত্তার উপচয়ে, সত্তার গভীর গহনে অতীতের সার্থক শক্তিপরিণামের অর্থক্রিয়াকারী সমাহরণে এবং তার ফলে আত্মপ্রকৃতিতে সিসৃক্ষার অভিনব প্রেতির উন্মেষে। বহিশ্চর মনের দৈনন্দিন আলোড়নের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর সেখানে পৌঁছনো নিরর্থক, অতএব পূর্বস্মৃতির বিশেষ গুরুত্বও সেখানে নাই। গাছ যেমন রোদ-বৃষ্টি সার-জল প্রভৃতি ভূতশক্তির বিচিত্র পরিণামকে অবচেতন বা অচেতনভাবে পরিপাক করে

বেড়ে ওঠে, জীবাত্মাও তেমনি অধিচেতনায় কি অন্তশ্চেতনায় অতীতের শক্তি-পরিণামকে পরিপাক করে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে ভবিষ্যতের দিকে মেলে দিয়ে এগিয়ে চলে। অতএব জাতিস্মরতার অভাবই আমাদের অধ্যাত্মপরিণামের সর্বতোভাবে অনুকূল এবং বিশ্বপ্রকৃতির সর্বদর্শী বিজ্ঞানশক্তির নিদর্শন।

অতীত জন্মের স্মৃতি থাকে না বলে জন্মান্তর একটা অবাস্তব কল্পনা—এ-ধারণায় আমাদের অজ্ঞান এবং অযৌক্তিকতাই সূচিত হয় মাত্র। স্মৃতির অভাব এ-জন্মেও ঘটে। অতীতের সকল ঘটনা আমাদের মনে থাকে না; কত স্মৃতি ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যায়, শৈশবের স্মৃতি যৌবনের তাপে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তবু স্মৃতির এই দুস্তর ফাঁক নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি, বেড়ে চলি। এমন-কি অতীতের সব ঘটনা মন থেকে মুছে গিয়ে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মরণও যদি ঘটে, তবুও তো ব্যক্তিসত্তার ছেদ হয় না বা লুপ্ত স্মৃতির পুনরুজ্জীবন অসম্ভব হয় না। ইহজন্মেই যদি স্মৃতির এত বিপর্যয় ঘটতে পারে, তাহলে লোকান্তর-স্থিতির আমূল-নবীন অনুভবের পর একেবারে নতুন পরিবেশে নতুন দেহে জন্ম নেবার সঙ্গে-সঙ্গে অতীতের বহিশ্চর বা মনোময় স্মৃতি যে নিঃশেষে মুছে যাবে, তাতেই-বা আশ্চর্যের কি আছে? তাতে জীবসত্তার স্বরূপের বিপর্যয় বা আত্মপ্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণামের বাধাই-বা ঘটবে কেন? বরং নতুন পরিবেশে অতীতের জীর্ণ সাধনসম্পত্তিকে পরিহার করে জীবাত্মা যদি নতুন দেহ-প্রাণ-মনের আশ্রয়ে অভিনব ভঙ্গিতে তার ব্যক্তি-সত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলে, তাহলে বহিশ্চর মনোময় স্মৃতির বিপরিলোপই হবে তার সুনিশ্চিত এবং অপরিহার্য সাধন। নতুন মস্তিষ্ক পুরানো মস্তিষ্কের সমস্ত চিন্তার ছাপ বয়ে বেড়াবে কিংবা পুরনো প্রাণ-মনের যত বাতিল সংস্কারের প্রেতচ্ছায়া ঘুরে বেড়াবে নতুন প্রাণ-মনের আনাচে-কানাচে—এটা আশা করাই আমাদের অন্যায়। অবশ্য অধিচেতন পুরুষের পক্ষে অবিলুপ্ত স্মৃতির বাহন হওয়া অসম্ভব নয়—কেননা তিনি তো বহিশ্চর জীবনের পঙ্গুতাদ্বারা লাঞ্ছিত নন। কিন্তু অধিচেতন স্মৃতিতে অতীত জীবনের সুস্পষ্ট ছবি জিয়ানো থাকলেও বহিশ্চর মনের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই থাকে না। এই নিঃসম্পর্কতাও অর্থহীন নয়, কেননা অন্তরগহনের একটা সুস্পষ্ট চেতনা উদ্বুদ্ধ না করেই অভিনব ব্যক্তিসত্ত্বকে গড়ে তুলতে হবে বাইরে-বাইরে—এই হল প্রকৃতির সহজ বিধান। বহিশ্চর সত্তার অন্যান্য বৃত্তির মত এই ব্যক্তিসত্ত্ব অবশ্য অন্তর্যামীর প্রেরণাতেই রূপ নেয়, কিন্তু তাহলেও সে-সম্পর্কে সে সচেতন নয়—নিজেকে স্বয়ম্ভূ মনে করা অথবা বিশ্ব-প্রকৃতির অব্যক্ত পরিণাম হতে উদ্ভূত মনে করাই তার স্বভাব। এত দুস্তর বাধা সত্ত্বেও পূর্বজন্মের স্মৃতিকে কখনও অংশত উজ্জীবিত হতে দেখা যায়—এমন-কি শিশু-মনের পূর্ণ জাতিস্মরতার দু-একটি বিস্ময়কর কাহিনীও

কখনও-কখনও কানে আসে। তাছাড়া অধ্যাত্মসাধনার ফলে বহিশ্চেতনাকে অভিভূত করে অন্তশ্চেতনা যখন পুরোধা হয়ে জেগে ওঠে, তখন অতীতের গভীর গহন হতে জন্মান্তরের স্মৃতি মাঝে-মাঝে চিত্তের পরদায় ছায়া ফেলে। এই উজ্জীবিত স্মৃতিতে প্রায়ই বিগত জন্মের খুটিনাটির কোনও খবর থাকে না—থাকে শুধু 'জন্মকথন্তা-সংবোধ' অর্থাৎ অতীত ব্যক্তিসত্তার কোন্ শক্তিপরিণামের অনুবৃত্তিতে এ-জন্মের ধাতু-প্রকৃতি নিরূপিত হয়েছে, তার সূক্ষ্ম অনুভব। অবশ্য স্মৃতি-সংযম দ্বারা অধিচেতন ভূমি হতে বা গুহাহিত চিৎ-ধাতুর অন্তর্গূঢ় ভাণ্ডার হতে অতীতের পুঙখানুপুঙখ স্মৃতিও জাগানো যায়। কিন্তু স্মৃতির এই উদ্বোধনে বর্তমান জীবনের প্রগতির কোনও আনুকূল্য সাধিত হয় না, তাই প্রকৃতিও আমাদের জীবনে প্রায়ই তার কোনও ব্যবস্থা রাখেনি। প্রকৃতির লক্ষ্য জীবসত্তার ভবিষ্য-পরিণামকে গড়ে তোলা। তার জন্য সবার অলক্ষ্যে সে অতীতের গোপন ভাণ্ডার হতে উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করে, অতএব অতীতকে চোখের সামনে সর্বদা জাগিয়ে রাখাকে সে মনে করে অনাবশ্যক।

ব্যষ্টিপুরুষ ও ব্যক্তিসত্ত্বের এই স্বরূপকথাকে সত্য মানলে, আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত সংস্কারেরও শোধন-মার্জন প্রয়োজন হবে। সাধারণত আত্মার অমরত্ব বলতে আমরা বুঝি মৃত্যুর পরেও একটা বিশিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় ব্যক্তিসত্ত্বের চিরন্তন অস্তিত্ব। আমরা ভাবি, এই একটি ব্যক্তিসত্ত্বই অনন্তকাল জুড়ে অবিকল একভাবে ছিল এবং থাকবেও। অথচ এ-ব্যক্তিসত্ত্ব আমাদের বহিশ্চর অপূর্ণ অহন্তা ছাড়া আর-কিছুই নয়। মহাপ্রকৃতি তাকে চিৎসত্তার একটা কালাবচ্ছিন্ন রূপায়ণ বলেই জানে, তাই তাকে জিইয়ে রাখবার গরজও তার নাই। কেবল আমরাই তাকে অমরত্বের শাশ্বত মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই! আমাদের এ-দাবি যে সৃষ্টিছাড়া সুতরাং নামঞ্জুর হতে বাধ্য, সেকথা বলাই বাহুল্য। ক্ষণভঙ্গুর 'অহং' চিরঞ্জীব হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, যদি পরিণামের প্রবাহে ভেসে যেতে তার আপত্তি না থাকে। তখন আত্মোৎসর্গের অবিরাম সাধনার ফলে তার গতি হবে বৃহত্তর ও মহত্তর সিদ্ধি এবং ঋদ্ধির দিকে—দিনে-দিনে বিজ্ঞানের জ্যোতিতে সে হবে উদ্দীপ্ততর, অন্তরের শাশ্বত সুষমায় ক্রমেই তার প্রতিমা লাবণ্যোচ্ছল হয়ে উঠবে, গুহাহিত চিৎপুরুষের দিব্যভাবের দিকে আরও খরস্রোতা হবে তার উত্তরায়ণের প্রবেগ। এই গুহাহিত চিৎপুরুষ বা আত্মার দিব্যভাবনাই আমাদের মধ্যে অবিনশ্বর হয়ে আছে—কেননা এ-ভাব অজ এবং শাশ্বত। আমাদের অন্তঃস্থ চৈত্যপুরুষ এঁরই প্রতিভূ। আমাদের চিন্ময় জীবভাবের অথবা পৌরুষেয়বোধের মূল এইখানে। ব্যষ্টিজীবনের ক্ষণভঙ্গুর অহন্তা অন্তঃস্থ পুরুষের একটা সাময়িক বিসৃষ্টি মাত্র। তাকে বলতে পারি প্রকৃতিপরিণামের

বহুধা-পরম্পারিত পর্বের একটি পর্ব শুধু। তার সার্থকতা স্বোত্তরভূমিতে উৎক্রমণে—সত্তা ও চৈতন্যের উত্তরকোটির সামীপ্য অর্জনে। বস্তুত অন্তর-পুরুষই মৃত্যুঞ্জয় এবং বর্তমান জন্মেরও প্রাগ্‌ভাবী। জন্মজন্মান্তরে অনু-বৃত্ত তাঁর মৃত্যুজিৎ বিভাবনায় আমাদের কালাতীত কূটস্থ স্বরূপকে তিনি রূপায়িত করে চলেছেন কালস্রোতের তরঙ্গদোলায়।

মৃত্যুঞ্জয় হবার প্রাকৃত আকৃতি এই প্রাণকে, এই মনকে—এমনকি এই দেহকেই আবার ফিরে পেতে চায়। এই শেষের দাবি রূপ নিয়েছে 'কিয়ামৎ'-এর দিনে বর্তমান দেহেরই পুনরুজ্জীবনের যুক্তিহীন কল্পনায়। যুগ-যুগ ধরে মানুষ, অমৃত-রসায়নের সন্ধানে প্রাণপাত করেছে, ইন্দ্রজাল কিমিয়া কিংবা জড়বিজ্ঞানের সাধনায় দেহের মৃত্যুকে নিরুদ্ধ করে অমর হতে চেয়েছে। কিন্তু এ-স্বপ্ন তার সার্থক হয়, যদি এই দেহ-প্রাণ-মনই গুহাশায়ী চিৎ-পুরুষের মৃত্যুঞ্জয় দিব্য স্বভাবের প্রসাদ পায়। অবশ্য বিশেষ-কোনও কারণে অন্তঃস্থ মনোময় পুরুষের প্রতিভূস্থানীয় বহিশ্চর মনোময় সত্ত্বেরও মৃত্যুজিৎ হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। বহিশ্চর মানসসত্ত্ব কখনও তার ব্যক্তি-ভাবনাকে সর্বাভিভাবী করে তুলেও ভিতরে-ভিতরে অন্তর্মন ও মনোময় পুরুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে। সেইসঙ্গে অন্তরপুরুষের অন্তহীন প্রগতির অভিযানে সাবলীল ছন্দে সাড়া দেবার সামর্থ্য যদি তার অক্ষুণ্ণ হয়, উত্তরায়ণের জন্যে তাহলে মনের পুরানো কাঠামোকে বর্জন করে একটা নতুন কাঠামো গড়বার কোনও প্রয়োজনই হয় না। অন্তশ্চর প্রাণময় পুরুষের প্রতিভূরূপে আমাদের বহিশ্চর প্রাণসত্ত্বও এমনি করে একাগ্র ব্যক্তি-ভাবনা, শক্তির সমাহরণ এবং অকুণ্ঠ আত্মোন্মীলনের ফলে মৃত্যুঞ্জয় হবার সামর্থ্য পায়। এ-সিদ্ধি তার করায়ত্ত হলে, অন্তরাত্মা ও বহির্মুখ জীবসত্ত্বের মাঝখানকার ব্যবধান ভেঙে পড়ে এবং চৈত্যপুরুষের প্রশাসনে জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁরই প্রতিভূস্বরূপ শাশ্বত প্রাণময় ও মনোময় পুরুষের প্রবর্তনায়। জীবের প্রাণপ্রকৃতি ও মনঃপ্রকৃতি তখন পুরুষের স্বীয়া প্রকৃতিরূপে অবাধ ছন্দে প্রগতির পথে এগিয়ে যায়—বারবার রূপান্তরগ্রহণের ভিতর দিয়ে নিজের স্বরূপকে টিকিয়ে রাখবার প্রয়াস আর তাদের করতে হয় না। জন্ম হতে জন্মান্তরে তখন চলে একই প্রাণসত্ত্ব ও মনঃসত্ত্বের নিষ্প্রলয় লীলায়ন। তাদের অমর্ত্য বলতে তখন কোনও বাধা থাকে না—কেননা দেহান্তর-সংক্রমনের আবর্তনেও তখন তাদের তাদাত্ম্যবোধের অনুবৃত্তি অবিচ্ছেদ হয়। একেই বলতে পারি অচিতি ও জড়প্রকৃতির সকল সংকোচকে পরাভূত করে প্রাণ মন ও চিৎসত্ত্বের বিজয়গৌরবের নিদর্শন।

কিন্তু একমাত্র সূক্ষ্মদেহই এমনতর মৃত্যুঞ্জয় মহিমার যোগ্য আধার হতে পারে। স্থূলদেহকে পরিবর্জন করে লোকান্তরে উৎক্রান্তি এবং সেখান হতে

আবার নতুন দেহে এখানে ফিরে আসা তখনও জীবাত্মার পক্ষে অপরিহার্য হবে। উৎক্রান্তির সময় জীব সাধারণত সূক্ষ্মদেহস্থ প্রাণময় ও মনোময় কোশকেও ছেড়ে চলে। কিন্তু প্রাণময় ও মনোময় পুরুষ তার মধ্যে প্রবুদ্ধ থাকলে এই দুটি কোশকে অক্ষুণ্ণ রেখেই আবার সে নতুন দেহে ফিরতে পারে। তখন প্রাণ ও মনের শাশ্বত সদ্‌ভাবের একটা সুস্পষ্ট এবং অবিচ্ছিন্ন প্রত্যয় তার নবজন্মের চেতনাতেও জাগ্রত থাকে—বর্তমান ও ভবিষ্য সম্ভাবনার মধ্যে অতীতের সার্থক অনুবৃত্তির আকারে। কিন্তু যে-স্থূলদেহ জীবের অন্নময় জীবনের আশ্রয়, আধারের এই গোত্রান্তরেও কিন্তু তাকে জিইয়ে রাখা সম্ভব হয় না। অন্নময়-বিগ্রহ চিরঞ্জীব হত, যদি কোনও উপায়ে তার ক্ষয় ও বিশরণের জড়াশ্রিত নিমিত্তগুলি আমাদের স্ববশে যেত * এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার ধাতু-প্রকৃতিতে এমন-একটা প্রগতিশীল সাবলীলতা দেখা দিত, যাতে অন্তর-পুরুষের প্রগতিচ্ছন্দের সঙ্গে পিণ্ডদেহেরও রূপান্তরের ছন্দ মিল রেখে চলত। জীবাত্মার মধ্যে আছে ব্যক্তিসত্ত্বের বৈশিষ্ট্যে নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার একটা সংবেগ, দীর্ঘদিনের তপস্যায় তার অন্তর্গূঢ় চিন্ময় দিব্যভাবকে উন্মিষিত করবার একটা প্রেতি এবং তার ফলে মনোময় আধারকে দিব্যমানস বা চিৎ-সত্তার ব্যক্তবিভূতিতে রূপান্তরিত করবার নিরন্তর প্রয়াস। জীবনচেতনার এই দিব্যভাবনার সঙ্গে জীবদেহও যদি তাল রেখে চলতে পারে, তাহলেই তার অমরত্বের আকৃতি সার্থক হয়। চিৎসত্তার নিত্যসিদ্ধ অমরত্ব ও চৈত্যসত্তার মৃত্যুজয়ী মহিমাকে আপূরিত করে প্রকৃতিও যদি অমৃতরূপিণী হয়—তাহলে ত্রিপর্বা অমৃতত্বের এই মহাসিদ্ধিই হবে জন্মান্তর-প্রবাহের চরম পরিণাম এবং জড়শক্তির মর্মগহনে অধিষ্ঠিত অন্ধ অচিতি ও অবিদ্যার নিশ্চিত পরাভবের অবন্ধ্য সূচনা। কিন্তু তাহলেও অমৃতত্বের সত্যকার তাৎপর্য নিহিত থাকবে চিৎসত্তার শাশ্বত সদ্‌ভাবের 'স্বে মহিম্নি'। জড়বিগ্রহের চিরঞ্জীবতা হবে একটা আপেক্ষিক বিভূতিমাত্র—যাকে ইচ্ছামাত্রেই সংহরণ করা চলবে। এই মর্ত্যভূমিতেও চিৎপুরুষ যে জড়জিৎ ও মৃত্যুঞ্জয়, ইচ্ছামৃত্যু হবে তার একটা কালাবচ্ছিন্ন নিদর্শন।

---

* জড়বিদ্যা বা বিভূতিবিদ্যা যদি স্থূলদেহকে অনির্দিষ্টকাল জিইয়ে রাখবার কোনও অব্যর্থ কৌশল আবিষ্কার করতেও পারে, তবু জীবাত্মা চিরদিন সে-দেহকে আঁকড়ে থাকবে না। কেননা, চিৎসত্ত্বের উপচয়কে রূপ দেবার যোগ্য বাহনরূপে দেহ যদি নতুন করে নিজেকে না গড়তে পারে, তাহলে যে-কোনও উপায়ে তার বাঁধন কাটিয়ে জীবাত্মাকে নতুন শরীর নিতেই হবে। মৃত্যুর যে-কারণ আধারের জড়ত্ব বা স্থূলত্বের সঙ্গে জড়িত, তা-ই তার একমাত্র বা সত্য কারণ নয়। মৃত্যুর নিগূঢ়তম যথার্থ কারণ হল জীবের অভিনব পরিণামের মূলে নিহিত চিৎশক্তির অনুত্তরণীয় প্রেতি।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মানুষ ও প্রকৃতিপরিণাম

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ...সাক্ষী চেতা কেবলঃ... ॥
একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।১১,১২

এক দেবতা—সর্বভূতে আছেন গূঢ় হয়ে, সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা তিনি; তিনিই কর্মাধ্যক্ষ সাক্ষী চেতা ও নির্গুণ।...এক তিনি—বহু নিষ্ক্রিয়ের বশীশ্বর, একটি বীজকেই বহুধা করেন রূপায়িত।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৬।১১।১২)

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্বন্ অস্মিন্ ক্ষেত্রে সঞ্চরত্যেষ দেবঃ।
..যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥
যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ পাচ্যাংশ্চ সর্বান্ পরিণাময়েদ্যঃ।
গুণাংশ্চ সর্বান্ বিনিয়োজয়েদ্যঃ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৫।৩-৫

এক-একটি জালকে বহুধা ব্যাকৃত করে এই ক্ষেত্রেই সঞ্চরণ করেন এই দেবতা। ...সেই এক দেবতাই অধিষ্ঠিত আছেন সকল যোনিতে এবং সকল স্বভাবে। বিশ্বযোনিরূপে তিনিই সত্তের স্বভাবকে করেন পরিপক্ক—পরিপাকের যোগ্য যাবা, সে-সবার পরিণাম ঘটান তিনিই; আবার তিনিই করেন সকল গুণের বিনিয়োগ।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (৫।৩,৫)

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।

কঠোপনিষৎ ৫।১২

একই রূপকে বহুধা রূপায়িত করেন তিনি।

—কঠ উপনিষদ (৫।১২)

ক ইমং বো নিণ্যমা চিকেত বৎসো মাতৄর্জনয়ত স্বধাভিঃ।
বহ্বীনাং গর্ভো অপসামুপস্থান্মহান্ কবির্নিশ্চরতি স্বধাবান্ ॥
আবিষ্ট্যো বর্ধতে চারুরাসু জিহ্মানামূর্ধ্বঃ স্বযশা উপস্থে।

ঋগ্বেদ ১।৯৫।৪,৫

কে তোমাদের মধ্যে এই রহস্যকে জেনেছে। বৎসই মায়েদের জন্ম দিল স্বধার বীর্যে, বহু অপ্‌এর কোল হতে বেরিয়ে এল যে-শিশু, মহান কবি হয়ে সঞ্চরণ করছে সে আপন স্বধার অধিকার পেয়ে। প্রকাশ হতে আবির্ভূত সে—বেড়ে চলেছে কুটিলাদের কোলে, বেড়ে চলেছে উপরপানে চারুরূপে—আপন মহিমায়।

—ঋগ্বেদ (১।৯৫।৪,৫)

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।৩।২৮

আমায় নিয়ে যাও অসৎ হতে সতে, তমঃ হতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হতে অমৃতে।

—বৃহদারণ্যক উপনিষদ (১।৩।২৮)

জড়ত্বের অন্তর্নিহিত চেতনা আত্মরূপায়ণের বিচিত্র পরম্পরায় পরিশেষে কায়ার চিন্ময় স্বচ্ছতায় অবারিতভাবে আপনাকে ফুটিয়ে তুলবে—অধ্যাত্ম-

পরিণামের এই আকূতিই হল মর্ত্যজীবনের মর্মকথা, তার অন্তর্গূঢ় রহস্যের ইশারাও এরই দিকে। চিৎসত্তার অন্তঃপরিণামবশত এই ইশারা প্রথম সংবৃত্ত রইল জড় অচিতির গভীর গহনে—অন্তশ্চারিণী চিৎশক্তি 'পরে পড়ল অসাড় জড়ত্বের আচ্ছাদন। তাই বিসৃষ্টির প্রথম পর্বে ভূতশক্তি জড়বিশ্বে দেখা দিল একটা অচেতন অন্ধবেগের আকারে, যদিও তার আড়াল হতে ফুটে উঠল প্রত্যক্ষের অগোচর এক বিশালবুদ্ধির লীলা। চিররহস্যময়ী মহাপ্রকৃতি অবশেষে অন্তর্গূঢ় চেতনাকে অন্ধতমিস্রার গহন কারা হতে মুক্তি দিল বটে—কিন্তু সে-বন্ধনমোচন ঘটল অতিমন্থর গতিতে, তিলে-তিলে, চিৎশক্তির অতিকৃশ উৎসারণে, চেতনার বিন্দু-বিন্দু উদ্‌গমনে। রূপায়ণী শক্তি ও রূপধাতুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিস্পন্দনে, প্রাণ ও মনের ক্ষীণাতিক্ষীণ কম্প্রশিখায় দেখা দিল মহাপ্রকৃতির ব্যাকৃতির লীলা—মনে হল জড়ত্বের বিপুল বাধাকে অপসারিত করে অচিতির অসাড় দুরাগ্রহের আড়ষ্ট উপাদান হতে এর বেশী আলো ফুটিয়ে তোলা যেন তার সাধ্যাতীত। তার প্রথম রূপায়ণ জড়ের অচেতন সংহতিতে। তারপর সজীব জড়ত্বের আধারে দেখা দিল মানস অভিব্যক্তির কৃচ্ছ্র-সাধনা—অবশেষে চেতন জীবে তার অপূর্ণ প্রকাশ। সে চেতনাও প্রথম ফুটল অর্ধ-অবচেতনায় অথবা জীবের সহজপ্রবৃত্তির সহচারী আভাস-চেতনায়—চেতনার ভ্রূণের মত। ক্রমে জড়ের আধারে প্রাণশক্তি উৎকৃষ্টতর পরিণামকে আশ্রয় করে বুদ্ধির উন্মেষ ঘটল এবং অবশেষে প্রাণিজগতের শেষ পর্বে মননধর্মী মানুষের মধ্যে দেখা দিল তার চরম চমৎকার। কিন্তু মানুষ মনস্বী বুদ্ধিমান ও যুক্তিজীবী হলেও তার মধ্যে চিৎশক্তির পূর্ণ প্রমুক্তি ঘটল না। মানবচেতনার সর্বোচ্চ স্তরেও রয়ে গেল আদিম পশুত্বের ছাপ, দেহ্য অবচেতনার মূঢ়ভাব তামসিকতা ও অজ্ঞানের দিকে চিত্তের দুরতিক্রমণীয় অবকর্ষ—অবচেতন জড়প্রকৃতির দুর্ধর্ষ শাসন পদে-পদে তার অধ্যাত্মপরিণামের চেতনাকে সঙ্কুচিত বিলম্বিত ব্যাহত ও কৃচ্ছ্রসাধ্য করে তুলল। অনাদি অচিতির কক্ষ হতে উৎসারিত চেতনার 'পরে জড়প্রকৃতির এই প্রশাসন মনের মধ্যে বিদ্যার অভীপ্সার আকারে ফোটে। অথচ তখনও মনে হয় অবিদ্যাই যেন আমাদের মনের স্বরূপপ্রকৃতি। এমনি করে মূঢ়তার ভারে কুণ্ঠাচার হলেও মানুষের প্রগতির পথে দাঁড়ি টানা চলে না। পূর্ণচেতনার দিব্যভূমিতে দেবমানবরূপে অথবা চিন্ময় অতিমানস অতিমানবরূপে তাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে—এই তার অধ্যাত্মপরিণামের উত্তরকাণ্ড। এই উৎক্রান্তিতে তার আধারে অবিদ্যার খেলা নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়ে বিদ্যাশক্তির বৃহত্তর পরিণামের লীলা শুরু হবে, অচিতি ও অবিদ্যার অন্ধসম্পুটকে বিদীর্ণ করে সহস্রদল মহিমায় বিকশিত হবে অতিচেতনার জ্যোতির্ময় লীলাকমল।

এমনি করে এই পৃথিবীতে জড় হতে মনে এবং তারও ওপারে উন্মনী-

ভূমিতে উত্তরণের যে-মর্ত্যলীলা অভিনীত হচ্ছে, তার দুটি ধারা। একটি ধারায় জড়পরিণামের ব্যক্ত লীলা—জীবের জন্ম বা শরীরধারণ তার সাধন। দেহের এক-একটি রূপায়ণকে আধার করে চেতনার ক্রমোন্মেষিত শক্তির স্ফূর্তি ঘটছে এবং বংশানুক্রমের নিয়মকে আশ্রয় করে চলছে তার পুষ্টি এবং অনুবৃত্তি। আবার পরিণামের আরেকটি ধারায় প্রত্যক্ষের অগোচরে জীবাত্মার ক্রমিক অভিব্যক্তি ঘটছে—জন্মান্তরের আরোহক্রমে রূপ ও চেতনার উত্তরায়ণ হল তার সাধন। কেবল প্রথম ধারাটি থাকলে মহাপ্রকৃতির বিশ্বগত-পরিণাম হত বিসৃষ্টির একমাত্র তাৎপর্য। ব্যক্তির অচিরস্থায়িত্ব হত তার অবান্তর একটা সাধন মাত্র—প্রকৃতির আসল লক্ষ্য হত জাতি বা ব্যক্তিব্যূহের স্থায়িত্ব বিধান করে মর্ত্যলোকে বিরাট পুরুষের প্রকাশকে ধীরে-ধীরে সম্ভাবিত করে তোলা। কিন্তু মর্ত্যভূমিতে ব্যক্তির স্থায়িত্ববিধান এবং অধ্যাত্মপরিণাম সম্ভব হতে পারে একমাত্র জন্মান্তরের ধারাকে অনুসরণ করে। বিশ্বপরিণামের প্রত্যেক পর্বে গুহাশায়ী চিৎপুরুষের ভোগায়তনরূপে যে রূপ-সামান্য কিংবা আকৃতি কি জাতির পরম্পরা দেখা দেয়, তাকে আশ্রয় করে জন্মান্তরের সহায়ে জীবাত্মা বা চৈত্যসত্তা আপন অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তিকে ব্যক্ততর করেন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবন এমনি করে জড়ের 'পরে চিৎশক্তির বিজয়মহিমার লীলাভূমি হয়—জড়ের মধ্যে তিলে-তিলে ব্যাপ্ত হয় চেতনার নিরঙ্কুশ অধিকার এবং অবশেষে জড়ই হয়তো চিৎসত্ত্বের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির সর্বানুকূল সাধন হয়ে ওঠে।

কিন্তু মর্ত্য বিসৃষ্টির বিশিষ্ট রীতি ও তাৎপর্যের এই বিবৃতি পদে-পদে মানুষের চিত্তে সংশয় এবং অতৃপ্ত জিজ্ঞাসার অস্বস্তি জাগাবে। কেননা মর্ত্য-পরিণামের ধারা আজও যে পথের মাঝখানে ঠেকে রয়েছে। আজও সে-ধারা অবিদ্যার কবলিত, আজও সে অর্ধোন্মিষিত মানবচিত্তের গোধূলিলোকে তার আকৃতি ও তাৎপর্যের স্পষ্টতর একটা দ্যোতনা খুঁজে ফিরছে। এ-অবস্থায় পরিণামবাদের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তিই উঠতে পারে। কেউ বলবেন, চিন্ময়-পরিণামবাদের প্রতিষ্ঠা কোনও দৃঢ় ভিত্তির 'পরে নয়—এমন-কি মর্ত্যব্যাপারের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যার পক্ষে এ-কল্পনা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। চিন্ময়-পরিণাম যদি সম্ভবও হয়, তবু পরিণামের ঊর্ধ্বতন কোনও পর্বে উন্নীত হওয়া মানুষের সাধ্যায়ত্ত কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। পরিণামের ধারা আজ যেখানে থেমে রয়েছে, তাকে পেরিয়ে সে এগিয়ে যাবে কি না তা-ই বা কে জানে! অনাদি অবিদ্যার অন্ধ-তমঃ নিরূঢ় হয়ে আছে মর্ত্য প্রকৃতিতে: অতিমানসপরিণামের প্রবেগে সে যে কোনদিন ঋত-চিতের পূর্ণদ্যুতিতে রূপান্তরিত হবে, এই পৃথিবীর বুকে বিজ্ঞানঘন সত্ত্বের আবির্ভাব সম্ভব হবে—এ কি সত্য?...লক্ষ্যাভিসারী পরিণামবাদ স্বীকার না করেও মর্ত্য-

ভূমিতে চিৎসত্ত্বের স্ফুরণকে অন্য উপায়ে ব্যাখ্যা করা চলে। আমাদের তরফের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার আগে পূর্বপক্ষীর এই চিন্তাধারাকে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট করবার চেষ্টা করব।

মানলাম, শাশ্বত কালাতীতের শাশ্বত কালে অভিব্যক্তিই সৃষ্টির তত্ত্ব। মানলাম, চেতনার আছে সাতটি সোপানের পরম্পরা এবং জড়ের অচিতিও চিৎ-সত্তার উত্তরায়ণের মৌলিক সাধন। মানলাম, জন্মান্তর সত্য এবং মর্ত্য-বিধানের সঙ্গে একটা নাড়ীর যোগও তার আছে। কিন্তু তবু ব্যষ্টি কিংবা সমষ্টিভাবে এসব অভ্যুপগমের 'পরে নির্ভর করেও তো বলা চলে না—জীবের অধ্যাত্মপরিণাম একটা অপরিহার্য সিদ্ধান্ত। মর্ত্য প্রকৃতির অন্তঃশীলা প্রবৃত্তি এবং তার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের অন্যধরনের বিবৃতিও তো সম্ভব। এ-জগতের সব-কিছু যদি চিন্ময় ব্যক্তব্রহ্মের বিভূতি হয়, তাহলে অন্তর্যামীর দিব্য অধিষ্ঠানবশত প্রত্যেক বস্তুই স্বরূপত চিন্ময় হবে—বহিঃ-প্রকৃতিতে তার প্রতিভাস আকৃতি বা স্বভাব যে-রূপ ধরেই ফুটক না কেন। নাম-রূপের প্রত্যেক অভিব্যক্তিতে যখন দিব্য-পুরুষের আনন্দরসায়ন উছলে উঠছে, তখন তার মধ্যে পরিণাম বা পরিবর্তনের ধারাকে স্বীকার করবার সার্থকতা কোথায়? অনন্তস্বরূপের স্বভাবে যে-ভব্যার্থের সিদ্ধরূপের ঋতময় প্রকাশ বা পারম্পর্যের অলঙ্ঘ্য প্রেতি নিহিত রয়েছে, আপনাহতেই তার সার্থকতা ঘটছে বিশ্বপ্রকৃতির অগণিত বৈচিত্র্যে—আমাদের চারদিকে ছড়ানো রূপ ও চিত্তের, সংখ্যাতীত জীবপ্রকৃতির উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্যে। সুতরাং সৃষ্টির মূলে একটা লক্ষ্যাভিসারী আকূতির কল্পনা একেবারেই নিরর্থক, কেননা বিশ্বের সব-কিছুই তো অনন্তস্বরূপের উদার বক্ষে সমভাবে বিধৃত রয়েছে। দিব্য-পুরুষ আপ্তকাম, নিঃস্পৃহ—তাঁর অবাপ্তব্য কিছুই নাই। বিসৃষ্টি বা প্রকাশের লীলা তাঁর আনন্দকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যই—এছাড়া আর-কোনও অর্থ তার থাকতেই পারে না। অতএব একটা পরমভূমিকে লক্ষ্য করে বিশেষ-কোনও ইষ্টসিদ্ধির জন্য কিংবা অনিঃশেষ পূর্ণতার তাগিদে এ-জগতে একটা চিন্ময় পরিণাম চলছে—এ-কল্পনা একেবারে অহেতুক।

বস্তুত সৃষ্টির সকল তত্ত্বই তো চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। বিসৃষ্টির প্রত্যেকটি সামান্য-রূপ বা আকৃতি স্ব-তন্ত্র এবং স্বরূপে অভিনিবিষ্ট, তারা রূপান্তর চায় না কেউ—রূপান্তরের প্রয়োজনও তাদের নাই। মানি, একটি আকৃতির তিরোধান কিংবা আরেকটির আবির্ভাব—এও আমরা দেখতে পাই। কিন্তু তার মূলে রয়েছে চিৎশক্তির লীলাস্বাতন্ত্র্য। বিশ্বের একটি রূপ-সামান্যকে সংহরণ করে আরেকটির অভিব্যক্তিতে শুধু চিৎ-শক্তির রসাস্বাদনের বৈচিত্র্য প্রকাশ পায়—এছাড়া আর-কোনও তাৎপর্য তার নাই। আবার প্রাণের প্রত্যেকটি সামন্যরূপের স্থিতিকাল জুড়ে দেখা দেয় একটা সুস্পষ্ট স্বকীয়তা

—বিশিষ্ট একটা ধাঁচ। খুঁটিনাটিতে সামান্য ইতরবিশেষ হলেও এই মূল ধাঁচের কোনও ব্যত্যয় হয় না। প্রত্যেকটি আকৃতিই আত্মচৈতন্যের অনুবর্তী, তাকে উল্লঙ্ঘন করে পরচৈতন্যে আপনাকে সে মিলিয়ে দিতে পারে না। আত্ম-প্রকৃতির সীমিত বন্ধনকে অতিক্রম করে পরপ্রকৃতিকে অঙ্গীকার করা তার পক্ষে অসম্ভব। অনন্তস্বরূপের চিৎশক্তি যদি জড়ের পরে প্রাণ এবং প্রাণের পরে মনের অভিব্যক্তি ঘটিয়ে থাকে, তাহলে তার পরেই যে মর্ত্যভূমিতে অতি-মানসের অভিব্যক্তি সে ঘটাবে, তার কোনও প্রমাণ নাই। কারণ মন আর অতিমানস কুমেরু আর সুমেরুর মতই বিবিক্ত। মন অবিদ্যাশক্তির কবলিত, আর অতিমানস পূর্ণপ্রজ্ঞার স্বরূপবিভূতি। এ-জগৎ অবিদ্যার জগৎ, চিরকাল তা-ই সে থাকবে—এই হল বিধির বিধান। অতএব পরমপরার্ধের শক্তিরাজিকে এখানে নামিয়ে আনবার অথবা তাদের অন্তর্গূঢ় বীর্যকে এখানে প্রকট করবার কোনও আকৃতিই প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন নাই। ঊর্ধ্বশক্তি এখানে অন্তর্গূঢ় থাকলে সৃষ্টির মূলে অনির্বাচ্য নিগূঢ় ধৃতিশক্তির আবেশরূপেই আছে—পরিণামশক্তিরূপে নয়। মানুষ দাঁড়িয়ে আছে অবিদ্যাজগতের শেষ ধাপে। জ্ঞান ও সংবিতের সাধ্যাবধিতে সে পৌঁছে গেছে। তাকেও পেরিয়ে সে যদি এগোতে চায়, তাহলে আপন মনশ্চক্রেরই বৃহত্তর আবর্তের মধ্যে সে পাক খেয়ে মরবে শুধু। মনের চক্রগতিই মানুষের মর্ত্যপরিণামের শেষ পর্ব। এই কুণ্ডলীর বাইরে যাবার ক্ষমতা তার নাই—ঘুরে-ঘুরে আবার তাকে এইখানেই ফিরতে হয়। ঋজুগতিতে অন্তহীন ঊর্ধ্বায়নের অভিযান, অথবা তির্যক-গতিতে অনন্তের মধ্যে অবগাহন—দুইই মনের বিকল্পমাত্র। মানুষের আত্মা যদি মানবতার গণ্ডি ছাড়িয়ে অতিমানসে বা তারও ঊর্ধ্বভূমিতে উত্তীর্ণ হতে চায়, তাহলে এই বিশ্বচক্রের সীমা ছাড়িয়ে তাকে যেতে হবে—হয় কোনও চিদানন্দময় লোকোত্তর দিব্যধামে, নয়তো অব্যক্তজ্যোতির্ময় শাশ্বত আনন্ত্যের অতল গহনে।

আধুনিক বিজ্ঞান পার্থিব-পরিণামবাদের সমর্থক—একথা সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানের আহৃত তথ্যপঞ্জী নির্ভরযোগ্য হলেও তার উপস্থাপিত সিদ্ধান্ত-সমূহ প্রায়ই অচিরভাবী। এক-একটা সিদ্ধান্তকে দশ-বিশ বছর কি একশ' বছর পর্যন্ত আঁকড়ে থেকেও, তাকে ছেড়ে একটা নতুন সিদ্ধান্তে বা মতবাদে পৌঁছুতে তার দ্বিধা নাই। জড়জগতের তথ্যগুলি নিতান্তই নিরেট, পরীক্ষা-সমীক্ষার দ্বারা তাদের যাচাই করাও অসম্ভব নয়। তবু জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে অচলপ্রতিষ্ঠ বলতে পারি না। তাছাড়া, চিৎপরিণামের যাচাই হবে মনোবিজ্ঞানের সহায়ে। সেখানে সকল তথ্যই জঙ্গম, সুতরাং বিজ্ঞানের অচলপ্রতিষ্ঠার কথা সেখানে আরও অচল। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্তের আসন পাকা হতে-না-হতেই আরেকটি সিদ্ধান্তে গড়িয়ে পড়া অথবা

অন্যোন্য-বিরোধী বহু সিদ্ধান্তের হাট জমানো—কোনটাই অসম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের এমনতর চোরাবালির 'পরে তত্ত্ববিদ্যার কোনও ইমারতই গড়ে তোলা চলে না। বৈজ্ঞানিকের প্রাণপরিণামবাদের ভিত্তি হল বংশানুক্রমের 'পরে। বংশানুক্রম আকৃতি বা সামান্যরূপকে অবিকৃত রাখবার একটা মস্ত সাধন। কিন্তু তার ভিতর দিয়ে জাতিরূপের ক্রমনিয়ত বিপরিণামও যে ঘটে—এ-সিদ্ধান্তে সংশয় করবার যথেষ্ট কারণ আছে। বংশানুক্রম বরং রক্ষণশীলতারই অনুকূল—পরিণামের নয়। প্রাণশক্তি যে তার 'পরে নতুন ধর্ম চাপাতে চায়, তাকে অঙ্গীকার করা তার পক্ষে সহজ নয়। তথ্যের প্রমাণ হতে এইটুকু তত্ত্ব শুধু নিষ্কাশন করা চলে যে, প্রত্যেক জাতিরূপের মধ্যে আত্মপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ব্যক্তিরূপের সামান্য ইতরবিশেষ ঘটতে পারে। কিন্তু তাবলে তার মধ্যে জাত্যন্তরপরিণামও যে ঘটে, তার কোনও প্রমাণ নাই। বানরজাতিই যে মানুষজাতিতে পরিণত হয়েছে, এ-সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত বস্তুত অসিদ্ধ। মানুষজাতির যারা পূর্বপুরুষ, তারা বানর-সদৃশ হলেও বানরজাতীয় নয়। আভাসিক মনুষ্যত্বেই তাদের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—বানরত্বে নয়। আত্মপ্রকৃতির বিশিষ্ট ধারাকে অনুসরণ করেই প্রাক্তন মানুষ পরিণত হয়েছে আজকার মানুষে। এমন-কি মানুষের বেলাতেও যে অবরজাতি হতে উত্তরজাতির উদ্ভব হয়েছে—এমন কথা বলতে পারি না। সংহতি ও সামর্থ্যে যারা নিকৃষ্ট ছিল, তারা লোপ পেয়েছে সত্য। কিন্তু তাবলে আজকার মানুষকে তাদেরই বংশধররূপে তারা রেখে গেছে, এ-সিদ্ধান্তের কোনও প্রমাণ নাই। অথচ একটি জাতিরূপের মধ্যে প্রকৃতির এমনতর উৎকর্ষভাবনাও অকল্পনীয় নয়। বিশ্বপ্রকৃতি জড় হতে প্রাণে এবং প্রাণ হতে মনের দিকে এগিয়ে গেছে বটে। কিন্তু তাবলে জড়ই প্রাণ হয়েছে অথবা প্রাণশক্তি রূপান্তরিত হয়েছে মনঃশক্তিতে—তার প্রমাণ কোথায়? জড়ের আধারে প্রাণের স্ফুরণ হয়েছে এবং প্রাণবন্ত জড়ে ঘটেছে মনের স্ফুরণ—এইটুকুই আমরা মানতে পারি। কোনও বিশিষ্ট উদ্ভিদজাতিই যে পশুতে পরিণত হয়েছে অথবা নিষ্প্রাণ জড়ের সংস্থানবিশেষ হতেই জীবন্ত কায়সংস্থান উদ্ভূত হয়েছে—এর অবিসংবাদিত প্রমাণ কি কোথাও আছে? ভবিষ্যতে এমন যদি হয় যে, কতগুলি রাসায়নিক উপাদান বা নিমিত্তবিশেষের সংযোজন হতে প্রাণের আবির্ভাব হল—তাহলেও তাতে এ-ই শুধু প্রমাণিত হবে যে জড়ের বিশেষ-একটা পরিবেশে প্রাক্‌সিদ্ধ প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি হতে পারে। কিন্তু তাবলে রাসায়নিক সংস্থানই যে প্রাণের নিমিত্ত কি উপাদান বা নিষ্প্রাণ জড়ের সপ্রাণ পরিণামের প্রয়োজক, এ-সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছতে পারি না। অতএব প্রকৃতিপরিণামের প্রত্যেকটি পর্ব স্বধাবান্‌ ও স্বপ্রতিষ্ঠ—আত্মশক্তির উল্লাসে আপন স্বভাবকে সে ফুটিয়ে চলেছে। তার উপরের বা নীচেরকার

কোনও পর্বই তার নিমিত্ত কি পরিণাম কিছুই নয়—শুধু পার্থিবপ্রকৃতির ক্রমায়ত স্বরগ্রামের এক-একটি পর্দা তারা।

যদি বল, তাহলে বিভিন্ন জাতিরূপের এই উঁচু-নীচু পর্দাই-বা দেখা দিল কেথা হতে? জবাবে বলব, বস্তুত জড়ের আধারে জড়ত্বের অন্তর্নিহিত চিৎশক্তিরই এই বহুধা বিসৃষ্টি—অন্তর্যামী চিৎপুরুষের বিশ্বভাবনার অনুরোধে সম্ভূতবিজ্ঞানের এই সার্থক রূপ ও জাতির আত্মনিষ্ঠ কল্পন। তার মধ্যে সাজাত্যের একটা মৌলিক ধারার প্রতীতি অবাস্তব না হলেও, স্থূল সৃষ্টিব্যাপারে প্রকৃতি কখনও পর্বে-পর্বে অবিকল একটি রীতির অনুসরণ করে চলে না। এমন-কি একাধিক রীতি কি শক্তির সঙ্গমনও তার সৃষ্টির ধারা হতে পারে। জড়ের বেলায় দেখি, পরমাণু-সংযোজন হল প্রাকৃত সৃষ্টির মুখ্য রীতি। এক-একটি পরমাণু অমেয় শক্তির আধার—তাদের সংখ্যা ও সংস্থানের বৈচিত্র্যবশত বিচিত্র অণুর উৎপত্তি। আবার ব্যূহন ও সংযোজনের এই মৌলিক রীতিকে অনুসরণ করে মাটি জল ধাতু খনিজ প্রভৃতি দিয়ে বিরাট জড়জগতের পত্তন।...প্রাণের বেলাতেও দেখি ওই অণু-সংযোজনের লীলা। আণুবীক্ষণিক উদ্ভিজ্জ কোষ ও প্রাণিকোষের মেলা নিয়ে সেখানে চিৎশক্তির কারবার শুরু। প্রাণপঙ্কের আদিকণাকে বহুগুণিত করে অণুপ্রমাণ জীবকোষকে অবয়বরূপে সৃষ্টি করে, বীজ বা 'জীন্'-রূপী অতিসূক্ষ্ম নিকায়কে প্রাণধারার বাহন করে, ব্যূহন ও সংযোজনের ওই একই রীতি অনুসারে অথচ বিচিত্র কৌশলে সে গড়ে তুলেছে কায়সংস্থানের চিত্রশালা। এমনি করে প্রকৃতিতে জাতিরূপের নিরন্তর আবির্ভাব হচ্ছে। তবু তার মধ্যে পরিণাম-পরম্পরার নিঃসংশয় সূত্র আবিষ্কার করা কঠিন। জাতিরূপগুলিও আবার কখনও পরস্পরের ব্যবহিত, কখনও অন্যোন্যসারূপ্য হেতু ঘনিষ্ঠ—কখনও-বা মৌলিক সাম্য সত্ত্বেও তাদের খুঁটিনাটিতে অনেক বৈষম্য। সর্বত্র দেখি, নানানরকমের ধাঁচ—গোড়াতে সাম্যের ক্ষীণ একটা আভাস থাকলেও অভিব্যক্তির কত-না বৈচিত্র্য তাদের মধ্যে। দেখে মনে হয়, এ যেন এক অখণ্ড চেতনশক্তি বহুভবনের নির্বারিত উল্লাসে খেয়ালখুশির ফুল ফুটিয়ে চলেছে দিকে-দিকে! প্রাণিসৃষ্টির গোড়ার দিকে ভ্রূণদশায় হয়তো সৃষ্টির ধরন সর্বত্র এক। কিছুদূর পর্যন্ত ক্রমিক পুষ্টির ধারাটা সর্বাংশে না হ'ক অনেকাংশে চলেছে একই খাত বেয়ে—কিন্তু তার পরেই বহুশাখ বৈচিত্র্যে তা ছড়িয়ে পড়েছে। দুটি বিভিন্নপ্রকৃতির জাতিরূপের মধ্যে সেতুস্বরূপ একটা মধ্যস্থ জাতিরূপের সঙ্কর হয়তো পাওয়া গেল। কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয় না যে তিনটি জাতিরূপ পরিণামের একটা পরম্পরায় গাঁথা। তাছাড়া নবীন জাতিধর্মের আবির্ভাবের মূলে কেবল যে বংশানুক্রমিক বিপরিণামই কাজ করছে, তাও নয়। আলোকরশ্মি আহার প্রভৃতি জড়শক্তির প্রভাবেও যে বিপরিণাম সম্ভব,

এতদিনে আমরা তা জানতে পেরেছি। তাছাড়া আরও-কত শক্তির প্রভাব থাকতে পারে, এখনও আমরা যার খবর জানি না। অদৃশ্য প্রাণশক্তি ও দুর্জ্ঞেয় মনঃশক্তির প্রভাবও যে বিপরিণামের মূলে নাই, তাই-বা বলি কি করে? তথাকথিত 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বিপরিণামের হেতু—একথা বললে প্রাণ-মনের প্রভাবকেও স্বীকার করতে হয়, নইলে নির্বাচন কথাটার সার্থকতা থাকে না। পারিপার্শ্বিক প্রয়োজন অনুসারে কোনও জাতি-রূপের অন্তর্গূঢ় বা অবচেতন ক্রিয়াশক্তি কোথাও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। অথচ সেই পরিবেশেই অপরের শক্তি থাকে অসাড়, কিংবা জীবনযুদ্ধে টিকতে না পেরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এতেই প্রমাণ হয়, বিশ্ববৈচিত্র্যের মূলে শুধু জড়ের খেলা নয়—আছে বিচিত্র প্রাণ- ও মনঃ-শক্তিরও লীলায়ন, অজড় চিতিশক্তিরও একটা প্রেতি। মোট কথা, প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের সমস্যা দুর্জ্ঞেয় তথ্যের জটিলতায় এখনও আমাদের কাছে প্রহেলিকা হয়েই আছে। এসম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সময় এখনও আমাদের আসেনি।

জড়প্রকৃতির রাজ্যে যে বহুবিচিত্র জাতিরূপের আবির্ভাব ঘটেছে, মানুষ তার অন্যতম অথচ অনন্যসাধারণ একটি জাতিরূপ মাত্র। প্রাকৃত সৃষ্টির সে সবচেয়ে জটিল নিদর্শন। তার চেতনার ঐশ্বর্য অনুপম, তাকে গড়তে প্রকৃতি শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। মর্ত্যসৃষ্টির সে মুকুটমণি, কিন্তু তবু মৃত্তিকার আলিঙ্গনকে ছাড়িয়ে যাবার সাধ্য তার নাই। আর-সবার মত তারও স্বভাব ও স্বধর্মের একটা সীমিত বৈশিষ্ট্য আছে। ওই বেষ্টনীর মধ্যেই তার প্রসার ও পুষ্টির আয়োজন, তাকে ডিঙিয়ে যাবার সামর্থ্য তার কোথায়? স্বভাবধর্মের পরিমণ্ডল দিয়ে ঘেরা তার পূর্ণতাসিদ্ধির আকূতি। স্বধর্মের অব্যাহত স্ফূর্তিতে অথচ তার নিজস্ব রীতি ও মিতি বজায় রেখেই তার জীবনসাধনা উদ্‌যাপিত হবে—তাকে অতিক্রম করবার প্রয়াস দ্বারা নয়। মানুষ যত উঁচুতে উঠুক, তবু সে মানুষই থেকে যাবে। নিজেকে ছাড়িয়ে অতিমানবের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হওয়া কিংবা দেবতার স্বভাব ও সামর্থ্যকে অধিগত করা তার পক্ষে অসাধ্য এবং অসম্ভব—কেননা তা হবে তার স্বতঃস্ফূর্ত স্বধর্মের প্রতিষেধ। প্রত্যেকটি সত্ত্বের রূপ ও রীতিতে ফুটছে তার স্বরূপের অনুরূপ আনন্দের লীলা। অতএব মনোধর্মী মানুষের পক্ষে, মনঃশক্তির সাহায্যে মর্ত্য পরিবেশের ভোগৈশ্বর্যকে আয়ত্ত করবার সাধনাই হল একমাত্র পুরুষার্থ। তারও ওপারে দৃষ্টিকে প্রসারিত করা, মনের সীমাকে লঙ্ঘন করবার আকূতি নিয়ে অমানব-সিদ্ধির আলেয়ার পিছনে ছোটা—এতে উদ্দেশ্যহীন বিশ্ববিধানের 'পরে একটা কল্পিত উদ্দেশ্য আরোপ করা হয় শুধু। মর্ত্যভূমিতে অতিমানস-সত্ত্বের আবির্ভাব কখনও সম্ভব হলেও তা হবে মহাপ্রকৃতির একটা স্ব-তন্ত্র ও অভিনব বিসৃষ্টি। জড়ের মধ্যে যেমন করে

প্রাণ ও মনের স্ব-তন্ত্র আবির্ভাব হয়েছে, অতিমানসের আবির্ভাবও সেই রীতিতেই হবে—কিন্তু অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তিকে তার স্বরূপ-বিভূতি এই ষোড়শী কলাকে প্রকট করবার জন্য গড়ে তুলতে হবে একটা নতুন ধাঁচ বা রূপা-দর্শ। অথচ আজ পর্যন্ত প্রকৃতিতে তেমন-কোনও আয়োজনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

সৃষ্টির একটা উত্তরমেরু যদি প্রকৃতির লক্ষ্য হয়েও থাকে, তবু মানুষ হতেই যে সে অভিনব বিভূতির আবির্ভাব হবে তার কোনও প্রমাণ নাই। তাহলে মানবজাতির কোনও-না-কোনও শাখায়, কারও-না-কারও প্রকৃতিতে অতিমানবতার উপাদান পূর্ব হতেই নিহিত থাকত। পশুত্বের যে বিশিষ্ট থাক হতে মনুষ্যত্বের আবির্ভাব হয়েছে, তার মধ্যে মানবতার বীজ আগে থেকেই যেমন নিহিত বা উদ্যত হয়ে ছিল, এক্ষেত্রেও-বা তার অন্যথা হবে কেন? কিন্তু অতিমানবতার বাহন বিশেষ-কোনও মানব-জাতি বা -প্রকৃতি তো আমাদের চোখে পড়ছে না। বড়জোর এ-জগতে দেখতে পাচ্ছি অধ্যাত্মচেতনায় সমৃদ্ধ মহামানবের আবির্ভাব। কিন্তু স্বভাবতই তাঁরা মনোময় সত্ত্ব—মর্ত্যসৃষ্টির বাইরে গিয়ে দাঁড়ানোই তাঁদের পরমপুরুষার্থ। অতএব মহাপ্রকৃতির কোনও গুহ্যাতিগুহ্য ধর্মের প্রেরণায় মানুষ হতেই যদি অতিমানবের আবির্ভাব সম্ভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে সমষ্টিমানব হতে বিবিক্ত গুটিকয়েক আলাদা থাকের মানুষের মধ্যেই সে-সম্ভাবনা সার্থক হবে। হয়তো তাঁরা হবেন 'ঈশ্বর-কোটি'—নব মানবতার অগ্রণী। কিন্তু জীবকোটি মানুষের সবাই যে ঈশ্বরকোটি হয়ে দাঁড়াবে একদিন, তা কখনও সম্ভব নয়—কেননা মনুষ্যপ্রকৃতির সামান্যধারায় এমন রূপান্তরের কোনও আভাস আজপর্যন্ত দেখা দেয়নি।

পশু হতে মানুষের উন্মেষ প্রকৃতিতে একদিন ঘটেছে বটে। তবু আজ আর-কোনও পশুজাতির মধ্যে নিজের জাতিরূপের গণ্ডি ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার কোনও লক্ষণ তো কোথাও দেখছি না। সুতরাং পশুজগতে জাত্যন্তরপরিণামের একটা তাগিদ কোথাও এতদিন থাকলেও, মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতির অভীষ্টসিদ্ধির ফলে সে-ঝোঁকও নিঃশেষিত হয়ে গেছে। আবার যদি প্রকৃতির মধ্যে নূতন পরিণামের বা স্বোত্তরায়ণের কোনও প্রেরণা দেখা দেয়, তাহলে সেও কিন্তু অতিমানস-সত্ত্বের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে কৃতার্থম্মন্য হয়ে তেমনি করে ঝিমিয়ে পড়বে। অথচ প্রকৃতিতে তেমন-কোনও প্রেতির আভাস কোথাও নাই। এমন-কি মানবপ্রগতির কল্পনাও খুব সম্ভব একটা মরীচিকা মাত্র—কেননা পশুর পর্যায় হতে উদ্বর্তনের পর আজপর্যন্ত কোনও মৌলিক প্রগতির নিশানা মনুষ্যজাতির ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষ বড়জোর জড়প্রকৃতির জ্ঞান বাড়িয়েছে বিজ্ঞানের সহায়ে, কিংবা নিছক ব্যাবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে

প্রকৃতির রহস্যকে করায়ত্ত করে নিজের পরিবেশের 'পরে খানিকটা দখল জমিয়েছে। প্রগতির হিসাবে এই হল তার জমার দিক। নইলে সভ্যতার গোড়াতেও মানুষ যা ছিল, আজও সে তা-ই আছে। আজও তার মধ্যে ফুটছে দোষে-গুণে জড়িয়ে সেই চিরন্তন কুণ্ঠিত সামর্থ্য, সেই প্রয়াস ও প্রমাদের সিদ্ধি ও অসিদ্ধির দ্বন্দ্ববিধুরতা। মানুষের প্রগতি হয়ে থাকলেও তার কক্ষা হয়েছে বৃত্তাকার—বড়জোর সে-বৃত্তের পরিধিই হয়তো বেড়েছে তিলে-তিলে। কিন্তু প্রগতির এক ধাপ ছাড়িয়ে মানুষ আরেক ধাপে কোনকালেই উঠে যেতে পারেনি। অতীতের মুনি-ঋষি বা দার্শনিকের চাইতে আজকার মানুষ কি বেশী জ্ঞানী? তার অধ্যাত্মসাধনা কি আদিযুগের মহাভাবকদের বিপুল এষণার প্রবেগকে আজও ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে? সে-যুগের শিল্পী ও কারুর চাইতে এ-যুগের মানুষের কলানৈপুণ্য কি খুব বেশী? অতীতের যেসব জাতি আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আধুনিক মানবের মত জীবনসাধনায় তারাও মৌলিক প্রতিভা কৃতিত্ব ও সৃষ্টিকৌশলের অতুলনীয় পরিচয় দিয়ে গেছে। এখনকার মানুষ খানিকটা তাদের ছাড়িয়ে গেছে—প্রগতির কোনও সত্যকার বিবর্তনের ফলে নয়, কিন্তু তার মাত্রা অধিকার ও প্রাচুর্যের স্ফীতিতে মাত্র। আর তারও মূলে আছে পূর্বপুরুষের কীর্তির দায়াধিকার। অর্ধ-বিদ্যা আর অর্ধ-অবিদ্যার লাঞ্ছনে চিহ্নিত মানুষ কখনও যে এই অশক্তির ব্যূহভেদ করে বেরিয়ে আসবে, তার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এমন-কি পরা বিদ্যার সম্পদ অর্জন করেও মানসচক্রের চরম প্রসারকে যে সে ডিঙিয়ে যেতে পারবে কোনদিন, তারই-বা ভরসা কোথায়?

জন্মান্তরকে চিন্ময়পরিণামের পরোক্ষ সাধনরূপে কল্পনা করবার ঝোঁক হয়তো অযৌক্তিক নয়। কিন্তু জন্মান্তর সত্য হলেও চিৎপরিণামই তার তাৎপর্য, একথা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। আবহমান কাল জন্মান্তরকে শুধু তির্যক হতে মানুষ এবং মানুষ হতে তির্যক যোনিতে জীবাত্মার অবিরাম সংক্রমণ বলেই ধরা হয়েছে। ভারতীয় দর্শন তার সঙ্গে যোগ করেছে কর্মবাদ —যার ফলে অতীতের সুকৃতি-দুষ্কৃতি কিংবা সংকল্প ও সাধনার নিরিখে সুখ-দুঃখের একটা ব্যবস্থিতির সিদ্ধান্তই প্রাধান্য পেয়েছে মাত্র। কিন্তু জাতিরূপের ক্রমিক ঊর্ধ্বপরিণামের আভাসটুকুও তাতে নাই—আজ না হ'ক, ভবিষ্যতে সম্ভাবিত অতিমানবের আবির্ভাব তো দূরের কথা। প্রকৃতির পরিণাম যদি হয়ে থাকে তো মানুষই তার চরম পর্ব। কেননা মনুষ্যযোনিতে জন্ম নিয়েই জীবাত্মা সংসারচক্রের গতানুগতিক আবর্তন হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ভবোত্তর দ্যুলোক বা নির্বাণের চরম অধিকার পায়। অতীতের সকল দর্শনেই এই হল মানুষের পরমপুরুষার্থ। সারা বিশ্ব জুড়ে অবিদ্যার খেলা না চললেও, এই মর্ত্যভূমি যে গোড়া হতে চিরন্তনী অবিদ্যার কবলিত, তাতে

কোনও ভুল নাই। সুতরাং ভবচক্র হতে নিষ্ক্রমণই যে জন্ম-পরম্পরার চরম লক্ষ্য হবে, তাতে আর সন্দেহ কি ?

এইধরনের যুক্তির গুরুত্ব বা তার প্রামাণ্যের দাবি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। গুরুত্বের তুলনায় তার বিবৃতি অতি সংক্ষিপ্ত হলেও, তাকে খণ্ডন করবার জন্য এখানে তার উল্লেখ না করে আমরা পারলাম না। এ-মতবাদের কতগুলি প্রতিজ্ঞার প্রামাণ্য অনস্বীকার্য, কিন্তু তবু তার দৃষ্টিকে উদার ও পূর্ণায়ত এবং তার তর্ককে নির্ণয়ের অনুকূল বলতে পারি না। পরিণামের একটা পূর্বনিরূপিত ধারাকে অনুসরণ করে অচিতি হতে অতিচেতনার উন্মেষ, সত্ত্বপরম্পরার ক্রমোদয়ের ফলে চরম পর্বে এই অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবনেরই রূপান্তর বিদ্যার দিব্যজ্যোতিতে—মর্ত্যভূমিতে প্রকৃতিপরিণামের এমনতর একটা সাভিপ্রায় বা লক্ষ্যাভিসারী প্রগতির কথা পূর্বেই আমরা বলেছি। তার বিরুদ্ধে যে-আপত্তি উঠবে, তাকে খণ্ডন করা কঠিন নয়। আপত্তি হতে পারে দুটি বিভিন্ন তরফ থেকে—একটি বৈজ্ঞানিক, আরেকটি দার্শনিক। বৈজ্ঞানিকের যুক্তির মূলে আছে এই অভ্যুপগম : বিশ্বব্যাপারের সর্বত্র দেখছি একটা অচেতন শক্তির লীলা। তার মধ্যে অর্থহীন যান্ত্রিকতার স্বয়ংচলতাই আছে, কোনও নিগূঢ় অভিপ্রায়ের দ্যোতনা নাই। আর দার্শনিকের যুক্তির মূলে আছে এই দর্শন : বিশ্বম্ভর অনন্তস্বরূপের মধ্যে সমস্তই তো নিত্যসিদ্ধ, নিত্যপ্রাপ্ত। সেখানে অনিষ্পন্ন অতএব নিষ্পাদ্য কিছুই নাই, নিজের সঙ্গে যোগ করবার ফুটিয়ে তোলবার কি রূপ দেবারও কিছু নাই—সুতরাং প্রগতি উন্মেষ বা আকূতির আদিম কোনও প্রেতিও নাই।

আপাত-অচেতন জড়শক্তির অন্তরে বা অন্তরালে চিৎশক্তিই যদি নিগূঢ় হয়ে থাকে, তাহলে সাভিপ্রায় সৃষ্টির বিরুদ্ধে জড়বিজ্ঞানীর আপত্তি টেকে না। স্পষ্টই দেখছি, অচিতি তো একেবারে অসাড় নয়। তারও মধ্যে স্বারসিক নিয়তির একটা অবন্ধ্য প্রেতি নিহিত রয়েছে—যা দলে-দলে ফুটিয়ে তুলছে রূপের ফুল এবং প্রত্যেকটি রূপের বুকে জাগিয়ে তুলছে চেতনার উপচীয়মান অরুণরাগ। এই প্রেতিকে স্বচ্ছন্দে এক অন্তর্গূঢ় চিন্ময়পুরুষের পরিনামবাহী সত্যসংকল্পের প্রবেগ বলতে পারি—তাঁর পর্বে-পর্বে আত্মবিসৃষ্টির এমনিতর আকূতিতে ধরা পড়ছে প্রকৃতিপরিণামের আদিতে একটা স্বরসবাহী অভিপ্রায়ের ব্যঞ্জনা। এই লক্ষ্যাভিসারিণী আকূতিকে স্বীকার করবার মধ্যে অযৌক্তিকতা কিছুই নাই। যে-কোনও সচেতন এমন-কি অচেতন প্রয়াসের গোড়ায় আছে চেতনসত্ত্বেরই সত্যধৃতির একটা প্রেতি—জড়প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত যন্ত্রলীলাতেও পুরুষ চাইছেন নিজের জঙ্গমস্বভাবের একটা সার্থক রূপায়ণ। এই প্রয়াসের মূলে যে অভিপ্রায় বা আকূতি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তাতে পুরুষের আত্মস্বরূপের স্বকৃৎ-সত্য রূপায়িত হচ্ছে তাঁর অবন্ধ্য ক্রতুর সিদ্ধবীর্যে।

যেখানে চেতনা আছে, সেখানেই এমনতর ক্রতুর একটা প্রবেগ আছে। আর স্ফুরন্ত আকূতির আকারে তার রূপান্তরও নিতান্ত স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য। সত্তার সত্যের অবন্ধ্য আত্মরূপায়ণ প্রকৃতিপরিণামের মর্মকথা। কিন্তু তার মধ্যে বিশ্বপ্রবৃত্তির অনতিবর্তনীয় সাধনাঙ্গরূপে পুরুষের ক্রতু ও তার আকূতির স্ফুরণও ঘটবে।

দার্শনিকের আপত্তি আরও গুরুতর। তাঁর মতে 'আপ্তকামস্য কা স্পৃহা ?' সুতরাং বিসৃষ্টির আনন্দেই পরমার্থসতের এই বিসৃষ্টি, তাছাড়া এর মূলে আর-কোনও উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন নাই। জড়ের মধ্যে পরিণামশক্তির যে-লীলা, তাও ওই বিরাট আনন্দলীলার একটা ছন্দ—আপনাকে শুধু ফুটিয়ে তোলবার, পর্বে-পর্বে অবন্ধন কল্পনাকে সিদ্ধরূপ দেবার, কলায়-কলায় নিজেকে উন্মীলিত করবার একটা লক্ষ্যহীন প্রবেগমাত্র। বিশ্বগত সমষ্টিভাবকে বলতে পারি স্বয়ংপূর্ণ একটা তত্ত্ব—তার নিটোল সমগ্রতার মধ্যে বাইরে থেকে জোড়বার তো কিছুই নাই।...কিন্তু জড়ের জগৎকে এমন অভঙ্গ সমগ্রতার মর্যাদা দিই কি করে ? জড়বিশ্ব স্পষ্টই কোনও বিরাট অংশীর অংশভূত কিংবা অখণ্ড পর্বপরম্পরার একটি ধাপ শুধু। সুতরাং তার জড়ত্বের গহনে সমগ্রভাবনার যে অজড় তত্ত্ব বা বিভূতি নিবিষ্ট হয়ে আছে, তাদের অনভিব্যক্ত সত্তাকে স্বীকার করতে আপত্তি কি ? অথবা লোকোত্তর স্বধাম হতে ওই বিভূতি যদি তাদের সগোত্র ভাবনাকে জড়ের আড়ষ্ট বন্ধন হতে এইখানে মুক্তি দিতে নেমে আসে, তাতেই-বা বাধা কোথায় ? সন্মাত্রের মহত্তর বীর্য এইখানে মূর্ত হয়ে উঠবে, এই মর্ত্যভূমিতে অখণ্ড পূর্ণতার মহিমা রূপায়িত হবে লোকোত্তর চিন্ময় বিসৃষ্টির বিভাবনায়—এই তো প্রকৃতিপরিণামের নিগূঢ় অভিপ্রায়। এ-আকূতিকে অখণ্ডের বহির্ভূত কোনও তত্ত্বের আগম বলে কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন, কেননা এর মধ্যে আছে শুধু অংশের বুকে অংশীর পূর্ণমহিমাকে স্ফুরিত করবার প্রেতি। বিশ্বগত সমষ্টিভাবের একদেশে একটা সাভিপ্রায় স্পন্দের লীলাকে স্বীকার করতে আমাদের আপত্তি হবে কেন —যদি জানি সে-অভিপ্রায়কে কামসঙ্কল্প মানুষের অতৃপ্ত আকূতির সঙ্গে তুলনা করা চলে না ? কেননা এ তো যা নাই তার জন্য অশক্তের আকুলতা নয়। এ হল অন্তর্যামী চিৎপুরুষের দিব্যক্রতুতে উদ্বেল স্বরূপসত্যের অবন্ধ্য নিয়তির প্রবেগ—সমষ্টিতে নিত্যসমবেত সমস্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ স্ফুরণ যার লক্ষ্য। এ-জগতে যা-কিছু আছে, অস্তিত্বের নিরঙ্কুশ উল্লাসকে বহন করেই তা আছে—তাতে সন্দেহ নাই। সমস্তই এখানে সৎস্বরূপের আনন্দ-লীলা। কিন্তু লীলারও সার্থক পরিণামের অভিমুখে একটা সংবেগ থাকে, যা সিদ্ধ না হলে তার তাৎপর্য খণ্ডিত হয়। নির্বহণশূন্য নাটকরচনা অবশ্য শিল্পীর খেয়ালের ফলে অসম্ভব নয়। তার মধ্যে হয়তো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

কিংবা সমাধানহীন সমস্যার অসদ্ভাব নাই, অথবা নাটকের সন্ধি সেখানে বিমর্শেই এসে ঠেকে আছে, উপসংহৃতিতে উত্তীর্ণ হচ্ছে নাই। হয়তো তা-ই দেখে সামাজিকের আনন্দ। কল্পনা করা চলে, এই পার্থিবপরিণামের নাট্য-লীলাও সেইধরনের। কিন্তু তার চাইতে অন্তঃস্যূত নির্বহণের দিকে তার একটা স্বাভাবিক পরিণতি রয়েছে, এই কল্পনাই কি আরও সুসঙ্গত ও নিশ্চয়াবহ নয়? আনন্দই সত্তার মর্মরহস্য এবং তার নিখিল প্রবৃত্তির মূলাধার। কিন্তু তাবলে সত্তায় সমবেত সত্যের স্ফুরণে কিংবা তার শক্তিতে কি সংকল্পে আনন্দ অনুস্যূত হয়ে নাই, একথা মানব কি করে? এই অধিষ্ঠানসত্তার চিতিশক্তির অন্তর্গূঢ় আত্মসংবিৎ নিত্যকাল ধরে তার নিখিল প্রবৃত্তির প্রবর্তক ও মর্মবিৎ হয়ে আছে। তার এই বিধৃতির মূলে আনন্দের প্রেরণা নাই—এ কখনও হতে পারে না। আনন্দের সঙ্গে কবিক্রতুর অবন্ধ্য আকূতির সংযোগে লীলার নিরঙ্কুশতা খর্ব হয় কিংবা আপ্তকামের অতৃপ্তি সূচিত হয়—এ-আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক।

চিন্ময়পরিণাম আর বৈজ্ঞানিকের কল্পিত আকৃতিপরিণাম বা স্থূল প্রাণপরিণাম ঠিক এক জিনিস নয়। চিন্ময়পরিণামকে পরতঃপ্রমাণ না বলে বলব স্বতঃপ্রমাণ। বৈজ্ঞানিকের ভূতপরিণামবাদকে তার একটা অনুকূল প্রমাণ বা উপাঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করলেও এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকের সমর্থন তার প্রামাণ্যসিদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য নয়। বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত ইন্দ্রিয়-গোচর প্রকৃতিপরিণামের বহিরঙ্গের বিবৃতি মাত্র। প্রাকৃতব্যাপারের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে, জড়পরিণাম এবং জড়ের আধারে প্রাণ ও মনের পরিণাম নিয়ে তার কারবার। নতুন তথ্যের আবিষ্কারে যে-কোনও মুহূর্তে তার মার্জন-বর্জনও সম্ভব, কিন্তু তাতে চিন্ময়পরিণামের কোনও রূপান্তর ঘটে না, কেননা এ-পরিণাম স্বানুভবগম্য অতএব স্বতঃসিদ্ধ। জড়ের জগতে চেতনার উন্মেষ এবং পর্বে-পর্বে জীবচেতনার স্ফুরণ চিৎপরিণামের সর্বজন-বিদিত রীতি, সুতরাং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের অদলবদলে তার প্রামাণ্য ব্যাহত হবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বাইরে থেকে দেখতে গেলে পরিণামবাদের মোটামুটি সিদ্ধান্ত এই। মর্ত্যভূমিতে আমরা দেখছি আরোহক্রমে রূপ ও কায়ের একটা ক্রমিক উৎকর্ষ—জড়ের সংহতি ক্রমেই জটিলতর হয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে জড়ের মধ্যে প্রাণ এবং প্রাণবন্ত জড়ের মধ্যে চেতনার উন্মেষের যোগ্যতর বাহনরূপে। আধার যত সুসংহত হয়ে উঠছে, ততই তাকে আশ্রয় করে প্রাণ ও চেতনার আরও সংহত জটিল সমর্থ ও পরিণত প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে। পরিণামবাদের কল্পনার মধ্যে তার অনুকূল সকল তথ্যকে একবার সাজিয়ে নিলে, পার্থিবপরিণামের এদিকটা এত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাকে অস্বীকার করবার কোনও উপায় থাকে না। পরিণামের প্রত্যেকটি ধাপ আজও আমরা

আবিষ্কার করতে পারিনি বটে—বিভিন্ন জাতিরূপের সঠিক বংশলতা বা ধারাবাহিক ইতিহাস আজও আমাদের খুঁটিয়ে জানা নাই। তথ্যসংকলনের দিকটা চিত্তাকর্ষক এবং গুরুত্বপূর্ণ হলেও তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার দিক থেকে তার মর্যাদা অনেকটা আনুষঙ্গিক। অপরিণত পূর্বজ আধার হতে পরিণত আধারের ক্রমিক উন্মেষ, প্রাকৃতিক নির্বাচন, জীবনসংগ্রাম, বংশধারায় অর্জিত ধর্মের অনুসংক্রমণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তর্কের অবকাশ থাকলেও, সৃষ্টিব্যাপারে যে ক্রমবন্ধ পরিণামের একটা পরিকল্পনা আছেই—এই অনস্বীকার্য তত্ত্বটি হল আসল কথা। আরেকটি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব এই : প্রকৃতিতে পরিণাম ঘটেছে অনুবৃত্তির একটা নিয়ত পরম্পরাকে অনুসরণ করে। প্রথম হয়েছে জড়ের উন্মেষ, তারপর সেই জড়ে প্রাণের স্ফুরণ, তারপর জীবন্ত জড়ের আধারে মনের বিকাশ এবং এই শেষ পর্বে পশুজগতের অনুবৃত্তিরূপে মানুষের আবির্ভাব। ধারাবাহিক প্রথম তিনটি পর্ব আমাদের এতই পরিচিত যে তাদের সম্পর্কে সংশয়ের কোনও অবকাশ নাই। তির্যকপ্রাণী হতে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, না তির্যক ও মানুষ একই মূল হতে বিবর্তিত হয়ে অবশেষে মনের উৎকর্ষে মানুষই তির্যককে ছাড়িয়ে গেছে—এ নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। এমন-কি এমন মতবাদও আছে, প্রাণিজগতে মানুষ এসেছে সবার শেষে নয়—সবার আগে। অবশ্য এ-মতটি সুপ্রাচীন হলেও সর্ববাদিসম্মত নয়। মানুষ পৃথিবীর সেরা জীব, এই অবিসংবাদিত বোধ হতে এ-মতের উৎপত্তি, অর্থাৎ মানুষের আভিজাত্যের মহিমাই যেন তার প্রাক্তন আবির্ভাবের প্রমাণ। কিন্তু পরিণামের স্বাভাবিক রীতিতে অভিজাতের আবির্ভাব হয় গোড়ার দিকে নয়, শেষের দিকে—অপরিণতের প্রাক্তন আবির্ভাবই রচনা করে পরিণততর অভিব্যক্তির ভূমিকা।

কালের মাপে অবর প্রাণরূপের আবির্ভাবই যে প্রাক্তন, প্রাচীন কালেও এ-মতের একান্ত অসদ্ভাব ছিল না। সৃষ্টির নানা কাল্পনিক বিবরণের কথা ছেড়ে দিলেও, এদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বহু শাস্ত্রে এমন-সব উক্তিও পাওয়া যায়, যা আধুনিক পরিণামবাদের মত মানুষের তুলনায় পশুর প্রাক্তনতাকেই সমর্থন করে। একটি উপনিষদে আছে : আত্মা প্রাণবিসৃষ্টির সঙ্কল্প নিয়ে প্রথম গড়লেন পশুজাতি—গো আর অশ্বের আকারে। কিন্তু দেবতারা (উপনিষদের মতে তাঁরা চিদ্‌বিভূতি ও প্রকৃতির শক্তি) দেখলেন, পশুর আধার তাঁদের পক্ষে অপর্যাপ্ত। তাই আত্মা সর্বশেষে সৃষ্টি করলেন মানুষ। তখন দেবতারা তাকে সুনির্মিত ও পর্যাপ্ত আধার মনে করে তাতেই অনুপ্রবিষ্ট হলেন তাঁদের বিশ্বজনীন লীলাকে রূপ দেবার জন্যে। এই আখ্যায়িকাতে স্পষ্টই বলা হচ্ছে, একটির পর একটি করে ক্রমোন্নত আধার-সৃষ্টির দীর্ঘ পরম্পরার শেষে এমন-একটি আধার দেখা দিল যার মধ্যে পরিণত

চেতনার অবস্থান হল স্বচ্ছন্দ।...পুরাণেও বলা হয়েছে, তামসিক তির্যক সৃষ্টিই প্রাক্তন। 'তমঃ' বলতে বুঝি চেতনা ও শক্তির অসাড় স্তিমিত ভাব। যে-চেতনা নিষ্প্রভ মন্থর ও কুণ্ঠিত-প্রচার, তা-ই তামসিক চেতনা। তেমনি যে-শক্তি অলস ও সীমিত-সামর্থ্য, শুধু সহজাত-প্রবৃত্তির সংকীর্ণ আবর্তে যে পাক খেয়ে ফেরে, প্রগতি ও এষণার প্রেতি নাই যার মধ্যে, বৃহত্তর স্ফুরত্তায় বা চিন্ময়-ভাবনার দীপ্তিতে জ্বলে ওঠবার প্রবেগ যার নাই, তাকেই বলব তামসী শক্তি। তির্যকযোনিতে চিতিশক্তির এমনতর পঙ্গু প্রকাশ ঘটেছে বলে প্রাণি-সৃষ্টির বেলায় তির্যক সবার অগ্রজ। মানুষের চেতনা আরও পরিণত, মনঃ-শক্তির চরিষ্ণুতা ও বোধের দীপ্তি তার মধ্যে আরও প্রখর। তাই মানুষ এসেছে তির্যকের পরে।...তন্ত্রে আছে, স্বধামচ্যুত জীবাত্মা বহু লক্ষ জন্ম উদ্ভিদ ও তির্যকযোনিতে কাটিয়ে অবশেষে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে মুক্তির অধিকার পায়। সেখানেও দেখি, উদ্ভিদ ও পশুযোনি প্রাণপরিণামের নীচের ধামরূপে কল্পিত হয়েছে। মানুষ হওয়া যেন পুরুষের সংসৃতির শেষ-পরিণাম—এইখানে এসেই জীবাত্মা যেন অধ্যাত্মপ্রগতির একটা তাগিদ খুঁজে পায়, দেহ-প্রাণ-মনের গণ্ডি কাটিয়ে চিন্ময় ভূমিতে তার উত্তীর্ণ হবার একটা সম্ভাবনা দেখা দেয়।...প্রকৃতিপরিণামের এই ধারণাই স্বাভাবিক। বুদ্ধি ও বোধি দুয়ের দিক থেকে এ-ধারণা এতই সুসংগত যে, এ নিয়ে বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন—বলতে গেলে এ-সিদ্ধান্ত প্রায় অনতিবর্তনীয়।

অতএব প্রকৃতি পরিণামের ক্রমপ্রবাহের সূত্র ধরে আমাদের বিচার করতে হবে মানুষের উৎসমূল ও প্রথম আবির্ভাবের কথা, দেখতে হবে বিশ্ববিসৃষ্টির মধ্যে কোথায় তার স্থান। এ-বিচারের দুটি কল্প আছে। বলতে পারি : পার্থিব প্রকৃতিতে মনুষ্যদেহ ও মনুষ্যচেতনার আবির্ভাব আকস্মিক। জড়ের মধ্যে আপনাহতেই কারও অপেক্ষা না রেখে হঠাৎ যেমন অবচেতন এবং সচেতন জীবকায়ের আবির্ভাব ঘটেছে, তেমনি আকস্মিকভাবে তার পরের যুগে দেখা দিয়েছে বুদ্ধিজীবী মনোময় জীব। অথবা বলতে পারি : ইতরপ্রাণী হতেই মন্থর প্রস্তুতি ও দীর্ঘায়িত ক্রমোন্মেষের ধারা ধরে মনুষ্যত্বের উন্মেষ হয়েছে—কেবল বিশিষ্ট পর্বসন্ধিতে তার গতি হয়েছে উৎপ্লাবী ও ক্রান্তিকারী। এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তটিকে মনে হয় সহজ ও সমীচীন। জাতিরূপের মৌলিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব না হলেও তার শাখা-উপশাখার বিশিষ্ট ধর্মে যে পরি-বর্তন আনা সম্ভব, মানুষ তা জানে এবং ফলিত-বিজ্ঞানের সহায়ে এ-বিষয়ে আশ্চর্য সাফল্যও সে অর্জন করেছে ছোট-খাটো ব্যাপারে। তাই যদি হয়, তাহলে প্রকৃতিতে অনুস্যূত গূঢ়চেতন শক্তিও যে এইধরনের বিপুল ও ব্যাপক পরিবর্তন এনে সিসৃক্ষার সুকৌশল প্রেরণায়, জাতিরূপের মধ্যে একটা ক্রান্তি-কারী রূপান্তর ঘটাতে পারে—তা কিছু অসম্ভব নয়। তখন সাধারণ তির্যক

প্রাণী হতে মনুষ্যত্বের বিবর্তনের জন্য প্রয়োজন হবে শুধু জড়ীয় আধারের উৎকর্ষ—যাতে তা চেতনার ক্ষিপ্র ঊর্ধ্বায়ন বা বিপর্যয়ের বাহন হতে পারে। তার ফলে চেতনা অভিনবের তুঙ্গভূমিতে আরূঢ় হয়ে সেইখানে থেকে নীচেকার ভূমির সাক্ষী হবে, সঙ্গে-সঙ্গে আধারের ঊর্ধ্ববাহী ও পরিব্যাপ্ত নবজাগ্রত সামর্থ্যও প্রাক্তন পশুবৃত্তিকে পরিমার্জিত ও প্রসারিত করবে মনুষ্যোচিত সাবলীল বুদ্ধিবৃত্তির ভূমিকারূপে। তারপর হয় যুগপৎ কিংবা কিছুকাল পরে অধারে দেখা দেবে নূতন জাতিরূপের উপযোগী সূক্ষ্ম ও বিপুলতর নানাধরনের শক্তি—ভাবনা যুক্তিবিচার ভূয়োদর্শন তত্ত্বাবিষ্কার ও সুসংহত নির্মাণবুদ্ধির আকারে। চিৎশক্তির উন্মেষই যদি সৃষ্টির নিগূঢ় অভিপ্রায় হয়, তাহলে যোগ্য আধার পেলে চেতনার এই উৎক্রান্তি মোটেই দুঃসাধ্য হবে না—কেবল জড় অচিতির বাধা ও প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে ওঠবার পথটুকু তার পক্ষে দুস্তর হবে। পশুর মধ্যে মনঃশক্তির যে-বিকাশ ঘটেছে, মানুষের মনোধর্মের অনুরূপ হলেও তার পরিধি সংকীর্ণ এবং তাতে ক্রিয়ার দিকটাই ফুটেছে, জ্ঞানের দিকটা নয়। পশুর আধারে মনোধর্মের যে-সংহতি, তার মধ্যে আছে ভ্রূণোচিত আদিম সারল্য। তাই বৃত্তিসমূহের অধিকার যেমন সঙ্কুচিত, সাবলীলতাও তেমনি কুণ্ঠিত। আত্মকর্তৃত্বের স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত ক্ষীণ ও অনিয়ত বলে তাদের বৃত্তির স্ফুরণে দেখা দেয় বিচারহীন যান্ত্রিকতার মূঢ়তা। মনে হয়, অপরা প্রকৃতি যেন পশুর আধারে অপরিণত আদিচেতনার একটা অপ্রবুদ্ধ যন্ত্রলীলাকে শুধু সচল রেখেছে। তাই মানুষের মত তার মধ্যে চেতনশক্তির নিত্যজাগ্রত দৃষ্টি নাই—যে-দৃষ্টি চেতনার বৃত্তিসমূহের শাসন ও নিয়ন্ত্রণই করে না শুধু, তাদের বুদ্ধিপূর্বক পরিবর্তন বা বিপরিণামও ঘটায়। এইখানেই মানুষের বৈশিষ্ট্য। নইলে পশুচেতনার অন্যান্য বৃত্তির সঙ্গে মানুষের মৌলিক কোনও প্রভেদ নাই। পশুর বৃত্তিগুলিকেই মনের ঊর্ধ্বভূমিতে উঠিয়ে নিয়ে মানুষ তাদের পুষ্ট ও প্রসারিত করেছে—সম্ভব হলে তাদের সূক্ষ্ম ও সংস্কৃত করে মনোধর্মী করে তুলেছে মাত্র। এককথায় বলতে গেলে পশুধর্মকেই মানুষ উদ্দ্যোতিত করেছে তার নবলব্ধ বুদ্ধি ও বিচারশক্তির আলোকে, মূঢ় আবর্তনের 'পরে এনেছে যুক্তির প্রশাসন—যা কোনকালেই পশুর সাধ্য ছিল না। একবার এই পরিবর্তন বা বিপর্যয় ঘটবার পরে মানুষের মনে নিজেকে এবং জগৎকে আলোড়িত করবার একটা সামর্থ্য আবির্ভূত হয়, যুগান্তব্যাপী পরিণামের মোহানায় তার মধ্যে সঞ্চারিত হয় বিজ্ঞান জল্পনা ও সৃষ্টির উপচীয়মান প্রবেগ। এদের আবির্ভাব যে অতর্কিত, তাও নয়। স্বচ্ছন্দে কল্পনা করতে পারি, মনুষ্যসৃষ্টির আদিপর্বেও তারা ছিল—পশুত্বের কাছ ঘেঁষে, সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে, নিতান্ত অপরিণত ও অনলংকৃত প্রবৃত্তির আকারে। প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যেক ক্রান্তিকারী পর্বসন্ধিতে

এমনতর বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। জড়ের মধ্যে প্রাণশক্তির উন্মেষের পর জড়ই তার বাহন হয়েছে, জড়শক্তির ব্যাপ্রিয়ায় প্রাণধর্মের ছোঁয়াচ লেগেছে এবং সেই-সঙ্গে স্ফুরিত হয়েছে প্রাণেরও বিশিষ্ট বৃত্তি এবং স্পন্দ। তারপর প্রাণশক্তি ও জড়কে আধার করে দেখা দিয়েছে প্রাণন-মন। সেও তাদের আপন চেতনার রঙে ছুপিয়েছে, সেইসঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে নিজের বিশিষ্ট বৃত্তি এবং ক্রিয়া। প্রকৃতিপরিণামের রঙ্গভূমিতে এই নজিরে আবার একটা বড়রকমের তোলাপাড়া হয়ে মনুষ্যত্বের যে উন্মেষ হবে, সে কিছু আশ্চর্য নয়। তাকে বলতে পারি, প্রকৃতিলীলার সাধারণ সূত্রেরই একটা নতুনধরনের প্রয়োগ মাত্র।

অতএব এ-সিদ্ধান্তকে মানা সহজ, কেননা এর রীতিনীতি আমাদের কাছে দুর্বোধ নয়। কিন্তু আকস্মিক-আবির্ভাবের সিদ্ধান্তকে মানবার পথে অনেক কাঁটা। প্রথমত মনুষ্যত্বের অভিনব আবির্ভাবকে চেতনার দিক দিয়ে বলতে হবে—বিশ্বপ্রকৃতিতে অন্তঃসংবৃত্ত নিগূঢ় চিতিশক্তির প্রচণ্ড একটা উৎক্ষেপ। কিন্তু তাহলে মানতে হয়, ওই উৎক্ষেপের বাহন হবার জন্য একটা জড়ীয় আধার পূর্ব হতেই উন্মুখ হয়ে ছিল—এখন শুধু উৎক্ষেপের বেগে নবীন সিসৃক্ষার অনুকূলে তার বিশিষ্ট রূপায়ণ ঘটেছে। অথবা বলতে হয়, প্রাক্তন স্থূল আকৃতি বা ধাঁচের সঙ্গে প্রবল বৈধর্ম্যের ব্যবধানবশত মানুষের মধ্যে একটা নতুন তত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছে। দুটি সিদ্ধান্তের যেটিকে মানি না কেন, তারা এক পরিণামবাদেরই রকমফের মাত্র—শুধু বৈজাত্য বা পর্বসংক্রমণের রীতি ও কৌশলে তাদের যা-কিছু তফাত।...আবার এও বলা যায় : মানুষের আবির্ভাব উৎক্ষেপের পরিণাম নয়, বরং ঊর্ধ্বতন মনোলোক হতে মনশ্চেতনার অবক্ষেপের ফল—হয়তো-বা উপর হতে মনোময়-পুরুষ কি জীবাত্মার অবতরণ হয়েছে মর্ত্যপ্রকৃতিতে। তখন প্রশ্ন হবে, এই অবক্ষেপকে ধারণ করবার উপ-যোগী মনুষ্যদেহরূপী এমন দুঃসাধ্য ও জটিল আধারের আকস্মিক উদ্ভব হল কেমন করে? জড়োত্তর ভূমিতে কোনও ক্রমের অপেক্ষা না রেখে যা-ইচ্ছা-তাই ঘটতে পারে বিদ্যুতের বেগে। কিন্তু জড়শক্তি স্ফুরণেরও যে এই ধারা, এ তো এখানকার সুপরিচিত বা স্বাভাবিক রীতি নয়। বিশ্বপ্রকৃতির কোনও জড়োত্তর প্রবেগ কি ধর্ম অথবা বিধাতৃ-মানসের অধৃষ্য বীর্য যদি সাক্ষাৎভাবে জড়ের 'পরে প্রহত হয়, তাহলেই এখানে এমনতর বিপর্যয় ঘটা সম্ভব। জড়ের আধারে প্রত্যেক নবসত্ত্বের আবির্ভাবের মূলে এমনতর জড়োত্তর শক্তির আবেশ বা বিধাতার সিসৃক্ষা মানতে আমাদের কিছুই আপত্তি নাই। বলতে গেলে প্রত্যেক নবসৃষ্টিই প্রচ্ছন্ন প্রাণশক্তি বা মনঃশক্তির আয়তনে কল্পিত অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির একটা অনির্বাচ্য লীলা। কিন্তু তাহলেও তার ক্রিয়াকে কোথাও অব্যবহিত ও স্ব-তন্ত্র হয়ে বাইরে ফুটতে তো দেখি না—সর্বত্র দেখি, প্রাক্‌সিদ্ধ কোনও

জড়ীয় আধারের 'পরে অধিক্ষিপ্ত হয়েই চিৎশক্তি তার কাজ করছে প্রকৃতির ভূতপূর্ব কোনও সিদ্ধির ধারাকে সম্প্রসারিত করে। কোনও পার্থিব আধারের আত্মোন্মীলনের ফলে জড়োত্তর শক্তির একটা আস্রব ঘটেছে তার মধ্যে এবং তাইতে তার নবকলেবর সিদ্ধ হয়েছে—এ-কল্পনাকে বরং সম্ভবপর বলতে পারি। কিন্তু জড়প্রকৃতির অতীত ইতিহাসে এমন ঘটনা অনায়াসে ঘটেছে, তার কোনও প্রমাণ নাই। অভিনবের আবির্ভাবের জন্য, হয় কোনও অদৃশ্য মনোময়-পুরুষের ঈক্ষণ প্রয়োজন—যার ফলে তাঁর আবেশের অনুকূল কায়সৃষ্টি সম্ভব হবে; অথবা জড়াতীত শক্তির আস্রবকে ধারণ করে জড়ত্বের আড়ষ্ট সঙ্কীর্ণ বিধানকে আবিষ্ট ও আলোড়িত করতে পারে, জড়েরই মধ্যে এমন মনোময় সত্ত্বের প্রাক্‌সত্তাকে স্বীকার করতে হবে। নইলে কল্পনা করব : জড় আধারই পরিণামের পথে পূর্ব হতে এতদূর এগিয়ে ছিল যে, বিপুল মনশ্চেতনার আস্রবকে বা কোনও মনোময়-পুরুষের অবতরণকে স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় ধারণ করা তার পক্ষে মোটেই কঠিন হয়নি। কিন্তু তাহলে মনতে হয়, জড়-দেহে মনোধর্মের প্রাক্তন উন্মেষ এই শক্তিপাতের জন্যে উদ্যত হয়েই ছিল। ঊর্ধ্ব হতে শক্তিপাত আর জড়সত্তার ঊর্ধ্বায়ন—উভয়ের যোগাযোগে মর্ত্য-প্রকৃতিতে যে মানুষভাবের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে, তা অকল্পনীয় নয় বটে। পশুর আধারে অন্তর্নিহিত নিগূঢ় চৈত্যসত্তার আবাহনে হয়তো প্রাণবন্ত জড়ের রাজ্যে মনোময়-পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তাঁর প্রৈষাতে প্রাণমিশ্রা মনঃশক্তি উত্তীর্ণ হয়েছে শুদ্ধতর মনোভূমিতে। কিন্তু তাহলেও একে পরিণাম-বাদই বলব, কেননা ঊর্ধ্বশক্তির আবেশ এক্ষেত্রে পার্থিবপ্রকৃতিতে তার স্বধর্মের অভিব্যক্তি এবং প্রসারণের সহায়ক হয়েছে মাত্র।

না হয় মানলাম, আধারস্থ চেতনা ও সত্ত্বের প্রত্যেকটি আকৃতি বা ধাঁচ একবার সুপ্রতিষ্ঠ হলে তার মধ্যে আর স্বধর্মের ব্যভিচার ঘটবে না—স্বভাবের নিয়ম ও পরিকল্পনাকে সর্বতোভাবে অনুসরণ করাই হবে তার কাজ। এ যদি সত্য হয়, তাহলে পরিণামবাদের কোনও সার্থকতা থাকে না।...এ-আপত্তির জবাবে স্বচ্ছন্দে বলতে পারি : স্বোত্তরায়ণের প্রেতিই মানবী আকৃতির একটা বিশেষ ধর্ম, মানুষের অধ্যাত্মবীর্যের ভাণ্ডারে জাগ্রত চেতনা নিয়ে আপনাকে ছাড়িয়ে যাবার সকল সাধনই সঞ্চিত আছে। এমনতর সামর্থ্যের পুঁজি তার থাকবে—এই পরিকল্পনা নিয়েই বিশ্বের বিধাতা তাকে গড়ে তুলেছেন।... পূর্বপক্ষী বলতে পারেন, আজপর্যন্ত মানুষ যা-কিছু করেছে, সে কেবল তার স্বভাবের গণ্ডিতে অবরুদ্ধ থেকেই। তার প্রগতি হয়েছে প্রকৃতির কম্বু-রেখায়—কখনও সে নেমেছে আবার কখনও উঠেছে, কিন্তু সরলরেখায় এগিয়ে কোনকালেই যেতে পারেনি, বা তার অর্জিত স্বভাবের একটা অবিসংবাদিত মৌলিক ঊর্ধ্বপরিণাম ঘটাতে পারেনি। মোটের উপর, তার নিরূঢ় সামর্থ্যকে

সূক্ষ্ম ও শাণিত করে নানা বিচিত্র ও সাবলীল উপায়ে তাদের ব্যাপারিত করা—এতদিন ধরে এ-ই তো দেখছি তার সাধ্যের সীমা। কিন্তু পূর্বপক্ষীর এ-আপত্তি অনেকাংশে সত্য হলেও একথা সত্য নয় যে, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের যুগ হতে আজপর্যন্ত, এমন-কি তার সাম্প্রতিক ইতিহাসের সাক্ষ্যেও মানুষের প্রগতির কোনও নিশানা নাই। প্রাচীনেরা যত বড়ই হ'ন, তাঁদের কোনও-কোনও কীর্তি ও সৃষ্টির মহিমা যত উত্তুঙ্গই হ'ক, বুদ্ধি চারিত্র ও অধ্যাত্মসম্পদের বীর্যে আমাদের দৃষ্টিতে তাঁরা যত জ্যোতিষ্মানই হ'ন,—তবু পরের যুগের মানুষ যে জ্ঞান ও কর্মের সাধনায় আরও সূক্ষ্ম জটিল ও বিচিত্র বীর্যের উপচীয়মান পরিচয় দিয়েছে, জীবনে সমাজে রাষ্ট্রে দর্শনে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে বহুদিক দিয়েই প্রাচীনদের কীর্তিকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে—নিরপেক্ষ বিচারের ফলে একথা আমাদের মানতেই হবে। এমন-কি আধুনিক মানবের অধ্যাত্মসাধনায় প্রাচীন সিদ্ধির বিস্ময়কর তুঙ্গতা ও বিরাট বৈভব না থাকলেও, তার মধ্যে দেখা দিয়েছে মনীষার একটা উপচীয়মান সূক্ষ্মতা—সাবলীল দূরবগাহ অথচ বহুমুখী এষণার একটা আশ্চর্য প্রতিভা। মানি, আজকালকার সভ্য মানুষ সংস্কৃতির উন্নত শিখর হতে অনেকদূর গড়িয়ে পড়েছে, কিছুদিন ধরে হঠাৎ সে নেমে এসেছে অধ্যাত্মপ্রগতি-বিরোধী নাস্তিকতার গভীর খাদে—চিন্ময়ী অভীপ্সার ঊর্ধ্বশিখা তার মধ্যে নির্বাপিত, প্রাকৃত জড়বাদের বর্বরতায় তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন। কিন্তু তবু বলব, তার এ অধোগতি সাময়িক—এ শুধু প্রগতির কম্বুরেখার অবরোহের দিকটাই আমরা দেখছি। সত্য বটে, মানুষের প্রগতির বেগ আজও তাকে আপন গণ্ডি ছাড়িয়ে স্বোত্তরায়ণের পথে উত্তীর্ণ করেনি—আজও তার মনোময় স্বভাবের আমূল রূপান্তর ঘটেনি। কিন্তু এ তো কেউ প্রত্যাশাও করেনি। কারণ প্রত্যেকটি আকৃতি বা জাতিরূপের চেতনায় প্রকৃতিপরিণামের শক্তি এমনভাবে কাজ করে যায় যে, তার ফলে আকৃতির অন্তর্নিহিত সামর্থ্য সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্যের উপচীয়মান ঐশ্বর্যে তার অন্তিম কোটিতে পৌঁছয়। অবশেষে স্বভাবের চরম পরিপাকে আপন সম্পুটকে বিদীর্ণ করবার দিন যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তার মধ্যে দেখা দেয় চেতনার একটা বিপর্যয়—পরিণামের নতুন পর্বে সুনিশ্চিত উৎক্রান্তির একটা অনতিবর্তনীয় প্রেতি। মনোময় মানুষের পর চিন্ময় ও অতিমানস সত্ত্বের আবির্ভাব যদি প্রকৃতির লক্ষ্য হয়, তাহলে তার সূচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের অন্তরে চিন্ময়-ভাবনার সংবেগে। সে-সংবেগ হতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, নিজের চেষ্টায় কিংবা প্রকৃতির সাহায্যে এই অভিনব পর্বসংক্রমণটুকু ঘটিয়ে তোলবার সামর্থ্যও তার আছে। একবার তির্যক প্রাণীর মধ্যে কোনও-কোনও বিষয়ে বানরগোত্রের অনুরূপ অথচ গোড়া হতেই মনুষ্যধর্মাক্রান্ত জীবের আবির্ভাব ঘটিয়ে, মানুষের আবির্ভাবের

পথকে প্রকৃতি সুগম করে দিয়েছিল। তারই উত্তরপর্বে চিন্ময় ও অতিমানস সত্ত্বের আবির্ভাবকে সহজ করবার জন্য অনুরূপ রীতির অনুসরণ সে করবে। অর্থাৎ মানুষেরই মধ্যে সৃষ্টি করবে পশুগোত্র মনোময় মানুষের অনুরূপ অথচ চিন্ময়ী অভীপ্সার আবেগযুক্ত একধরনের নতুন মানুষ।

একথা মেনেও পূর্বপক্ষী একটা আপাতসুষ্ঠু তর্ক তুলতে পারেন এই বলে যে, মানুষকে বাহন করে অতিমানবের আবির্ভাব ঘটানো যদি প্রকৃতির উদ্দেশ্য হয়, তাহলে নতুন জাতিরূপের নিদর্শনস্বরূপ গুটিকয়েক উন্নত-শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করেই হয়তো তার সে-উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে। তখন এই নতুন মানুষেরা জীবনের নতুন পথে চলতে থাকবে। আর প্রকৃতির চিন্ময়ী অভীপ্সার এমন তর্পণের পর, মানবজাতির অবশিষ্টভাগ ঊর্ধ্বায়নের আকূতিকে বর্জন করে আবার ফিরে যাবে মনোময়ী স্থিতির বদ্ধজলে।...এ-তর্কের জবাবে বলতে পারি : জন্মান্তরের সহায়ে প্রকৃতিপরিণামের ধারায় জীবাত্মা বাস্তবিক যদি অতিমানসভূমিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে উত্তরণের সে সোপান-পরম্পরাকে প্রকৃতি মানুষের মধ্যে টিকিয়ে রাখবেই—নতুবা অতি-মানবতার আংশিক সিদ্ধি হবে পূর্বাপরহীন একটা আকস্মিক খেয়ালের খেলা। অবশ্য এইসঙ্গে একথাও বলি, সমগ্র মানবজাতিই যে একজোটে অতি-মানসভূমিতে উত্তীর্ণ হবে, এমন সিদ্ধি বা সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এ-ধরনের বিস্ময়কর একটা বিপ্লবের ইঙ্গিতও আমরা করছি না। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, চিৎপরিণামের স্বাভাবিক সংবেগে মানুষের মন এমন-একটা জায়গায় উঠে আসবে, যেখানে তার অন্তর্নিহিত সামর্থ্য অনায়াসে লোকোত্তর চেতনার অভিযাত্রী হবে এবং সে-চেতনাকে কায়ে রূপায়িত করবার আকূতিও তার মধ্যে জাগবে। এই কায়পরিগ্রহের ফলে অবশ্য জীবের প্রাকৃত স্বভাবেরও একটা পরিবর্তন ঘটবে। তার হৃদয় মন ইন্দ্রিয়ে তো বটেই—এমন-কি দৈহ্যচেতনা ও শারীরবৃত্তির সংগঠনেও গুরুতর একটা রূপা-ন্তর দেখা দেবে। কিন্তু সবচাইতে বড় রূপান্তর হবে তার চেতনার। তার প্রথম প্রৈষার একটা গৌণ সিদ্ধি বা বিপাকরূপে ঘটবে স্থূল আধারের বিপরিণাম। চৈত্যসত্তার সমিন্ধনে হৃদয়-মন যখন ভাস্বর হয়ে উঠবে এবং আধার যখন প্রস্তুত থাকবে, তখন যে-কোনও মানুষের মধ্যে দেখা দেবে এই চিন্ময়-রূপান্তরের সামর্থ্য ও সম্ভাবনা। চিন্ময়ী অভীপ্সা মানুষের স্বভাবগত। মানুষ পশুর মত স্বভাবতৃপ্ত নয়—সঙ্কোচ ও অপূর্ণতার বোধ নিরন্তর তাকে বর্তমানের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যেতে প্রচোদিত করছে। এই স্বোত্তরায়ণের প্রচোদনাই মনুষ্যত্ব মানবজাতির অন্তর হতে এ কখনও নিঃশেষে বিলুপ্ত হতে পারে না। মানুষের মধ্যে মনোময়ী সত্তার স্থান একটা থাকবেই। কিন্তু সে শুধু তার সংসৃতির প্রয়োজক

হবে না—তার মধ্যে চিন্ময়ী অতিমানসী ভূমির দিকে একটা উদ্যত প্রেরণা দেখা দেবেই।

একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। পৃথিবীর বুকে মনুষ্যকায় ও মনুষ্যমনের আবির্ভাবে পরিণামের অতীত ধারার অনুবৃত্তিই যে আছে শুধু তা নয়—এই-সঙ্গে প্রকৃতিপরিণামের লক্ষ্যে ও রীতিতে দেখা দিয়েছে অনপিতচর অথচ সুনিশ্চিত একটা বিপর্যয়। এতকাল জড়ের উন্মিষন্ত আধারে মননধর্মী পরিণত চিত্তের আবির্ভাব ঘটেছে—জীবের আত্মসচেতন অভীপ্সা আকূতি সংকল্প বা এষণার বশে নয়, কিন্তু প্রকৃতির যন্ত্রমূঢ় প্রবৃত্তির তাগিদে অবচেতনা ও অধিচেতনার নিগূঢ় লীলায়নে। কারণ আর কিছুই নয়। অচিতি হতে যে-পরিণামের শুরু, তার মধ্যে চেতনার সঞ্চরণ হয় অন্তর্গূঢ়। চেতনার উন্মেষ অপরিস্ফুট বলে আধারে তার ক্রিয়া আত্মসচেতন জীবের জাগ্রত সংকল্পের শরিক হয়ে চলবার সুযোগ পায় না। একমাত্র মানুষের আধারে একটা যুগান্তর দেখা দিয়েছে। জীবসত্ত্ব এখানে প্রবুদ্ধ ও আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। তাই তার মনের মধ্যে ফুটেছে অভ্যুদয়ের একটা আকূতি, জ্ঞানে ও শক্তিতে নিজেকে সমৃদ্ধ করে বহিজীবনকে উদারতর এবং অন্তর্জীবনকে গভীরতর করবার একটা সচেতন প্রয়াস। একমাত্র মানুষই জানে, তার প্রাকৃত আত্মচেতনারও ঊর্ধ্বে একটা বৃহত্তর চিন্ময় ভূমি আছে। ঊর্ধ্বপরিণামের' দুর্বার কামনায় স্পন্দিত তার প্রাণ-মন—স্বোত্তরায়ণের অভীপ্সা মূর্ত ও উদগ্র হয়ে উঠেছে তার মধ্যে : সে পেয়েছে আত্মার সন্ধান, পেয়েছে চিন্ময় আত্মস্বরূপের আভাস। অতএব অবচেতন পরিণামকে সচেতন করে তোলা তারই আধারে সম্ভব হয়েছে। এইজন্যই অভীপ্সার যে-তীব্রসংবেগ তার মধ্যে নিরন্তর তপস্যার অগ্নিবীর্যে প্রজ্বল হয়েছে, আমরা স্বচ্ছন্দে তাকে ধরে নিতে পারি মহাপ্রকৃতির মহত্তর সিদ্ধি অথবা বৃহত্তর বিভূতির উন্মেষের অবন্ধ্য আকূতির নিশ্চিত নিশানারূপে।

পরিণামের প্রথম পর্বে প্রকৃতির ঝোঁক ছিল কায়িক সংস্থানের রূপান্তর-সাধনের দিকে, কেননা তখন তারই 'পরে ছিল চেতনার রূপান্তরের নির্ভর। দেহের রূপান্তরসাধনে ব্যাপৃত চেতনার বীর্য তখন তীক্ষ্ণ ছিল না বলে এছাড়া প্রকৃতির সামনে আর-কোনও পথ খোলা ছিল না। কিন্তু মানুষের মধ্যে এ-ব্যবস্থার বিপর্যয় শুধু সম্ভাবিত নয়—অপরিহার্যও বটে, কেননা এখানে ঊর্ধ্বপরিণামের একমাত্র সাধন হল চেতনারই রূপান্তর। একটা অভিনব কায়সংস্থান যে তার প্রাথমিক বাহন হবেই, এমন-কোনও বাধ্য-বাধকতা এক্ষেত্রে নাই। বস্তুত তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখতে গেলে চিৎপরিণামই প্রকৃতি-পরিণামের মূলকথা। পরিণামের প্রত্যেক পর্বের ইশারা অধ্যাত্মসিদ্ধির দিকেই—স্থূলের বিপরিণাম তার একটা অবান্তর সাধন মাত্র। কিন্তু গোড়ার

দিকে চিৎ ও জড়ের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক বৈষম্য ছিল, তাই এ-তথ্যটি ছিল যবনিকার অন্তরালে। তখন বহির্বৃত্ত অচিতির বিপুল কায় অন্তশ্চর চিৎ-পুরুষের মহিমাকে খর্ব এবং স্তিমিত করে রেখেছিল। কিন্তু এবার সে-বৈষম্য দূর হয়েছে। তাই এখন আর চেতনার রূপান্তরের জন্য পূর্ব হতেই দেহের রূপান্তর আবশ্যক হয় না—চেতনা এখন নিজেরই বিপরিণামদ্বারা আধারের ঈপ্সিত গোত্রান্তর সিদ্ধ করে। মনে রাখতে হবে, মানুষ আর সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতিচালিত নয়। উদ্ভিদ ও পশুর মধ্যে জাত্যন্তর-পরিণাম ঘটিয়ে প্রকৃতির আনুকূল্য করা তার মনোবীর্যের পক্ষে এখন অসাধ্য নয়। তার পরিবেশকে নানাদিক দিয়ে সে নতুন করে গড়েছে, জ্ঞানের সাধনায় নিজের মনেরও অভাবনীয় উৎকর্ষ ঘটিয়েছে। সুতরাং আপন দৈহ্য ও চিন্ময় পরিণাম বা রূপান্তর সাধনে সে-যে প্রকৃতির সচেতন আনুকূল্য করবে, এ-প্রত্যাশা কি অযৌক্তিক? এমনিতর একটা প্রেতি তার অন্তরে আছেই এবং তার আংশিক সার্থকতাও ইতিমধ্যে ঘটেছে। শুধু বহিশ্চর মন পুরোপুরি বুঝতে পারছে না বলেই তাকে মানতে পারছে না। কিন্তু একদিন অন্তরাবৃত্ত হয়ে নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে এই মনই হয়তো অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির সঙ্গোপন সাধনবীর্য ও সাসূত প্রবৃত্তির রহস্য আবিষ্কার করবে। আমরা যাকে প্রকৃতি বলি, চিৎশক্তির এই আকূতি তার মর্মকথা। মানবমন তাকে যেদিন বুঝবে, সেইদিন তার জগতে যুগান্তর আসবে।

প্রাকৃত প্রগতির বহিরঙ্গ বিভূতির পর্যবেক্ষণ হতে অর্থাৎ শুধু কায়িক জন্ম ও কায়িক স্থিতিকে আশ্রয় করে সত্তা ও চেতনার যে বহির্বৃত্ত পরিণাম সাধিত হচ্ছে, তাকে দিয়ে এসব সিদ্ধান্ত স্বচ্ছন্দে সমর্থিত হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে আরেকটা ব্যাপার রয়েছে প্রত্যক্ষের অগোচর—সে হল জীবের জন্মান্তর। উন্মিষন্ত আত্মভাবের পর্ব হতে পর্বান্তরে উদয়নের সোপান বেয়ে জীব এগিয়ে চলেছে—প্রত্যেক পর্বে তার কায়িক ও মানস সাধনসম্পদ সমৃদ্ধতর হয়ে উঠছে। কিন্তু এই প্রগতির মধ্যে চৈত্যসত্তা এখনও ঢাকা আছে দেহ-প্রাণ-মনরূপী সাধনের অন্তরালে—এমন-কি মানুষের মত সচেতন মনোময়-জীবেরও আধারে। এখন চৈত্যসত্তার প্রকাশ ব্যাহত, আত্মপ্রকৃতিকে বশে এনে এখনও সে জীবনের পুরোধা হতে পারেনি। পুরুষ এখনও প্রকৃতির অধীন—বিকল সাধনের খানিকটা নিয়ন্ত্রণও মেনে চলতে সে বাধ্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে পুরুষের চৈত্যসত্ত্ব পূর্ণপরিণতির দিকে ইতরপ্রাণীর চাইতে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে যেতে পারে। ক্রমে এমন-একটা সময় আসে, যখন আধারের সকল বাধা ঠেলে নির্মুক্ত প্রকাশের জ্যোতিরঙ্গনে সে এসে দাঁড়ায় প্রকৃতি-স্থ সাধনসম্পদের ঈশ্বর হয়ে। চৈত্যসত্ত্বের এই ঈশনা গুহা-হিত অন্তর্যামী চিন্ময়পুরুষের আসন্ন আবির্ভাবের দ্যোতনা আনে। চৈত্য-

সত্তার অন্তঃশীল অনুভাবে যখন প্রাকৃত-মনের গোত্রান্তর ঘটছিল, তখন এই চিৎপুরুষই তার মধ্যে আড়াল থেকে দীপালির আয়োজন করেছিলেন। আজ তাই আধারে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মিষিত করবার সঙ্গে-সঙ্গে জীবনকে তিনি চিন্ময় দিব্যভাবনায় আরও ঝলমল করে তুলতে চাইবেন। কিন্তু মর্ত্য-প্রকৃতিতে মন অবিদ্যার সাধন মাত্র। অতএব এই চিন্ময়-রূপান্তর সিদ্ধ হবে একমাত্র চেতনার রূপান্তরে—যার ফলে অবিদ্যামূল জীবন হবে বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত, মনোময় চেতনা পরিণত হবে অতিমানস চেতনায়, মহাপ্রকৃতির অতিমানস প্রযোজনা দেখা দেবে এই আধারেই।

এ-জগৎ অবিদ্যাশাসিত বলে অতিমানস-রূপান্তর এখানে অসম্ভব, কিংবা 'প্রেত্য অস্মাৎ লোকাৎ' দ্যুলোকে গিয়েই তা সম্ভব, অথবা চৈত্যসত্ত্বের এমন আকূতি অজ্ঞানপ্রসূত বলে নির্বিশেষ ব্রহ্মে আত্মবিলোপই তার একমাত্র পুরুষার্থ—এধরনের উক্তি নিতান্তই যুক্তিহীন। এ-সিদ্ধান্ত প্রামাণিক হত—যদি অবিদ্যার লীলাই হত বিশ্ববিসৃষ্টির তাৎপর্য প্রযোজক ও উপাদান, কিংবা বিশ্বপ্রকৃতিতে এমন-কোনও তত্ত্ব না থাকত, যাকে ধরে অবিদ্যামানসের বর্তমান গুরুভার ঠেলে উত্তরায়ণের পথে আমাদের এগিয়ে যাওয়া চলে। কিন্তু অবিদ্যা বিশ্বপ্রকৃতির একাংশ মাত্র। সে তার সবখানি নয়, কিংবা তার অনাদি বিধাত্রী বা প্রযোজিকাও নয়। বরং অবিদ্যা নিজেই বিদ্যার আত্মসঙ্কোচ হতে উৎপন্ন হয়েছে—এই তার ঊর্ধ্বকোটির পরিচয়। আবার অবর কোটিতেও অচিতির নিরেট জড়ত্ব হতে তাব উন্মেষ হয়েছে অবদমিত বিদ্যাশক্তিরূপে—তাই বিদ্যার নিরঙ্কুশ প্রকাশে নিজের যথার্থ স্বরূপ ও প্রতিষ্ঠাকে ফিরে পাবার আকূতি তার মধ্যে এত প্রবল। বিরাট্-মনের মধ্যে এমন-সব স্তর আছে, যারা আমাদের প্রাকৃত-মনের নাগালের বাইরে। বিরাটের ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার তারা অতীন্দ্রিয় সাধন হলেও, মনোময় জীব সমাধিযোগে সেসব স্তরে পৌঁছতে পারে। এমন-কি প্রাকৃতভূমিতেও তাদের দিকে খানিকটা সে উজিয়ে যেতে পারে অতিপ্রাকৃত আবেশের ফলে। কখনও-বা বোধির ঝলক, চিন্ময়ী দ্যোতনা, প্রতিবোধের বিপুল প্লাবন বা যোগবিভূতির আকারে তাদের সে আভাস পায়—কিন্তু তাদের বুঝতে বা ধরে রাখতে পারে না। অতিপ্রাকৃত সকল স্তরই স্বোত্তরভূমি সম্পর্কে সচেতন ও ঊর্ধ্বমুখ। শেষ স্তরটি আবার অতিমানসের অব্যবহিত এবং তার দিকে উন্মীলিত—ঋত-চিতের দিব্যসংবিতে সমুজ্জ্বল। উন্মিষন্ত মর্ত্য আধারে এইসব লোকোত্তর চিদ্‌বিভূতির আবেশ আছে—চিত্তবৃত্তির আড়ালে প্রচ্ছন্ন থেকে তারাই চিত্তসত্ত্বের নিয়ন্তা এবং ভর্তা। এই অতিমানস আর তার ঋতবিভূতির নিগূঢ় আবেশে নিখিল প্রকৃতি বিধৃত রয়েছে—এমন-কি আমাদের চিত্তসত্ত্বও তাদের পরিণাম বা কুণ্ঠিতবৃত্তি আংশিক রূপায়ণ মাত্র।

অতএব মনঃশক্তি যেমন জড় ও প্রাণের মধ্যে নেমে এসেছে, তেমনি শাশ্বত সন্মাত্রের এইসব উত্তরবিভূতিও যে আপন স্বরূপে প্রাকৃতমনে প্রকট হবে—এ কেবল স্বাভাবিক নয়, অপরিহার্যও বটে।

মানুষের চিন্ময়ী অভীপ্সাতে তার অন্তর্গূঢ় চিৎসত্ত্বের আত্মোন্মীলনের আকূতি আছে—আধারে নিহিত চিৎশক্তি এমনি করে প্রকাশের পরের ধাপে আপনাকে রূপায়িত করতে চায়। সত্য বটে, আজপর্যন্ত এ-অভীপ্সা দ্যুলোকের ছবিকে মর্ত্যের ওপারে কল্পনা করে এসেছে, অথবা মনোময় ব্যষ্টি-জীবের আত্মবিলোপে ও নেতিবাদেই তার চরম সার্থকতা খুঁজেছে। কিন্তু এ হল অভীপ্সার একটা দিক এবং তার এই দীর্ঘযুগব্যাপী উদগ্র দাবিকে একেবারে নিষ্প্রয়োজনও বলতে পারিনা। অনাদি অচিতির অন্ধকবল হতে, দেহের বাধা প্রাণের তামসিকতা ও মনের অবিদ্যাবৃত্তির মূঢ় দুরাগ্রহ হতে নিজেকে সবলে ছিনিয়ে নিয়ে চিন্ময় সত্তার দিব্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রাথমিক প্রয়াস এই ইহবিমুখীনতায় রূপ নিয়েছে। কিন্তু চিন্ময়ী অভীপ্সার শুধু নিষ্কৃতির দিকটা নয়, তার কৃতির দিকটাও মানুষের চিত্তে ফুটেছে—দিব্যভাবনার দ্বারা প্রকৃতির বশীকার ও রূপান্তরের আকূতিতে, হৃদয় ও মনের এমন-কি এই দেহেরও দেবায়নের সাধনাতে। অন্তশ্চক্ষু মানুষ দেখেছে এই মর্ত্যভূমিতেই অনাগত অমরাবতীর স্বপ্ন, ব্যক্তির রূপান্তরকে অতিক্রম করে সমগ্র পৃথিবীরই অভিনব দিব্য রূপান্তর, এইখানেই ভাগবত-শক্তির অবতরণ, সিদ্ধের স্বারাজ্য ও স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা—শুধু মানুষের অন্তরে নয়, তার বাইরে সমষ্টিমানবের সংঘজীবনেও। এই চিন্ময়ী অভীপ্সার বহু কল্পছবি আজও হয়তো মানুষের চেতনায় নীহারিকার বাষ্প-মায়া হয়ে আছে। কিন্তু তবু এই পার্থিব প্রকৃতিতে অন্তর্গূঢ় চিৎপুরুষের উদয়নের আকূতি যে অনির্বাণ দহনে কাঁপছে তাদের মধ্যে—একথা তো অস্বীকার করবার উপায় নাই।

এ যদি সত্য হয় যে জড়ের আধারে জীবজন্মের অর্থই হল মৃন্ময় পাত্রে চিন্ময়ী দ্যুতির আত্মোন্মীলনের আয়োজন, বিশ্ব জুড়ে প্রকৃতিপরিণামের একমাত্র তাৎপর্য যদি হয় চেতনার নিরঙ্কুশ ঊর্ধ্বপরিণাম, তাহলে মানুষে এসেই সে-পরিণামের ছন্দে যতি পড়েছে—একথা মানতে পারি না। অসঙ্কোচেই বলব, মানুষও চিৎসত্তার অপূর্ণ অভিব্যক্তিমাত্র—মনের রূপায়ণে চিৎশক্তির সাধনবীর্য সামান্যই ফুটেছে। মন শুধু চেতনার মধ্যকাণ্ড, মনো-ময় সত্ত্ব উন্মিষন্ত চিৎসত্ত্বের সংক্রান্তিপর্বের বিভূতি মাত্র। মানুষ যদি মানস-ভাবের ঘোর কাটিয়ে না উঠতে পারে, তাহলে এইখানেই সে প্রকৃতির বন্ধ্যা সৃষ্টি হয়ে পড়ে থাকবে এবং তাকে অতিক্রম করে অতিমানস আর অতি-মানবের অনিরুদ্ধ প্রকটশক্তি হবে ভবিষ্য-সৃষ্টির নায়ক। কিন্তু উন্মনী-

ভাবের দিকে মন যদি আজ দল মেলতে পারে, তাহলে এই মানুষই কেন অতি-মানবতার অতিমানস জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ হবে না—অন্তত তার দেহ-প্রাণ-মনকে কেন সে আহুতি দেবে না বিশ্বপ্রকৃতিতে চিৎপুরুষের অভিনব আত্মোন্মীলনের বিরাট উত্তরবেদিকায় ?

• চতুর্বিংশ অধ্যায়

চিন্ময় মানবের বিবর্তন

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

গীতা ৪।১১

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাম্.. ।
দেবান্ দেবযজো যান্তি ..।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥

গীতা ৭।২১-২৩, ৯।২৫

যে যেমনভাবে আমার কাছে আসে, তাকে তেমনভাবেই আমি গ্রহণ করি। মানুষ আমারই পথের অনুবর্তন করে সবরকমে।. .যে-ভক্ত যে-তনুকে শ্রদ্ধায় অর্চনা করতে চায়, তার সেই শ্রদ্ধাকে অচল করি আমি। সেই শ্রদ্ধাযোগে ওই তনুর আরাধনা করে সে এবং তার ফলে আমারই বিধানে লাভ করে তার কাম্য যত। দেবতার যজন করে যারা তারা পায় দেবতাকে; আর আমার ভক্তেরা আমাকেই পায়।

—গীতা (৪।১১; ৭।২১-২৩)

. .ন যাসু চিত্রং দ শে ন যক্ষম্।
ন বাং নিণ্যান্যাচিতে অভূবন্ ॥

ঋগ্বেদ ৭।৬১।৫

এদের মধ্যে না দেখা দিল অপরূপ, না দেখা দিল বীর্য; রহস্য যা, অচিতের জন্য তো হয়নি তা।

—ঋগ্বেদ (৭।৬১।৫)

কবির্ণ নিণ্যং বিদথানি সাধন... .. ।
দিব ইত্থা জীজনৎ সপ্ত কারূনহ্না চিচ্চক্রুর্বয়ুনা গৃণন্তঃ ॥

ঋগ্বেদ ৪।১৬।৩

কবির মত সত্যের রহস্য এবং বিদ্যার সিদ্ধিকে ফুটিয়ে তুলে দ্যুলোকের সাতটি কারুকে জন্ম দিলেন তিনি; দিনেরই আলোতে তারা কইল কথা, করল তাদের কাজ।

—ঋগ্বেদ (৪।১৬।৩)

.. নিণ্যা বচাংসি। নিবচনা কবয়ে কাব্যানি।

ঋগ্বেদ ৪।৩।১৬

কত-যে রহস্য-বাণী—কত-যে কাব্য, কবির কাছেই যারা বলে তাদের মর্মকথা।

—ঋগ্বেদ (৪।৩।১৬)

নকির্হ্যেষাং জনূংষি বেদ তে অঙ্গ বিদ্রে মিথো জনিত্রম্।
এতানি ধীরো নিণ্যা চিকেত পৃশ্নির্যদূধো মহো জভার ॥

ঋগ্বেদ ৭।৫৬।২,৪

কেউ জানেনা এদের জন্ম; জানে এরা পরস্পরের জন্মধারা : কিন্তু এসব রহস্য ধীরেরা জানেন, বিপুলা পৃশ্নি যাদের ধরে আছেন আপন পালানে।

—ঋগ্বেদ (৭।৫৬।২,৪)

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা...শুদ্ধসত্ত্বাঃ।

মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।৬

বেদান্তবিজ্ঞানের অর্থ সুনিশ্চিত তাঁদের মধ্যে—তাঁরা শুদ্ধসত্ত্ব।

—মুণ্ডক উপনিষদ (৩।২।৬)

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥
...জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানঃ...।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরাঃ যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২,৪,৫

এইসব উপায়ে সাধন করে বিদ্বান যিনি, তাঁর মধ্যে এই আত্মা প্রবেশ করেন ব্রহ্মধামে।...জ্ঞানতৃপ্ত কৃতাত্মা ধীর ঋষিরা যুক্তাত্মা হয়ে, সর্বগ ব্রহ্মকে সবখানে পেয়ে সবারই মধ্যে হন আবিষ্ট।

—মুণ্ডক উপনিষদ (৩।২।৪,৫)

প্রকৃতিপরিণামের আদিকাণ্ডে আমরা দেখি মূঢ় অচিতির নির্বাক রহস্য। তখন মনে হয় না, মহাপ্রকৃতির প্রবৃত্তিতে কোনও আকূতি বা তাৎপর্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যেন অচিতির ওই আদিবিক্ষেপ ছাড়া শাশ্বতকাল ধরে তার আর-কোনও কাজ নাই, ওই একটিমাত্র ঐকান্তিক অভিনিবেশের তলায় যেন তলিয়ে গেছে সত্তার আর-যত বিভূতির ইঙ্গিত। এমনি করে প্রকৃতির প্রথম কীর্তিরূপে ফোটে জড়—বিশ্বের একমাত্র তত্ত্বের নির্বাক নিরেট ব্যঞ্জনা নিয়ে। কল্পনা করা যাক, এই বিসৃষ্টির একজন সাক্ষী আছেন, যিনি এর মর্মরহস্য কিছুই জানেন না। সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি দেখবেন : অপ্রতর্ক্য আপাতঅসতের বিপুল গহন হতে অনির্বচনীয় মহাশক্তির আন্দোলনে সৃষ্ট হল জড়জগৎ ও জড়পদার্থে সংকুল এক মহাবিপুল জড়ের মেলা, অচিতির নিরন্ত বিস্তার কণ্টকিত হয়ে উঠল অগণন ব্রহ্মাণ্ডের সীমাহীন পরিকীর্ণতায়। তাঁকে ঘিরে অন্তহীন মহাকাশের অসীম অঙ্গন জুড়ে চলল কোটি-কোটি নীহারিকা নক্ষত্রপুঞ্জ আদিত্য ও গ্রহমণ্ডলীর অবিশ্রাম উৎসারণ—যার কোনও অর্থ নাই, হেতু নাই, লক্ষ্য নাই। তাঁর মনে হবে, এ যেন এক অতিকায় যন্ত্রের অর্থহীন দুর্নিবার আবর্তন, যুগ হতে যুগান্তর ছেয়ে এক দর্শকহীন দৃশ্যের অবতারণা, এক অনধ্যুষিত বিশ্বের বিরাট পরিকল্পনা। কেননা, তখনও তিনি এর মধ্যে এমন-কোনও অন্তর্যামী চিন্ময়-পুরুষের আভাস খুঁজে পেতেন না, যাঁর আনন্দ-বিধানের জন্য প্রকৃতির এই অয়োজন। এইধরনের সৃষ্টিকে বলা চলে এক অচেতনা মহাশক্তির বিক্ষেপ অথবা উদাসীন অতি-চেতন নির্বিশেষের পটভূমিকায় প্রতিফলিত রূপাবলির একটা মায়াছবি কি ছায়াবাজি বা পুতুলনাচ মাত্র। জীবচেতনার আভাস দূরে থাকুক, এই অমেয় অনন্ত জড়লীলার মধ্যে কোথাও তিনি মন বা প্রাণের এতটুকু স্পন্দন দেখতে পেতেন না। ওই ঊষর বিশ্বের নিঃসংজ্ঞ নিষ্প্রাণ বুকে কোনদিন যে উচ্ছ্ব-

সিত প্রাণের অতর্কিত শিহরন জাগবে, এক অপ্রতর্ক্য রহস্যনিবিড় প্রাণ-চেতনার অরুণ স্পন্দন দেখা দেবে, কোনও অন্তর্গূঢ় চিন্ময় সত্তার বহিঃ-প্রকাশের মন্থর অভিযান শুরু হবে—এ কি কল্পনারও গোচর ছিল তাঁর!

কিন্তু বহুযুগের অবসানে এই অর্থহীন রঙ্গলীলার দিকে আরেকবার তাকিয়ে সাক্ষী পুরুষ হয়তো দেখতে পেতেন, ওই জড়বিশ্বের একপ্রান্তে—যেখানে জড়শক্তি যেন সংহত সুবিন্যস্ত ও দৃঢ়মূল হয়েছে এক অভিনব রূপায়ণের জন্য, সেইখানেই দেখা দিল জড়ের আধারে প্রাণের প্রথম স্ফুরণ, প্রাণের সুস্পষ্ট উন্মেষে সহসা কেঁপে উঠল জড়ের বুক। তবু কিছুই তিনি বুঝতে পারতেন না, কেননা তখনও প্রকৃতি তার পরিণামরহস্যের ঢাকা খোলেনি তাঁর কাছে। প্রকৃতিকে তিনি প্রাণের এই অভিনব উচ্ছ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠ করবার চেষ্টাতেই ব্যাপৃত দেখতেন, কিন্তু প্রাণের অয়নে খুঁজে পেতেন না কোনও লক্ষ্যের ইশারা। প্রাচুর্যের উচ্ছৃঙ্খল প্রমত্ততায় মহা-প্রকৃতি দিকে-দিকে ছড়িয়ে চলেছে তার নবলব্ধ বিভূতির বীজ, রূপবৈচিত্র্যের সুষমাময় অফুরন্ত ঐশ্বর্য ফুটিয়ে তুলছে আপন বুকে, অথবা শুধু সৃষ্টির উল্লাসেই রচনা করে চলেছে বিচিত্র গণ ও প্রজাতির অগণিত পরম্পরা। বিশ্বের বর্ণরাগহীন অকূল মরুতে ঝিকিমিকি করছে একটুখানি রঙের ছোঁয়াচ, একটুখানি গতির ইশারা—এর বেশী কিছুই নয়! প্রাণের এই শীর্ণ মরূদ্যানে অচিতির সম্পুটকে বিদীর্ণ করে কোনদিন যে চেতনার ফুল ফুটবে মননধর্মের চিত্রসুষমা নিয়ে, এক নবীন বৃহৎ ও সূক্ষ্মতর কম্পনের সংবেদনে বিশ্বের নাড়ীতে অন্তঃশীল চিদ্‌ভাবের সত্তা স্ফুরিত হবে—এ কি সেই সাক্ষী পুরুষ কল্পনায় আনতে পারতেন? শুধু তাঁর মনে হত, প্রাণ যেন কী করে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। ওই কি মনের ভ্রূণ? কিন্তু এখনও মনের এই ক্ষীণকায় নবজাতক প্রাণের ক্রীড়নক, তারই বাঁচবার এবং টিকে থাকবার একটা সাধনমাত্র। প্রাণের ইষ্টসিদ্ধি ও বুভুক্ষার তৃপ্তি চাই, চাই সহজাত বৃত্তি ও প্রেতির অবাধ সার্থকতা। অতএব আঘাত করে ও আঘাত বাঁচিয়ে চলবার জন্য মনেরই মত একটা সাধন তারও চাই। জড়ত্বের মহাবৈপুল্যের মধ্যে অদৃশ্যপ্রায় প্রাণের এই স্বল্প পরিসরে নগণ্য জীববাহিনীর একটিমাত্র পর্যায়ে মনোময় জীবের কোনদিন যে আবির্ভাব হবে, এ কি সাক্ষী পুরুষের ধারণায় আসত? তিনি কি জানতেন, প্রাণের আজ্ঞাবহ হয়েও এই মনই একদিন প্রাণ ও জড়কে কবলিত করে আপন ভাবনা সঙ্কল্প ও বাসনার সার্থকতায় নিয়োজিত করবে? এই মনোময় জীবই নিজের সর্ববিধ প্রয়োজন সিদ্ধ করতে জড়ের উপাদান ছেনে গড়বে কত তৈজস হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি, রচবে সৌধ মন্দির প্রেক্ষাগৃহ বীক্ষণাগার ও শিল্পশালায় আকীর্ণ কত মহানগরী, পাথর কুঁদে বার করবে মূর্তি, পাহাড় খুঁড়ে গড়বে চৈত্যগুহা, স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রে

শিল্পে চারুকলায় ও কাব্যে দেবে সন্ধানী প্রতিভার সহস্র পরিচয়, জড়বিশ্বের তত্ত্ব ও গণিতের অনুশীলনে অপাবৃত করবে তার রচনার গোপন রহস্য, মনের শতরূপা আকৃতির উচ্ছলনে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এষণায় ধন্য করবে জীবনকে, দার্শনিক মনস্বী ও বৈজ্ঞানিকের আসনকে করবে অলঙ্কৃত, এবং অবশেষে জড়ের আধিপত্যকে ধূলিসাৎ করে নিজেরই মধ্যে জাগিয়ে তুলবে গুহাহিত দেবত্বের মহিমা, অলখের ব্যাকুল এষণায় পাগল হয়ে অবিষ্কার করবে লোকোত্তর চেতনার তুঙ্গশিখর।...কিন্তু এই অনাগত ঐশ্বর্যের এতটুকু আভাসও কি সেদিন সাক্ষী পুরুষের চোখে পড়ত ?

বহু যুগ বা কল্পের পরে সে অঘটনও ঘটল। বিশ্বের রঙ্গভূমির দিকে তাকিয়ে সাক্ষী পুরুষ দেখতে পেলেন মানুষের চিত্তৈশ্বর্যের অভাবনীয় লীলা। কিন্তু বহুলক্ষযুগব্যাপী জড়ত্বের অনুধ্যানে তখনও হয়তো তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন। অতএব এর অন্তর্গূঢ় চিন্ময় তাৎপর্য তাঁর বুদ্ধির অগোচর রইল। চিদাভাস যে চিদাকাশ হয়ে ফুটবে, মৃন্ময় আধারে চিন্ময় পূর্ণপ্রস্ফুট চেতনা যে আত্মবিৎ ও সর্ববিৎরূপে দেখা দেবে প্রকৃতির শাস্তা এবং ভর্তা হয়ে—এ-সম্ভাবনা তখনও তাঁর মনে জাগেনি। তার একটুখানি ইঙ্গিতে চকিত হয়ে তিনি বললেন, ‘অসম্ভব ! এমন-কী আর ঘটেছে এত যুগ পরেও ? মস্তিষ্কের সংবেদনশীল ধূসর উপাদান একটু গেঁজে উঠেছে, বিশ্বের তিলমাত্র-ঠাঁই-জোড়া নিষ্প্রাণ জড়ের এককোণে দেখা দিয়েছে খেয়ালী প্রকৃতির একটা আজগুবী খেয়াল—এই তো ?’ কিন্তু আদিকাণ্ডের বঞ্চনায় আচ্ছন্ন হয়নি যে-পুরুষের দৃষ্টি, অতীত পরিণামের ধারাকে অনুসরণ করে এই উত্তর-কাণ্ডে এসে তিনি হয়তো বলে উঠবেন, ‘বুঝেছি ! এই চরম চমৎকারের আকৃতিই তবে গোপন ছিল প্রকৃতির বুকে ! অচিতির গহনে অন্তর্লীন ছিল যে-চিৎসত্তা, তার আত্মপ্রকাশের সংবেগে তারই উন্মেষের আধাররূপে লক্ষ-যুগ ধরে চলেছে এই রূপায়ণের লীলা। আজ তার শেষ পর্বে চিন্ময় তনুতে হল চিন্ময় মহেশ্বরের নির্মুক্ত আবির্ভাব।’ কিন্তু সাক্ষীর দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ ও গভীর থাকলে, সৃষ্টির আদিতেই হয়তো প্রকৃতির এই আকৃতি তাঁর কাছে ধরা পড়ত—পরিণামের প্রতিপর্বে স্পষ্ট হয়ে উঠত তার দূরান্তরের লক্ষ্য। কারণ প্রকৃতি রহস্যময়ী হলেও ঊর্ধ্বায়নের প্রতি পর্বেই তার রহস্যের ঘোর তরল হয়ে আসে, প্রতি পদক্ষেপেই সে দেয় পরবর্তী পদক্ষেপের সুস্পষ্ট সূচনা, অনাগতের আয়োজনকে দৃষ্টির সম্মুখে করে আরও অনাবৃত। তাই স্থাবর প্রাণের অচেতনবৎ বৃত্তিতেও লক্ষ্য করি ইন্দ্রিয়সংবেদনের বহিরভিসারের স্পষ্ট নিশানা ; তারপর জঙ্গম ও উচ্ছ্বাসী প্রাণের মধ্যে দেখি সংবেদনশীল মনের উন্মেষ এবং তার অন্তরালে মননধর্মের আয়োজনও একান্ত দুর্লক্ষ্য নয়। অবশেষে মননধর্মী চিত্তের আবির্ভাবের সঙ্গে গোড়া হতেই দেখা দেয়

অধ্যাত্মচেতনার অপরিণত অথচ উপচীয়মান আকূতি। এমনি করে উদ্ভিদের মধ্যে সচেতন পশুত্বের অব্যক্ত সূচনা নিহিত থাকে। আবার পশুর চিত্ত দুলে ওঠে ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও বেদনার স্পন্দনে, মনুষ্যত্বের ভূমিকারূপে দেখা দেয় সামান্যভাবনার ক্ষীণতম আভাস। অবশেষে মননধর্মী মানুষের মধ্যে ঊর্ধ্ব-পরিণামিনী প্রকৃতির দুশ্চর তপস্যা সার্থক হয় চিন্ময় মানুষের আবির্ভাবের সম্ভাবনায়—যে-মানুষের পূর্ণস্ফুট চেতনা দেহ-আত্মার আদ্যচ্ছন্দকে অতিক্রম করে আবিষ্কার করে তার পরম আত্মা ও পরমা প্রকৃতির মুক্তচ্ছন্দ।

এই যদি প্রকৃতির আকূতি হয়, তাহলেও এ-বিষয়ে দুটি প্রশ্নের নিশ্চিত জবাব আমাদের পাওনা থাকে। প্রথম প্রশ্ন : মনোময় পুরুষ হতে চিন্ময় পুরুষের বিবর্তনের প্রকৃত স্বরূপ কি? একথাটা পরিষ্কার হলে তার পরের প্রশ্ন : এই বিবর্তনের কি ধারা, কি রীতি?...এপর্যন্ত দেখে এসেছি, প্রকৃতি-পরিণামের প্রত্যেক পর্বে প্রাক্তন পর্বের একটা অনুবৃত্তি ও পরিবেশ থাকে। জড়ের মধ্যে প্রাণের উন্মেষ হলেও জড় আধারের নিমিত্তদ্বারাই তার আত্ম-রূপায়ণের সংবেগ সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার এমনি করে প্রাণময় জড়ে মনের উন্মেষকে ঘিরে থাকে প্রাণময় ও অন্নময় পরিবেশের শাসন। অতএব এই রীতিতে প্রাণময় জড়বিগ্রহে নিহিত মনের কোলে চিৎসত্ত্বেরও উন্মেষ হবে এবং তার সকল বৃত্তি বহুলপরিমাণে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে শুধু আশ্রয়ভূত মনোধর্মের নিমিত্তদ্বারা নয়—এই মর্ত্যজীবনের প্রাণময় ও জড়ময় পরিবেশের দ্বারাও। এমনও বলতে পারি, আমাদের মধ্যে চিন্ময়পরিণাম ঘটে থাকলেও তাকে গণ্য করতে হবে মনোময়পরিণামের অঙ্গরূপে, মানুষের মননধর্মেরই একটা বিশেষ ব্যাপাররূপে। মানুষের চিৎস্বভাব একটা সুস্পষ্ট কি বিবিক্ত বস্তু নয়, সুতরাং তার স্ত-তন্ত্র উন্মেষ বা অতিমানস পরিণামের কল্পনা অযৌক্তিক। আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরাগ বা অভিনিবেশবশত মনোময় জীব খানিকটা বুদ্ধির উৎকর্ষসাধন বা অধ্যাত্মসম্পদ আহরণ করতে পারে, মনোময় মাটিতে চিন্ময় ফুলের ফসল ফোটাতে পারে—এইটুকু সম্ভব। যেমন শিল্পে কি ফলিত-বিজ্ঞানে কারও বিশেষ ঝোঁক থাকে, তেমনি আধ্যাত্মিকসাধনারও দিকে হয়তো কারও-কারও একটা ঝোঁক থাকতে পারে। কিন্তু তাবলে কোনও চিন্ময় পুরুষ যে মনোময় প্রকৃতিকে চিন্ময় প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করবেন—এ কিছুতেই সম্ভবপর মনে হয় না। আসলে মানুষের মধ্যে নিভাঁজ চিৎস্বভাবের উন্মেষ হতেই পারে না, কদাচিৎ তার মনোময় আধারে সূক্ষ্মতর একটা অসামান্য ধর্মের স্ফুরণ হয় মাত্র।...এইধরনের পূর্বপক্ষকে খণ্ডন করবার জন্য আমাদের বিশেষ করে জানতে হবে, চিন্ময় আর মনোময় প্রকৃতির মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য কোথায়, চিন্ময় পরিণামের স্বরূপ কি, এবং শুধু তা সম্ভব না হয়ে অপরি-হার্যই-বা কেন। চিন্ময় বৃত্তির ধরনধারন কি তার উন্মেষের রীতি অনেক-

ক্ষেত্রে আজ মনোময় বৃত্তির অনুবর্তী অথবা প্রায়ই তার মধ্যে মননধর্মের একটা স্বরাট বিভূতি ফোটে। কিন্তু এ তো তার প্রকৃত রূপ নয়। বস্তুত চিন্ময় বৃত্তিতে সত্তার একটা নবীন ও স্ব-তন্ত্র বীর্য স্ফুরিত হয়, যা অবশেষে আধারে জ্বলে ওঠে মনোধর্মের শিখামণি হয়ে এবং তার স্থানকে অধিকার করে জীবন ও প্রকৃতির নিয়ন্তারূপে। চিৎস্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যটুকু এবার আমাদের তলিয়ে বুঝতে হবে, নইলে মনের ধাঁধা ঘুচবে না।

সত্য বটে, বাইরে থেকে দেখতে গেলে প্রাণকে মনে হয় নিছক একটা জড়ের ব্যাপার, মনকে মনে হয় প্রাণেরই পরিস্পন্দ। এহতে সিদ্ধান্ত করতে পারি, জীবচেতনা বা চিৎসত্তা মনেরই বিভূতি। জীবাত্মা মনের একটা সূক্ষ্ম-বিগ্রহ মাত্র, আর চিৎসত্ত্ব মনোময় দেহীর উৎকৃষ্ট একটা বৃত্তিপরিণাম। কিন্তু এ-ধারণা আমাদের বহির্মুখ দৃষ্টির ফল। প্রতিভাসের দিকে তাকিয়ে মন যখন ক্রিয়াশক্তির খেলা ছাড়া আর-কিছুই দেখতে পায় না অর্থাৎ ক্রিয়ার পিছনে কর্তার প্রতি সে অন্ধ যখন, তখনই তার এই ভুল হয়। এ যেন বিদ্যুৎকে জলভরা মেঘের পরিণাম বলে সিদ্ধান্ত করার মত—যেহেতু জলভরা মেঘেই সাধারণত বিদ্যুৎসঞ্চার হয়ে থাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার দৃষ্টিতে মেঘ আর জল দুইই বিদ্যুৎশক্তির পরিণাম—বিদ্যুৎই তাদের শক্তি-ধাতু বা মূলা প্রকৃতি। যাকে আমরা বিকৃতি ভাবছি—আকারে না হ'ক, তত্ত্বত সে-ই কিন্তু প্রকৃতি। বস্তুত কার্যের সত্তা পূর্ব হতেই সূক্ষ্মরূপে কারণে নিহিত ছিল অর্থাৎ উন্মিষন্ত ক্রিয়াশক্তি তত্ত্বত বর্তমান ক্রিয়ার আধারের প্রাগ্ভাবী। প্রকৃতিপরিণামের সর্বত্র এই ব্যাপার। বহিঃপরিণামে তা-ই স্ফুরিত হয়, যা পূর্ব হতে সত্তাতে বীজের আকারে অনুস্যূত ছিল। জড় প্রাণময় হয়ে উঠত না, যদি প্রাণের তত্ত্ব জড়ের প্রকৃতি না হত। এই মূলা প্রকৃতিরই বিকৃতিতে দেখা দিল জীবন্ত জড়ের প্রতিভাস। আবার জীবন্ত জড়ের আধারে সংজ্ঞা বেদনা ভাবনা বা বুদ্ধির বৃত্তি ফুটত না, যদি প্রাণ ও রূপধাতুর অন্তরালে মনের বীর্য প্রচ্ছন্ন না থাকত। মনের প্রাক্সিদ্ধ সত্তাই তাদের স্বব্যাপারকে আশ্রয় করে ফুটেছে মননধর্মী জীববিগ্রহের আকারে। তেমনি মানুষের মনে অধ্যাত্মচেতনার স্ফুরণে প্রমাণিত হচ্ছে—এই চিৎশক্তিই ছিল জড় প্রাণ ও মনের প্রকৃতি এবং প্রতিষ্ঠা, তাই আজ মনোময় জীবন্ত আধারে চিন্ময় পুরুষরূপে তার অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছে। এই অভিব্যক্তির প্রসার কতদূর, স্বরাট হয়ে আধারের আমূল রূপান্তর সে ঘটাবে কি না—সে হল পরের কথা। আপাতত এই তথ্যটি জানতে হবে, চিৎসত্ত্ব মনের চাইতে বিরাট এবং বিবিক্ত একটা তত্ত্ব, আর আধ্যাত্মিকতা মানুষের মানসধর্মেরও বাড়া—অতএব চিন্ময় পুরুষ মনোময় পুরুষ হতে সম্পূর্ণ আলাদা। পরিণামের পরম্পরায় চিৎসত্তার প্রকাশ সবার শেষে কেননা অন্তঃপরিণামের ধারায় সে-ই ছিল সবার আদি প্রযোজক তত্ত্ব।

অন্তঃপরিণামের প্রতীপ বৃত্তিই হল বহিঃপরিণাম। তাই সংবৃত্তির শেষ পর্বে যার আবির্ভাব, সে-ই দেখা দেয় বিবৃত্তির আদিপর্বে। আবার যে ছিল সংবৃত্তির আদিবিন্দুতে, বিবৃত্তির অন্ত্যপর্বে সে-ই ফুটবে চরম স্ফুরণের মহিমা নিয়ে।

এও সত্য, জীবাত্মা চিৎসত্ত্ব বা চিদ্‌বৃত্তিকে আধারভূত প্রাণময় ও মনোময় বৃত্তি হতে বিবিক্ত করে দেখা মানুষের পক্ষে কঠিন। কিন্তু চিৎস্বভাবের সম্পূর্ণ স্ফুরণ না হওয়া পর্যন্তই এই বাধা। পশুর মধ্যে মনোবৃত্তি প্রাণময় ধাতু ও মাতৃকা হতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত নয়। তার সকল বৃত্তি প্রাণের সঙ্গে এমন-ভাবে জড়িয়ে আছে যে, নিজেকে তাহতে পৃথক করে বৃত্তির উদাসীন সাক্ষী হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু মানুষের বেলায় মন বিবিক্ত, তাই মনোবৃত্তিকে প্রাণ-বৃত্তি হতে আলাদা করে দেখবার সামর্থ্য সে রাখে। ইন্দ্রিয়ের সংবিৎ ও চিত্তের সংবিৎকে বাসনা ও বেদনার বিক্ষোভকে ইচ্ছা করলেই সে ঠেকিয়ে রেখে তাদের পর্যবেক্ষণ ও শাসন করতে পারে—তাদের প্রবর্তন বা নিবর্তনের স্বাতন্ত্র্যও তার আছে। অবশ্য আজও তার সত্তার সকল রহস্য সে জানে না, অতএব সে-যে অন্ন-প্রাণের আধারে প্রতিষ্ঠিত স্ব-তন্ত্র মনোময় সত্ত্ব—আত্মস্বরূপের এ সুনিশ্চিত বোধ তার নাই। অথচ এমনতর একটা সংস্কার তার আছে এবং অন্তরে-অন্তরে স্বাতন্ত্র্যের সাধনাও সে করতে পারে। ..পশু-মনের মত মানুষের চৈত্যসত্তাও প্রথম যেন তার মন এবং মনোবাসিত প্রাণের সঙ্গে অবিবিক্ত হয়ে জড়িয়ে থাকে, তাই তার বৃত্তিকে হৃদয়-মনের বৃত্তি বলে ভুল হয়। মনোময় মানুষ জানে না, তার মধ্যে অধিষ্ঠিত রয়েছে দেহ-প্রাণ-মন হতে বিবিক্ত এক চৈত্যসত্তা—তাদেরই বৃত্তি ও রূপায়ণের উপদ্রষ্টা শাস্তা ও স্থপতিরূপে। কিন্তু অন্তর যখন দল মেলতে থাকে, তার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের মধ্যে দেখা দেয় ঈশনার এই অবিসংবাদিত সামর্থ্য। কেননা বহুবিলম্বিত হলেও মনোময় পর্বের পরে এই চিন্ময় পর্বের আবির্ভাব আমাদের প্রকৃতিপরিণামের অপরিহার্য নিয়তি। আধারে চিৎ-সত্ত্বের উন্মেষ এতখানি সুপ্রতিষ্ঠ হতে পারে যে, সাধক মনন হতে বিবিক্ত হয়ে অন্তরের নৈঃশব্দ্যে তলিয়ে গিয়ে নিজেকে মনের অধিষ্ঠাতা চিৎসত্ত্বরূপে অনুভব করতে পারে। কিংবা প্রাণের স্পন্দ আকূতি প্রবৃত্তি ও অনুভব হতে সরে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রাণের ভর্তা চিৎসত্ত্বরূপে দেখতে পারে। অথবা দেহবোধ হতে বিযুক্ত হয়ে নিজেকে জড়বিগ্রহ অথচ চিন্ময় দেহীরূপে জানতে পারে। এই হল নিজেকে 'পুরুষ' রূপে জানা : আমরা শুধু দেহী প্রাণী বা মানুষ নই—আমরা অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় পুরুষ। অনেকের ধারণা, আত্মবিজ্ঞানের সাধনা এতেই বুঝি পূর্ণ হল। একহিসাবে কথাটা মিথ্যা নয়, কেননা এ-দর্শনে আত্মা বা চিৎসত্তাই যে প্রকৃতির নিয়ন্তা, এই বোধ হতে প্রকৃতি-পুরুষের

বিবেকসাধন সহজ হয়। কিন্তু আত্মোপলব্ধি আরও গভীর হতে পারে— প্রকৃতির ক্রিয়া বা সম্মূর্ছনের সঙ্গে পুরুষের সকল সম্পর্ক একেবারে ছিন্নও হতে পারে। বস্তুত অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় পুরুষ এক দিব্য-পুরুষের বিভূতি—দেহ-প্রাণ-মন তার বিগ্রহ ও সাধন মাত্র। নিজের মধ্যে যখন পৌরুষেয় সত্তার সন্ধান পাই, তখন বুঝতে পারি প্রকৃতি-স্থ পুরুষই প্রকৃতির উপদ্রষ্টা। প্রকৃতির যা-কিছু ব্যাপার আধারে ঘটছে, সবই তিনি জানেন—মানসপ্রত্যক্ষ দিয়ে নয়, কিন্তু স্বতোভাস্বর নির্মুক্ত চেতনার অপরোক্ষ বৃত্তি দিয়ে। এমনি করে প্রকৃতির মর্মসত্যে অবগাহন করতে পারেন বলেই, আধারে পুরুষসত্ত্বের উন্মেষ হলে তিনিই আমাদের অপরা প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ ও রূপান্তরের কর্তা হন। আত্মবিবেকের এই হল প্রথম স্তর। কিন্তু চরম বিবেকে সমস্ত সত্তা যখন নিথর হয়ে যায়, কিংবা বাহ্য বিক্ষোভের অন্তরালে অক্ষোভ্য নিস্পন্দতায় সমাহিত থাকে—তখনই আমরা জানতে পারি সেই কূট-স্থ পুরুষ বা আত্ম-স্বরূপকে, এই আধারের যিনি চিদ্‌ঘন-সত্ত্বরূপী, ব্যষ্টি জীবচেতনাকেও অতিক্রম করে যিনি বিশ্বাত্মভাবনার পরম ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে আছেন, প্রাকৃত বিগ্রহ বা ক্রিয়ার উপরাগ হতে নির্মুক্ত হয়ে বিশ্বোত্তীর্ণের অলখ নিঃসীমতার দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে যাঁর উত্তরজ্যোতির দীপ্তচ্ছটা। এমনি করে আধারের চিদংশের প্রমুক্তিই হল প্রকৃতির চিন্ময়-পরিণামের বিশিষ্ট এবং অপরিহার্য ধারা।

প্রকৃতির এই ক্রান্তিকারী প্রবৃত্তি হতে তার আবহমান পরিণামের যথার্থ রূপটি ধরা পড়ে। তার পূর্বে চলে শুধু প্রমুক্তির আয়োজন—দেহ-প্রাণ-মনের 'পরে চৈত্যসত্তার আবেশে আধারে ফোটে জীবভূতা প্রকৃতির ঋতময় বৃত্তি, চিন্ময় আত্মসত্তার আবেশে অহন্তা ও অবিদ্যার বহির্মুখ প্রবৃত্তির অভ্যষ্টতা দূর হয়, প্রাণ ও মনের মধ্যে জাগে গূহাহিত তত্ত্ববস্তুর জন্য একটা ব্যাকুলতা। কিন্তু এও চিন্ময় অনুভবের আদিপর্ব মাত্র। এতে চিদ্‌বাসিত প্রাণ ও মনের একটা আদরা গড়ে ওঠে শুধু—প্রকৃতি-স্থ ও কূটস্থ পুরুষের নির্মুক্ত প্রকাশে কিংবা প্রকৃতির আমূল রূপান্তরে আধার একেবারে চিন্ময় হয়ে ওঠে না। পূর্ণপ্রমুক্তি বা চিৎসত্তার স্বরসবাহী বিশিষ্ট স্ফুরণের একটা লক্ষণ এই যে, তাকে আশ্রয় করে আমাদের আধারে নিরূঢ় অন্তরঙ্গ স্বয়ম্ভূ-চেতনার একটা স্থিতি বা বৃত্তি ফোটে। সে-চেতনা সত্তার সঙ্গে অবিনাভূত বলে তার আত্মসংবিৎ যেমন স্বপ্রকাশ, তাদাত্ম্যবোধের নিবিড়তায় তার আত্ম-বৃত্তির সংবিৎও তেমনি অপরোক্ষ। শুধু তা-ই নয়। আমাদের মন যাকে বাইরে দেখে, এই চেতনার তাদাত্ম্যবোধ বা অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ অনুভবের সহজ বৃত্তি তাকে আবৃত অনুবিদ্ধ ও জারিত করে আত্মস্বরূপকেই তার মধ্যে আস্বাদন করে—বিষয়ে অবগাহন করে তার অন্তস্তলে আবিষ্কার করে দেহ-

প্রাণ-মনের অতীত একটা অনির্বচনীয় সত্তা। এই অনুভব হতে প্রমাণ হয়, মনোময় চেতনার পরেও একটা অধ্যাত্মচেতনার ভূমি আছে, অতএব আমাদের বহির্মুখ মনোময় পুরুষেরও উপরে আছে এক চিন্ময় পুরুষের অধিষ্ঠান। প্রথমত এই অধ্যাত্মচেতনা ফোটে অবিদ্যা-প্রকৃতির বহির্মুখ ক্রিয়া হতে বিবিক্ত ও বিযুক্ত সাক্ষিচৈতন্যরূপে। এ-অবস্থায় জ্ঞানই সে-চেতনার বৃত্তি। সাক্ষিচৈতন্য বিষয়কে দর্শন করে শুধু নির্বিকল্প সত্তার চিন্ময় বোধ দিয়ে। ক্রিয়ার জন্য তখনও তাকে দেহ-প্রাণ-মনরূপী সাধনের 'পরে নির্ভর করতে হয়। অথবা দেহ-প্রাণ-মনকে স্বভাবের পথে ছেড়ে দিয়ে আত্মজ্ঞান ও আত্মরতির মধ্যেই সে পরিনির্বাণের দূরগন্ধবহ আন্তর মুক্তির তৃপ্তি পায়।...কিন্তু অধ্যাত্মচেতনার এই একটিমাত্র রূপ নয়। প্রায়ই তার মধ্যে দেখা দেয় শাস্তা ও নিয়ন্তার একটা ভাব—যা দেহ-প্রাণ-মনের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিশুদ্ধ ক'রে স্বভাবসিদ্ধ উত্তরায়ণের ঋতময় পথে প্রচোদিত করে। তার অনুশাসনে প্রাণ-মন তখন লোকোত্তরের কোনও জ্যোতিঃশক্তির নিমিত্ত কিংবা অনুবর্তী হয়। এক জ্যোতির্ময়ী দেশনার অবন্ধ্য প্রেতি তাদের মধ্যে নেমে আসে। সে-দেশনায় মনের প্ররোচনা নাই, আছে দেবাদেশের সুস্পষ্ট-লাঞ্ছনযুক্ত চিন্ময়ী প্রচোদনা—যাকে বলতে পারি পরমাত্মার প্রেরণা বা সর্বভূতমহেশ্বরের অমোঘ অনুশাসন।...অথবা আরও গভীর অনুধ্যানের ফলে, চৈত্যপুরুষের নির্দেশ মেনে প্রকৃতি অন্তরের জ্যোতির্লোকে বিচরণ করে—অন্তর্যামীর অন্তঃশীলা প্রেষণার বাহন হয়ে। ওই অবস্থা এলে বুঝতে হবে পরিণামের পথে আমরা অনেকখানি এগিয়ে গেছি—কেননা এইহতে আধারে চৈত্য ও চিন্ময় রূপান্তরের শুরু। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আন্তর মুক্তির ফলে একবার স্বচ্ছন্দ হলে চিৎসত্ত্ব এই প্রাকৃত-মনের মধ্যেই তার অপ্রাকৃত স্বভাবের উত্তরবিভূতিদের গড়ে তুলতে পারে, অতিমানস হতে নামিয়ে আনতে পারে ঋত-চিতের জ্যোতিঃপ্রবাহের বন্যা। এই প্লাবনেই প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনরূপী সাধনসম্পদের পূর্ণ রূপান্তর সিদ্ধ হয়। অবিদ্যার যত জলুসই থাকুক, তারা তখন আর তার অনুবর্তী হয়ে চলে না—কেননা অতিমানসের সিসৃক্ষা এবার তাদের গড়ে তোলে ঋত-চিতের দিব্যপ্রজ্ঞা ও ঋতম্ভরা প্রবৃত্তির বাহন ক'রে।

চিৎসত্তা ও অধ্যাত্মচেতনার সত্যকে মানুষের মন প্রথমেই স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করতে পারে না। জীবাত্মা যে দেহ হতে স্বতন্ত্র এবং প্রাকৃত প্রাণ-মনেরও উপরে—এমনতর একটা মানসপ্রত্যয় থাকলেও তার চেহারাটা মানুষের কাছে খুব স্পষ্ট নয়, কেননা প্রাকৃতজীবনের 'পরে একটা গৌণ প্রভাব ছাড়া আত্মার আর-কোনও পরিচয় তার জানা নাই। এই প্রভাবও আবার ফোটে প্রাণময় অথব মনোময় বৃত্তির আকারে। উভয়ের পার্থক্য তাই চেতনায় খুব গভীর রেখাপাত করে না বলে আমাদের মধ্যে আত্মবোধ নিশ্চিত স্বাতন্ত্র্যের

দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে না। পরমার্থদৃষ্টিতে বিশ্বচেতনা ও ব্যক্তি-চেতনা দুইই আত্মার স্বরূপ হলেও, বিবিক্ত অহংবোধকে আমরা যেমন আত্মা বলে ভুল করি, তেমনি প্রাণ-মনের 'পরে চৈত্যসত্তার অপূর্ণ আবেশহেতু মনের আকূতি ও প্রাণের বাসনার খাদ-মেশানো একটা ব্যামিশ্র আত্মপ্রত্যয়কে আমরা প্রায়ই মনে করি আত্মবোধের স্বরূপ। কখনও-কখনও প্রাণ-মনের এই আকূতি ও উৎসাহের দীপ্তি কোনও অটল বিশ্বাস কি শ্রদ্ধা অথবা আত্মোৎসর্গ কি লোকহিতৈষণার উন্মাদনায় আরও উৎশিখ হয়ে ওঠে। আর আমরা তাকেই ভাবি আধ্যাত্মিকতার একটা জ্বলন্ত নিদর্শন। কিন্তু প্রকৃতিপরিণামের ধাপে-ধাপে এইধরনের সাময়িক অস্পষ্টতা ও ব্যামিশ্রভাব মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কেননা অবিদ্যা হতে যখন সবার যাত্রা শুরু, তখন প্রকৃতির আদিপর্ব জুড়ে থাকবে শুধু অস্পষ্ট বোধিচেতনা ও সহজাতপ্রবৃত্তি বা এষণার সংবেগ—সাধনলব্ধ প্রজ্ঞার সুনির্মল দীপ্তি নয়। এমন-কি চিন্ময়-পরিণামের সূচনায় অথবা তার অনুকূল প্রজ্ঞা বা প্রেতির উদ্বোধনে যেসব বৃত্তির স্ফুরণ হয়, তাদের মধ্যেও এমনতর অপূর্ণতা ও অনিশ্চয়তার ছাপ থাকে। চিন্ময় বৃত্তি বলে তাদের ভুল করলে আমাদেরই সত্যকার বোধোদয়ের পথে কাঁটা পড়বে। তাই গোড়াতেই জেনে রাখা ভাল, বুদ্ধির উৎকর্ষ আর আধ্যাত্মিকতা এক বস্তু নয়—এমন-কি যে-কোনও ধরনের আদর্শবাদ শীলানুরাগ চারিত্রিক বিশুদ্ধি তপশ্চর্যা ধর্মনিষ্ঠা উচ্ছ্বসিত ভাবোন্মাদ বা এতগুলি সদ্‌বৃত্তির একত্র সমাবেশও সত্যকার আধ্যাত্মিকতা নয়। কোনও সাম্প্রদায়িক মতবাদের প্রতি মনের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস, ভাবুকের ঊর্ধ্বমুখী ব্যাকুলতা, আচার বা ধর্মবিধানের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুবর্তন—এতেও অধ্যাত্মসিদ্ধি আয়ত্ত হবার নয়। এরা যে নিরর্থক, তা নয়। প্রাণ ও মনের উৎকর্ষসাধনের পক্ষে এরা অপরিহার্য—এমন-কি চিন্ময়-পরিণামেরও বহিরঙ্গ সাধনরূপে এদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, কেননা আধারের মার্জন ও শোধনদ্বারা এরা তাকে সত্যধারণার উপযোগী করে তোলে। কিন্তু তবু এরা মনোময়-পরিণামেরই অন্তর্গত—যার মধ্যে চিন্ময় সিদ্ধি বা রূপান্তরের সূচনা এখনও দেখা দেয়নি। আত্মসত্তার অন্তর্গূঢ় তত্ত্বভাবের সম্পর্কে চেতনার যে-প্রতিবোধ, তা-ই হল আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ। সে-চেতনা আনে দেহ-প্রাণ-মনের অতীত এক প্রকৃতি-স্থ ও কূটস্থ চিৎসত্ত্বের অবাধিত প্রত্যয় এবং তাকে জেনে অনুভব ক'রে তৎস্বরূপ হবার একটা অন্তঃসমাহিত অভীপ্সা। প্রাণ তখন চায়, আমারই হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট যে বৃহৎ জ্যোতিঃ বিশ্বকে আ-বৃত ক'রে তারও ওপারে অতি-ষ্ঠা হয়ে আছে, তার সামীপ্য সাযুজ্য ও তাদাত্ম্য লাভ করতে। এই অভীপ্সা সন্নিকর্ষ ও তাদাত্ম্যের ফলে সমগ্র আধারের যে-পরিবৃত্তি বা রূপান্তর, উত্তম ব্রহ্মসংস্পর্শ ও ব্রহ্মসাযুজ্যের যে-চেতনা, একটা নবীন সত্তা বা

সম্ভূতির পরিবেষে চিত্তের যে-অভ্যুদয়, আত্মভাব ও আত্মপ্রকৃতির একটা নবীন-ছন্দে তার যে-জাগৃতি—তা-ই হল আধ্যাত্মিকতার যথার্থ রূপ।

বস্তুত পৃথিবীতে চিৎশক্তির সিসৃক্ষা প্রবাহিত হয়েছে পরাবর পরিণামের যুগলধারায়। দুটি ধারা প্রায় একই সময়ে প্রবর্তিত হলেও, অবর ধারাটির দিকেই যেন তার বিশেষ পক্ষপাত এবং ঝোঁক। পরিণামের একটি বহিরঙ্গ ধারা—যার ফলে আমাদের বহিঃপ্রকৃতির অর্থাৎ দেহ ও প্রাণের আশ্রিত মনোময় সত্তার উৎকর্ষ ঘটছে। আবার তার অন্তরালে, সেই মানস-পরিণামকেই অনুকূল নিমিত্ত ক'রে আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে আরেকটা অন্তরঙ্গ পরিণামের ধারা—যা আমাদের গুহাশায়ী পুরুষকে এবং তাঁর অব্যক্ত অধিচেতন চিন্ময় প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে চায়। এই উন্মেষ সুস্পষ্ট হ'ক বা না হ'ক অন্তত তার একটা আয়োজন—এমন-কি একটা সূচনা যে প্রাকৃত আধারে দেখা দিয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও বহু যুগ ধরে মহাপ্রকৃতির বিশেষ ঝোঁক হবে মনোময়-পরিণামের চরম প্রসার উন্নতি ও সূক্ষ্মতা সম্পাদনের দিকে। কেননা, এমনি করেই তার বোধিজ-বুদ্ধি অধিমানস ও অতিমানসের অব্যাহত উন্মীলনের প্রস্তুতি সার্থক হবে, চিৎ-পুরুষের দিব্যসাধন-প্রযোজনার দুশ্চর তপস্যা সিদ্ধ হবে। শুদ্ধ চিন্ময় পরমার্থতত্ত্বের অভিব্যক্তি এবং তার শুদ্ধস্বভাবে আমাদের আত্মবিলোপ ঘটানোই যদি প্রকৃতির লক্ষ্য হত, তাহলে মানস-পরিণামের জন্য তার মাথা-ঘামানোর কোনও প্রয়োজন ছিল না। কেননা প্রকৃতিপরিণামের যে-কোনও পর্বে চিৎসত্তার স্ফুরণ এবং তার মধ্যে আমাদের আত্মনিমজ্জন অসম্ভব-কিছু নয়। সে চরম সিদ্ধির জন্য চাই শুধু হৃদয়ের তীব্রসংবেগ, চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ এবং একাগ্র সঙ্কল্পের তন্ময়তা। ইহবিমুখীনতাই যদি প্রকৃতির চরম লক্ষ্য হত, তাহলেও এই কথাই খাটত। কারণ ইহবিমুখীনতার তীব্রসংবেগও ঠিক এমনি করে যে-কোনও ভূমিতে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে জীবকে অপর-কোনও দিব্যভূমির দিকে উধাও করে দিতে পারে। কিন্তু আধারের সর্বাঙ্গীণ পরিণামসাধন যদি প্রকৃতির নিগূঢ় আকূতি হয়ে থাকে, তাহলেই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ পরিণামের যুগল ধারার একটা তাৎপর্য ও সঙ্গতি আমরা খুঁজে পাই—কেননা এই দ্বিবিধ পরিণাম সম্যক্-রূপান্তরসাধনের পক্ষে অপরিহার্য।

অথচ তার ফলে অধ্যাত্মপ্রগতি দুরূহ এবং মন্থর হয়। প্রথমত, চিদ-ভিব্যক্তিকে প্রতিপর্বে আধারের প্রস্তুতির প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। দ্বিতীয়ত, অভিব্যক্তির উপক্রমে তাকে অপরিণত দেহ-প্রাণ-মনের অবিশুদ্ধ সংস্কার বৃত্তি ও সংবেগের জটিল জালে জড়িয়ে পড়তে হয়। তার দরুন, এইসব অন্ধ-প্রবৃত্তির দাবি মেনে চিৎসত্ত্বকে তাদেরই পোষকতা করতে হয় এবং তাইতে

ব্যামিশ্রভাবের আতঙ্ককর লাঞ্ছনে কলঙ্কিত হয়ে তাকে নেমে যেতে হয় নীচের টানে, তার প্রতি পদক্ষেপে থাকে অধঃপতনের প্রলোভন বা আশঙ্কা—আর-কিছু না হ'ক, পায়ে-পায়ে জড়ানো দুর্মোচন শৃঙ্খলের গুরুভার, নয়তো একটা পিছুটান। কখনও-বা উপরে উঠে আবার তাকে নেমে যেতে হয় অবর-প্রকৃতির কোনও আড়ষ্ট বাধাকে দূর ক'রে ঊর্ধ্বাভিযানকে সহজ করতে। তার সর্বশেষ ব্যাঘাত আসে চিত্তক্ষেত্রের স্বাভাবিক সঙ্কীর্ণ প্রবৃত্তি হতে—কেননা চিত্তের অপরিসর আধারে উন্মিষন্ত চিৎজ্যোতি ও চিৎশক্তি সঙ্কুচিত হয়ে কাজ করে। চিৎসত্ত্বকে বাধ্য হয়ে তখন খণ্ডিতবৃত্তির পঙ্গুতা নিয়ে চলতে হয়। একাগ্রতার ছলে তার মধ্যে অন্যব্যাবৃত্ত একদেশী অভিনিবেশ দেখা দেয় এবং তার ফলে তার স্বাভাবিক অখণ্ডভাবনার প্রত্যাশিত সিদ্ধি চিরায়িত হয়। দেহ-প্রাণ-মনের এই বাধা ও ব্যাঘাত—দেহের গুরুভার অসাড়তা ও দুরাগ্রহ, প্রাণের উত্তাল আবিলতা, মনের মূঢ়তা সংশয় অনিশ্চয়তা অথবা সত্যের প্রতি পরাঙ্মুখীনতা বা তার অন্যথাকার—এদের স্ফীতকায় অত্যাচার কখনও এতই অসহন হয়ে ওঠে যে, উদ্বুদ্ধ চিত্তের অধীর অধ্যাত্মসংবেগ তখন এইসব প্রতিপক্ষ বা যোগবিঘ্নকে নির্মমভাবে নির্জিত করতে চায়। দেহের কর্শন, প্রাণের প্রত্যাখ্যান ও চিত্তের নিরোধ দ্বারা সাধক তখন অন্যনিরপেক্ষ আত্ম-মুক্তির সাধনার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে—মূঢ় অদিব্যপ্রকৃতির সমস্ত সংশ্রব বর্জন করে বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপে চায় চিৎসত্ত্বের আত্যন্তিক প্রলয়। ঊর্ধ্ব-ভূমির একটা প্রলয়ঙ্কর আহ্বান আছে সত্য—যার টানে আধারের চিন্ময়ী বৃত্তি স্বভাবতই আত্মস্বরূপের অনুত্তর ধামের দিকে ছুটে যেতে চায়। কিন্তু শুদ্ধ অধ্যাত্মচেতনার প্রতি অন্নময় ও প্রাণময় প্রকৃতির এই প্রতিকূলতা সে-ঊর্ধ্বসংবেগকে বাধ্য করে তপঃকৃচ্ছ্রতা মায়াবাদ ইহবিমুখীনতা বা জীবনের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা ও নির্বিশেষ শুদ্ধচৈতন্যের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহের আশ্রয় নিতে। মানবাত্মার মধ্যে নির্বিশেষের প্রতি পরমতৃষা স্বরূপপ্রতিষ্ঠারই অনুকূল একটা প্রবৃত্তি এবং মহাপ্রকৃতির আকূতিসিদ্ধির পক্ষে তা অপরি-হার্যও—কেননা এমনিতর একটা রোখ না থাকলে ব্যামিশ্র-প্রকৃতির আকর্ষণ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হয় না। অতএব কৃচ্ছ্রতপা বিবিক্তসেবী বৈরাগী নির্বিশেষবাদের চরমপন্থীরূপে চিদাত্মারই বিজয়কেতন উড়িয়ে দিয়েছে—তার গৈরিকের অগ্নি-নিশান প্রকৃতিপারবশ্যের বিরুদ্ধে অনম্য বিদ্রোহেরই নিদর্শন। রফা করতে সে জানে না, কেননা চিদভিব্যক্তির উগ্রসাধনা রফার ধার ধারে না। তাই অবরপ্রকৃতির পূর্ণ পরাভবদ্বারা চিৎ-শক্তির বিজয়মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত না করে কিছুতেই সে নিরস্ত হবে না। মর্ত্যভূমিতে এ-সাধনা যদি সিদ্ধ না হয়—অন্য-কোথাও হবে। প্রকৃতি যদি উন্মিষন্ত পুরুষের কাছে নতি স্বীকার না করে, তাহলে তার সঙ্গে

অসহযোগ ছাড়া আর-কোনও উপায় নাই।...এমনি করে চিদভিব্যক্তির মধ্যেও কাজ করছে দুটি প্রেরণা : একদিকে অসহযোগদ্বারা হলেও চাই অধ্যাত্ম-চেতনার স্বারাজ্য-প্রতিষ্ঠা, আরেকদিকে চাই প্রকৃতির সর্বাংশে সে-চেতনার অবাধ সংক্রমণ। কিন্তু প্রথমটি সিদ্ধ না হলে দ্বিতীয়টির সাধনা পঙ্গু এবং ব্যাহত হবে। চিন্ময় পুরুষের বিবর্তনের গোড়ার কথাই হল শুদ্ধচৈতন্যের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা। অতএব অধ্যাত্মসাধনের একমাত্র পুরুষার্থ হবে এই চিৎ-প্রতিষ্ঠা এবং ব্রহ্ম আত্মা বা ভগবানের সাযুজ্যসিদ্ধির সংবেগকে চেতনায় দীপ্ত করে তোলা। যতদিন এ-সাধনায় সিদ্ধি না আসবে, ততদিন তার পিছু হটবার উপায় নাই। নিজের সাধ্যমত যে কোনও উপায়ে হ'ক্ স্বধর্মের অনুশীলনদ্বারা এই পুরুষার্থসিদ্ধির প্রযত্নই যে সবাইকে করতে হবে—এ-অনুশাসন অনতিবর্তনীয়।

চিন্ময়-পুরুষের বিবর্তন এপর্যন্ত কতখানি এগিয়ে গেছে আমরা তার বিচার করব দুদিক থেকে। প্রথম দেখব, কোন্ উপায়ে কি ধারা ধরে প্রকৃতির মধ্যে এই বিবর্তনের সাধনা চলছে। তারপর দেখব, মানুষের ব্যষ্টি আধারে তা কতখানি সার্থক হয়েছে।...অন্তরের ফুল ফোটাতে প্রকৃতি মুখ্যত অনুসরণ করে চলেছে চারটি ধারা : ধর্মসাধনা, রহস্যবিদ্যা বা বিভূতিযোগ, অধ্যাত্মবিচার, এবং অধ্যাত্ম অনুভব ও তত্ত্বসাক্ষাৎকার। প্রথম তিনটি সাধনা বহিরঙ্গ, কেবল শেষেরটি বলতে গেলে অধ্যাত্মসিদ্ধির সত্যকার ব্যূহমুখ। সাধনার এই চারটি ধারাই এগিয়ে চলেছে কখনও অল্পাধিক সংযোগ রেখে একজোটে, কখনও ভাগে-ভাগে ছড়িয়ে প'ড়ে, কখনও পরস্পর ঝগড়া ক'রে, কখনও-বা ছাড়া-ছাড়া হয়ে। ধর্মসাধনার আচারে অনুষ্ঠানে ও সংস্কারে রহস্যবিজ্ঞানের ছাপ সুস্পষ্ট। তেমনি অধ্যাত্মবিচার হতে ধর্মসাধনা কখনও খুঁজেছে তার নিজস্ব মত বা বিশ্বাসের প্রামাণ্য, কখনও-বা সাধনার অনুকূলে যুক্তিসিদ্ধ কোনও দর্শন —পূর্বের পন্থাটি সাধারণত প্রতীচ্য, আর পরেরটি প্রাচ্য। কিন্তু অধ্যাত্ম অনুভব ও তত্ত্বসাক্ষাৎকারই হল ধর্মসাধনার চরম সাধ্য এবং সিদ্ধি—উত্তরায়ণের শেষে তার প্রমুক্ত মহাকাশের উত্তুঙ্গতা।...আবার ধর্মসাধনা কখনও একেবারে বাদ দিয়ে, কখনও-বা যথাসম্ভব কেটে-ছেটে চলেছে। কখনও দর্শনের যুক্তিকে সে ঠেলে ফেলেছে বিজাতীয় শুষ্কতর্কের কচকচি বলে, আর সেইসঙ্গে গা এলিয়ে দিয়েছে আচার-নিষ্ঠা, মতুয়ারি ও সাধুচিত ভাবোচ্ছ্বাসের উদ্বেলতায়। আবার কখনও সে চলতে চেয়েছে অধ্যাত্ম অনুভব ও তত্ত্বসাক্ষাৎকারকে বর্জন বা তার প্রয়োজনকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ক'রে।...বিভূতিযোগ কখনও অধ্যাত্মসিদ্ধিকেই তার লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে এবং নানা অলৌকিক অনুভব ও সাধনার ভিত্তিতে গড়তে চেয়েছে একটা মরমীয়া দর্শন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার গুহ্যবিদ্যা ও গুহ্যসাধনা

পর্যবসিত হয়েছে অধ্যাত্মযোগবর্জিত সিদ্ধাই ও ইন্দ্রজালে—এমন-কি নানা পৈশাচিক উৎকটতায়।...অধ্যাত্ম-মনন প্রায়ই ধর্মসাধনাকে তার ভিত্তি বা অনুভবের সাধন করেছে। অনুভব ও তত্ত্বসাক্ষাৎকারকে অবলম্বন ক'রে অথবা তার সোপানরূপে গড়ে উঠেছে তার বিচারশাস্ত্র। কখনও আবার সে চলার পথে বাধা ভেবে ধর্মের ঠেক্‌নাকে ছুঁড়ে ফেলেছে এবং আপন স্বাতন্ত্র্যের দুঃসাহসে এগিয়ে চলেছে—হয় শুধু মানসবিত্তের সঞ্চয়ে খুশী থেকে, নয়তো স্বকীয় সাধনার জোরেই সিদ্ধির পথ আবিষ্কার করবে বলে।...অধ্যাত্মযোগ তিনটি ধারা ধ'রেই অগ্রসর হয়েছে বটে, কিন্তু তিনটিকে সে প্রত্যাখ্যানও করেছে স্ব-তন্ত্র বীর্যের দৃপ্তিতে। বিভূতিবিদ্যা ও সিদ্ধাইকে সমাধির উপসর্গ বা সর্বনাশা প্রলোভনজ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করে সে খুঁজেছে শুধু সত্যের শুদ্ধ-চিন্ময় রূপটি। 'বিচারের মাথায় বজ্রাঘাত' করে কেবল হৃদয়ের আকুলি-বিকুলি দিয়ে, অথবা চিন্ময় ভাবনার রহস্যনিবিড় পথ ধরে সে আপন লক্ষ্যে পেঁাছেছে। কিংবা ধর্মের সমস্ত মতবাদ অর্চনা ও অনুষ্ঠানকে পুতুলখেলার মত ছেলেমানুষি ভেবে দূরে সরিয়ে নিরাভরণ ঋজুতায় নিজেকে নিরাবরণ সত্যের উপাসনায় সঁপে দিয়েছে।...সাধনপদ্ধতির এই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন ছিল, কেননা এমনিতর বিচিত্র পরখের ভিতর দিয়েই পরিণামিনী প্রকৃতির তপস্যা খুঁজে ফিরেছে পরা সংবিৎ ও সম্যক্-জ্ঞানের সত্য এবং অনবচ্ছিন্ন পথ।

সাধনার প্রত্যেকটি ধারাই আমাদের সমগ্র স্বভাবের কোনও-না-কোনও বিশিষ্ট প্রবৃত্তির অনুকূল, অতএব প্রকৃতিপরিণামের অখণ্ড প্রয়োজনসিদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য। আজ মানুষের বাহ্যপ্রকৃতি বিশ্বশক্তির ক্ষুদ্র খর্ব অর্ধপক্ব ক্রীড়নকমাত্র। বহিশ্চর অবিদ্যার আলো-আঁধারিতে মানুষ আজ সত্যের সন্ধানে অন্ধের মত হাতড়ে বেড়াচ্ছে এবং খণ্ডজ্ঞানের টুকিটাকিকে জড়ো করে তার জ্ঞানের ইমারত গড়তে চাইছে। এই দীনতার সঙ্কোচ হতে মুক্ত হয়ে নিজেকে বৃহৎ করবার জন্য চারটি জিনিস তার আবশ্যক।...সবার আগে নিজেকে জানতে হবে এবং নিজের সম্ভাবিত সকল শক্তির উদ্বোধন ও উপযোগ করতে হবে। কিন্তু নিজেকে এবং জগৎকে জানতে গেলেই তাকে আত্মপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির বাইরের পর্দা সরিয়ে নিজেরই মানসপ্রকৃতির গভীরে ডুবতে হবে। তার একমাত্র সাধনা হবে—নিজের গুহাহিত অন্নময় প্রাণময় মনোময় ও চৈত্য সত্তার স্বরূপটিকে চিনে তার বীর্য ও প্রবৃত্তির সকল রহস্য অধিগত করা, এবং বিশ্বের জড়ময় আবরণের অন্তরালে অধিষ্ঠিত রয়েছে যে অতীন্দ্রিয় বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বমনের তত্ত্ব, তাদেরও ধর্ম ও কর্মের খবর নেওয়া। রহস্যবিদ্যা বা বিভূতিযোগকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে এসব সাধনা তার এলাকায় পড়ে।...তারপর, যে-শক্তি বা শক্তিকূট জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করেছে তারও পরিচয় নিতে হবে। বিশ্বের মূলে কোনও বিরাট্-পুরুষ পরমাত্মা বা

বিশ্বস্রষ্টার অধিষ্ঠান থাকলে, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া মানুষের পুরুষার্থ বলে গণ্য হবে। সে-যোগ শুধু ক্ষণেকের হবে না। যার-যার শক্তি ও সংস্কার অনুযায়ী সম্প্রয়োগ বা সাযুজ্যের একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, বিশ্বভাবন পুরুষ কিংবা তাঁর বিভূতিবর্গের সঙ্গে কোনও-না-কোনও উপায়ে যোগযুক্ত থেকে তাঁর বিশ্বচ্ছন্দের অনুবর্তন করা অথবা পরাৎপর পুরুষের লোকোত্তর ছন্দে নিজেকে ঝঙ্কৃত করা—এই হবে মানুষের ব্রত। তার জীবনে ও আচারে ফুটবে তাঁর দিব্যবিধানের আনুগত্য এবং তাঁরই নিরূপিত বা প্রতিবোধিত পুরুষার্থের নিষ্ঠাপূত সাধনা। ইহলোকে কি লোকান্তরে যে পরমা সিদ্ধির দিকে তিনি তার জীবনকে প্রচোদিত করছেন, তার তুঙ্গতম শিখরের দিকে নিজেকে উদ্যত রাখা হবে তার স্বধর্ম। আর বিশ্বের মূলে তেমন-কোনও চিন্ময় সত্তা বা পুরুষের অধিষ্ঠান যদি সে না মানে, তাহলেও সেখানে কি আছে তা জেনে বর্তমানের এই অপূর্ণতা ও অশক্তি হতে নিজেকে সেই বিশ্বমূলের কূলে উত্তীর্ণ করাই হবে তার কর্তব্য। ধর্মসাধনার এ-ই লক্ষ্য : মানুষকে সে চায় পরমদেবতার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে এবং তার ফলে দেহ-প্রাণ-মনের ঊর্ধ্বায়নদ্বারা দিব্যভাবনার বীর্যে তাদের অনুপ্রাণিত করতে।...কিন্তু শুধু অসমীক্ষিত আপ্তবচন বা অতীন্দ্রিয় শ্রুতিবাক্যই ধর্মজ্ঞানের ভিত্তি হলে যথেষ্ট হল না। মানুষের জাগ্রত চিত্তের শাণিত মনন যদি শ্রৌত মতকে স্বীকার করে এবং বস্তুস্বভাব ও বিশ্বের সমীক্ষিত সত্যের সঙ্গে তার সমন্বয় ঘটাতে পারে, তবেই তার সার্থকতা। এইটি দার্শনিক বিচারের কাজ। বলা বাহুল্য, অধ্যাত্মসত্যের গবেষণায় একমাত্র আধ্যাত্মিক দর্শনই বিশেষ উপযোগী—এখন বুদ্ধি কিংবা বোধি যা-ই তার তত্ত্ববিচারের কর্ণধার হ'ক্ না কেন। কিন্তু সমস্ত বিদ্যা ও সাধনার চরম সার্থকতা অপরোক্ষ অনুভবে অর্থাৎ চেতনার অঙ্গীভূত হয়ে নিরূঢ় চিদ্‌বৃত্তিতে তাদের রূপান্তরে। তাই বিভূতিযোগ ধর্মসাধনা ও অধ্যাত্মবিচারের একমাত্র লক্ষ্য হবে অধ্যাত্মচেতনার উন্মীলন, নইলে অধ্যাত্মসাধনার রাজ্যে তারা হবে নিষ্ফলা পাতাবাহারের মেলা। সাধনার ফলে এমন অনুভব জাগ্রত হওয়া চাই—যা অধ্যাত্মচেতনাকে আধারে সুপ্রতিষ্ঠিত উদ্দীপিত সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত করবে, জীবন ও কর্মকে বেঁধে দেবে চিন্ময় সত্যের বৃহৎ সুরে। এই হল অধ্যাত্ম অনুভব ও তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের কাজ।

পরিণামের সমস্ত প্রবৃত্তিই স্বভাবত অতি মন্থর, কেননা পরিণম্যমান প্রত্যেকটি তত্ত্বকে অচিতি ও অবিদ্যার সম্পুট বিদীর্ণ করে মেলতে হয় তার বিভূতির দল। যে-আধারে কোনও তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ, তার মূঢ়তার বদ্ধ-মুষ্টিকে শিথিল ক'রে অচিতির স্বাভাবিক বাধা ও ব্যাঘাতের অবকর্ষকে পরাভূত ক'রে এবং ব্যামিশ্রবৃত্তি অবিদ্যার অন্ধ একগুঁয়ে পিছুটানের সকল বাধা

ঠেলে ফেলে, নিজেকে কুঁড়ি হতে ফুলের শোভায় ফুটিয়ে তোলা কি সহজ সাধনা? পরিণামের প্রথম পর্বে প্রকৃতির মধ্যে তাই দেখা দেয় একটা অস্ফুট প্রেতির আন্দোলন, যাতে সূচিত হয় অতল হতে অন্তর্গূঢ় অবচেতন তত্ত্বের বহিরভিযানের প্রবেগ মাত্র। তারপর শীর্ণ অর্ধস্ফুট ইঙ্গনায় দেখা দেয় ভাবী জাতকের একটা অপরিণত সূচনা—অমার্জিত উপাদানের প্রাথমিক বিন্যাসে সম্ভাবিতের একটা তুচ্ছ কৃশ এবং দুর্লক্ষ্য পরিচয়। তারপরে আসে বহু-বিচিত্র ব্যাকৃতির মেলা—ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা রূপায়ণে। প্রথমত এখানে-সেখানে বিশিষ্ট ধর্মের ক্ষীণবীর্য অথচ লক্ষণীয় প্রকাশ, তারপর তার স্পষ্টতর ব্যাকৃতির ব্যঞ্জনা। অবশেষে ঘটে অভিনবের নিশ্চিত উন্মেষ—চেতনার বিপর্যয়ে তার সম্ভাবিত রূপান্তরের ভূমিকা। কিন্তু এইখানে এসেই পরিণামের তপস্যা ফুরিয়ে যায় না; দিকে-দিকে এখনও পড়ে আছে তার কত কাজ—পূর্ণতার দিকে কী দীর্ঘ মন্থর অভিযানের পালা। যা ফুটল, তাকে যে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে কিংবা অবকর্ষ ও পরাবর্ত হতে আত্মরক্ষা করতে হবে, শুধু তা-ই নয়। অন্তর্গূঢ় সম্ভাবনার সমস্ত দল মেলে তাকে পেতে হবে অখণ্ড আত্মসিদ্ধির পরিপূর্ণ অধিকার, পৌঁছতে হবে তার সূক্ষ্ম-তম তুঙ্গতম বৃহত্তম ঐশ্বর্যের কল্পলোকে—স্বারাজ্যের বিপুল ঔদার্যে সবাইকে তার কুক্ষিগত করতে হবে। সর্বত্র প্রকৃতির এই একই ধারা। এর প্রতি অন্ধ থাকলে প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের নিগূঢ় অভিপ্রায়টি না ধরতে পেরে আমরা শুধু তার গোলকধাঁধায় দিশাহারা হব।

এই ধারাতে মানুষের চিত্তে ও চেতনায় ধর্মবোধেরও উন্মেষ হয়েছে। ধর্ম-বোধ মানবজাতির কি কাজে এসেছে তার ঠিকমত যাচাই হবে না, যদি তার বিবর্তনের প্রয়োজন ও পরিবেশকে আমরা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা না করি। তার প্রথম পর্বে নিশ্চয়ই অগণিত অমার্জিত ও অপরিণত সংস্কারের বাহুল্য ছিল। মানুষের অপরিশুদ্ধ প্রাণ-মনের নানা এলোমেলো বৃত্তির আবদার ও ভুলভ্রান্তির দ্বারা তখন তার প্রগতি পদে-পদে ব্যাহত হয়েছে। ধর্মবুদ্ধির মুখোস প'রে নানা অজ্ঞানাচ্ছন্ন অনিষ্টকর এমন-কি সর্বনাশা বৃত্তিও মানুষকে অনর্থ ও প্রমাদের পথে প্ররোচিত করেছে এবং করছে। সংকীর্ণ চিত্তের দম্ভ আর মতুয়ারি, উদ্ধত অহমিকার অসহিষ্ণু যুযুৎসা, সীমিত সত্যের প্রতি পক্ষ-পাত এবং অভ্যস্ত প্রমাদের প্রতি ততোধিক দুরাগ্রহ, অবরপ্রাণের প্ররোচনায় ফেনিয়ে ওঠা হিংস্র জুলুম ও গোঁড়ামি, আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্ধতায় অত্যাচারী বর্বরের মত সবার 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়া, আপন প্রবৃত্তি ও বাসনার মঞ্জুরি পাবার জন্য মনের সঙ্গে প্রাণের মিথ্যাচার—এইগুলি আধ্যাত্মিকতার সপিণ্ডীকরণ ক'রে ধর্মক্ষেত্রকে দাঁড় করায় কুরুক্ষেত্রে। ধর্মের নামে এমনি করে চলে অজ্ঞা-নতার কত ছদ্মলীলা, স্বচ্ছন্দে প্রশ্রয় পায় প্রমাদ ও অধর্ম্য সৃষ্টির অবাঞ্ছিত

বাহুল্য—এমন-কি দুষ্কৃতি ও ব্যভিচারও পুণ্যের লাঞ্ছনে সম্মানিত হয়।... কিন্তু মানুষের সমস্ত সাধনার ইতিহাসই তো এমনি কলঙ্কবিকৃত। বিকারের নজিরে ধর্মের সত্যতা ও প্রয়োজনকে নাকচ করতে হলে মানুষের আর-সব কর্ম ও সাধনাকেও নাকচ করতে হয়—তার চিন্তা আদর্শবাদ শিল্প বিজ্ঞান কিছুই তো অপবাদের হাত হতে রেহাই পায় না।

ধর্মের বিরুদ্ধে একটা নালিশ এই : ধর্ম সত্যপ্রতিষ্ঠার দাবি করে লোকোত্তর সত্তা অনুভব বা প্রেরণার প্রামাণ্য। উপর হতে বাদশাহী যে-সনদ সে পেয়েছে, তার হুকুমতকে অগ্রাহ্য করবার অধিকার কারও নাই—এই যেন তার ভাব। এমনি করে মানুষের ভাবনা-বেদনা আচার-বিচারের 'পরে সে দখল জমাতে চেয়েছে—যুক্তিতর্কের কোনও অবকাশ না দিয়ে। অবশ্য অনুভবিতার কাছে লোকোত্তর অনুভব ও প্রেরণার একটা অনস্বীকার্য ও নিঃসংশয় প্রামাণ্য থাকতে পারে। তাছাড়া মানুষের মন যেখানে অজ্ঞান দুর্বল ও সংশয়ান্দোলিত, সেখানে আত্মার অন্তর্গূঢ় দীপ্তি ও বীর্যরূপে বিশ্বাসেরও একটা অবিসংবাদিত প্রয়োজন আছে। এইজন্যেই ধর্মের বেলায় অলৌকিক প্রামাণ্যের দাবিকে একেবারে নিরর্থক বলতে পারি না। কিন্তু তাহলেও সে-দাবিতে অনেকখানি বাড়াবাড়ি আর জবরদস্তিও আছে। বিশ্বাসের দীপ না হলে মানুষের চলবে না—সে ছাড়া অজানার পথে তাকে আলো দেখাবে কে? কিন্তু তাবলে বিশ্বাসকে কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়—বিশ্বাস আসবে অন্তরের নির্মুক্ত দৃষ্টি হতে, অধ্যাত্ম অনুভবের অলঙ্ঘ্য দেশনা হতে। অবিচারে একটা-কিছুকে মেনে নেবার প্রণোদনা তবেই দেওয়া চলে, যদি মানুষের অধ্যাত্মসাধনা তাকে ঋত-চিতের সমগ্র ও অখণ্ড দর্শনের দিব্যধামে উত্তীর্ণ করে থাকে। চেতনা মুক্ত হওয়া চাই অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাণ-মনের ব্যামিশ্র সংস্কারের আবিলতা হতে। আমাদের অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্যও তা-ই। কিন্তু এখনও আমরা তার কূলে পৌঁছতে পারিনি। অতএব ধর্মানুশাসনের স্বতঃপ্রামাণ্যের দাবি এখনও অচল। বরং সে-দাবি মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে আচ্ছন্নই করেছে। ধর্মবোধ মানুষকে নিয়ে যাবে দিব্যচেতনার দিকে, সকল সিদ্ধিকে সংহত ক'রে তাকে প্রচোদিত করবে ওই লক্ষ্যের অভিমুখে। প্রত্যেক মানুষকে সে দেবে অধ্যাত্ম-সাধনার একটা বিশিষ্ট সঙ্কেত—প্রত্যেকের অন্তঃপ্রকৃতির স্বধর্ম ও সামর্থ্য অনুযায়ী পরমসত্যের এষণা ও সামীপ্যের একটা বিশিষ্ট সাধনা।

ধর্মৈষণার বেলাতেও যে প্রকৃতিপরিণামের উদার সাবলীলতা বহুবিচিত্র সাধনার নিরঙ্কুশ অবকাশ দিয়েই ধর্মবোধের সত্যকার লক্ষ্যটিকে জিইয়ে রেখেছে, তার সুন্দর পরিচয় আমরা পাই ভারতবর্ষের ধর্মসাধনার ইতিহাসে। এখানে বিচিত্র ধর্মমত আচার ও সাধনা শুধু যে পাশাপাশি ঠাঁই পেয়েছে তা নয়, গলাগলি হয়ে বেড়েও উঠেছে—আপন ভাবনা-বেদনা রুচি ও প্রকৃতি

অনুসারে প্রত্যেক মানুষই তার স্বধর্মকে অনুসরণ করবার স্বচ্ছন্দ অধিকার পেয়েছে। পরিণামের পরখ চলছে যখন, তখন তার মধ্যে এমনতর একটা সাবলীলতা থাকা খুবই সঙ্গত—কেননা ধর্মসাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের দেহ-প্রাণ-মনকে অধ্যাত্মচেতনার আবেশের উপযোগী করে গড়ে তোলা। ধর্ম মানুষকে এমন-একটি ভূমিতে উত্তীর্ণ করবে, যেখানে তার অন্তর্জ্যোতির সম্যক্ স্ফুরণের কোনও বাধা থাকবে না। এইখানে এসে ধর্মকেও শাস্তার আসন থেকে নামতে হবে, বাহ্য আচারের বাধ্যবাধকতার উপর জোর না দিয়ে অন্তরাত্মাকে দিতে হবে তার স্বরূপ ও সত্যকে ফুটিয়ে তোলবার পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। সেইসঙ্গে দেহ-প্রাণ-মনের সত্যকেও যতটা-সম্ভব স্বীকার ক'রে অধ্যাত্মচেতনার দিকে মানুষের সমস্ত প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে—তার জীবনের প্রত্যেকটি স্পন্দে আবিষ্কার করতে হবে একটা চিন্ময় ছন্দ, মাখিয়ে দিতে হবে একটা দিব্যভাবের লাবণ্য, ফুটিয়ে তুলতে হবে একটা চিন্ময় স্বভাবের দ্যোতনা। ধর্মের ক্ষেত্রে প্রমাদ এসে জোটে এইখানেই, কেননা এই রূপান্তরের সাধনায় যে-মালমসলা নিয়ে তার কারবার, দুষ্টির বীজ রয়েছে লিপ্ত তারই মধ্যে। মানুষের দেহ-প্রাণ-মনের আশ্রিত অবরচেতনা আর অধ্যাত্মচেতনার মধ্যে সেতুস্বরূপ যে আচারগত সাধনা, তাকে অবলম্বন করে যত আবর্জনা স্তূপাকার হয়ে ওঠে—যা সে-সাধনার তাৎপর্যকে কলুষ সঙ্কীর্ণতা ও বিকৃতির দ্বারা কলঙ্কিত করে। অথচ পুরুষ আর প্রকৃতির মধ্যে দূতীয়ালিই তো ধর্মের সবচেয়ে বড় কাজ। মানুষের চিত্তবিবর্তনের ঘরে সত্য আর প্রমাদ একই সঙ্গে বাসা বেঁধেছে। কিন্তু প্রমাদের সঙ্গী বলে সত্যকে তো ছেঁটে ফেলা চলে না। অথচ প্রমাদের সংশোধন চাই—যদিও ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। হাতুড়ের মত প্রমাদের 'পরে অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে ধর্মের অঙ্গহানি ঘটাবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। কারণ আমরা যাকে প্রমাদ ভাবি, অনেকক্ষেত্রে তা হয়তো সত্যের প্রতীক বিকৃতি ছদ্মরূপ বা অর্বুদমাত্র। নির্মম হয়ে তাকে উচ্ছেদ করতে গিয়ে আমরা তখন সত্যেরই মরণ-দশা ডেকে আনি। ফসল আর আগাছাকে বেশীদিন একসঙ্গে বাড়তে দেওয়া প্রকৃতির রীত নয়, কেননা আগাছা না নিড়িয়ে ফেললে তার সাকূত-পরিণামের লীলা সার্থক হবে কেমন করে?

মানুষের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনার প্রথম অঙ্কুরণে মহাপ্রকৃতি তার চিত্তে জাগিয়ে তোলে অতীন্দ্রিয় আনন্ত্যের একটা অস্পষ্ট বোধ—যেন একটা-কিছু অজানা রহস্য তার দৈহ্যসত্তাকে ঘিরে আছে। কী যেন প্রচ্ছন্ন আছে বিশ্ব-পটের অন্তরালে—যা তার চাইতে বহুগুণে বৃহৎ, যার কাছে তার চিত্ত আর সংকল্পের বীর্য নিষ্প্রভ ও সঙ্কুচিত। অদৃশ্য এক শক্তিকূটের পরিমণ্ডল তার চারদিকে, যাদের তুষ্টি বা রুষ্টির দ্বারা তার কর্মের ফল নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

এই জড়জগতের পিছনে হয়তো এক অলক্ষ্য শক্তির অধিষ্ঠান রয়েছে—সে-ই তাকে এবং জগৎকে গড়েছে। আবার সে-শক্তিরও পিছনে আছে এক বিরাট শক্তিকূট—যা জগদ্‌ব্যাপী শক্তিস্পন্দের অন্তর্যামী ও শাস্তা। তারও পরে, ওই শক্তিকূটের ওপারে আছে এক অজানার অধিষ্ঠান—অদৃশ্য শক্তিকূটেরও যে নিয়ন্তা। এই শক্তিব্যূহের স্বরূপ জেনে মানুষকে একটা যোগাযোগের সেতু আবিষ্কার করতে হবে—যাতে শক্তিকে প্রসন্ন ক'রে তার অভীষ্ঠসিদ্ধি সহজ হয়। তাছাড়া বহিঃপ্রকৃতির চলনের রহস্য জেনে তারও সূত্রধার হতে হবে তাকে।...এই ছিল আদিমানবের আকূতি। কিন্তু এক্ষেত্রে বুদ্ধি তার বিশেষ কাজে আসেনি। কেননা বুদ্ধির কারবার শুধু জড়তথ্যের সঙ্গে, আর এ হল অলখের রাজ্য—এখানে চাই অতীন্দ্রিয় দর্শন ও বিজ্ঞানের আনুকূল্য। মানুষ তার জন্য বোধি আর সহজাত-বৃত্তিকে তীক্ষ্ণতর করল। এ-বৃত্তি পশুতেও ছিল, কিন্তু মানুষের মধ্যে এসে মনোধর্মের ছোঁয়াচ লেগে তার সামর্থ্য বাড়ল। আদিমানবের বোধিবৃত্তি নিশ্চয় আজকের চাইতে তীক্ষ্ণ ও সজাগ ছিল। কিন্তু সম্ভবত তার প্রয়োগের ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ, কেননা সাধারণত সেই আদিযুগের আবিষ্ক্রিয়ার আবশ্যক সাধনা এর 'পরে নির্ভর করেই তাকে চালাতে হত। তাছাড়া অধিচেতন অনুভব ছিল তার একটা মস্ত সহায়। সে-যুগে মানুষের মধ্যে অধিচেতনা ছিল আরও জাগ্রত, তার বিস্ফোরণ ছিল আরও সহজ, বহিশ্চেতনায় আপন বৃত্তিকে রূপায়িত করবার সামর্থ্য ছিল আরও নিরঙ্কুশ। ক্রমে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের 'পরে নির্ভর করাতে অধিচেতনার স্বাভাবিক স্ফুরণ হতে মানুষকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে স্বভাবত বোধিবৃত্তির যে-উন্মেষ হত, তাকে মনের কাঠামোয় সাজিয়ে মানুষ ধর্মের আদিম রূপ গড়েছে। বোধির এই সজাগ তৎপরতা তার মধ্যে জড়োত্তর শক্তির একটা বোধ ফুটিয়ে তুলল। সেইসঙ্গে সহজাত-বৃত্তির প্রেরণায় অথবা অধিচেতন ও অতিপ্রাকৃত অনুভবের আকস্মিক স্ফুরণে সে নানা অতীন্দ্রিয় সত্ত্বের সন্ধান পেল। কোনরকমে তাদের সঙ্গে যোগ ঘটিয়ে এই নবলব্ধ বিজ্ঞানকে সে ব্যাবহারিক সিদ্ধির একটা সার্থক ও সংহত পন্থার আবিষ্কারে প্রয়োগ করল। এমনি করে গড়ে উঠল প্রাচীন যুগের যাদুবিদ্যা ও বিভূতি-বিজ্ঞানের বিচিত্র নিদর্শন।...মানুষের মধ্যে যে দেহাতীত অজড় অমর একটা আত্মসত্তা আছে—কোনও সময়ে তার চিত্তে এ-জ্ঞানেরও উন্মেষ হয়েছে। অদৃশ্যকে জানবার আকূতিতে অন্তরে যেসব অতি-প্রাকৃত অনুভব কখনও-কখনও স্ফুরিত হয়েছে, তারাই হয়তো তার চেতনায় এই অন্তর্গূঢ় সত্তার একটা অমার্জিত আদিম প্রত্যয় জাগিয়েছে। এর অনেক পরে হয়তো সে বুঝেছে, চোখের সামনে বিশ্বে যে শক্তির লীলা, তার অনুরূপ স্পন্দন তার অন্তরেও আছে। আর তার মধ্যে এমন-কিছু আছে, যা শুভাশুভের

নিমিত্ত হয়ে বিশ্বের অদৃশ্য শক্তির ডাকে সাড়া দেয়। এই বোধ হতেই মানুষে জেগেছে ধর্মবুদ্ধির উপাশ্রিত নীতির চেতনা, দেখা দিয়েছে অধ্যাত্ম অনুভবের সম্ভাবনা। এমনিতর বোধির আদিম সংস্কার, নানা ধরনের গুহ্যাচার, ধর্ম ও সমাজের কাঠামোতে গড়া একটা অস্পষ্ট ঋতবোধ, বিচিত্র পুরাণকাহিনীতে নানা অলৌকিক অনুভবের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এবং দীক্ষা ও সাধনার গুহ্য অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে তাদের জিইয়ে রাখবার প্রয়াস—এই হল মানুষের আদিম ধর্মের রূপ। যেসব উপাদানে এ-ধর্ম গড়ে উঠেছে, গোড়াতে তাদের সহস্র দৈন্য ও ত্রুটি সত্ত্বেও বহুযুগের অনুশীলনে ক্রমেই তারা ব্যাপক ও গভীর হয়েছে—এমন-কি কোনও-কোনও সংস্কৃতিতে তাদের অভূতপূর্ব একটা প্রসার এবং ব্যঞ্জনা দেখা দিয়েছে।

মানুষের মধ্যে প্রাণ ও মনের উৎকর্ষসাধন হল প্রকৃতির প্রথম কাজ—আধারের আর-সব উপাদানের সম্যক পুষ্টি এর পরে হলেও তার চলে। কিন্তু প্রাণ-মনের এই আপ্যায়নের সঙ্গে-সঙ্গেই তার ঝোঁক পড়ে বুদ্ধিকে শাণিত করবার দিকে। তার ফলে বোধি সহজ-সংস্কার ও অধিচেতনার যে আদিম বৃত্তিগুলি এতকাল অপরিহার্য ছিল, তার 'পরে দিনে-দিনে ভার হয়ে চেপে বসে যুক্তি ও মনোময়ী বুদ্ধির কারুকৃতি। জড়প্রকৃতির ক্রিয়া ও রহস্যের আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ বিভূতি-বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যার আবহমান চর্চা হতে সরে যায়। বিশ্বব্যাপারের প্রাকৃত ও যান্ত্রিক ব্যাখ্যা যত বেড়ে চলে, ততই তার চেতনা হতে অদৃশ্যশক্তি ও দেববীর্যের সুস্পষ্ট অনুভব অপসৃত হয়। তবু তার জীবনে আধ্যাত্মিকতার একটা বাস্তব স্পর্শ চাই। সুতরাং কিছুদিন ধরে বিজ্ঞানের প্রাকৃত আর অপ্রাকৃত দুটি ধারাই সে বজায় রাখে। কিন্তু অলৌকিকত্বের যে-সঞ্চয়টুকু এতদিন ধর্মের মধ্যে বিশ্বাসের আকারে কিংবা আচার-অনুষ্ঠান ও পুরাণকথার তলায় বেঁচে ছিল, ক্রমেই তা যুক্তির শাণিত দীপ্তির কাছে অর্থহীন ও নিষ্প্রভ হয়ে আসে। অবশেষে যুক্তি-বাদের নেশা সবাইকে যখন ছাপিয়ে ওঠে, তখন তার তোড়ে সব-কিছু ভেসে গিয়ে ধর্মের মধ্যে অবশিষ্ঠ থাকে শুধু মতুয়ারি, আচার-অনুষ্ঠান, বাহ্যিক সাধনা আর নীতিবাদ। সেই সঙ্গে অধ্যাত্মঅনুভবের ধারাটিও ক্ষীণ হয়ে আসে—কেবল বিশ্বাস ভাবোচ্ছ্বাস ও চারিত্রকেই মানুষ তখন মনে করে ধর্ম-সাধনার সর্বস্ব। আদিযুগে ধর্মবোধ বিভূতিবিদ্যা ও অধ্যাত্মযোগের যে ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছিল, এখন তা বিশ্লিষ্ট হয়ে প্রত্যেকটি ধারা স্বতন্ত্র খাতে বইতে থাকে—আপন খুশিতে, আপন বিবিক্ত লক্ষ্যের দিকে। অবশ্য এ-ঝোঁকটা সবজায়গায় পুরাপুরি ফুটে ওঠে না, কিন্তু তবু তার সুস্পষ্ট লক্ষণকে চিনতে ভুল হয় না। এর চরম পর্বে দেখা দেয় পরিপূর্ণ নাস্তিক্য। ধর্ম মিথ্যা, বিভূতিবিজ্ঞান মিথ্যা—কোথাও কিছু নাই জড়ের বাইরে! বহির্মুখ বুদ্ধির

শুষ্কতর্কের কালাপাহাড়িতে অন্তঃপ্রকৃতির গহনরহস্যের সব আশ্রয় তখন চূর্ণ হয়ে যায়। তাহলেও পরিণামিনী প্রকৃতি তার পরম আকূতিকে দুটি-চারটি সাধকের হৃদয়ে জিইয়ে রাখে এবং মানুষের মনোময়-পরিণামের উৎকর্ষের যোগে তাকে তারও উচ্ছ্রিত ও গভীর করে তোলে। আজকের দিনেও দেখি, জড়বাদ ও বুদ্ধিচর্চার বিজয়-জয়ন্তীর পরেও একই স্বাভাবিক ধারার সুস্পষ্ট পুনরাবৃত্তি : আবার মানুষের মধ্যে ফিরে এসেছে সেই আত্মৈষণার অন্তর্মুখীনতা, তেমনি করে অনির্বাচ্যের সন্ধানে মনের গহনে তলিয়ে যাওয়া, খুঁজে ফেরা অন্তরের সেই কূটস্থ সত্তাকে, নতুন করে মরমী অনুভবকে পাবার জন্যে উতলা হওয়া, চিৎসত্তার সত্য ও বীর্যের দ্যুতিতে আবার যেন চকিত হয়ে ওঠা! মানুষের আত্মৈষণা ও তত্ত্বৈষণার রহস্যভরা আকূতি আবার যেন লুপ্তবীর্যকে ফিরে পেয়ে তার মধ্যে জেগে উঠেছে, অতীতের বিশ্বাস ও সাধনাকে উজ্জীবিত করছে নতুন তেজে, সাম্প্রদায়িকতার নিগড় ভেঙে গড়ে তুলছে স্ব-তন্ত্র উদার নতুন ধর্ম। জড়প্রকৃতির রহস্যভেদের যেটুকু স্বাভাবিক সামর্থ্য বুদ্ধির ছিল, আজ প্রায় তার শেষ সীমায় সে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু সাধ্যের অবধিতে পৌঁছে সে দেখছে, এত করেও জড়প্রকৃতির বাইরের ঢাকনাটা শুধু সে খুলতে পেরেছে কোথাও-কোথাও। তাই আবার সে দ্বিধান্দোলিত চিত্তে শুধু পরখ করবার জন্যই যেন তার সন্ধানী চোখের দৃষ্টিকে পাঠিয়েছে মন ও প্রাণশক্তির পাতালপুরীতে—এতকাল উপেক্ষিত অতীন্দ্রিয়-লোকের রহস্যযবনিকা সরিয়ে দেখতে চাইছে, তার মধ্যে কিসের সত্য লুকিয়ে আছে। এত আঘাতেও ধর্মবোধ যে মরেনি, তার প্রমাণ তার অভিনব রূপান্তরে—যার চরম তাৎপর্য এখনও আমাদের বুদ্ধির অগোচর। মানুষের চিত্তপরিণামের এই নতুন পর্বের মধ্যে অমার্জিত বৃত্তির যত দ্বিধাই থাকুক, তার অন্তরালে আমরা দেখছি বিশিষ্ট একটা বর্তনির অবন্ধ্য সংবেগের আভাস—প্রকৃতিতে চিৎপরিণামের একটা প্রাগ্রসর সূচনা। প্রাচীন যুগের ধর্মবোধে ঐশ্বর্য থাকলেও শাণিত বুদ্ধির অভাবে তার মধ্যে প্রথমত খানিকটা অস্পষ্টতা ছিল। আজ বুদ্ধির অতিরিক্ত ধারে ধর্মের সকল বাহুল্য ছেঁটে মানুষ তাকে একটা ঋজু ও অনাড়ম্বর রূপ দিতে চাইছে। কিন্তু বুদ্ধির এই অন্তরিক্ষলোক হতে মুক্তি পেয়ে অবশেষে একদিন মানবচিত্তের উত্তরায়ণের পথ ধরে তার যাত্রা শুরু হবে এবং তার শীর্ষবিন্দুতে এসে সে পাখা মেলবে অতর্ক্য বিজ্ঞান ও চেতনার দিব্যধামের দিকে—আপন সত্য ও স্বারাজ্যের শাশ্বত মহিমার সন্ধানে।

অতীতের দিকে চেয়ে দেখি, প্রকৃতিপরিণামের এই চলনের চিহ্নই আঁকা তার সরণিতে, যদিও প্রাগৈতিহাসিকের অলিখিত পৃষ্ঠায় তার আদিপর্বের অধিকাংশ ইতিবৃত্ত গোপন রয়েছে। কারও-কারও মতে আদিম ধর্ম

'এনিমিজ্‌ম্‌' 'ফেটিশিজ্‌ম্‌' 'টোটেমিজম্‌' 'টাবু' যাদুবিদ্যা পুরাণের আষাঢ়ে-গল্প এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রতীকোপাসনার একটা জগাখিচুড়ি—আধা-বৈদ্য আধাপুরুত যাদুকর তার পাণ্ডা। তাকে বলতে পারি আদিমানবের অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনের ছত্রাকলীলা—চরম উৎকর্ষের দিনেও যা প্রকৃতিপূজার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। আদিমানবের ধর্মবোধের এ-চেহারা নিছক কল্পনা নাও হতে পারে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, এর বহু সংস্কার ও আচারের পিছনে এমন-একটা অবর-সত্যের জোরালো বনিয়াদ ছিল, যার সঙ্গে সভ্যতার অতি-উৎকর্ষের ফলে আমাদের যোগসূত্র আজ ছিন্ন হয়ে গেছে। আদিমানব সাধারণত বাস করত প্রাণসত্ত্বের সংকীর্ণ অবরভূমিতে। তার অনুরূপ এক অদৃশ্য-প্রকৃতির রাজ্যও অতীন্দ্রিয়-ভূমিতে আছে। আদিমানব হয়তো অজ্ঞাত কোনও বিদ্যার সাধনায় সে-প্রকৃতির অলক্ষ্য বীর্যকে আকর্ষণ করে আনতে পারত—যার রহস্য তার অবরপ্রাণের বোধি ও সহজবৃত্তিরই শুধু জানা ছিল। এর ফলে হয়তো ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মসাধনার একটা প্রাথমিক স্তর গড়ে উঠেছে। স্বভাবতই তার ঝোঁক থাকবে অপুষ্ট ও অমার্জিত রহস্যবিদ্যার দিকে—অধ্যাত্মবিদ্যার দিকে নয়। অতএব তার প্রধান লক্ষ্য হবে ক্ষুদ্র প্রাণ-বিভূতি ও ভূতসূক্ষ্মময় সত্ত্বের আবাহন করে তাদের দিয়ে তুচ্ছ প্রাণবাসনার ও স্থূল প্রাকৃত অভ্যুদয়ের চরিতার্থতা খোঁজা।

ধর্মবোধের এই অনুন্নত অবস্থা যে সভ্যতার কোনও পুরাকল্পে প্রচলিত পরা বিদ্যার পরাবর্তনজনিত অপকর্ষের নিদর্শন নয়, কিংবা কোনও লুপ্ত বা অপ্রচলিত পুরাতন সংস্কৃতির বিকৃত অবশেষ নয়—একথা জোর করে বলা যায় না। কিন্তু একে ধর্মের আদিযুগের ছবি বলে মানলেও ক্ষতি নাই—কেননা পরিণামের ধারা যে এইখানে এসেই থেমে গেছে, তা তো নয়। আমাদের অজানা অনেক পর্ব পার হয়ে ক্রমে দেখা দিয়েছে আরও উন্নতধরনের নানান্‌ ধর্ম—প্রাচীন সভ্য জাতিসমূহের সাহিত্য বা লেখমালার অবিলুপ্ত অংশে যাদের ইতিবৃত্ত আমরা খুঁজে পাই। এই নতুনধরনের ধর্মে আছে বহুদেবতার উপাসনা, সৃষ্টিতত্ত্বের জল্পনা, বিচিত্র পুরাণকাহিনী, নানা আচার অনুষ্ঠান সাধনা ও শীলানুশাসনের জটিল সমাহার—যারা অনেকসময় সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। অধিকাংশক্ষেত্রে এসব ধর্ম কোনও জাতি বা উপজাতির ধর্ম এবং বিশেষ করে তাদের জীবন ও চিন্তার উৎকর্ষের একটা মাপকাঠি। বাইরের থেকে দেখতে গেলে কোনও গভীর আধ্যাত্মিকতার সুস্পষ্ট প্রভাব তাদের মধ্যে খুঁজে পাই না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উন্নততর সংস্কৃতির বেলায় রহস্যবিদ্যা ও গুহ্যসাধনার একটা পাকাপোক্ত ভিত্তির 'পরে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, কিংবা অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মভাবনার আভাসযুক্ত নানা সযত্নগোপিত গুরুমুখী রহস্যের উপদেশ দ্বারা এ-ন্যূনতার

পূরণ হয়েছে। তবু এসব ধর্মে রহস্যবিদ্যা কি বিভূতিযোগ অনেকক্ষেত্রেই অবান্তর একটা প্রক্ষেপ অথবা পরিশেষমাত্র এবং সবসময়ে ধর্মের সাধনায় তার সন্ধানও মেলে না। দেবশক্তির উপাসনা, যাগযজ্ঞ, সদাচার এবং সমাজধর্মের গতানুগতিক অনুবর্তন—এই হল এক্ষেত্রে ধর্মের সাধারণ রূপরেখা। তার মধ্যে অধ্যাত্মবিচার বা জীবনদর্শন সম্পর্কে গোড়াতে কোনও সুস্পষ্ট বিবৃতি না থাকলেও, অনেকসময় নানা তন্ত্রে ও পুরাণকথায় তার আভাস সূচিত হয়েছে এবং দু-এক জায়গায় অবান্তর অনুশাসনের জঞ্জাল ঠেলে তা বিবিক্ত আত্মসত্তা নিয়ে মূর্ত হয়েও উঠেছে।

সর্বত্র সিদ্ধ ভাবক বা বিভূতিযোগের প্রবর্ত-সাধকেরাই সম্ভবত ধর্মের স্রষ্টা। নিজের রহস্যানুভবকে নানা বিশ্বাস কল্পকাহিনী ও অনুষ্ঠানের আকারে তাঁরাই সর্বসাধারণের চিত্তে সংক্রামিত করেছেন। প্রকৃতির রহস্য সর্বপ্রথম ধরা পড়ে ব্যক্তির হৃদয়ে এবং ব্যক্তিই তখন গণচিত্তকে অভিনবের পথে টেনে বা হিঁচড়ে নিয়ে চলে। হয়তো অবচেতন গণচিত্তে প্রথম দেখা দেয় নব-সৃষ্টির অরুণলেখা। তবু সে-চিত্তের রহস্যানুভূতি ও ভাবক-বৃত্তিকে আশ্রয় করেই তার অভিব্যক্তি ঘটে এবং ব্যক্তিবিশেষকে যোগ্য আধার-রূপে পেলে তবে তার আকূতি চরিতার্থ হয়। অভিনবের আলোকচ্ছটায় গণচেতনাকে সহসা দীপ্ত করে তোলা প্রকৃতিপরিণামের আদিচ্ছন্দ নয়। এখানে-সেখানে আধার বেছে প্রথম একটি-একটি করে দীপের শিখা জ্বলে—তারপর শুরু হয় গণদেবতার বিপুল জ্যোতিরুৎসব। ভাবকের চিন্ময় অভীপ্সা ও অনুভব সাধারণত গাঁথা হয় 'উপনিষৎ' বা রহস্যশাস্ত্রের মন্ত্রমালায় এবং দু-চারটি দীক্ষিত ছাড়া অপরের তাতে অধিকার থাকে না। ক্রমে ধর্মসাধনার পরম্পরাগত প্রতীকের ভিতর দিয়ে সর্বসাধারণের হিতার্থে তার বিতরণ বা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হয়। আদিমানবের চিত্তে এই প্রতীকরাশিই ছিল ধর্মের মর্মরহস্যের বাহন।

ধর্মসাধনার এই দ্বিতীয় স্তরের পরে দেখা দিল তৃতীয় একটা স্তর। তার লক্ষ্য হল অধ্যাত্ম যোগবিদ্যার রহস্যের ঢাকা খুলে তার সত্যকে সবার মধ্যে পরিবেশন করা—যা-কিছু তার সর্বসাধারণের রুচিকর, তাকে সর্বজনলভ্য করে তোলা। এখনথেকে আধ্যাত্মিকতাই হল ধর্মসাধনার মর্মকথা। শুধু তা-ই নয়, তাকে সাধক-সাধারণের অধিগম্য করবার জন্য প্রকাশ্য অনুশাসনের ব্যবস্থা হল। পূর্বে যেমন রহস্যতন্ত্রের মধ্যে বিদ্যা ও সাধনার বিশেষ-বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, এবার তেমনি প্রত্যেক ধর্মে তার নিজস্ব মতবাদের অনুকূল দর্শন ও সাধনার বিশিষ্ট ধারা দেখা দিল।...চিন্ময়-পরিণামের এমনিতর অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ দুটি তন্ত্রের মধ্যে মরমী সাধক বেছে নিয়েছেন আগেরটি, আর ধার্মিক নিয়েছেন পরেরটি। বস্তুত দুটি পদ্ধতিতে দেখা

দিয়েছে প্রকৃতিপরিণামের একটা যুগ্মবিভাব : একটিতে পরিণামশক্তি সীমিত পরিসরের মধ্যে সংহৃত হবার ফলে তীক্ষ্ণবীর্য হয়ে উঠেছে, আরেকটিতে সেই বীর্যেরই নতুন সৃষ্টি ব্যাপক পরিসরের কূলে-কূলে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রথমটির লক্ষ্য একাগ্রতাসিদ্ধির দ্বারা শক্তিকে ফলোন্মুখ করা, আর দ্বিতীয়টির দ্বারা সাধিত হচ্ছে তার ব্যাপ্তি এবং প্রতিষ্ঠা। শক্তি-পরিণামের বহিরঙ্গ প্রবৃত্তির দরুন মরমীদের অভীপ্সালব্ধ গোপন সম্পদ সবার ভোগে এল বটে, কিন্তু তার মাহাত্ম্য শুচিতা ও তীব্রসংবেগ কুণ্ঠিত হল। মরমীদের সাধনার মূলে ছিল অতর্ক্য বোধিজাত দিব্যভাবাবেশে উৎসারিত বিজ্ঞানের বীর্য। চিৎ-শক্তির নিগূঢ় সংবেগেই তাঁদের অতীন্দ্রিয় সত্যের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার ঘটত। কিন্তু গণচিত্তের তো সে-বীর্য নাই—থাকলেও আছে অপূর্ণ অমার্জিত অপরিপুষ্ট ভ্রূণের আকারে। তাকে ভিত্তি করে একটা-কিছু গড়ে তোলা কখনও নিরাপদ নয়। তাই জনসাধারণের বহিরঙ্গ-সাধনার জন্য সত্যকে সাজাতে হল বুদ্ধিকল্পিত মতবাদের সজ্জায়—তাদের উপাসনা-পদ্ধতিতে রইল শুধু ভাবের আবেগ এবং অনাড়ম্বর অথচ অর্থপূর্ণ আচারের অনুষ্ঠান মাত্র। সেইসঙ্গে গণচিত্তে চিদ্‌বীর্যের বৈন্দব-সত্তা হল ব্যামিশ্র এবং তরলিত—তাকে হাতের মুঠায় পেয়ে দেহ-প্রাণ-মনের অবরবৃত্তি তার নকল করতে শুরু করল। এমনি করে বিজাতীয় বৃত্তির ছোঁয়াচে আসলের সঙ্গে নকলের খাদ মিশলে যেমন রহস্যবিদ্যার বীর্যহানি ও অপভ্রংশের সম্ভাবনা আছে, তেমনি অদৃশ্যশক্তির সাধনায় অর্জিত বিভূতির অপব্যবহরেরও আশঙ্কা আছে। এই ভয়েই প্রাচীনকালের মরমী সাধকেরা বিদ্যাগুপ্তি, অধিকারিভেদ ও কঠিন বিধি-নিষেধের দ্বারা সাধনরহস্যকে এত করে আগলে রাখতে চাইতেন। বিদ্যার অতিপ্রচার এবং তজ্জনিত ব্যভিচারের আরেকটা অবাঞ্ছিত আতঙ্ককর পরিণাম হল অধ্যাত্মতত্ত্বকে বুদ্ধির খোপে পুরে আড়ষ্ট মতবাদে পর্যবসিত করা এবং জীবন্ত সাধনার প্রাণশক্তিকে অন্ধ আচার-অনুষ্ঠান ও ব্রত-নিয়মের স্তূপীকৃত জঞ্জালের তলায় চাপা দেওয়া। তার ফলে দিনে-দিনে ধর্মের বিগ্রহ অসাড় এবং প্রাণহীন হয়ে ওঠে। তবু এ-দুর্গতির দায় প্রকৃতিকে বহন করতেই হয়; কেননা শুধু শক্তির সংহরণ নয়—তার পরিব্যাপ্তিও যে পরি-ণামিনী প্রকৃতির চিন্ময় প্রবেগের একটা স্বারসিক সাধন।

অধ্যাত্মসিদ্ধির জন্য আপ্ত-প্রামাণ্য ও আচার-অনুষ্ঠানের 'পরেই প্রধানত যাদের নির্ভর, এমনি করে সেইসব ধর্মের উৎপত্তি হল। অনুভূতির কিছু-না-কিছু সত্য তাদের মধ্যে আছে বলে সমাজে তারা টিকেও থাকে। জনসাধারণের বুদ্ধিমান্দ্য কেবল আচারের দিকটাকে বড় করলেও, দু-চারজন সাধকও যতদিন এসব ধর্মের অন্তর্নিহিত সনাতন সত্যটিকে সম্প্রদায়ের পরম্পরায় জিইয়ে রাখেন অথবা যুগে-যুগে প্রাণের স্পর্শে নতুন করে তাকে

রাঙিয়ে তোলেন,—ততদিন তীব্রসংবেগী অধ্যাত্মপিপাসুর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মমুমুক্ষাকে তৃপ্ত করবার সামর্থ্যও এদের থাকে। তার ফলে এসব ধর্মে কালক্রমে দেখা দেয় উদারপন্থী আর নববিধানী এই দু'ধরনের সাধনার ধারা। প্রথমটির ঝোঁক ধর্মের সাবলীল আদিম রূপটি বজায় রাখবার দিকে। তার মতে ধর্ম বহুভঙ্গিম—মনুষ্যপ্রকৃতির সর্বত্র তার প্রভাব ছড়িয়ে আছে। কিন্তু নববিধানী সাধক এই লোকরঞ্জনাকে মোটেই আমল দিতে চান না। তাঁর মতে ধর্ম হবে অনাড়ম্বর। বিশ্বাস আচার ও উপাসনার এমন-একটি সহজ ও সংস্কৃত রূপকে তিনি দাঁড় করাতে চান, যা সাধারণ মানুষেরও বুদ্ধি হৃদয় ও শীলসাধনার প্রবৃত্তিকে অনায়াসে পরিতৃপ্ত করতে পারে। তার দরুন ধর্মের রাজ্যে দেখা দিয়েছে যুক্তিবাদের আতিশয্য। অতীন্দ্রিয় অনুভবের যে সাধনা অলখের সঙ্গে চিত্তকে যোগযুক্ত করবে, তার প্রতি নব্য নৈষ্ঠিকের বিশেষ-কোনও প্রীতি কি আস্থা নাই। অধ্যাত্মসাধনার জন্য বহিশ্চর মনের বৃত্তিসমূহের অনুশীলনই যথেষ্ট—এই তাঁর মত। এইজন্যেই নববিধানী সম্প্রদায়ে প্রায়ই দেখি, মানুষের ধর্মজীবন রসহীন অনুদার ও কার্পণ্যোপহত। তাছাড়া বুদ্ধির নেতিবাদ সেখানে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় পেয়ে, আধ্যাত্মিকতার সব বিভূতি ছাঁটতে-ছাঁটতে অবশেষে কিছুকেই আর মানতে চায় না। তার মতে তখন ধর্ম মিথ্যা, অধ্যাত্ম অনুভব মিথ্যা—সত্য শুধু বুদ্ধির এষণালব্ধ বিত্তটুকু। কিন্তু চিৎসত্তার ছোঁয়াচ না পেলে বুদ্ধি কেবল জড়ো করবে অর্থকরী অপরা বিদ্যা ও কল-কারখানার উপকরণ, প্রাণগঙ্গার গোমুখীকে শুকিয়ে ফেলে অভিশপ্ত জীবনে আনবে মৃত্যু ও বিস্রস্তির মার এবং এমনি করে আবার সে চক্রাবৃত্ত অবিদ্যাশক্তির কবলে ফিরে যাবে। এছাড়া তার দেউলিয়া শক্তির ভান্ডারে প্রাণকে বাঁচাবার বা তাকে নতুন করে সৃষ্টি করবার আর-কোনও উপায় অবশিষ্ট থাকবে না।

প্রাচীনকালের অধ্যাত্মসাধনায় যে অখন্ড সৌষম্যের বোধ ছিল, তাকে বিপর্যস্ত না করে প্রসারিত করতে পারলেই অধ্যাত্মপরিণামের প্রগতি নিরঙ্কুশ হত, অথচ তাতে থাকত আদিম অখন্ডভাবনার অটুট ছন্দ। অর্থাৎ সংহৃতির সঙ্গে বিচ্ছুরণের জুড়ি মিলিয়ে একটা উদারতর সামঞ্জস্যের সূত্র আবিষ্কার করা তখন কিছুই কঠিন হত না। এদেশে দেখেছি ধর্মসাধনার বেলায় বোধির আদিম প্রেতিকে কখনও কেউ খর্ব করেনি, কিংবা প্রকৃতিপরিণামের সমগ্র ছন্দে যতিভঙ্গ ঘটায়নি। কারণ ভারতবর্ষে ধর্ম কখনও একচ্ছত্র মতবাদের গোঁড়ামিতে বাঁধা পড়েনি। ধর্মের বিচিত্র রূপায়ণের বিপুল সমারোহকে এদেশ যে স্বীকারই করেছে শুধু তা নয়, ধর্মবোধের ক্রমিক বিকাশে যা-কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে, অপক্ষপাতে তাকেই সে জীর্ণ করবার চেষ্টা করেছে—কাউকে ঠেকিয়ে রাখতে বা ছেঁটে ফেলতে চায়নি। তাই দেখি রহস্যবিদ্যার

সাধনাকে ভারতবর্ষ চরমে তুলেছে যেমন—তেমনি সবধরনের অধ্যাত্মবিচারকে আপন কোলে স্থান দিয়েছে, অধ্যাত্ম অনুভব সিদ্ধি ও সাধনার প্রত্যেকটি ধারাকে অনুসরণ করেছে তার তুঙ্গশিখর হতে সাগরগহন পর্যন্ত—বিচরণ করেছে তার অমিত প্রসারের কূলে-কূলে। প্রকৃতিপরিণামের স্বাভাবিক রীতিতে যে-বদান্যতা আছে, তার অনুবর্তনে এদেশ ঘটে-ঘটে চিন্ময় আবেশ ও অভ্যুদয়ের সকল ধারাকে সহজেই স্বীকার করেছে, ব্রহ্মসাযুজ্যের কোনও সাধনাকে প্রত্যাখ্যান করেনি, অধ্যাত্মপ্রগতির প্রত্যেকটি পথ ধরে চলেছে চরম লক্ষ্যের দিকে—এমন-কি তার উৎকটতম আতিশয্যকেও বাজিয়ে নিতে সে ভয় পায়নি। অধ্যাত্মপরিণামের বিভিন্ন ভূমিতে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেককে তার অধিকার অনুযায়ী স্বধর্মানুকূল সাধনার পথ দেখিয়ে দিতে হবে—এই হল এদেশের ধর্মনীতি। তাই অধ্যাত্মবোধের তুঙ্গতম শিখরে চিদাকাশের অনুত্তর মহিমায় অবগাহন করবার আকূতি নিয়েও আদিমানবের লুপ্তাবশেষ ধর্মসাধনাকে সে উপেক্ষা করেনি, বরং একটা গভীরতম অনুভবের ব্যঞ্জনা দিয়ে তাকে মহীয়ান করতেই চেয়েছে। এমন-কি সাম্প্রদায়িক ধর্মের একান্ত কুনোমিকেও সে কোনঠাসা করে রাখেনি। আধ্যাত্মিকতার সাধারণ লক্ষ্য ও সাধনার সঙ্গে একটা গোত্রসম্পর্ক থাকলেই তাকে সে স্থান দিয়েছে গণসভার অগণিত বৈচিত্র্যের মেলায়। কিন্তু ধর্মসম্পর্কে এই উদার সাবলীলতাকে সে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে ধর্মশাসিত সমাজব্যবস্থার 'পরে। সে-ব্যবস্থার মূলসূত্র হল পর্বে-পর্বে মানুষের প্রকৃতিকে এমন করে ফুটিয়ে তোলা, যাতে শেষ পর্বে এসে সে চরম অধ্যাত্মসাধনার একটা অবাধ অবকাশ পায়। সামাজিক কাঠামোর এই অপরিবর্তনীয়তা একসময়ে হয়তো জীবনকে আচারে যেমন সংহত করেছে, তেমনি বিচারে মুক্তিসাধনার ভিত্তিকেও করেছে দৃঢ়মূল। তার দরুন একদিকে নিষ্ঠার বীর্য যদিও সমাজকে আত্মরক্ষার শক্তি দিয়েছে, তবুও আরেকদিকে অখণ্ড-ঔদার্যের স্বভাবছন্দকে বিকৃত করে তার মধ্যে এনেছে আত্মসংকোচ ও দানা-বাঁধবার প্রবৃত্তির অনিষ্টকর অতিশয্য। সমাজের একটা দৃঢ়ভিত্তি অবশ্যই চাই। কিন্তু পরিণামের লীলায়নে লীলায়িত হবার সামর্থ্যও তার থাকা উচিত। সমাজে ক্রম থাকবে, কিন্তু সে-ক্রমের স্বভাব হবে উপচয়—আড়ষ্টতা নয়।

তবু বলব, ভারতবর্ষে ধর্ম ও অধ্যাত্মপরিণামের এই বহুভঙ্গিম প্রকাশ একটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এদেশ ধর্মসাধনায় মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সব-খানিকে ঠাঁই দিয়েছে, তার আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাকে কোনদিকেই খর্ব করতে চায়নি। অথচ বুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যকে কুণ্ঠিত না করে কিংবা বুদ্ধির পরিপন্থী না হয়ে তার স্বাভাবিক স্ফূর্তিকে সে অধ্যাত্ম এষণার অনুকূলে নিয়োজিত করেছে। তার ফলে পাশ্চাত্যদেশের মত বুদ্ধির দ্বন্দ্ব ও অতিপ্রাধান্যের নীচে

চাপা পড়ে মানুষের স্বাভাবিক ধর্মবোধ এদেশে শুকিয়ে ওঠেনি, কিংবা ইহসর্বস্ব জড়বাদের কুটিল আবর্তে তলিয়ে যায়নি। ধর্মের সমস্ত খুঁটি-নাটিকেই মেনে নেওয়া, কোনও মত কি পথকে প্রত্যাখ্যান না করে সবার ঊর্ধ্বে থাকা—ধর্মসম্পর্কে এমনতর বিশ্বজনীন সাবলীলতাকে নানা অবাঞ্ছিত বিকৃতির প্রসূতি বলে শুদ্ধিবাদী নৈষ্ঠিক হয়তো হাঁকিয়ে দিতেই চাইবেন। কিন্তু এর একটা প্রত্যক্ষ শুভফল দেখছি আধ্যাত্মিক এষণা সাধনা ও সিদ্ধির অতিবিচিত্র ও অনুপম ঐশ্বর্যে, তার বহুযুগব্যাপী আয়ুষ্য এবং অধৃষ্য প্রতিষ্ঠায়, তার লোকাতত সর্বজনীনতায় এবং তার তুঙ্গতা সূক্ষ্মতা ও বিশ্বতোমুখ বৈপুল্যে। এমন ঔদার্য ও সাবলীলতা ছাড়া প্রকৃতিপরিণামের বিরাট আকূতি পরিপূর্ণ সিদ্ধির কূলে কোনমতেই পৌঁছতে পারে না। ব্যক্তির আকূতি ধর্মের কাছে চায় অধ্যাত্ম অনুভবের একটা প্রবেশিকা কিংবা তারই অনুকূল কোনও সাধন—চায় দিশারী আলোর অচপল দীপ্তি, অনাগত সুখাবতীর পথনির্দেশ, ইহোত্তর সিদ্ধির আশ্বাস কিংবা ঈশ্বরের সাযুজ্য। সাম্প্রদায়িক ধর্ম তার সংকীর্ণ মত ও পথের অনুশীলন দ্বারা ব্যক্তিমনের এ-দাবি সহজেই মেটাতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির গভীরতর আকূতি হল মানুষের মধ্যে চিন্ময় স্বভাবকে ফুটিয়ে তোলবার আয়োজন করা—এই মর্ত্যের মানুষকেই দিব্য মানুষে রূপান্তরিত করা। এই লক্ষ্যের দিকে মানুষের আদর্শবোধ ও সাধনশক্তিকে প্রচোদিত করবার জন্য প্রকৃতির হাতে একমাত্র উপায় আছে ধর্ম। তাই তৈরী আধার পেলে ধর্মবোধকে উদ্দীপ্ত করেই প্রকৃতি মানুষকে উত্তরায়ণের পথে এগিয়ে যাবার সংকেত দেয়। তার জন্যই সাধনপদ্ধতির এত অগুনতি বৈচিত্র্য সে সৃষ্টি করেছে। তারা কেউ স্থাণু, অপরিবর্তসহ, ইতোনাস্তি-বাদী—কেউবা সাবলীল, বহুভঙ্গিম, স্বচ্ছন্দ-পরিণামী। যে উদার ধর্মে বহু ধর্মের সংকলন ও সমন্বয় আছে, প্রত্যেকের অন্তরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সাধনার নির্দেশ দিতে পারে যে-ধর্ম, তাকেই বলতে পারি মহাপ্রকৃতির আকূতির সর্বাপেক্ষা অনুগত সনাতন মানবধর্ম। এই ধর্মই হবে মানুষের বহুধাপুষ্ট ও পুষ্পিত চিন্ময়ী এষণার জন্মভূ, জীবের তপস্যা সাধনা ও সিদ্ধির বিশাল গুরুকুল। অতীতে ধর্মের সাধনায় যত প্রমাদ ঘটে থাকুক, তার একমাত্র সাধ্য ও অনতিবর্তনীয় সার্থকতা এই যে, মনের অবিদ্যাগহন পথে আজও সে আমাদের দীপঙ্কর—উপচীয়মান আলোর ইশারায় সে-ই আমাদের নিয়ে চলেছে চিৎপুরুষের আত্মবিদ্যা ও পূর্ণসংবিতের জ্যোতির্লোকের দিকে।

রহস্যবিদ্যা বা অতীন্দ্রিয়বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল প্রকৃতির নিগূঢ় সত্য ও শক্তির আবিষ্কার দ্বারা সংকীর্ণ জড়ত্বের দাসত্ব হতে মানুষকে মুক্ত করা। প্রাণের 'পরে মনের এবং রড়ের 'পরে প্রাণ-মনের যে

অব্যক্ত রহস্যময় প্রভাব বাইরে অস্ফুট থেকেও ভিতরে-ভিতরে অপরোক্ষভাবে কাজ করে চলেছে, তাকে হাতের মুঠায় এনে ইষ্টসিদ্ধির অনুকূলে রূপায়িত করাই রহস্যবিদ্যার বিশেষ লক্ষ্য। সেইসঙ্গে সে চায়, বিরাট্-পুরুষের জড়োত্তর স্থিতির তুঙ্গতায় গভীরে কি অন্তরিক্ষে যেসব লোক ও সত্ত্বের সংস্থান আছে, তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই যোগসিদ্ধির দ্বারা উত্তরজ্যোতির সত্যকে আয়ত্ত করতে এবং মানুষের প্রকৃতিজয়ের সংকল্পকে সফল করতে। এমনতর একটা অভীপ্সা চিরকাল মানুষের মধ্যে আছে। কেননা বোধির ইশারা কি ওপারের আদেশ এই বিশ্বাসই তার চিত্তে জাগায় যে, সে একটা মৃৎপিণ্ড নয় শুধু—সে আত্মস্বরূপ, মনোময় ও ক্রতুময়। শুধু ইহলোকের কেন, লোক-লোকান্তরের সকল রহস্যই তার হাতের মুঠায় আসবে, কেননা প্রকৃতির শিক্ষানবিশি না করে তার 'পরে ওস্তাদি করবারও সামর্থ্য তার আছে। রহস্য-বিজ্ঞানীরা জড়জগতের রহস্যও জানতে চেয়েছিলেন। তাঁদেরই সাধনার ফলে জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি ও রসায়নের সৃষ্টি হয়েছে, জ্যামিতি ও সংখ্যাগণিতের চর্চা অন্যান্য বিজ্ঞানকেও প্রগতির পথে এগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাঁদের মুখ্য কারবার ছিল অতিপ্রাকৃত রহস্যকে নিয়ে। এই অর্থে রহস্যবিদ্যাকে বলতে পারি অতিপ্রাকৃতের বিজ্ঞান। কিন্তু বস্তুত তার সকল প্রয়াস পর্যবসিত হয়েছে জড়ের গণ্ডি ছাপিয়ে জড়োত্তরের ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়াতে। সত্য বলতে রহস্যবিদ্যা কিন্তু অসম্ভবের আলেয়ার পিছনে ছোটে না। বিশ্বপ্রকৃতির এলাকা ছাড়িয়ে এমন-কোথাও সে যেতে চায় না, যেখানে অলীক কল্পনা বা অলৌকিকের খেয়ালকে ইচ্ছা করলেই সিদ্ধরূপ দেওয়া চলে। আমরা যাকে অতিপ্রাকৃত বলি, বস্তুত তা প্রকৃতির অভ্যন্তরের ক্রিয়া—কোনও নিগূঢ় কারণে জড়ের স্তরে ব্যক্ত হয়েছে। অথবা তার মূলে রয়েছে রহস্য-বিজ্ঞানীরই কোনও সাধনবীর্য। তিনি চান, সশক্তি বিরাট্-পুরুষের ঊর্ধ্ব-বিভূতিতে প্রজ্ঞা ও বীর্যের যে-ভাণ্ডার সঞ্চিত আছে, তাকে অধিগত ক'রে এই মর্ত্যভূমিতে তার শক্তি ও ক্রিয়াকে মূর্ত করতে। লোক-লোকান্তরের মধ্যে একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক থাকলে এ-কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। আজপর্যন্ত প্রাণ-মনের সকল শক্তিই বর্তমান ভৌম-কল্পে স্ফুরিত হয়নি। সুতরাং তাদের স্ফুরণোন্মুখ সামর্থ্যকে জড়বস্তুতে কি জড়ের ব্যাপারে সংক্রামিত করা—এমন-কি ঊর্ধ্বলোক হতে তাদের নামিয়ে এনে বিশ্বের সাম্প্রতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা বিভূতিযোগীর অসাধ্য নয়। তার ফলে যোগীর শুধু নিজের নয়, অপরেরও দেহ-প্রাণ-মনের 'পরে লোকোত্তর মনঃশক্তির অধিকার সম্প্রসারিত হবে—এমন-কি বিশ্বের শক্তিস্পন্দকেও তাঁর নিয়ন্ত্রিত করবার সামর্থ্য জন্মাবে। সম্মোহনশক্তির কথা এযুগে সবাই জানে। অতিপ্রাকৃত শক্তির আবিষ্কার ও তন্ত্রসম্মত প্রয়োগের এও একটা নিদর্শন, যদিও বিজ্ঞান

ও প্রক্রিয়ার ত্রুটিতে এ-বিদ্যার অধিকার এখনও আমাদের কাছে সঙ্কুচিত। অতীন্দ্রিয়-শক্তির অতর্কিত বা নিগূঢ় ক্রিয়া কতবার মানুষকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়, কিন্তু মানুষ তার ধরন জানে না—হয়তো-বা দু'চারজন তার একটুখানি হদিস পায়। প্রতিমুহূর্তেই অপরের আধার হতে কিংবা বিশ্বশক্তির বিপুল ভাণ্ডার হতে আমাদের মধ্যে ঝরে পড়ছে বা আবিষ্ট হচ্ছে সংজ্ঞা ভাবনা বেদনা সংবেগ ও সংকল্পের কত ইঙ্গনা, প্রাণ ও মনঃশক্তির কত আপ্লাবন। আধারকে আলোড়িত করে তারা আমাদের 'পরে ছাপ রেখে যাচ্ছে—কিন্তু অমরা কি তার সন্ধান রাখি? এই আন্দোলনের ধরন বুঝতে পারা, তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি-শক্তিকে আয়ত্ত করে কাজে লাগানো বা তার রিষ্টি হতে আত্মরক্ষা করা রহস্যবিদ্যার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু ওতেই তার অনুশীলনের প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে যায় না। কেননা এই স্বল্পাধীত বিদ্যার বিশাল পরিধিতে বহু-বিচিত্র প্রয়োগবিজ্ঞানের যে বিপুল রহস্য নিহিত আছে, তার কতটুকু পরিচয়ই-বা আমরা পেয়েছি?

আধুনিক যুগে জড়বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়ার পরিসর বেড়ে যাওয়াতে জড়প্রকৃতির অনেক নিগূঢ় শক্তিই মানুষের আয়ত্তে এসেছে এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি মত তাদের সে কাজেও লাগিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে রহস্যবিজ্ঞানেরও পসার কমেছে। অবশেষে তাকে বাতিল করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, জড়ই বিশ্বের একমাত্র তত্ত্ব—প্রাণ ও মন তার একদেশী পরিণাম মাত্র। বিশ্বের সকল রহস্যের চাবি জড়শক্তির হাতে, এই বিশ্বাসের বশে প্রাণ ও মনের বৃত্তিকে বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছে—তাদের প্রাকৃত বা বৈকৃত ব্যাপ্রিয়া ও প্রবৃত্তির মূলে জড়শক্তির যে-ক্রিয়া আছে তার সূত্র ধরে। অধ্যাত্মবিজ্ঞান তার দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞানেরই একটা শাখা মাত্র। বিজ্ঞানের এ-প্রচেষ্টা সার্থক হলে মানবজাতির অস্তিত্বসম্পর্কেই শঙ্কিত হবার কারণ ঘটতে পারে। মন যখন তৈরী হয়নি কিংবা ধর্মবুদ্ধির দৈন্য ঘোচেনি, তখন প্রকৃতির প্রলয়ংকরী শক্তির ভাণ্ডার হাতে এলে তার অপপ্রয়োগে আনাড়ী মানুষ কতখানি দুর্দৈব ঘটাতে পারে, বৈজ্ঞানিকের অনেকগুলি সাম্প্রতিক আবিষ্কারের পরিণাম হতে তা বোঝা গেছে। জড়শক্তি দিয়ে প্রাণ- ও মনঃ-শক্তিকে আয়ত্ত করতে গিয়েও মানুষ এই বিপদই ডেকে আনবে—কেননা তার এ-প্রচেষ্টা হবে জীবনের মর্মাধিষ্ঠাত্রী নিগূঢ়শক্তির রহস্য না জেনেই কৃত্রিম উপায়ে তাকে বশ করতে যাওয়া। পাশ্চাত্যদেশে রহস্যবিদ্যা সাবালিকা হয়নি কোনকালেই, কেননা দর্শন ও সাধনতন্ত্রের দিক দিয়ে তার বনিয়াদ পাকা ছিল না বলে তার তেমন পুষ্টিও হতে পারেনি। তাই বিজ্ঞানের এলাকা থেকে তাকে বিদায় করা কঠিন হয় নি। রহস্যবিদ্যা ওদেশে বিহার করতে চেয়েছে অতিপ্রাকৃতের কল্পলোকে—অতীন্দ্রিয় শক্তিকে ব্যাবহারিক প্রয়োজনে খাটাবার মন্ত্র আর তন্ত্র আবিষ্কার করবার অপ-

চেষ্টাতেই তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়েছে। তাই শেষপর্যন্ত তার উদ্ভ্রান্ত সাধনা তাকে টেনে নিয়েছে ইন্দ্রজাল ও অভিচারের রাজ্যে, মরমী অনুভবের অনির্বচনীয়তাকে ঘিরে সৃষ্টি করেছে বিভূতিযোগের কল্পমায়া এবং বিজ্ঞানের তিলকে তাল করে তার মিথ্যা গুমরই বাড়িয়েছে শুধু। একে বুদ্ধির ভিত পাকা নয়, তাতে আত্মগর্বের এই নেশা—এতেই রহস্যবিদ্যার মরণ হল। বিজ্ঞানের সব্যসাচী বাণে-বাণে জর্জরিত করলেও তাকে রক্ষা করতে কেউ এগিয়ে এল না। কিন্তু মিশরে এবং প্রাচ্যখণ্ডে এ-বিদ্যার অনুশীলন হয়েছিল আরও উদার ভিত্তিতে। তার পরিণত রূপ বিশেষ করে দেখতে পাই এদেশের তন্ত্রশাস্ত্রে। তন্ত্রের রহস্যবিদ্যা বহুশাখ অতীন্দ্রিয়-বিজ্ঞানই নয় শুধু—তা ধর্মসাধনারও অব্যক্ত-মূলের প্রতিষ্ঠাভূমি। এমন-কি অধ্যাত্ম সাধনা ও সিদ্ধির একটা সিদ্ধমার্গ আবিষ্কারও তার অন্যতম বিপুল কীর্তি। বস্তুত রহস্যবিদ্যার অনুত্তম সার্থকতা প্রাণ-মন-চেতনার বিগূঢ় স্পন্দ ও অতীন্দ্রিয় শক্তিবিভূতির ছন্দ আবিষ্কারে এবং তাদের স্বরূপশক্তি বা সাধনবীর্য দ্বারা আমাদের প্রাণময় মনোময় ও চিন্ময় আধারের সামর্থ্য বাড়ানোতে।

সাধারণের বিশ্বাস, রহস্যবিদ্যা কেবল যাদু আর তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপার কিংবা অতিপ্রাকৃত শক্তিসাধনার শাস্ত্র। কিন্তু এ শুধু রহস্যবিদ্যার একটা দিক। রহস্যচারিণী প্রকৃতি-শক্তির এই প্রচ্ছন্ন দিকটা যারা খানিকটা বা মোটেই তলিয়ে দেখেনি, কিংবা তার সম্ভাবিত সামর্থ্য নিয়ে কখনও নাড়াচাড়া করেনি,—তারা একে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও এ তো নিছক কুসংস্কার নয়। বিজ্ঞান যেমন আজ নানা অসাধ্য সাধন করছে, তেমনি মন্ত্রশাস্ত্রের প্রয়োগে প্রকৃতির সুপ্তশক্তিকে যন্ত্রিত করে প্রাণ ও মনের সংগোপন বীর্যকে অপ্রাকৃত উপায়ে অথচ অদ্ভুত সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগানো নিতান্ত অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু রহস্যবিদ্যার এইটি যেমন মুখ্য প্রয়োগ নয়, তেমনি এ-প্রয়োগের সিদ্ধির পরিসরও সঙ্কীর্ণ। কারণ প্রাণশক্তি আর মনঃশক্তির লীলা সূক্ষ্ম বিচিত্র এবং সাবলীল—তার মধ্যে জড়শক্তির মত নিয়মের কাঠিন্য নাই। অতএব তাদের তত্ত্ব প্রবৃত্তি ও প্রয়োগের রহস্য জানতে হলে বোধির সূক্ষ্ম ও সাবলীল সংবেদন প্রয়োজন। এমন-কি প্রাণ-মনের চিরপরিচিত বৃত্তির রহস্য ও প্রয়োগ বুঝতে গেলেও বোধির সাহায্য ছাড়া অগ্রসর হবার উপায় নেই। তাই যন্ত্র-মন্ত্রের বাঁধা গৎ অনেকসময় বিদ্যার সূক্ষ্মপ্রচারকে ব্যাহত ক'রে তাকে যেমন আড়ষ্ট ও বন্ধ্যা করে, তেমনি প্রয়োগের দিক দিয়েও বহু প্রমাদ অপচার অসিদ্ধি ও মূঢ় গতানুগতিকতার কারণ হয়। জড়কেই বিশ্বমূল মনে করার কুসংস্কার আমরা দিনে-দিনে কাটিয়ে উঠছি। সুতরাং প্রাচীন রহস্যবিদ্যার একটা নবীন রূপায়ণ এবং প্রাকৃত-মনের গোপন রহস্য ও বিভূতির বৈজ্ঞানিক

গবেষণার সঙ্গে-সঙ্গে, চিন্ময় ও অপ্রাকৃত বা অতীন্দ্রিয়বৃত্তির গভীর অনুশীলনের দিকে আমাদের ঝোঁক হওয়া এখন স্বাভাবিক। কোথাও-কোথাও তার লক্ষণও দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে রহস্য-বিদ্যার সত্যকার ভিত্তি চর্যা ও লক্ষ্য কি ছিল, এ-পথের সাধককে কী বিধি-নিষেধ ও সতর্কবাণী মেনে চলতে হত—তার পুনরাবিষ্কার আবশ্যক। রহস্য-বিজ্ঞানের বিশেষ লক্ষ্য হবে—প্রাণ- এবং মনঃ-শক্তির নিগূঢ় সত্য এবং বীর্যকে অধিগত করা এবং গুহাহিত চিৎসত্তার মহত্তর বিভূতিসমূহকে আবিস্কার করা। ব্যক্তি ও বিশ্বের অধিচেতনভূমি হল রহস্যবিদ্যানুশীলনের প্রধান ক্ষেত্র। তাই তাকে বলতে পারি অধিচেতনার বিজ্ঞান—যদিও অনুষঙ্গক্রমে অবচেতন ও অতিচেতন ভূমির সঙ্গেও তার একটা সম্বন্ধ আছে। রহস্যবিদ্যার অনুশীলনে আমাদের আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞানের পরিধি যদি বাড়ে এবং সে-জ্ঞান সত্যের বীর্যকে এই জীবনেই স্ফুরিত করে, তবেই তার সার্থকতা।

মানুষের মৃন্ময় আধারে চিন্ময়-পরিণামকে সার্থক করতে হলে, পরা বিদ্যাকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার ও মন দিয়ে ধারণা করবারও একটা অপরিহার্য প্রয়োজন আছে। সাধারণত প্রাকৃতভূমিতে আমাদের ভাবনা ও কর্মের মুখ্য-সাধন হল বুদ্ধি, কেননা ভূয়োদর্শন অবধারণ ও যুক্তিযোজনার দ্বারা মনের বিচিত্র অনুভবকে সে-ই গুছিয়ে নেয়। অধ্যাত্ম প্রগতি বা চিন্ময়-পরিণামকে সর্বাঙ্গসম্পন্ন করতে হলে শুধু যে বোধি, অন্তর্দৃষ্টি, অন্তঃসংজ্ঞা ও নিষ্ঠা-পূত হৃদয়দ্বারা চিদ্‌বিলাসের প্রত্যক্ষ গভীর আস্বাদন—এই বৃত্তিগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলতে হবে, তা নয়। সেইসঙ্গে বুদ্ধিকেও করতে হবে প্রতি-বোধিত এবং তৃপ্ত। জাগ্রত চিত্তের ভাবনা এবং বিচার যাতে মনুষ্যপ্রকৃতির এই অনুত্তম উৎকর্ষ ও প্রবৃত্তির তত্ত্বসাধনা আর লক্ষ্য সম্পর্কে একটা সুশৃঙ্খল যুক্তিযুক্ত ধারণায় পৌঁছতে পারে এবং তার অন্তর্নিহিত সত্যের বিষয়ে সচে-তন হতে পারে, তারও আয়োজন করতে হবে। সত্য বটে, চিন্ময়-পরিণামের অন্তরঙ্গ সাধন হল অধ্যাত্ম অনুভব ও তত্ত্বসাক্ষাৎকার, বোধিজাত অপরোক্ষ-বিজ্ঞান এবং অন্তশ্চেতনার পরিস্ফুরণে আত্মার একটা অলৌকিক প্রত্যক্ষ দিব্যদর্শন ও প্রাতিভসংবিতের সামর্থ্য। কিন্তু সেইসঙ্গে বুদ্ধির বিচার ও যুক্তি দিয়ে এদের সমর্থন করবার গুরুত্বও নিতান্ত কম নয়। বহু সাধকের পক্ষে বুদ্ধির ব্যাপার বাহুল্য মনে হতে পারে—কেননা তত্ত্ববস্তুর অপরোক্ষানু-ভবের দীপ্তিতে তাঁদের অন্তর উজ্জ্বল বলে অন্তরাবৃত্ত সম্বোধির রসেই তাঁরা তৃপ্ত। কিন্তু চিন্ময়-পরিণামের সমষ্টিধারার দিকে তাকালে মনে হয়, এক্ষেত্রে বুদ্ধিরও সহযোগিতা অপরিহার্য। পরমার্থ-সত্য যদি চিন্ময় তত্ত্ব হয়, তাহলে তার স্বরূপ কি এবং জীবজগতের সঙ্গে তার সম্পর্কই-বা কি—মানুষের বুদ্ধি নিশ্চয় তা জানবার দাবি করতে পারে। অবশ্য অপরোক্ষ

চিন্ময় তত্ত্বের রাজ্যে বুদ্ধি নিজে আমাদের নিয়ে যায় না। কিন্তু তাহলেও বৃত্তির রেখায় চিন্ময় সত্যের একটা ছবি এঁকে তাকে সে মনের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে পারে এবং তা অপরোক্ষ এষণার অনুকূল সাধনও হতে পারে। সাধকজীবনে বুদ্ধির এ-আনুকূল্যটুকুর যে বিশেষ-একটা মূল্য আছে, তা বলাই বাহুল্য।

চিন্তাশক্তির মারফতে মানুষের মন চিন্ময় সত্যের একটা স্থূল ধারণা করতে পারে, তার সবিশেষ ও নির্বিশেষ দুটি বিভাবেরই ন্যায়সিদ্ধ রূপটি বুঝতে পারে—এমন-কি তাদের অন্যোন্যসম্পর্ক এবং আরোহ-অবরোহের ধারাটিও তার কাছে অস্পষ্ট নয়। তাছাড়া বিশ্বমূলকে চিন্ময় বললে যুক্তির দৃষ্টিতে কি-কি সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তাও তার জানা আছে। তত্ত্ব-বস্তুকে এমনি করে বুঝে নিয়ে যুক্তির কাঠামোয় দাঁড় করানো বুদ্ধির একটা মূল দাবি ও প্রধান দায়। কিন্তু এছাড়া তার একটা বড় কাজ হল—অনুভবের যাচাই করে তার রাস টেনে ধরা। সমাধি বা অনুরূপ অপরোক্ষানুভবকে মেনে নিতে তার দ্বিধা নাই। কিন্তু তবু সে জানতে চায়, বিশ্বসত্যের কোন্ সুনিশ্চিত তত্ত্বসংস্থানের 'পরে তার ভিত্তি। বাস্তবিক গোড়ার সত্যকে জানবার কি যাচাই করবার সুযোগ না থাকলে, আমাদের তর্কবুদ্ধি স্বচ্ছন্দেই অলৌকিক অনুভবকে অনিশ্চিত ও দুর্বোধ বলে সন্দেহ করতে পারে কিংবা সত্যাশ্রিত নয় বলে তার প্রতি বিমুখ হতে পারে। তাছাড়া অধ্যাত্ম অনুভবের মূলকে না হ'ক, তার পল্লবনকে বুদ্ধি বিশ্বাস করতে পারে না এইজন্যে যে, বস্তুত সে-পল্লবন হয়তো প্রমাদদুষ্ট, প্রাণময় মানসের কল্পনাবিকারে কলুষিত কিংবা ভাবাবেগ ইন্দ্রিয়সংবিৎ না নাড়ীতন্ত্রের অপেরণা দ্বারা বিপর্যস্ত। ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের পক্ষে ভুলপথে চলা আশ্চর্য কিছুই নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়ের সীমা হতে অলক্ষ্য অতীন্দ্রিয়ের রাজ্যে উৎক্রান্ত বা উৎক্ষিপ্ত হবার সময় কখনও তারা আলেয়ার পিছনে ছোটে, কখনও উপলব্ধ তত্ত্বের সংস্কারদুষ্ট দুর্ব্যাখ্যার দ্বারা বস্তুর স্বরূপসত্যকে বিকৃত করে, কখনও-বা স্বচ্ছদৃষ্টির অভাবে চিন্ময় সত্যের ব্যঞ্জনাকে আচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল করে।...রহস্যবিদ্যার সাধনা ও সিদ্ধিকে যুক্তিবুদ্ধি অপ্রমাণ বলে উড়িয়ে দিতে হয়তো পারবে না। কিন্তু তাহলেও অতিপ্রাকৃত শক্তির অনুভূত লীলায়নের মূলে যে তত্ত্ব তন্ত্র ও তাৎপর্যের প্রেরণা, তাদের যৌক্তিকতা সম্পর্কে একটা জিজ্ঞাসা তার থাকবেই। বিভূতি-যোগী তাঁর বিদ্যার যে-অর্থ করেন, তা-ই কি তার তত্ত্ব না তার অন্যকোনও অর্থ আছে—বুদ্ধির এ-প্রশ্ন অসঙ্গত নয়। কেননা বিভূতিযোগের স্বরূপ ও প্রয়োজনের গভীরতর তাৎপর্যকে ভুল বোঝা, অথবা অধ্যাত্ম অনুভবের সমগ্র পরিবেশে তার যোগ্য স্থানটি আবিষ্কার করতে না পারা সাধারণ যোগীর পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়।...বুদ্ধির তাহলে তিনটি কাজ : প্রথমত তত্ত্বের অবধারণ,

তারপর যুক্তির কষ্টিপাথরে তাকে কষে দেখা, এবং সবশেষে সংহত ও সংযত আকারে তাকে রূপ দেওয়া।

বুদ্ধির এ-আকৃতি চরিতার্থ হয় আমাদের চিত্তস্থিত দার্শনিক বিচারের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে। অবশ্য এক্ষেত্রে দর্শন বলতে বুঝব আধ্যাত্মিক বিচার শাস্ত্র। প্রাচ্যখণ্ডে এধরনের দর্শনশাস্ত্র দেখা দিয়েছে অগুনতি : যেখানেই অধ্যাত্মসাধনার উৎকর্ষ ঘটেছে, বুদ্ধির কাছে তার রূপটি স্পষ্ট করবার জন্য সেখানেই দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত বোধির দর্শনকে বোধির ভাষাতে ব্যক্ত করবার চেষ্টা হয়েছে—যেমন উপনিষদের অতলান্ত ভাবনা ও গভীর-গহন বাণীতে। তারপর তাকে ধরে গড়ে উঠেছে তত্ত্বসমীক্ষার বিতর্কবহুল পদ্ধতি—যুক্তি ও ন্যায়ের সুদৃঢ় শৃঙ্খলায় গাঁথা। তার মধ্যে দেখি অন্তরের উপলব্ধির বিবৃতি—কখনও বুদ্ধির কাছে (যেমন গীতায়), কখনও-বা তর্ক-প্রমাণের দরবারে। কোথাও-বা পাই তত্ত্বসাক্ষাৎকারের অনুকূল চিত্তভূমি বা সাধনক্রমের বৈজ্ঞানিক বর্ণনা—যেমন পাতঞ্জলদর্শনে। পাশ্চাত্যদেশে কিন্তু চেতনার সমন্বয়ী বৃত্তির জায়গায় দেখা দিয়েছে বিভজ্যবাদের বিবেকসাধনী বৃত্তি; তাই সেখানে অধ্যাত্মিক প্রেতির সঙ্গে বিচার-বুদ্ধির গোড়া থেকেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে এবং সেইজন্যে পাশ্চাত্যদর্শন বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেয়েছে শুধু বুদ্ধি ও তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে। তবু সেদেশে পিথাগোরিয়ান্ ষ্টোইক ও এপিকিউরিয়ান্ প্রস্থানে একটা প্রাণের সাড়া ছিল, কেননা তাতে বিচারের সঙ্গে আচারেরও যোগ ছিল—সাধনার একটা ধান্ধা ধরে আধারকে আন্তর অনুভবের ঐশ্বর্যে সার্থক করবার একটা প্রয়াস ছিল। এই সমন্বয়-রীতি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সানুদেশে পৌঁছল পরের যুগের 'অর্বাচীন-ক্রীশ্চান' বা 'নীও-প্যাগান' দর্শনে—যার মধ্যে প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যভাবের মিলন ঘটল। কিন্তু তারপরেই শুরু হল প্রতিক্রিয়া। বুদ্ধিচর্চার আতিশয্যে দর্শনের সঙ্গে জীবনস্পন্দের সকল যোগ ছিন্ন হল—চিন্ময় প্রেরণার উৎসমূল শুকিয়ে গেল। কিংবা শুষ্কতর্কের খাত বেয়ে তার একটা শীর্ণধারা জীবনে ও কর্মে বেঁচে রইল জীবনরসহীন পরোক্ষতার দৈন্য নিয়ে। তাই ওদেশে চিরকাল ধর্মের ওকালতি করে এসেছে দর্শনশাস্ত্র নয়—'শরীয়ৎ' বা 'মজ্‌হবী' তত্ত্বকথা। কদাচিৎ কোনও সাধকের প্রবল প্রতিভা এক-আধটা অধ্যাত্মশাস্ত্রের সৃষ্টি করলেও এদেশের মত অধ্যাত্মসাধনা ও সিদ্ধির যে-কোনও সার্থক রূপায়ণের পাশে দর্শনশাস্ত্রের একটা অপরিহার্য উপাঙ্গ জুড়ে দেবার রেওয়াজ কোনকালেই ওদেশে ছিল না। অবশ্য চিন্ময় অনুভবকে দর্শনের কাঠামোয় যে পুরতেই হবে, এমন-কোনও আইন নাই। কেননা চিন্ময় সত্যের অপরোক্ষ ও অখণ্ড অনুভব আমরা পাই বোধির সহায়ে—তত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শদ্বারা। দার্শনিকের রীতি সেখানে পরোক্ষ সাধন, অতএব অবান্তর। তাছাড়া অধ্যাত্ম

অনুভবকে বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করবার পদ্ধতি অনেকসময় অনৈশ্চিত্য এবং বাধারও সৃষ্টি করতে পারে, কেননা বুদ্ধির অবরদীপ্তি দিয়ে বোধির উত্তরজ্যোতিকে পরখ করবার মধ্যে প্রমাদ ঘটবার সম্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। অন্তরের উপলব্ধির সত্যকার যাচাই হতে পারে একমাত্র অন্তর্মুখ বিবেকশক্তি দিয়েই—যার মধ্যে আছে অধ্যাত্মচেতনার উপায়কুশলতা। সেখানে ঊর্ধ্বলোকের শক্তিপাত অথবা অন্তর্যামীর স্বভাবজ্যোতির প্রেরণা হয় আমাদের যথার্থ দিশারী। তবু বুদ্ধির উৎকর্ষসাধনাও নিরর্থক নয়, কেননা চিৎশক্তি ও তর্ক-বুদ্ধির মধ্যে যোগাযোগের একটা সেতু থাকা নিতান্তই আবশ্যক। চিন্ময়ী বুদ্ধির না হ'ক, চিদ্‌বাসিত বুদ্ধির দীপ্তিতেই আমাদের আন্তর পরিণাম পূর্ণকল হয়। নইলে গুহাশায়ী সত্য দিশারীর অভাবে বুদ্ধির প্রসাদহীন অন্তর্বৃত্তি হয়তো প্রমাদী ও উচ্ছৃঙ্খল, অচিৎ-বৃত্তির সাঙ্কর্যে আবিল কিংবা ব্যাপ্তিচেতনার ন্যূনতাহেতু অপূর্ণ ও একদেশদর্শী হয়। অতএব অবিদ্যা-শক্তিকে অখণ্ড সর্ববিদ্যায় রূপান্তরিত করতে হলে চাই চিন্ময়ী বুদ্ধির একটা অন্তরিক্ষলোক, যেখানে ঊর্ধ্বলোকের ভাস্বতী দীপ্তি ব্যাহিত হয়ে প্রচারিত হবে আধারস্থ অপরা প্রকৃতির তন্ত্রে-তন্ত্রে।

কিন্তু শুধু ধর্মসাধনা, বিভূতিযোগ বা অধ্যাত্মবিচার দিয়ে প্রকৃতির পরতর এবং মহত্তর আকূতি কখনও সম্পূর্ণ সফল হয় না। চিন্ময় অনুভবের দিকে যতক্ষণ তারা চেতনার মোড় ফিরিয়ে না দিচ্ছে, ততক্ষণ এই তিনটি পথের কোনটিই মানুষের মনোময় আধারে চিন্ময়সত্ত্বের উন্মেষ ঘটাতে পারে না। সে-উন্মেষ সিদ্ধ হয়, যখন এই তিনটি সাধনার অন্তর্লক্ষ্যকে অপরোক্ষ-অনুভব দ্বারা আমরা আয়ত্ত করি এবং উপলব্ধির তিল-তিল সঞ্চয়ে কিংবা সর্ব-প্লাবিনী বিদ্যুতিতে অন্তরকে নতুন করে গড়ে তুলি চেতনার রূপান্তর দ্বারা—দেহ-প্রাণ-মনের এই কঞ্চুককে বিদীর্ণ করে আবিঃ-স্বরূপে নির্মুক্ত করি গুহাশায়ী চিৎপুরুষকে। অধ্যাত্ম প্রগতির এই চরম লক্ষ্যের দিকেই আর-সব সাধনার অভিসার। বহিরঙ্গ-সাধনার দায় নির্বাহ করে জীব যখন অন্তরঙ্গ-সাধনার অবন্ধনতায় মুক্তি প্রায়, তখনই তার সত্যের অভিযান শুরু হয়—দিগন্তের কোলে উঁকি দেয় হিরণ্যবর্তনির জ্যোতির্লেখা। এতকাল মনোময় মানুষ শুধু ওপারের রহস্যের সঙ্গে তার পরিচিতিকে মার্জিত করেছে—অনুভব করেছে উত্তরায়ণের একটা অস্ফুট সংবেগ, শীলবিশুদ্ধির একটা আদর্শচেতনা। লোকোত্তর কোনও সত্য কি শক্তির সংস্পর্শে হয়তো-বা তার হৃদয়ে প্রাণে ও মনে নতুন একটা উদ্দীপনা জেগেছে। ধর্মভাবনা শীলসাধনা ও বিভূতিযোগ অতীত যুগে সৃষ্টি করেছে পুরুত ও গুণিন্‌কে, সাধু-সজ্জন বা জ্ঞানী পুরুষকে—যাদের বলতে পারি মনোময় মানবত্বের আকাশপ্রদীপ। কিন্তু শুধু 'মনসা' নয় 'হৃদা—মনীষা' সত্যকে অনুভব

করবার অধিকার মানুষ পেল যখন, তখনই জগতে দেখা দিল ঋষি যোগী সন্ত প্রবক্তা ও মরমীর মেলা। আর এইধরনের উত্তমপুরুষদের আবির্ভাব হল যেসব সম্প্রদায়ে, তারাই সনাতন ধর্মরূপে অধিকার করল জগদ্গুরুর আসন, সমগ্র মানবজাতির হৃদয়বেদিতে জ্বালাল চিন্ময়ী অভীপ্সা ও সাধনার হোমশিখা।

চেতনার পটে চিন্ময়-ভাবনার নির্মুক্ত ও বিবিক্ত প্রকাশ প্রথমে দেখা দেয় জ্যোতির্ঘন একটি বিন্দুরূপে। অপ্রবুদ্ধ ও বহিশ্চর প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের সংস্কারান্ধতার মসীঘনতায় সে যেন একটা অরুণিমার উপচয়—যেন লোকোত্তর অনুভবের একটা চকিত বিদ্যুৎ। আলো আসে শঙ্কিত চরণে—ধীরে-ধীরে তার গুণ্ঠন ঘোচে, কেটে যায় সাধ্বসকম্পিত প্রকাশের জড়িমা। তাই তার আদিপর্বের সূচনায় দেখি ধর্মবোধের একটা আবছায়া, যাকে ঠিক অধ্যাত্মচেতনা না বলে বলতে পারি প্রাণ ও মনেরই একটা আকূতি কি আশ্বাস—চিন্ময় আধার বা উপাদানের একটুখানি আশ্রয় পেয়ে। লোকোত্তর অনুভবের যে-ছোঁয়াচটুকু এইসময়ে মানুষ পায়, তা-ই দিয়ে সে চায় মনশ্চেতনাকে বা শীলাচারের আদর্শকে উজ্জ্বলতর করতে, কিংবা তার দেহ ও প্রাণ-বাসনার চরিতার্থতা ঘটাতে। কেননা সত্যকার অধ্যাত্মপরিণামের জন্য তখনও তার চিত্ত তৈরী হয়নি। পরিণামের প্রথম সূচনা মূর্তি ধরে আমাদের প্রাকৃত প্রবৃত্তির চিন্ময় জারণাতে—যেন তাদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে দিব্যভাবের একটা আবেশ বা দেশনা। হয়তো প্রাণ-মনের বিশেষ-কোনও চক্রে কি বৃত্তিতে নেমে আসে লোকোত্তর একটা অনুভাব বা আস্রবের দ্যোতনা। চিদ্বাসিত ভাবনায় ঝিলিক হানে উৎসর্পিণী কোন্ বিজলীশিখা, হৃদয়ের আবেগে ও রসচেতনায় কোথা হতে জাগে ঊর্ধ্বচেতনার জোয়ার, চারিত্রে দেখা দেয় চিদাবিষ্ট শীলাচারের একটা দীপ্তি, প্রাণের প্রবৃত্তিতে উপচে ওঠে কী-এক চিন্ময়ী প্রেরণার উদ্বেলন। এমনি করে আধারের প্রাণলীলায় উচ্ছ্বসিত হয় অনির্বচনীয় নবায়নের প্রবর্তনা। তখন অনুভব হয়, মনেরও ওপারে আছেন এক অন্তর্জ্যোতির্ময় নিত্যযুক্ত শাস্তা ও নিয়ন্তা—মানুষের অন্তর সাড়া দেয় তাঁর গোপন ইশারার বৈদ্যুতীতে। তবু এ-অনুভবের আলোকে জীবনের আদ্যন্ত প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে না, সব-কিছু তার ছাঁচে নতুন করে গড়ে ওঠে না। কিন্তু বোধির এই চকিত দীপ্তি যখন সংহত হয়ে একটা বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হয়, কিংবা তার অন্তঃস্থ চিদ্ঘন রূপায়ণ সমগ্র জীবনে ব্যাপ্ত হয়ে প্রকৃতিকেও জারিত করে, তখনই আধারে শুরু হয় চিন্ময় দিব্যভাবনার ক্রিয়া। তার ফলে জগতে দেখা দেয় ভক্ত সন্ত ঋষি যোগী প্রবক্তা ধর্মবীর বা 'খুদাই-খিদমতগার'এর বাহিনী। অধ্যাত্মজ্যোতিতে চিদ্বীর্যে বা সমাধিরসে উল্লসিত প্রাকৃতসত্তার একদেশকে আশ্রয় করে তাঁদের অধিষ্ঠান। যোগী-ঋষিরা চিন্ময় মনোলোকের অধিবাসী—তাঁদের মনন ও

দর্শনকে প্রেষিত এবং আকারিত করে এক অন্তর্গূঢ় লোকোত্তর বৃহৎ জ্যোতির বিজ্ঞানময় দীপ্তি। ভক্তের হৃদয় জুড়ে জ্বলে এক চিন্ময়ী অভীপ্সার দহন—নিঃশেষে নিজেকে সঁপে দিয়ে আঁতিপাঁতি করে বাঞ্ছিতকে খোঁজবার অন্তহীন ব্যাকুলতা। সন্তের অন্তরের অন্তরে ঘটে চৈত্যপুরুষের উদ্বোধন—আপন স্বধার বীর্যে তিনিই নেন তাঁর ভাবোদ্বেল প্রাণময়-পুরুষের প্রশাসনের ভার। আর কর্মযোগীর স্ফুরন্ত প্রাণপ্রকৃতির মধ্যে নামে চিৎশক্তির উত্তর-প্রবেগ। তাঁর সমস্ত চিত্তের মোড় তা ফিরিয়ে দেয় উদ্দীপ্ত চিত্তের কর্মসাধনার দিকে—ঈশ্বরনির্দিষ্ট কোনও জীবনব্রত অথবা কোনও দিব্যশক্তি দিব্যভাবনা বা দিব্য আদর্শের আরাধনার অভিমুখে। এঁদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন মুক্তপুরুষ। অন্তর্যামী চিদাত্মাকে জেনে বিশ্বচেতনায় অবগাহন করেও, আবার অধ্যাত্মযোগে তিনি নিত্যযুক্ত রয়েছেন বিশ্বোত্তরের সঙ্গে। অথচ জীবন ও কর্মকে প্রত্যাখ্যান না করে বাসুদেবের নিমিত্তরূপে বিশ্বের কুরুক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন সব্যসাচীর কর্মভার। এই অধ্যাত্মরূপায়ণের অনুত্তম সিদ্ধি দেখা দেয় আত্মা মন হৃদয় ও কর্মের পূর্ণ প্রমুক্তিতে—বিশ্বচিতের দিব্যরসায়নে জারিত করে নতুন ছাঁচে তাদের ঢেলে নেওয়ায়।* এমনি করে জীবের চিন্ময়-পরিণাম উত্তীর্ণ হয় গৌরীশঙ্করের উত্তুঙ্গতায়—দিকে-দিকে উৎক্ষিপ্ত হয় তার উত্তমা প্রকৃতির শৃঙ্গরাজি। আর এই উচ্ছ্রিত মহাবৈপুল্যের ওপারে দেখা দেয় অতিমানসের সোপানমালা—ঊর্ধ্বে উৎসারিত হয়ে চলেছে কোন্ অব্যক্ত অনুত্তরের রহস্যলোকের দিকে।

মানুষের মনোময় আধারে চিন্ময়-পুরুষের উন্মেষের সাধনাকে প্রকৃতি আজ অধ্যাত্মলোকের এই সানুদেশে এনে পৌঁছে দিয়েছে। এইবার প্রশ্ন হতে পারে, মানুষের এ-সিদ্ধির বাস্তব তাৎপর্য কি এবং তার অধিগত ঋদ্ধিরই-বা কি পরিমাণ। আধুনিকের জড়সর্বস্ব বিদ্রোহী চিত্ত চিজ্‌জগতের প্রতি প্রকৃতি-পরিণামের এই সুস্পষ্ট ইশারাকে খুব সুনজরে দেখেনি। তার ধারণা, একে চেতনার যথার্থ পরিণাম বলা ভুল—কেননা এক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার নামে অজ্ঞানের মূঢ়তাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে আকাশে তোলা হয়েছে এবং তাতে মানুষ প্রগতির সাধনা হতে ভ্রষ্টই হয়েছে। মানুষের সত্যকার জীবনব্রত হল প্রাণ-শক্তির উন্মেষ ঘটানো, বাস্তবতার ভূমিতে জড়ীয়-মনের উৎকর্ষ সাধন করা, উদ্বেল ভাব ও মূঢ় আচারকে যুক্তির শাসনে আনা এবং বস্তুতন্ত্র বুদ্ধির গবেষণা ও কৃতির শক্তিকে উত্তরোত্তর তীক্ষ্ম করে তোলা। এ-যুগের রায় হল : ধর্ম অতীতযুগের একটা কুসংস্কার, অতএব আধুনিক সমাজের একটা অবাঞ্ছনীয় বাহুল্যমাত্র। অধ্যাত্মসাধনা ও সিদ্ধিতে আছে শুধু ভাবকালির

* গীতোক্ত অধ্যাত্মসাধনা ও সিদ্ধির তাৎপর্যও তা-ই।

ধোঁয়া। ভাবক অবাস্তবতার উপাসক—নিজেরই রচিত অতীন্দ্রিয় কুহকের ধাঁধায় দিশাহারা। অবশ্য এ-সিদ্ধান্ত জড়বাদীর, কেননা জড়কে বিশ্বের একমাত্র তত্ত্ব মেনে জীবনের বহিরঙ্গকেই সে বড় করে দেখেছে। কিন্তু ভিতরের ফাঁকি ধরা পড়ে একদিন তার এ-সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য বাতিল হতে বাধ্য। উৎকট জড়বাদী ছাড়াও, ইহসর্বস্ব বুদ্ধিজীবীদের বস্তুতন্ত্র চিত্তে আরেকধরনের জড়বাদ বাসা বেঁধেছে। অধ্যাত্মবাদ মানুষের বিশেষ-কোনও উপকারই করেনি—এই হল আধুনিক মনের লোকায়ত একটা সংস্কার। সে বলে : আধ্যাত্মিকতার সাধনায় জীবনসমস্যার কি কোনও সমাধান হয়েছে? জীবনের যেসব জটিল প্রশ্নের সঙ্গে মানুষ আবহমান কাল যুঝে এসেছে, ধর্ম তার কোন্ গ্রন্থিটা মোচন করেছে? ভাবক যখন জীবন থেকে সরে দাঁড়ান ইহবিমুখ তপস্যার ঝোঁকে কিংবা ভাবের চক্ষু উলটে দিয়ে, তখন জীবনের বাস্তব সাধনায় তিনি উদাসীন। আবার কখনও তাঁর সাধনবিত্তকে সকল দুঃখের দাওয়াই রূপে লোকের সামনে যদি হাজির করেন, তখন তার মধ্যে এমনকিছু বৈশিষ্ট্য থাকে না, যা একজন করিতকর্মা বা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষের ব্যবস্থাতে ছিল না। বরং ভাবকের অনধিকারচর্চায় মানুষের সহজস্থিতিও পর্যাকুল হয়ে ওঠে। কেননা তাঁর প্রবৃত্তিসামর্থ্যহীন ভাবকালির অনভ্যস্ত আলোক সাধারণ বুদ্ধিকে ধাঁধিয়ে দিয়ে বিকারের সৃষ্টি করে এবং জীবনের গুরুতর অথচ সহজরোধ্য বাস্তব সমস্যাকে শুধু ঘুলিয়ে তোলে।

কিন্তু চিন্ময়-পরিণামের তাৎপর্যকে কিংবা আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনকে এইধরনের মাপকাঠিতে মাপতে যাওয়া অন্যায়, কারণ অতীত বা বর্তমানের মনোময় ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে জীবনসমস্যার সমাধান করা আধ্যাত্মিকতার সত্যকার দায় নয়। সে চায় মানুষের আধার ও জীবনের একটা অকল্পিত রূপান্তর—তার বিজ্ঞানসাধনার একটা নতুন বনিয়াদ। ভাবকের মধ্যে যে ইহবিমুখীনতা বা তপশ্চর্যার ঝোঁক দেখি, সে শুধু জড়প্রকৃতির সীমায়নের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহের একটা ঐকান্তিক রূপ। জড়প্রকৃতিকে সে ছাড়িয়ে যাবে—এই তার বিধির বিধান। সুতরাং প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাতে না পারলে, প্রকৃতিকেই তার ছাড়তে হবে বাধ্য হয়ে। কিন্তু তাবলে নিখিল মানবের জীবনধারা হতে চিন্ময় মানুষ তো নিজেকে কোনকালেই সম্পূর্ণ বিযুক্ত রাখেননি। কারণ, মৈত্রী করুণা সর্বাত্মভাব ও সর্বভূতের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করবার পুণ্যসংকল্পই* যে তাঁর চিন্ময়-ভাবনার বাসন্ত উচ্ছ্বাসে রসের যোগান আনে। এই দিব্যপ্রেরণাই বারবার তাঁকে টেনে এনেছে সমাজের বুকে, প্রাচীন ঋষি বা

---

* গীতা দ্রষ্টব্য। করুণা ও মৈত্রীকে ('বসুধৈব কুটুম্বকম্') বৌদ্ধেরা মনে করতেন ব্রহ্মবিহারের সর্বোত্তম সাধন; ক্রিশ্চানেরাও প্রেমকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। এসমস্তই চিন্ময়ভাবনার স্ফুরত্তার নিশানা।

নবীদের মত তাঁকে করেছে প্রাকৃত মানুষের দিশারী। কখনও-বা সিসৃক্ষার প্রেতি নিয়ে তিনি মর্ত্যের ধুলায় নেমে এসেছেন। তাঁর সে সংবেগের মধ্যে যখন চিৎবীর্যের অপরোক্ষ প্রচোদনা আহিত হয়েছে, তখন তাঁর সৃষ্টিও হয়েছে যুগান্তরের প্রবর্তক। তবু বলব, ভাবকের আধ্যাত্মিকতা জীবনসমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে বহিরংগ কোনও সাধনের 'পরে নির্ভর করে নয়—যদিও তাকে একেবারে উপেক্ষাও সে করনি। কিন্তু অন্তরংগ সাধনদ্বারা চেতনা ও প্রকৃতির রূপান্তর ঘটানোতেই সে জীবনের সকল প্রশ্নের সত্য সমাধান খুঁজে পেয়েছে।

অধ্যাত্মসাধনার ফলে আজপর্যন্ত মানুষের চেতনায় কোনও বিপ্লব আসেনি, শুধু তার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছে সূক্ষ্মভাবের কিছু অভিনব উপাদান। অর্থাৎ চেতনার ঐশ্বর্য বাড়ালেও অধ্যাত্মসাধনা তার গোত্রান্তর ঘটায়নি—স্পর্শমণির ছোঁয়ায় জীবনকে সে সোনা করে তোলেনি। তার কারণ, মানুষের গণচেতনা কোনকালেই চিন্ময় প্রবেগকে সমগ্রভাবে ধারণা করতে পারেনি। আধ্যাত্মিকতার আদর্শ হতে বারবার সে চ্যুত হয়েছে, কিংবা তার শাঁস ছেড়ে ছোবড়াকেই বড় করে দেখেছে। অচিতের সাধনাকে আশ্রয় করে চিতিশক্তির কারবার চলবে জীবনের সংগে, অথবা রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কোনও মকরধ্বজ দিয়ে সংসারের সকল ব্যাধি সে দূর করবে—এটা আশা করাও আমাদের অন্যায়। রোগের নিদান না জেনেও এমনিতর হাতুড়ে চিকিৎসা করতে পারে আমাদের প্রাকৃত-মন। বারবার ব্যর্থ হয়েও চিকিৎসার একই পদ্ধতিকে সে আঁকড়ে আছে, তাই তার এই ব্যর্থতার কলঙ্কও দূর হবার নয়। বাইরের বিপ্লব যত সর্বনাশা-হ'ক, তাতে প্রকৃতির রূপান্তর কখনও সিদ্ধ হবে না—শুধু প্রাচীন অনর্থটাই নতুন রূপে দেখা দেবে। এতে মানুষের পরিবেশ বদলায়—স্বভাব বদলায় না। এত করেও মানুষ সেই আগেকার মত অবিদ্যার দাস হয়ে আজও মনের করায় বন্দী আছে—বিদ্যার অপপ্রয়োগ বা অসার্থক প্রয়োগ আজও তার কপালের লিখন। অহমিকা, প্রাণের অন্ধবাসনা ও উত্তালতা, দেহের ক্ষুধা—এদের শাসনই জীবনের প্রতি পদে সে মেনে চলেছে। তার বহির্মুখ দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিকতার সর্বতোগ্রাহী স্বচ্ছতা নাই। নিজেকে যেমন সে জানে না, তেমনি জানে না কোন্ শক্তির ক্রীড়নকরূপে সংসারে সে তাড়িত হয়ে চলেছে। জীবনের যে-কাঠামো সে গড়ে তুলেছে, ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীর দিক দিয়ে তার একটা সার্থকতা হয়তো আছে। কেননা এ-ব্যবস্থা তাদের অধুনাতন স্থিতির অনুকূল, এতে আছে মানুষের দেহ এবং প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের খানিকটা বরাদ্দ, তার মানসিক পুষ্টির একটা চলনসই আয়োজন। কিন্তু তার বর্তমানের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যাবার কোনও সংকেত এতে নাই—তার রূপান্তরসাধনার কোনও আশ্বাসও নাই। ব্যক্তি বা সমাজকে পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে

এখনও মানুষকে বহুদূর উত্তরায়ণের পথে এগিয়ে যেতে হবে। চাই আধারের চিন্ময় গোত্রান্তর, বহিশ্চর চিত্তের সম্পুটকে ফুটিয়ে তোলা চাই গুহাচর চিন্ময়সংবিতের কমলদলে—তবেই-না জীবনে সত্য ও সাথক রূপান্তরের সূচনা হবে। চিন্ময় মানুষের লক্ষ্য তাই। তিনি চান নিজের চিন্ময়সত্তাকে আবিষ্কার করতে এবং তাঁর মত অপরকেও উত্তরায়ণের অভিসারে প্রেরণা দিতে। তাঁর মানব-হিতৈষণারও এ-ই রূপ। কেননা তিনি জানেন, বাইরের হিতৈষণায় মানুষের দুঃখের সাময়িক উপশমই হতে পারে—তার বেশী নয়।

সত্য বটে, মানুষের অধ্যাত্মভাবনার লক্ষ্য এখনও জীবনের ওপারপানে নিবদ্ধ রয়েছে—এপারপানে নয়। এও মানি, আজপর্যন্ত গোত্রান্তর ঘটেছে ব্যষ্টিরই-গোষ্ঠীর নয়। শুধু দুটি-একটি মানুষের জীবনে ফুটেছে সার্থকতার ফুল, কিন্তু গণ-জীবন তেমনি উষরই থেকে গেছে, অথবা তার মধ্যে রসের অনুষেক হয়েছে অলক্ষ্য। প্রকৃতির চিন্ময়-পরিণাম এখনও অপূর্ণ, এখনও সে চলতি-পথের পথিক—বলতে গেলে সবে তার চলার শুরু। তাই চিন্ময় সংবিৎ ও বিজ্ঞানের একটা ভিত্তিরচনার দিকে প্রকৃতির বিশেষ ঝোঁক। সে চায় তিলে-তিলে চিন্ময় সত্যের শাশ্বতী প্রতিমার একটা পাদপীঠ বা আদল গড়তে। এইজন্য পরিণামশক্তিকে সে ব্যক্তির আধারে সংহত ও বিগ্রহঘন করে তুলতে চাইছে। নইলে শক্তির প্রসারণ ও বিচ্ছুরণ দ্বারা বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হয় না, অতএব চিন্ময় মানবগোষ্ঠীও গড়ে ওঠে না। অবশ্য গোষ্ঠীরচনার চেষ্টা ইতিপূর্বেও হয়েছে। কিন্তু সাধারণত তার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির অধ্যাত্ম-পুষ্টির একটা গর্ভাশয় তৈরি করা। সমষ্টিগত রূপান্তরের আয়োজন যতক্ষণ সম্পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ ব্যক্তির একমাত্র সাধনা হবে চিৎ-সত্যের সিদ্ধ বা সাধ্যমান অন্তরঙ্গ অনুভবকে প্রাণ-মনের আধারেও ফুটিয়ে তোলা—সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাদেরও সোনা করে নেওয়া। সমস্ত আয়োজন পূর্ণ হবার পূর্বেই একটা বৃহৎ চিন্ময় পরিবার গড়বার প্রয়াস ব্যাহত হয়—কখনও অধ্যাত্মবিদ্যায় শক্তিসঞ্চারের দিকটা ভাল করে না জানার দরুন, কখনও-বা ব্যক্তিগত সাধনার ত্রুটিবিচ্যুতিতে। আবার কখনও সত্যকে গ্রহণ করতে গিয়ে প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের অন্ধসংস্কার তাকে আচ্ছন্ন অসাড় ও বিকৃত করে ফেলে এবং তার ছোঁয়াচেও সংঘের সাধনা বিপর্যস্ত হয়। মানস-বুদ্ধির প্রধান সাধন হল যুক্তি। কিন্তু যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে মানুষের জীবনধর্মের চিরাচরিত বৃত্তির মোড় ফেরানো যায় না—শুধু অদল-বদল ও হরণ-পূরণের নানা কসরতে তাদের বহুরূপী করে তোলাই চলে। এমন-কি চিদ্‌বাসিত মনের সমগ্র শক্তিপ্রয়োগেও জীবনের গোত্রান্তর ঘটে না। চিন্ময় ভাবনা আনে অন্তরের মুক্তি ও দীপ্তি, মনের মধ্যে আনে উন্মনী ভূমির সন্নিকর্ষ, এমন-কি অমনীভাবের ঘরেও তাকে নিয়ে যায়, আত্মশক্তির নিগূঢ় আবেশে ব্যক্তির

বহিঃপ্রকৃতিকে করে নির্মল এবং উর্ধ্বশিখ। কিন্তু শুধু মনকে অবলম্বন করে সে-ভাবনা যদি গণচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে চায়, তাহলে মর্ত্যের সমষ্টি-জীবনকে একটা নাড়াই সে দিতে পারে, কিন্তু তার রূপান্তর ঘটাতে পারে না। এইজন্য মর্ত্যচেতনার রূপান্তরের দিকে আজও চিন্ময়-মনের ঝোঁক পড়েনি। শুধু সমষ্টিজীবনে একটা আলোড়ন তুলে ইহবিমুখ সিদ্ধির সন্ধানে সে খুশী থেকেছে কিংবা বাইরের সমস্ত বিক্ষেপ ও ব্যুত্থানকে বর্জন করে আত্মমুক্তি বা ব্যক্তির সিদ্ধিকে সে আঁকড়ে ধরেছে একমাত্র পুরুষার্থ বলে। বস্তুত অবিদ্যাকল্পিত প্রকৃতির পূর্ণ রূপান্তর ঘটাতে হলে, মনেরও উজানের আর-কোনও শক্তিকে আমাদের সাধনরূপে গ্রহণ করা চাই।

ভাবকের বিরুদ্ধে আরেকটা আপত্তি তাঁর বিদ্যার ব্যাবহারিক পরিণাম সম্পর্কে নয়, কিন্তু তাঁর উপলব্ধ সত্য ও তার সাধনপদ্ধতি নিয়ে। বলা হয়, ভাবকের সাধনপদ্ধতি নিছক ব্যক্তিগত—ব্যক্তিচেতনার বৃত্তি ও সংস্কারের এলাকা ছাড়িয়েও সে-সাধনা সত্য কি না, তা প্রমাণ করবার উপায় নাই। কিন্তু এ-তর্ক নিতান্তই অসার। কারণ ভাবকের লক্ষ্য আত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান। সে-জ্ঞান অন্তরাবৃত্ত দৃষ্টিতেই ফোটে—পরাক্ দৃষ্টিতে নয়। বস্তুর পারমার্থিক স্বরূপজ্ঞানও যদি তার লক্ষ্য হয়—তাও তো মিলবে না ইন্দ্রিয়ের বহির্বৃত্ত এষণায়, বাইরের উপরভাসা তথ্যের 'পরে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বসমীক্ষায়,' কিংবা পরোক্ষপ্রমাণজন্য অনিশ্চিত সাধনসামগ্রীর আশ্রিত জল্পনায়। সে-জ্ঞান আসবে স্বরূপসত্যের চিন্ময় বিগ্রহের সঙ্গে চেতনার অপরোক্ষ সন্নিকর্ষ ও সম্প্রয়োগ হতে, কিংবা তাদাত্ম্যবিজ্ঞানকে আশ্রয় করে। সে-জ্ঞানে প্রমাতা আত্মা প্রমেয় আত্মার সঙ্গে অবিনাভূত হয়ে জানবে তার সত্ত্ব ও বিভূতির তত্ত্ব। ...আপত্তি ওঠে : কিন্তু এ-উপায়ে যে-জ্ঞানলাভ হয়, সে তো সর্বসাধারণগম্য অদ্বিতীয় কোনও তত্ত্ব নয়, কেননা ব্যক্তিভেদে আমরা যে সত্যেরও রূপভেদ দেখতে পাই। অতএব তাকে পরমার্থসত্য না বলে ব্যক্তিমনের বিকল্প বলাই ঠিক। কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যার তত্ত্বরূপ না জানলেই এমন আপত্তি উঠতে পারে। চিন্ময় সত্য চিদ্‌বস্তুরই সত্য—বুদ্ধির সত্য নয়, কিংবা গণিতের সিদ্ধান্ত কি ন্যায়ের উপপত্তিও নয়। এ-সত্য অনন্তের সত্য, অনন্ত বৈচিত্র্যে বিভাবিত অখণ্ডের সত্য—অতএব রূপবিভাবনার অন্তহীন ঐশ্বর্যে রূপায়িতও সে হতে পারে। চিন্ময়-পরিণামের বেলায়, একই সত্যের অভিমুখে বহুবিধ সাধনা ও উপলব্ধির বিচিত্র ধারা যে বিতত থাকবেই—এ-তথ্য অনস্বীকার্য। অনুভবের এই বৈচিত্র্য হতে প্রমাণ হয় যে, আমরা যে-সত্যের সম্মুখীন হয়েছি, সে-সত্য জীবন্ত—আচ্ছিন্ন বা বিকল্পিত নয়, অতএব তাকে প্রাণহীন বাঁধা গৎএর পাথুরে কাঠামোয় বন্দী করবার উপায় নাই। তর্কবুদ্ধির আড়ষ্ট কাঠিন্যের কাছে সত্যের একটিমাত্র রূপ রয়েছে—সবাই তাকে মানতে বাধ্য। তার মতে,

জগতে একটিমাত্র ভাব কি ভাবধারা সর্বজিৎ হবে, সবাই একটিমাত্র সীমিত তথ্য বা তথ্যের সমাহারকে শিরোধার্য করবে। কিন্তু এ তার অন্ধভাবে অন্যায় জুলুম—কেননা এতে শুধু জড়ত্বের সঙ্কীর্ণ সত্যের সংস্কারকে প্রাণ-মন-চেতনার সাবলীল ও বহুভঙ্গিম সত্যের 'পরে চাপানো হয়।

এই অতিদেশের ফলে আমাদের অনিষ্টও হয়েছে কম নয়। এ আমাদের চিন্তার সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতা এনেছে—এনেছে গোঁড়ামি ও পরমতাসহিষ্ণুতা। আমরা ভুলে গেছি যে দৃষ্টিভঙ্গির বহুমুখী বৈচিত্র্য না থাকলে সত্যের সমগ্র রূপটি কখনও প্রত্যক্ষগোচর হয় না, চিত্তের সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতা শুধু ভুলকে আঁকড়ে থাকবার প্রবৃত্তিকে ঝাঁজালো করে তোলে। তার ফলে দর্শনের দৃষ্টি কানা হয়ে যায় ঊষর তর্কের গোলকধাঁধায়, ধর্মের রাজ্যে চড়াও হয় অসহিষ্ণুতা গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির মতুয়ারি। চিন্ময় সত্য ভাব ও চেতনার সত্য --চিন্তার সত্য নয়। মনোরম ভাবনায় সে-সত্যের একটিমাত্র বিভাব প্রতি-ফলিত বা রূপায়িত হতে পারে, তার অনন্ত তত্ত্ব বা বিভূতির একটিকে শুধু তর্জমা করা যায় মনের ভাষায়, কিংবা তার বিচিত্র বীর্যের একটা তালিকামাত্র তৈরী করা চলে। কিন্তু সত্যকে জানতে হলে তার তত্ত্বরসে সঞ্জীবিত হয়ে তার সঙ্গে একাকার হতে হবে। এই সঞ্জীবনী তাদাত্ম্যভাবনা ছাড়া অধ্যাত্মবিদ্যায় কারও অধিকার জন্মায় না। অধ্যাত্ম অনুভবের মৌলিক তত্ত্ব সর্বত্র এক, তার চেতনাও এক—এমন-কি চিৎসত্ত্বের উদ্বোধন ও পুষ্টির বেলাতেও সে একই সামান্য রীতির অনুবর্তন করে। কিন্তু এই অনতিবর্তনীয় ঐক্যের তত্ত্বকে আশ্রয় করেই তার মধ্যে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে অনুভূতি ও চিদ্‌বিলাসের অগণিত বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা। সম্ভূতির এই অবন্ধন লীলাকে সংহতি ও সৌষম্যে ছন্দোময় করে তোলা, আবার তার যে-কোনও ধারাকে অবিচল নিষ্ঠায় চরম পর্যন্ত অনুসরণ করা—আমাদের অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির পরিস্ফুরণের এই দুটি প্রবৃত্তিই পরস্পরের পরিপূরকরূপে অপরিহার্য। তাছাড়া প্রাণ-মনকে চিন্ময় সত্যের সুরে বেঁধে তার প্রকাশের বাহনরূপে গড়ে তোলবার সাধনাতে সাধকের সংস্কারানুযায়ী বৈচিত্র্য থাকবেই—যতদিন এই ছন্দোনুবর্তন ও সীমিত প্রকাশের দায় হতে সে মুক্ত হতে না পারছে। প্রাণ ও মনের এই সংস্কারনিষ্ঠা হতেই সাধকদের মধ্যে সম্প্রদায়ভেদের উৎপত্তি এবং এইজন্যে দেখি সত্যোপলব্ধির বিবৃতিতে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু আধ্যাত্মিক এষণা ও প্রগতির স্বাতন্ত্র্য নিরঙ্কুশ হয় এই বৈচিত্র্য ও মতভেদের ফলে। সমস্ত ভেদের ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব বটে, কিন্তু তা অনায়াস হতে পারে নির্বর্ণ অনুভবের ভূমিতেই। নইলে যতক্ষণ মনের রূপায়ণ চলে, ততক্ষণ ভেদও ঘোচে না। একমাত্র উন্মনী ভূমির তুঙ্গতম চেতনাতেই চিন্ময় সত্যের চিত্রবিভূতি অদ্বৈতানুভবের বৃন্তে সম্যক্‌দর্শনের সহস্রদল সুষমায় ফুটে ওঠে।

স্বভাবতই চিন্ময় মানুষের অভিব্যক্তি বহুপর্বা হবে এবং প্রত্যেক পর্বে দেখা দেবে সত্তা চেতনা ভাবনা চারিত্র মেজাজ ও জীবনায়নেরও সংখ্যাতীত ব্যষ্টি রূপায়ণ। অন্তঃকরণের স্বভাববশে ও জীবনচর্যার তাগিদেও প্রত্যেক সাধকের ব্যক্তিগত ও যোগভূমিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে অগণিত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হবে। তাছাড়া বিশুদ্ধ স্বরূপানুভূতি ও স্বরূপাভিব্যক্তির রাজ্যও যে অদ্বয়বর্ণের ভাস্বর দীপ্তিতেই শুধু উদ্ভাসিত, তাও তো নয়। সেখানেও দেখা দিতে পারে এক প্রথমজ অদ্বৈতের অমিতবিপুল চিত্রলীলা। বহু জীবাত্মায় একই পরমাত্মা ব্যূঢ় থাকলেও প্রতি জীবের প্রকৃতি অনুসারে তার আত্ম-স্বরূপেরও চিন্ময় অভিব্যক্তি ঘটবে। একের বৃন্তে বহুর মেলা বিসৃষ্টির নিত্যবিধান। অতিমানসী চেতনার অদ্বৈতভাবনা ও অভঙ্গসমাহারের তন্ত্রীতেও বাজবে এই সহস্রদল সৌষম্যের সুর—কেননা বিশ্বের চিত্রবর্ণকে অবর্ণে বিলুপ্ত করা কখনও প্রকৃতি-স্থ চিৎপুরুষের অভিপ্রায় হতে পারে না।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ত্রিপর্বা রূপান্তর

পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ঈশানো ভূতভব্যস্য।
জ্যোতিরিবাধূমকঃ ॥
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেৎ ধৈর্যেন ॥

কঠোপনিষৎ ৪।১২,১৩; ৬।১৭

আত্মার মধ্যবিন্দুতে আছেন এক পুরুষ—ভূত-ভব্যের ঈশান তিনি অধূমক জ্যোতির মত সেই পুরুষকে...নিজের হতে পৃথক করতে হবে অনেক ধৈর্যে।

—কঠ উপনিষদ (৪।১২,১৩; ৬।১৭)

ইদয়ং কেতো হৃদ আ বি চষ্টে।

ঋগ্বেদ ১।২৪।১২

হৃদয়ের এই বোধি-চেতনা দেখেছে সে-সত্যকে।

—ঋগ্বেদ (১।২৪।১২)

অহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ **গীতা** ১০।১১

আমি তাদের আত্মভাবে স্থিত হয়ে অজ্ঞানজাত তমসাকে নষ্ট করি ভাস্বর জ্ঞানদীপ দিয়ে।

—গীতা (১০।১১)

নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষামস্মে অন্তর্নিহিতাঃ কেতব স্যুঃ।
বরুণেহ বোধ্যুরুশংস।
অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম।

ঋগ্বেদ ১।২৪।৭,১১,১৫

নীচমুখী এইসব রশ্মি, কিন্তু তাদের কন্দ রয়েছে ঊর্ধ্বে; আমাদের অন্তরে তারা হ'ক নি-হিত।..হে বরুণ, এইখানে জাগো—বিছিয়ে দাও তোমার প্রশাসন; আমরা যেন থাকি তোমার ব্রততে—নিষ্কলুষ থাকি অদিতির কাছে।

—ঋগ্বেদ (১।২৪।৭,১১,১৫)

হংসঃ শুচিষৎ ঋতজ. ঋতং বৃহৎ ॥

কঠোপনিষৎ ৫।২

হংস তিনি—শুচিতে নিষণ্ণ...ঋত হতে জাত—স্বয়ং তিনি ঋত এবং বৃহৎ।

—কঠ উপনিষদ (৫।২)

কল্পনা করতে পারি : চিন্ময়-পরিণামস্বারা প্রকৃতি শুধু পরমার্থতত্ত্বের বোধ জাগিয়ে মানুষকে আপন কবল হতে মুক্ত করতে চায়। কিংবা অনন্ত-স্বরূপের শক্তিরূপে যে-অবিদ্যার আবরণে নিজেকে সে ঢেকেছে, তার ছলনাকে অপসারিত করতে চায় জীবের চেতনা হতে। তার জন্যে মহাপ্রস্থানের পথ ধরে অমর্ত্যভূমির ঊর্ধ্বস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই একমাত্র সাধনা। অতএব

মর্ত্য-পরিণামের ফাঁদ হতে একবার যে বেরিয়ে পড়েছে, অনাবৃত্তিই তার পরমা নিয়তি।...এই যদি মহাপ্রকৃতির আকূতির চরম সীমা, তাহলে বলতে পারি এতদিনে তার কর্তব্য মোটের উপর শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং নতুন-কিছু নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাবার প্রয়োজন তার নাই। মুক্তির পথ তৈরী হয়েই আছে মানুষের জন্য, সে-পথ ধরে চলবার সামর্থ্যও অর্জিত হয়েছে, সৃষ্টির চরম লক্ষ্য সম্পর্কে কোনও অস্পষ্টতার আভাসটুকুও কোথাও নাই। এখন শুধু বাকী আছে, প্রত্যেক জীবের আপন পুষ্টিমার্গের ছকটি ঠিকমত চিনে নিয়ে আধ্যাত্মিকতার পথ ধরে সংসারের রঙ্গমঞ্চ হতে একে-একে বিদায় নেওয়া।. কিন্তু পূর্বেই বলেছি, জীবাত্মায় শুধু আত্মদীপ্তির স্ফুরণই প্রকৃতি-পরিণামের একমাত্র তাৎপর্য নয়, প্রাকৃত আধারের আমূল সম্যক্-রূপান্তরও তার আরেকটা লক্ষ্য। এই মর্ত্যের বুকেই প্রকৃতি চায় আত্মার চিদ্ঘন বিগ্রহের সার্থক আবির্ভাব ঘটাতে, অবিদ্যা হতে বিদ্যায় উত্তীর্ণ হয়ে তার প্রারব্ধ ব্রতকে উদ্যাপন করতে--আপন গুণ্ঠন মোচন করে অবারিত করতে চায় অনন্ত সন্মাত্রের নিরন্ত-আনন্দনিষ্যন্দিনী চিন্ময়ী মহাশক্তির রূপটি। স্পষ্টই তখন বুঝতে পারি, মোক্ষমার্গের আবিষ্ক্রিয়াতেই প্রকৃতির বিবর্তন ফুরিয়ে যায়নি-- এখনও সে 'ভূরি অস্পষ্ট কর্ত্বম্'—চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে কী বিপুল কর্তব্য তার পড়ে আছে। সানু হতে তুঙ্গতর সানুতে আরোহণ করতে হবে তাকে, অবন্ধ্য ক্রতুর পাখায় ভর করে দিগন্তবিথার দৃষ্টি দিয়ে তাকে মহাবৈপুল্যের নিঃসীম পাথার ছাইতে হবে—এই জড়বিশ্বেই সমিদ্ধ করতে হবে চিদাত্মার স্বপ্রতিষ্ঠার বহ্নিশিখা। এতদিনে তার পরিণামশক্তি শুধু এখানে-সেখানে দুটি-চারটি মানুষকে আত্মসচেতন করে শাশ্বতস্বরূপের সন্ধান দিয়েছে, অধ্যাত্মযোগে দিব্য-পুরুষের সঙ্গে তাদের যুক্ত করেছে, অথবা প্রতিভাসের আবরণ সরিয়ে তত্ত্বার্থের বিদ্যুৎ হেনেছে তাদের দৃষ্টিতে। এই আলোকসম্পাতের সহচারী হয়ে, কিংবা তার আদিতে কি অন্তে হয়তো দেখা দিয়েছে আধারের একটা আংশিক রূপান্তর। কিন্তু যে আমূল পূর্ণরূপান্তর অভিনবের নিশ্চিত প্রতিষ্ঠার আশ্বাস আনে, সিসৃক্ষার অ-পূর্ব সার্থকতায় এই মর্ত্য-প্রকৃতিতেই নব-সত্ত্বের চিরন্তন আবির্ভাবের আয়োজন করে—তার সিদ্ধবীর্যের আভাস কিন্তু মোক্ষমার্গের ঐকান্তিক সাধনায় ফোটেনি। এপর্যন্ত জগতে অধ্যাত্মচেতারই আবির্ভাব হয়েছে, প্রকৃতির 'ঈশানো ভব্যস্য' অতিমানস সত্ত্বের অভিব্যক্তি হতে এখনও বাকী আছে।

কারণ আর-কিছুই নয়—মর্ত্যভূমিতে চিৎতত্ত্বের নিরঙ্কুশ স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠা আজও সম্ভব হয়নি। চিৎশক্তি এতদিন মনকে দেখিয়েছে শুধু অমনীভাবের কিংবা চিন্ময় ধামে উত্তরণের পথ। মন হতে চিতের বিবেক সাধিত হয়েছে, চিদ্বাসিত হৃদয়-মনের দীপ্তিতে আধারসত্ত্বের প্রসার ঘটেছে—কিন্তু মনের

সমস্ত উপাধি ও সংস্কার হতে মুক্ত হয়ে অকুণ্ঠ ঈশনার স্ফুরদ্‌বীর্যে চিৎসত্তা এখনও নিজেকে আধারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, অন্তত তার সে-প্রয়াস এখনও পূর্ণ-সার্থক হয়নি। আমাদের সুপরিচিত সাধনসম্পত্তির বাইরে আরেকটি সাধনের আভাসমাত্র দেখা দিয়েছে, কিন্তু এখনও তার অমোঘ বীর্য অবাধে স্ফুরিত হয়নি। তাছাড়া, অনাদি অবিদ্যার পরিবেশে সে-সাধন যদি শুধু ব্যক্তিগত সাধনার একটা অপার্থিব বিভূতি হয়, যাকে ব্যক্তির কৃচ্ছ্র-তপস্যাদ্বারা পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে হবে—তাহলেও তো চলবে না। চাই পার্থিব সত্ত্বের একটা নতুন থাক—চিন্ময় সাধন যার স্বভাবের সহজ সম্পদ হবে। অবিদ্যার ভিতরে প্রতিষ্ঠিত থেকেই মন যেমন এতকাল বিদ্যার এষণায় উত্তরায়ণের পথে চলেছে, তেমনি এবার বিদ্যার ভিত্তিতে অতিমানসের প্রতিষ্ঠা হবে—যে-অতিমানস স্বভাবের প্রেরণায় উপচে উঠবে নিজেরই উত্তরজ্যোতির উদারলোকে। কিন্তু চিন্ময় মানুষ অতিমানসভূমিতে সম্যক্‌ উত্তীর্ণ হয়ে মর্ত্যপ্রকৃতিতে তার বীর্যবিভূতিকে যতক্ষণ নামিয়ে না আনছেন, ততক্ষণ এই নতুন ধারার প্রবর্তনা সম্ভব হবে না। মন ও অতিমানসের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান, তার মধ্যে সেতুবন্ধন করা চাই—যেখানে আজ মহাশূন্যতার নৈঃশব্দ্য, রুদ্ধপথ মুক্ত করে সেইখানে গড়া চাই আরোহ আর অবরোহের সোপানমালা। •তার উপায় হল প্রকৃতির ত্রিপর্বা রূপান্তরসাধনা—ইতিপূর্বেই প্রসঙ্গত যার উল্লেখ করেছি। প্রথমত চাই চৈত্য বা তৈজস রূপান্তর—যাতে আমাদের অধুনাতন সমগ্র প্রকৃতি চৈত্যসত্তার সাধনশক্তিতে গোত্রান্তরিত হবে। সেইসঙ্গে বা তাকে ভিত্তি করে আসবে চিন্ময় রূপান্তর, অর্থাৎ ঊর্ধ্বলোক হতে সমগ্র আধারে নেমে আসবে দিব্য জ্যোতি শক্তি জ্ঞান বল আনন্দ ও শুচিতার নির্বারিত প্লাবন—যার প্রবেগ সঞ্চারিত হবে দেহ-প্রাণ-মনের অণুতে-অণুতে, এমন-কি অবচেতনারও অন্ধতমিস্রায়। সবার শেষে দেখা দেবে অতিমানস রূপান্তর—যখন অতিমানসে আরূঢ় হয়ে সে-চেতনার হিরণ্যবর্তনি প্রপাতকে এই সত্ত্ব ও প্রকৃতির সমগ্র আয়তনে নামিয়ে আনা হবে।

চিন্ময় রূপান্তরের ভূমিকারূপে চাই প্রকৃতি-স্থ পুরুষ বা চৈত্যসত্তার গুণ্ঠনমোচন। আধারে এই পুরুষ প্রথম থাকেন সম্পূর্ণ আড়াল হয়ে। অথচ তিনি আছেন বলেই আমাদের ব্যষ্টি জীবসত্তা প্রকৃতির ঘূর্ণাবর্তে অটুট হয়ে টিকে আছে। প্রাকৃত আধারের সমস্ত উপাদান বিপরিণামী এবং ক্ষয়িষ্ণু, কেবল চৈত্যসত্তাই তার মধ্যে স্বরূপত অপরিণামী ও অবিনশ্বর। আমাদের আত্মবিভাবনার নিরূঢ় সকল সামর্থ্য তাঁতে নিহিত থেকেও তাঁর উপাদান নয়। আত্মবিভূতির দ্বারা তিনি অনুপহিত বলে অসম্যক্‌ বিভাবনার ন্যূনতা তাঁকে বেড়ে পায় না। বহিশ্চেতনার নিয়ন্তা হয়েও তিনি তার অপূর্ণতা ও আবিলতার, ত্রুটি ও বিচ্যুতির মলিন স্পর্শে কলঙ্কিত

নন। এই চৈত্যপুরুষ সকল সত্ত্বের অন্তর্নিহিত ভাগবত-জ্যোতির ধূমহীন শিখা—যার দীপ্তিকে আমাদের কোনও কর্ম বা অনুভবই স্তিমিত বা কলুষিত করতে পারে না। তাঁর চিন্ময় সত্ত্ব অপাপবিদ্ধ এবং জ্যোতির্ময়। তাঁর সে নিরাবরণ জ্যোতির্মহিমা তাঁকে আধারস্থ পুরুষ-প্রকৃতির মর্মসত্যের সঙ্গে অব্যবহিত অন্তরঙ্গ ও অপরোক্ষ সংবিতের নিত্যযোগে যুক্ত করেছে। সত্য-শিব-সুন্দর তাঁর স্বভাবের সগোত্র ও স্বরূপ ধাতুর নিরূঢ় বিভূতি বলে, সত্য-শিব-সুন্দরের সম্বোধি হতে কোনকালেই তিনি বিচ্যুত নন। আবার যা তাদের প্রতীপচারী কিংবা স্বভাবধর্ম হতে ভ্রষ্ট, সেই অসত্য অশিব ও অসুন্দরকেও তিনি জানেন। কিন্তু তাঁর দেহ-প্রাণ-মনরূপী বহিশ্চর সাধনাকে এরা বিক্ষুব্ধ ও বিপ্লুত করলেও, এদের কৃত অধ্যাস পরামর্শ বা বিপরিণাম হতে তিনি সম্পূর্ণ নির্মুক্ত। কারণ আধারের স্থিরসত্ত্বরূপী চৈত্যপুরুষ দেহ-প্রাণ-মনকে তাঁর যন্ত্ররূপে ব্যবহার করছেন। তাই তাদের নিমিত্ত ও পরিবেশদ্বারা পরিবৃত হয়েও তিনি তাদের থেকে বিবিক্ত এবং তাদের চাইতে বৃহৎ।

চৈত্যপুরুষ আধারে 'আঁধার ঘরের রাজা' না হয়ে প্রথম হতেই যদি সবার কাছে নিরাবরণ মহিমায় প্রকাশ থাকতেন, তাহলে আমাদের অধ্যাত্মপরিণাম এখনকার মত এত দুঃসাধ্য বিকলাঙ্গ ও আবর্তসংকুল হত না—চেতনার বাসন্ত পুষ্পোচ্ছ্বাসে মুখর থাকত জীবনের নন্দনকানন। কিন্তু চৈত্যপুরুষকে ঘিরে রয়েছে রহস্যযবনিকার দুর্মোচন স্থূলতা। তাই হৃদয়দেউলের মণিকোঠায় যে-দীপ জ্বলছে, তার এতটুকু আভাসও আমরা পাই না। অন্তরের গভীর কন্দর হতে তাঁর বাণী বাইরে ভেসে আসে, কিন্তু মন জানে না তার উৎস কোথায়। তাঁর ইসারা বাইরে ফোটবার আগেই মনোধাতুর প্রলেপে ঢেকে যায়। তাই মন তাকে নিজের বৃত্তি বলে ধরে নেয় এবং তার মর্যাদা জানে না বলে নিজের খেয়ালমত কখনও তাতে কান দেয়, কখনও-বা দেয় না। মন যখন প্রাণের উত্তাল সংবেগে অভিভূত থাকে, তখন চৈত্যপুরুষের কোনও প্রশাসন প্রকৃতির 'পরে খাটতে চায় না কিংবা তাঁর অন্তর্গূঢ় চিন্ময় ধাতু ও স্বভাবধর্মের কোনও স্ফুরণ আধারে ঘটে না। আবার মন যদি একান্তভাবে নিজের প্রবৃত্তি বুদ্ধি-বিবেচনা ও সংকল্পকে আঁকড়ে থাকে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের দরুন নিজের ধূমাঙ্কিত দীপশিখাকেই চলার পথের আলো করে, তাহলে চৈত্য-পুরুষও মানস-পরিণামের উত্তরপর্বের প্রতীক্ষায় নিজেকে প্রচ্ছন্ন এবং স্তিমিত রাখেন। কারণ চৈত্যপুরুষ হৃদয়ে আসন পেতেছেন পরিণামের প্রাকৃত ধারাকে বহন করবেন বলে। সে-পরিণামের আদিকাণ্ডে একে-একে চলতে থাকে দেহ প্রাণ ও মনের পুষ্টি—কখনও স্ব-তন্ত্র স্বভাবের নিয়মে, কখনও-বা যৌথকারবারের ঠোকাঠুকির ভিতর দিয়ে। এমনি করে বিচিত্র অনুভবের

মেলায় তাদের উপচয় ও পরিণাম ঘটে। আর দেহ-প্রাণ-মনের এই চিত্রানুভূতির সকল রস চৈত্যপুরুষ পিপ্পলাদ হয়ে সঞ্চয় করেন এবং তাকে জীর্ণ করে আমাদের প্রাকৃত সত্তার উত্তরপরিণামের আয়োজনকে পূর্ণাঙ্গ করেন। কিন্তু তাঁর এ-লীলা চেতনার বহিরঙ্গনকে মুখর না করে চলে আধারের অলক্ষ্য গহনে। প্রথম দিকে, আধারে জড়- ও প্রাণ-পরিণামের প্রাধান্য থাকতে জীবের মধ্যে আত্মবোধ জাগে না। জীবচেতনার ক্রিয়া তখনও চলে, কিন্তু তার বাহন ও ধরন হয় জড়ময় ও প্রাণময়—কিংবা মন জেগে থাকলে মনোময়। অঙ্কুরাবস্থায় থাকে যখন, কিংবা পরিণত অবস্থাতেও যতক্ষণ সে অতিমাত্রায় বহির্মুখ থাকে, ততক্ষণ চিদ্‌বৃত্তির গভীরতাকে ঠিকমত সে বুঝতে পারে না। আমরা তখন অনায়াসে নিজেকে অন্নময় প্রাণময় কি বড়জোর প্রাণ-শরীরভোক্তা মনোময় সত্ত্ব বলে ভুল করি—কিন্তু জীবাত্মার সত্তাকে একেবারেই আমলে আনি না। মৃত্যুর পরও আত্মা বলে একটা-কিছু থাকে—এর চাইতে আত্মার কোনও স্পষ্ট ধারণা আমাদের নাই। আত্মা যে কী বস্তু, আমরা তার কিছুই জানি না। কদাচিৎ আত্মসচেতনতা স্ফুরিত হলেও আত্মার বিবিক্ত সত্তার কোনও চেতনা সচরাচর আমাদের থাকে না, কিংবা আধারে তার অপরোক্ষ প্রভাবেরও কোনও পরিচয় আমরা পাই না।

পরিণামের পর্বে-পর্বে আধারের অন্তর্গূঢ় অংশগুলিকে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে ধীরে-ধীরে এবং অতি সন্তর্পণে জাগিয়ে তোলে। আমাদের দৃষ্টিকে ক্রমেই সে অন্তরাবৃত্ত করে—কিংবা অন্তরের গোপন বিভূতিকে পরিচিতির সীমায় টেনে আনতে চায় বিচিত্র ইঙ্গিত ও রূপায়ণের উপচীয়মান স্পষ্টতায়। এর মধ্যেই চৈত্যসত্তা প্রচ্ছন্ন বিগ্রহে আমাদের আধারে রূপায়িত হয়ে উঠেছে—চৈত্যপুরুষের আকারে দেখা দিয়েছে চিন্ময় জীবসত্ত্বের একটা পরিণত কায়। এই চৈত্যপুরুষ এখনও অধিচেতনার অন্তরালে কণ্ঠুকিত আছেন—আধারের সত্যকার মনোময় প্রাণময় ও ভূতসূক্ষ্মময় পুরুষের মত। কিন্তু ওই গহন হতেই চেতনার বহিঃস্তরে তিনি তাঁর নিগূঢ় অনুভাব ও ইঙ্গনা উৎক্ষিপ্ত করেন। এই উৎক্ষেপের মিশ্রপ্রবৃত্তিতে আমাদের নিত্যপরিচিত এবং আত্মরূপে কল্পিত বহিশ্চর ব্যূহসত্তার একদেশ গড়ে ওঠে। এই ব্যূহ আত্মচেতনায় অধ্যস্ত একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপায়ণমাত্র। সেখানে অবিদ্যার স্তিমিতালোকে আমরা দেহ-প্রাণ-মন হতে বিবিক্ত আত্মা বলে একটা-কিছুর অনচ্ছ আভাস অনুভব করি। তাকে শুধু প্রাকৃত আত্মভাবের একটা মনোবিকল্প বা অস্পষ্ট সহজ-প্রত্যয় ভাবতে পারি না। মনে হয়, তার অনুভাব যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে আমাদের জীবনের কর্মে এবং চারিত্রে সংক্রামিত হচ্ছে। যা-কিছু সত্য শিব ও সুন্দর, যা-কিছু সূক্ষ্ম শুচি মহৎ তারই ডাকে সাড়া দেওয়া, হৃদয়ের সচেতন আকূতি দিয়ে তাকে বরণ করা, ভাবনা ও বেদনায় আচারে ও চরিত্রে তাকে

রূপায়িত করবার জন্য প্রাণ-মনকে উন্মুখ ও উদ্যত রাখা—চৈত্যপুরুষের অন্তর্গূঢ় অনুভবের এই হল সর্বজনপরিচিত এবং সুস্পষ্ট একটা নিশানা। কিন্তু এ-ই তাঁর আবেশের একমাত্র লক্ষণ নয়। এই বৈশিষ্ট্যটুকু যার মধ্যে নাই, কিংবা এর প্রেতিতে যে সাড়া দেয় না, আমরা তাকে আত্মবান্‌ বলতে পারি না—বলি অমানুষ, হৃদয়হীন। কারণ চৈত্যপুরুষের অনুভাবেই আধারে নিগূঢ় সুসূক্ষ্ম বা সুদিব্য ভাবনার স্পষ্টতর সহজ পরিচয় আমরা পাই। এও জানি, একমাত্র এরই ঈশনায় আমাদের প্রকৃতিতে পূর্ণতাসিদ্ধির একটা সার্থক আয়োজন ধীরে-ধীরে উপচিত হবে।

কিন্তু বহিশ্চেতনায় এই চৈত্য অনুভাব খুব স্বচ্ছ হয়ে ফোটে না, কিংবা অসংকীর্ণ ও বিবিক্ত হয়েও থাকে না। তা যদি হত, তাহলে আধারের চৈত্য-বৃত্তিগুলিকে বিশেষ করে চিনে নিয়ে আমরা সজ্ঞানে ও শেষ পর্যন্ত তাদেরই অনুশাসন মেনে চলতাম। কিন্তু মাঝ থেকে চৈত্য অনুভাবের সঙ্গে জড়িয়ে যায় সূক্ষ্ম দেহ-প্রাণ-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কতগুলি সংস্কার—যারা নিজেদের ইষ্টসিদ্ধির প্রয়োজনে তাকে খাটাতে চায়। এরা তার চিদ্‌বীর্যকে কুণ্ঠিত করে—স্বপ্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্যকে করে পঙ্গু অথবা বিকারগ্রস্ত। এমন-কি তাকে স্খলিত ও দিগ্‌ভ্রান্ত করতে কিংবা নিজেদের প্রমাদ মালিন্য ও সংকীর্ণতা দ্বারা কলুষিত করতেও তারা দ্বিধা করে না। এমনি করে ব্যামিশ্র ও হৃতশক্তি হয়ে সে-অনুভাব যখন বাইরে ফোটে, তখন আধারের বহির্মুখ স্বভাব তাকে অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরে আনাড়ির মত আপন ছাঁচে ঢালতে চায়। তাতে তার ব্যামিশ্র ও পথভ্রষ্ট হবার আশঙ্কা আরও প্রবল হয় এবং সে-আশঙ্কা সত্যেও পরিণত হয় অনেকসময়। এইজন্যই দেখি, আধারে নিহিত চিৎসত্তার শুদ্ধ উপাদান ও শুদ্ধ বৃত্তি বাইরে আসতে অপপ্রয়োগের মোচড় খেয়ে আরেক চেহারায় ফুটে ওঠে—সহজ পথের মোড় বেঁকে হাজির হয় ভুলের দুয়ারে। তাইতে বহির্বৃত্ত প্রকৃতিতে চেতনার যে-রূপায়ণ দেখা দেয়, তার মধ্যে চৈত্য-সত্তার অনুভাব ও ইঙ্গনার সঙ্গে এলোমেলো হয়ে জড়িয়ে থাকে মনের নানা ভাবনা ও সংস্কার, প্রাণের উদ্ধত বাসনা ও সংবেগ এবং চিরাভ্যস্ত শরীরবৃত্তির যত ঝামেলা। শুধু কি তা-ই? দেহ-প্রাণ-মনের মধ্যে ঊর্ধ্বায়নের যে একটা শুভেচ্ছা-প্রণোদিত অথচ মূঢ় প্রচেষ্টা আছে, তাও এসে যোগ দেয় এই স্তিমিতবীর্য চৈত্য অনুভাবের সঙ্গে। একে তো মনের মধ্যে ভাবসাঙ্কর্যের অন্ত নাই—আবার তাকে ঘিরে আছে আদর্শবাদের অস্পষ্টতা, কখনও-বা তার সর্বনাশা প্রমত্ততা। তাছাড়াও আছে হৃদয়ের উত্তাল আবেগ, ফেনোচ্ছল বেদনা ভাবরস ও ভাবালুতার শীকরবর্ষণ, প্রাণপুরুষের উৎসাহমুখর উদ্যতি—আছে দেহের নাড়ীতে-নাড়ীতে সঞ্চরমাণ বিদ্যুতের রোমাঞ্চ। এইসব বিক্ষোভের সমাযোগে যে সঙ্কুল চেতনার উদ্ভব হয়, আমরা তাকেই আত্মা বলে ভুল করি—

তার ব্যামিশ্র ও পর্যাকুল বৃত্তিকে ভাবি আত্মার পরিস্পন্দ বা উন্মিষিত চৈত্য-সত্ত্বের ক্রিয়া, কিংবা প্রবুদ্ধ অন্তরের সিদ্ধবীর্য। চৈত্যসত্তা স্বয়ং কলুষ বা ব্যামিশ্রভাব হতে নির্মুক্ত—কিন্তু তার প্রবর্তিত বিভাবনার কোনও রক্ষাকবচ থাকে না বলেই আধারে এই বিভ্রাট ঘটে।

তাছাড়া চৈত্যপুরুষ প্রথম হতেই পূর্ণকল জ্যোতিঃস্বরূপে আপনাকে প্রকট করেন না। তাঁর উন্মেষ হয় কলায়-কলায়—ক্রমিক উপচয় ও রূপায়ণের মন্থর ধারায়। আধারে প্রথম তাঁর বিগ্রহ থাকে অস্পষ্ট—তারপর বহুকাল থাকে ক্ষীণবল ও অপরিপুষ্ট, অবিশুদ্ধ না হলেও অপূর্ণ। কেননা তাঁর আত্মরূপায়ণের সংবেগ নির্ভর করে অধ্যাত্মবীর্যের 'পরে—যাকে অবিদ্যা ও অচিতির বাধা ঠেলে বহিশ্চেতনায় আত্মস্ফুরণের অল্পাধিক সার্থক অধিকার অর্জন করতে হয়। আধারে চৈত্যপুরুষের আবির্ভাব প্রকৃতিতেও চিদ্-উন্মেষের সূচনা আনে। সে-উন্মেষ শীর্ণ ও বিকল হলে চৈত্যসত্ত্বও খর্ব ও নির্বল হয়। আমাদের স্তিমিত চেতনার দৈন্যে চৈত্যপুরুষও যেন তাঁর অন্তর্গূঢ় তত্ত্বভাব হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েন—সত্তার গভীরে নিহিত উৎসমূলের সঙ্গে তাঁর যোগধারা যেন বিচ্ছিন্ন হয়। কারণ এখনও দুয়ের মধ্যে ভাল করে পথ কাটা হয়নি, চলার পথে এখনও অতর্কিত বাধা আসে, যোগযোগের সূত্রটি এখনও ত্রুটিত বা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে অন্য-কোথাকার বিজাতীয় প্রতিবেদনের আবর্জনায়। এছাড়া অধিগত বিত্তের অনুভাবকে বহিঃকরণের 'পরে সংক্রামিত করবার সামর্থ্যও তাঁর কুণ্ঠিত। এ-দৈন্যকে তাঁর পূরণ করতে হয় বহিশ্চর করণশক্তির দুয়ারে ভিক্ষা করে, তাঁর প্রকাশ ও প্রবৃত্তির প্রেতিকে দাঁড় করাতে হয় বহিঃকরণের আহৃত তথ্যের 'পরে—শুধু চৈত্যসত্তার প্রমাদহীন অপরোক্ষ অনুভবের 'পরেই নয়। এইজন্যই চৈত্যসত্তার সত্যদীপ্তি স্তিমিত কি বিকৃত হয়ে মনের মধ্যে যখন একটা ভাব বা ধারণামাত্রে পর্যবসিত হয়, কিংবা তার বেদনা হৃদয়ে একটা অনিশ্চিত আবেগ বা ভাবালুতার রূপ ধরে, তার সত্যসঙ্কল্প প্রাণপুরুষের অন্ধ উৎসাহ বা উত্তাল উত্তেজনার চাঞ্চল্যে উদ্বেল হয়ে ওঠে—তখন চৈত্যপুরুষের তাকে বাধা দেবার শক্তি থাকে না। এমন-কি অভাবের তাড়নায় এইসব মেকী মালকে খাঁটি বলে তাঁর ঘরে তুলতে হয় এবং তাদের দিয়েই খুঁজতে হয় জীবনসাধনার সার্থকতা। এদের ঠেলে ফেলতেও তিনি পারেননা, কেননা হৃদয়-প্রাণ-মনের সমস্ত ভাবনা বেদনা প্রবেগ ও উদ্দীপনাকে জ্যোতির্ময় দিব্যচেতনার দিকে প্রচোদিত করা তাঁর অন্যতম ব্রত। কিন্তু এ-ব্রতের সিদ্ধি প্রথম আসে ব্যামিশ্র বিকল ও মন্থর হয়ে। চৈত্যপুরুষের মধ্যে যতই সামর্থ্যের উপচয় ঘটে, ততই অন্তর্গূঢ় চৈত্যসত্তার সঙ্গে তাঁর অধ্যাত্মযোগ নিবিড় হয় এবং বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের পথও হয় প্রশস্ত। তখন সে-যোগবীর্যকে বিশুদ্ধ আকারে ও তীব্রসংবেগে হৃদয়ে-

প্রাণে-মনে সঞ্চারিত করা অসম্ভব হয় না, কেননা প্রভুশক্তির উত্তরোত্তর উপচয়ে ব্যামিশ্রভাবের আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার শক্তিও তাঁর জন্মে। এমনি করে চৈত্যপুরুষের প্রভাব সমগ্র প্রকৃতিতে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।...কিন্তু শুধু পরিণামশক্তির স্বাভাবিক কৃচ্ছ্রসাধনার 'পরে নির্ভর করে চললে, চৈত্যপুরুষের এই বিবর্তন হবে মন্থর ও বিলম্বিত। তাই আত্মসচেতন মানুষ যখন এই গুহাহিত পুরুষকে তার জীবনযজ্ঞের পুরোধা করবার দুর্নিবার প্রেতি অনুভব করে, কেবল তখনই প্রকৃতির পরিণামে দেখা দেয় একটা অভিনব চিন্ময় প্রবেগ --যা তার তৈজস রূপান্তরকে আসন্নতর করে।

এই মন্থর পরিণাম দ্রুততর হয়, মন যখন আধারের গভীরে এক দেহোত্তর মৃত্যুঞ্জয় সত্তার সুস্পষ্ট ও অবাধিত অনুভব পায় এবং তার স্বরূপ জানবার আকূতিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু এই জিজ্ঞাসার পথে প্রথম বাধা আধারের বিচিত্র উপাদানের সাঙ্কর্য। চিত্তের বহু ব্যাকৃতিকেই চৈত্যসত্ত্ব বলে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা আমাদের পদে-পদে। প্রাচীন যুগের গ্রীক ও অন্যান্যজাতির পরলোক-কল্পনার যে-বিবৃতি পাই, তাতে স্পষ্টই দেখি, আত্মসত্ত্বের একটা অবচেতন বিগ্রহ, অবতমসাচ্ছন্ন একটা সংস্কার-কায় কিংবা ছায়াপুরুষ কি প্রেতপুরুষকেই ভুল করা হয়েছে জীবাত্মা বলে। এই প্রেতকায়কে ওদেশে বলে স্পিরিট বা চিৎসত্ত্ব; কিন্তু কথাটা সত্য নয়। তথাকথিত স্পিরিট অধিকাংশক্ষেত্রে প্রাণশক্তির একটা বিসৃষ্টি মাত্র। তার মধ্যে মৃতব্যক্তির যা-কিছু বৈশিষ্ট্য, তার জীবিতকালের যত মুদ্রাদোষ, তাদেরই পুনরাবৃত্তি চলে। কখনও-বা মৃত্যুর পরে সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় করে মনের খোলাটার যে-অনুবৃত্তি চলে, তাকেই বলা হয় স্পিরিট। বস্তুত দেহ ছাড়বার পরও প্রাণময় সত্ত্বের একটা পুরঃক্ষেপ যে কিছুকাল ধরে স্থায়ী হয়, তথাকথিত স্পিরিটের তত্ত্ব তাকে কখনও ছাপিয়ে ওঠে না। মৃত্যুর পর জীবসত্ত্বের পরিত্যক্ত কোশসমূহের যে-অবশেষ বা কল্পছবি, তার সংস্পর্শে এসেই মরণোত্তর স্থিতি সম্পর্কে মানুষের বুদ্ধি এমনি করে ঘুলিয়ে যায়। তাছাড়া ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে—আমরা আধারের অধিচেতন ভাগ ও তার অধিষ্ঠাতা পুরুষের রূপ ও বিভূতির কোনও খবর রাখি না বলে। এই অজ্ঞতার দরুন অন্তর্মন বা অন্তঃপ্রাণের বিশেষ-কোনও বিভূতিকে আমরা চৈত্যসত্ত্ব বলে ভুল করি। পরমার্থ-সৎ যেমন এক হয়েও বহু, আমরাও ঠিক তা-ই। আমাদের চিৎপুরুষ এক, কিন্তু প্রকৃতির প্রতি ব্যাকৃতিতে তিনি প্রতিরূপ হয়ে ফুটছেন। আমাদের আধারের প্রতি পর্বে চিৎশক্তির বিশেষ-একটা আবেশ নিয়ে পুরুষের অধিষ্ঠান। তাইতে অন্তরাবৃত্ত হয়ে সত্তার গভীরে অনুভব করি মন-আত্মা, প্রাণ-আত্মা ও দেহ-আত্মার পরম্পরিত স্থিতি। অন্তরে এক মনোময় পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন, যাঁর বিভূতির একাংশ ফোটে বহিশ্চর মনের নানা প্রত্যক্ষ ভাবনা ও

প্রবৃত্তির আকারে। তেমনি প্রাণময় পুরুষের খানিকটা প্রকাশ পায় প্রাণপ্রকৃতির নানা বাসনা বেদনা সংবিৎ সংবেগ ও বহিশ্চর জীবনযোনি-প্রযত্নে। আবার অন্নময় পুরুষ তাঁর আপন বিভূতিকে অংশত প্রকট করেন দৈহ্যপ্রকৃতির নানা অভ্যাস সহজবৃত্তি ও ব্যবস্থিত-প্রবৃত্তির ভিতর দিয়ে। আত্মপুরুষের এই বিভূতিপুরুষেরা বস্তুত চিৎসত্তারই লীলায়ন। অতএব আধারে সাময়িক ক্ষুণ্ণ-প্রকাশদ্বারা তাঁরা সীমিত হন না, কেননা এ-রূপায়ণ তাঁদের পূর্ণবৈভবের আংশিক স্ফুরণ মাত্র। অথচ তাকে আশ্রয় করে আমাদের মধ্যে একটা মনোময় প্রাণময় বা অন্নময় ব্যক্তিসত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে, যা চৈত্যপুরুষেরই মত কলায়-কলায় বর্ধিত হয়। প্রত্যেকটি সত্ত্বের প্রকৃতি স্বতন্ত্র—সমগ্র আধারের 'পরে তার প্রভাব ও ক্রিয়াও স্বতন্ত্র। কিন্তু তাদের ক্রিয়া ও প্রভাব আমাদের বহিশ্চেতনায় ব্যামিশ্র হয়ে ভেসে উঠে সৃষ্টি করে একটা সত্ত্বাভাসের পাঁচমিশালী পিন্ড, যার মধ্যে সব-কিছুরই ভাগ থাকে। এই বহির্বৃত্ত সত্ত্বাভাস একদিকে নিত্যানুবৃত্ত হলেও, আরেকদিকে এই জীবনেরই সীমিত প্রয়োজনের খাতিরে সে নিত্যপরিণামী ও প্রবহমান।

কিন্তু এই পিন্ডসত্ত্বের এমনি গড়ন যে তার মধ্যে একটা সুষম ও একরস সমগ্রভাবনার স্থান হয় না। তার পাঁচমিশালী উপাদানের জন্যই আমাদের আধারের বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে অবিশ্রাম এত কোলাহল আর ঠোকাঠুকি। আধারের সমস্ত বৃত্তিগুলিকে সংযমিত করে একসুরে বেঁধে নেবার ভার পড়েছে প্রাকৃত বুদ্ধি ও সঙ্কল্পের 'পরে। কিন্তু তাদের হট্টগোল ও রেষারেষিকে থামিয়ে একটা চলনসই শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা আনতেও তারা হিমসিম খেয়ে যায়। তাই আমরা সাধারণত প্রকৃতির তাড়নায় বা তার প্রবাহে ভেসে চলি। প্রকৃতির যখন যে-খেয়াল চড়াও হয়ে ভাবনা আর কর্মের যন্ত্রগুলোকে দখল করে, তখন তার হুকুমটাই বাধ্য হয়ে আমাদের মানতে হয়। এমন-কি আমরা যাকে সুচিন্তিত সঙ্কল্প মনে করি, আসলে তাও হয়তো প্রকৃতির একটা খেয়ালখুশির খেলা। প্রকৃতির অরাজক রাজ্যে শৃঙ্খলা এনে ভাবনা বেদনা সংবেগ ও সাধনাকে যে যুক্তিবুদ্ধি ও স্থিরসঙ্কল্পের দৌলতে আমরা গুছিয়ে তুলি তার মধ্যেই-বা পূর্ণতা ও চৌকস-দৃষ্টির পরিচয় কোথায় ? পশুর জগতে প্রকৃতির নিজস্ব একটা প্রাণময় ও মনোময় বোধির লীলা চলে। অভ্যাস ও সহজপ্রবৃত্তির শাসনে পশু যন্ত্রের মত প্রকৃতিকল্পিত ব্যবস্থার অনুবর্তন করে, সুতরাং চিত্তপরিণামের অনিয়ততা তাকে পীড়িত করে না। কিন্তু মানুষ আত্মসচেতন, তাই পশুর মত প্রকৃতির যন্ত্র হয়ে চলতে গেলে মনুষ্যত্বের দাবিকে তার ছাড়তে হয়। তার আধার যে সহজাত বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির একটা কুরুক্ষেত্র হবে এবং তার 'পরে প্রকৃতির যান্ত্রিক বিধানের শাসন চলবে—এ-জুলুম তার সইবে না। মানুষের মন সচেতন। অতএব আধারের বহিরঙ্গনে বিচিত্র বৃত্তি ও

উপাদানের যে জটলা আর হানাহানি, তাকে শাসনে আনবার একটা স্বতঃপ্রণোদিত চেষ্টা সে করবেই। হয়তো গোড়ার দিকে সে-চেষ্টা অকিঞ্চিৎকর হবে, কিন্তু তবু এ-কোলাহলের মধ্যে সৌষম্যের মূর্ছনাকে ক্রমেই যে সে স্পষ্ট করতে পারবে —এ আশা তার আছে।...এমনি করে প্রথম সে সৃষ্টি করে—যাকে বলতে পারি ছন্দোবন্ধ একটা হট্টগোল। হয়তো সে ভাবে, ইচ্ছা আর মনের জোরেই নিজেকে সে চালিয়ে নিচ্ছে, যদিও সত্য বলতে মনের রাস পুরাপুরি তার হাতে নাই। বস্তুত মানুষের অন্তররাজ্য জুড়ে আছে চিরাভ্যস্ত বিচিত্র প্রবৃত্তির একটা সঙ্কুল সঞ্চয় শুধু নয়। তার মধ্যে যখন-তখন উৎক্ষিপ্ত হয় দেহ ও প্রাণের নতুন প্রেতি ও সংস্কার—যারা সবসময় বশ্য নয়, প্রত্যাশিতও নয়। আবার অসংলগ্ন ও বেসুরা চিত্তবৃত্তির ঝাঁক এসে তার যুক্তি ও সংকল্পের 'পরে হুকুম চালায়—তার আত্মগঠন স্বভাবের পুষ্টি ও জীবনসাধনার ব্যবস্থায় নিয়ন্তার আসন দখল করে। মানুষ স্বরূপত অদ্বিতীয় পুরুষ হয়েও আত্মবিভাবনার বৈচিত্র্যে সে চিত্রপুরুষ। এই চিত্রপুরুষের বৈভবকে অন্তর-পুরুষের শাসনে না আনলে তার স্বারাজ্যসিদ্ধি অসম্ভব। কিন্তু শুধু বহিশ্চর মনের সংকল্প ও যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে এ-সাধনা সম্যক সিদ্ধ হয় না। তার জন্যে অন্তরের গভীরে ডুবে আবিষ্কার করতে হবে, মানুষের সমস্ত আত্ম-বিভাবনা ও কর্মের আদিতে আছে কোন্ 'হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' পুরুষের সর্বজয়া প্রবর্তনা। প্রকৃতপক্ষে চৈত্যপুরুষই মানুষের আত্মপ্রকৃতির হৃৎশয় নিয়ন্তা। কিন্তু বাইরে সে-নিয়ন্ত্রণের ভার হয়তো থাকে বিভূতিপুরুষদের কারও হাতে—সুতরাং তাদের কাউকে অন্তরতম আত্মস্বরূপ বলে ভুল করা আমাদের পক্ষে বিচিত্র নয়।

মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বের পরম্পরীণ পরিণামের মূলে আছে এমনিতর বিভিন্ন প্রতিভূ-আত্মার প্রশাসন—পূর্বেই একথার উল্লেখ করেছি। এইবার প্রকৃতির 'পরে অন্তর্যামীর প্রশাসনের দিক দিয়ে ব্যাপারটাকে বিচার করলে মন্দ হয় না।...কোনও-কোনও মানুষের মধ্যে অন্নময়-পুরুষই তার চিত্ত সংকল্প ও প্রবৃত্তির নিয়ন্তা। এদের আমরা বলি দেহাত্মবাদী। অনুক্ষণ এরা শুধু দেহের স্বাচ্ছন্দ্য আর তার চিরাভ্যস্ত প্রয়োজন ও প্রবৃত্তির তাগিদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। দেহ-প্রাণ-মনের গতানুগতিকতা ছাড়িয়ে তাদের দৃষ্টি কখনও দূরে যায় না, সুতরাং আধারের আর-সমস্ত উন্মুখীন বৃত্তি ও সম্ভাব্যতাকে তারা ওই সঙ্কীর্ণ চৌহদ্দিটুকুর মধ্যে ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু দেহাত্মবাদীরও অন্তরে ছাইচাপা সোনা আছে। তাই নরাকার পশুর মত শুধু জন্ম-মরণ আর প্রজনন নিয়ে, শুধু ইতর বাসনা ও প্রবৃত্তির তৃপ্তি খুঁজে চিরকাল সে দেহ আর প্রাণের অন্ধকারায় বন্দী থাকতে পারে না। অবশ্য তার স্বভাবের ঝোঁক ওইদিকেই। কিন্তু তবু তার 'পরে এসে পড়ে ওপারের অতি ক্ষীণ রশ্মিরেখা,

যার ইশারায় উত্তরায়ণের পথে এগিয়ে যাওয়া তার অসম্ভব নয়। ভূতসূক্ষ্মের অধিষ্ঠাতা অন্নময়-পুরুষের প্রেরণা পেলে, তার কল্পনায় এই দৈহ্য জীবনেরই সুন্দর ও নিখুঁত একটা সূক্ষ্মতর আদর্শ জাগতে পারে। তখন নিজের কি গোষ্ঠীর মধ্যে তাকে মূর্ত করবার সাধনায় সে মেতে উঠতেও পারে।...কারও-কারও চিত্তে সংকল্পে ও প্রবৃত্তিতে প্রাণময়-পুরুষের প্রশাসন প্রবল। তারা প্রাণাত্মবাদী। তারা চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মবিস্ফারণ ও প্রাণের সম্প্রসারণ। জীবনে তাদের চাই দুর্দম মনোবেগ, উচ্চাশা, প্রবৃত্তি ও বাসনার তৃপ্তি এবং অহমিকার চরিতার্থতা—চাই ঈশনা শক্তি উত্তেজনা ও যুযুৎসার মত্ততা, অন্তরে-বাইরে দুঃসাহসের পথে চাই দুর্বার অভিযান। উত্তাল প্রাণময় অহন্তার পুষ্টি ও প্রচারের কাছে সব-কিছুকে তারা বলি দিতে পারে। তবু তাদের মধ্যে মনোময় বা চিন্ময় ধর্মের অপরিণত অথচ উপচীয়মান একটা আভাস উঁকিঝুঁকি দেয়, যদিও প্রাণশক্তি ও প্রাণাত্মভাবনার উৎকর্ষকে তা ছাপিয়ে উঠতে পারে না। দেহাত্মবাদী হাজার হলেও মাটির জীব মাটির বুকে থিতিয়ে গিয়ে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা তার স্বভাব। কিন্তু প্রাণাত্মবাদী তার চাইতে চঞ্চল বলদৃপ্ত ও কর্মমুখর। তার মধ্যে আছে ঝঞ্ঝার বন্ধহারা প্রমত্ততা, যা এক-একসময় কোনও শাসনই মানতে চায় না। প্রাণাত্মবাদী মরুৎতত্ত্বের জীব—ক্ষিতিতত্ত্বের নয়। তাই তার মধ্যে স্থিতির চাইতে গতিই প্রবল এবং স্ফুরত্তা ও সিসৃক্ষা তার স্বভাবধর্ম। দুর্ধর্ষ প্রাণোচ্ছল চিত্ত ও সংকল্প স্ফুরন্ত প্রাণশক্তিকে হাতের মুঠোয় আনতে পারে বটে, কিন্তু তার জিগীষার সাধন হয় হঠকারিতা এবং বলাৎকার—সমন্বয় ও সৌষম্য নয়। বীর্যশালী প্রাণাত্মবাদী পুরুষের চিত্ত ও সংকল্প যদি যুক্তি-বুদ্ধির অকুণ্ঠ সমর্থন ও আনুকূল্য পায়, তাহলে গড়ে ওঠে অনিরুদ্ধ প্রাণোচ্ছলতার উৎকৃষ্ট একটা নিদর্শন। অল্পাধিক ভারসাম্য থাকলেও সে-আধারে তখন দেখা দেয় শক্তি ও সিদ্ধির একটা অধৃষ্য সংবেগ—যা স্বভাব ও পরিবেশকে অবষ্টব্ধ করে জীবনের কুরুক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার বিজয়িনী মূর্তিতে ফুটে ওঠে। উৎসর্পিণী প্রকৃতির সম্ভাবিত সৌষম্যসিদ্ধির এই হল দ্বিতীয় ধাপ।

পরিণামের ধারায় আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে পৌঁছই, মনোময়-পুরুষের অধিকারে। সেখানে দেখা দেয় মনোময় মানুষ। আর-সবাই যেমন দেহ-বা প্রাণ-রাজ্যের অধিবাসী, এ তেমনি বিশেষ করে মনোরাজ্যের অধিবাসী। মনোময় মানুষ চায় আধারের সবখানি মানসী সিদ্ধির ছটায় দীপ্ত করতে। মনের আদর্শ রুচি ভাব বা আকূতির তর্পণই তার জীবনব্রত। এ-সাধনা কঠিন বটে, কিন্তু সিদ্ধ হলে তার পরিণামও হয় অমোঘবীর্য। তাই মনের সাধনায় আত্মপ্রকৃতির মধ্যে ছন্দসুষমা আনা একদিকে যেমন কঠিন, আরেকদিকে তেমনি সহজও। সহজ এইজন্যে যে, মনের সংকল্পশক্তিকে একবার আয়ত্তে

আনলে, বুদ্ধি এবং যুক্তির জোরে দেহ আর প্রাণকেও সে আপন দলে ভিড়িয়ে নিতে পারে। তখন দেহ আর প্রাণের ঔদ্ধত্যকে শাসনে রাখা কিংবা তাদের দাবিকে খর্ব কি অবদমিত করা তার পক্ষে কঠিন হয় না। দেহ-প্রাণকে এমনভাবে গায়ের জোরে মনের অনুকূল সাধনে রূপান্তরিত করে, প্রয়োজন হলে তাদের শক্তিকে এতখানি দাবিয়ে রাখা যায় যে, তাদের দ্বারা মনের রাজ্যে শান্তিভঙ্গের কোনও আশঙ্কা থাকে না কিংবা মনকে তারা ভাব বা আদর্শের উচ্চমঞ্চ হতে টেনে নামাতে পারে না। কিন্তু এ-সাধনা আবার কঠিন এইজন্যে যে, দেহ আর প্রাণের শক্তি মনঃশক্তির অগ্রজা, অতএব একটুখানি শক্তিসঞ্চয় করলেই শাস্তা মনকে তারা এমনি চেপে ধরতে পারে যে তাদের ঠেকিয়ে রাখবার তার আর-কোনও উপায় থাকে না। মানুষ মনোময় জীব, অতএব মনই হবে তার 'প্রাণ-শরীর-নেতা'। কিন্তু মন এমনই নেতা যে, তার দলই তাকে চালিয়ে নেয় বেশির ভাগ—এমন-কি এক-একসময় দলের ইচ্ছা ছাড়া তার স্বতন্ত্র কোনও ইচ্ছাও থাকে না। বীর্য থাকতেও মন যেন অচিতির আর অব-চেতনার সামনে নিবীর্য হয়ে পড়ে। তার স্বচ্ছতাকে আবিল করে তারা তাকে ভাসিয়ে নেয় সহজবৃত্তি ও অন্ধসংবেগের স্রোতের টানে। দৃষ্টির স্বচ্ছতাসত্ত্বেও মুগ্ধহৃদয় ও অন্ধপ্রাণের প্ররোচনায় নির্বোধের মত সে সায় দেয় অজ্ঞান ও প্রমাদের, কুকর্ম ও কুচিন্তার কারসাজিতে, কিংবা নিরুপায় হয়ে চেয়ে থাকে—প্রকৃতি যখন তাকে জানিয়েই অনর্থ অন্যায় কি সংকটের পথে পা বাড়ায়। মনের মধ্যে স্বচ্ছ ও অকুণ্ঠ ঈশনার বীর্য থাকলেও, আধারে মানস সৌষম্যের ছন্দই সে অল্পাধিক ফুটিয়ে তুলতে পারে—কিন্তু সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতিকে বৃহৎসামের অখণ্ড রাগিণীতে ঝঙ্কৃত করতে পারে না। তাছাড়া অপরা প্রকৃতির প্রশাসনজনিত এই সৌষম্যের ফলও অনিশ্চিত। কেননা এতে প্রকৃতির একটা দিক প্রবল হয়ে সার্থকতার পথ খুঁজে পায়, কিন্তু সেইসঙ্গে আর-সবদিক প্রবলতর শক্তির চাপে কানা হয়ে থাকে। সুতরাং এ শুধু চলতি-পথের পাথেয়, যাত্রাশেষের সিদ্ধি নয়। তাই অধিকাংশ মানুষে দেখি, প্রকৃতির একটা দিক কখনও একেশ্বর হয়ে আধারে যে আংশিক সৌষম্য এনেছে, তা নয়। বরং সে নিজেকে ফাঁপিয়ে তুলে আধারের আর-সর্বত্র সৃষ্টি করেছে অব্যবস্থিত ব্যক্তিসত্ত্বের একটা দোটানা—পাকা-আমির সঙ্গে কাঁচা-আমির ভেজাল দিয়ে। কখনও-বা কেন্দ্রশক্তির শাসনের অভাবে কিংবা পূর্বসিদ্ধ অংশত-সাম্যের বিলোড়নে আধারের ভারকেন্দ্রকে বিচলিত করে অরাজকতাও এনেছে। জীবনের কেন্দ্রবিন্দুটি আবিষ্কার করে ঋত-সৌষম্যের অন্তত আদ্যচ্ছন্দটি খুঁজে না-পাওয়া পর্যন্ত এমনিতর অব্যবস্থা চলবেই। বস্তুত চৈত্যপুরুষই আধারের কেন্দ্রবিন্দু—অথচ তিনি আছেন যবনিকার অন্তরালে। অধিকাংশ মানুষে তিনি শুধু অন্তর্গূঢ় সাক্ষী মাত্র। অথবা তিনি যেন সাক্ষীগোপাল রাজা—

তাঁর হয়ে মন্ত্রীরাই রাজ্যের কর্ণধার। রাজ্যের সমস্ত ভার তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তাদের হাতে, বিনা প্রতিবাদে তাদের মতে সায় দেওয়া ছাড়া তাঁর আর-কোনও কাজ নাই। মাঝে-মাঝে নিজের একটা মত ব্যক্ত করলেও মন্ত্রীরা যে-কোনও মুহূর্তে তাকে ঠেলে যা-খুশি-তাই করতে পারে। চৈত্যসত্তার পুরঃক্ষিপ্ত জীবসত্ত্বে যতক্ষণ উপযুক্ত সামর্থ্যের অভাব, ততক্ষণ অন্তবরাজ্যে এই যথেচ্ছাচাব চলে। কিন্তু জীবসত্ত্ব স্বপ্রতিষ্ঠ হ'লে সে হয় অন্তর্গূঢ় চৈত্যসত্তার যোগ্য বাহন। চৈত্যপুরুষ তখন পুরোধা প্রকৃতিকে আপন শাসনে আনেন। আঁধার ঘর হতে বেরিয়ে রাজা যখন নিজের হাতে রাজ্যের ভার নেন, তখনই আমাদের আধারে এবং জীবনে ঋতচ্ছন্দ সৌষম্যের নির্মুক্ত আবির্ভাব হয়।

জীবাত্মার এমনিতর পরিপূর্ণ অভ্যুদয়ের প্রথম পর্ব হ'ল বহিশ্চেতনাতেও চিন্ময় সত্যের অপরোক্ষ সন্নিকর্ষ। জীবাত্মা স্বরূপত চিন্ময় বলে অপরা প্রকৃতিতেও সে উত্তরজ্যোতির দ্যুতি খোঁজে। সে-জ্যোতির এতটুকু আভাস যেখানে, তারই দিকে আমাদের আধারের চিন্ময়ী বৃত্তি ঝুঁকে পড়ে। চিন্ময় তত্ত্বকে জীবাত্মা প্রথম খোঁজে সত্য শিব ও সুন্দরের মধ্যে—জগতে যা-কিছু সূক্ষ্ম শুচি উত্তুঙ্গ ও মহৎ, তার আয়োজনে। এমনি করে তত্ত্ববস্তুর বাহ্য-বিভূতির ভিতর দিয়ে সত্যের ছোঁয়াচ পেলে আত্মপ্রকৃতির খানিকটা শোধন ও পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু তাব মর্মস্থল আলোড়িত হয়ে সমগ্র এবং আমূল রূপান্তর সাধিত হয় না। তার জন্যে চাই তত্ত্ববস্তুর অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার,-কেননা তৎস্বরূপের স্পর্শ ছাড়া সত্তার মর্মমূলে বিদ্যুতের শিহরন কে আনবে, সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কে জাগাবে প্রকৃতিতে অভিনব রূপান্তরের আকুল বেদন? মনের কল্পকৃতি হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস বা আত্মশক্তির প্রক্ষোভ—এ-সবারই একটা প্রয়োজন ও মূল্য আছে। সত্য শিব ও সুন্দর পরমার্থসত্যেরই অনন্তবীর্যের আদ্যবিভূতি—এমন-কি তাদের যে-রূপায়ণকে মনের চোখে দেখি, হৃদয়-দিয়ে অনুভব করি কি জীবনে মূর্ত করে তুলি, তারাও রচে জীব-সত্ত্বের উদয়নের সোপানমালা। কিন্তু তারা যে-তৎস্বরূপেব বিভূতি, শুধু তাব তটস্থ অনুভবে নয়—সমস্ত বিভূতির মর্মমূলে তার চিন্ময় তাদাত্ম্য-ভাবনার অপরোক্ষ অনুভবেই যে আমাদের হৃদয়ে তাদের সত্যস্বরূপ ধরা পড়বে, একথা ভুললে তো চলবে না।

জীবাত্মা এই অপরোক্ষ অনুভবের প্রয়াস মুখ্যত করতে পারে চিত্তের মননবৃত্তিব মধ্যস্থতায়। অর্থাৎ বুদ্ধি ও অন্তঃপ্রজ্ঞ বোধিচিত্তের 'পরে অধ্যাত্মচেতনার একটা ঝলক পড়লে ওইদিকে সে তাদের মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে। মননধর্মী চিত্তের শেষ ঝোঁক অব্যক্তের দিকে। এষণার চরমে সে এক চিন্ময় সদ্‌বস্তু বা নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বভাবের আভাস পায়—বিশ্বের বিচিত্র

বিভূতিতে নিজেকে ব্যক্ত করেও যা সমস্ত বিসৃষ্টি বা রূপায়ণের অতীত। সেইসঙ্গে তার মধ্যে স্ফুরিত হয় এক অলখদ্যুতির অন্তরঙ্গ ব্যঞ্জনা—এক পরমসত্য পরমশিব পরমসুন্দর পরমনিরঞ্জন পরমানন্দের প্রভাস। ক্রমেই চেতনায় তার স্পর্শ নিবিড় হয়, তার অধরা-অছোঁয়ার মায়া গাঢ় হয়ে ওঠে চিন্ময় গোচরতার উপচীয়মান আশ্বাসে, আধারের মর্মমূলে অনুবিদ্ধ হয় সেই শাশ্বত আনন্ত্যের সান্দ্র সম্প্রয়োগ—যা এই ব্যাকৃত আনন্ত্যের লীলায় উপচে উঠেও ফুরিয়ে যায়নি। এই অপুরুষবিধ অব্যক্তের একটা নিবিড় প্রৈষা আছে—যা মনের সবখানিকে নিজের ছাঁচে গড়তে চায়। সেইসঙ্গে বিসৃষ্টির লীলাবৈচিত্র্যেও দিনে-দিনে স্পষ্ট হয় ওই অব্যাকৃতেরই নিগূঢ় ঋতের পরিচয়। মন প্রথম হয় মুনির মন—মননের তুঙ্গশৃঙ্গে যাঁর বিহার। তারপর ফোটে অধ্যাত্মযোগীর চিত্ত—নির্বর্ণ মননের রাজ্য ছাড়িয়ে যিনি পৌঁছেছেন অপরোক্ষ অনুভবের ঊষালোকে। তখন মন হয় শুভ্র শান্ত বৃহৎ ও নৈর্ব্যক্তিক—প্রাণেও সঞ্চারিত হয় এই শান্তির রসায়ন। কিন্তু প্রকৃতির পূর্ণ রূপান্তর তাতেও সিদ্ধ হয় না, কেননা ক্রমেই এ-মনোনিবৃত্তি ঝুঁকে পড়ে অন্তরে অচলস্থিতি ও বাইরে উপশমের দিকে। প্রপঞ্চোপশমের নিরঞ্জন শুভ্রতা তখন নবায়মান প্রাণোচ্ছ্বাসের এষণা হতে পরাঙ্মুখ হয়। তাই প্রকৃতিতে চিদ্‌বীর্যকে আহিত করে তার পূর্ণ রূপান্তরসাধনের প্রবৃত্তিও তার থাকে না।

মননের সহায়ে আরও এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেও উপশমের এই আবেশ মানুষের কাটতে চায় না। কেননা চিদাবিষ্ট মনের স্বাভাবিক গতি ঊর্ধ্বমুখী হলেও, নিজের এলাকা ছাড়িয়ে যেতেই তার রূপের সংস্কার যখন খসে পড়ে, তখন অরূপের অলক্ষণ অব্যক্তের অতলে নিঃশব্দে সে তলিয়ে যায়। তার চেতনায় তখন ফোটে কূটস্থ আত্মা ও শুদ্ধ চিন্মাত্রের অচল প্রতিষ্ঠা, অনুপহিত সন্মাত্রের নির্বর্ণ নিরঞ্জন ব্যঞ্জনা, নীরূপ অনন্ত ও নিরভিধান নির্বিশেষের নিঃসঙ্গ মহিমা। প্রথম হতেই নাম-রূপের সকল দ্বন্দ্ব, সদসৎ শুভাশুভ বা সুন্দর-অসুন্দরের সকল সংস্কার উৎখাত করে সোজাসুজি দ্বন্দ্বাতীত সেই তৎস্বরূপের দিকে এগোনো চলে—যিনি শাশ্বত অদ্বৈত আনন্ত্যের পরম বিজ্ঞান, যাঁর অনির্বচনীয় অনুত্তরতায় হারিয়ে যায় চিদাত্মস্বরূপের চরম ও পরম মানসপ্রত্যয়। তার ফলে চিদাবেশে চেতনা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু প্রাণ তলিয়ে যায় নিঃসাড়তায়, দেহরতির সকল কোলাহল স্তব্ধ হয়, জীবাত্মা অবগাহন করে অব্যাকৃত প্রশান্তির চিন্ময় নৈঃশব্দ্যে। কিন্তু এই মানসী সিদ্ধিতেও আধারের সম্যক রূপান্তর সিদ্ধ হয় না। এতে শুধু তৈজস রূপান্তরের ভূমিতে দেখা দেয় অধ্যাত্মচেতনার তুঙ্গশৃঙ্গে চিন্ময়-পরিণামের দীপ্তচ্ছটা—কিন্তু পরাবর সমস্ত প্রকৃতি তাতে দিব্য হয়ে ওঠে না।

অপরোক্ষ সম্প্রয়োগের আরেকটি সাধন হল হৃদয়। হৃদয়ের পথ ধরে জীবাত্মার সাধনা ও সিদ্ধি ক্ষিপ্র এবং সুনিবিড় হয়, কেননা হৃৎশয় অনাহত-চক্রই জীবাত্মার গুহ্যধাম। তাছাড়া আমাদের ভাবকায়ের সঙ্গেও তার স্বাভাবিক একটা নাড়ীর যোগ আছে। তাই সাধনার শুরুতে হৃদয়ের ভাবরাশিকে উদ্বেল করেই জীবাত্মা তার সহজ বীর্য ও সান্দ্র অনুভবের প্রাণোচ্ছল সংবেগকে স্ফুরিত করে। হৃদয়ের সাধনা বস্তুত ভক্তি ও প্রেমের সাধনা—চিরসুন্দর চিরকল্যাণ চিরনন্দিত সত্যস্বরূপের উপাসনা। প্রেম সেখানে পরাৎপর চিন্ময় তত্ত্ব। অন্তরের সমস্ত ভাবাবেগ ও চিত্তরঞ্জনী সকল বৃত্তি তখন একাগ্র হয়ে, উপাস্যের কাছে প্রাণ ও আত্মার এমন-কি সমগ্র প্রকৃতির অকুণ্ঠ নিবেদনে পায় আত্মাহুতির একটা পরম তৃপ্তি। কিন্তু ভক্তি-সাধনার সিদ্ধি শতধারায় উছলে ওঠে তখনই যখন নৈর্ব্যক্তিক অব্যক্তের ভূমি পার হয়ে সাধকের মন পুরুষোত্তমের অনুভব পায়। সে-অনুভবে আধারের সমস্ত বৃত্তি তীক্ষ্ণ দীপ্ত এবং সান্দ্র হয়, হৃদয়ের ভাবরাশি ও উন্মাদনা অথবা ইন্দ্রিয়ের চিন্ময়ী সংবিৎ সমস্তই চরমকোটিতে উত্তীর্ণ হয়, নিঃশেষ আত্ম-নিবেদনে সকল আকূতির অন্তিম অবসান হয় শুধু সম্ভাবিত নয়—হয় অনুত্তরণীয়। সাধকের ভাবদেহকে আশ্রয় করে অন্তরের অস্ফুট চিন্ময় মানুষটি তখন ফোটে ভক্তহৃদয়ের মাধুরী নিয়ে। এই পরা ভক্তির সঙ্গে যদি চৈত্যপুরুষের সত্তা ও প্রশাসনের অপরোক্ষ সংবিৎ যুক্ত হয়, ভাব-সত্ত্বের সঙ্গে চৈত্যসত্ত্বের সমাযোগে সমগ্র জীবন ও প্রাণের সকল বৃত্তি চিন্ময়ী হিরণ্যদ্যুতিতে কল্যাণদীপ্ত হয়ে ওঠে দিব্যোন্মাদের অগ্নিদহনে ও বিশ্ব-মৈত্রীর অমৃতরসায়নে, তাহলেই মর্ত্য আধারে ফোটে শিবজ্যোতির্ময় সাধুত্বের চরম চমৎকার—প্রকৃতির অভূতপূর্ব রূপান্তরে সার্থক হয় পরমপুরুষের মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে দেবার ব্যাকুল সাধনা। কিন্তু প্রকৃতির সম্যক্ রূপান্তর এতেও সিদ্ধ হয় না। এরও পরে চাই, আত্মপ্রকৃতিকে উল্লঙ্ঘন না করেই চিত্তের মননধর্মের এবং চেতনার মনোময় ও অন্নময় বৃত্তির হিরণ্ময় রূপান্তর।

এই বৃহৎ রূপান্তর খানিকটা সিদ্ধ হয়, যদি হৃদয়ের দিব্য অনুভবের সঙ্গে ব্যাবহারিক সংকল্পবৃত্তির উৎসর্গভাবনা যুক্ত হয়। যে প্রাণসংবেগ চিত্তকে জঙ্গম করে বহির্বৃত্ত কর্মের প্রেরণা জোগায়, তারও মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া চাই উৎসৃষ্ট সংকল্পের প্রেতি, নইলে সংকল্পশুদ্ধির সাধনা সফল হবে না। ইচ্ছার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে-অহমিকা, আর তার মূলে আছে যে-বাসনার প্ররোচনা, ধীরে-ধীরে তাদের বিলীন করে দেওয়াতেই কর্মসংকল্পের উৎসর্গ এবং শুদ্ধি সিদ্ধ হয়। অহমিকা প্রথমত পরা প্রকৃতির কোনও উত্তরবিধানের কাছে আপনাকে নত করে দেয়। তারপর

নিঃশেষে নিজেকে সে মুছে ফেলে—মনে হয় যেন সে কোথাও নাই, অথবা থাকলেও আছে কোনও উত্তরশক্তি বা উত্তরসত্যের বাহনরূপে, কিংবা পরম-পুরুষের নিমিত্তরূপে তার সংকল্প ও কর্মকে উৎসর্গের বেদিমূলে সঁপে দিয়ে। যে ঋতের প্রশাসন বা সত্যের দীপ্তি তখন সাধকের দিশারী হয়, মানস অনুভূতির চরমশিখরে তাকে সে প্রত্যক্ষ করে একটা অনাবরণ স্বচ্ছতা কি শক্তির বৈদ্যুতী কি তত্ত্বভাবের প্রেরণারূপে। অথবা, হয়তো সে চিন্ময় সত্যসংকল্পের সত্যকেই নিত্যসহচর অন্তর্যামীরূপে অনুভব করে—সে-ই যেন আলো হয়ে বাণী হয়ে শক্তি হয়ে চিন্ময় পুরুষ হয়ে কিংবা শুদ্ধসত্তার অধিষ্ঠানমাত্র হয়ে তাকে কর্মের পথে চালনা করে। অবশেষে এমনি করে তার অনুভব উত্তীর্ণ হয় লোকোত্তর চেতনার দিব্যধামে। সেখানে সে দেখে, তার সমস্ত কর্ম স্পন্দিত ও প্রশাসিত হচ্ছে এক অন্তর্যামী মহাশক্তি বা অধি-ষ্ঠানতত্ত্বের আবেশে, সুতরাং আপন ইচ্ছা বলে কিছুই তার নাই—তার অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণে সে-ইচ্ছা একাকার হয়ে গেছে ওই ঋতম্ভরা মহাশক্তি ও মহা-সত্তারই সত্যসংকল্পের সঙ্গে।...চিত্তের সাধনা, সংকল্পের সাধনা আর হৃদয়ের সাধনা—এ তিনের ত্রিবেণীসংগম ঘটলে, আমাদের বহিশ্চর সত্তায় ও প্রকৃতিতে এমন-একটা চৈত্য বা চিন্ময় পরিবেশ রচিত হয়, যাতে উন্মুক্ত চিত্তের বিচিত্র শতদল উদার আনন্দে উন্মীলিত হয় চৈত্যপুরুষের অন্তর্জ্যোতির দিকে, কূটস্থ চিদাত্মা বা ঈশ্বরের দিকে, পরিতোব্যাপ্ত ও সর্বত্রানুবিদ্ধ অনুত্তর তত্ত্বের সদ্য-অনুভূত আবেশের দিকে। আত্মপ্রকৃতিতে তখন একটা বহুশাখ রূপান্তরের বীর্যবত্তর বিভূতি, আত্মগঠন ও আত্মবিসৃষ্টির একটা চিন্ময় প্রবেগ দেখা দেয় এবং একই আধারে ভক্ত অধ্যাত্মবিৎ ও কর্মযোগীর পরম সমন্বয়ে ফোটে মানবতার পূর্ণমহিমা।

কিন্তু এ-রূপান্তরকে অখণ্ড পূর্ণতার গহন ঔদার্যে পৌঁছতে হলে আত্মচেতনার স্থাবর ও জঙ্গম দুটি বিভাবকেই অন্তরাবর্তনদ্বারা আধারের মর্মমূলে—সত্তার অন্তর্গূঢ় চিদ্‌বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত করা চাই। জীবনের সমস্ত ভাবনা ও কর্মকে তখন ওই অক্ষীয়মাণ উৎস হতে উৎসারিত করতে হবে। বাইরে দাঁড়িয়ে শুধু অন্তরপুরুষের অনুশাসনের অনুবর্তনই প্রকৃতির রূপান্তরের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তারও পরে চাই বহিশ্চর ব্যক্তি-সত্ত্বের সম্পূর্ণ নিরসনদ্বারা বোধিসত্ত্ব অন্তরপুরুষের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কিন্তু তার পথে দুটি প্রধান বাধা। প্রথমত, অন্তরাবৃত্তির প্রয়াসকে অপরা প্রকৃতি মূঢ়ের মত রুখে দাঁড়ায়, কেননা চিরাভ্যস্ত বহির্মুখী প্রবৃত্তির সংস্কার কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষে সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, বহিশ্চেতনা আর নিগূঢ় চৈত্যসত্তার মণিকোঠা—এ-দুয়ের সুদূরবিস্তৃত অন্তরালটি ছেয়ে থাকে অধিচেতন প্রকৃতির এমন-সব আবর্ত এবং তরঙ্গ, যাদের সবাইকে কোনমতেই অন্তরাবৃত্তি-সিদ্ধির অনুকূল সাধন বলা চলে না। বহিশ্চর

প্রকৃতির সমস্ত ভঙ্গিমার একটা বদল চাই। তাকে প্রশান্ত ও পরিশুদ্ধ করে তার সমস্ত শক্তি ও উপাদানের এমন সূক্ষ্ম পরিণাম ঘটানো আবশ্যক, যাতে তার অধিকাংশ খাদ ক্ষয়িত হয়ে ঝরে পড়ে বা মিলিয়ে যায়। আধারের এমনতর শুদ্ধিতেই সত্তার গভীরে ডুবে একটা অভিনব চেতনার বনিয়াদ গড়ে তোলা সম্ভব হয়—যা ভূতাত্মার অন্তরে ও অন্তরালে অধিষ্ঠিত হয়ে তার সঙ্গে অন্তরাত্মার সেতুবন্ধন করবে। আমাদের মধ্যে এমন-একটা চেতনার উপচয় বা আবির্ভাব চাই—সত্তার উত্তুঙ্গ-গভীর মহিমার দিকে দল মেলবে যে দিনে-দিনে, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বশক্তির অনুভাবের কাছে কি বিশ্বোত্তীর্ণের শক্তি-পাতের কাছে আপনাকে অনায়াসে অনাবৃত করবে এবং শান্তি জ্যোতি শক্তি ও আনন্দের উত্তর-প্লাবনে পরিপ্লুত হবে। সে-চেতনা প্রাকৃত ব্যক্তিসত্ত্বের সঙ্কীর্ণ সীমাকে বহুদূর ছাড়িয়ে যাবে—ছাড়িয়ে যাবে বহিশ্চর চিত্তের ক্ষীণদ্যুতি অনুভবের খদ্যোতকে, প্রাকৃত জীবনচেতনার হীনবীর্য আকূতিকে, স্থূলদেহের আচ্ছন্ন এবং সংকীর্ণ সম্বিৎকে।

অপরা প্রকৃতির শুদ্ধি ও প্রশমের সাধনা পূর্ণ বা পর্যাপ্ত হবার পূর্বেই অন্তরপুরুষ ও বহিঃসংবিতের মাঝের দেয়ালটাকে ভেঙে দেওয়া যায় - ওপারের দুর্ধর্ষ আহ্বানে জাগ্রত অভীপ্সার তীব্রসংবেগে, দুর্দম সংকল্পে প্রচণ্ড প্রয়াস বা সার্থক সাধনবীর্যের উদ্যত অভিঘাতে। কিন্তু ওই হঠকারিতার ফলে সাধকের সমূহ বিপদ ঘটাও অসম্ভব নয়। অতর্কিতে অন্তররাজ্যে ঢুকে সাধক হয়তো নানা অপরিচিত ও দুর্বোধ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জটিল জালে জড়িয়ে যায়। অথবা বিশ্বচেতনা কি অধিচেতনার নানা মনোময় প্রাণময় কি ভূতসূক্ষ্মময় ও অবচেতন সংবেগে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে কখনও সে অনিয়ন্ত্রিত বিক্ষেপ-শক্তির অন্যায় তাড়নায় ঘুরে বেড়ায়, কখনও তলিয়ে যায় অন্ধকারের অতল গহ্বরে, কখনও-বা প্রলোভন ও প্রবঞ্চনার আলেয়ার পিছনে ছুটে চলে কোন্ পথহীন কান্তারে। আবার অজ্ঞাত শক্তির রহস্যময় প্রভাব কখনও তাকে তমসাচ্ছন্ন কোন্ সমরাঙ্গনে ঠেলে দেয় সেখানে কোথাও অদৃশ্য বাধার গুপ্তঘাত চেতনায় বিভ্রমের সৃষ্টি করে, কোথাও-বা তার প্রকাশ্য বিদ্রোহের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ দেখা দেয়। অন্তঃ-সংবিতের প্রাতিভবৃত্তিতে কখনও অলৌকিক সত্ত্ব বাণী বা অনুভাবের প্রতিভাস ফুটে ওঠে। তারা আসে যেন ইষ্টদেবতা বা তাঁর বার্তাবহের রূপে, জ্যোতিঃ-স্বরূপের চিন্ময়ী বীর্যবিভূতির আকারে, সিদ্ধিপথের দিশারী হয়ে—অথচ আসলে তাদের প্রকৃতি হয়তো ঠিক তার বিপরীত। সাধকের স্বভাবে হয়তো আছে আকাশচুম্বী অহমিকা, প্রবৃত্তির উত্তাল বিক্ষোভ, দুরাকাঙ্ক্ষার উৎকট আতিশয্য, শক্তির মিথ্যা দর্প বা এমনিতর মারাত্মক কোনও ব্যসন। অথবা হয়তো তার চিত্ত ধূমাচ্ছন্ন, সংকল্পে শিথিল ও দ্বিধাগ্রস্ত, প্রাণশক্তি কৃপণ

অপ্রতিষ্ঠিত ও দোদুল্যমান।--তখন আধারের এইসব ত্রুটিকে আশ্রয় করে তার চেতনায় বিরোধী শক্তির আবেশ হয়। তারা তার সাধনাকে পণ্ড করে, অধ্যাত্মজীবন ও চিন্ময়ী আকৃতির সত্য পথ হতে ভ্রষ্ট করে নানা অবান্তর অনুভবের গোলকধাঁধায় ভুলের পথে নিয়ে যায় এবং এমনি করে চিরদিনের জন্য সত্যোপলব্ধির দুয়ারে আগল টেনে দেয়। প্রাচীন সাধকেরা এসব সঙ্কটের কথা জানতেন এবং তাদের প্রতিরোধেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষার্থীর কাছে এইজন্যেই তাঁরা দাবি করতেন দীক্ষা সংযম ও চিত্তশুদ্ধির সাধনা—শিষ্যত্বের নানা অগ্নিপরীক্ষা। পথের যিনি দিশারী বা নায়ক, যিনি সত্যদর্শী এবং সত্যজ্যোতির ধারক ও সঞ্চারক—সেই সিদ্ধগুরুর নির্দেশের কাছে শিষ্য আপনাকে সম্পূর্ণ নুইয়ে দেবে এবং তিনিও তার হাত ধরে দুস্তর সঙ্কটের সব বাধা পার করে দেবেন, অবন্ধ্য অনুশাসনদ্বারা তার সাধনপথ আলোকিত করবেন, এই কথাই তাঁরা জানতেন এবং মানতেন। এতেও কিন্তু সকল বিপদ কাটে না। যতক্ষণ সাধকের চিত্তে অক্ষুণ্ণ আর্জবের স্ফুরণ বা উপচয় না হয়—আত্মশুদ্ধির অটুট সঙ্কল্প, সত্যের অনুশাসনের দ্বিধাহীন অনুবর্তন, পরা সংবিতের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ, আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী সঙ্কীর্ণ অহং-এর নিরসন অথবা পরম-দেবতার দ্বারা তার অকুণ্ঠ বশীকার প্রভৃতি দৈবী সম্পদের আবির্ভাব না হয় ততক্ষণ প্রতি পদক্ষেপে সাধকের পতনের ভয় থাকে। এইসব দৈবী সম্পদের স্ফুরণ সূচিত করে—এইবার সাধকের আধার তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে আত্মোপলব্ধি এবং চেতনার গোত্রান্তর ও রূপান্তরের যথার্থ আকূতি এইবার জেগেছে। এরপর মনুষ্যপ্রকৃতির যেসব স্বাভাবিক বৈকল্য, মনোময় হতে চিন্ময় ভূমিতে উত্তরণের পথে তারা আর-কোনও স্থায়ী বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। অবশ্য এতেই সাধনা একান্ত সহজ হয়ে ওঠে না,—কিন্তু সাধকের সম্মুখে জ্যোতিঃ-পথ এখন থেকে নিরর্গল ও সুগম হয়।

অন্তরাত্মায় অবগাহনের সাধনাকে সহজ করবার একটি সার্থক উপায় হল পুরুষ ও প্রকৃতির বিবেকসাধন। মন ও তার বৃত্তিসমূহ হতে সাধক ইচ্ছামাত্র নিজেকে বিবিক্ত করতে পারলে, হয় মন নিস্পন্দ হয়ে পড়ে, নয়তো সাক্ষীর উদাসীন দৃষ্টির সম্মুখে চলে মনোবৃত্তির বহির্বৃত্ত লীলা। তখন মনের গহনে যে বিশুদ্ধসত্ত্ব মনোময়-পুরুষ রয়েছেন, তাঁর সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। এইভাবে প্রাণবৃত্তি হতে বিবিক্ত হয়ে শুদ্ধ প্রাণময়-পুরুষকেও দর্শন করা চলে। এমনকি দেহের প্রবৃত্তি ও বুভুক্ষা হতে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে, দেহচেতনার নৈঃশব্দ্যে অবগাহন করে আমরা এক অন্নময়-পুরুষের অনুভব পেতে পারি—যিনি দেহসত্তার মর্মমূলে শুদ্ধস্বরূপে অধিষ্ঠিত থেকে বাইরে উৎসারিত করছেন অন্নময় চিতিশক্তির লীলায়ন। আবার প্রকৃতির এই ত্রিধা

প্রবৃত্তি হতে ক্রমান্বয়ে বা যুগপৎ বিবিক্ত হলে সত্তার গভীর স্তব্ধতায় নির্বিকার কূটস্থ সাক্ষিপুরুষের দর্শন মিলবে। এ-দর্শনে আত্মমুক্তির চিন্ময় অনুভব এলেও, তাতে প্রকৃতির রূপান্তর নাও ঘটতে পারে। কারণ পুরুষ এ-অবস্থায় আত্মবিমুক্তি ও স্বরূপাবস্থানে তৃপ্ত হয়ে প্রকৃতির প্রতি তাটস্থ্য অবলম্বন করতে পারেন। হয়তো তার ক্রিয়াকে তিনি আর অনুমন্তারূপে উজ্জীবিত বা প্রবর্ধিত করতে চান না—শুধু নিঃস্পৃহ ভোগের গতানুগতিক অনুবৃত্তিতে তার সঞ্চিত সংবেগ নিঃশেষিত হয়ে যাক, এইটুকুই চান। অথবা এই তাটস্থ্যকে আশ্রয় করে প্রকৃতির সমস্ত প্রবৃত্তি হতে নিত্য-বিবিক্ত থাকতে চান। কিন্তু শুধু উদাসীন দ্রষ্টৃত্বই পুরুষের স্বভাব নয়—জীবের সমস্ত ভাবনা ও কর্মের বিজ্ঞাতা প্রবর্তক ও শাস্তাও তিনি। এই প্রভুত্বের আংশিক চরিতার্থতা ঘটে—পুরুষ যখন মনোময়-ভূমিতে অবস্থিত, কিংবা প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের যতক্ষণ তিনি উপযোক্তা। কিন্তু প্রকৃতির 'পরে খানিকটা প্রভুত্ব করতে পারলেই তার রূপান্তরসিদ্ধি হয় না—কেননা আংশিক প্রশাসনের বীর্য এত তীক্ষ্ণ নয় যে আধারকে তা আমূল পালটে দিতে পারে। পূর্ণ রূপান্তরের জন্যে চাই মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় পুরুষের অধিকারকেও অতিক্রম করে সত্তার আরও গভীরে তলিয়ে গিয়ে গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ চৈত্যসত্তার সাক্ষাৎকার—অথবা অতিচেতনার অনুত্তর মহিমার দিকে আত্মসত্তার উন্মীলন। অন্তর্জ্যোতিতে প্রভাস্বর জীবচেতনার এই মণিকোঠায় অনুপ্রবিষ্ট হতে হলে, দীর্ঘকালের ক্লান্তিহীন দুশ্চর তপস্যায় সাধককে প্রাণধাতুর যে অনচ্ছ ব্যবধান চিৎকেন্দ্রের দুর্গম পথ জুড়ে আছে তা পার হয়ে যেতে হবে। বিবেকসাধনার দ্বারা দেহ-প্রাণ-মনের বিরামহীন যত উদ্দামতা আর বুভুক্ষাকে ঠেকিয়ে রাখা, হৃদয়চক্রে একাগ্রভাবনার কীলককে নিহিত করা, কৃচ্ছ্রতপস্যা এবং আত্মশোধন, প্রাণ-মনের সর্ববিধ প্রাক্তন সংস্কারের উচ্ছেদ, চিরাভ্যস্ত প্রয়োজনের মিথ্যা প্ররোচনার নিরোধ, বাসনাপ্রণোদিত অহন্তার নিরসন—এসমস্তই এই কঠিন সাধনার অঙ্গ। কিন্তু রূপান্তরসিদ্ধির বীর্যবত্তম মার্মিক সাধন হল—প্রত্যেকটি সাধনাঙ্গকে ঈশ্বরের কাছে অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন ও আধারের সকল অংশের পূর্ণ-সমর্পণের 'পরে প্রতিষ্ঠিত করা। সদ্‌গুরুর বোধিদীপ্ত প্রাজ্ঞ দেশনার একান্ত অনুবর্তনও এক্ষেত্রে স্বভাবত অপরিহার্য সবার পক্ষে—কেবল দু-চারজন উচ্চকোটির সাধক ছাড়া।

নিষ্ঠাপূত সাধনার ফলে অন্তর-বাহিরের দেয়ালের আড়াল ভেঙে অপরা প্রকৃতির স্থূল আবরণ যখন বিদীর্ণ হয়, তখন এই বিদারণের ভিতর দিয়ে অন্তর্বেদিতে নিত্যসিদ্ধ চিদগ্নির দীপ্তশিখা বিকীর্ণ হয়, প্রকৃতি ও চেতনার মর্মে-মর্মে শুরু হয় অতিসূক্ষ্ম পাবকশক্তির দাহন। আর সেই দাহনে বিশুদ্ধীকৃত আধারের সূক্ষ্ম পরিমণ্ডলে, অন্তঃপ্রাণ ও অন্তর্মনেরও ওপারে

সত্তার গভীরগহনে রয়েছে যে বিচিত্র চিন্ময় অনুভব তার স্ফুরণ ঘটে। চৈত্য-পুরুষের কঞ্চুক একে-একে তখন খসে পড়ে এবং চৈত্যসত্ত্বের পূর্ণোপচিত মহিমা চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চৈত্যসত্তাকে সাধক তখন অনুভব করে দেহ-প্রাণ-মনের ভর্তারূপে—আধারস্থ চিৎশক্তির নিখিল বীর্যবিভূতির ঈশান রূপে। চিৎকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত এই পুরুষই তখন প্রকৃতির শাস্তা ও নিয়ন্তা, এবং তাঁর লোকোত্তর মহিমার এই পরিচয়। তাঁর অবন্ধ্য দেশনা ও প্রশাসনে অন্তর হতে ঋতজ্যোতির অনুসৃতির সহজ প্রেতি উৎসারিত হয়-- আধারে যা-কিছু তমশ্ছন্ন অনৃত বা দৈবী সিদ্ধির প্রতিকূল, তা ব্যাহত হয়। সত্তার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অণুতে-অণুতে তাঁর দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে। চিত্তের যত ভাবনা বেদনা সংজ্ঞা সংকল্প বাসনা প্রবৃত্তি আশয় সংস্কার ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া, স্থূল অভ্যাসের চেতন কি অবচেতন যত তাগিদ, এমন-কি আধারের অব্যক্ত কুহরে যা-কিছু ছদ্ম আস্তরণে প্রচ্ছন্ন নির্বাক ও রহস্যঘন হয়ে আছে--সে-সমস্ত বৃত্তির যত স্পন্দন রূপায়ণ দিশা বা ঝোঁক সব তাঁর অপ্রমত্ত ধ্রুবজ্যোতিতে আলোকিত হয়ে ওঠে। সে-আলোকে তাদের বিপর্যাস ও জটিলতা দূর হয়, সহজ গ্রন্থিমোচন হয় - তাদের তামসিকতা প্রতারণা ও আত্মবঞ্চনার সত্য-রূপটি রেখায়িত হয়ে তাদের ব্যসন নির্মূল হয়। এমনি করে আধারের সব-কিছু স্বচ্ছ নির্মল ও স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে, সমগ্র প্রকৃতিতে ফোটে ঊর্ধ্বমুখী, চৈত্য প্রেরণার স্বরগ্রামে বাঁধা ঋতচ্ছন্দা চিন্ময় সৌষম্যের মূর্ছনা। আধারের হৃতাবশেষ তামসিকতা বা প্রতিকূলতার অনুপাতে এসাধনা কখনও দ্রুত কখনও বা বিলম্বিত লয়ে চলে। কিন্তু তবু সিদ্ধির চরমকোটিতে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কখনও তার তালভংগ হবার আশংকা থাকে না। পরিশেষে সত্তার সমগ্র চেতনায় দেখা দেয় এমন-এক সর্বতোমুখী প্রতিভা যা অনায়াসে চিন্ময় অনুভবের সমস্ত বৈচিত্র্যের গহনে অবগাহন করে। আমাদের প্রত্যেক ভাবনা বেদনা সংজ্ঞা প্রবৃত্তির মধ্যে যে-জ্যোতিঃসত্যের অনুস্যূতি আছে, তার ধারণা তখন সাধকের পক্ষে সহজ হয়। আর তার বেতালে পা পড়ে না, কেননা তামসিক জড়ত্বের অন্ধ দুরাগ্রহ হতে, রাজসিক উন্মাদনা ও বৈষম্যচঞ্চল প্রবৃত্তির আবর্তসংকুল পঙ্কিল অশুচিতা হতে, এমন-কি জ্যোতিরভিমানী সাত্ত্বিকতার সূক্ষ্ম সংকোচ আড়ষ্ট কাঠিন্য ও কৃত্রিম সমত্বের বাহানা হতে --এক-কথায় অবিদ্যা-প্রকৃতির সর্ববিধ শাসন হতে সাধক তখন নিষ্কৃতি পায়।

এই হল সিদ্ধির প্রথম পর্ব। তার দ্বিতীয় পর্বে আধারে চিন্ময় অনু-ভবের একটা আস্রব নামে। কূটস্থ আত্মস্বরূপের উপলব্ধি, যুগনদ্ধ শিব-শক্তির অনুভব, বিশ্বচেতনার দীপ্ত প্রত্যয়, বিশ্বপ্রকৃতির অতীন্দ্রিয় শক্তি-লীলার অপরোক্ষ সংবিৎ, সর্বাত্মভাবের গভীর আবেশে ঘটে-ঘটে বহিঃপ্রকৃতির মর্মে-মর্মে অনুপ্রবিষ্ট চেতনার নিবিড় ও নিরঙ্কুশ ব্যতিষংগ, চিত্তে বিজ্ঞানের দীপ্তি, হৃদয়ে ভক্তি প্রেম ও হ্লাদিনীশক্তির দিব্যবিভা, দেহে ও ইন্দ্রিয়ে

লোকোত্তর অনুভবের পুণ্যচ্ছটা, অতন্দ্র কর্মে শুদ্ধ হৃদয়-মন-চেতনার ঋতম্ভর ঔদার্যের বৈদ্যুতী, সংকল্পে ও আচরণে তাঁরই জ্যোতির্ময়ী দেশনার নৈশ্চিত্য, তাঁর চিন্ময় শক্তিপাতের আনন্দসংবেগ—এমনিতর ঐশ্বর্যের অজস্রতায় সাধকের জীবনে নেমে আসে চিত্রভানুর জ্যোতির বন্যা। আধারের অন্তঃশীল ও অন্তরতম সত্ত্ব এবং প্রকৃতির বহিরুন্মীলনের ফলে এই সিদ্ধি আসে। তাই চেতনায় তখন চৈত্য-পুরুষের অপ্রমত্ত ধ্রুবসম্বোধির সহজ দীপ্তি ফোটে—যার অপরোক্ষ দর্শন-স্পর্শনের সামর্থ্য মানসপ্রত্যয়ের সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাঁর অনাবিল শুদ্ধ চিদ্‌বিলাসে তখন স্ফুরিত হয় ভূতধাত্রী প্রকৃতির সাক্ষাৎ ও অন্তরঙ্গ অনুভব, পরমাত্মা ও পরমপুরুষের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার, পরম-সত্যের ও তার ঋতম্ভরা চিত্রবিভূতির প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান ও দর্শন, চিন্ময় ভাবোল্লাস ও বেদনার সুদূরাবগাঢ় এবং অব্যবহিত সংবিৎ, সম্যক্‌সংকল্প ও সম্যক্‌কর্মের বোধিদীপ্ত অবিতথ বিনিয়োগ। বহিরাত্মার দ্বিধান্দোলিত অনৈশ্চিত্য নিয়ে নয়, কিন্তু অন্তর্যামী কবিক্রতুর প্রেরণায় এবং পরা প্রকৃতির নিগূঢ় শক্তির উন্মেষে তখন তিনি স্ফুরিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন আত্ম-সত্তার এক অভূতপূর্ব ভূমিকা।

চৈত্যসত্তার পূর্ণ উন্মীলন না হতেই যদি প্রাণময় ও মনোময় পুরুষের উন্মীলন ঘটে, তাহলেও আধারে এসব সিদ্ধির খানিকটা মূর্ত হতে পারে। কেননা আধারের অন্তর্গূঢ় সূক্ষ্ম ও বৃহত্তর হৃদয়-প্রাণ-মনেরও অপরোক্ষ চিন্ময়-সন্নিকর্ষের একটা স্বাভাবিক সামর্থ্য আছে। কিন্তু অধিচেতন ভূমি হতে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যারও উৎক্ষেপ হয় বলে সেক্ষেত্রে সাধারণ অনুভবের ধরন হয় ব্যামিশ্র। তার ফলে সত্তার পূর্ণবিস্ফারণ ব্যাহত হয় মনের কোনও সংকীর্ণ সংস্কার, হৃদয়ের কোনও পক্ষপাতদুষ্ট সঙ্কুচিত প্রবৃত্তি অথবা স্বভাবের বিশেষ-কোনও ঝোঁকের জন্য। হয়তো চৈত্যসত্ত্বের উন্মেষ হয়নি, অথবা তার পূর্ণোন্মীলনে বাধা পড়েছে; তখন বৃহত্তর জ্ঞান ও শক্তির আবেশে সাধকের অধ্যাত্ম অনুভবে যদি অলৌকিকত্ব বা অসাধারণতার ছোঁয়াচ লাগে, তাহলে তার চিত্তে অহমিকার অতিস্ফীতি দেখা দিতে পারে। এমন-কি আধারে কখনও-কখনও দিব্যভাবের বসন্তোৎসবের জায়গা জুড়তে পারে আসুরভাবের উত্তাল আলোড়ন, অথবা বিশ্বশক্তির এমন-সব অবরবিভূতি নেমে আসতে পারে—যারা এতটা সর্বনাশা না হলেও কিছু কম দুর্ধর্ষ নয়। কিন্তু চৈত্যপুরুষের পূর্ণ উন্মীলনে সে-ভয় থাকে না। কেননা তাঁর দেশনা ও প্রশাসন অনুভবের সকল ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করে সম্যক্‌-সম্ভূতির ঋতম্ভরা দ্যুতি ও অপরাহত সৌষম্যের নিবিড় ব্যঞ্জনা—যা চৈত্যসত্ত্বের স্বভাবধর্ম। অতএব এমনিতর একটা তৈজস অথবা বিশেষ করে তৈজস-চিন্ময় রূপান্তর আধারে যদি ঘটে, তাহলেই মানুষের মনোময় প্রকৃতিতে দেখা দেবে সুচির-প্রত্যাশিত বৈপ্লবিক যুগান্তরের সূচনা।

কিন্তু এধরনের অনুভব ও রূপান্তর তত্ত্বত কি স্বভাবত তৈজস বা চিন্ময় ভূমির হলেও, তাদের বিশিষ্ট অর্থক্রিয়াকারিতা কিন্তু দেহ প্রাণ ও মনের ভূমিতেই দেখা দেয়। সাধারণত তাদের চিদ্‌বীর্য* স্ফুরিত হয় দেহ-প্রাণ-মনের সবখানি জুড়ে চৈত্যদীপ্তির বিচ্ছুরণে। কিন্তু তার আকৃতি-প্রকৃতিতে সাধনসামগ্রীর অপকর্ষের একটা ছাপ থাকেই—নিষ্ঠাপূত তপস্যার ফলে তারা যতই প্রসারিত ঊর্ধ্বায়িত বা বিরলীকৃত হ'ক না কেন। মনের ওপারে সত্য বীর্য ও আনন্দের যে অদ্বৈতসম্পুটিত বহুধাবিসৃষ্টির উদার-গহন বাস্তব-প্রত্যয় রয়েছে, মর্ত্য আধারে তার একটা অনতিস্ফুট প্রতিবিম্ব মাত্র পড়ে। কেননা আমাদের বর্তমান প্রকৃতির শোধনমার্জন অতিনিখুঁত হলেও তা মানস সংস্কারের এলাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে না, অতএব তাকে উন্মনী ভূমির স্বরূপ-জ্যোতির যোগ্য বাহন বলি কী করে? এইজন্যই তৈজস বা তৈজস-চিন্ময় রূপান্তরেরও 'পরে চাই শুদ্ধ চিন্ময় রূপান্তরের পূর্ণতম প্রবেগ। অন্তরাত্মা বা 'হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' পরমাত্মা ও পরমপুরুষের অভিমুখে চেতনার যে অন্তরাবৃত্ত অগ্র্যা-গতি, তার আপূরণ চাই অনুত্তমা চিন্ময়ী স্থিতি বা লোকোত্তর-পদের প্রতি আত্মোন্মীলনের ঊর্ধ্বমুখী আকূতির দ্বারা। তার জন্যে উত্তর-জ্যোতির দিকে চেতনার দল মেলা চাই। অধিমানসের পর্বে-পর্বে অতিমানস-প্রকৃতিতে রয়েছে চিৎসত্তার যে শাশ্বত নির্মুক্ত প্রকাশ, যেখানে স্বয়ম্ভূবীর্যের জ্যোতির্ময় প্রস্ফুরণে সাধনবৈকল্যের অণুতম সম্ভাবনাও থাকতে পারে না (যেমন আছে আমাদের প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের ভূমিতে)—সেই ঊর্ধ্বলোকে চেতনার উত্তরণ চাই। তৈজস-রূপান্তরের পর এ-উদয়ন অনেকটা সহজ হয়। কেননা চৈত্যসত্তার অকুণ্ঠ আবির্ভাব সঙ্কুচিত ব্যক্তিভাবনার একাধিক আবৃতিকে অপসারিত করে যেমন বিশ্বচেতনার উদারলোকে আমাদের সত্তাকে প্রসারিত করে, তেমনি আবার বিভজ্যবৃত্তি বিবিক্ত মনের দীপ্ত-কঠিন আবরণের আড়ষ্ট পাশ মোচন করে লোকোত্তর অতিচেতনার দিকেও চেতনাকে উন্মীলিত করে। তৈজস-চিন্ময় রূপান্তরের প্রবেগে, আপন উৎসমূলের দিকে নবোদ্ভাসিত অধ্যাত্মচেতনার নিরূঢ় প্রেতিতে, মানস আবরণ ক্ষীয়মাণ হয়ে অবশেষে বিদীর্ণ বিকীর্ণ ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাধক যদি চিদাবিষ্ট মনের সাধারণ ভূমিতে শুধু ভাগবত-সত্তার অপরোক্ষানুভবে তৃপ্ত থাকে, তাহলে এই আবরণ-বিদারণ ও অনুত্তরের শক্তিপাত সম্ভব নাও হতে পারে—চৈত্যসত্তার পূর্ণোন্মীলন হয়নি বলেই। কিন্তু কোনও নিগূঢ় কারণে অতিপ্রাকৃত ভূমির আভাস মানসক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়ে যদি তীব্র অভীপ্সার আগুন জ্বালিয়ে তোলে, তাহলে হয় 'হিরন্ময় পাত্রের' আবরণ উন্মোচিত হয়, নয়তো তার মধ্যে

* তৈজস ও চিন্ময় উন্মীলনের অনুভব হতে, চেতনার মোড় ইহবিমুখ হয়ে নির্বাণের দিকেও ঘুরে যেতে পারে। কিন্তু এখানে আমরা সে-অনুভবের বিপাককে দেখছি শুধু প্রকৃতির প্রত্যাশিত রূপান্তরের সাধনরূপে।

দেখা দেয় মনোন্মনীর বিদাররেখা। কখনও-বা তৈজস-চিন্ময় রূপান্তর পূর্ণ-সিদ্ধ হবার পূর্বেই—এমন-কি তার অস্ফুট সূচনা বা প্রগতির অর্ধপথেই এই উত্তরায়ণের আকূতি জাগে। কেননা প্রবুদ্ধ চৈত্যসত্ত্ব একবার সে-অতিচেতনার আভাস পেলে তার প্রতি শরবৎ তন্ময় না হয়ে পারে না। অভীপ্সার প্রবেগে কিংবা আন্তর প্রস্তুতির ফলে, ঊর্ধ্বজ্যোতির অবতরণ বা ঊর্ধ্বচ্ছাদনের বিদারণ নিরূপিত কালের পূর্বেও ঘটতে পারে। অথবা অধিচেতন ভূমির কোনও নিগূঢ় প্রয়োজনে বা ঊর্ধ্বলোকের আবেশে কি চাপে অপ্রত্যাশিতভাবেও সে-জ্যোতি চিত্তের সচেতন আকূতির কোনও প্রতীক্ষা না রেখে আধারে নেমে আসতে পারে। তখন মনে হয়, যেন দিব্য-পুরুষের চিন্ময় স্পর্শে সহসা সকল চেতনা উদ্ভাস্বর হয়ে উঠেছে। অবশ্য এমনিতর শক্তিপাতে মনের রাজ্যে একটা যুগান্তর আসতে পারে। কিন্তু অবরভূমির চাপে অকালে শক্তিপাত ঘটাবার চেষ্টা করলে বিঘ্ন-বিপদের আশংকাও আছে, কেননা চিন্ময়-পরিণামের ঊর্ধ্বপর্বে অনুত্তরের প্রথম সমাগমকে নির্বাধ করতে হলে চাই চৈত্যসত্ত্বের পূর্ণকল উন্মেষ। তবে কিনা চিন্ময়-পরিণামের ধারা ব্যক্তিভেদে বিচিত্র ও বহুমুখী এবং সবসময় তার নিয়ন্ত্রণের ভারও আমাদের হাতে থাকে না। তাই ঊর্ধ্ববিভাবনী যে-চিৎশক্তি আমাদের উত্তরায়ণের প্রবর্তিকা, তার নিগূঢ় প্রেষার বশে পরিণামের যে-কোনও পর্বসন্ধিতে অপ্রত্যাশিতভাবে চেতনার মোড় ফিরে যেতে পারে—তার অন্তঃশীলা প্রথম প্রেতির ইঙ্গনাতে।

মনের ঢাকনায় চিড় দেখা দেবার পরে, সাধকের চোখে কখনও অজানা লোকোত্তরের একটা আ-ভাস ফোটে, কখনও উদ্যত চেতনার উদয়ন ঘটে তার দিকে, কখনও-বা আধারে তার শক্তিপাত হয়। আ-ভাস ফুটলে সাধক তার ঊর্ধ্বে প্রসারিত দেখে এক চির আনন্ত্য ও শাশ্বত সদ্ভাব, অথবা এক অনন্ত-সৎ অনন্ত-চিৎ ও অনন্ত-আনন্দ—এক নিঃসীম আত্মভাব, এক নিঃসীম শক্তি, এক নিঃসীম উল্লাসের স্বয়ম্ভূ মহিমা। তারপর বহুকাল ধরে মাঝে-মাঝে ঘন-ঘন বা নিরবচ্ছেদে এই দর্শনের আবৃত্তি চলে—অন্তরে তার জন্য জাগে ব্যাকুল একটা অভীপ্সা। কিন্তু সাধক এর বেশী আর এগোতে পারে না। কেননা এ-অবস্থায় হৃদয় মন বা আধারের খানিকটা যদি-বা বিকচ হয়েছে উপরপানে তবু সমস্ত অবরপ্রকৃতি এখনও তার আচ্ছন্ন গুরুভার দিয়ে প্রগতির আকূতিকে ঠেকিয়ে রেখেছে।...কিন্তু নীচে থাকতেই লোকোত্তর আভাসনের এই প্রাথমিক উদার সংবিৎ ফোটবার আগে কি তার কিছুদিন পরেও চেতনার উদয়ন ঘটতে পারে। মন তখন হয় ঊর্ধ্বলোকের সানু-সঞ্চারী। এই সানু-দেশের পরিচয় ঠিক না জানলেও, উত্তরণের ফল নানাভাবে আমাদের অনুভব-গোচর হয়। অনেকসময় চেতনার অন্তহীন উদয়ন ও প্রত্যাবর্তনের একটা সংবিৎ জাগে—কিন্তু তাহলেও ওখানকার খবর ধরা কি এখানকার ভাষায় তার তর্জমা করা অমাদের সাধ্যে কুলায় না। তার কারণ, উত্তরভূমি এতকাল মনের

কাছে অতিচেতন ছিল। তাই মন সেখানে আরূঢ় হয়েও সচেতন সমীক্ষা ও বিশেষাবগাহী অনুভবের সামর্থ্যকে প্রথমদিকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু চিতিশক্তির ক্রমোন্মেষে মন যখন অতিচেতন বস্তুর সম্পর্কে ধীরে-ধীরে সচেতন হয়ে ওঠে, তখন আর উন্মনী ভূমির বিজ্ঞান ও অনুভব তার অগোচর থাকে না। যে আ-ভাসিক দর্শনের কথা পূর্বে বলেছি, সে তখন রূপান্তরিত হয় অনুভবে। তার ফলে, মন কখনও উত্তীর্ণ হয় নির্বিশেষ আত্মস্বরূপের নিস্তব্ধ নিঃসীম প্রশান্তির উত্তরভূমিতে। কখনও সে আরূঢ় হয় চির-ভাস্বর জ্যোতির্লোকে বা দ্যুলোকের আনন্দনিকেতনে। কোথাও অনন্তশক্তির অপরোক্ষ অনুভবে সে হয় স্পন্দিত—দিব্য-সদ্‌ভাবের অবিপ্লুত চেতনায় কণ্টকিত। কোথাও সে ডুবে যায় চিন্ময় সৌন্দর্য ও প্রেমের অতল সায়রে, অথবা জ্যোতির্ময় দিব্যজ্ঞানের অনন্ত প্রসারে অবাধে সঞ্চরণ করে। ফিরে আসবার পরও চিন্ময় অনুভবের সংস্কার তার থাকে, কিন্তু মনের মুকুরে তার ছায়া পড়ে আচ্ছন্ন এবং অস্পষ্ট হয়ে। অনুভবের ঝাপ্‌সা খণ্ডস্মৃতি তখন আর অবরচেতনায় কোনও বীর্যসঞ্চার করে না, তাই উদ্দীপনার শেষে আবার সে ঝিমিয়ে পড়ে অভ্যস্ত লৌকিক ভূমির কোলে—শুধু বৈদ্যুতীহীন অনুভবের স্মৃতি বা চকিত আভাসটুকু তার মনের ভাণ্ডারে জমা হয়। ক্রমে সাধকের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত উদয়নের শক্তি ফোটে। তখন চিন্ময়ভূমিতে ঊর্ধ্ব-বিহারদ্বারা অর্জিত সম্পদের খানিকটা সে প্রাকৃত চেতনার অঙ্গীভূত করে নেয়। সাধারণত এ-উদয়ন সমাধিতে ঘটে। কিন্তু জাগ্রৎচেতনার একাগ্র অভি-নিবেশদ্বারাও উত্তরভূমিতে আরূঢ় হওয়া অসম্ভব নয়। আবার চিত্তের চিন্ময়তায় ধ্যান ছাড়াও যে-কোনও মুহূর্তে সগোত্র ভূমির ঊর্ধ্বাকর্ষণে এ-অবস্থা আসতে পারে।.. কিন্তু এমনতর আ-ভাসিত দর্শন বা উদয়নে অতি-চেতনার স্পর্শ আধারে প্রভাস্বর দীপ্তি প্রমুক্তি ও আনন্দের উচ্ছলতা আনলেও তার ফল সুদূরাবগাহী হয় না। চিন্ময়-রূপান্তরের সম্যক্ সিদ্ধির জন্য আমাদের আরও-কিছু চাই—চাই অবর হতে উত্তর চেতনায় সাধকের অধিরূঢ় নিত্যস্থিতি এবং তার সঙ্গে অপরা প্রকৃতিতে পরমা প্রকৃতির নিত্য-নিরূঢ় অবতরণ বা সার্থক শক্তিপাত।

এই অবতরণ বা শক্তিপাতই হল চিন্ময়-রূপান্তরের তৃতীয় বিভাব, অধিরূঢ়-স্থিতির পক্ষে যাকে অপরিহার্য বলতে পারি। উপর হতে উপচীয়মান প্রবেগে অমৃতের নির্ঝর আধারে নেমে আসছে, চিৎসত্তার বা তার চিন্ময়ী বৃত্তি ও বিভূতির নিরবচ্ছিন্ন নিষ্যন্দকে উৎসুক চেতনা ধরে রাখছে তার কমলপুটে—এই হল শক্তিপাতের রীতি। আ-ভাসিক দর্শন বা সাময়িক উদয়নের ফলেই সাধারণত শক্তিপাত সম্ভব হয়। কিন্তু তাছাড়া কখনও তা আপনা হতেও দেখা দেয়—আকস্মিক আবৃতি-বিদারণ বা অনুস্রবণের ফলে, ধারাসারে বা আস্রবের আকারে। উত্তরজ্যোতির একটি শিখা নেমে আসে মনে

প্রাণে কি দেহে, এবং অবরসত্তাকে তা স্পর্শ করে, আবৃত করে, বিদ্ধ করে। কিংবা লোকোত্তরেব সত্তা সংবিৎ ও শক্তির ধারা কি তরঙ্গ সহসা চেতনাকে পরিপ্লুত করে। অথবা কোথাহতে আধারে আনন্দের ফোয়ারা উথলে ওঠে—জ্যোৎস্নাপুলকিত মাধুরীতে ছেয়ে যায় সকল দিক। তখনই বুঝতে হবে--অতিচেতনার সঙ্গে আধারের সেতুবন্ধন হল। প্রথমত গ্রাহক-চিত্তের সংস্কাব-বশে এসব অনুভবের যথার্থ তাৎপর্য ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় রহস্যাচ্ছাদনের অন্তরালে ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু এপারে-ওপারে বারবার আনাগোনার ফলে ক্রমেই তারা যখন সুপরিচিত ও স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়, তখন আর তাদের কোনও তত্ত্ব চেতনার কাছে গোপন থাকে না। তখন ঊর্ধ্বলোকের গঙ্গোত্রী হতে নামে দিব্যজ্ঞানের বিপুল প্লাবন—ঝলকে-ঝলকে, অক্ষীয়মাণ শতধারায়, অবশেষে নিরন্ত নির্ঝরে—ফুটে ওঠে চিত্তের উপশম বা নৈঃশব্দ্যের পটভূমিতে। লোকোত্তব দর্শন ও ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা হতে জাত বোধি, প্রতিভা বা দিব্যশ্রুতির আবেশ জাগে আধারে, নির্বিচার বিবেকদীপ্তির বৈশারদ্যে বুদ্ধির তামসিকতা ও ব্যামিশ্রভাবের ধাঁধা দূর হয়—ঋতের ছন্দে বাঁধা হয় জীবনতন্ত্রীর সুর। এক অভিনব চেতনার দিব্যসামর্থ্য গড়ে তোলে উত্তর মনের স্বয়ম্ভু-মননজাত প্রজ্ঞার বৈপুল্য, প্রভাস-মানস বোধি-মানস বা অধিমানসের দর্শন ও ভাবনার নবীন বৈভব, প্রাকৃত দর্শন কি ভাবনারও অতিভাবী চিন্ময় অপরোক্ষ অনুভবের লোকোত্তর বীর্য, প্রাকৃত আধারে চিন্ময় ধাতুতে সঞ্চারিত মহাসম্ভূতির অকুণ্ঠ সংবেগ। হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ের সংবেদনশক্তি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ম ও বৃহৎ হয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করে, ঈশ্বরকে দর্শন শ্রবণ স্পর্শন ও আস্বাদন করে, বিশ্বোত্তর তাদাত্ম্যানুভবে আত্মাকেই বিশ্বাভেদে উপলব্ধি করে একরসপ্রত্যয়ের নিবিড় আসঙ্গে। এই মৌলিক রূপান্তরকে আশ্রয় করে অনুভবের আরও-কত বৈশিষ্ট্য, চেতনার আরও-কত পরিণাম মঞ্জরিত হয়ে ওঠে। আধার জুড়ে এ মহাবিপ্লবের কোথাও শেষ নাই—কেননা এ যে তার 'পরে আনন্ত্যের দুর্বার অভিঘাত।

এই হল চিন্ময়-রূপান্তরের স্বরূপ। কখনও তার ক্রিয়া ক্রমবাহী ও অনতিদ্রুত, কখনও-বা ক্ষিপ্র ও ক্রান্তিকারী। এই রূপান্তরের প্রভাবে বারবার চেতনার উদয়ন ঘটে এবং অবশেষে লোকোত্তর ভূমিতে অধিরূঢ় হয়ে সেইখান থেকে সে দেহ-প্রাণ-মনের উপদ্রষ্টা এবং প্রশাস্তা হয়। এই অধিরূঢ়ভাবের সিদ্ধির সঙ্গে ক্রমেই নিবিড়তর ধারায় আধারে নেমে আসে ঊর্ধ্বভূমির চেতনা ও বিজ্ঞানের বীর্যবিভূতি এবং অবিশ্রান্ত উপচয়ের ফলে তা সাধকের স্বভাব-গত হয়ে দাঁড়ায়। এক জ্যোতির্ময় সামর্থ্য ও প্রজ্ঞাদীপ্ত প্রবেগ প্রথমে মনকে অধিকার করে নতুন ছাঁচে ঢালে, তারপর প্রাণে আবিষ্ট হয়ে তারও রূপান্তর ঘটায় এবং অবশেষে সংকুচিত দৈহ্যচেতনায় সঞ্চারিত হয়ে তার সঙ্কীর্ণতাকে পরাভূত করে জাগায় সাবলীল বৈপুল্য—এমন-কি নিরঙ্কুশ অনন্তসমাপত্তির

ছন্দ। কারণ আনন্ত্যবোধ এই অভিনব চেতনার স্বভাব। এর আবির্ভাবে আত্মপ্রকৃতির এক স্বচ্ছন্দ ঔদার্যের অভিঘাতে সকল সঙ্কোচ ভেঙে যায়—চেতনা নিত্যবিকশিত থাকে শাশ্বত আনন্ত্যের অমিতবিশাল সংবিতে। অমৃতত্বের অনুভব তখন চিরাগত বিশ্বাস বা ক্ষণিক উপলব্ধির বিষয় না হয়ে স্বাত্মানুভবের একটা সহজবৃত্তি হয়। পরমপুরুষের নিত্যসান্নিধ্য, অন্তর্যামিরূপে তাঁর দ্বারা বিশ্বের ও সর্বভূতের প্রশাসন, অন্তরে-বাইরে সর্বত্র তাঁর চিৎশক্তির উল্লাস, আনন্ত্যের নিত্যনির্ঝরিত প্রশান্তি এবং আনন্দ—এ সমস্তই যেন হয় অবিচ্ছেদ ও অপরোক্ষ অনুভূতির বস্তু। বিশ্বের সকল রূপে সকল দৃশ্যে সাধক তখন দেখে শাশ্বতকে, সৎস্বরূপকে। সকল শব্দে শোনে তাঁর মন্ত্র, সকল স্পর্শে পায় তাঁর অনুভব। নিখিল জুড়ে সে দেখে ঘটে-ঘটে তাঁরই রূপোল্লাসের বিসৃষ্টি—আর হৃদয়ের উদ্বেল ভক্তির আনন্দে. নিখিলের নিবিড় বাহুবন্ধনে. চিন্ময় তাদাত্ম্যানুভবের পুলকে নিত্য আপ্লুত হয় তার চেতনা।...এমনি করে মনোময় জীবের চেতনা আবর্তিত হয়—কিংবা অলক্ষ্যে আবিষ্ট ও রূপান্তরিত হয় চিন্ময়-পুরুষের চেতনায়। তিনটি রূপান্তরের এইটি হল দ্বিতীয়—যা ব্যক্ত ও অব্যক্তের মধ্যে সেতুর মত. বিষ্ণুপদের অন্তরিক্ষরূপে যা প্রকৃতির চিৎপরিণামের বিশিষ্ট একটি পর্বসন্ধি।

চিৎসত্তা যদি প্রথম হতেই লোকোত্তর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে ভূত ও চিত্তের অক্ষত নির্লাঞ্ছন পটভূমিকায় তার জ্যোতির্ময় রূপের রেখা ফোটাতে পারত, তাহলে আধারের অখণ্ডিত চিন্ময়-পরিণামও ক্ষিপ্র এবং সুসাধ্য হত। কিন্তু প্রকৃতির ধরনধারন তো বস্তুত সহজ নয়। তার চলনে আছে নানা বৈচিত্র্য সর্পিলতা ও কুটিল রেখার বাহুল্য। তার দিগন্তবিথার দৃষ্টিতে ফোটে আরব্ধ ব্রতের সকল খুঁটিনাটি। সমস্যাকে সে কঠিন হতে কঠিন করে—সহজ সমাধানের ম্লান নির্বীর্য আনন্দ চায় না বলেই। আধারের প্রত্যেকটি বৃত্তির স্বভাব ও স্বধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে—তাদের পুরানো ছাঁচের প্রত্যেকটি লিখনকে অটুট রেখে। তারপর তার ক্ষুদ্রতম ভাগ ও ক্ষীণতম স্পন্দকে অযোগ্য হলে বিধ্বস্ত করে আর-কিছুকে তার জায়গায় বসাতে হবে, আর যোগ্য হলে সোনা করে নিতে হবে উত্তর-সত্যের স্পর্শ দিয়ে। তৈজস-রূপান্তর সিদ্ধ হলে এ-সাধনা অবশ্য দুঃখদায়ক হয় না—যদিও সেক্ষেত্রেও চাই দীর্ঘদিনের নিষ্ঠাপূত তপস্যা এবং প্রগতির সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি। চৈত্যসত্তার নির্মুক্ত প্রকাশ না হলে চিন্ময়-রূপান্তরের আংশিক সিদ্ধি নিয়েই সাধককে তৃপ্ত থাকতে হবে। আর নিখুঁত পূর্ণতার আকূতি বা আত্মার বুভুক্ষা যদি অদম্য হয়, তাহলে বাধ্য হয়ে তাকে সাধনার দুর্গম পথে চলতে হবে—কণ্টকবিদ্ধ চরণে অফুরন্ত দিক্‌প্রান্তের দিকে চেয়ে-চেয়ে। কারণ. বিশেষ-কোনও উজ্জ্বল মুহূর্তেই সাধারণত আমাদের চেতনা সানুসঞ্চারী হয়, নইলে প্রায়ই সে মনোভূমিতে থেকেই শক্তিপাতকে গ্রহণ করে। কখনও উপর

হতে চিদ্‌বীর্যের বিবিক্ত একটি ধারা নেমে আসে এবং আধারে আহিত হয়ে চিন্ময় ঐশ্বর্যে তাকে জ্যোতিষ্মান করে। কখনও-বা উপর্যুপরি ধারাপাতে তার মধ্যে ক্রমে চিৎসত্তার স্থিতি ও স্ফুরত্তা উভয়েরই বীর্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অনুত্তর ভূমিতে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা লাভ না করলে আধারের সম্যক্ রূপান্তর অংশত সিদ্ধ হবারও আশা নাই। তৈজস-রূপান্তরদ্বারা পূর্ব হতে নিজেকে প্রস্তুত না করে অজ্ঞানে উত্তরশক্তিকে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করলে, অপরা প্রকৃতির অমেধ্য ও দোষদুষ্ট আধার তার তীব্রসংবেগকে ধারণ না করতে পেরে বিকল বা বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে—দিব্য সোমধারার পরিস্রবে বিশীর্ণ অপক্ক পাত্রের মত। অথবা আধারে আশ্রয় না পেয়ে অবতীর্ণ শক্তি আবার গুটিয়ে যেতে বা চলকে পড়তেও পারে। হয়তো উপর হতে নেমে আসছে শক্তির বিশেষ প্রবেগ। সাধকের অশুদ্ধচিত্ত বা প্রাণময় অহন্তা তাকে যদি আপন ভোগৈশ্বর্যের তৃপ্তিসাধনায় নিয়োজিত করে, তবে তার অবাঞ্ছিত পরিণাম হবে অহমিকার অতিস্ফীতি এবং নানা সিদ্ধাই ও বিভূতির পিছনে ছোটাছুটি। আবার আধারে পঙ্কিল কামবাসনার আতিশয্য থাকলে, ঊর্ধ্ব হতে অবতীর্ণ আনন্দধারাকে সে কলুষিত মত্ততার আবর্তে ফেনিয়ে তুলতে পারে। শক্তি কুণ্ঠিত হয়ে ফিরে যায়—যদি আধারে দুরাকাঙ্ক্ষা মিথ্যা অভিমান বা এমনিতর প্রতিকূল কোনও হীনবৃত্তি থাকে। তামসিকতা কিংবা যে-কোনও অবিদ্যা-বৃত্তির প্রতি আসক্তিতে জ্যোতির ধারা প্রত্যাহৃত হয়—দেবতা বিমুখ হয়ে চলে যান অমার্জিত হৃদয়ের অঙ্গন হতে। আবার কখনও প্রত্যাহৃত শক্তির উচ্ছিষ্ট পরিণামকে নিয়ে আধারে শুরু হয় আসুরী শক্তির দেববিরোধী প্রমত্ততার তাণ্ডব। সর্বনাশ যদি এতদূর ঘনিয়ে নাও আসে, তবু গ্রহীতার অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতে কিংবা আধারের সহস্র বিকলতায় রূপান্তর ব্যাহত হয়। শক্তি মাঝে-মাঝে নেমে আসে, কিন্তু তার ক্রিয়া চলে আড়ালে-আড়ালে। অর্জিত দৈবী সম্পদকে জীর্ণ করতে কিংবা আধারের বিদ্রোহী অংশকে অনুকূল করতে সাধকের দীর্ঘকাল কেটে যায়—ততদিন শক্তি গুহাহিত ও স্তিমিত হয়ে থাকে। এখনও অমানিশা যেখানে ছেয়ে আছে, সেখানে আঁধারে বা স্বল্পালোকের পাণ্ডুরতায় আলোর তপস্যা চলে। আধারের বীর্যহীনতায় যে-কোনও মুহূর্তে শক্তির ক্রিয়া স্থগিত হতে পারে। হয়তো এ-জন্মে যতটুকু করবার সাধক তা করে নিল—সীমিত সামর্থ্যের বাইরে আর তার পা বাড়াবার সাধ্য নাই। হয়তো তার মন তৈরী রয়েছে, কিন্তু অন্ধ প্রাণ পূর্ব-সংস্কারের মোহ কাটিয়ে নবীনকে বরণ করতে চায় না। অথবা প্রাণ যদি-বা রূপান্তরের অনুকূলে, ক্লিষ্ট চেতনার অপরিহার্য বিপর্যয় ও তার নিগূঢ় শক্তির অভাবনীয় বিচ্ছুরণের অনুকূলে পঙ্গু অযোগ্য দেহ সাড়া দিতে পারছে না।

তাছাড়া, আধারের প্রত্যেকটি অংশকে তার স্বভাব ও স্বধর্ম অনুসারে পৃথকভাবে সংস্কৃত করতে হবে। তার জন্যে চেতনাকে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি

অংশে নেমে আসতে হয় এবং প্রত্যেকের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সাধ্যের মাপে তার শোধন-মার্জন করতে হয়। ঊর্ধ্বতন কোনও চিন্ময় ভূমি হতে শক্তিসঞ্চার দ্বারা রূপান্তর-সাধনার প্রয়াস করলে কিন্তু প্রকৃতির অভীষ্ট সিদ্ধ হত না। কেননা উত্তরশক্তির তীব্রসংবেগে জীবধাতুর ঊর্ধ্বপাতন উন্নমন বা অভিনবের সৃষ্টি সম্ভব হলেও আধারের অবরভাগ তাকে আপন বলে মেনে নিতে পারত না। কারণ এ তো আধারের সমগ্র সম্যক্‌ ও স্বচ্ছন্দ পরিণাম নয়—এ যে তার স্বভাবের প্রতি বলাৎকার। তাতে তার কোনও অংশ যদি-বা মুক্তির ডাকে সাড়া দিয়েছে, তেমনি আবার আরেক অংশ অসাড় হয়ে গেছে অপ্রত্যাশিত নিষ্পেষণে কিংবা অনাদরে ও অবহেলায় অমার্জিত অবস্থাতেই থেকে গেছে। স্বভাবের প্রতিকূলে বাইরে-থেকে-চাপানো কোনও নির্মিতি ততক্ষণ নিরঙ্কুশ স্থায়িত্বের দাবি করতে পারে, যতক্ষণ তার মূলে সিসৃক্ষার ধারানিষেক অনিরুদ্ধ থাকে। আধারের অবরভাগেও চিৎশক্তির অবতরণ এইজন্যই আবশ্যক। কিন্তু তবু উত্তরতত্ত্বের পূর্ণ বীর্যকে ফুটিয়ে তোলবার পথে অনেক বাধা জমে ওঠে। উপর হতে নীচে নামবার পথে শক্তির যে বিপরিণাম তরলায়ন ও অপচয় ঘটে, তাইতে তার পরিপাকে একটা সঙ্কোচ ও অপূর্ণতার ছোঁয়াচ থেকেই যায়। মহাবিদ্যার দীপ্ত চেতনায় নেমে আসে·· কিন্তু তার তাৎপর্যকে আমরা ভুল বুঝি, প্রাণ ও মনের প্রমাদের সঙ্গে তার সত্যের সংমিশ্রণ ঘটাই। তাই আধারে তার প্রকাশ হয় স্তিমিত এবং বিকৃত - তাতে যতখানি আলো থাকে, ততখানি আত্মসম্পূর্তির সামর্থ্য থাকে না। অধিমানসের জ্যোতিঃশক্তি স্বারাজ্যের মহিমা নিয়ে স্বধামে কাজ করছে—এ হল এক কথা। আর সেই জ্যোতি দৈহ্য চেতনার অন্ধ পরিবেশে নিষ্প্রভ হয়ে কাজ করছে—এ হল আরেক কথা। ভেজাল-মেশানো ফিকা শক্তি যে স্বভাবের বীর্য হারিয়ে জ্ঞানে বলে ও ক্রিয়ায় দুর্বল হবে—সে তো বলাই বাহুল্য। তার ফলে আধারে আমরা দেখব শক্তির খণ্ডিত বীর্য, তার অসমগ্র পরিণাম কিংবা কুণ্ঠিত প্রচার মাত্র।

এইজন্যই প্রকৃতির মধ্যে চিৎশক্তির স্ফুরণ এত মন্থর ও আয়াসসাধ্য। প্রাণ ও মন জড়ের আয়তনে যখন নেমে আসে, তখন নিমিত্ত ও পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়েই তাদের কাজ করতে হয়। জড়ধাতু এবং জড়শক্তির তামসিকতা আর আড়ষ্ট অসারতা প্রাণ-মনকে খর্ব ও বিকৃত করে। তাই জড় আধারের পূর্ণরূপান্তর দ্বারা তাকে একেবারে নতুন ধাতুতে গড়ে নিজেদের স্বাভাবিক সত্যবীর্যের বাহন করা তাদের সাধ্যে কুলায় না। প্রাণচেতনার সহজস্ফূর্তিতে যে-সৌন্দর্য ও যে-মহিমা আছে, জড়ের আড়ষ্টতাকে অতিক্রম করে আধারে তার প্রকাশ উদার ও স্বচ্ছন্দ হতে পারে না। তাই পদে-পদে প্রাণের প্রেতি কুণ্ঠিত হয়, তার দিব্য ভাবনার দীপ্ত সত্যের তুলনায় মর্ত্য সিসৃক্ষার সংবেগ স্তিমিত হয়, তার সৃষ্ট আধারের অন্তরের প্রকাশবেদনায় আকুল হয়ে

ফেরে জাগ্রত বোধির কল্পনা। মনেরও সেই দশা ঘটে। জড় ও প্রাণের আধারে আত্মমহিমাকে ফোটাতে গিয়ে প্রতি পদে তাকে চলতে হয় রফা আর রেয়াত ক'রে, তাই তারও দিব্য ভাবনা ঊনীকৃত হয়। তার জ্ঞানে ও সংকল্পে স্বচ্ছতা থাকে, কিন্তু সেই অনুপাতে শক্তি থাকে না—যাতে এই অবরধাতুকে সে কল্পলোকের সে-স্বচ্ছতাকে ফুটিয়ে তুলতে বাধ্য করবে। বরং প্রাণের উত্তাল আবিলতায় ও জড়ত্বের মূঢ় সঙ্কোচে তার বীর্য কুণ্ঠাহত হয়, সংকল্প হয় দ্বিধাগ্রস্ত, জ্ঞান ব্যামিশ্রভাবের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। পরিবেশের প্রতিকূলতায় আত্মবীর্যের সমগ্র সামর্থ্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না বলেই প্রাণ আর মন জড়ের জীবনকে পূর্ণায়ত বা গোত্রান্তরিত করতে পারে না। তার জন্য তারা কোনও ঊর্ধ্বতন শক্তির প্রতীক্ষায় থাকে—যে তাদের বন্ধন ঘুচিয়ে খুলে দেবে স্বারাজ্যসিদ্ধির দুয়ার। কিন্তু ঊর্ধ্বলোকের চিন্ময়-মনোময় শক্তিও প্রাণ ও জড়ের আধারে নামতে এসে ওই একই কুণ্ঠার নাগপাশে বাঁধা পড়ে। অবশ্য উত্তরশক্তি মনের চাইতে আরও-খানিক এগিয়ে যায়, দীপালির অনেক দীপই সে আধারে জ্বালিয়ে তোলে। কিন্তু তাহলেও সঙ্কোচ আর বিকৃতি হতে তারও নিস্তার নাই। চিৎশক্তির স্বাভাবিক বীর্য অখণ্ডিত, অর্থাৎ চেতনা ও শক্তির কোনও অনুপাত-বৈষম্য তার মধ্যে নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে অবতারিত চেতনায় আর তার অর্থক্রিয়াকারিতায় সেই বৈষম্যই দেখা দেয়—চেতনার যা সংকল্প, শক্তির তা সাধ্যে কুলায় না এবং তাইতে তার সৃষ্টি ঊনীকৃত হয়। কখনও-কখনও ঊর্ধ্বশক্তির আবেশে একটা অপ্রত্যাশিত ওলট-পালট হয়ে যায় আধারে—মনে হয় গোত্রভূ-চেতনার এবার বুঝি উজান-বওয়া শুরু হল। কিন্তু বস্তুত তার স্রোতাপত্তির ফল যে অবন্ধ্য অর্থক্রিয়ায় পর্যবসিত হবেই, জোর করে তা বলা যায় না।

অব্যাহত অর্থক্রিয়ার বীর্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে একমাত্র অতিমানসই আধারে অবতরণ করতে পারে। কেননা অতিমানস কবিক্রতু—তার কৃতি স্বারসিক ও স্বতঃস্ফূর্ত, তার ইচ্ছায় ও জ্ঞানে কোনও ভেদ নাই বলে ক্রিয়াফলেও কোনও বন্ধ্যতা নাই। স্বকৃৎ ঋত-চেতনাই অতিমানসের স্বভাব। সুতরাং তার স্বরূপ বা ক্রিয়ার আপাতসঙ্কুচিত বৃত্তির মূলে আছে নিজেরই স্বেচ্ছাতন্ত্রিত আকূতি, পরতন্ত্রতার জুলুম নয়। তার স্বয়ংবৃত সঙ্কোচ তার বিভূতিমাত্র, তাই ক্রিয়া আর ক্রিয়াফলে সেখানে থাকে সৌষম্যের ছন্দ এবং পরিণামের অপরিহার্যতা।...কিন্তু অধিমানস আবার মনেরই মত বিভজ্যবৃত্তি। তার বৈশিষ্ট্য হল সৌষম্যের বিশেষ-একটি ছন্দকে বেছে নিয়ে স্ব-তন্ত্রভাবে তাকে রূপায়িত করা। তার প্রবৃত্তি সংবর্তুল বলে একটা অখণ্ড ও পূর্ণকল সৌষম্য সে সৃষ্টি করতে পারে বটে, কিংবা সৌষম্যের বহুধাবৃত্ত ছন্দোরাজিকে ঐক্যের ভাবনায় সংহত বা সংশ্লিষ্ট করতে পারে। কিন্তু মন প্রাণ ও জড়ের উপাধিতে ক্লিষ্ট হয়ে কাজ করতে হয় বলে সৌষম্যের অখণ্ডতাকে সে গড়ে

তোলে স্ব-তন্ত্র খণ্ডের অন্যোন্যসংযোগদ্বারা। তার সমগ্রত্বের ভাবনা ব্যাহত হয় নির্বাচনী ভাবনার তাগিদে—কেননা প্রাণ-মনের যে-উপাদান নিয়ে এখানে তার কাজ, ওই তাগিদ তার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে। তাই তার চিন্ময় সৃষ্টিও হয় অখণ্ড পূর্ণতার মধ্যে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিবিক্ত। সম্যক্-বিজ্ঞানের অভঙ্গ বিসৃষ্টির শতদল গড়া তার সাধ্যের বাইরে। এইজন্যেই—বিশেষত আধারে নামবার সঙ্গে-সঙ্গে—তার স্বাভাবিক জ্যোতিঃশক্তির ক্রমিক অবক্ষয় ঘটে বলে কৃতকৃত্যতার চরমে সে পৌঁছতে পারে না এবং তাইতে নিজেকে প্রমুক্ত ও সার্থক করবার জন্যে অতিমানসের উত্তরশক্তিকে তার আবাহন করতে হয়। আত্মসম্পূর্তির তাগিদে তৈজস-রূপান্তর যেমন চিন্ময়-রূপান্তরের অপেক্ষা রাখে, প্রথম চিন্ময়-রূপান্তরও তেমনি অপেক্ষা রাখে অতিমানস-রূপান্তরের। ঊর্ধ্বপরিণামের প্রত্যেকটি ধাপ এপর্যন্ত কেবল উত্তরসংক্রান্তির ইঙ্গিত এনেছে। কিন্তু পরিণামের চরম-প্রত্যাশিত আমূল ও অখণ্ড রূপান্তরের প্রতিষ্ঠা হবে অবিদ্যালেশশূন্য বিদ্যার ভূমিতে এবং তা সিদ্ধ হতে পারে মর্ত্যজীবনের 'পরে একমাত্র অতিমানসের শক্তিপাত ও সাক্ষাৎ আবেশদ্বারা।

এই তৃতীয় রূপান্তরই চরম রূপান্তর। অবিদ্যার দীর্ঘপথ অতিবাহনের অবসানে জীবকে বিদ্যার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করা, তার শক্তি ও চেতনাকে তার জীবনের সাধনা ও আত্মবিভাবনার ধারাকে অখণ্ড আত্মবিজ্ঞানের নিরঙ্কুশ অর্থক্রিয়াকারিতার ভিত্তিতে নতুন করে রূপায়িত করা—এই হল অতিমানস-রূপান্তরের স্বধর্ম। এর জন্যে ঊর্ধ্বপরিণামিনী প্রকৃতির তৎপর উদ্যতির মধ্যে ঋত-চিতের অবন্ধ্য বীর্য নেমে আসে এবং প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় অতিমানসী ভাবনার প্রবেগকে মুক্তি দেয়। তার ফলে এই মর্ত্যভূমিতেই অতিমানস ও চিন্ময় পুরুষের আবির্ভাব ঘটে—জড়বিশ্বে চিদাত্মার স্বরূপসত্যের নির্মুক্ত প্রকাশের প্রথম নিদর্শনরূপে।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

উদয়ন—অতিমানসের দিকে

ঋতেন যাবৃতাবৃধাবৃতস্য জ্যোতিষস্পতী।

ঋগ্বেদ ১।২৩।৫

ঋতজ্যোতির পতি যাঁরা—ঋত দিয়ে ঋতকে করেন বর্ধিত।

—ঋগ্বেদ (১।২৩।৫)

তিস্রো বাচঃ জ্যোতিরগ্রা।
ত্রিধাতু শরণং শর্ম. .ত্রিবর্তু জ্যোতিঃ।

ঋগ্বেদ ৭।১০১।১,২

জ্যোতিরগ্রা তিনটি বাক্. .ত্রিপর্বা শান্তিসদন—ত্রিবর্তনি জ্যোতি।

—ঋগ্বেদ (৭।১০১।১,২)

চত্বার্যন্যা ভুবনানি নির্ণিজে চারূণি চক্রে যদৃতৈরবর্ধত ॥

ঋগ্বেদ ৯।৭০।১

আরও চারটি চারু ভুবন রচেন তিনি আত্মরূপায়ণের তরে—যখন ঋতসমূহের দ্বারা বর্ধিত হন তিনি।

—ঋগ্বেদ (৯।৭০।১)

সং দক্ষেণ মনসা জায়তে কবিঃ; ঋতস্য গর্ভঃ।
গুহাহিতং জনিম নেমমুদ্যতম্ ॥

ঋগ্বেদ ৯।৬৮।৫

দক্ষ মন নিয়ে প্রজাত হন সেই কবি; ঋতের গর্ভজ তিনি, গুহাহিত জন্ম তাঁর -আধখানি উদ্যত।

—ঋগ্বেদ (৯।৬৮।৫)

বৃহচ্ছ্রবসঃ...জ্যোতিষ্কৃতঃ...প্রচেতসঃ...বিশ্ববেদসঃ.. ঋতাবৃধঃ।

ঋগ্বেদ ১০।৬৬।১

তাঁরা বৃহৎ-শ্রবাঃ, জ্যোতিষ্কৃৎ, প্রচেতা, বিশ্ববেদাঃ, ঋতে বর্ধমান।

—ঋগ্বেদ (১০।৬৬।১)

উদ্‌বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥

ঋগ্বেদ ১।৫০।১০

তমসার পারে উত্তরজ্যোতিকে দেখে আমরা এলাম দেবত্বের আধারে দিব্য সূর্যের কাছে—এলাম উত্তমজ্যোতিতে।

—ঋগ্বেদ (১।৫০।১০)

তৈজস-রূপান্তর ও চিন্ময়-রূপান্তরের প্রাথমিক স্তরসম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আমাদের অসম্ভব নয়। আমরা জানি, জ্ঞান ও অনুভবের যুগনদ্ধ অখণ্ড-অন্বয় পরমাসিদ্ধিতে রূপান্তরেরও সিদ্ধবীর্যের সম্যক পরিচয়। এ-সিদ্ধিকে মানুষের করায়ত্ত বলা চলে, যদিও তেমন সিদ্ধের

সংখ্যা এখনও মুষ্টিমেয়। কিন্তু অতিমানস-রূপান্তরের সাধনা আমাদের নিয়ে যায় স্বল্পাবিষ্কৃতের রাজ্যে। দৃষ্টির সম্মুখে যে উত্তুঙ্গ চেতনার আভাস সে মেলে ধ'রে, দূরান্তরের পথিক তার চকিত ছবি এখানেও নিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু তার অন্ধি-সন্ধির পরিপূর্ণ মানচিত্রটি এখনও আমাদের অগোচরে। চেতনার যে-মালভূমিতে আছে অতিমানস গৌরীশঙ্করের উচ্ছ্রিত মহিমা, সে-সুদূরকে মনের কোনও ছকে কি নকশায় বন্দী করবার তৃপ্তি, কিংবা মনের কোনও দর্শন বা বিবৃতির আমলে আনবার সামর্থ্য আজও আমাদের প্রত্যাশার বাইরে। যে-চেতনার মধ্যে সংবিতের ধরন একেবারে আরেক থাকের, অনুদ্ভাসিত ও অরূপান্তরিত প্রাকৃত-মনের প্রত্যয় দিয়ে তাকে প্রকাশ করা কি তার মধ্যে প্রবেশ করা বাস্তবিকই দুঃসাধ্য। প্রতিবোধের চকিত ঝলকে কখনও যদি-বা জ্যোতির দুয়ার খুলে যায় এবং ওপারের দর্শন বা প্রত্যয় চেতনার মর্মমূলে নিরূঢ় হয়—তবু তাকে তর্জমা করবার জন্য চাই অবাস্তবের দীনতালাঞ্ছিত এই মামুলী ভাষার চাইতে বীর্যশালী আর-কোনও বাণীর বৈদ্যুতী, নইলে অধরার তত্ত্বকে ধরবার কোনও উপায়ই যে আমাদের নাই। পশুর চেতনায় যেমন মানবমনের উত্তুঙ্গশিখরের কোনও পরিচয় ফুটতে পারে না, তেমনি অতি-মানসের লীলায়নকে প্রাকৃত-মনের ধৃতিশক্তির সামান্যবৃত্তি দিয়ে ধরা যায় না। মানসোত্তর অন্তরিক্ষচেতনার অনুভব যদি মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে, তবেই উপমানের সহায়ে অতিমানসের বাঙ্‌ময় আমাদের বুদ্ধির কাছে যথাযথ অর্থবহ হতে পারে: কেননা বিবৃত বস্তুর সজাতীয় একটা-কিছুকে অনুভব করেছি বলে, এই কুণ্ঠিত বিবৃতিকেই আমরা জ্ঞাতার্থের অনুরূপ জ্ঞেয়ার্থের পরিকল্পনাতে তর্জমা করতে পারি। অতিমানস প্রকৃতিতে আবগাহন করা মনের সাধ্য নয়। তবু ঊর্ধ্বচেতনার এইসব জ্যোতিঃসঙ্কেতের অনুসরণে অতিমানসের দিকে তাকাতে গিয়ে মন হয়তো সেই 'ঋতং সত্যং বৃহৎ'এর চিন্ময় স্বরাট মহিমার আ-ভাসকে খানিকটা চিনতে পারবে।

কিন্তু অতিমানসের উপান্তে অন্তরিক্ষ-চেতনার যে-জ্যোতির্লোক রয়েছে, তারও সম্যক পরিচয় দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সে-সম্পর্কে সামান্য-প্রত্যয়ের পাণ্ডুর ভাষায় আভাসে-ইঙ্গিতে শুধু পথ চলবার উপযোগী কতগুলি সঙ্কেত দেওয়া চলে। তবে ভরসার কথা এই যে, ঊর্ধ্বচেতনার প্রকৃতি ও ধরন যতই স্বতন্ত্র হোক্, মর্ত্যপরিণামের ধারায় প্রাকৃত আধারে তার যে প্রাথমিক রূপসিদ্ধি দেখা দিয়েছে, তা আমাদের অন্তর্নিহিত বীজভাবের স্ফুরণ মাত্র। অর্থাৎ ঊর্ধ্বচেতনায় পূর্ণস্বরূপের যে আ-ভাস ও বীর্য ভ্রূণের মত স্তিমিত হয়ে ছিল, মর্ত্য আধারে তারই ঘটছে চরম চমৎকার। তাছাড়া আরও-একটা কথা। প্রকৃতিপরিণামের মূলাধার হতে উদয়নের উত্তুঙ্গতম শিখর পর্যন্ত সর্বত্র দেখি তার প্রগতির ধারায় একই ছন্দ—যদিও ক্ষেত্রবিশেষে সে-ছন্দের চালে সামান্য অদল-বদল হয়েছে। তাই এই ছন্দঃসূত্রটি

করে, মহাপ্রকৃতির উজানধারাকে অন্তত কিছুদূর অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য নয়। বৌদ্ধ-মন হতে চিন্ময়-মনে উত্তরণের রীতি-প্রকৃতি কি, তার খানিকটা আমাদের জানা আছে। এই সিদ্ধিকে আদিবিন্দু করে নব-চেতনার উত্তরবিভূতির অয়নপথটি আমরা চিনে নিতে পারি এবং চিন্ময়-মন হতে অতিমানসের দিকে দূরতর অভিযানের একটা রেখাছবি পাই। কিন্তু এ-ছবি স্বভাবতই অস্পষ্ট, কেননা দার্শনিকের সমীক্ষা এক্ষেত্রে একটা সামান্যবিবৃতির অবস্তুতন্ত্র ভূমিকাই শুধু রচনা করতে পারে। তাকে আপূরণ করতে বৈজ্ঞানিকের বিশেষ-বিবৃতি আমরা পাব ভাবকের বিদ্যুন্ময় বাণীতে—সান্দ্র এবং অপরোক্ষ অনুভবের রহস্যদীপ্তির চিত্রলেখায়।

অধিমানসের ভিতর দিয়ে অতিমানসে উত্তীর্ণ হবার অর্থ হল চিরাভ্যস্ত প্রাকৃত চেতনার অতিপ্রাকৃত চেতনায় রূপান্তর। অতএব স্বভাবতই তা মনের সকল সাধ্যসাধনার বাইরে। সেখানে আমাদের ব্যক্তিগত অভীপ্সা কি প্রয়াস দোসর ছাড়া পেঁছতে পারে না, কেননা আমাদের সমস্ত সাধনপ্রয়াস প্রকৃতির অবরশক্তির লীলা মাত্র। অবিদ্যাশক্তির এমন-কোনও বৈশিষ্ট্য কি উপায়-কুশলতা নাই, যাতে সে আপন জোরে তার অধিকারবহির্ভূত বস্তুকে আয়ত্ত করতে পারে। প্রকৃতির প্রাক্তন যত উদয়ন, তার মূলে রয়েছে নিগূঢ় চিৎ-শক্তির সংবেগ—যার প্রথম স্ফুরণ হয়েছে অচিতিতে, তারপর অবিদ্যায়। প্রকৃতির অতীত ব্যাকৃতি হতেও মহত্তর যে-চিদ্‌বিভূতির সম্ভাব্যতা যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল, তার সংবৃত্ত বীর্যকে বিবৃত্ত করা চিৎশক্তির ব্রত। কিন্তু তবু তার জন্য অব্যক্তের পরে চিৎশক্তির স্বধামে স্বভাবছন্দে স্ফুরিত এইসব উত্তরবিভূতির একটা চাপ আবশ্যক হয়। সেই চাপে আমাদের অধিচেতনায় তাদের একটা প্রতিষ্ঠাভূমি গড়ে ওঠে, যেখানে থেকে বহিশ্চর পরিণামের ক্রিয়াকে তারা প্রভাবিত করতে পারে। অধিমানস এবং অতিমানসও মর্ত্যপ্রকৃতিতে নিগূঢ় ও সংবৃত্ত হয়ে আছে। কিন্তু আজও অধিচেতনার অন্তর্লোকে আমাদের নাগালের মধ্যে তাদের কোনও সিদ্ধরূপের স্ফুরণ হয়নি। আজপর্যন্ত বহিশ্চেতনায় বা আমাদের অধিগম্য অধিচেতনায়, অতিমানস কি অধিমানসের কোনও সত্ত্বমূর্তি বা সংহত প্রকৃতি গড়ে ওঠবার অবকাশ পায়নি। চিৎশক্তির এসব উত্তরবিভূতি আমাদের অবিদ্যাভূমির কাছে এখনও অতিচেতন। অন্তঃসংবৃত্ত অধিমানস ও অতিমানস তাদের নিভৃত গুহাশয়ন ছেড়ে জেগে উঠবেই। কিন্তু সেইজন্যেই চাই, অতিচেতনার সত্তা ও বীর্য আমাদের মধ্যে নেমে আসুক মুক্তধারায়—আধারকে উল্লসিত করে আমাদের সত্তায় এবং বীর্যে আপনাকে মূর্ত করুক। এই শক্তিপাতের প্রবেগেই প্রকৃতি তার অভ্যস্ত সংস্কারের গণ্ডি ভেঙে আপনাকে অভূতপূর্ব রূপান্তরে সার্থক করবে।

কল্পনা করা যাক্ : শক্তিপাত ছাড়াই, শুধু উত্তরশক্তির নিগূঢ় প্রৈষাতে দীর্ঘযুগব্যাপী প্রকৃতিপরিণামের ফলে আমাদের মর্ত্যচেতনার সঙ্গে অধুনা-

অতিচেতন উত্তরভূমির একটা নিবিড় যোগ ঘটল এবং সত্তার গহনে অধিচেতন-ভূমিতে অধিমানসেরও একটা বিগ্রহ ফুটে উঠল। তার দরুন বহিশ্চেতনাতেও ধীরে-ধীরে উত্তরচেতনার একটা আ-ভাস জাগল। এমনি ক'রে পৃথিবীতে ক্রমে দেখা দিল মনোময় সত্ত্বের একটা থাক্। তাদের চিন্তা ও কর্ম নির্বাহিত হয় শুধু যুক্তি-বুদ্ধি বা বিচার-বুদ্ধি দিয়ে নয়—কিন্তু বোধিবাসিত চিত্তের বৃত্তি দিয়ে। এ'কে বলতে পারি উদয়নের পথে রূপান্তরের প্রথম পর্ব। তারপর হয়তো দেখা দিল অধিমানসের ব্যাপ্রিয়া—যা তাদের নিয়ে যাবে চেতনার প্রত্যন্তভূমিতে, অতিমানস বা বিজ্ঞানঘন দিব্যভাবের জ্যোতির্ময় উপকূলে।.. কিন্তু এ-কল্পনার বিরুদ্ধে দুটি আপত্তি। প্রথমত এ ধরনের উত্তরণ হবে প্রকৃতির অযথাবিলম্বিত একটা কৃচ্ছ্রসাধনামাত্র। দ্বিতীয়ত এর ফলে হয়তো আমরা পাব মানস সিদ্ধিরই একটা উন্নত অথচ অসম্পূর্ণ সংস্করণ। চেতনার 'পরে নবস্ফুরিত উত্তরবৃত্তির ঈশনা প্রবল হলেও, অবরমানসের ছোঁয়াচে তখনও তাদের ক্রিয়াতে একটা বিপর্যয় ঘটবেই। হয়তো বিজ্ঞানের নবদীপ্তি চিত্তের পরিসরকে বহুদূর উদ্ভাসিত করবে—ঊর্ধ্বক্রমের প্রত্যয়ও ফোটাবে তার মধ্যে। কিন্তু তাহলেও চেতনাকে অবিদ্যাকবলিত ব্যামিশ্রভাব হতে বাঁচানো যাবে না, যেমন জড় ও প্রাণের সঙ্কোচবৃত্তি হতে মনকে বাঁচানো যায় না। রূপান্তরকে সত্য ও সার্থক করতে হলে চাই ঊর্ধ্বশক্তির অপরোক্ষ ও নির্মুক্ত আবেশ। আর সেই আবেশের কাছে চাই অবরচেতনারও কুণ্ঠাহীন নতি ও সমর্পণ, চাই তার দুরাগ্রহের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি —আধারের 'পরে সমস্ত দাবি-দাওয়া ছেড়ে রূপান্তরের জ্যোতিঃপ্রবাহে তার স্বতন্ত্র প্রবৃত্তির সকল স্পৃহা ভাসিয়ে দেওয়া চাই। আবেশ ও সমর্পণের এই যুগল-বিধান আমাদের প্রবুদ্ধচিত্তের চিন্ময় আকূতি ও অটল সংকল্পের অগ্নিবীর্যে এই মুহূর্তে যদি সার্থক হয়, সমগ্র আধারের অন্তরে-বাইরে ঊর্ধ্বস্রোতা রূপান্তরের অনুকূলে যদি একটা সাড়া পড়ে যায়—তাহলে প্রকৃতির মন্থর পরিণামের 'পরে নির্ভর না করে জাগ্রত চেতনার দীপ্ত প্রবেগে আমরা ঈপ্সিত রূপান্তরকে ক্ষিপ্রসঞ্চারী করতে পারি। মনোময় মানুষের প্রবুদ্ধ সংবিৎ ও সঙ্কল্পের 'পরে উপর হতে অতিমানসী চিৎ-শক্তির আবেশ এবং কঞ্চুকের আড়াল হতে উৎসর্পিণী চিৎ-শক্তির উন্মুখ প্রেতি—এই দুটি মনোবীর্যের সঙ্গমে এই অভাবনীয় রূপান্তর সিদ্ধ হতে পারে। তার জন্য প্রতি পদক্ষেপে লক্ষযুগ অতিবাহিত করে, অবিদ্যাকবলিত জীবের অন্ধচেতনার আশ্রয়ে প্রকৃতিপরিণামের যে কৃচ্ছ্রমন্থর অভিযান—তার মুখ চেয়ে থাকবার কোনও আবশ্যক নাই।

রূপান্তরের প্রথম শর্ত এই। আজ যে-মানুষ মনোময় জীব মাত্র, তাকে অন্তশ্চেতন হয়ে আধারের নিগূঢ় ধর্ম ও প্রবৃত্তির শাসনভার তুলে নিতে হবে—তাকে হতে হবে 'ঈশানো ভূতভব্যস্য' অন্তর্মনোময় চৈত্য-পুরুষ। অপরা

প্রকৃতির ক্রীড়নক হয়ে আর তাকে কাল কাটাতে হবে না, পরা প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য ও সৌষম্যের 'পরে রচিত হবে তার স্বপ্রতিষ্ঠার অচল আসন। যুক্তি দিয়েও বুঝি, চিৎপরিণামের একটি বিশেষ লক্ষণ এই হবে যে, আত্মপ্রকৃতির প্রবৃত্তির 'পরে জীবের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ এবং বিশ্বপ্রকৃতির ব্যাপারে সচেতন যোগ-যুক্তির সামর্থ্য ক্রমেই তার বেড়ে যাবে। বিশ্বের যা-কিছু ব্যাপার, জড় প্রাণ কি মনের যত-কিছু প্রবৃত্তি, সমস্তই এক চিন্ময়ী বিশ্বশক্তির খেলা—এক চিন্ময় বিরাট্-পুরুষের আত্মবিভাবনারূপে বস্তুস্বভাবের ব্যষ্টি ও সমষ্টি সত্যের লীলায়ন। কিন্তু জড়ের মধ্যে এই চিন্ময়ী সিসৃক্ষা অচিতির আবরণে নিজেকে আবৃত করে বাইরে ফোটায় এক অন্ধ বিশ্বশক্তির নিশ্চেতন প্রমত্ততা- যা নিজের অজ্ঞাতসারে বিশ্বের একটা ছক বা পরিকল্পনাকে রূপ দিয়ে চলে। এই শক্তিপরিণামের সৃষ্টিও হয় তারই অনুরূপ। জগতে দেখা দেয় নিশ্চেতন ব্যক্তিভাবনার ফলে জড়ের বিগ্রহ অর্থাৎ বিশ্বে বস্তু পিণ্ড আবির্ভূত হয়—জীবসত্ত্ব নয়। এই পিণ্ডেরও একটা 'সংঘাত' আছে, নিজস্ব গুণ ও ধর্ম আছে—আছে আত্মসত্তার বৈশিষ্ট্য এবং চারিত্র। কিন্তু তাদের বিন্যাস ও সংহতির ক্রিয়া চলে প্রকৃতির যন্ত্রবৎ আবর্তনে। তার মধ্যে পিণ্ডব্যক্তির বিবিক্ত সংবিৎ প্রবর্তনা কি কর্তৃত্বের আভাসও থাকে না—কেননা এই জড়ময় ব্যক্তি-ভাবনায় দেখা দেয় প্রকৃতির প্রবৃত্তি ও বিসৃষ্টির বাক্যহারা আদিরূপ, তার উত্তরসৃষ্টির নিষ্প্রাণ বনিয়াদ। তারপর তির্যকযোনিতে দেখি, শক্তি আড়াল ছেড়ে ধীরে-ধীরে বাইরেও সচেতন হয়ে উঠেছে—তার প্রবর্তনায় শুধু বস্তু-পিণ্ডের নয়, জীবসত্ত্বেরও রূপায়ণ ঘটছে। কিন্তু তখনও জীবসত্ত্বের চেতনা অপরিস্ফুট, কেননা তার সংজ্ঞা বেদনা ও কর্মদায় থাকলেও শক্তির প্রবর্তনাকে সে অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলে—তার বুদ্ধিতে বা দৃষ্টিতে সে-প্রবর্তনার কোনও অর্থই স্পষ্ট হয়ে ফোটে না। নিরূঢ় প্রকৃতির দ্বারা আরোপিত ইচ্ছা কি রুচির বাইরে তার নিজস্ব বলতেও যেন কিছুই থাকে না। মানুষের মধ্যেই প্রথম দেখা দেয় অবেক্ষক বুদ্ধির তৎপরতা—ফোটে সুস্পষ্ট ইচ্ছা ও রুচির চেতনা। তবু মানুষের চেতনা সংকীর্ণ এবং বহির্বৃত্ত। তার জ্ঞানও তাই অপূর্ণ এবং সীমিত—তাতে তার বুদ্ধির খানিকটা মাত্র ছাড়া পায়। তাই নিজেকে বা জগৎকে বোঝা তার অর্ধেক বোঝা শুধু—তারও বেশির ভাগ হাতড়ে-হাতড়ে কাজে-কর্মে ঠেকতে-ঠেকতে বোঝা। তার বুদ্ধি যেখানে যুক্তিঘেঁষা, সেখানেও সে-যুক্তির মূলে আছে সূত্রের আকারে গাঁথা মনগড়া সিদ্ধান্তের প্ররোচনা। এখনও মানুষের বুদ্ধিতে জ্যোতির্ময় দিব্যদৃষ্টি ফোটেনি—যা বস্তুর তত্ত্বকে অপরোক্ষ করে যাথাতথ্যতার সহজ-বিধানে স্বভাব-সত্যের সঙ্গে সত্যদর্শনের ছন্দ মিলিয়ে তাদের গেঁথে নেবে। অবশ্য এই দিব্য-দৃষ্টির খানিকটা আভাস দেখা দিয়েছে মানুষের বোধি অন্তর্দৃষ্টি ও সহজ-সংস্কারের সীমিত সঞ্চয়টুকুর মধ্যে। কিন্তু তাহলেও তার বুদ্ধির স্বাভাবিক

ঝোঁক গবেষণা যুক্তি এবং বিচারের দিকেই। ভূয়োদর্শন অর্থাপত্তি ও অনুমানের সাহায্যে জোড়াতাড়া দিয়ে সত্যের বা বিজ্ঞানের একটা কাঠামো দাঁড় করানো, কিংবা চারদিক দেখে-শুনে নিজের সাধ্যমত অকাজের একটা ছক পাতা—এই হল বুদ্ধির ধর্ম। কিন্তু তার এ-সাধনাতেও আধখানি সিদ্ধি মেলে, কেননা আধারের যেসব শক্তি যন্ত্রমূঢ় প্রকৃতির অন্ধপ্রায় অনুচর, তারা তার জ্ঞান ও সংকল্পের পথে প্রতি পদে অতর্কিত বাধা এবং তামসিকতার বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলে।

কিন্তু চেতনার সামর্থ্যের এই কি সীমা, এই কি তার পরিণামের শেষ পর্ব, উত্তুঙ্গ অভিযানের শেষ শিখর?—নিশ্চয় নয়। একে পেরিয়েও আছে বৃহত্তর অন্তরঙ্গ বোধির অকুণ্ঠ বীর্য, যা বস্তুর মর্মমূলে অনুবিদ্ধ হবে, তাদাত্ম্য-ভাবনার জ্যোতিতে আলোকিত করবে প্রকৃতির রহস্যলীলা, মানুষের জীবনে আনবে অবন্ধ্য প্রশাসনের সামর্থ্য—অন্ততপক্ষে তার নিজের বিশ্বে সৌষম্যের একটা ছন্দ। একমাত্র অখণ্ড ও নির্মুক্ত বোধিচেতনাই অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষ ও মর্মাবগাহী দৃষ্টি দিয়ে বস্তুর স্বরূপসত্যকে আয়ত্ত করতে পারে। অন্তর্গূঢ় ঐক্য অথবা তাদাত্ম্যের ভাবনা হতে জাত ঋতম্ভরা ইন্দ্রিয়সংবিৎ দিয়ে সে-ই চেনে বস্তুর মর্মসত্যকে এবং প্রকৃতির সত্যের সঙ্গে প্রকৃতির ঋতের পরিণয় ঘটায়।...এমনি করেই জীব সচেতনভাবে চিৎশক্তির বিশ্বলীলার যথার্থ অংশভাক্ হবে। অর্থাৎ ব্যষ্টিপুরুষ যেমন হবে আত্মপ্রকৃতির ভর্তা ও নিয়ন্তা, তেমনি বিশ্বশক্তির লীলায়নেও সে হবে বিরাট্-পুরুষের নিত্যজাগ্রত অংশহর নিমিত্ত বা যন্ত্রস্বরূপ। বিশ্বশক্তি তার ভিতর দিয়ে কাজ করবে যেমন, সেও তেমনি কাজ করবে বিশ্বশক্তির ভিতর দিয়ে এবং ঋতম্ভরা বোধি-চেতনার সৌষম্য এই কর্মব্যতিহারকে একটি অখণ্ড ক্রিয়ায় পর্যবসিত করবে। এমনি করে প্রবুদ্ধচেতনার উপচয়দ্বারা বিশ্বলীলার অন্তরঙ্গ শরিক হবার সিদ্ধিতে প্রাকৃত চেতনার অতিপ্রাকৃত ভূমিতে উত্তরণের সূচনা দেখা দেবে।

এমন-একটা ঋতসুষমার লোক কল্পনা করা অসম্ভব নয়, যেখানে মানস বুদ্ধিই বোধির আলোকে দীপ্ত হয়ে স্বরাজ্যের নিরঙ্কুশ অধিকার পেয়েছে। কিন্তু এই মর্ত্যভূমিতেই বোধির শাসন এমন অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হবে—এ-আশা করা চলে না, কেননা প্রকৃতিপরিণামের আদিম আকূতি বা অতীত ইতিহাস কোনটাই তার অনুকূল নয়। বোধির রাজ্য এখানে শুরু হলেও তার প্রতিষ্ঠা যে সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত ও অনতিবর্তনীয় হবে, তাই-বা কি করে বলি? এখানে চিৎসত্তার অবরবিভূতির উন্মেষে দেখা দিয়েছে দেহ-প্রাণ-মনের ব্যামিশ্রচেতনার যে-জঞ্জাল, তাকে নিয়েই বোধির কাজ চলবে—সুতরাং তার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা তার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হবে না। অবরচেতনাকে প্রভাবিত করতে বোধিচেতনাকে তার রাজ্যে ঢুকতেই হবে; তখন অবরচেতনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে তার বীর্যে জারিত না হয়ে সে পারবে না—চারদিক থেকে

তাকে চেপে ধরবে আমাদের খণ্ডিত মনের বিভজ্যবৃত্তিতা এবং কুণ্ঠিতবীর্য অবিদ্যাশক্তির সংকোচ। বোধিবাসিত বুদ্ধির তীক্ষ্ন দীপ্ত অর্চিতি ও অবিদ্যার গুহায় প্রবেশ করে তাদের রঙ বদলে দিতে পারে, কিন্তু তাদের নিবিড় অন্ধতাকে নিজের মধ্যে বিলীন করে দেবে—এতখানি বৈপুল্য এবং বীর্য তার নাই। তাই সমগ্র চেতনাকে আপন ধাতুতে ও শক্তিতে আমূল রূপান্তরিত করা তার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থাতেও চিৎশক্তির সঙ্গে চিত্তশক্তির খানিকটা শরিকানী সম্পর্ক আছে। তাই দেখি মানুষের প্রাকৃত বুদ্ধি আজ এতদূর জাগ্রত যে, তার ভিতর দিয়ে বিশ্বের চেতনশক্তির অনতিব্যাহত সঞ্চরণের ফলে বুদ্ধি আর সংকল্প আধারের অন্তরে-বাইরে খানিকটা কর্তৃত্ব করবার অধিকার পেয়েছে—যদিও তাদের কর্তৃত্বে আছে অনেক কুণ্ঠা ও আনাড়িপনা এবং পদে-পদে ভুল করবার ও খুঁড়িয়ে চলবার বিড়ম্বনা, যাতে মহাপ্রকৃতির বিরাট বিশ্বলীলার সঙ্গে বুদ্ধির সুর মেলানো সকল সময় সম্ভব হয় না। আধারে পরমা প্রকৃতির উন্মেষের সূচনায়, জীবশক্তি ও বিশ্বশক্তির মধ্যে এই-যে শরিকানী সম্পর্কের দ্যোতনা, তার বীর্য ক্রমেই উপচিত হয়ে ব্যষ্টিবিগ্রহে মহাশক্তির বিপুল ও নিবিড় লীলায়নের সমগ্র ছবিটি সাধকের চেতনায় ফুটিয়ে তুলবে। অনায়াসে তখন সে বুঝতে পারবে—মহাপ্রকৃতির আকূতি কোন্ ধারায় ফুটতে চাইছে তার আধারে। উপচীয়মান বোধ ও বোধির নিশ্চিত প্রত্যয় তখন তাকে আরও ক্ষিপ্র ও সচেতন প্রগতির অব্যর্থ সাধনার সংকেত দেবে। গুহাচর মনোময়পুরুষ বা চৈত্যপুরুষ যখন তার জীবনের পুরোধা হবেন, তখন তার স্বয়ংবরণ ও অনুমতির সামর্থ্য অবিসংবাদিত হবে, অবন্ধন সত্যসংকল্পের অবন্ধ্য চরিতার্থতার অনুভবও চেতনায় হবে দীপ্ততর। কিন্তু তখনও এই অবন্ধন সংকল্পের সামর্থ্য তার আত্মপ্রকৃতির সীমার মধ্যেই অবরুদ্ধ থাকবে, অর্থাৎ তার আপন আধারের ক্রিয়াকে অপরোক্ষদৃষ্টির নিত্যজাগ্রত প্রশাসনে রাখবার সামর্থ্য তার আরও নির্মুক্ত এবং অসংকুচিত হবে। তাও যে গোড়াতেই খুব সহজসাধ্য হবে তা নয়—কেননা তখনও হয়তো নিজের সৃষ্টির জালে নিজেই সে বাঁধা পড়বে, কিংবা প্রাচীন ও নবীন চেতনার মিশ্রণজাত বৈকল্যের দ্বারা উপহত হবে। তবু সাধকের মধ্যে তখন হতে দেখা দেবে ঈশনা ও বিজ্ঞানশক্তির অকুণ্ঠ উপচয়, উত্তরসত্ত্ব ও উত্তরপ্রকৃতির দিকে আত্মোন্মীলনের একটা নিশ্চিত সূচনা।

আমাদের তথাকথিত স্বাধীন ইচ্ছার ধারণায় অনেক গলদ আছে। আমরা স্বাধীন ইচ্ছা বলতে বুঝি মানবীয় অহন্তার ঐকান্তিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ভাবি, ব্যক্তির ইচ্ছা তখনই স্বাধীন, যখন সে তার বিবিক্ত এষণার চরিতার্থতা খোঁজে—যখন সবাইকে ছেড়ে নিজের খুশিতে একলা পথে চলবার স্বতন্ত্রে কোনদিক থেকেই তার সংকোচের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু একথা ভুলে যাই, আমাদের

আত্মপ্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিরই একটা অংশ, আমাদের আত্মচেতনা বিশ্বোত্তীর্ণ চেতনারই বিভূতি। অতএব অপরা প্রকৃতির পারতন্ত্র্য হতে আমাদের সমগ্র আধার একমাত্র পরা প্রকৃতির বৃহত্তর সত্যের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধের দ্বারাই মুক্তি পেতে পারে। ব্যষ্টিজীব পূর্ণস্বতন্ত্র হয়েও বিবিক্ত স্বৈরাচার অবলম্বন করতে পারে না, কেননা ব্যক্তির সত্ত্ব ও প্রকৃতি বিরাট্-পুরুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত এবং পরাৎপর বিশ্বোত্তীর্ণের প্রশাসনে বিধৃত। অতএব উদয়নের দুটি ধারা দেখা দিতে পারে। একটি ধারায়, আপন কূটস্থ সত্তার সঙ্গে তদাত্মক হয়ে সাধক অনুভব করে এবং আচরণে ফোটায় স্বয়ম্ভু সত্তার অখণ্ড স্বাতন্ত্র্য। এমনিতর স্বানুভব হতেও শক্তির প্রচণ্ড বিচ্ছুরণ সম্ভব। কিন্তু এই বিচ্ছুরণ হয় ঘটে সাধকের প্রাকৃত-শক্তিরই অতিক্রান্ত ও বর্তমান কুণ্ডলীর স্ফীততর পরিসর হতে—নয়তো এ হয় তার ব্যষ্টিবিগ্রহে বিশ্বশক্তি বা পরমা শক্তির স্বচ্ছন্দ বিস্ফোরণ, অতএব তার মধ্যে ব্যক্তিসত্ত্বের কোনও প্রবর্তনা থাকে না। সুতরাং এক্ষেত্রে বিরাটের সংকল্প বা পরা শক্তির নৈর্ব্যক্তিক লীলায়নের অনুভব ছাড়া ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছারও কোনও অনুভব ফোটে না।.. আরেকটি ধারায়, সাধক নিজেকে অনুভব করে পরম পুরুষের চিন্ময় নিমিত্ত-রূপে, অতএব তার কর্মে তাঁরই বীর্য স্ফুরিত হয়। সে-বীর্যের খেলায় উপচে ওঠে পরমা প্রকৃতিরই অবন্ধন সামর্থ্য—যার নিঃসীম ও নির্বাধ প্রচার নিত্যপ্রচোদিত হচ্ছে অনুত্তরের স্বরূপসত্য ও স্বধার দ্বারা এবং মাহেশ্বরী শক্তির অবন্ধ্য সংকল্পের সংবেগে।...কিন্তু উভয়ক্ষেত্রে প্রাকৃতশক্তির যন্ত্রাবর্তন হতে মুক্তির একমাত্র উপায় হল—কোনও মহত্তর চিন্ময় শক্তির আনুগত্য স্বীকার করা, কিংবা সাধকের নিজের জীবনে ও বিশ্বের লীলায় সেই শক্তিরই প্রকট আকূতি ও প্রবৃত্তির সঙ্গে স্বেচ্ছায় একাত্ম হয়ে চলা।

চেতনার ঊর্ধ্বলোকে উত্তীর্ণ হবার পর আধারের নবলব্ধ বীর্যের ক্রিয়া যে বহিশ্চর প্রকৃতির প্রশাসনেও বিস্ময়কর সামর্থ্যের পরিচয় দেয়, তার মূলে আছে শুধু ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধি নয়—কিন্তু তার চিন্ময় দৃষ্টির ঔদার্য এবং তার ফলে বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ দিব্যক্রতুর সঙ্গে তার সৌষম্য বা তাদাত্ম্যের অনুভব। পুরুষ যখন অবরশক্তির দাসত্ব ছেড়ে আপনাকে উত্তরশক্তির বাহন করে তখন তার ইচ্ছা বিশ্বগত প্রাণশক্তি মনঃশক্তি ও জড়শক্তির বিচিত্র বৃত্তির যন্ত্রমূঢ় নিয়ন্ত্রণের কবল হতে মুক্তি পায়—আর সে অপরা প্রকৃতির শাসনকে অন্ধের মত মেনে চলে না। তখন তার মধ্যে দেখা দিতে পারে প্রবর্তকের বীর্য—এমন-কি বিশ্বশক্তিরও ’পরে ব্যক্তির আধিপত্য। কিন্তু এই ঈশনার অধিকার পুরুষোত্তমের নিমিত্ত বা প্রতিভূরূপেই সে পায়। ব্যক্তির খুশি তখন অনন্ত-স্বরূপের মঞ্জুরি পায়—সে-খুশিতে অনন্তের কোনও সত্যের প্রকাশ হয়েছে বলে। এমনি করে ব্যক্তির ভাবনা ক্রমে সার্থকতর এবং বীর্যবত্তর হয়—যতই সে নিজেকে বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ পুরুষ-প্রকৃতির ঘনবিগ্রহরূপে উপ-

লব্ধি করে। কারণ গোত্রান্তরের পথে যত সে এগিয়ে চলে, ততই সে দেখে, তার প্রমুক্ত চেতনার বীর্য দেহ-প্রাণ-মনের সীমিত শক্তির পুঁজিকে বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। তখন এক অভূতপূর্ব চেতনার উত্তরজ্যোতি ও শক্তির বিপুল সংবেগ আধারে উৎসারিত এবং অবতীর্ণ হয়ে তাকে পরিপ্লুত করে— তাকে ঘিরে রচনা করে দ্যুলোকদ্যুতির অপ্রমেয় পরিবেষ। তার স্পর্শে সিদ্ধ-পুরুষের প্রাকৃত জীবনও অধিচেতনা ও অতিচেতনা চিন্ময়ী আদ্যাশক্তির লোকোত্তর বীর্যের দিব্য সাধন হয়। প্রকৃতির সমস্ত পরিণামকে তখন তিনি অনুভব করেন এক সর্বগত পরমচৈতন্যের লীলারূপে—দেখেন, অক্ষুণ্ণ স্বাতন্ত্র্যের খুশিতে যে-কোনও ভূমিতে স্বকৃত যে-কোনও বিশেষণকে অঙ্গীকার করে এক সর্বগত পরমা শক্তির বীর্য স্ফুরিত হচ্ছে। সিদ্ধের জ্ঞানময় দৃষ্টিতে এ-জগৎ বিশ্বাত্মক ও বিশোত্তীর্ণ পুরুষের কবিক্রতুর খেলা, সর্বেশানী সর্ববিৎ বিশ্বজননীর মহাসংকর্ষণের বিলাস—জীবকে তাঁর বুকে তাঁরই অতিপ্রাকৃত চিৎস্বরূপের সাযুজ্যে টেনে নেবার জন্যে। এতদিন বদ্ধজীব-রূপে পুরুষ ছিলেন অবিদ্যা-প্রকৃতির অচেতন বা অর্ধচেতন সাধনরূপে অবরুদ্ধ লীলায়নের ক্ষেত্র। আজ তাঁর মধ্যে ফুটেছে চিদ্‌ঘনবিগ্রহ পুরুষোত্তমের পরমা প্রকৃতি—তাঁর আত্মা তাঁরই চিন্ময় নির্মুক্ত স্ব-তন্ত্র লীলাধার ও নিমিত্ত-মাত্র। সে-প্রকৃতির চিদ্‌বিলাসের তিনিও অংশভাক্—কেননা তিনি জানেন কি তার আকৃতি, কি তার সাধনা। আবার তিনি জানেন পরাবর দিব্য-পুরুষরূপে তাঁর আত্মস্বরূপের বিরাট ও লোকোত্তর মহিমা। সেইসঙ্গে জানেন, তাঁর জীবত্ব একটা নিস্তত্ত্ব বিভ্রম নয়—কেননা জীবস্বরূপে যেমন তিনি একাধারে অন্তহীন পরমচেতনার সঙ্গে তাদাত্ম্যভাবে সমাপন্ন অথচ তাঁরই আত্মবিভাবনার ব্যষ্টিবিগ্রহ, তেমনি আবার চিদ্‌বিন্দুরূপে তাঁর লীলার সাধনা।

এমনি করে পরমা প্রকৃতির চিন্ময়ী লীলার সহচর হবার উপক্রমেই সর্বশেষ অতিমানস-রূপান্তরের শুরু। কেননা প্রকৃতির যাত্রারম্ভে দেখা দিয়েছিল অন্ধ যন্ত্রলীলার যে পর্যাকুল ছন্দ, এই রূপান্তরে তা উত্তীর্ণ হয় জ্যোতির্ময় রূপায়ণের অবন্ধন উৎসারণে, চিৎস্বরূপের স্বয়ম্ভূ সত্যের ধ্রুব-চ্ছন্দে। প্রকৃতিপরিণামের প্রথম পর্বে ছিল জড়ের মূঢ় যন্ত্রাচার। তারপর দেখা দিল অবরপ্রাণের স্পন্দন—যা অপরা প্রকৃতির অন্ধ অনুবর্তনে ও স্বধর্মের যন্ত্রবৎ অনুশীলনে নিজের সঙ্কীর্ণ গতি-প্রকৃতির ছন্দ বজায় রাখতে চায়। তারপর মানুষের মধ্যে দেখা দিল ওই অপরা প্রকৃতিরই শাসনে প্রাণ ও মনের একটা অর্থপূর্ণ ব্যামিশ্রতা এবং প্রকৃতির নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে তার শাস্তারূপে আপন প্রয়োজনে তাকে খাটিয়ে নেবার একটা দ্বন্দ্ব-সংকুল প্রয়াস। সবার শেষে ফুটল স্ব-সৃৎ সৌষম্য ও স্ব-কৃৎ কর্মের বৃহৎসাম সর্বভূতাশয়ে স্থিত চিন্ময় সত্যকে আধার করে। এই উত্তরভূমিতে ঋত-চিতের অপরোক্ষ অনুভবে উদ্দীপ্ত হয়ে মানুষ পূর্ণজ্ঞানে অনুসরণ করবে তার বীর্য-

বিভূতির শাশ্বত বিধান, পরমপুরুষের নিমিত্ত হয়েও সৃষ্টির সাধনায় থাকবে তার অকুণ্ঠ ঈশনা ও কর্মদায়, তার জীবনে ও আচরণে উছলে উঠবে পূর্ণানন্দের প্রস্রবণ। আজ অসহায় জীব বিশ্বচক্রের অন্ধ আবর্তনের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। কিন্তু সেদিন সর্বাত্মভাবের জ্যোতিরুচ্ছল আনন্দে তার বন্ধনের বিভ্রম বিলুপ্ত হবে—বিশ্বোত্তীর্ণা পরমা প্রকৃতির প্রশাসনে বিধৃত জীব ও বিশ্বের অন্যোন্য-সঙ্গমের ছন্দসুষমা হিরণ্যদ্যুতিতে তার চেতনায় ঝলসে উঠবে।

কিন্তু এই পরমাসিদ্ধি স্পষ্টই দীর্ঘযুগের দুশ্চর সাধনার অপেক্ষা রাখে। কেননা রূপান্তরের বেলায় শুধু পুরুষের সায় ও সহায়তা থাকলেই চলে না, সেইসঙ্গে চাই প্রকৃতিরও সায় এবং আনুকূল্য। শুধু উন্মুখ ভাবনা ও উদ্বুদ্ধ সংকল্পের ব্রতদীক্ষা ও স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়—আধারের সর্বত্র সঞ্চারিত হওয়া চাই চিন্ময় সত্যের শাশ্বত বিধানকে স্বীকার করে তার কাছে নিজেকে লুটিয়ে দেবার আকুলতা। আধারের পর্বে-পর্বে জাগ্রত হওয়া চাই নিত্যপ্রবুদ্ধা চিন্ময়ী মহাশক্তির শাসনকে অকুণ্ঠচিত্তে পালন করবার অভীপ্সা। অন্ধ প্রকৃতিপরিণামের ফলে দুরাগ্রহের মূঢ়তা আধারের আনাচে-কানাচে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে—স্বীকৃতির পক্ষে তারাই বিপুল বাধা রচনা করে। আধারের বহু অংশ এখনও অচিতি ও অবচিতির কবলিত, মূঢ় অভ্যাসের সংস্কারে আচ্ছন্ন, তথাকথিত প্রকৃতির আইনে বাঁধা। প্রাণ মন ব্যক্তি-সত্ত্ব চারিত্র বা নিসর্গবৃত্তি—সবারই আছে চিরাভ্যস্ত যন্ত্রাচার। প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের মধ্যে অভাববোধ অন্ধ আবেগ ও জান্তব বাসনার তাড়না মজ্জাগত হয়ে আছে—তাদের অতল গহনে শিকড় মেলেছে পুরানো বৃত্তির কত অনুশয়, যাদের ওপড়াতে গেলে অচিতির পাতাল পর্যন্ত খুঁড়তে হবে। এরা আধারের পাকা দখল নিয়ে আছে—তাই অচিতির অবরবিধানের অনু-বর্তন এরা করবেই। প্রাণ আর মনের চেতনায় অহরহ এরা ফেনিয়ে তুলবেই অতীতের যত সংস্কার এবং আধারে তাদেরই প্রকৃতির শাশ্বত অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে। আধারের যে-অংশ এমনতর আচ্ছন্ন যন্ত্রমূঢ় কি অচিতির কবলিত নয়, তাদের মধ্যেও অপূর্ণতা আছে—আছে অপূর্ণতার প্রতি অভিনিবেশ। অন্ধসংস্কারের প্রতি দুরাগ্রহও তাদের কিছু কম নয়। প্রাণ যেমন তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও কামনাতর্পণের মোহ ছাড়তে পারে না, মনও তেমনি কিছুতেই নিজের বাঁধা-চাল ছাড়া চলতে পারে না—আর স্বেচ্ছাতেই উভয়ে মেনে চলে অবিদ্যার অবরধর্মের প্রবর্তনা। অথচ পরমা প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য অনুশাসনে ঊর্ধ্বপরিণামের শরিক তাদের হতেই হবে, আত্মসমর্পণ করতেই হবে। পর্বসংক্রান্তির প্রত্যেক ধাপে পুরুষের সায় চাই। তেমনি প্রকৃতিরও প্রত্যেক অংশকে সায় দিতে হবে উত্তরশক্তির ঊর্ধ্বগ প্রেরণার অনু-কূলে, নইলে পুরুষের একক সংকল্প সার্থক হবে না। অতএব অভ্যস্ত প্রকৃতিকে পরমা প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করবার এই-যে নিরূঢ় আকূতি—এই

স্বোত্তরায়ণের প্রতি মনোময়পুরুষেরও স্বতঃপ্রবৃত্ত একটা উন্মুখীনতা চাই। তাছাড়াও চাই চিৎসত্তার উত্তরসত্যের সচেতন অনুবর্তন—পরমা প্রকৃতি হতে উৎসারিত জ্যোতি ও শক্তির কাছে সমগ্র আধারের নিঃশেষ সমর্পণ। এ-তপস্যা কঠিন ও দীর্ঘসাধ্য হলেও আধারকে নিজেই এর দায় বরণ করতে হবে, নইলে অতিমানস-রূপান্তর সম্ভব হবে না।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তৈজস ও চিন্ময় রূপান্তর সিদ্ধপ্রায় না হলে চরম ও পরম অতিমানস-রূপান্তরের সূচনাই হতে পারে না—কেননা শুধু ওই দুটি রূপান্তরের ফলে অবিদ্যার মূঢ়সংবেগ নিঃশেষে পরিণত হতে পারে লোকোত্তর আনন্ত্যচেতনার হিরণ্যবর্তনি সত্যসংকল্পের ছন্দোনুবর্তনে। পরমপুরুষ ও পরমা প্রকৃতির কাছে সমগ্র আধারের বিবশ সমর্পণ সম্পূর্ণ সহজ হবার পূর্বে দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর একাগ্র কঠোর তপস্যা এবং ঐকান্তিক সংকল্পের অশ্রান্ত উদ্যতি একান্ত আবশ্যক। সাধনার প্রথম পর্বে চাই তীব্র এষণা ও নিষ্ঠাপূত প্রয়াসের সঙ্গে-সঙ্গে পরা সংবিতের কাছে হৃদয় মন ও আত্মার প্রমুখ সমর্পণ। তারপর সাধনার মধ্যপর্বে দেখা দেবে—আমার সাধনা তাঁরই পরা শক্তিতে উদ্দীপ্ত—এই বোধ নিয়ে সেই শক্তির 'পরে পূর্ণ ও সচেতেন নির্ভরতা। আর তার চরমপর্বে সে অখণ্ড নির্ভর পর্যবসিত হবে—আধারের সকল অংশে ও সকল ক্রিয়ায় প্রকৃতি-স্থ পরমসত্যের লীলায়নের কাছে বিবশ হয়ে আপনাকে সঁপে দেওয়ায়। এই বিবশ সমর্পণ তখনই পূর্ণাঙ্গ হয়, যখন আধারের তৈজসরূপান্তর সিদ্ধ হয়, কিংবা চিন্ময়-রূপান্তর অনেক দূর এগিয়ে যায়। কারণ এ-সমর্পণ মন প্রাণ দেহ—এমন-কি অচিতি ও অবচেতনারও সচেতন আত্মসমর্পণ। মনের সমর্পণে, তার প্রাক্তন যত ভাব সংস্কার ধারনা কল্পনা ও চিরাভ্যস্ত বৌদ্ধ-সমীক্ষা—সবার জায়গায় প্রথম জাগবে বোধি-মানসের, তারপর অধিমানসের প্রবর্তনা। তারপর সেই প্রবর্তিকা শক্তি চিত্তে সঞ্চারিত করবে ঋতচিতের অপরোক্ষ ব্যাপ্রিয়া, ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ও বিবেকদৃষ্টির সাক্ষাৎ প্রেতি—এককথায় প্রাকৃত-মনের সম্পূর্ণ বিজাতীয় একটা অভিনব চেতনার স্ফুরত্তা।...তেমনি প্রাণের সমর্পণে, তাকে ছাড়তে হবে চিরপোষিত যত বাসনা বেদনা আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাস, যত গতানুগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রবেগ ও ইন্দ্রিয়বোধের কুণ্ডলিত বৃত্তি। তার জায়গায় আসবে নিষ্কাম নির্মুক্ত অথচ স্বয়ংতন্ত্র এক জ্যোতির্ময় সংবেগ —যা বিশ্বজনীন নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান শক্তি ও আনন্দের সুষুমূণ-নির্ঝর। সমস্ত জীবনের তন্ত্রে-তন্ত্রে সেদিন রণিত হবে তার আবিঃস্বরূপের মূর্ছনা। অথচ আজ তার প্রাণচেতনায় তার এতটুকু স্পন্দন, তার গুহাহিত বিপুল আনন্দ ও সাধনবীর্যের একটুকু আভাস নাই।...আবার দৈহ্যচেতনাকেও ছাড়তে হবে তার নিসর্গবৃত্তি ও অন্ধ আসক্তির গোঁড়ামি, অভাববোধ ও গতানুগতিক প্রকৃতির আবর্তন, জড়াতীতের প্রতি অশ্রদ্ধা ও সংশয়,

জড়াশ্রয়ী দেহ-প্রাণ-মনের বাঁধা-চালের অনতিবর্তনীয়তা সম্পর্কে মূঢ় আস্থা। তখন আধারে উৎসারিত এক অভিনব শক্তির প্লাবন এদের ভাসিয়ে নেবে, যা জড়ের বিগ্রহে ও সংবেগে সঞ্চারিত করবে তার বৃহত্তর ধর্ম ও প্রবৃত্তির বিপুল বীর্য।...এমন-কি আধারের অচিতি ও অবচেতনার মধ্যেও তখন চেতনার দীপ্তি জাগবে। উত্তরজ্যোতির বিদ্যুৎঝলকে তারা চকিত হবে—চিতিশক্তির পূর্ণতার পথে বাধা না হয়ে দিনে-দিনে হবে চিৎস্বরূপের আধার এবং পাদপীঠ।...... কিন্তু প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের নেতৃত্ব বা আধিপত্য আধারে যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন এ পরমসিদ্ধি আসবে না। এইজন্যেই তো চাই গুহাশায়ী চৈত্য-পুরুষের পূর্ণকল উন্মেষ, চাই তৈজস ও চিন্ময় সংকল্পের অপ্রতিহত প্রবেগ। দীর্ঘকাল ধরে তাদের জ্যোতি ও শক্তির ধারাসম্পাতে আধারের প্রত্যেকটি কোষকে অভিষিক্ত করে সমগ্র প্রকৃতিতেই নিয়ে আসা চাই তৈজস ও চিন্ময় রূপান্তর।

অতিমানস-রূপান্তরের জন্য আরও-একটা সাধনা অপরিহার্য। অন্তঃপ্রকৃতি আর বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যে-আড়াল গড়ে উঠেছে, তাকে ভেঙে ফেলে সমগ্র আধারকে একটি সুরে বাঁধা চাই। সে-সুর হবে অন্তরের সুর—বহির্মুখ চেতনা অন্তরাবৃত্ত হয়ে একাগ্র এবং সুপ্রতিষ্ঠ হবে অন্তরাত্মার চিদ্-বিন্দুতে, অন্তরের সত্যদর্শন ও সত্যসংকল্পের প্রেরণায় তার সমস্ত ব্যবহার অনায়াসে উদ্দীপ্ত হবে, স্বপ্রতিষ্ঠার এই অচলভূমি হতে তার ব্যক্তিচেতনা উন্মীলিত হবে বিশ্বচেতনার দিকে। পরাক-বৃত্ত হৃদয় প্রাণ আর মন যতই অধ্যাত্মমুখী হ'ক না কেন, তাদের অপরিসর আধারে ঋত-চিতের পরম আবির্ভাব যে হতেই পারে না—একথাও কি বলতে হবে? আধারের চক্রে-চক্রে চিৎ-শক্তির জ্যোতিঃকমল দল মেলবে, চৈত্যসত্তা স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ বীর্য নিয়ে প্রস্ফুরিত হবে, সাধারণ চেতনার পর্যায় হতে চিত্ত ধ্যানচিত্তের যোগভূমিকায় উন্নীত হবে—এই প্রাথমিক গোত্রান্তরের শক্তিতে পুরুষ যদি অন্তররাজ্যের বিশালতায় প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে রূপান্তর-সিদ্ধির লোকোত্তর মহিমা কি করে তার মধ্যে ফুটবে? শুধু তা-ই নয়। সাধকের ব্যষ্টি-ভাবনাকে বিশ্বাত্মভাবনার সীমাহীন ঔদার্যে পরিব্যাপ্ত করতে হবে—তার ব্যষ্টি-মন নবায়িত হবে বিশ্বমানসের অবন্ধন বৈপুল্যে, উদ্দীপ্ত এবং প্রসারিত ব্যষ্টি-প্রাণ স্পন্দিত হবে বিশ্বপ্রাণের বিভূতিস্পন্দের ছন্দে, দেহের শিরায়-শিরায় বইবে বিশ্বপ্রকৃতির নির্বারিত শক্তির প্রবাহ—তবেই-না এই বর্তমান বিশ্ব-কল্পের বেষ্টনী পেরিয়ে তার পক্ষে বিরাটের অবরার্ধ হতে চিন্ময় পরম-পরার্ধের জ্যোতির্লোকে উত্তরণ সম্ভব হবে। তাছাড়া আজ যা অতিচেতনার ধূসরলোকে রয়েছে, তার একটা সুস্পষ্ট সংবিৎ জাগা চাই তার মধ্যে। যে দিব্য জ্যোতি শক্তি জ্ঞান ও আনন্দের নিরন্ত নির্ঝর তুর্যাতীত হতে আধারে অবিরাম ঝরে পড়ছে, তার সংবিৎ ও সংবেগ অনুবিদ্ধ করবে তার চেতনা--চিন্ময়-রূপা-

স্তরের রসায়নে তাকে নতুন করে গড়ে তুলবে। চৈত্যপুরুষের প্রগতি বা প্রমুক্তি সিদ্ধ হবার পূর্বেই চিন্ময়রূপান্তরের দল-মেলা শুরু হতে পারে, কেননা উপর হতে চিন্ময়ের শক্তিপাত তৈজসকে জাগিয়ে দিয়ে আপন অনুভাবদ্বারা তার রূপান্তর সম্পূর্ণ করতেও পারে। তার জন্য চাই শুধু চৈত্যসত্তার একটা প্রবল আকূতি—চিদ্‌বীর্যের ওই ধারাসারে আপনাকে নিষিক্ত করবে বলে। কিন্তু অতিমানস-রূপান্তরের লীলায়নে অনুত্তর জ্যোতির এমন অকাল-সম্পাতের সম্ভাবনা নাই—কেননা অতিমানসের শক্তিপাত কোনও ব্যবধান মানতে চায় না বলে আধারের প্রস্তুতি নিখুঁত না হলে তার কাজ শুরু হয় না। অপরা প্রকৃতির সামর্থ্যের সঙ্গে পরা শক্তির মহাবীর্যের এতই বৈষম্য যে অপরিণত আধার তার প্রবেগকে হয় ধারণ করতে পারে না, বা ধারণ করলেও সত্ত্বসমুদ্রেকের স্বচ্ছতা নিয়ে তাকে গ্রহণ করতে পারে না, কিংবা গ্রহণ করলেও জীর্ণ করতে পারে না। তাই আধার তৈরী না হওয়া পর্যন্ত অতিমানসের বীর্য কাজ করে পরোক্ষভাবে—অধিমানস কি বোধিচেতনার আড়াল দিয়ে, কিংবা নিজেরই কোনও অবরবিভূতির মাধ্যমে, যার আহ্বানে আংশিক বা পুরাপুরি সাড়া দেওয়া আধারের অধরূপান্তরিত চেতনার পক্ষে কঠিন হয় না।

চিন্ময়-পরিণাম হয় কলায়-কলায়—এই তার সনাতন রীতি। একটি মুখ্য পর্ব সম্পূর্ণ আয়ত্ত হলে তবে অমনতর আরেকটি পর্বসিদ্ধির নিশ্চিত অধিকার মেলে। অতর্কিত ক্ষিপ্র উদয়নের প্রবেগে যদি-বা কখনও ছোটখাট দু-চারটি পর্ব গ্রাস করে বা ডিঙিয়ে যাওয়াও চলে, তবু সাবধানী সাধককে আবার ফিরে দেখতে হয় নীচের স্তরের কোনও পিছুটান রইল কি না—সামনের সঙ্গে পিছনের জোড় পোক্ত হল কি না। অপরা প্রকৃতির মন্থর ও অনিশ্চিত সাধনা যে চিন্ময়ী সিদ্ধি অর্জন করতে বহু শতাব্দী কি বহু যুগযুগান্ত কাটিয়ে দিতে পারত, মানুষের অধ্যাত্মপ্রয়াস তাকে সংক্ষিপ্ত করে আনে দু-চার জন্মের মধ্যে—এ-কথা সত্য। অবশ্য এই কালসংক্ষেপ নির্ভর করে সাধনার তীব্রসংবেগের তারতম্যের ’পরে। কিন্তু সাধকের শরবৎ তন্ময়গতিতেও প্রগতির ধাপগুলি কখনও উড়ে যায় না, কিংবা ক্রমান্বয়ে তাদের অতিক্রম করবার দায়ও চোকে না। তাছাড়া তীব্রসংবেগও সম্ভব হয়—প্রবুদ্ধ অন্তরপুরুষ সাধকের সাধনোদ্যমের শরিক হন বলেই, অর্ধরূপান্তরিত অপরা প্রকৃতির মধ্যে পরমা প্রকৃতির শক্তি পূর্ব হতে সক্রিয় রয়েছে বলেই। তাইতে অচিতি ও অবিদ্যার আঁধারে যে-সাধনা হাতড়ে-হাতড়ে চলত, তা তখন বিদ্যার উপচীয়মান শক্তি ও জ্যোতির প্রচ্ছন্ন পরিবেশে স্বচ্ছন্দ হয়ে চলে। প্রকৃতির জড়পরিণাম আচ্ছন্ন-মন্থর—লক্ষযুগেও তার একটি পর্ব শেষ হয় না। প্রাণপরিণাম মন্থর হলেও আর-একটু দ্রুত—তার পর্বোত্তরণের বেগ হয়তো সহস্রযুগের কোঠায় পৌঁছয়। আবার কালপুরুষের গদাইলশ্‌করী চালকে মন

হয়তো ক্ষিপ্র করে আনে শতের কোঠায়। কিন্তু চিদাত্মার আবেশে প্রকৃতি-পরিণামের এই বিলম্বিত লয় কল্পনাতীত সংক্ষিপ্ত হতে পারে। তবু সংকর্ষণদ্বারা পরিণামের ধারাকে ভিতরে-ভিতরে গুটিয়ে নিয়ে সাধনার পর্ব-সংক্ষেপ করা তখনই সম্ভব হয়, যখন চিদাত্মশক্তির আবেশে আধার প্রস্তুত হয়েছে এবং তাতে শুরু হয়েছে অতিমানসের অপরোক্ষ বীর্যাধান। প্রকৃতির যে-কোনও রূপান্তর বলতে গেলে অলৌকিক একটা প্রাতিহার্য। কিন্তু তাহলেও তার একটা রীতি আছে। পাকারাস্তার নিরাপত্তার 'পরে নির্ভর করেই তার দীর্ঘতম পদক্ষেপ সম্ভব হয়, পরিণমনের সুস্থির ও সুনিশ্চিত ভিত্তি পেলেই দেখা দেয় তার ক্ষিপ্রতম উৎপ্লবন। তাছাড়া এক সর্ববিৎ নিগূঢ় প্রজ্ঞাই তার সব-কিছুর প্রশাস্তা—এমন-কি তার চালচলনের আপাত-দুর্বোধ ছন্দেরও।

প্রকৃতির এই ঋতের বিধানমতে অতিমানসের দিকে চরম উদয়নের পথেও দেখা দেয় সুবিন্যস্ত যোগভূমির পরম্পরা, চিদ্‌বাসিত মন হতে অতিমানস পর্যন্ত চেতনার উত্তরায়ণের একটা সোপানমালা—কেননা এমনতর একটা আরোহ-ক্রম না থাকলে চেতনা কিছুতেই সে দুরুত্তর উত্তুংগতায় পৌঁছতে পারত না। পূর্বেই বলেছি, প্রাকৃত-মনকে ছাড়িয়ে আমাদেরই আধারের অতি-চেতন গুহায় নিহিত আছে সত্তার সোপানায়িত দশা ভূমি বা বিভূতির পর্ব-রাজি, ঊর্ধ্বমানসের কত স্তর, চিন্ময় সংবিৎ ও অনুভবের কত পরম্পরা। এই অন্তরিক্ষলোকের যোগাযোগ ও আনুকূল্য না থাকলে মন আর অতি-মানসের অমিত ব্যবধানকে অতিক্রম করা কিছুতেই সম্ভব হত না। বস্তুত এই উত্তরজ্যোতির গংগোত্রী হতেই আধারে চিন্ময়ী মহাশক্তির নিগূঢ় ধারা নেমে আসে এবং তার আবেশে তার তৈজস বা চিন্ময় রূপান্তর সিদ্ধ হয়। কিন্তু সাধনার প্রথম পর্বে আমরা এই আবেশের কোনও সুস্পষ্ট আভাস পাইনা, কেননা চেতনার অগোচরে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তখন তার ক্রিয়া চলে। তাইতে প্রথমে চাই মানস প্রকৃতিতে চিৎশক্তির দীপ্ত স্পর্শ। তার উদ্বোধনী প্রৈষা সাধকের হৃদয়ে প্রাণে ও মনে নিরূঢ় হয়ে লোকোত্তরচেতনার দিকে তাদের উন্মুখ করবে। এক সুসূক্ষ্ম জ্যোতি বা রসায়নী মহাশক্তি তাদের বৃত্তিকে শোধিত শাণিত এবং ঊর্ধ্বায়িত করবে, এক অপ্রাকৃত উত্তরচেতনার অভিষেকে তাদের জ্যোতিষ্মান করবে। এর জন্য উপর হতে শক্তিপাতের সংবিৎ আবশ্যক হয় না—অন্তর হতে চৈত্যসত্তা ও চৈত্যসত্ত্বের অদৃশ্য শক্তির আবেশই তার জন্যে যথেষ্ট। ঘটে-ঘটে, চেতনার সকল স্তরে, সকল বস্তুতে চিৎসত্ত্বের আবেশ রয়েছে। অতএব অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সালোক্য সামীপ্য ও সংস্পর্শের পরমচেতনা হৃদয়ে প্রাণে মনে এমন-কি দৈহ্য চেতনাতেও যে-কোনও মুহূর্তে স্ফুরিত হতে পারে। আধারের ভিতরদুয়ার যদি অকৃপণ-ভাবে উন্মুক্ত থাকে, তাহলে অন্তরের মণিদীপ্তি বহিশ্চেতনার আসন্নতম হতে

প্রত্যন্ততম ভাগকে উদ্ভাসিত করতে পারে। এও গোত্রান্তরের একটা রীতি। তাছাড়া উপর হতে চিৎশক্তির নিগূঢ় সম্পাতের ফলেও চেতনার মোড় ফিরে যেতে পারে। তখন শক্তির আস্রব অনুভাব ও পরিণামকে আমরা সুস্পষ্ট অনুভব করি বটে, কিন্তু কোন্ তুঙ্গশিখর হতে সে-ধারা নেমে এল তা বুঝতে পারি না কিংবা শক্তিপাতের অপরোক্ষ সংবেগকেও প্রত্যক্ষ করি না। লোকোত্তরের এমনি ছোঁয়ায় চেতনার উৎক্ষেপ কখনও এত প্রবল হয় যে, প্রকৃতি-পরিণামের স্বাভাবিক রীতি লঙ্ঘন করে সাধক শরবৎ তন্ময়তায় আত্মা ও ব্রহ্মের লক্ষ্যকে বিদ্ধ করতে চায়। পরমপুরুষের যদি তাতে সায় থাকে, তাহলে আর সাধনার পথে ধাপ গুনে-গুনে চলবার কথাই ওঠে না। তখন প্রকৃতি ও সাধকের মধ্যে নাড়ীচ্ছেদ হয় ক্ষিপ্র এবং সুনিশ্চিত। কারণ, কোনও পথিকের বেলায় মহাপ্রস্থানের বিধানই যদি সত্য হয়ে উঠে, তাহলে সে-বিধান তো রূপান্তরসিদ্ধির ক্রমায়িত ছন্দ মেনে চলবে না। তার গতিতে থাকবে মণ্ডূকপ্লুতির আকস্মিকতা, বিদ্যুদ্বেগে মর্ত্যের বাঁধন ছিঁড়ে সাধক তখন ছিটকে পড়বে চিজ্জগতের অঙ্গনে—তারপর প্রারব্ধক্ষয়ে দেহপাতের প্রতীক্ষা ছাড়া ইষ্টসিদ্ধির আর-কোনও সাধনা তার বাকী থাকবে না। কিন্তু মর্ত্যজীবনের রূপান্তর যদি অন্তর্যামীর অভিপ্রায় হয়, তাহলে চিন্ময়-ভাবনার প্রথম ছোঁয়াতে সাধকের মধ্যে জাগবে ঊর্ধ্বশক্তির উৎসমূলের একটা চেতনা ও এষণা। তার সংবেগে এই আধারই তখন প্রসারিত ও উচ্ছ্রিত হয়ে ওই লোকোত্তরের তুঙ্গস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইবে এবং তার বৃহত্তর ঋতের বিদ্যুন্ময় স্পর্শে ঘটবে চেতনারও নবসঞ্জীবন। কিন্তু আধারের এই রূপায়ণ পর্বে-পর্বে সাধিত হয় এবং তার চরমক্ষণে উত্তরায়ণের সোপানশেষে ঝলসে ওঠে বেদের সেই 'উরৌ অনিবাধে' প্রদ্যোতিত মহাভুবন, যা অনন্ত-জ্যোতির্ময় পরমচেতনার নিত্যধাম।

বিশ্বপ্রকৃতির অন্যত্র যেমন, এখানেও তেমনি পরিণামের ওই একই ধারা। অর্থাৎ চেতনার ঊর্ধ্বায়নের সঙ্গে-সঙ্গে এখানেও দেখা দেয় সম্প্রসারণের একটা প্রবেগ, উত্তরভূমিতে আরূঢ় চেতনা অবরভূমিদের নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে, অনুত্তরের উত্তরশক্তির আবেশে সমগ্র আধারে স্ফুরিত হয় একটা অভিনব অভঙ্গসমাহরণের সৌষম্য এবং ওই তত্ত্বশক্তির ক্রিয়া ও নিরূঢ় বীর্যের সংবেগ প্রকৃতির প্রাক্তন পরিণামের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যথাসম্ভব সঞ্চারিত হয়। এই অভঙ্গসমাহরণের আকূতিই হল প্রকৃতিপরিণামের চরমপর্বের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। চেতনার উত্তরভূমিতে সব-কিছুকে তুলে এনে একটা নতুন ছন্দের সৃষ্টি করা —এ-ব্যাপারটা উদয়নের অবরপর্বে অসম্পূর্ণ থাকে। মন জড় আর প্রাণকে পুরোপুরি মনোধর্মী করে তুলতে পারে না, তাই প্রাণপুরুষ আর দৈহ্যচেতনার অনেকখানিই অবমানস এবং অবচেতনা কি অচেতনার রাজ্যে পড়ে থাকে। এতে আধারকে নিখুঁত করে গড়তে গিয়ে মনকে একটা দারুণ বাধার সম্মুখীন

হতে হয়। আধারের পরিচালনায় মনের সঙ্গে অবমানস অবচেতনা ও অচেতনার চিরকাল যে-ভাগাভাগি চলছে, তার সুযোগ নিয়ে আধারে তারা মনোরাজ্যের আইন ছাড়া নিজেদেরও আইন জারি করে। তার জোরে প্রাণ-পুরুষ ও দৈহ্যচেতনা মনের আইনকে না মেনে, নিজেদের প্রবৃত্তি ও নিসর্গ-বৃত্তির প্ররোচনাকে অনুসরণ করে—মনের যুক্তি ও পরিণতবুদ্ধির সঙ্গত দেশনাকে কানেও তোলে না। এইজন্যই রূপান্তরের ব্যাপারে মনের পক্ষে মুশকিল হয় আপন গণ্ডির বাইরে যাওয়া। নিজের আলোর পূর্ণদীপ্তিটুকু যার মধ্যে সে ফোটাতে পারে না, যুক্তির শাসনে এনে পুরাপুরি আপন ছাঁচে যাকে ঢালতে পারে না, তাকে সে চিন্ময় করে তুলবেই-বা কি করে—কেননা চিন্ময়সমাহরণের সাধনা যে তার চাইতে কঠিন। অবশ্য চিৎশক্তিকে আবাহন করে আধারের কোথাও-কোথাও—বিশেষত নিজের কাছাকাছি মনন আর হৃদয়-বৃত্তির এলাকায়—চিন্ময়তার খানিকটা সৌরভ ছড়ানো বা রং ধরানো মনের পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু তার এটুকু আয়োজনও আপন সীমার মধ্যে কোনদিন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে না—তার সম্যক সিদ্ধি তো দূরের কথা। অধ্যাত্ম-চেতনা যখন মনকে সাধন করে কাজ করতে যায়, তখন সাধনের অপকর্ষের দরুন তাকেও শক্তিসঙ্কোচ করে চলতে হয়। হয়তো সে চিত্তকে দিব্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে, হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিব্যভাবনার শুচিস্নিগ্ধ কূলছাপানো সংবেগ, কিংবা জীবনে চিন্ময় বিধানের অনুবর্তিতা আনে—কিন্তু চারদিককার বাধাকে তবু সে ছাপিয়ে উঠতে পারে না। প্রাণের অবর-বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত কি নিরুদ্ধ করা, দেহকে সংযমের কঠিন নিগড়ে বাঁধা—এই তার সাধ্যের সীমা। তাতে দেহ-প্রাণ মার্জিত কি নির্জিত হলেও চিন্ময় হয়ে ওঠে না, কিংবা পরিপূর্ণ উন্মেষের ফলে তাদের রূপান্তর ঘটে না। তার জন্যে সে-চেতনাতে নামিয়ে আনতে হয় এমন-কোনও উত্তরশক্তির স্ফুরদ্‌বীর্য, যা তার সগোত্র বলেই স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে আপন স্বভাবের দীপ্তি ও শক্তিকে আধারে পূর্ণবিচ্ছুরিত করতে পারবে।

কিন্তু আধারে এই নবশক্তির অবতরণ ও বীর্যাধান সার্থক হতে বহু বিলম্ব ঘটতে পারে। কারণ আধারের অবরভাগেরও আত্মতুষ্টি আর আত্ম-পুষ্টির একটা দাবি আছে, সুতরাং রূপান্তরসাধনের জন্য আপন দাবিদাওয়া ছাড়তে তাদেরও রাজী করা চাই। কিন্তু মুশকিল এইখানেই। কেননা আধারের প্রত্যেক অঙ্গ চায়—অপকৃষ্ট হলেও স্বধর্মেরই অনুবর্তন। পর-ধর্ম যত উৎকৃষ্টই হ'ক, তবু তা তাদের বর্জনীয়। চেতনায় হ'ক কি অচেতনাতেই হ'ক—সবাই চায় আপন বৃত্তির স্ফূর্তি, আপন প্রবৃত্তি ও প্রতি-ক্রিয়ার সার্থকতা, আপন জীবনস্পন্দ ও জীবনরসের বিশিষ্ট আস্বাদন। এমন-কি জীবনছন্দে যদি আনন্দের নিরাকৃতি বা দুঃখ-শোক-সন্তাপের অমা-নিশাও থাকে, তবু তাকেই আঁকড়ে ধরতে হবে মরিয়া হয়ে। কেননা মিষ্ট

না হয়ে কটু হলেও সেও তো একটা রস—তমসাচ্ছন্ন শোকের রস, দুখঃ-সন্তাপের মধ্যেও পীড়ন করে ও পীড়ন সয়ে কামনাতর্পণের নিগূঢ় রস! আধারের এই মূঢ়ভাগ হয়তো-বা উপরপানেও তাকায়। কিন্তু তার 'মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া'কে ঠেকাবে কে—কেননা ওই তো তার শক্তি ও ধাতুর অনুকূল আত্মধর্ম। এই বিদ্রোহীদের আমূল রূপান্তর ঘটাতে হলে চাই তাদের 'পরে চিন্ময় জ্যোতির নিরন্তর অভিষেক, চিন্ময় সত্য শক্তি ও আনন্দের নিবিড় অনুভাবের সংক্রামণ, যাতে তারাও বুঝতে পারে—ওই জ্যোতিঃপথেই তাদেরও সিদ্ধির পথ, তাদের স্বভাবে চিৎশক্তিরই কুণ্ঠিত প্রকাশ, অতএব জীবনের এই নবীনছন্দের অনুবর্তনেই তাদের স্বরূপসত্য ও অভঙ্গ-স্বভাবের মহিমা তারা ফিরে পাবে। কিন্তু এই জ্যোতিঃপথকে আগলে দাঁড়ায় অবরপ্রকৃতির অন্ধ শক্তিপুঞ্জ। তারও চাইতে উত্তরায়ণের উগ্র পরিপন্থী হল, জগতের বৈকল্যকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে অশিব-শক্তির যে দুর্ধর্ষ বাহিনী—অচিতির শিলাঘন তমিস্রার 'পরে রচেছে যারা দুর্ভেদ্য আয়স-পুরী।

এই বিরুদ্ধশক্তির অভিঘাতকে ঠেকাতে হলে চাই অন্তরাধার এবং তার শক্তিকেন্দ্রসমূহের উন্মীলন। কেননা বহির্মনের অসাধ্য যে-সাধনা, তার সিদ্ধির সূচনা দেখা দিতে পারে শুধু অন্তরেই। অন্তর্মন, আন্তর প্রাণ-চেতনা ও প্রাণমানস, ভূতসূক্ষ্ম-চেতনা ও ভূতসূক্ষ্ম-মানস—একবার উদ্বুদ্ধ এবং সক্রিয় হতে পারলে এরা এক সূক্ষ্ম ও বৃহত্তর সংবিতের উদার অন্তরিক্ষ সৃষ্টি করে, যা বিরাট ও বিশ্বোত্তীর্ণের মধ্যে যোগসাধনের সেতু হয়ে তাদের শক্তিকে নামিয়ে আনে আধারের সর্বত্র—অবমানসে, প্রাণ ও মনের অবচেতন প্রদেশে, এমন-কি দেহেরও অবচেতনায়। এতেই-যে আধার পূর্ণদীপ্ত হয়ে ওঠে, তা নয়। কিন্তু তবু এই শক্তির আবেশে অনাদি-অচিতির অন্ধকার খানিকটা শিথিল ও তরল হয়। ঊর্ধ্ব হতে উৎসারিত চিৎশক্তির দীপ্তি জ্ঞান ও আনন্দ তখন হৃদয়-মনের সুগম ও অনুকূল পরিবেশকে ছাপিয়েও অনুবিদ্ধ এবং পরিব্যাপ্ত হয় আধারের সর্বত্র। সমগ্র প্রকৃতিকে আনখশিখ আবিষ্ট করে তাদের সিদ্ধবীর্য প্রাণ ও দেহকেও পরিষিক্ত করে এবং প্রচণ্ডতর অভিঘাতে অচিতির গহন ভিত্তি টলিয়ে দেয়। কিন্তু ভিতর হতে প্রাণময় ও মনোময় চেতনার এমনিতর পরিস্ফুরণেও আধারের পূর্ণ দীপনী সিদ্ধ হয় না। এতে অবিদ্যার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়—লুপ্ত হয় না। অচিতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতি-গূঢ় বীর্য অভিহত ও প্রতিনিবৃত্ত হয়—প্রশমিত হয় না। চিৎশক্তির যে-পরিস্পন্দ প্রাণময় ও মনোময় চেতনার এই বৃহত্তর আবেশকে আশ্রয় করে, তা ঊর্ধ্বলোক হতে আনে আলো বল ও আনন্দের প্লাবন। কিন্তু তাতেও আধারের সবখানি চিন্ময় হয়ে উঠে না, অথবা অভিনব অভঙ্গচেতনার পূর্ণ শতদল বিকশিত হয়না। কিন্তু অন্তরেরও অন্তরে গুহাহিত হয়ে আছেন

যে-চৈত্যপুরুষ, তিনি যদি সাধনযজ্ঞের পুরোহিত হন, তাহলে এই মনোময় ভাবনাকেও ছাপিয়ে আধারের গভীর হতে জাগে রূপান্তরের একটা আলোড়ন এবং তাতে চিৎশক্তির অবতরণ সার্থকতর হয়। কেননা পৌরুষেয়-সত্তার সবখানি তখন চৈত্যপুরুষের স্পর্শে সোনালী হয়ে ওঠে, আধারের দিগঙ্গনে ফোটে তৈজস-রূপান্তরের অরুণ আভাস এবং দেহ-প্রাণ-মনকে তা অবরভাগীয় অশুদ্ধি ও বিকলতার কবল হতে নির্মুক্ত করে। এইসময়ে তীব্রতর শক্তিপাতের ফলে আধারে চিন্ময়-মানস ও অধিমানসের উত্তরশক্তির প্লাবন নামতে পারে। ইতিমধ্যেই তাদের যে-অনুভাব আড়াল হতে শুধু সঙ্গোপনে প্রেরণা জুগিয়েছে, তা-ই এখন পূর্ণস্ফুরিত হয়ে আধারের কেন্দ্র-পিণ্ডকে আপন ভূমিতে উৎক্ষিপ্ত করতে পারে। তখনই শুরু হয় প্রকৃতির অভিনব অভঙ্গরূপায়ণের চরম সাধনা। অবশ্য মানুষের চিত্ত চিদাবিষ্ট হবার পূর্বেও তার মধ্যে এইসব উত্তরশক্তির ক্রিয়া চলতে থাকে, কিন্তু তখন তাদের ব্যাপ্রিয়া হয় পরোক্ষ স্তিমিত এবং খণ্ডিত। তারা মনোধাতু এবং মনোবীর্যে রূপান্তরিত হয়েই আধারে নামে এবং তাদের আবেশে মনোবৃত্তির মধ্যে একটা প্রভাস্বর তীব্র বিচ্ছুরণের পরিস্পন্দ সঞ্চারিত হয়—এমন-কি কখনও-কখনও চিত্ত সমাহিতও হয় ঊর্ধ্বস্রোতা আনন্দের প্রবেগে। কিন্তু তাতে মনোধাতুর সত্যকার কোনও রূপান্তর ঘটে না। পরিপূর্ণ চিদাবেশের ফলে আধারের চিন্ময়-রূপান্তর যখন শুরু হয়, তখন তার বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়—প্রাকৃত চিত্তবৃত্তির নিরোধে, বিশ্বাত্মভাবনায়, বিশ্বাত্মার বোধে ক্ষুদ্র অহং-এর পরিনির্বাণে এবং আত্যন্তিক ব্রহ্মসংস্পর্শে। তখনই অনুভূত হয় শক্তিপাতের তীব্রতম সংবেগ—আধারের কমলদল আরও সহজ আনন্দে উন্মীলিত হয় উপরপানে। উত্তরশক্তির অবন্ধ্য বীর্য তখন আরও অপরোক্ষ ও পূর্ণতর প্রবেগে তার স্বধর্মকে আধারে স্ফুরিত করে। আর যতক্ষণ এই স্ফুরত্তার প্রেতি সিদ্ধির কোঠায় না পৌঁছয়, ততক্ষণ তার গতি অপ্রতিহত হয়। এই দুর্ধর্ষ শক্তিসংবেগই চিন্ময়-রূপান্তরের মোড় ঘুরিয়ে দেয় অতিমানস-রূপান্তরের দিকে, কেননা উত্তরায়ণের পথে চেতনার অন্তহীন ঊর্ধ্বাভিযানই তো আধারে রচে অতিমানসভূমিতে উদয়নের সোপানমালা—যাদের উত্তরণই মানুষের চরম ও কৃচ্ছ্রতম পুরুষার্থ।

অথচ এই মোড়-ঘোরানোর ব্যাপারটা যে একই পরিবেশে কি একই নিয়মে ঘটে সবার মধ্যে, তা নয়। কেননা এবার আমরা পা দিয়েছি অনন্তের রাজ্যে—সেখানে সমস্তই নিয়তিকৃত নিয়মের বাইরে থেকেও ঋতচ্ছন্দের অনুগামী। কিন্তু এক অখণ্ডসত্যের ভিত্তিতে যখন আনন্ত্যের সকল বিভাবের প্রতিষ্ঠা, তখন উদয়নের যে-কোনও একটি ধারার সমীক্ষাতেই তার বহুধা-বৈচিত্র্যের মূলতত্ত্বটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাছাড়া একটিমাত্র ধারার সমীক্ষণের ভারই আমরা এখন হাতে নিতে পারি—এর বেশী নয়।...আর-সব ধারার মত আলোচ্যমান

ধারাটিও সোপানায়িত একটা পরম্পরা ধরে উঠে গেছে—যাতে অনেক বাধা থাকলেও কোথাও তাদের মধ্যে ফাঁক নাই। আমাদের প্রাকৃত-মনের ভূমি হতে উন্মনী ভূমি পর্যন্ত উত্তরবাহিনী চেতনার যে স্ফুরত্তবীর্যের জোয়ার ধরে মনের ঊর্ধ্বায়ন চলতে পারে, তাকে মোটের উপর চারটি পর্বসামান্যে ভাগ করা যায়—যার প্রত্যেকটিতে ফুটেছে চিন্ময়ী মহাসিদ্ধির এক-একটি বিভাব। লোকোত্তরগামী চেতনার এই অধিরূঢ় ভূমিগুলিকে যথাক্রমে বলা যেতে পারে --উত্তর-মানস, প্রভাস-মানস, বোধি-মানস, অধিমানস ও তদুত্তর লোক। এমনি করে চলেছে আত্মরূপান্তরের একটা ঊর্ধ্ব পরম্পরা, যার চরম শিখরে রয়েছে অতিমানস বা দিব্যবিজ্ঞান। এর প্রত্যেকটি ভূমি তত্ত্বে এবং বীর্যে বিজ্ঞানময়। কেননা প্রথম ভূমিতেই আমরা অনুভব করি, অনাদি অচিতিতে নিরূঢ় যে-চেতনা এতদিন অবিদ্যা-সামান্য অথবা বিদ্যা-অবিদ্যার মিথুন-লীলায় আবর্তিত হয়ে চলেছিল, আজ সে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে অন্তর্গূঢ় বিদ্যাশক্তির স্বয়ম্ভূসত্তায়। তার জ্যোতিঃশক্তি চেতনাকে অনুভাবিত ও উজ্জীবিত করছে এবং ক্রমে বিদ্যার সত্ত্বে রূপান্তরিত হয়ে চেতনা বিদ্যা-শক্তিকেই তার সকল প্রবৃত্তির সাধন করছে। স্বরূপত প্রত্যেকটি ভূমি চিৎ-স্বরূপেরই শক্তিধাতুর প্রস্তারে গাঁথা আছে। বিদ্যার সাধন ও বীর্য হিসাবে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে আমরা বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করেছি বলে একথা ভাবলে চলবে না যে, চিৎসত্ত্বের এই প্রস্তারটি শুধু জ্ঞানের একটা করণ বা প্রকার, কিংবা প্রত্যয়ের একটা বৃত্তি কি শক্তি মাত্র। আসলে তার প্রত্যেকটি পর্ব শুদ্ধসত্ত্বের এক-একটি ভূমি, চিৎসত্তার স্বরূপধাতু ও স্বরূপশক্তির এক-একটা থাক। তারা অবাস্তব বিকল্প নয়—বিশ্বব্যাপিনী চিৎশক্তির স্বরসবাহী ঊর্ধ্ববিভাবনার এক-একটি স্তর তারা। প্রত্যেক স্তর হতে নিরংকুশ শক্তি-পাতের ফলে, আমাদের মননের ধারাই যে শুধু পরিবর্তিত হয় তা নয়—আমাদের সত্তা ও চেতনার সমস্ত স্থিতি ও বৃত্তি হতে শুরু করে তাদের মর্ম-কোষ পর্যন্ত সে-সম্পাতে অভিষিক্ত ও অনুবিদ্ধ হয়ে আধারে আনে যোগা-গ্নিময় রূপান্তর। অতএব এই উদয়নের প্রত্যেক পর্বে চলে এক মহত্তর ভূমির জ্যোতি ও শক্তির সত্ত্বে আধারের—সমগ্র না হ'ক, সামান্য পরিণাম।

সর্বত্রই ভূমির উচ্চাবচতা প্রধানত নির্ভর করে পুরুষের শক্তিস্পন্দের সত্ত্ব সামর্থ্য ও তীব্রতার তারতম্যের 'পরে। নীচের দিকে যত নেমে আসি, ততই দেখি চেতনা ব্যামিশ্র ও স্তিমিত হয়ে পড়েছে, তার অমার্জিত স্থূলতা নিবিড় হয়ে অবিদ্যার উপাদানকে ঘনীভূত করেছে এবং সেই অনুপাতে বিদ্যার জ্যোতিরভিষেককে প্রতিহত করেছে। অবরভূমিতে চেতনার শুদ্ধসত্ত্ব ক্ষীণতর হয়ে তার শক্তিকেও সঙ্কুচিত করে—তার জ্যোতিকে স্তিমিত এবং আনন্দের সামর্থ্যকে করে শীর্ণ ও দুর্বল। একটা-কিছু করতে গেলে চেতনা তখন নেমে যায় তার হৃতবীর্য সত্ত্বের আরও নিবিড় স্থূলতার মধ্যে

এবং প্রাণপণে তার অন্ধশক্তিকে উদ্বেল করতে চায়। কিন্তু এই গলদ্‌ঘর্ম প্রাণপাতী প্রয়াসই সূচিত করে, তার বলকে নয়—তার অশক্তিকে।...আবার উদয়নের পথে উত্তরোত্তর অনুভব করি ঋতচ্ছন্দ চিদ্‌ঘন সত্ত্বের মহাবল বিচ্ছুরণ, চেতনার দীপ্ততর এবং বীর্যবত্তর সামর্থ্য, আনন্দের অতিসূক্ষ্ম শুদ্ধ স্নিগ্ধ এবং উচ্ছলিত রসোদ্‌গার। ঊর্ধ্বভূমির আবেশে এই বৃহত্তর জ্যোতি ও শক্তির, সত্তা ও চেতনার লোকোত্তর সত্ত্ব এবং আনন্দের বিপুল বীর্য দেহে-প্রাণে-মনে অনুষিক্ত হয়ে তাদের স্তিমিত হৃতসার ও নির্বীর্য ধাতুকে মার্জিত ও আপ্যায়িত করে, এবং তাকে রূপান্তরিত করে আপন প্রাণোচ্ছল চিদ্‌বীর্যের দীপনীতে—তত্ত্বভাবের অমোঘ আত্মরূপায়ণের সিদ্ধ-বীর্যে। এ কিছুই অসম্ভব নয়, কেননা স্বরূপত বিশ্বের সমস্তই একই সত্ত্ব একই চৈতন্য ও একই শক্তির উপাদানে গড়া বিচিত্র রূপ ও বিভূতির প্রস্তার-মাত্র। তাই উত্তরভূমির দ্বারা অবরভূমির সমাহরণও একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। আমাদের অপরা প্রকৃতিতে অচিতির বাধা না থাকলে, এই সমাহরণে ফুটত চিন্ময় প্রগতির একটা স্বাভাবিক ছন্দ—কেননা এতে উত্তরভূমি হতে অবসৃষ্ট বীজের অঙ্কুরকে আবার উৎক্ষিপ্ত ও পল্লবিত করে তোলা হয় ওই উত্তরশক্তিরই বৃহত্তর সত্তা ও সত্ত্বের পরিবেশে।

মানুষী বুদ্ধি ও প্রাকৃত মানসের ভূমি হতে অবাধিত ধ্রুব উত্তরণের প্রথম পদক্ষেপ আমাদের নিয়ে যায় উত্তর-মানসের অধিত্যকায়। সেখানেও মন আছে, কিন্তু আলো-আঁধারির ব্যামিশ্রতায় সঙ্কুল হয়ে নাই—আছে চিৎ-স্বরূপের উদার দীপ্তিতে ঝলমল হয়ে। এক অদ্বৈতসত্তাই বহুধাবিস্ফুরণের বিপুল বীর্যে আপনাকে লীলায়িত করে চলেছেন জ্ঞানের বিচিত্র বিভূতিতে, কর্মের বিচিত্র স্পন্দে, সম্ভূতির বিচিত্র অর্থ ও রূপের ব্যঞ্জনায়—এই মহাসত্যের অন্তরঙ্গ বোধই হল উত্তর-মানসের মৌল উপাদান। অতএব উত্তরমানস অধিমানসেরই বিভূতি, যদিও তার বীর্যের চরম উৎস হল অতিমানস—যাকে বলা চলে সমস্ত উত্তরশক্তির মহাগঙ্গোত্রী। উত্তরমানসের চিদ্‌বৃত্তি বিশেষ করে স্ফুরিত হয় দিব্যমননের আশ্রয়ে। তাই তাকে বলতে পারি আলো-ঝলমল ভাবচিত্ত—চিন্ময় সামান্য-ভাবনাই যার বিশিষ্ট জ্ঞানবৃত্তি। তার মধ্যে আছে প্রথমজ তাদাত্ম্যবোধ হতে সঞ্জাত সর্ববিৎ-স্বভাবের ঐশ্বর্য। তাই তাদাত্ম্যের মণিমঞ্জুষায় বিধৃত বিভূতিসত্যের সে বাহন হয় এবং তার ভাবনার সিদ্ধবীর্য বিশ্বতোমুখী বিজয়িনী কল্পনার বিদ্যুন্ময় রূপরেখায় সত্যের যে-ছবি আঁকে, বিজ্ঞানের স্বকৃৎ-শক্তিতে তখনই তা মূর্ত হয়ে উঠে। অব-রোহক্রমে দেখতে গেলে উত্তরমানসের এই বিশিষ্ট প্রত্যয়শক্তি হল অনাদি-চিন্ময় তাদাত্ম্যভাবের অন্ত্যবিভূতি—তার অব্যবহিত পরের পর্বেই হয় অবিদ্যার উৎসরূপী বিভজ্যবৃত্তি খণ্ডজ্ঞানের উন্মেষ। তাই উত্তরায়ণের পথে, অবিদ্যা শাসিত জ্ঞানা-শক্তির চরমব্যূহরূপে-পাওয়া যুক্তি-বুদ্ধি ও সামান্য-

প্রত্যয়ের এলাকা ছাড়িয়ে যেতে, আমরা প্রথমেই ঢুকে পড়ি চিৎসত্তার এই মহলটিতে। ভাবসামান্যের ধারণা হল আমাদের প্রাকৃত-মনের সর্বোত্তম সামর্থ্য এবং উত্তর-মানসই সে-সামর্থ্যের চিন্ময় উৎস। তাই অভ্যস্ত অধিকারের প্রত্যন্তসীমা পার হয়ে মন যে আপন উৎসমূলে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এ তো অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু এই মহত্তর মননে প্রাকৃত-মনের এষণাবৃত্তি বা তর্কবুদ্ধিপ্রণোদিত সমীক্ষার তাগিদ নাই। পঞ্চাবয়বের পরম্পরা ধরে নির্ণয়ে পৌঁছবার তাড়া তার নাই, নাই অবরোহ-অনুমানের ব্যক্ত কিংবা অব্যক্ত কোনও ব্যাপার—বিভিন্ন খণ্ডজ্ঞানের বুদ্ধিপূর্বক যোজনায় একটা জ্ঞানসামান্য বা চরমসিদ্ধান্ত দাঁড় করাবারও কোনও প্রয়াস নাই। এসমস্তই হল প্রাকৃত-বুদ্ধির পঙ্গু চলনের নিদর্শন। অবিদ্যার ভূমিতে থেকে সে বিদ্যার সন্ধান করছে,—তাই পদে-পদে তাকে প্রমাদ বাঁচিয়ে চলতে হয়, মনের নির্বাচনী বৃত্তি দিয়ে গড়া তত্ত্বের ইমারতকে তার দুর্দণ্ডের আশ্রয় করতে হয়। সযত্নে সংগৃহীত প্রাক্তন তথ্যের ভিত্তিতে সে-ইমারতকে দাঁড় করিয়েও সে নিঃশঙ্ক হতে পারে না, কেননা তার তথ্যসংগ্রহের মূলে অপরোক্ষ-সংবিতের অটুট সমর্থন নাই—আছে শুধু অনাদি অবিদ্যার শিথিল সৈকতশয্যা! প্রাকৃত-মনের চরমোৎকর্ষে দেখা দেয় একধরনের হঠাৎ-পাওয়া দিব্যচক্ষু বা অন্তর্দৃষ্টির ঝলকানি। তখন কোনও দুর্বোধ কারণে উদ্দীপ্ত-বুদ্ধির বিদ্যুৎ সাহসা অ-জানা ও অনতি-জানার বুকে বিদ্ধ হয়। কিন্তু এমনতর হঠাৎ-আলোর ঝলকানিও উত্তর-মানসের স্বভাবধর্ম নয়। তার মধ্যে নিহিত রয়েছে যে স্বয়ম্ভূ সর্ববিদ্যার বীজ, তাকেই সে রূপায়িত করে সম্যক্-দৃষ্টির একটি বিশিষ্ট বিভাবনার ভিতর দিয়ে, তার বিচিত্র অর্থের সৌষম্যকেই দিব্য-মননের আকারে ফুটিয়ে তোলে। এই তার জ্ঞানবৃত্তির সহজ ঐশ্বর্য। বিশিষ্ট জ্ঞানবৃত্তির মাধ্যমে নিজেকে স্ফুরিত করা তার পক্ষে যদিও অসম্ভব নয়, তবুও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় পুঞ্জভাবনার মঞ্জরীতে—একটি দৃষ্টিক্ষেপে সমগ্র বা সমূহ সত্যের অখণ্ড দর্শনে। সে-দর্শনে তর্কবুদ্ধির সূত্র দিয়ে ভাবের সঙ্গে ভাবের কিংবা সত্যের সঙ্গে সত্যের মালা গাঁথতে হয় না, কেননা তাদের প্রাক্‌-সিদ্ধ অন্যোন্যসম্বন্ধ সেখানে অভঙ্গ-সত্তার স্বানুভব হতেই ফুটে ওঠে বৈচিত্র্যের বিকীর্ণতায়। এ যেন নিত্যসিদ্ধ সংবিৎই দিব্যমননের সহায়ে অরূপ হতে নেমে এল রূপের ভূমিকায়—অতএব হেতু ও উপনয় হতে নিগমনে পৌঁছবার রীতি তার নয়। উত্তর-মানসের মনন অনন্ত প্রজ্ঞারই স্বতঃ-প্রকাশ—লোকায়ত অর্জিত জ্ঞান নয়। সত্যের যে-উদারলোক তার দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে, উত্তরপথিক মন ইচ্ছা হলে তার মধ্যে আগের মত ঘর বেঁধে পরম তৃপ্তিতে বাস করতে পারে। কিন্তু প্রগতির সাধনা অব্যাহত রাখতে হলে কোথাও বিশ্রাম করা তো চলবে না। দৃষ্টির নিরন্তর প্রসারে সত্যের পরিধিও

যেমন বাড়বে, তেমনি তার বহু খণ্ডরাজ্যের সমাহারে গড়ে উঠবে এক অখণ্ড মহাসাম্রাজ্যের আপাতবৈপুল্য—যাকে গণ্য করতে হবে সাধ্যমান চরম অখণ্ড ভাবনার সোপানরূপে। পরিশেষে হয়তো দেখা দেবে বিজ্ঞাত এবং অনুভূত সত্যের এক অকল্পনীয় মহাসমষ্টি, কিন্তু তবুও তার অবারিত সম্প্রসারণের সীমা থাকবে না কোথাও—কেননা জ্ঞানের বিচিত্র বিভূতির শেষ পরিধি তো নাই; 'নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে'।

উত্তর-মানসের এই হল প্রত্যয়ের বা জ্ঞানের দিক। এছাড়াও তার আছে একটা সংকল্পের দিক, কবিক্রতুর একটা সিদ্ধ প্রবর্তনার দিক। তার সংকল্পসিদ্ধির সাধন হল মনন-শক্তি বা ভাবনার বীর্য। তা-ই দিয়ে তার বৃহত্তর দীপ্তিকে সে আধারের মধ্যে সংক্রামিত করে—প্রাকৃত চিত্তের সংকল্প, হৃদয়ের বেদনা, প্রাণ ও শরীর সবাইকে অভিষিক্ত করে। আধারকে সে জ্ঞান দিয়ে মার্জিত ও সংস্কারমুক্ত করতে চায়—নতুন করে তাকে গড়ে তুলতে চায় তার সহজবীর্যে। উত্তর-মানসই ভাবের বীজকে আহিত করে হৃদয়ে কি জীবনে—ইষ্টমন্ত্রের বীর্য ও প্রেরণারূপে। নতুন ভাবের চেতনা সমিদ্ধ হয়ে ওঠে যখন, তার স্ফুরদ্‌বীর্য তখন অভিনবের সাড়া জাগায় আধারের মধ্যে; তারপর ওই ভাবের অনুকূলে ঘটে হৃদয় ও জীবনের সাত্ত্বিক-পরিণাম। অর্থাৎ হৃদয়ের বেদনা ও জীবনের প্রবৃত্তি হয় উত্তর-মানসেরই দিব্যপ্রজ্ঞার পরিস্পন্দ এবং তার বীর্যে জারিত, তার আবেগ ও সংবেদনে পরিপ্লুত। এমনি করে মনের সংকল্প ও প্রাণের সংবেগেও সঞ্চারিত হয় দিব্যভাবনার বীর্য—তার স্বতঃ-পরিণামের অবন্ধ্য প্রেতি। এমন-কি সাধকের দেহধর্মও ভাবের অনু-প্রাণনার অনুগামী হয়। অর্থাৎ যেমন, স্বাস্থ্যের বীর্যময় ভাবনা ও সংকল্প দ্বারা তার দেহচেতনা রোগের অভিমান ও স্বীকৃতিকে পর্যুদস্ত করতে পারে, বলের ভাবনা* নিয়ে আসতে পারে বলের সত্ত্ব বীর্য প্রবেগ ও পরিস্পন্দ এমনি করে ভাবের সাধনা হতেই হয় তার অনুরূপ রূপ ও বীর্যের সিদ্ধি এবং তা দেহ-প্রাণ-মনের ধাতুকে প্রসাদযুক্ত করে। উত্তর-মানসের অনুভাবের এই হল ভূমিকা। এক অভিনব চেতনার সমিন্ধনে সমগ্র আধারে সে গড়ে গোত্রান্তরের বনিয়াদ—তাকে তৈরি করে জীবনের উত্তর-সত্যের বাহনরূপে।

উত্তর-শক্তির দুর্ধর্ষ সংবেগ আধারে যখন প্রথম অনুভূত হয়, তখন তাকে সহজেই ভুল বোঝবার সম্ভাবনা আছে. তাই একটি কথা এখানে বলে রাখা ভাল। শক্তিপাতের বীর্য প্রথমেই অপ্রতিহত সামর্থ্য নিয়ে আধারে কাজ করতে পারে না—যেমন সে পারে স্বধামে থেকে নিজের স্বাভাবিক মাধ্যমের ভিতর দিয়ে। জড়-পরিণামের সূত্রে উত্তরশক্তিদের কাজ করতে হয় একটা অপকৃষ্ট এবং বিজাতীয় মাধ্যমকে আশ্রয় করে। তাই দেহ-প্রাণ-মনের অশক্তি,

* চিৎশক্তির দ্বারা পুটিত এবং জারিত হলে ভাবের ব্যঞ্জক শব্দের মধ্যেও এই বীর্যের আবির্ভাব হতে পারে। এদেশের মন্ত্রসাধনার তত্ত্বও তা ই।

অবিদ্যার আড়ষ্টতা ও অন্ধ বিদ্রোহ, অচিতির মূঢ় প্রতিষেধ ও ব্যাঘাতের প্রতিকূলতায় পদে-পদে তারা ব্যাহত হয়। স্বধামে তাদের কর্মের প্রতিষ্ঠা ছিল জ্যোতির্ময় চেতনা ও ধাতুপ্রসাদের 'পরে, তাদের ক্রিয়াবিপাকও তাই স্বতঃসিদ্ধ ছিল। কিন্তু এখানে তাদের লড়তে হয় অবিদ্যাতামসের নিরূঢ় প্রাক্তন সংস্কারের সঙ্গে—সে-তমিস্রা শুধু জড়ের অন্ধতমিস্রা নয়, হৃদয়-প্রাণ-মনেরও অনতিদীপ্ত তমিস্রা। অতএব সুমার্জিত মানস-বুদ্ধিতেও সিদ্ধ-ভাবের অবতরণ হয় যখন, তখন তাকে চলতে হয় বিদ্যা-অবিদ্যার সুবিন্যস্ত বা অবিন্যস্ত বদ্ধসংস্কারের জঞ্জাল ঠেলে—যারা আত্মসম্পূর্তি ও জিজীবিষার দাবিকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। এ-কিছু আশ্চর্য ও নয়। কেননা ভাব মাত্রেই শক্তিস্বরূপ বলে তাদের মধ্যে রূপায়ণ বা স্বতঃ-পরিণামের একটা সহজ বৃত্তি আছে—যার তারতম্য নির্ভর করে পরিবেশের 'পরে । অচেতন জড়কে নিয়ে তাদের কারবার যখন, তখন হয়তো এই রূপায়ণী বৃত্তির সামর্থ্যের অঙ্ক হয় শূন্য—তবু তার স্বরূপযোগ্যতাকে অস্বীকার করা চলে না। অতএব আধারে একটা প্রতিঘাতের শক্তি উদ্যত হয়েই আছে—যা জ্যোতির অবতরণকে ব্যাহত কিংবা ঊনীকৃত করবে। কখনও সে চায় জ্যোতিঃশক্তির নিরাকৃতি বা নিরসন, কখনও তাকে ক্ষুণ্ণ ও নির্জিত করতে চায়—কখনও-বা কদর্থনা ও বিকারের সূক্ষ্ম ছলনা দিয়ে তাকে নিয়োজিত করতে চায় অবিদ্যার পুরাকৃত কল্পনার সাধনায়। এইসব পুরাকৃত বা প্রাক্তন সংস্কারকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চাইলেও তারা বিদায় হয় না। আধার হতে তাড়িয়ে দিলে আবার তারা ফিরে আসে বাইরে থেকে—বিশ্বমনের আড়ত থেকে। কিংবা সাময়িক-ভাবে প্রাণ ও শরীরের অবরচেতনায় কি আধারের অবচেতনায় তলিয়ে গিয়ে হৃতাধিকার ফিরে পেতে আবার যে-কোনও সুযোগে ভেসে ওঠে। এতে প্রকৃতিরও সায় আছে। কেননা একবার যার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে, তার টিকে থাকবার দাবিকে সে ঠেকাতে চায় না—তার আত্মপরিণামের প্রত্যেকটি ধাপকে নিরেট এবং পোক্ত করবে বলেই। তাছাড়া শক্তির যে-কোনও বিভূতির যেখানে-খুশি যখন-খুশি নিজেকে ফুটিয়ে ও জিইয়ে রেখে সার্থক করে তোলবার একটা স্বাভাবিক দাবি আছে। তাই অবিদ্যার জগতে দেখি, সবার মূলে আছে শক্তির জটিল সমাবেশই নয়—আছে সংঘাত সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণ। কিন্তু প্রকৃতিপরিণামের এই উত্তরপর্বে বিদ্যা-অবিদ্যার মিশ্রণকে সম্পূর্ণ উৎ-খাত করতে হবে। এতদিন যেখানে ছিল শক্তির সংঘর্ষজনিত পরিণাম, সেখানে আনতে হবে শক্তির সৌষম্যজনিত পরিণাম। আবার তার জন্যে বিদ্যা আর অবিদ্যার একটা চরম সংঘর্ষ ঘটবে—উষার প্রাক্‌কালে আলো-আঁধারের শেষ লড়ায়ের মত। আধারের অবরভাগে, হৃদয়ে প্রাণে ও দেহে এ-সংঘর্ষ ফিরে দেখা দেয় আরও তুমুল হয়ে। কেননা এখানে বাধা কেবল ভাবেরই নয়—বাধা অপরা প্রকৃতির নানা বাসনা বেদনা প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়সংবিৎ প্রাণের

বুভুক্ষা ও চিরাচরিত অভ্যাসের। ভাবের আলোক পায় না বলেই আরও অন্ধভাবে এরা সাড়া দেয়—এদের আত্মপ্রতিষ্ঠার জিদকে দাবানো আরও কঠিন। এদের লড়াই করবার বা বারবার ফিরে আসবার ক্ষমতা মানস-সংস্কারেরই মত—বরং আরও বেশী। তাড়া খেয়ে এরা পরিচেতন বিশ্বপ্রকৃতির অন্দর-মহলে বা আমাদের আধারের অবরভাগে কি অবরচেতনার গর্ভাশয়ে পালিয়ে যায় এবং সেখান থেকে ভেসে উঠে যখন-তখন উৎপাত শুরু করে। এই-যে প্রকৃতির কায়েমী শক্তির অনুবৃত্তি আবৃত্তি এবং ব্যাঘাত, তার দুর্জয় প্রতিকূলতাকে পরিণামশক্তি বাধ্য হয়েই ঠেলে চলে—যদিও এ তার আপন হাতে গড়া জিনিস। রূপান্তরসিদ্ধি প্রকৃতির লক্ষ্য হলেও হঠাৎ-সিদ্ধি সে চায় না। তাই এমনতর তির্যকভঙ্গিতে তার অফুরন্ত প্রাণৈশ্বর্যের প্রকাশ।

সুতরাং উদয়নের প্রত্যেক পর্বে বাধা থাকবেই, যদিও ক্রমে তার জোর হয়তো কমে আসবে। আধারে উত্তরজ্যোতির আবেশ ও ক্রিয়াকে অব্যাহত করবার জন্য চাই শমথ বা প্রকৃতি-প্রশমের সাধনা—যাতে ইচ্ছামাত্র দেহ-প্রাণ-মন-হৃদয়কে অনুদ্বিগ্ন প্রশান্ত ও নিষ্ক্রিয় করা যেতে পারে, এমন-কি অক্ষোভ্য অশব্দের গহনে তাদের তলিয়ে দেওয়া চলে। কিন্তু তাতেও অবিদ্যার বীর্য সম্পূর্ণ পরাভূত হয় না। সবসময়ে একটা উদ্যত বাধা কখনও স্পষ্ট অনুভূত হয় বিশ্বগত-অবিদ্যার শক্তিস্পন্দে, কখনও-বা তার অধিচেতন বা অব্যক্ত কম্পন ধরা পড়ে ব্যষ্টি আধারের সত্ত্ববীর্যে—সাধকের মনের গড়নে, প্রাণনের ধরনে, জড়ের বিগ্রহে। অবিদ্যা-প্রকৃতির সংযমিত বা অবদমিত শক্তির একটা দুর্লক্ষ্য প্রতিকূলতা কিংবা একটা প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পুনঃপ্রয়াস যে-কোনও সময়ে সাধককে বিপর্যস্ত করতে পারে এবং আধারের কারও গোপন ইশারা পেলে আবার তারা হৃতরাজ্য জুড়ে বসাতেও পারে। এই-জন্যই পূর্ব হতে চৈত্যসত্তার ঈশনাকে প্রবুদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক—কেননা তাতে আধারের সর্বত্র জাগে উত্তরজ্যোতির দিকে সহজ একটা উন্মুখীনতা এবং জ্যোতিঃশক্তির বিরুদ্ধে অবরভাগের যে-বিদ্রোহ বা অবিদ্যার প্ররোচনার প্রতি তার যে-পক্ষপাত, তা আর মাথা তুলতে পারে না। চিন্ময়রূপান্তরের উপক্রমেও অবিদ্যার বন্ধন শিথিল হয়। কিন্তু চৈত্য বা চিন্ময় কোনও অনুভাবের সূচনামাত্র আধারের বাধা ও সঙ্কোচের মূলোচ্ছেদ করতে পারে না—কেননা গোত্রান্তরের এই প্রাথমিক সিদ্ধিই সাধকের মধ্যে সম্যক-চেতনা বা সম্যক্-সম্বোধি প্রতিষ্ঠার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। এত করেও অচিতিসুলভ অবিদ্যাতামসের আদিবীজটি আধারে থেকেই যায়। সুতরাং তার পরিসর ও ক্রিয়াশক্তিকে খর্ব ক'রে প্রতিমুহূর্তে তাকে জ্যোতির্ময় করে তোলবার প্রযত্নকেও কখনও শিথিল করা চলে না। চিন্ময় উত্তর-মানস এবং তার ভাব-বীর্য দিব্যভাবনার অগ্রদূত হলেও অবিদ্যার সকল বাধা দূর করে বিজ্ঞানঘন সত্ত্বকে সৃষ্টি করতে পারে না, কেননা প্রাকৃত-মনের ভূমিতে নেমে আসতে

স্বভাবতই তার শক্তির খর্বতা ও বিকার ঘটে। কিন্তু তাহলেও উত্তর-মানসই গোত্রান্তরের প্রথম সোপান রচনা করে এবং সাধকের উত্তরণ ও উত্তরশক্তির অবতরণকে সহজসাধ্য করে চেতনা ও বিজ্ঞানের বিপুলতর বীর্যে সে-ই আধারের সহস্রদল পূর্ণতার স্পষ্টতর সূচনা আনে।

এই বিপুলতর বীর্য আছে প্রভাস-মানসের—যা দিব্যমননেরও ওপারে, চিন্ময় জ্যোতিই যার স্বরূপধাতু। উত্তর-মানসে চিন্ময়ী বুদ্ধির যে-স্বচ্ছতা যে প্রশান্ত সৌরদীপ্তি ছিল, এখানে তার জায়গায় কি তাকে ছাপিয়ে ফোটে চিজ্‌জ্যোতির তীব্রচ্ছটা—তার প্রভাস্বর মহিমার ঝলমল ঐশ্বর্য। চিন্ময় সত্য ও শক্তির স্ফুরন্ত বিদ্যুদ্দাম ঊর্ধ্বলোক হতে ভেঙে পড়ে চেতনার গহনে—উত্তর-মানসের চিন্ময় সামান্যভাবনার সহজাত অনুদ্বেল জ্যোতির্ময় বিশাল প্রশান্তিকে করে বিজ্ঞানময় অনুভবের লেলিহান বহ্নিশিখায় ও লোকোত্তর আনন্দের অমেয় উচ্ছ্বাসে তড়িন্ময়। সেইসঙ্গে আধারে অন্তর্দৃশ্য জ্যোতিঃ-সম্পাতের বিপুল প্লাবন নামে। এখানে মনে রাখতে হবে, আলোককে আমরা সাধারণত যা ভাবি, তা সে নয়। অর্থাৎ আলোক জড়সৃষ্টি নয়, কিংবা প্রভাস্বর চিত্তের জ্যোতির্ময় অনুভব ও দর্শন একটা প্রত্যক্-বৃত্ত কল্পছবি কি প্রতীকী প্রতিভাস মাত্র নয়। আলোক বস্তুত ভাগবত সত্তার চিন্ময়ী বিভূতি—প্রকাশ ও সৃষ্টি দুইই তার ধর্ম। জড় আলোক ওই চিন্ময় আলোকের স্থূল ছায়া বা পরিণাম মাত্র—জড়শক্তির প্রয়োজনে তার সৃষ্টি। এই জ্যোতিঃ-সম্পাতের সঙ্গে দেখা দেয় অন্তর্গূঢ় মহাশক্তির একটা দুর্বার স্ফুরত্তা, একটা হিরণ্য-জ্যোতির্ময় ঈশনা, একটা প্রভাস্বর দিব্যোন্মাদ, যা উত্তর-মানসের মনন-মন্থর রূপায়ণের স্থানে ক্ষিপ্র রূপান্তরের দ্রুতবিসর্পী সংবেগ আনে—কখনও জোয়ারের মত, কখনও-বা কূলভাঙা প্লাবনের মত।

প্রভাস-মানসের মুখ্য সাধন হল দর্শন—মনন নয়। মনন এখানে দর্শনের ব্যঞ্জনাবহ একটা গৌণবৃত্তি মাত্র। মননই প্রাকৃত-মনের প্রধান সম্বল—তাই মানুষ মনে করে মনন বুঝি জ্ঞানের সর্বোত্তম মুখ্যসাধন। কিন্তু চিজ্‌-জগতে মননের ব্যাপার গৌণ—অপরিহার্য নয়। ব্যাবহারিক জগতের বাঙ্ময় মননকে বলতে পারি অবিদ্যার কাছে বিদ্যার যেন একটা রেয়াত। কেননা সত্যের বিপুল ব্যঞ্জনাকে অবিদ্যা আর-কোনও উপায়ে নিজের কাছে সুগম ও প্রাঞ্জল করতে পারে না—অর্থবহ শব্দের সুস্পষ্ট সঙ্কেত ছাড়া। একমাত্র ভাষার কৌশলে ভাবের ব্যঞ্জনা তার কাছে সুব্যক্ত রেখার টানে অর্থবান বিগ্রহের আকারে ফোটে। কিন্তু স্পষ্টই দেখছি, ভাষা অবিদ্যার একটা উপায়কৌশল মাত্র। মননের নিরুপাধিক রূপ ফোটে চেতনার ঊর্ধ্বলোকে বস্তু বা বস্তু-সত্যের অব্যবহিত প্রত্যয়ে—যা চিন্ময়-দর্শনের একটা বীর্যশালী অথচ অবান্তর গৌণ পরিণাম। সত্যদর্শন আত্মবস্তুরই অখণ্ডদর্শন। বিষয় সেখানে বিষয়ীর বিভূতিবিস্তর মাত্র, অতএব সর্বত্র সে-দর্শন অদ্বৈতবাসিত।

কিন্তু মননের দর্শনে প্রমাতার দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বহির্মুখী এবং আত্মার বিভূতি-বৈচিত্র্যের ভেদগ্রাহী। এই ভেদগ্রহ প্রাকৃত-মননে আরও স্পষ্ট। দৃষ্ট বা আবিষ্কৃত কোনও বস্তু তথ্য কি তত্ত্বের সন্নিকর্ষে মনের সদরমহলে যে প্রত্যক্ষের সাড়া জাগে, অন্তঃকরণ দিয়ে তাকেই সে ভাবনায় রূপায়িত করে। কিন্তু চিন্ময়-দর্শনে বস্তুসত্যের সংবেদন জাগে একেবারে চেতনাধাতুর মর্ম হতে এবং সেইখানে সম্ভূতিসংবিতের প্রেরণায় তার সত্য রূপায়ণ ঘটে—প্রমাতার চিৎসত্ত্বে ফোটে প্রমেয়ের চিদ্‌ঘন ভাববিগ্রহ। সুতরাং মনন-জ্ঞানকে সম্পূর্ণ ও নিখুঁত করবার জন্য সেখানে বাঙ্ময় বা মনোময় বিগ্রহ রচনা করবার প্রয়োজনই হয় না। মনন সত্যের আভাস-বিগ্রহ রচনা করে। তাকেই সে প্রাকৃত-মনের কাছে সত্যের গ্রহণ ও প্রমিতির সাধনরূপে হাজির করে। কিন্তু প্রভাস-মানসের দিব্যদর্শনের সৌরকরে ঝলসে ওঠে সত্যের স্বরূপবিগ্রহের সত্যভাতি। কাজেই মননের রচিত আভাস-বিগ্রহ তার তুলনায় জন্য এবং গৌণ—বিদ্যাসম্প্রদানের দিক দিয়ে তার একটা গভীর সার্থকতা থাকলেও বিদ্যার গ্রহণ বা ধারণার জন্য তা অপরিহার্য নয়।

ঋষির চেতনায় আছে দর্শনের সংবেগ, সুতরাং মনস্বীর চেতনার চাইতে বিদ্যাধারণে যোগ্যতা তার বেশী। অন্তর্দৃষ্টির প্রত্যক্ষশক্তি মননের প্রত্যক্ষ-শক্তির চাইতে ব্যাপক এবং অব্যবহিত। তাকে বলতে পারি চিন্ময় ইন্দ্রিয় বিশেষ, যা দিয়ে সত্যের ধাতুকে বা সত্ত্বকে ধরা যায়—শুধু তার আকৃতিকে নয়। আবার সে-দর্শন সত্যের আকৃতিকেও রেখায়িত করে এবং সেইসঙ্গে তার ব্যঞ্জনাকে পরিস্ফুট করে তোলে। সত্যদর্শনে সত্যের রূপরেখা ফোটে সূক্ষ্ম এবং স্পষ্টতর হয়ে, তার ব্যাপ্তি এবং সমগ্রতার ভাবনা আরও বৃহৎ হয় -শুধু মনন-কল্পনায় যা কখনও সম্ভব হত না। উত্তর-মানস আধারে চেতনার ব্যাপ্তি ঘটায় চিন্ময় ভাবনার সিদ্ধবীর্য দিয়ে। প্রভাস-মানস ঋত-চক্ষু ও ঋতজ্যোতির চিন্ময় গ্রাহকশক্তির উদ্বোধনে চেতনার সীমাকে আরও সম্প্রসারিত করে। তাই তার আবেশে প্রবুদ্ধ আধারের সমাহরণী বৃত্তির বীর্য ও সংবেগও তীক্ষ্ণতর হয়। অপরোক্ষ অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রেরণার দীপ্তিতে মনন-চিত্তকে সে উদ্ভাসিত করে, হৃদয়কে দেয় দিব্যচক্ষুর সম্পদ—তার আবেগ ও বেদনায় দিব্যজ্যোতি ও দিব্যশক্তির ধারাসার আনে, প্রাণশক্তিতে সঞ্চারিত করে চিন্ময় প্রেতি ও সত্যানুভূতির সংবেগ—যা কর্মকে করে বিদ্যুন্ময়, জীবনকে করে ঊর্ধ্বস্রোতা। এমন-কি ইন্দ্রিয়সংবিতেও সে চিন্ময় ইন্দ্রিয়-চেতনার অপরোক্ষ অখণ্ডবীর্য ঢালে, যাতে আমাদের প্রাণময় ও অন্নময় সত্তা ঘটে-ঘটে ব্রহ্ম-সংস্পর্শের অব্যবহিত সামর্থ্যে আপূরিত হয়। সে-সংস্পর্শে থাকে হৃদয়-মনের দিব্য ভাবনা-চেতনা-বেদনারই মত প্রত্যক্ষানুভবের তীব্রতা। প্রভাস-মানসের হিরণ্যবর্তনি জ্যোতির অভিঘাতে প্রাকৃত-মনের সকল সঙ্কোচ ও স্থিতিধর্মী অসাড়তা ভেঙে পড়ে, তার সংশয়াচ্ছন্ন মননশক্তির সঙ্কীর্ণতায়

আসে দিব্যদর্শনের প্রমুক্তি—এমন-কি দেহেরও অণুতে-অণুতে বিচ্ছুরিত হয় দিব্যচেতনার দীপ্তি। উত্তর-মানস যে-রূপান্তর আনে, তাতে অধ্যাত্মযোগী ও মনস্বী সাধক জীবনের পূর্ণকল ও প্রাণোচ্ছল সার্থকতা খুঁজে পান। কিন্তু প্রভাস-মানসের সৃষ্ট রূপান্তরে অনুরূপ সিদ্ধি আসে ঋষি ও দীপ্তচেতন ভাবকের সাধনায়। অপরোক্ষানুভব দিব্যদর্শন ও অপরোক্ষসংবিৎ এঁদের অধ্যাত্মসম্পদ। প্রভাস-মানসের জ্যোতির্লোকে তার অক্ষয় ভাণ্ডার নিহিত আছে। অতএব ওই দিব্য-ভূমির অধিবাসী হওয়াতেই তাঁদের স্বারাজ্যের সাধনা সিদ্ধ হয়।

কিন্তু উদয়নের এ-দুটি পর্বের বীর্য নিহিত রয়েছে তৃতীয় আরেকটি ভূমিতে—যেখানে তাদের যুগনদ্ধ আত্মসম্পূর্তির মহিমা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বোধিসত্তার তুঙ্গতর ভূমিতে বিজ্ঞানের যে-স্বয়ংজ্যোতি আছে, তাকেই তারা মনন ও দর্শনের আকারে আধারে নামিয়ে এনে মনকে দেয় পরশমণির সোনার ছোঁয়া। পূর্বেই বলেছি, বোধি চিৎশক্তির সেই অন্তরঙ্গ বিভূতি, যা প্রথমজ তাদাত্ম্যজ্ঞানের আসন্নচর—কেননা গুহাহিত তাদাত্ম্যের বিচ্ছুরণই সবসময় বোধির দীপ্তি হয়ে চমক হানে। বিষয়িচেতনা যখন বিষয়চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট ও অনুবিদ্ধ হয়ে তার তত্ত্বরূপের আমর্শনে স্পন্দিত হয়, তখন উভয়ের সেই অলৌকিক-সন্নিকর্ষ হতেই বিদ্যুদ্দামের মত স্ফুরিত হয় বোধির চেতনা। অথবা অলৌকিক-সন্নিকর্ষের অভাবেও, চেতনা যখন আত্মসমাহিত হয়ে অপরোক্ষ অন্তরঙ্গ অনুভব দিয়ে সত্যের বা সত্যব্যূহের সত্যরূপ জানে, কিংবা প্রতিভাসের অন্তরালে অন্তর্গূঢ় শক্তিকূটের নিবিড় স্পর্শ পায়, তখনও চেতনায় বোধির বৈদ্যুতী ঝিলিক হানে। আবার চেতনা যখন পরাৎপর-তত্ত্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হয় এবং তাইতে লোকোত্তর স্পর্শযোগের নিবিড় রসে জারিত হয়—তখন তার গভীর গহনে অন্তরঙ্গ বোধিজ-প্রত্যক্ষ জ্বলে ওঠে স্ফুলিঙ্গের মত, বিদ্যুৎ চমকের মত, কি লেলিহান শিখার মত। অনুভবের এই অপরোক্ষতা কিন্তু দর্শন বা সামান্য-প্রত্যয়ের চাইতেও রসঘন। মর্মাবগাহী স্পর্শযোগের প্রদ্যোতনা হতে তার আবির্ভাব—দর্শন ও সামান্যপ্রত্যয় তার অঙ্গীভূত স্বাভাবিক পরিণাম মাত্র। তাদাত্ম্যবোধ এর মধ্যে গুপ্ত বা সুপ্ত হয়ে আছে—এখনও নিজেকে সে খুঁজে পায়নি। অথচ এই বোধিরই সহায়ে সে স্মরণ ও ক্ষেপণ করে তার মর্মনিহিত বস্তুর আত্মস্বরূপে দর্শন ও অনুভবের নিবিড়তাকে, তার সত্যের দীপ্তিকে, তার স্বতঃসিদ্ধ নৈশ্চিত্যের অমোঘ বীর্যকে।

প্রাকৃত-মনেও বোধির সহায়ে এমনিতর স্বরূপসত্যের স্মরণ ও ক্ষেপণ চলে। কখনও অবিদ্যার পুঞ্জিত আধারে, কখনও-বা অজ্ঞানের যবনিকাকে বিদীর্ণ করে বোধির সন্দীপনী সত্যের ঝলক হানে। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, মানস-সংস্কারের মিশ্রণে ও প্রলেপে সেখানে তার বীর্য ব্যাহত বা পরাবর্তিত হয়। তাছাড়া বোধির ইঙ্গনাকে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা আছে বলেও অনেকসময়

তার ক্রিয়া ব্যামিশ্র এবং খণ্ডিত হয়। আবার চেতনার প্রত্যেক স্তরে আছে তথাকথিত বোধির বাহানা—বোধির সহজদর্শন না বলে যাদের বলতে পারি অনুভবের অবান্তর বিক্ষেপ। তাদের নিদান স্বভাব ও সার্থকতারও অফুরন্ত বৈচিত্র্য আছে। তথাকথিত অ-বোধ ভাবকের যুক্তিহীন চিত্তে এইসব বিক্ষেপ প্রায়ই অন্ধকারের শঙ্কিল গুহাশয়ন হতে প্রাণোচ্ছ্বাসের তামস আকৃতিরূপে হানা দেয়। বস্তুত ভাবক হতে গেলে বিচারবুদ্ধিকে কুলার বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে, যার তত্ত্ব জানি না এমন দৈবী প্রেরণাকে ভাব ও কর্মের দিশারী করলেই চলে না।...এইজন্যই আমাদের যুক্তির 'পরে নির্ভর করবার ঝোঁক হয়। তাইতে ভূয়োদর্শী বিবেকী বুদ্ধির সমীক্ষা দিয়ে আমরা বোধির ইশারাকে শাসন করতে চাই—যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের বোধি একটা ছদ্ম বোধি-মাত্র। যাকে বোধি বলছি, তার মধ্যে কতটুকু খাঁটি কতটুকুই-বা ভেজাল কি মেকী, তা নিয়ে একটা সংশয় আমাদের বুদ্ধিতে উদ্যত হয়েই থাকে। কিন্তু বোধির সার্থকতা এতে অনেকখানি কমে যায়। এক্ষেত্রে যুক্তিবুদ্ধির বিচারকেও নির্ভরযোগ্য ভাবতে পারি না—কেননা সে-বিচারের ধারা যেমন আলাদা, তেমনি তার এষণায় চরম ও নিশ্চিত প্রাপ্তির আশ্বাস নাই। অথচ বোধির দর্শনকে স্বীকার না করে নিশ্চিত প্রাপ্তির পথে বুদ্ধির এক-পা চলবারও উপায় নাই। প্রচ্ছন্ন বোধির 'পরে তার সকল সিদ্ধান্তের একান্ত নির্ভর হলেও বোধির এই ঋণকে বুদ্ধি গোপন করতে চায় যুক্তিসিদ্ধ নির্ণয় বা দৃক্‌সিদ্ধ অভ্যুপগমের বিস্তার করে। কিন্তু বোধির বিচার করতে বুদ্ধির রায়কেই প্রমাণ মানলে তাকে আর বোধি বলা চলে না। বোধি তখন বুদ্ধির অনুজ্ঞা নিয়ে চলবে, অথচ বুদ্ধির নৈশ্চিত্যকে অপরোক্ষ করবার কোনও আন্তর সাধনও থাকবে না! মন কখনও অন্তর্নিহিত বোধির সঞ্চয়ের 'পরে ভর করে বোধিমানসের কাছাকাছি উঠে যেতেও পারে। কিন্তু বোধিবাসিত হলেও তার প্রত্যয় ও বৃত্তির রাজ্যে তখনও শুধু বিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ঝিলিক হানা চলবে। তাদের সংহত করে একটা সৌষম্যের ছন্দ ফোটানো কঠিন হবে—যতক্ষণ এই নবমানস তার বুদ্ধ্যতীত উৎসের সঙ্গে চিন্ময় যোগে যুক্ত না হবে, অথবা ঊর্ধ্বগ স্বতঃপ্রেরণায় চেতনার সেই উত্তরভূমিতে উন্নীত না হবে যেখানে বোধির বৃত্তি শুদ্ধ এবং সহজ।

বোধি সর্বত্র কোনও উত্তরজ্যোতির আ-ভাস রশ্মি বা বিচ্ছুরণ। মর্ত্য আধারে প্রথম সে নেমে আসে কোন্ অতিমানস সুদূরজ্যোতির একটা প্রচ্ছুরিত শিখা আ-ভাস কি বিন্দুর আকারে। এই মনেরই ওপারে কোনও সত্যমানসের অন্তরিক্ষলোকে প্রবেশ করে সে যেন হয় জ্যোতির্ময় বাষ্পের ফানুস—তারপর আরও নীচে এসে আচ্ছন্ন হয়ে যায় আমাদের অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাকৃত-মনের আলো-আঁধারিতে। কিন্তু লোকোত্তর স্বধামে তার দীপ্তি নির্মল ও অনাচ্ছন্ন, অতএব একান্তই ঋতম্ভরা। সেখানে তার রশ্মিমালা সংহত—পরিকীর্ণ নয়।

অথবা তার জ্যোতির্ময় উচ্ছলতাকে কবির ভাষায় বলা যেতে পারে 'স্থিরা সৌদামিনীর পুঞ্জিত প্রভা'। বোধির এই অব্যাকৃত সহজদীপ্তি বোধিলোকে উত্তীর্ণ চেতনার আকুতিতে কিংবা বোধির সঙ্গে আমাদের যোগযুক্তির কোনও সুনিশ্চিত কৌশল আবিষ্কারের ফলে আধারে যখন নেমে আসে, তখন চকিতদীপ্ত বা নিরন্তর বিদ্যুৎ-ঝলকে আধারকে সে উদ্ভাসিত করে চলে। কিন্তু তখন তার লীলায়ন বুদ্ধির বিচারের বাইরে। বুদ্ধি তখন বোধির দর্শক বা অনুলেখকমাত্র—এই উত্তরশক্তির জ্যোতির্ময় সঙ্কেত প্রত্যয় ও সমীক্ষাকে তলিয়ে বোঝা কি টুকে রাখাই তার কাজ। বুদ্ধির মানদণ্ডে বিচার করে বোধির কোনও বিবিক্ত প্রকাশের স্বরূপ প্রয়োগ বা অধিকার নিরূপণ করা চলে না। তার জন্য যোগ্য প্রমাতাকে নির্ভর করতে হয় অন্যকোনও বোধির আপূরণের 'পরে, অথবা চেতনায় সর্বসমন্বয়ী পুঞ্জিত-বোধির পরিবেশ নামিয়ে আনতে হয়। কারণ, বোধির আবেশে চেতনার রূপান্তর একবার শুরু হয়ে গেলে মনোধাতু এবং মনোবৃত্তিকে বোধির সত্ত্বে বীর্যে ও আকৃতিতে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যতক্ষণ তা না হয়, অর্থাৎ চেতনার ব্যাপ্রিয়াতে বোধির আসেবন আনুকূল্য বা উপযোগে ব্যাপৃত প্রাকৃতবুদ্ধির শাসন যতদিন চলে, ততদিন বিদ্যা-অবিদ্যার মিথুন-লীলাই কায়েমী থাকে আধারে—শুধু তার বিদ্যাভাগকে থেকে-থেকে উচ্চকিত কি উদ্দীপ্ত করে তোলে উত্তরজ্যোতি ও উত্তরশক্তির বিচ্ছুরণ।

বোধির সামর্থ্যের চারটি বিভাব আছে। তার সত্যদর্শনের সামথ্য বস্তুর স্বরূপ উন্মোচিত করে, সত্যশ্রুতির সামর্থ্য অন্তরে আনে দিব্য প্রেরণা, ঋতস্পৃক্ সামর্থ্য দেয় মর্মসত্যের অপরোক্ষ ধৃতি—সাধারণত এই বিভাবটিই ফোটে আমাদের মানস-বুদ্ধির বোধিসংবিতে। আর চতুর্থত তার স্বতঃস্ফূর্ত সত্যবিবেকের সামর্থ্য সত্যের সঙ্গে সত্যের অন্যোন্যসম্বন্ধের ধ্রুববিধানকে আবিষ্কার করে। অতএব বুদ্ধির সকল ব্যাপারই বোধির দ্বারা নিষ্পন্ন হতে পারে—এমন-কি তর্কবুদ্ধির যে বিশিষ্ট শৈলীতে বস্তু ও ভাবের অন্যোন্য-সম্বন্ধের ধারা নিরূপিত হয়, তাও বোধির অনায়ত্ত নয়। বরং বোধির ব্যাপ্রিয়া আরও উন্নত বলে বুদ্ধির মত তার চলতে গিয়ে পা টলে না কি পা ফস্কায় না। বোধির প্রেতিতে শুধু যে মননচিত্তই বোধিধাতুতে রূপান্তরিত হয় তা নয়—হৃদয়ে প্রাণে ইন্দ্রিয়বোধে এমন-কি দৈহ্যচেতনাতেও সে-রূপান্তরের বৈদ্যুতী সঞ্চারিত হয়। এদের সবার মধ্যে অন্তর্গূঢ় বোধিজ্যোতি হতে আহৃত স্বকীয় একটা বোধির বৃত্তি আছে। কিন্তু উপর হতে বোধির শুদ্ধবীর্যের অনুষেক নতুনভাবে যখন তাদের ভাবিত করে, তখন হৃদয় প্রাণ ও দেহের এইসব গভীর বোধশক্তিতে একটা বৃহত্তর পূর্ণতা ও অভঙ্গভাবনার সামর্থ্য সংক্রামিত হয়। সমগ্র চেতনাই এমনি করে বোধির ধাতুতে রূপায়িত হয়। সাধকের সঙ্কল্পে বেদনায় ভাবের আবেগে প্রাণের প্রেতিতে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বোধের

ক্রিয়ায়, এমন-কি দেহচেতনার বৃত্তিতে জাগে বোধির উত্তরজ্যোতির বিপুল শিহরণ—তার অগ্নিস্পর্শে আধারের স্তরে-স্তরে জ্বলে ওঠে সত্যের শক্তি ও দীপ্তির শিখা এবং তার প্রত্যেকটি বৃত্তির অন্তর্নিহিত বিদ্যা- এবং অবিদ্যা-শক্তি সমানভাবে সন্দীপিত হয়। এমনি করে চেতনা একটা উদার অভঙ্গ-ভাবনার দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু সে-ভাবনা সম্যক্ কি না তা নির্ভর করে—বোধির নবদীপ্তি অবচেতনার কতখানি অধিকার করল এবং অনাদি অচিতির তমিস্রাকে কতখানি অনুবিদ্ধ করল, তার 'পরে। এইখানে বোধির শক্তি ও দীপ্তি ব্যাহত হতে পারে। কেননা বোধি অতিমানসের আ-ভাস হলেও তার ক্ষুণ্ণবীর্য প্রতিভূ মাত্র, অতএব তাদাত্ম্যবোধের পরিপূর্ণ ভরকে সে আধারে নামিয়ে আনতে পারে না। অপরা প্রকৃতিতে অচিতির মূল এত গভীরে এমন নিরেট হয়ে ছড়িয়ে আছে যে, তাকে অনুবিদ্ধ করে জ্যোতিঃশক্তিতে রূপান্তরিত করা ঋতাবরী প্রকৃতির কোনও অবরবিভূতির সাধ্য নয়।

বোধিমানসের পরের ধাপে আমরা উত্তীর্ণ হই অধিমানসে। বোধিজ-রূপান্তর এই চিন্ময় উত্তরণের ভূমিকা মাত্র। পূর্বেই বলেছি, অধিমানসী চেতনা সম্যক্‌গ্রাহী নয়—তার মধ্যে একটা নির্বাচনী-বৃত্তি আছে। তবুও সংবতুল জ্ঞানের আধাররূপে সে বিশ্বচেতনার বিভূতি—তার দ্যুতি অতি-মানস বিজ্ঞানঘন জ্যোতির প্রতিভূ। অতএব বিশ্বচেতনার মহাবৈপুল্যে অবগাহন করেই আমরা অধিমানস আরোহ-অবরোহের সঙ্কেত পাব—অন্য কোনও উপায়ে নয়। ব্যক্তিচেতনার অগ্র্যা এষণার দ্বারা লোকোত্তর জ্যোতির তুঙ্গশৃঙ্গে আরূঢ় হলেই অধিমানসভূমির সন্ধান পাওয়া যাবে না—তার জন্য চাই চেতনার যুগপৎ উদগ্র উৎক্ষেপ ও বিপুল বিস্তার, চিৎসত্তার সমগ্রতার একটা অখণ্ড বিধৃতি। অন্তত প্রথম হতেই বহির্মানসের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জায়গায় আনতে হবে অন্তরপুরুষের গভীর ও বিশাল সংবিতের ঔদার্য এবং বিশ্বাত্মবোধের বিপুল মুক্তির মধ্যে বাঁচতে শিখতে হবে। এ নইলে অধিমানসী দৃষ্টি আমাদের যেমন খুলবে না, তেমনি অধিমানসী শক্তির বীর্যময় স্ফুরণও স্বাচ্ছন্দ হবে না। অধিমানসের অবতরণে অহংবুদ্ধির আত্মকেন্দ্রিকতা গুণীভূত হয় এবং সত্তার ঔদার্যে আত্মহারা হয়ে অবশেষে তার পরিনির্বাণ ঘটে। তার জায়গায় দেখা দেয় বিশ্বাত্মচক্ষুর উদার দর্শন এবং অসীম বিশ্বাত্মা ও বিশ্ব-স্পন্দের বিপুল সংবিৎ অহংকেন্দ্রিত অনেক বৃত্তি তখনও হয়তো অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু বিশ্বচেতনার সাগরবক্ষে তারা তখন ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গের মত দুলতে থাকে। মনের বেশির ভাগ মননকেই আর তখন ব্যক্তিচেতনার ধর্ম বলে জ্ঞান হয়না। মনে হয়, তারা ঊর্ধ্বলোক হতে বা বিশ্বমনের তরঙ্গদোলার কিরীটরূপে আসছে যেন। ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টিতে ও অন্তঃপ্রজ্ঞায় বস্তুর যে সত্যরূপ কি তত্ত্বজ্ঞান ফোটে, তাকে দিব্যদর্শন বা দিব্যশ্রুতি বলেই অনুভব হয়, কিন্তু তার উৎসরূপে তখন দেখি বিশ্বপ্রজ্ঞার হিরণ্যদ্যুতিকে—বিবিক্ত ব্যক্তিচেতনাকে

নয়। সমস্ত সংজ্ঞা বেদনা ও হৃদয়ের আবেগ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের 'পরে বিশ্বসাগরের ঢেউয়ের মত তেমনি করেই ভেঙে পড়ে এবং বৈশ্বানর আত্মসংবিতে জাগায় অনুরূপ আলোড়ন। কারণ, সত্য বলতে ব্যক্তির দেহ মহাবিপুল বিশ্বলীলার একটি ক্ষুদ্র আধার, কিংবা তার চাইতেও নগণ্য—মহাশক্তির একটি ক্ষেপণবিন্দু মাত্র। চেতনার এই সীমাহীন বৈপুল্যে বিবিক্ত অহন্তার সকল সংস্কার—এমন-কি পরমপুরুষের দাস বা নিমিত্তরূপে ব্যক্তি-ভাবনার গৌণবোধটুকু পর্যন্ত—সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে জেগে থাকে শুধু বিরাট সন্মাত্র বিরাট চৈতন্য বিরাট আনন্দ ও বিরাট শক্তিব্যূহের লীলায়ন। যদি-বা সাধকের দেহ-প্রাণ-মন সে আনন্দ কি শক্তির আধাররূপে অনুভূতও হয়, তবু সে-অনুভবে বিসৃষ্টির ক্ষেত্ররূপটি ছাড়া ব্যক্তিসত্ত্বের কোন বেদনই থাকে না। আর শুধু একটি দেহে কি একটি ব্যক্তিতে এই আনন্দ ও শক্তির অনুভব অবরুদ্ধ না থেকে নিঃসীম সর্বতোব্যাপ্ত একাত্ম-চেতনার অণুতে-অণুতে তার বিপুল প্রত্যয় বিচ্ছুরিত হয়।

কিন্তু অধিমানস চেতনা ও অনুভবের বিভূতিবৈচিত্র্যের অন্ত নাই—কেননা অধিমানসের মধ্যে আছে সাবলীলতার অবন্ধন ছন্দ, আছে অগণিত সম্ভাব্যের মেলা...কেন্দ্রবর্জিত অসংস্থিত অব্যাকৃতির জায়গায় কখনও হয়তো দেখা দিল—আমাতেই বিশ্ব বা আমিই বিশ্ব—এমনিতর একটা সংহত বোধ। কিন্তু সে 'আমিও' অহঙ্কারের কাঁচা-আমি নয়। আমিত্ব সেখানে শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ আত্মচেতনারই প্রসার অথবা সর্বাত্মভাবজনিত তাদাত্ম্যপ্রত্যয়—যাতে ব্যক্তিতে জাগে বিশ্বচেতন বৈশ্বানরপুরুষের বোধ।...আবার বিশ্বচেতনার বিশেষ-ভূমিতে ব্যক্তি বিশ্বের কুক্ষিগত থাকে—কিন্তু তার সমস্ত চেতনা একাকার হয়ে যায় চেতন-অচেতন সবার সঙ্গে, সবার বেদন-মনন হর্ষ-শোকের সঙ্গে। আবার আরেক ভূমিতে সর্বভূত থাকে আমারই আধারে—তাদের জীবনের অনুভব সত্য হয়ে ওঠে আমারই আত্মসত্তার অনুভবে।...অনেকসময় বিশ্বপ্রকৃতির বিপুল লীলায়নে বাধাবন্ধহারা স্বৈরিণীর স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয়—ব্যক্তিসত্তা হয় নির্বিরোধে তার অনুবর্তন করে, নয়তো সক্রিয় অধ্যাসে তার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। কিন্তু চিৎসত্তা তবু স্ব-তন্ত্র ও নির্বিকার থাকে। নির্বিরোধ ঔদাসীন্য, কিংবা বিশ্বগত অথচ নৈর্ব্যক্তিক একাত্মবোধ ও সমবেদনা, দুটির একটিও তার মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না।......কিন্তু অধিমানসের গভীর অনুভাব কি পূর্ণবীর্য আধারে নেমে এলে সাধকের মধ্যে বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বরের অকুণ্ঠ আবেশ ঈশনা ও অন্তর্যামিত্বের একটা অখণ্ড নিরতিশয় অনুভূতি স্ফুরিত হতে পারে এবং সে-অনুভূতি ক্রমে তার স্বভাবে পরিণত হতে পারে।...অথবা আধারে এমন-একটি চিৎকেন্দ্র রচিত বা অভিব্যক্ত হতে পারে—যা ব্যক্তিসত্ত্বের এক সর্বাতিশায়ী ও সর্বাভিভাবী রূপ, অথচ যার চেতনা নৈর্ব্যক্তিক হয়েও পরাবর পরা সংবিতের স্বচ্ছন্দ নিমিত্তমাত্র।

অধিমানস হতে অতিমানস উত্তরায়ণের সময় এই চিৎকেন্দ্রের সঙ্কর্ষণে পর্যুষিত অহন্তার স্থানে আবির্ভূত হয় নিত্যজীবের স্বরূপচেতনা। সে-জীব স্বরূপত পরা সংবিতের আত্মভূত, ব্যাপ্তিত বিশ্বের সঙ্গে একাত্মা—অথচ জীবরূপে অনন্তস্বরূপের বিশিষ্ট বিভাবনার যুগপৎ বিশ্বতোমুখ কেন্দ্র এবং পরিধি।

এইসব অনুভব অধিমানস চেতনার সামান্য-পরিণামরূপে তার প্রথম পর্বে দেখা দেয় এবং উন্মিষিত চিন্ময় সত্তায় এরাই সে-চেতনার সহজভূমি গড়ে তোলে। কিন্তু অধিমানস চেতনার বিভূতি-বিস্তর বস্তুতই অন্তহীন। তাকে আমরা অনুভব করি সত্য ও জ্যোতির সংবিৎরূপে, সত্য ও জ্যোতির অকুণ্ঠ বীর্য বৃত্তি ও সংবেগরূপে। আধারে সে-চেতনা সর্বগত অথচ বহুধা বৈচিত্র্য-খচিত শ্রী ও আনন্দের রসসান্দ্র অনুভবে উছলে উঠে। তার দীপ্তি সমগ্রে ও সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে বিভূতিস্পন্দের একটি ছন্দে, আবার সকল ছন্দে। অন্তহীন বিশেষের অফুরন্ত ও অনির্বচনীয় বৈচিত্র্যে তার অনিঃশেষ সম্ভাব্যতার নিত্য উপচয় ও লীলায়ন চলে। এই লীলোচ্ছলতার মধ্যে অধি-মানসের বিজ্ঞানচেতনা যদি ঋতের প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে পুরুষের চেতনায় ও কর্মে রূপায়িত হয় বিরাটের মুক্তচ্ছন্দ—যার মধ্যে মনোময় সৃষ্টির আড়ষ্ট কাঠিন্য নাই। চিৎশক্তির সে-রূপায়ণ সাবলীল ও প্রাণোচ্ছল—নিজের সহস্রদল উপচয়কে সে আনন্ত্যের চক্রবালে মুক্তি দিতে পারে। অধিমানস প্রতিষ্ঠায় চিন্ময় অনুভবের সামর্থ্য সর্বগ্রাহী ও স্বভাবগত হয়। দেহ-প্রাণ-মনের স্বারসিক সকল অনুভব চিৎসত্ত্বে রূপান্তরিত হয়ে আধারে স্ফুরিত হয় অনন্ত-সন্মাত্রের দিব্য চেতনা আনন্দ ও বীর্যের বিভূতিরূপে। অধিমানসের আবেশে বোধি প্রভাসমানস ও উত্তরমানসেরও সম্প্রসারণ ঘটে। তাদের আপ্যায়িত শুদ্ধসত্ত্ব হয় আরও সান্দ্র বিপুল ও বীর্যশালী, তাদের শক্তিস্পন্দে দেখা দেয় আরও সর্বতোভাবী বহুমুখী বর্তুলতা, সত্যবীর্যের আরও অসঙ্কুচিত ও সমর্থ সংবেগ। এমনি করে পুরুষের সমস্ত প্রকৃতি—তাঁর বিজ্ঞান বেদনা করুণা রসচেতনা ও শক্তির উচ্ছলন—সমস্ত আরও উদার সর্বগ্রাহী সর্বাবগাহী বিশ্বতোমুখ ও অনন্তসমাপত্তিতে মহিমময়।

চিন্ময়-রূপান্তরের তীব্রসংবেগের উপান্ত্য পর্বে এই অধিমানস-রূপান্তর দেখা দেয়। চিন্ময়-মানসের ভূমিতে চিৎসত্তার প্রতিষ্ঠা ও স্ফুরত্তার যুগনদ্ধ চরম অভিব্যক্তিও হয় এই পর্বে। নীচের তিনটি ভূমির যা-কিছু বৈশিষ্ট্য, শুধু তাদের সমাহরণ নয়, তাদের তুঙ্গতম ও বিপুলতম বীর্যের ঊর্ধ্বভাবনাও এই পর্বেই ঘটে এবং তারা আরও সমৃদ্ধ হয় চেতনা ও শক্তির বিশ্বতোমুখ বৈপুল্যে, জ্ঞানের সর্ব-সঙ্গত সৌষম্যে, আনন্দস্বরূপের আরও বিচিত্র উচ্ছলতায়। তবু অধিমানসের স্থিতি ও শক্তিতে এমন-কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যাতে চিন্ময়-পরিণামের শেষ পর্বটিকে রূপ দেওয়া তার সাধ্যে কুলায় না।

অধিমানস স্বরূপত চিৎশক্তির অবরার্ধের বিভূতি—যদিও সে তার শ্রেষ্ঠ বিভূতি। বিশ্বগত ঐক্যভাবনা তার ভিত্তি হলেও, তার ক্রিয়াশক্তি ফোটে বিভাজনে ও ক্রিয়াব্যতিহারে, অতএব তার মূলে থাকে বহুত্বভাবনার প্রবর্তনা। যে-কোনও মানসব্যাপারের মতই তার কারবার ভব্যার্থকে নিয়ে। ভব্যার্থ তার কাছে প্রাকৃত-মনের মত অবিদ্যাকল্পিত না হয়ে যদিও সত্যজ্ঞানেরই অচরিতার্থ ব্যঞ্জনা, তাহলেও প্রত্যেকটি ভব্যার্থকে সে পরিচালিত করে তার স্ব-তন্ত্র শক্তিপরিণামের ধারা ধরে। বিশ্বের প্রত্যেকটি তত্ত্বে ব্যাকৃতির যে-মন্ত্র নিহিত রয়েছে, তাকে স্ফুরিত করাই তার ধর্ম—অত্যয়নের স্ফুরদ্‌বীর্যে তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া নয়। মর্তভূমিতে জড় প্রাণ ও মন আপন লোকোত্তর উৎসমুখ হতে বিচ্যুত হয়ে অজ্ঞানের অন্ধতমিস্রায় ডুবে আছে। বিশ্বব্যাকৃতির এই সত্যকে স্বীকার করেই অধিমানসকে মর্তপ্রকৃতির পরিণাম ঘটাতে হয়। তাই মনের স্বরূপভ্রংশের আংশিক সমাধানই সে করতে পারে। অধিমানসের মধ্যে যেখানে বিভজ্যবৃত্তি মনের আদিবিন্দু তার ক্রিয়ার অঙ্গীভূত হয়ে আছে, অধিমানস মনকে ওই পর্যন্তই তুলে দিতে পারে—তার ওপারে নয়। ব্যক্তিমনের চরম বিকাশে বিশ্বমনের সঙ্গে তাকে সে জুড়তে পারে, জীবাত্মাকে বিশ্বাত্মার সঙ্গে একাত্ম করে তার প্রকৃতিতে বিশ্বভাবনার নির্মুক্ত ঔদার্য আনতে পারে। কিন্তু অনাদি অচিতিব কবলিত এই জগতে বিশ্বোত্তীর্ণ পরা সংবিতের স্বরূপ-শক্তিকে সে ফুটিয়ে তুলতে পারে না—কেননা একমাত্র অতিমানসেই আছে অনুত্তরের স্ব-কৃৎ সত্যকৃতি ও আত্মবিসৃষ্টির সাক্ষাৎ বীর্য। অতএব প্রকৃতি-পরিণামের শক্তি যদি এইখানেই ফুরিয়ে যায়, তাহলে অধিমানস চেতনাকে বিশ্বাত্মভাবনার ভাস্বর বিপুলতায়, অখণ্ড সৎ চিৎ শক্তি ও আনন্দের চিদ্‌-বীর্যময় বিপুল সংবিতের লীলাবিলাসে পৌঁছে দিতে পারে। এরও উজানে পা বাড়াতে হলে তাকে খুলে দিতে হয় পরম-পরার্ধের জ্যোতির দুয়ার, জীব-চেতনায় জ্বালাতে হয় বিশ্ব হতে বিশ্বোত্তীর্ণে উত্তরণের একটা উদগ্র ও সার্থক অভীপ্সা।

পার্থিব-পরিণামের ক্ষেত্রে, অধিমানসের শক্তিপাতেই কখনও অচিতির সম্যক রূপান্তর ঘটাতে পারে না। অধিমানসের স্পর্শে প্রত্যেক সাধকের সমগ্র চেতনা, তার অন্তর ও বাহির, তার ব্যক্তিস্বভাব ও নৈর্ব্যক্তিক বৈশ্বানবভাব সমস্তই অধিমানস ধাতুতে রূপান্তরিত হতে পারে। তার আবেশে সাধকের অবিদ্যাও বিশ্বসত্য ও বিশ্ববিদ্যার দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তাহলেও চেতনায় অবিদ্যাতামসের মূল থেকেই যায়। এ যেন একটা সৌর-জগৎকে ঘিরে পুরাণকল্পিত লোকালোক পর্বতের বেষ্টনীর মত। বেষ্টনীর ভিতরে যতদূর আলোর ছটা, ততদূর কেউ অন্ধকারের অস্তিত্ব কল্পনাও করতে পারবে না। অথচ পর্বতমালার বাইরেই রয়েছে অনাদি তমিস্রার রাজ্য। অধিমানসভূমিতে সবই যখন সম্ভব, তখন অন্ধকারের রাজ্যে রচিত ওই

জ্যোতির্বলয় আবার যে আঁধারে ছেয়ে যাবে না, তা-ই বা কে বলতে পারে? তাছাড়া নানাধরনের সম্ভাব্য নিয়ে অধিমানসের কারবার। সুতরাং তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হবে চিদ্‌বীর্যের একাধিক কি অগণিত ব্যাকৃতির প্রত্যেকটি সম্ভাবনাকে চরম পর্যন্ত ফুটিয়ে তোলা, কিংবা কতগুলি ভব্যার্থকে সংযোগ বা সৌষম্যের সূত্রে একসঙ্গে গেঁথে নেওয়া। কিন্তু তাতে মর্ত্যের এই আদি-বিসৃষ্টির মধ্যেই দেখা দেবে এক কি একাধিক পূর্ণ-স্বতন্ত্র বিসৃষ্টির মেলা। তখন এ-জগতে চিন্ময় জীবের পূর্ণস্ফুট চেতনাও যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে একাধিক চিন্ময় গোষ্ঠীও—মনোময় মানুষ ও প্রাণময় তির্যকপ্রাণীর প্রতিবেশী হয়ে। অথচ মর্ত্যব্যাকৃতির মূলসূত্রের সঙ্গে একটা আলগা সম্পর্ক বজায় রেখে সবাই আপন স্ব-তন্ত্র পুষ্টির পথে চলবে। এক অখণ্ড অদ্বয় সত্তার অন্তরঙ্গ বিভূতিরূপে সমস্ত বৈচিত্র্যকে আত্মসাৎ ও নিয়মন করবার যে অনুত্তর বীর্য, নবোন্মিষিত চেতনার তা একান্তপ্রত্যাশিত ধর্ম হলেও এ-ক্ষেত্রে তার সাক্ষাৎ মিলবে না। তাছাড়া শুধু অধিমানস-পরিণামে অতর্কিত বিপত্তির সমস্ত আশঙ্কা দূর হয় না। অচিতির মধ্যে এক অন্ধ আকর্ষণশক্তি আছে, যা প্রাণ-মনের সকল বিসৃষ্টিকে প্রলয়ের পথে টেনে নামায় —যা-কিছু অঙ্কুরিত ও আরোপিত হয় তার মধ্যে, তাকেই কবলিত করে মিলিয়ে দেয় অনাদি অব্যক্তের মহতী বিনষ্টিতে। অচিতির এই সর্বনাশা আকর্ষণ বাঁচিয়ে বিজ্ঞানঘন দিব্যপরিণামের ধারাকে অব্যাহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে চাই এই মর্ত্যতন্ত্রেই অতিমানসের অবতরণ—যা চিৎসত্ত্বের ঋতজ্যোতির্ময় বীর্যের অনুষেকে জড় আধারের অচিতিকেও জারিত এবং হিরণ্ময় করবে। অতএব অধিমানস হতে অতিমানসে উত্তরণ এবং অতি-মানসেরও অবতরণ হবে প্রকৃতিপরিণামের অপরিহার্য চরম পর্ব।

অধিমানস এবং তার প্রতিভূশক্তিরা মনোধাতুর আশ্রিত দেহ-প্রাণ-মনকে গ্রাস করে তাদের যখন অনুবিদ্ধ করে, তখন আধারের সর্বত্র একটা অতিশায়নের ক্রিয়া শুরু হয়। তার প্রত্যেক পর্বে আধারে উত্তরোত্তর শুদ্ধ বিজ্ঞানচেতনার উপচীয়মান তীক্ষ্ণবীর্য প্রতিষ্ঠিত হয়—যার প্রভাবে মনোধাতুর অসংহত পরিকীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু ও ব্যামিশ্র বৃত্তির সমাবেশ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে। কিন্তু শুদ্ধবিজ্ঞান স্বরূপত অতিমানসের বিভূতি। অতএব অধিমানসের এমনিতর অভ্যুদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে আধারে অর্ধচ্ছন্ন অতিমানস জ্যোতি ও শক্তির উত্তরোত্তর আস্রব পরোক্ষভাবে নেমে আসবে। এই আস্রবের চরমবিন্দুতে শুরু হবে অধিমানসের অতিমানস-রূপান্তর। অতিমানসী চিন্ময়ী মহাশক্তি তখন আধারে স্বমহিমায় আবির্ভূত হয়ে এই মর্ত্য দেহ-প্রাণ-মনের কাছে তাদের চিন্ময় অমৃতস্বরূপের সত্য উদ্ঘাটিত করবেন, সমগ্র আধারে ঢেলে দেবেন অতিমানস সত্তার অখণ্ড বিজ্ঞান ও বীর্যের ভাস্বর সংবেগ। বিদ্যা ও অবিদ্যার চরম ভেদরেখাকে অতিক্রম করে জীবাত্মা তখন পরা বিদ্যার জ্যোতির্ময় ধামে

অতিমানস-বিজ্ঞানের অখণ্ড প্রাতিভ-লোকে উত্তীর্ণ হবে। আর আধারে সেই বিজ্ঞানঘন শুদ্ধজ্যোতির অবতরণে সিদ্ধ হবে অবিদ্যার পূর্ণ রূপান্তর।

এমনিতর বা এইধরনের ব্যাপকতর কোনও পরিকল্পনাকে চিন্ময়-রূপান্তরের সুসংস্থিত বা যুক্তিসম্মত একটা আদর্শচিত্র বলতে পারি। এ যেন অতিমানস গঙ্গোত্রী-অভিযানের একটা বাস্তব ছবি--ধাপে-ধাপে উত্তরায়ণের পথ উপরপানে উঠে গেছে। একটি ধাপ পুরোপুরি আয়ত্তে এলে তবে আরেকটি ধাপে পা বাড়াবার অধিকার মিলবে। মনে হয়, বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গে চেতনার পর্বগুলি স্তরে-স্তরে সাজানো রয়েছে। আর প্রাকৃত সত্ত্ব-নিকায়রূপে উত্তরায়ণের অভিযাত্রী জীব চলেছে তার সানু হতে সানুর 'পরে - প্রত্যেকটি সানুতেই যেন সে একটি অভঙ্গ সত্ত্ববিশেষ বা বিবিক্ত পৌরুষেয়-চেতনার ঘনবিগ্রহ। পর্ব হতে পর্বান্তরে সংক্রমণের সময় অবরপর্বকে আত্মসাৎ না করলে উত্তরপর্বে যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না, একথা মিথ্যা নয়। চিন্ময়-পরিণামের আদিযুগে গুটিকয়েক সাধক হয়তো ঠিক এমনি করে পর্বে-পর্বেই উঠে যাবেন এবং সুদূর ভবিষ্যতে পরিণামের সোপানমালা নিশ্চিতরূপে গড়ে উঠলে হয়তো এমনিতর পর্বসংক্রমণই হবে উত্তরায়ণের স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু তাহলেও ঠিক এইধরনের যুক্তিমাফিক ছক বেঁধে কাজ করা পরিণাম-শক্তির দস্তুর নয়। প্রকৃতিপরিণামকে বরং বলতে পারি বিচিত্র উত্তরণশক্তির একটা সমাহার--তার মধ্যে আছে সমূহ শক্তির অন্যোন্য অনুবেধ ও আপূরণ এবং ব্যতিষঙ্গবশত পরস্পরের বিপরিণাম ঘটানো। অবরচেতনায় নেমে আসতে উত্তরচেতনা যেমন তার আশ্রয়কে বদলে দেয়, তেমনি আশ্রয়ও তার পরিবর্তন এবং ন্যূনতা ঘটায়। আবার উত্তরভূমিতে ওঠবার পর অবরচেতনার যেমন রূপান্তর ঘটে, তেমনি তার আশ্রয় উত্তরচেতনারও শক্তি ও ধাতুতে সে উপরাগের ছায়া ফেলে। এই অন্যোন্যসংক্রমণের ফলে দুয়ের মাঝামাঝি ভূমিতে দেখা দেয় চেতনা ও শক্তির ব্যতিষঙ্গজনিত অগণিত বৈচিত্র্য। তখন বিশেষ-কোনও শক্তির প্রশাসনে সমস্ত শক্তির পূর্ণ সমাহরণও দুঃসাধ্য হয়। এই-জন্যই ব্যক্তিপরিণামের ধারা কখনও বাঁধাধরা ক্রম মেনে চলে না। তার জায়গায় সেখানে বিপুল বৈচিত্র্যের জটিলতা দেখা দেয়--শক্তিস্পন্দের সর্বাবগাহী ছন্দ কোথাও হয় সুব্যক্ত, কোথাও-বা পর্যাকুল। এমনও কল্পনা করা চলে, সাধক যেন পর্ব হতে পর্বান্তরসঞ্চারী উত্তরায়ণের অভিযাত্রী। উত্তরণের প্রত্যেকটি পর্বকে সে সুডোল করে গড়ে তোলে, কিন্তু প্রায়ই তাকে নেমে আসতে হয় নীচের পর্বকে নতুন করে গড়বার জন্য--যাতে কাঁচা বনিয়াদের দোষে সমস্ত কাঠামোটাই না ভেঙে পড়ে। সমগ্র চেতনার পরিণামকে বরং মহাপ্রকৃতির উদ্বেল সমুদ্রের আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এ যেন উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গের ফেনকিরীট পর্বতের উত্তুঙ্গ দেশকে স্পর্শ করছে, অথচ তার মূল তখনও সমুদ্রবক্ষে শুধু ব্যাকুল হয়ে দুলছে। উদয়নের প্রত্যেক পর্বে প্রকৃতির উত্তর-

ভাগ যদিও আপাতত নবচেতনার ছন্দে খানিকটা-নতুন হয়ে গড়ে উঠেছে, তবু তার অবরভাগে হয়তো রয়েছে দ্বৈধগতির দোলা—তার কতক অংশ রূপান্তরের আভাস নিয়েও পুরানো পথেই চলছে, কতক হয়তো নবাগত হয়েও অপ্রতিষ্ঠার দরুন রূপান্তরকে আধারে কায়েমী করতে পারছে না। আরেকটা উপমা : এ যেন দিগ্‌বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর অভিযান। বাহিনীর পুরোভাগ হয়তো নতুন দেশ দখল করেছে, কিন্তু তার বেশীর ভাগ ব্যস্ত রয়েছে পিছনের নববিজিত অতিবিশাল দেশকে কোনরকমে আয়ত্তে রাখতে। তাই সমগ্র বাহিনীকে মাঝে-মাঝে থেমে গিয়ে অধিকৃত ভূমিতে আপন শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, দেশ-বাসীকে আত্মীয় করতে পিছু হটতেও হয়েছে। অবশ্য দেশের উপর দিয়ে ক্ষিপ্রবিজয়ের একটা ঝড়ও সে বইয়ে দিতে পারত। কিন্তু তাতে শেষপর্যন্ত বিদেশের বুকে দুর্গাশ্রয়ী হয়ে থাকা বা ঔপনিবেশিক রাজ্যস্থাপন ছাড়া বেশী-কিছু কাজ হত না। সাধনার বেলাতেও এই কথাটি খাটে। ঝঞ্ঝাবেগে লোকোত্তর কোনও যোগভূমিকা দখল করা যায় বটে, কিন্তু তাকে অতিমানস-রূপান্তরের অনুকূল একটা সর্বগত আবেশ সমানয়ন কি সমাহরণ বলা চলে না।

অন্তরিক্ষলোকের এই ঝামেলাতে অতিমানস-পরিণামের সুস্পষ্ট পরম্পরার পথে নানা বাধার সৃষ্টি হয়। আমাদের যুক্তিবুদ্ধি প্রকৃতির কাছে সাধনার একটা সুনিরূপিত ছকের নিষ্ঠাপূত অনুবর্তনের প্রত্যাশা করে—কিন্তু মাঝ-খানকার এই গোলমালে সে-প্রত্যাশা প্রায়শ সফল হয় না। প্রকৃতি-পরিণামের পর্বগুলিতে যেমন পরম্পরা আছে, তেমনি আছে অন্যোন্যসংক্রমণের জটিলতা। তাইতে প্রত্যেক পর্বে পরিণামের ধারা সহজগতিতে প্রবাহিত না হয়ে আবর্ত-সংকুল হয়ে ওঠে। জড়ের উপযুক্ত আধার তৈরী হবার পর তার মধ্যে দেখা দিল প্রাণ ও মন। কিন্তু প্রাণ-মনের পরিণামের সঙ্গে-সঙ্গেই জড় আধারের বিবর্তন ঝুঁকে পড়ল জটিলতার পূর্ণতার দিকে। আবার প্রাণের ভূমি তৈরী হতে পরিস্ফুট চিৎ-স্পন্দনের আকারে যেমনই মন দেখা দিল, অমনি মনের ছোঁয়া পেয়ে শুরু হল প্রাণের পূর্ণতর পুষ্টি এবং রূপায়ণ। চিন্ময়-পরিণামের বেলাতেও এই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটে। মানস-পরিণামের একটা পর্বসন্ধিতে মানুষের মধ্যে যেমন আধ্যাত্মিকতার আকূতি ফোটে, অমনি চিৎসত্তার জ্যোতিঃ-শক্তি ও তীব্রসংবেগের কুঞ্চিকায় মনেরও পরম সার্থকতার গোপন ভাণ্ডার খুলে যায়। উত্তরপথযাত্রী চিৎশক্তির লোকোত্তর অভিযানেও তা-ই ঘটে। চিন্ময়-পরিণাম কিছুদূর অগ্রসর হতেই বোধি-চিতের আবেশ, ভাস্বর প্রতিবোধ, উত্তরচেতনার জ্যোতিঃস্পন্দ এরা সবাই আধারে নেমে আসে কখনও একা-একা, কখনও-বা ভিড় করে—উত্তরশক্তির আবির্ভাবের জন্য অবরশক্তির পূর্ণ-স্ফুরণের অপেক্ষা না রেখেই। হয়তো বোধি-মানস প্রভাস-মানস ও উত্তর-মানসের দিব্যজ্যোতি ভাল করে চেতনায় ফোটেনি। অথচ কোনরকমে অধি-মানসের জ্যোতির্ময় শক্তিপাতে আধারে তার একটা অপূর্ণ বিগ্রহ গড়ে উঠল

এবং তাকে আশ্রয় করে অধিমানসই আধারের অধ্যক্ষ নেতা বা প্রশাস্তার ভূমিকায় দেখা দিল। তখন বোধি-মানস প্রভৃতি আধারে অধিমানসের সহকারী হয়ে অক্ষুণ্ণশক্তিতেই বিরাজ করবে। কখনও তার উত্তরজ্যোতিতে অনুবিদ্ধ হয়ে তারা উৎশিখ হবে—কখনও-বা অধিমানসভূমিতে আরূঢ় হয়ে ফুটবে অধি-মানস-বোধি অধিমানসপ্রভাস কি অধিমানস-দিব্যমননেব বৃহত্তর দীপ্তি নিয়ে। আধারে শক্তিপাতের তীব্রতায় যে উজান-বওয়ার প্রবেগ জাগে, তাইতে এই জটিলতার সৃষ্টি হয়—কেননা উত্তরশক্তির বীর্যাধানের ফলে অবরশক্তির আত্মরূপায়ণ সিদ্ধ হবার পূর্বেই তার মধ্যে উত্তরসংক্রান্তির উদাত্ত সামর্থ্য জেগে ওঠে। তাছাড়া উত্তরশক্তির আবেশ ভিন্ন অপরা প্রকৃতির ঊর্ধ্বায়ন ও রূপান্তব সম্ভব নয় বলেই, এই অকালবোধনকে অপ্রত্যাশিতও বলতে পারি না। প্রভাস-মানস ও উত্তর-মানস চায় বোধির আলো—তেমনি বোধি চায় অতিমানসের শক্তি। নইলে চারদিককার আঁধার ও অবিদ্যার ঘোব কাটিয়ে পূর্ণ মহিমায় তারা দল মেলতে পারে না। কিন্তু তবু আধারে অধিমানসের প্রতিষ্ঠা এবং সমাহরণ সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ উত্তর-মানস ও প্রভাস-মানস অভঙ্গভাবনার বীর্যে বোধি-মানসের আত্মভূত না হয় এবং বোধি-মানসেরও অভঙ্গ ব্যূহটি অধিমানস-শক্তির সর্বপ্রসারিণী ও সর্বোৎক্ষেপিণী বৈদ্যুতীতে গ্রস্ত না হয়। প্রকৃতিপরিণামের গতি যত জটিলই হ'ক, ক্রমের অনুসরণ তাকে করতেই হবে।

জটিলতার আরেকটা কারণ নিহিত রয়েছে সমাহরণ বা অভঙ্গভাবনার মধ্যে। অভঙ্গভাবনায় চেতনা যেমন উত্তরভূমিতে উঠে যায়, তেমনি নবলব্ধ উত্তরচেতনাও অবরপ্রকৃতিতে নেমে এসে তাকে গ্রাস করে তার রূপান্তর ঘটায়। কিন্তু অবরপ্রকৃতির পূর্বসংস্কারের নিবিড় জড়তা উত্তরশক্তির অবতরণকে পদে-পদে ব্যাহত করতে চায়। এমনকি শক্তিপাতের ফলে আবরণ-বিদারণ ঘটলেও অবিদ্যাপ্রকৃতি উত্তরশক্তির প্লাবনকে ঠেকাবার চেষ্টা করতে কসুর করে না। কখনও সে রূপান্তরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, কখনও নতুন শক্তির ধরন পালটে তাকে আপন দলে টানতে চায়, কখনও-বা বলাৎকার দ্বারা তাকে বশে এনে আপন হীন প্রয়োজনের সাধনায় নিয়োজিত করতে চায়। সাধারণত অবরপ্রকৃতির দুর্বশ উপাদানকে পরিপাক করে তার ঊর্ধ্বপরিণাম ঘটাতে, উত্তরশক্তি প্রথম মনে নেমে মনের কেন্দ্রগুলি দখল করে—কেননা প্রজ্ঞাশক্তিতে এবং বুদ্ধির দীপ্তিতে এরাই তার নিকটতম আত্মীয়। কোনও কোনও সাধকের মধ্যে হৃদয় কি প্রাণসংবেগ ও ইন্দ্রিয়চেতনার আকূতি প্রবল থাকে এবং তাদের আহ্বানে উত্তরশক্তি প্রথম হয়তো তাদের মধ্যেই নেমে আসে। তখন স্বাভাবিক যুক্তিসংগত ধারার বিপর্যয় ঘটে বলে সে-অবতরণের ফল হয় শঙ্কিত ও ব্যামিশ্র, অপূর্ণ এবং অধ্রুব। কিন্তু স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে আধারের পর্বে-পর্বে শক্তিপাত ঘটলেও উত্তরশক্তি প্রত্যেকটি পর্বকে সম্পূর্ণ

জারিত ও রূপান্তরিত করে তারপর যে এগিয়ে যাবে, তা পারে না। উত্তর-শক্তির দখল কাঁচা থাকে বলে প্রত্যেক পর্বের কাজ চলে খানিকটা নতুন ধারায়, খানিকটা প্রাচীনকালের মামুলী ধারায়, আর খানিকটা হয়তো দুটি ধারার মিশ্রণে। পরশমণির ছোঁয়ায় মন যে তখনই আগাগোড়া সোনা হয়ে ওঠে, তা নয়—কেননা মনের চক্রগুলি তো আধারের বাকী অংশ হতে পৃথক হয়ে নাই। মনের বৃত্তিকে বিঁধে আছে প্রাণ আর দেহের বৃত্তি। আবার দেহ-প্রাণের মধ্যেও প্রাণ-মানস ও দৈহ্য-মানসের আকারে মনের অবর রূপায়ণ আছে। মনোময় সত্ত্বের সম্পূর্ণ রূপান্তর চাইলে আগে এদেরও রূপান্তর ঘটানো আবশ্যক। তাই মনের সম্যক-রূপান্তরের প্রতীক্ষায় না থেকে উত্তরশক্তি যথা-সম্ভব নেমে আসে হৃদয়চক্রে—ভাবুক-প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাতে। তারপর সে নেমে যায় প্রাণের অবরচক্রগুলিতে—সমগ্র প্রাণময় ইন্দ্রিয়বোধস্পন্দিত প্রকৃতির মোড় ফেরাতে। সবার শেষে সে দৈহ্যচেতনার চক্রগুলিতে নামে, যাতে সমগ্র দৈহ্যপ্রকৃতির আমূল রূপান্তর ঘটে। কিন্তু এই শেষ নামাও তার শেষ নয়, কেননা এরও পরে আছে অবচেতনার গুহাগহন, আছে অচিতির বনিয়াদ। শক্তির জাল আধারের বিভিন্ন ভাগে এমন গ্রন্থিল হয়ে জড়িয়ে আছে যে, সমস্ত শক্তির শোধন ও গ্রন্থিমোচন না হলে স্বচ্ছন্দেই বলা চলে—'এত করেও কিছুই হয়নি।' সমগ্র আধার জুড়ে পরাবর শক্তির জোয়ার-ভাঁটা চলছে। অবরশক্তি একবার পিছু হটে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে পুরানো দখল ফিরে পেতে—পিছু হটবার বেলাতেও ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্‌টা-কামড় দিতে ছাড়ছে না। এদিকে প্রত্যেক বারের অভিযানে পরাশক্তি নতুন দেশ দখল করছে বটে—কিন্তু তার বীর্যের দীপ্তিতে অনুষিক্ত হতে যতক্ষণ আধারের এতটুকুও বাকী থাকছে, ততক্ষণ নিঃসংশয়ে বলতে পারছে না তার স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠায় সিদ্ধি এল কি না।

তৃতীয় দফা জটিলতা আসে, একই সময়ে চেতনার বিভিন্ন ভূমিতে জীবের অবস্থানের সামর্থ্য হতে। বিশেষ করে মুশকিলের সৃষ্টি হয় আমাদের আধারে অন্দরমহল আর সদরমহলের একটা ভাগাভাগি আছে বলে। ঘোর আরও ঘনিয়ে ওঠে পরিচেতনার অলক্ষ্য পরিবেষ্টনীতে—যেখান থেকে বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের অদৃশ্য যোগাযোগের প্রবর্তনা চলছে। অধ্যাত্ম-উন্মীলনের বেলায়, প্রবুদ্ধ অন্তরপুরুষই শক্তিপাতের বীর্যকে স্বচ্ছন্দ হয়ে গ্রহণ এবং পরিপাক করেন এবং তাঁর মধ্যে পরা প্রকৃতির স্ফুরণও হয় অব্যাহত। কিন্তু বহিশ্চর ভূতাত্মার প্রকৃতি অবিদ্যা ও অচিতির ছাঁচে ঢালা বলে তার প্রবোধন হয় মন্থর, তার গ্রহণ- ও পরিপাক-শক্তিও উদ্দীপিত হয় ধীরে-ধীরে। তাই অন্তশ্চেতনার রূপান্তর অনেকখানি এগিয়ে গেলেও দীর্ঘ-কাল ধরে বহিশ্চেতনায় অপূর্ণ রূপান্তরের কৃচ্ছ্রতাসংকুল অভিযান চলে। উদয়নের প্রতি পর্বেই এই ধরনের একটা অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। রূপান্তরের

প্রত্যেক আহ্বানে অন্তশ্চেতনা যখন উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দেয়, বহিশ্চেতনা তখন খুঁড়িয়ে চলে তার পিছনে-পিছনে—রুচি এবং আকূতি থাকতেও সংকল্প বা যোগ্যতার জোর তার থাকে না। বহিশ্চেতনার এই আড়ষ্টতা ভাঙবার জন্য বারবার তাই উত্তরশক্তির আবেশ ও বহিশ্চেতনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তার মোড় ঘোরাবার কৃচ্ছ্রসাধনা আবশ্যক হয়, এবং পর্বে-পর্বে নতুন-ধরনে ওই একই সাধনার জের টানতে হয়। বহিশ্চেতনা এবং অন্তশ্চেতনায় সন্ধির ফলে চিন্ময় সৌষম্যে অন্তর যদি কখনও উচ্ছল হয়েও ওঠে, তবু আধারের যে বহির্বৃত্ত অথচ গূঢ়সঞ্চারী অংশে বহির্জগতের সঙ্গে পুরুষের সত্তা ও চেতনার আদান-প্রদান চলে, অপূর্ণতার বীজ কিন্তু সেখানে থেকেই যায়। এক্ষেত্রে বিজাতীয় দুটি শক্তির মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়—কেননা অন্তরঙ্গা চিৎশক্তিকে বাধা দেয় বর্তমান জগৎ-ব্যবস্থার অধিষ্ঠাত্রী বহিরঙ্গা অবিদ্যাশক্তি। নবজাত অধ্যাত্মচেতনাকে তাই পদে-পদে তার দৃঢ়মূল অদিব্য-বৃত্তির জুলুমে জর্জরিত হতে হয়। চিন্ময়-পরিণামে প্রকৃতির গোত্রান্তরের আকূতি প্রতি পর্বেই এমনি করে শক্তি-সংঘাতের প্রতিকূলতা দ্বারা অভিহত হয়।

একধরনের আত্মতৃপ্ত অধ্যাত্মসিদ্ধিও সম্ভব, যার ফলে সাধক বহির্জগতের কারবারকে নিরুদ্ধ বা সংক্ষিপ্ত করতে পারেন। হয়তো তিনি জগদ্ব্যাপারের উদাসীন সাক্ষী শুধু—অটল থেকে ভ্রূক্ষেপহীন চিত্তে বাইরের অভিঘাতকে ঠেকিয়ে রাখেন বা ফিরিয়ে দেন। কিন্তু অন্তরের অধ্যাত্মসংবেগকে যদি স্বেচ্ছাতন্ত্রিত জগদ্ব্যাপারে মূর্ত করতে হয়, জগতের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে জগৎকে যদি পুরুষের আত্মসাৎ করতে হয়, তাহলে পরিচেতনার ছটা-মণ্ডলের ভিতর দিয়ে বিশ্বশক্তির বিচ্ছুরণকে গ্রহণ না করে তো তাঁর উপায় নাই। বহিরঙ্গা শক্তির সঙ্গে অন্তরের দিব্যচেতনার তখন নতুনধরনের কার-বার চলে। আধারে বাইরের শক্তি ঢুকতে-না-ঢুকতেই চিৎশক্তি হয় তাদের বিলুপ্ত বা নির্বীর্য করে দেয়, কিংবা স্পর্শমাত্রে নিজের ধাতুতে বা পর্যায়ে তাদের রূপান্তরিত করে। কখনও তাদের চিদ্বীর্যে আপূরিত করে এবং রূপান্তরসাধনের সামর্থ্য দিয়ে আবার অবরভূমিতে প্রতিক্ষিপ্ত করে—কেননা বিশ্বের অপরা প্রকৃতিকে এমনি করে আদেশ মানতে বাধ্য করা চিৎশক্তির অকুণ্ঠ প্রবৃত্তির একটা অঙ্গ। কিন্তু তাহলেই পরিচেতনাকে চিজ্জ্যোতি ও চিতিধাতুর বিদ্যুদ্বীর্যে এমনই অনুষিক্ত রাখতে হয় যে, তার স্পর্শমাত্রে আগন্তুক অপরা প্রকৃতি রূপান্তরিত হয় চিন্ময়ী প্রকৃতিতে—আগন্তুকের সংবিৎ দৃষ্টি কি প্রবৃত্তির অপকর্ষ পরিচেতনার পরিমণ্ডলকে কলঙ্কিত কর-বার সুযোগই পায় না। কিন্তু এ-সিদ্ধি অতিকঠিন। কেননা সাধারণত পরিচেতনা পুরাপুরি আমাদের অধ্যাত্মসিদ্ধির বিভূতি নয়—তার খানিকটা আমাদের আত্মপ্রকৃতি, আর খানিকটা বাইরের জগৎ প্রকৃতি। এইজন্যই

অন্তরের অনুকূল বৃত্তিকে চিন্ময় করা সবসময়ই সহজ, কিন্তু বাইরে প্রবৃত্তিকে রূপান্তরিত করা সহজ নয়। বাইরের সকল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বা স্বভাবের কবচ এ'টে অন্তরাবৃত্তচক্ষু হয়ে আধ্যাত্মিকতার গুহাশয়নে নিজেকে বন্দী রাখা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু সমস্ত আধারকে চিদ্‌বীর্যে বিদ্যুন্ময় করে জীবনসাধনায় তাকে স্ফুরিত করা, সমস্ত জগৎকে আপন করে মহেশ্বরের অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যে জগৎ-প্রকৃতির 'পরেও স্বরাট্ হওয়া—তাকেই বলি মহাসিদ্ধির উত্তরকোটি। সর্বতোগ্রাহী সম্যক্-রূপান্তরে যখন চিৎ-সত্তার স্ফুরত্তার কোনও অংশ বাদ পড়বে না--বাইরের জগৎসুদ্ধ কর্ম-জীবনের সবখানি যখন রূপান্তরসাধনার অন্তর্গত হবে, তখন প্রকৃতি-পরিণামের এই পরমা সিদ্ধিকে সাধ্য-সাধনার বাইরে রাখা কি চলতে পারে?

অচিতিই যে আমাদের প্রাকৃত সত্তার মুখ্য উপাদান—আসল মুশকিল এই-খানে। আমাদের অবিদ্যা বিদ্যার বিভূতি হলেও তা অচিতির গহন হতে উৎসারিত। তাই তার উন্মেষিত চেতনার, তার বিদ্যার প্রতিষ্ঠায় সবসময় আঁধারের একটা অনুবৃত্তি অনুবেধ ও বেষ্টনী থেকে যায়। এই অজ্ঞান-ধাতুকে অতিচিতির ধাতুতে রূপান্তরিত করতে হবে—যার মধ্যে চেতনা ও চিন্ময়-সংবিৎ নিষ্ক্রিয় অব্যক্ত কিংবা জ্ঞানাকারে অস্ফুরিত হলেও কখনও অবিদ্যমান থাকবে না। যতক্ষণ তা না হবে, ততক্ষণ যা-কিছু অজ্ঞানের অধিকারে ঢুকবে, তাকেই সে আক্রমণ করবে ঘিরে রাখবে কি গ্রাস করবে—' পারলে তাকে অন্ধতামিস্রের অতলগহনে তলিয়ে দেবে। উপর হতে যদি আলো নামে, অবিদ্যাতামসের শাসনে তাকেও এখানকার প্রদোষচ্ছায়ার সঙ্গে রফা করে চলতে হয়। ফলে তার স্বরূপ হয় ব্যামিশ্র ক্ষুণ্ণ এবং তরলিত, তার সত্য ও শক্তি স্তিমিত ও বিকারগ্রস্ত, তার প্রামাণ্য অনিশ্চিত। আর-কিছু না হক অজ্ঞানশক্তি উত্তরজ্যোতির সত্যকে সঙ্কুচিত, তার বীর্যকে কুণ্ঠিত, তার প্রয়োজনা ও অধিকারকে খণ্ডিত করে। তখন ব্যক্তির সিদ্ধিতে তার তত্ত্বভাবের পূর্ণরূপটি ফুটতে পায় না, কিংবা তার বিশ্বজনীন প্রয়োগের সাধনা বিঘ্নিত হয়। যেমন প্রেম প্রাণধর্মের একটা সত্য—ব্যক্তির অন্ত-শ্চেতনায় তীব্রভাবে তার আবেগ অনুভূত হয়। কিন্তু প্রেম যদি প্রাকৃত-ধাতুকে আপন সত্যের বীর্যে সম্পূর্ণ জারিত করতে না পারে, তাহলে ব্যক্তির ভাব ও কর্ম প্রেমের অনুশাসনে রূপায়িত হতে পারে না। এমন-কি ব্যক্তির প্রেমসাধনা যদি সিদ্ধির চরমেও ওঠে, তবু অজ্ঞান-সামান্যের অন্ধতা ও প্রতি-কূলতার ফলে তা একনিষ্ঠতায় সঙ্কুচিত ও বীর্যহীন হয়ে থাকতে পারে, অথবা বিশ্বপ্রেমে ব্যাপ্ত হবার সামর্থ্য হারাতে পারে। সত্তার কোনও নতুন ছন্দে পরি-পূর্ণ সৌষম্যের সুরটি আধারে ঝঙ্কৃত করা মনুষ্যপ্রকৃতির পক্ষে দুঃসাধ্য। কারণ অচিতির ধাতুপ্রকৃতিতে অনতিবর্তনীয় অন্ধনিয়তির একটা কর্মাচার আছে—যা তার স্বভাবসিদ্ধ বা আগন্তুক ভব্যার্থের স্ফুরণকে সঙ্কুচিত করে,

তাদের স্বচ্ছন্দ প্রবৃত্তি ও পরিণামকে প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয় না, কিংবা নিজের পরমা সিদ্ধির প্রত্যন্তে তাদের পৌঁছতে দেয় না। তাই অচিতির পরিবেশে ভব্যার্থের লীলা ব্যামিশ্র পরতন্ত্র নিগৃহীত এবং ঊনীকৃত হয়। নইলে তারা অচিতির উচ্ছেদ করে জগদ্ব্যাপারের মূল ধরে ঝাঁকি দিত, যদিও তার রূপান্তর ঘটাতে পারত না। কেননা, কোনও ভব্যার্থেরই প্রাণময় বা মনোময় লীলায়নে সেই চিন্ময় সিদ্ধবীর্য নাই, যা এই অনাদি অন্ধতামিস্রের রূপান্তর ঘটিয়ে একটা সম্পূর্ণ নূতন কল্পের প্রবর্তন করতে পারে।

আধারের সমগ্র ধাতু যদি চিদ্রসে এমনি জারিত হয় যে তার প্রত্যেকটি স্পন্দ সৌষম্যের ছন্দে চিৎসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলনের রূপ ধরে, তবেই মানুষের সমগ্র প্রকৃতির রূপান্তর সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু উত্তরশক্তির তীব্রসংবেগ অচিতির মর্মমূলে অনুপ্রবিষ্ট হলেও ওই অন্ধনিয়তির বাধা তাকে ব্যাহত করতে চাইবেই, অবিদ্যাতামসের মূঢ় বিধান তার বীর্যকে খর্ব এবং ক্ষীণ করবেই। অচিতির বিধানে একটা শাশ্বত অনতিবর্তনীয়তায় মূঢ় দুরাগ্রহ আছে। তাই সে প্রাণের আকূতিকে মৃত্যুর অনতিক্রমণীয়তা দিয়ে স্তব্ধ করতে চায়, আলোর পাশে আঁধারের ভূমিকায় ছায়ার মায়া আনে কায়ার রূপ ফোটাতে, চিৎসত্তার স্বারাজ্য স্বাতন্ত্র্য ও স্ফুরত্তাকে পঙ্গু করে সঙ্কোচের ক্ষুণ্ণ প্রযোজনা দিয়ে ও অশক্তির সীমারেখা টেনে, অনাদি জড়ত্বের আরাম-শয়নকে শক্তিবিচ্ছুরণের পীঠভূমি করে। অচিতির এই প্রতিষেধের মূলে যে নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে, একমাত্র অতিমানসী চেতনাই তার সার্থক সমাধান জানে--কেননা তার মধ্যে পরমার্থ-সতের ভূমিকায় বৈষম্যের সকল দ্বন্দ্ব সৌষম্যের ছন্দে বাঁধা পড়ে। একমাত্র অতিমানসের চিন্ময় বীর্য সম্পূর্ণ প্রথমজ অন্ধতামিস্রের এই দুর্বার প্রতিরোধকে পরাভূত করতে পারে। কারণ অতিমানস শক্তিপাতের সঙ্গে-সঙ্গে সর্বভূতাশয়স্থিতা এক জ্যোতির্ময়ী মহানিয়তির উদগ্র সংবেগ আধারে সঞ্চারিত হয়--যা স্বয়ম্ভূ আনন্ত্যের অনাদি ও নিরতিশয় স্ব-তন্ত্র সত্ত্ববীর্য। এই জ্যোতির্ময়ী চিন্ময়ী নিয়তিই তার সর্বাতিভাবী অবন্ধ্য প্রবর্তনায় অচিতির অন্ধ প্রতীপাচারকে বিপর্যস্ত অনুবিদ্ধ ও আত্মসাৎ করতে পারে।

প্রকৃতির মধ্যে অন্তঃসংবৃত্ত অতিমানস যখন উন্মিষিত হয়ে পরমা প্রকৃতি হতে নিষ্যন্দিত উন্মনীভাবের জ্যোতি ও শক্তিকে আপন উজানধারায় ধারণ করে, তখনই সত্তার সমগ্র ধাতুতে অতিমানস-রূপান্তরের বিভূতি দেখা দেয়। আধারের সমস্ত বৃত্তিতে ধর্মে ও শক্তিতে তখন তার হিরণ্যদ্যুতি সংক্রামিত হয়। অবশ্য জীবব্যক্তি এই রূপান্তরের নিমিত্ত এবং আদিক্ষেত্র। কিন্তু ব্যক্তিসত্তের বিবিক্ত রূপান্তরই বিশ্বভাবনার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, কিংবা সর্বতোভাবে হয়তো সাধ্যও নয়। মনুষ্যত্বের বিবর্তনে জড় ও প্রাণের মধ্যে মননধর্মী চিত্তের অভিব্যক্তি হল একটা সুপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তশক্তির ক্রিয়ারূপে। অতিমানসী

চিতিশক্তিও যদি ঠিক এমনি করে প্রকৃতির মর্ত্যলীলায় নিজেকে স্ফুরিত করতে পারে এবং ব্যক্তিজীব যদি সে-স্ফুরণের সূচনাবাহী আদিবিন্দু হয়, তবেই ব্যক্তির অতিমানস সিদ্ধি বিশ্বলীলার একটা শাশ্বত ও সার্থক বিভূতি বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ চিন্ময়-পরিণামের চরম সিদ্ধি ঘটবে এই মর্ত্য-ভূমিতে বিজ্ঞানঘন পুরুষ ও বিজ্ঞানঘনা প্রকৃতির আবির্ভাবে। সমগ্র মর্ত্য-লোকে চিৎশক্তির অতিমানসী বিভূতির নির্মুক্ত প্রকাশ ও বিচ্ছুরণ এবং সেই প্রকাশের অতিমানস আধাররূপে চিন্ময় তনুর দিব্য রূপায়ণ—প্রকৃতপরিণামের এই হল চরম পর্ব। দেহচেতনারও পূর্ণ উদ্বোধন চাই, নইলে এই অতি-মানস নব-শক্তি ও নব-কল্পের বীর্যকে মর্ত্যভূমিতে ধারণ করবে কে? অধি-মানস বা বোধিমানসের দিব্যভাবনাকে আধারে নামিয়ে আনা যায় বটে—কিন্তু তার পাদপীঠরূপে দেহচেতনাও যদি জ্যোতির্ময় হয়ে না ওঠে, তাহলে দিব্য-ভাবনার দ্যুতি হবে অচিতির অনাদি পরিবেশে বিচ্ছুরিত একটা ভাস্বর মণ্ডলমাত্র এবং প্রকৃতির এই অন্তরাশ্রিত রূপান্তরও অসমগ্র এবং অপ্রতিষ্ঠ হবে। অতিমানস যদি তার বিশ্বতোভাবী শক্তি নিয়ে স্বমহিমায় এই মর্ত্য-ভূমিতে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা পায়, তাহলে তাকেই আশ্রয় করে অধিমানস ও চিন্ময়-মানসের অব্যাহত চিন্ময় স্ফুরণে এইখানেই চিন্ময় একটা অন্তরিক্ষ-লোক গড়ে উঠতে পারে। সে-লোক হবে মানুষের জড়াশ্রিত প্রাণ ও মন হতে চিন্ময় অতিভূমি পর্যন্ত প্রসারিত একটা দিব্যচেতনার পরম্পরা। মানুষ ও তার মনোময় সত্তা সে-সোপানের অবম ধাপ হবে, কিন্তু তারপরেই উপরপানে সুপ্রতিষ্ঠ সোপানরাজি স্তরে-স্তরে উঠে যাবে। মনোময় শরীরীর পক্ষে তারা আর অনধিগম্য থাকবে না। সাধনার পরিপাকে এই মনোবিগ্রহ পুরুষই শুদ্ধবিজ্ঞানের ভূমিতে আরূঢ় হয়ে অতিমানস চিদ্‌ঘনবিগ্রহ পুরুষে রূপান্তরিত হবে। এমনি করে মর্ত্যপ্রকৃতিতে স্ফুরিত হবে দিব্যজীবনের উদাত্ত বীর্য। তখন এই অবিদ্যা ও অচিতির জগৎ তার গুহাহিত স্বরূপরহস্য খুঁজে পাবে—রূপায়ণের অবরপর্বেও থরে-থরে ফুটবে সেই চিন্ময় রহস্যের জ্যোতির্ময় ব্যঞ্জনা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

বিজ্ঞানঘন পুরুষ

অভূদু পারমেতবে পন্থা ঋতস্য সাধুয়া।
অদর্শি বি স্রুতির্দিবঃ ॥

ঋগ্বেদ ১।৪৬।১১

আবির্ভূত হয়েছে তমসার পারে যাবার তরে সুসাধ্য এক ঋতের পথ।

—ঋগ্বেদ (১।৪৬।১১)

ঋতং চিকিত্ব ঋতমিচ্চিকিদ্ধ্যৃতস্য ধারা অনু তৃন্ধি পূর্বীঃ।

ঋগ্বেদ ৫।১২।২

হে ঋত চেতন ঋতের চেতনা বহন কর দীর্ণ কর ঋতের বিচিত্র ধারা।

—ঋগ্বেদ (৫।১২।২)

অগ্নীষোমা চেতি তদ্ বীর্যং বাম্.. অবিন্দতং জ্যোতিরেকং বহুভ্যঃ ॥

ঋগ্বেদ ১।৯৩।৪

হে অগ্নি, হে সোম, চিন্ময় হল বীর্য তোমাদের, পেয়েছ তোমরা একটি জ্যোতি বহুর তরে।

ঋগ্বেদ (১।৯৩।৪)

এষা বোনী ভবতি দ্বিবর্হা.
ঋতস্য পন্থামন্বেতি সাধু প্রজানতীব ন দিশো মিনাতি ।

ঋগ্বেদ ৫।৮০।৪

শুভ্র তনু, তাঁর দ্বিধা তাঁর, বৈপুল্য—ঋতের পথে চলেছেন উষা সিদ্ধগতিতে প্রজ্ঞানীর মত, তার দিক্‌সমূহকে করছেন না সংকুচিত।

ঋগ্বেদ (৫।৮০।৪,৫)

ঋতেন ঋতং ধরুণং ধারয়ন্ত যজ্ঞস্য শাকে পরমে ব্যোমন্।

ঋগ্বেদ ৫।১৫।২

ঋত দিয়ে সর্বধারক ঋতকে ধরে আছে তারা—যজ্ঞের শক্তিকূটে, পরম ব্যোমে।

ঋগ্বেদ (৫।১৫।২)

অজীজনো অমৃত মর্ত্যেষ্বাঁ ঋতস্য ধর্মন্নমৃতস্য চারুণঃ।

ঋগ্বেদ ৯।১১০।৪

ঋতেন য ঋতজাতো বিবাবৃধে রাজা দেব ঋতং বৃহৎ।

ঋগ্বেদ ৯।১০৮।৮

জন্মালে তুমি হে অমৃত, মর্ত্যের মধ্যে—ঋতের অমৃতের ও চারুতার ধর্মে। ঋত হতে জাত তিনি, ঋতের দ্বারা চলেছেন বিবৃদ্ধ হয়ে—রাজা তিনি, দেবতা তিনি, তিনিই ঋত, তিনিই বৃহৎ।

—ঋগ্বেদ (৯।১১০।৪, ১০৮।৮)

এই মনের অধিমানস পরিণাম যেখানে অতিমানস পরিণামের উপান্তে এসে ঠেকেছে, মননের সাহায্যে সে-অলখের রাজ্যে পৌঁছবার মুখেই দেখি, প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য এক বাধা আমাদের পথ আগলে রয়েছে। অবিদ্যার মধ্যে থেকেও মহাপ্রকৃতি যে অতিমানস বা শুদ্ধবিজ্ঞানময় পরিণামের তপস্যা করছে, আমরা

মনের ভাষায় তার একটা ছক, একটা সুস্পষ্ট বিবৃতি চাই। কিন্তু অধিমানস-ভূমি হল লোকোত্তর মনের শেষ সীমা। তার ওপারে গেলেই মন চলে যায় মানস-প্রত্যয় এবং মানস-বিজ্ঞানের বৃত্তি ও ধৃতির এলাকা ছাড়িয়ে। অতি-মানস প্রকৃতি যে চিন্ময় প্রকৃতি ও চিন্ময় অনুভবের একটা পরম অভ্যুদয় ও সমাহরণের ক্ষেত্র হবে—তাতে কোনও সন্দেহ নাই। পরিণামশক্তির স্বাভাবিক প্রেরণাতেই এই ভূমিতে মর্ত্যপ্রকৃতির পূর্ণচিন্ময় রূপান্তর ঘটবে—যদিও এই রূপান্তরসাধনাই অতিমানসের একমাত্র বিভূতি নয়। প্রকৃতি-পরিণামের এই পর্বে আমাদের মর্ত্য অনুভবেরও গোত্রান্তর ঘটবে- তার দৈবী সম্পদের উদ্দ্যোতনায় তার বৈকল্য ও ছদ্মরূপের প্রকাশব্যাকুল উন্মোচনে। তখন অমৃতসত্যের উচ্ছল পূর্ণমহিমায় সে প্রভাস্বর হবে। কিন্তু এসমস্তই অতিমানস অনুভবের রূপরেখা মাত্র -সে দিব্য রূপান্তরের কোনও বিশিষ্ট ধারণা এতে জন্মায় না। চিৎ বা অচিৎ সবারই প্রত্যক্ষ কল্পনা কি রূপায়ণ চলে সাধারণত মনকে ধরে। কিন্তু শুদ্ধবিজ্ঞানের ভূমিতে চিৎপরিণামের ধারা লোকাতীতের প্রান্তরেখা পার হয়ে যায়। তার ওপারে অনুত্তরের রাজ্যে চেতনার যে আমূল চরম-রূপান্তর ঘটে, তাকে তো মানস-প্রত্যয়ের মাপে মাপা যায় না। তাই অতিমানস প্রকৃতিকে বোঝা কি তার বিবৃতি দেওয়া মননধর্মী চিত্তের পক্ষে একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

মানস-প্রকৃতি ও মানস-ব্যাপারের ভিত্তি হল সান্তের চেতনা। আর অতি-মানস-প্রকৃতির ধাতু হল অনন্তের চিদ্‌বীর্য দিয়ে গড়া। অতিমানস-প্রকৃতিতে অদ্বৈতদৃষ্টি হল সহজ দৃষ্টি। অথচ বৈচিত্র্য ও বহুত্বের অন্ত নাই যেখানে। মন যেখানে অনপনেয় দ্বন্দ্ব ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না, অতিমানসের সর্ব-সমন্বয়ী অনুভব সেখানে দেখে এককে। তার সংকল্প ভাবনা বেদনা চেতনা সমস্তই অদ্বৈতবোধের ধাতুতে গড়া এবং তারই উৎস হতে উৎসারিত তার কর্মের প্রবৃত্তি। কিন্তু মনোময়-প্রকৃতির সকল ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা খণ্ড-বৃত্তিতে—তার অখণ্ডের সাধনা জোড়াতাড়া দিয়ে, এমন-কি অদ্বৈতানুভবের বেলাতেও তার প্রবৃত্তির মূলে দ্বৈতবাসনার সঙ্কোচ থেকে যায়। কিন্তু অতিমানসের প্রতিষ্ঠিত দিব্যজীবনের উৎস হল স্বতঃস্ফূর্ত অদ্বৈতচেতনার অন্তরঙ্গ অনুভব। ব্যষ্টি বা সমষ্টি জীবনে অতিমানসের কোন্ বিভূতি রূপায়িত হবে, আমাদের জীবনসাধনায় কি প্রাকৃত ব্যবহারে অতিমানস-রূপান্তরের কোন্ বীর্য স্ফুরিত হবে—তার কোনও পূর্বাভাস খুঁটিয়ে পাওয়া মনের পক্ষে অসম্ভব। মন মেনে চলে বুদ্ধির শাসন বা কৌশল, সংকল্পের যুক্তিসিদ্ধ প্ররোচনা কিংবা নিজের কি প্রাণের কোনও প্রেতি। কিন্তু অতিমানস তো মনের কোনও ভাবনা কি প্রশাসন কিংবা কোনও অবর-শক্তির প্রবর্তনা মেনে চলে না। তার প্রতি পদক্ষেপে আছে চিন্ময় সহজ-দৃষ্টির প্রেরণা, সমষ্টি- ও ব্যষ্টি-ভূতের মর্মসত্যের সর্বগ্রাহী ও মর্মাবগাহী

যথাযথ ধারণা। সর্বানুস্যূত বস্তুতত্ত্বের অন্তরঙ্গ অনুভব দিয়ে তার কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়—মনের কোনও ভাবনা কি বিকল্প দিয়ে নয়, কিংবা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা ব্যবহারের কল্পিত বিধানের 'পরে নির্ভর করে নয়। তাই তার বৃত্তি প্রশান্ত স্বপ্রতিষ্ঠ স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল। আত্মসত্তার যে চিন্ময়-ধাতু সর্বগত, অতএব আত্মভাবের সর্বাবগাহী প্রত্যয়ে সবার সংগে যা অবিনা-ভূত—সেই চিদ্‌বস্তুর মর্মে-মর্মে অনুভূত ঋতম্ভরা তাদাত্ম্যভাবনার সৌষম্য হতে অতিমানসের বৃত্তি অবন্ধ্য সংবেগের সহজছন্দে উৎসারিত হয়। মনের ভাষায় অতিমানস-প্রকৃতির পরিচয় দিতে গেলে, হয় তা হবে বস্তুতন্ত্র-হীন বাঙ্‌ময়মাত্র, নতুবা অতিমানসের তত্ত্বরূপ হতে একান্ত বিজাতীয় কত-গুলি মনোময় কল্পছবি। অতএব অতিমানস-পুরুষের ক্রিয়া-মুদ্রার কোনও কল্পনা কি আভাস দেওয়া মনের সাধ্য নয়। কারণ, এ অগম রাজ্যে মনের ভাবনা ও রূপায়ণী বৃত্তি কোনও-কিছুরই থই পায় না, বা তার নিখুঁত একটা সংজ্ঞা কি বিশেষণ দিতে পারে না- অতিমানস-প্রকৃতির স্বধর্ম ও প্রত্যক দৃষ্টি হতে মানস বৃত্তি এতই দূরে। অথচ মন আর অতিমানসে এই ব্যবধান আছে বলেই অধিমানস হতে অতিমানসে উত্তরায়ণের একটা ন্যায়ানুমিত সাধারণ বর্ণনা দেওয়া কিংবা অতিমানস-পরিণামের আদিপর্বের একটা অস্পষ্ট আলেখ্য আঁকা নিতান্ত অসম্ভব নয়।

এই উত্তরায়ণের আদিপর্বে অতিমানস-বিজ্ঞান অধিমানসের নিকট হতে প্রকৃতি-পরিণামের নিয়ন্ত্রণভার নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং আধারে তার স্বরূপবিভূতির নিরংকুশ প্রচারের ভিত্তি গড়ে তোলে। তাই এ-উত্তরায়ণে দেখা দেয় দীর্ঘ-তপস্যার পর অবিদ্যা-পরিণামের কবল হতে নির্মুক্ত বিদ্যার নিত্যোপচীয়মান জ্যোতিতে চিন্ময়-পরিণামের সুনিশ্চিত জয়যাত্রা। তবু মনে রাখতে হবে, এ কিন্তু 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধ অতিমানস শক্তি ও সত্তার অতর্কিত আবির্ভাব বা অর্থক্রিয়া কিংবা স্বয়ম্প্রজ্ঞ ও স্বতঃপূর্ণ ঋত-চিন্ময় সত্তার বিদ্যুন্ময় বিসর্প নয়। অতিমানসের নিত্যভাব ভুবনের নিত্য-পরিণামী ব্যাকৃতিতে অবতীর্ণ ও আবিষ্ট হয়ে এই মর্ত্যপ্রকৃতিতেই তার বিজ্ঞানবিভূতি উন্মীলিত করবে—এই হবে অতিমানস-পরিণামের ধারা। বস্তুত সমস্ত মর্ত্যভাবনার এই রীতি। এই পৃথিবীর ধূলির আড়ালে গুহা-হিত হয়ে আছেন এক অনন্ত পরমার্থ-সৎ, ধীরে-ধীরে আপনাকে অভি-ব্যক্ত করে তুলছেন তিনি তমশ্ছন্ন সংকীর্ণ অনচ্ছ অর্ধব্যাকৃতির পরম্পরায়। তাদের মধ্যে প্রকাশের আকৃতি আছে, তবু অপূর্ণতা ও ছদ্ম-রূপায়ণের বিকৃতিতে সত্যকে তারা বিকৃত করছে। অথচ এই ব্যাহৃতির ভিতর দিয়েই তিনি অর্ধভাস্বর আত্মরূপায়ণের উজান বেয়ে চলেছেন। অবশেষে একদিন অতিমানস দ্যুতির অবতরণে এই অনালোকের গুণ্ঠন প্রচেতনার উল্লাসে রূপান্তরিত হবে—এই বুঝি পার্থিব-পরিণামের পরম নিয়তি। অনাদি অতি-

মানসের অবতরণ আর উৎসপী অতিমানস শক্তির উত্তরণ—অতিমানস-বিজ্ঞানের এই দুটি স্পন্দ এত অনায়াস যে তাতে কোনমতেই তার স্বরূপ-চ্যুতি ঘটতে পারেনা। অবিপ্লুত আত্মবিদ্যার সহজস্থিতিতে ঋতচিন্ময় জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে, আবার সেইসঙ্গে এই প্রাকৃত প্রাণ-মন ও স্থূলদেহকেও ওই জ্যোতির্লোকে তুলে নেওয়া—অতিমানস-বিজ্ঞানের পক্ষে এ তো অসম্ভব নয়। কেননা অতিমানস অনন্ত সন্মাত্রেরই ঋত-চিৎ, অতএব অকুণ্ঠ আত্মব্যাকৃতির অনন্ত সামর্থ্য তার স্বভাবের একটা ছন্দ। সমস্ত বিজ্ঞানকে নিজের মধ্যে ধারণ করেও, পরিণামের নিয়তি অনুসারে পর্বে-পর্বে তার আংশিক প্রকাশও সে ঘটাতে পারে। তাতে বিশ্বলীলায় ভাগবত সত্যসংকল্পের স্বাতন্ত্র্য ফোটে, বিশ্বের বিভাবনায় তার অন্তর্নিহিত স্বরূপসত্যের প্রকাশ ঘটে। বিজ্ঞান-সংবরণের স্বাতন্ত্র্যও অতিমানসের স্বরূপবিভূতি। তাই নিজের স্বভাব ও স্বধর্মকে নিগূহিত করে সে ফোটায় অধিমানস চেতনা এবং তার প্রশাসনে বিধৃত এই অবিদ্যার ভুবন—যেখানে অবিদ্যার বহিরাবরণে স্বেচ্ছায় নিজেকে গুণ্ঠিত করে স্বরূপসত্তা অজ্ঞানের ব্যাপক শাসন মেনে নেয়। কিন্তু প্রকৃতি-পরিণামের চরম পর্বে, পার্থিব-চেতনায় যখন অতিমানসের স্বরূপে অবতরণ ঘটবে, তখন অবিদ্যাব এই গুণ্ঠন খসে পড়বে, পরিণামের ধারা প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলবে ঋত-চিতের জ্যোতির্ময় প্রশাসনে, প্রচেতনার প্রতি পর্বে থাকবে চিন্ময় বিদ্যাশক্তির অমোঘ প্রেরণা—অবিদ্যা বা অচিতির বিভ্রমকারী আবর্তন নয়।

আজপর্যন্ত পৃথিবীতে মনোময় চেতনা ও শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মনোময় চিৎশক্তিই এখানে মনোময় সত্ত্বের একটা থাক গড়ে পার্থিবপ্রকৃতির মধ্যে যা-কিছু তার অনুকূল তাকে আত্মসাৎ করে চলেছে। এরপর এই মর্ত্য ভূমিতে এবার প্রতিষ্ঠিত হবে এক বিজ্ঞানঘন চেতনা এবং শক্তি। সে গড়ে তুলবে বিজ্ঞানঘনবিগ্রহ চিন্ময়-সত্ত্বের একটা থাক এবং মর্ত্যপ্রকৃতিতে এই দিব্য রূপান্তরের অনুকূলে যা-কিছু আছে তা আপন করে নেবে। সেইসঙ্গে রূপান্তরের পর্বে-পর্বে তার পূর্ণকল জ্যোতি শ্রী ও শক্তিতে ঝলমল স্বধাম হতে সে নামিয়ে আনবে যা-কিছু ওখান থেকে নামতে চায় এখানকার মৃন্ময় আয়তনে। প্রকৃতি-পরিণামের প্রতি পর্বসন্ধিতে, আবহমান কাল একদিকে যেমন দেখা দিয়েছে অচিতিতে সংবৃত্ত গূঢ়শক্তির একটা উৎক্ষেপ, আরেক দিকে তেমনি সেই শক্তির উত্তরাধাম হতে নেমে এসেছে তার সিদ্ধবীর্যের একটা প্রপাত। কিন্তু প্রাক্তন সমস্ত পর্বে ভূতাত্মার বহিশ্চেতনা আর অধিচেতন আত্মার অধিচেতনার মধ্যে একটা ভাগাভাগি দেখা দিয়েছে। পুরুষের বাহিরটা নীচের থেকে অন্তঃশক্তির একটা উৎক্ষেপের প্রবেগে গড়ে উঠেছে—অন্তর্গূঢ় চিদ্‌বিভূতিকে অচিতির ধীরে-ধীরে রূপায়িত করবার প্রয়াস হতে। আর অধিচেতনার নির্মিতিতে এমনতর উৎক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গে বিশেষ করে যোগ

দিয়েছে উপর হতে একই চিদ্‌বিভূতির বৈপুল্যের একটা আস্রব। মনোময় বা প্রাণময় পুরুষের ভাবনা আধারের অধিচেতন ভাগে নেমে এসে তার নিগূঢ় পীঠস্থানে থেকে বাইরে গড়ে তুলেছে প্রাণময় বা মনোময় একটা ব্যক্তিসত্ত্ব। কিন্তু অতিমানস-রূপান্তরের প্রাক্‌কালে আধারের মাঝে অধিচেতনা আর বহিশ্চেতনার এই ব্যবধান ভেঙে পড়বে। শক্তিপাতের নিরঙ্কুশ বীর্য যুগপৎ সমস্ত আধারকে অধিকার করবে, যবনিকার আড়াল থেকে কুণ্ঠিত হয়ে তাকে কাজ করতে হবে না। অতএব রূপান্তরের প্রবেগ আধারে একটা নিগূহিত আচ্ছন্ন দ্বিধাসংকুল প্রেরণারূপে অনুভূত হবে না - তার সহস্রদল মহিমার অকুণ্ঠ প্রকাশে সমগ্র আধার আত্মসচেতন হয়ে তার ছন্দোনুবর্তন করবে। এছাড়া আর-সব দিকে পরিণামের সাধারণ রীতির সঙ্গে এই রূপান্তরের কোনও প্রভেদ থাকবে না। উপর থেকে অতিমানস-শক্তির নির্ঝর নেমে আসবে, এক বিজ্ঞানঘন-পুরুষের অবতরণ হবে প্রকৃতিতে এবং নীচের থেকে অন্তর্গূঢ় অতিমানস-শক্তিও উন্মীলিত হবে উপরপানে। আর এই শক্তিপাত ও উন্মীলনের যুক্তপ্রবেগে প্রকৃতিতে অবিদ্যার শেষ রেশটুকুও মুছে যাবে। চেতনার অচিতির প্রশাসন বলে তখন আর কিছুই থাকবে না। কেননা যে অন্তর্জ্যোতির বিপুল সংবিৎ এতকাল তার মধ্যে পিণ্ডিত হয়ে ছিল, তার বিস্ফোরণে অচিতি রূপান্তরিত হবে তার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে -নিগূঢ় অতিচেতনার জ্যোতিঃসিন্ধুরূপে। তার ফলে মর্ত্যের বুকে রচিত হবে বিজ্ঞানঘন পুরুষ-প্রকৃতির আদিপীঠ।

এই পৃথিবীতে শুধু অতিমানস সত্ত্ব প্রকৃতি ও জীবনের আবির্ভাবই এই দিব্য-পরিণামের একমাত্র সাধ্য হবে না; সেইসঙ্গে উদয়নপথের প্রত্যেকটি পর্বকে সিদ্ধমহিমায় সে ফুটিয়ে তুলবে। তখন এই মর্ত্যজীবনের আয়তনে সে প্রতিষ্ঠিত করবে অধিমানস বোধিমানস প্রভৃতি চিন্ময়ী প্রকৃতি-শক্তির বিভূতির পরম্পরা, এই পার্থিব প্রকৃতির আয়তনে বিজ্ঞানঘন শক্তি আর দ্যুতির উৎসর্পী ধারা ও পরম্পরিত রূপায়ণে রচিত এক বিদ্যুন্ময় সোপানমালা, এক চিদ্‌বীর্যময় দেবজাতির ক্রমিক অভ্যুদয়। অবিদ্যায় কি অজ্ঞানে নয় - কিন্তু ঋতম্ভরা চেতনায় যার মর্মমূল নিহিত, আমরা তাকেই শুদ্ধবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে পারি। অতএব, মনের অবিদ্যাকে ছাড়িয়ে ওঠবার প্রস্তুতি যাদের আছে, কিন্তু এখনও যাদের অতিমানস উত্তরণের আয়োজন সম্পন্ন হয়নি, তারাও দেখতে পাবে তুর্যাতীতের পথে চিন্ময় সোপানের ওতপ্রোত পরম্পরায় তাদের পদক্ষেপের সুনিশ্চিত ভিত্তি রচিত রয়েছে। তাকে ধরে আত্মরূপায়ণের মধ্যপর্বগুলিকে আয়ত্ত করা এবং চিন্ময়-স্থিতির সিদ্ধ সামর্থ্যকে জীবনে মূর্ত করে তোলা তাদের পক্ষে আর অসাধ্য নয়। শুধু তা-ই নয়। প্রকৃতিপরিণামের নিয়ন্ত্রণের ভার যখন প্রমুক্ত অতিমানস জ্যোতিঃশক্তির প্রশাসনে এল, তখন তার অমোঘ প্রভাব পরিণামের প্রত্যেক পর্বেই সঞ্চারিত

হবে। পরিণামের অবরপর্বগুলিতেও তখন শক্তিপাতজনিত একটা বিনিগমক ও সুনিশ্চিত সত্ত্বোদ্রেক অনুভূত হবে। অতিমানসের জ্যোতি ও শক্তির খানিকটা অন্তত প্রকৃতির সর্বত্র অনুষিক্ত হবে এবং তার অন্তর্গূঢ় ঋতম্ভরা শক্তির মধ্যে উদ্ভূতবীর্যের স্পন্দন আনবে। তখন অবিদ্যাকবলিত জীবনেও স্বরাট সৌষম্যের একটা আ-ভাস দেখা দেবে। আজ যেখানে বৈষম্য, মূঢ় এষণা, সংঘর্ষের ঝঞ্ঝনা, পর্যায়ক্রমে উচ্ছ্বাস ও অবসাদের পর্যাকুল আলোড়ন, অথবা অজ্ঞাত শক্তির মিশ্রণ ও সংঘাতজনিত বিক্ষেপ—সেখানে অতিমানসের মুগ্ধসংবিৎ হতে ফুটবে আধারের সুষম অভ্যুদয়ের একটা ঋতময় ছন্দ, প্রাণ ও চেতনার প্রগতিতে আসবে ঋতায়নের একটা স্পষ্টতর ব্যঞ্জনা, আরও উঁচু সুরে বাঁধা হবে মানুষের জীবনতন্ত্র। মানুষের চিত্তে বোধি ও সমবেদনার প্রকাশ হবে আরও নির্বাধ, আত্মার ও সর্বভূতের মর্মসত্যের অনুভব হবে আরও উজ্জ্বল, জীবনের সুযোগ-দুর্যোগকে বুঝে চলবার সামর্থ্য হবে দীপ্ততর। আজ যেখানে উপচীয়মান চেতনার সঙ্গে অচিতির, জ্যোতিঃশক্তির সঙ্গে তমঃশক্তির নিত্যসংঘর্ষের ফলে চিত্ত ব্যামিশ্রভাবের তাড়নায় বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে, সেখানে দেখা দেবে জ্যোতি হতে উত্তরজ্যোতির অভিযানে চিন্ময়-পরিণামের সহজ ছন্দ। তার প্রতি পর্বে আত্মসচেতন জীব অন্তরঙ্গা চিৎশক্তির আহ্বানে সাড়া দেবে এবং তার আত্মপ্রকৃতির স্বধর্মকে উদ্যত এবং প্রসারিত করবে ওই প্রকৃতির উত্তরবিভূতির সম্ভাব্যতার দিকে। প্রকৃতির পরিণামে অতিমানসের দিব্য বীর্য যদি প্রত্যক্ষ সঞ্চারিত হয়, তাহলে তার স্বাভাবিক বিপাকবশত এমনটি ঘটা খুব সম্ভব। অথচ তাতে পরিণামের আবহমান ধারার উচ্ছেদ হবে না, কেননা অতিমানসের মধ্যে তার জ্ঞানা-শক্তিকে নিবৃত্ত কি স্তম্ভিত রাখবার অথবা তাকে অংশত কি পূর্ণত বিচ্ছুরিত করবার একটা সহজ স্বাতন্ত্র্য আছে। অতএব বীর্যসঙ্কোচদ্বারা অবরপরিণামের ধারাকে সে পূর্বের মতই প্রবাহিত রাখবে, কিন্তু তার দুশ্চর ও ক্লিষ্ট তপস্যার মধ্যে নতুন করে আনবে একটা সৌষম্যের ছন্দ, একটা অক্ষুব্ধ প্রশান্তির বীর্য, একটা অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যের তৃপ্তি।

অতিমানসের প্রকৃতিতে এমন একটা-কিছু আছে, যাতে সিদ্ধপরিণামের এই বিপুল সম্ভাবনা কিছুতেই ব্যাহত হবে না। এক অদ্বৈতচেতনার সর্ব-সমাহারী মহাসৌষম্যের বোধ হল অতিমানসের ভিত্তি। প্রকৃতিপরিণামের ধারায় অবগাহন করে যখন সে অনন্তের বিভূতিবৈচিত্র্যের মেলায় নেমে আসবে, তখনও ওই অদ্বৈতভাবনার অনুবৃত্তিতে, বা অভঙ্গসমাহার ও সৌষম্যসাধনার ছন্দে তার ছেদ পড়বে না। এইখানেই অতিমানসের সঙ্গে অধিমানসের প্রভেদ। বিচিত্র ও বহুমুখী ভব্যার্থের প্রত্যেকটিকে অধিমানস স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দেয়। তার দরুন বিরোধ ও বৈষম্য দেখা দিলেও, বিরোধের ভিন্ন-দলকে সে সংহত করে একটি অখণ্ড বিশ্বভাবনার বৃন্তে, তাদের অজ্ঞান

ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমগ্রতার আপূরণেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনাকে নিয়োজিত করে। এমনও বলতে পারি, অধিমানস বিরোধকে শুধু মেনে নেয় না, তাদের উস্‌কিয়েও দেয়। কিন্তু সেইসঙ্গে তাদের অন্যোন্যনির্ভর হতেও সে বাধ্য করে। তাইতে অধিমানসী চেতনায়, অদ্বৈতের কেন্দ্রবিন্দু হতে বিকীর্ণ সত্তা চেতনা ও অনুভবের বহুমুখী রশ্মি যেমন ক্রমেই দূর হতে দূরে অন্যোন্য-বিশ্লিষ্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি আবার অদ্বৈতভাবনায় বিধৃত থেকে আপন-আপন পথে তারা ওই অদ্বৈতের মধ্যবিন্দুতেই ফিরে আসে। আমাদের অবিদ্যাজগতেরও মর্মরহস্য এই। অচিতিকে আশ্রয় করে তার কাজ, কিন্তু অধিমানসের বিশ্বভাবনার সংবেগ তার মর্মে নিহিত। অবিদ্যাকবলিত জীব এই রহস্য জানে না বলেই তাকে তার কর্মযোগের সাধন করতে পারে না। এ-রহস্য কিন্তু অধিমানস-পুরুষের অগোচর থাকবে না। কিন্তু তাহলেও তিনি হৃদিস্থিত চিৎপুরুষ বা দিব্য-পুরুষের প্রেরণায়, তাঁর সারথ্যে বা নিগূঢ় প্রশাসনে আত্মপ্রকৃতির বিশিষ্ট ধর্মকে অনুসরণ করবেন, স্বধর্ম ও স্বভাবের প্রতি নিষ্ঠার বশে পরধর্মকে তিনি আপন পথে ছেড়ে দেবেন। তাই এই অধিমানসী ভাবনা হতে যে-চিজ্‌জগতের সৃষ্টি হবে, সে যেন আপন বিবিক্ত জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হয়ে জ্বলতে থাকবে—অবিদ্যার কুহেলিকার মধ্যে সূর্য-বিম্বের মত। কিন্তু অতিমানস বিজ্ঞানঘন-পুরুষের ধারা হবে স্বতন্ত্র। তাঁর অন্তর্জীবনের সঙ্গে বহির্জীবন বা সংঘজীবনের কোনও ভেদ থাকবে না--এক দ্বৈতহীন সৌষম্যের স্বতঃসংবিৎ ও বীর্যময় ভাবনায় তাঁর সমস্ত ব্যবহার চিন্ময় হবে। শুধু তা-ই নয়। বর্তমান মনোময় জগতের অবশেষটুকু অবিদ্যাতে যদি আচ্ছন্নও থাকে, তবু তার সঙ্গে তিনি দ্বৈতহীন সৌষম্যেরই একটা নাড়ীর যোগ স্থাপন করবেন। তাঁর বিজ্ঞানঘন চেতনার দিব্যদৃষ্টি তার মধ্যে অবিদ্যার রূপায়ণে প্রচ্ছন্ন ঋতজ্যোতির স্ফুরত্তা ও বৃহৎসামের ছন্দকে উন্মেষিত করবে। তাঁর দিব্যজীবনের লোকোত্তর বিসৃষ্টিতে যে সত্য ও সৌষম্যের বীর্য এবং যে বিজ্ঞানঘন-চেতনার মহিমা স্ফুরিত হয়েছে তার সঙ্গে অবিদ্যার জগৎকে ঋতময় যোগে যুক্ত করা তাঁর পক্ষে যেমন অনায়াস হবে, তেমনি হবে তাঁর অভঙ্গ-ভাবনার সম্পূর্ণ অনুকূল। অবশ্য জগতের প্রাকৃত জীবনে একটা তোলাপাড়া না করে এ-মহাসিদ্ধিকে এখানে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে না। কিন্তু তবু প্রকৃতিতে একটা নবশক্তির উন্মেষে এবং তার বিশ্বতোব্যাপী সংক্রমণে এমনিতর বিপ্লবও হবে খুব স্বাভাবিক। মর্ত্য-ভূমিতে বিজ্ঞানঘন-পুরুষের আবির্ভাবে পার্থিব-প্রকৃতিতে এমনি করে দেখা দেবে আরও সুষম পরিণামের একটা অবন্ধ্য সূচনা।

চিদ্‌ঘনবিগ্রহ দেবজাতির প্রত্যেকটি পুরুষ যে একই জাতিরূপের আদর্শে একটিমাত্র নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা হবে, তা নয়। কারণ বৈচিত্র্যের মধ্যে অদ্বৈতের পূর্ণাভিব্যক্তি হল অতিমানসের ধর্ম। অতএব বিজ্ঞানঘন-চেতনার জ্যোতি-

লোকে দেখা দেবে অনন্ত বৈচিত্র্যের মেলা—অথচ অখন্ড-অদ্বৈতের ভাবনা হবে সে-চেতনার অধিষ্ঠান ও উপাদান, তার বিশ্বতোমুখী ব্যঞ্জনা ও সহস্রদল ঋতায়নের প্রযোজক। বলা বাহুল্য, চিন্ময়-পরিণামের এই অভিনব পর্বে অতিমানসের ত্রিপুটী আপন স্বরূপে অভিব্যক্ত হবে। তার নিম্নে তারই প্রশাসনে বিধৃত হয়ে ফুটবে অধিমানস ও বোধির বিজ্ঞানলোক—যারা উৎসর্পিণী চেতনার এই ভূমিতে পেঁাছেছে তাদের নিয়ে। শুদ্ধবিদ্যার উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে আবার অধিমানসের তুঙ্গতম শিখর হতে কেউ-কেউ উত্তীর্ণ হবেন অতিমানস-রূপায়ণেরও ওপারে—এই দেহেই অদ্বৈতঘন আত্মোপলব্ধির অনুত্তরস্থিতিতে, যেখানে দিব্যবিসৃষ্টির জ্যোতির্মুখ বিভাবনার পরম ও চরম লীলায়ন। কিন্তু অতিমানস দেবজাতিতেও ব্যক্তিসত্ত্বের স্ফুরণের বৈচিত্র্য ও তারতম্য অফুরন্ত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি হতে পৃথক হবে—শুদ্ধ-সন্মাত্রের সে অনুপম রূপায়ণ বলে। অথচ তাদাত্ম্যবোধনিবিড় আত্মস্বরূপের ভাবনায় এবং স্বরূপতত্ত্বের সমতায় সবার সঙ্গে সে একাত্মও হবে। মনোজগতের ভাব ও ভাষার দুর্বল রেখায় অস্পষ্ট একটা ছবি এঁকে এই অতিমানসস্থিতির একটা সামান্য-বিবৃতি দেবার চেষ্টাই আমরা করতে পারি। বিজ্ঞানঘনপুরুষের জীবন্ত আলেখ্য আঁকতে পারে একমাত্র অতিমানস চেতনাই—মনশ্চেতনার পক্ষে শুধু তার একটা পান্ডুর রেখাচিত্র রচনা করাই সম্ভব।

শুদ্ধবিজ্ঞানকে বলতে পারি চিৎপুরুষের ক্রিয়াবীর্য—চিৎসত্তার অবন্ধ্য স্ফুরত্তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। অতএব বিজ্ঞানঘন-পুরুষে হবে চিন্ময়-পুরুষের পরম পর্যবসান। তাঁর সকল ক্রিয়া-মুদ্রা ও ভাবনা-সাধনায় থাকবে বিশ্বব্যাপী চিৎশক্তির বিরাট অভিব্যঞ্জনা। তাঁর আত্মসংবিতে সৎ-চিৎ আনন্দের অপরোক্ষ-অনুভব, তাঁর অন্তর্জীবন তারই পূর্ণচ্ছটা। বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক চিদাত্মার তাদাত্ম্যানুভবদ্বারা তাঁর সকল সত্তা জারিত। বিশ্বপ্রকৃতির 'পরে অন্তর্যামী চিন্ময় দিব্য-পুরুষের যে-প্রশাসন, তার প্রেরণায় তারই ছন্দে উৎসারিত তাঁর কর্মপ্রবৃত্তি। জীবনকে তিনি হৃৎশয় পরমপুরুষের আত্মপ্রকৃতির স্ফুরণরূপে দেখেন। তাই জীবনজোড়া সমস্ত ভাবনা বেদনা ও কর্মের মধ্যে তিনি ওই একটি পরম অর্থের সর্বতোমুখী ব্যঞ্জনা খুঁজে পান—ওই-একটি ভাবই তাঁর জীবনসত্যের বনিয়াদ। চেতনার চক্রে-চক্রে, প্রাণশক্তির প্রতিটি স্পন্দে, দেহের প্রত্যেকটি কোষে তিনি অনুভব করেন পুরুষোত্তমের দিব্য আবেশ। আত্মপ্রকৃতির প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিতে তিনি পরমাপ্রকৃতিরূপিণী বিশ্বজননীর লীলাবিভূতি দেখতে পান—এমন-কি তাঁর প্রাকৃত সত্তা মায়েরই মহাশক্তির বিসৃষ্টি ও রূপায়ণ। এক লোকোত্তর প্রমুক্তির চিন্ময় উল্লাস উচ্ছল হয়ে উঠবে তাঁর জীবনে এবং কর্মে—চিদানন্দের পরিপূর্ণ উদ্বেলনে, বিশ্বাত্মভাবনার নিষ্কল নিবিড়তায়, সর্বভূতে পরিব্যাপ্ত

মৈত্রীর স্বত-উৎসারণে। সমস্ত জীব হবে তাঁর আত্মস্বরূপ, চিৎশক্তির সকল লীলাবিভূতি অনুভূত হবে তাঁর আত্মচেতনার বিশ্বব্যাপী উল্লাসরূপে। কিন্তু এই বিশ্বাত্মভাবনায় তাঁর কোনও অবরশক্তির দাস্য বা স্ব-ভাবের পরমসত্য হতে বিচ্যুতি থাকবে না। কেননা, তাঁর অখণ্ড সত্যভাবনায় বিশ্বের সকল সত্য মিলিত হয়ে বহুধাবৃত্ত সৌষম্যের একটি পূর্ণশতদল রচনা করবে। কোনও সংঘর্ষ ব্যামিশ্রভাব উচ্ছৃঙ্খলতা বা বিকৃতি সেখানে সুরসংগতির সমগ্রতাকে খণ্ডিত করবে না। নিজের জীবন আর বিশ্বের জীবন তাঁর কাছে হবে যেন শিল্পনৈপুণ্যের একটি চরম চমৎকার—যেন বহুধাবিকল্পিত উপাদান হতে কোন্ কবিক্রতু বিশ্বকর্মার সহজসৃষ্টির একটা অনবদ্য পরিচয়। বিজ্ঞান-ঘন-পুরুষ ব্যক্তিরূপে জগতে থেকেও এবং জগতের হয়েও তার ঊর্ধ্বে বিশ্বোত্তীর্ণ স্বরূপচেতনায় নিত্য অধিরূঢ় থাকবেন। বিশ্বাত্মক হয়েও তিনি বিশ্বে নির্মুক্ত—ব্যক্তিত্বে পূর্ণব্যক্ত হয়েও বিবিক্ত ব্যক্তিভাবনার বাইরে। সত্যপুরুষের সত্তা তো কোনও বিবিক্ত সত্তা নয়। তাঁর ব্যক্তিভাবনাও যে বিশ্বাত্মক, কেননা সমগ্র বিশ্বই যে তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বে সম্পুটিত। আবার তাঁর ব্যক্তিভাবনা যেন বিশ্বোত্তর আনন্ত্যের চিদাকাশে উৎসর্পিণী দিব্যভাবনার বিজলী-ঝলক, যেন অভ্রোত্তরণ তুষারশৃঙ্গের ধবলমহিমা—কেননা তাঁর ব্যক্তিভাবনায় বিশ্বোত্তীর্ণেরই ভাবসান্দ্র অভিনিবেশ।

জীবনরহস্যের কুঞ্চিকারূপে যে তিনটি শক্তি আমাদের আধারে কাজ করছে তারা হল জীবশক্তি বিশ্বশক্তি আর পরমার্থসত্যের স্বরূপশক্তি—যা জীব আর বিশ্বে অনুস্যূত হয়েও তাদের ছাড়িয়ে গেছে। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের জীবনে এই তিনটি রহস্যশক্তির পরম সামরস্য দেখা দেবে। জীবরূপে তিনি ষোড়শকল সিদ্ধপুরুষ—পরম অভ্যুদয় ও আত্মবিভাবনার সিদ্ধিতে আপ্তকাম চরম চর্যার ফলে তাঁর সকল বৃত্তিই উৎকর্ষের প্রত্যন্ত কোটিতে পৌঁছবে এবং এক সর্বসমঞ্জস ঔদার্যের পরিবেশে সমাহৃত হবে। আমাদের সমস্ত জীবন জুড়েই তো পূর্ণতা ও সৌষম্যের সাধনা চলছে। অথচ সে-সাধনা বারবার ব্যাহত হয়ে আত্মপ্রকৃতির অশক্তি অপূর্ণতা ও বৈষম্যের অনুভবজনিত মর্মবেদনাই আনছে। তার কারণ, নিজেকে আমরা ভাল করে চিনি না—আমরা পুরোপুরি আত্মপ্রতিষ্ঠ ও প্রকৃতি-স্থ নই। তাই আমাদের সকল সত্তা পূর্ণতাহানির বৈকল্যে পীড়িত। কিন্তু অতিমানস শুদ্ধবিজ্ঞান এনে দেয় এক সর্বাবগাহী নিত্যজাগ্রত আত্ম-জ্ঞানের নিটোল পূর্ণতা এবং তার সঙ্গে স্বপ্রতিষ্ঠ ঈশনার বিপুল সামর্থ্য—যা শুধু আমাদের আত্মপ্রকৃতিকে যে অবষ্টব্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করে তা নয়, আমাদের আত্মমায়ার সম্ভূতিশক্তিকেও পূর্ণপ্রকটিত করে। আত্মজ্ঞান তখন অনায়াসেই আত্মার সিদ্ধ সংকল্পে রূপ ধরে এবং সে-সংকল্প সার্থক হয় সিদ্ধকৃতির অকুণ্ঠ বৈভবে। তার ফলে আত্মা স্বীয়া প্রকৃতিতেই নিরঙ্কুশ স্বাচ্ছন্দ্যে আত্মসম্ভূতির পূর্ণবীর্যকে ফুটিয়ে তোলেন। বিজ্ঞানঘন-সত্তার অবরভূমিতে প্রকৃতির

বৈচিত্র্যবশত আত্মার প্রকাশবৈভবে সঙ্কোচ দেখা দিতে পারে। দিব্যভাবের সমগ্র মহিমা হতে বিচ্ছিন্ন করে, একটি দিক একটি ভাব কি ভাবৈশ্বর্যের একটিমাত্র সুষম সমাহারকে বিশেষ করে ফুটিয়ে তোলবার আকৃতিতে পূর্ণতার ভাবনা খণ্ডিত হতে পারে, অন্তহীন বৈচিত্র্যে বিলসিত অদ্বৈতস্বরূপের বিশ্বভাবন বিভূতির একটিমাত্র চয়নিকা আধারে স্ফুরিত হতে পারে। কিন্তু অতিমানস ভূমিতে পূর্ণতাসিদ্ধির জন্য কোনও সঙ্কোচ স্বীকার করা একেবারেই অনাবশ্যক। সেখানে বৈচিত্র্যের বিভাবনা চলে প্রকৃতির সঙ্কোচে নয়—কিন্তু পরমা প্রকৃতির বর্ণৈশ্বর্যের অফুরন্ত উল্লাসে। যুগনদ্ধ পুরুষ-প্রকৃতির অখণ্ড সামরস্য সেখানে উপচিত হয়ে ওঠে আত্মবিভাবনার অনন্তবিচিত্র রসোদ্গারে। কেননা প্রত্যেকটি পুরুষ সেখানে এক পরমপুরুষের অখণ্ড সৌষম্য ও তাদাত্ম্যভাবনার একটা নবীন ভঙ্গিমা মাত্র। অতিমানস বিগ্রহে যে-কোনও মুহূর্তে যা আ-ভাসিত হল কি সত্তার গভীরে তিরোহিত রইল, তার প্রকাশ বা তিরোধান নির্ভর করবে আধারের শক্তি কি অশক্তির 'পরে নয়—কিন্তু আত্মস্বরূপের চিদ্‌বিলা-সের স্বাতন্ত্র্যের 'পরে। স্বৈরাচারের অবন্ধন উল্লাস সেখানে আত্মরূপায়ণের ভিত্তি। তার একদিকে রয়েছে ব্রহ্মের ব্যক্তিভাবনার অবন্ধ্য প্রেতি ও আনন্দের সত্যসংবেগ; আবার তাকেই আশ্রয় করে রয়েছে অখণ্ডের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ব্যক্তিভাবের মধ্যে খণ্ডের সঙ্কল্পিত সত্যকে ফুটিয়ে তোলবার ঋতময় প্রেরণা। কারণ জীবত্বের পূর্ণমহিমা স্ফুরিত হয় বৈশ্বানরপুরুষেরই সিদ্ধভাবনাতে। বিশ্বাত্মভাবনায় বিশ্বকে আত্মসাৎ করে বিশ্বোত্তীর্ণের ভাবনায় তাকে যখন পার হয়ে যাই, তখনই আমাদের মধ্যে ফোটে অখণ্ড জীবত্বের চিন্ময় সহস্রদল।

অতিমানস-পুরুষ বিশ্বচেতনার আবেশে সবাইকে তাঁর আত্মস্বরূপ বলে অনুভব করেন। তাঁর কর্মেও এই অনুভবের ছন্দ রণিত হয়। ব্যক্তি-আত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার পরম সৌষম্য নিত্যস্ফুরিত হয় তাঁর জ্ঞানে, তাঁর ইচ্ছায় ফোটে বিরাটের সত্যসঙ্কল্পের প্রেতি, তাঁর কর্মে বিশ্বকর্মের ঋতময় স্পন্দ। বিশ্বের সঙ্গে ঠিকমত সুর মেলে না বলেই দুঃখে আমাদের বহির্জীবন জর্জরিত হয় এবং জীবনের অন্দরমহলেও তার প্রতিক্রিয়া পৌঁছয়। বিশ্বে সবাই আমা-দের অচেনা, বস্তুর সমগ্র সত্যের সঙ্গে তাল রেখে আমরা চলি না—বিশ্বের 'পরে আমাদের দাবি এবং আমাদের 'পরে বিশ্বের দাবির মধ্যে কোনও ছন্দ বা সঙ্গতি খুঁজে পাই না। তাই দিনে-দিনে আত্মা আর বিশ্বের মধ্যে একটা দুর্বহ বিরোধ ঘনিয়ে উঠেছে। মনে হয়, আত্মভাব আর বিশ্বভাব দুয়ের থেকে মহা-নিষ্ক্রমণ ছাড়া এ-বিরোধের বুঝি কোনও সমাধান নাই। আমরা খুঁজছি আত্ম-প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বকে সে-প্রতিষ্ঠার বনিয়াদ করতে চাইছি। কিন্তু বিশ্ব এত বৃহৎ, আমাদের দেহ-প্রাণ-মনের আকাঙ্ক্ষায় উদাসীন থেকে এমন ঝড়ের বেগে সে আপন লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে যে, তার সঙ্গে সুর মেলাব কেমন করে তা বুঝতে পারি না। জানি না বিশ্বের গতি ও লক্ষ্যের সঙ্গে আমাদের গতি

ও লক্ষ্যের কোনও মিল আছে কি না। তাই মিল খুঁজতে গিয়ে, হয় জোর করে বিশ্বকে কবলিত করবার অক্ষম প্রয়াসে, নয়তো বিশ্বের দ্বারা কবলিত হবার নিষ্ফল আক্রোশে আমাদের দিন কেটে যায়। অথবা হয়তো ব্যক্তির একার নিয়তির সঙ্গে বিশ্বের গোপন আকূতির একটা সামঞ্জস্য ঘটাতে গিয়ে দিনেদিনে অসামঞ্জস্যের যত জঞ্জাল স্তূপাকার করে তুলি। কিন্তু বিশ্বচেতন অতিমানস-পুরুষে আত্মভাব আর বিশ্বভাবে কোনও বিরোধ নাই—কেননা তাঁর মধ্যে তো অহন্তার সঙ্কোচ নাই। তাঁর অহং বিশ্বব্যাপ্ত, অতএব বিশ্বশক্তির স্পন্দ ও ব্যঞ্জনাকে তিনি তাঁর আত্মশক্তির লীলায়নরূপে অনুভব করেন। তাই জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির সত্য সম্পর্কটি তাঁর ঋতচিন্ময়ী দৃষ্টির দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং সে-সম্পর্ককে সত্যভাবনার অমোঘসিদ্ধিতে স্ফুরিত করবার সামর্থ্যও তাঁর অকুণ্ঠিত থাকে।

বস্তুত জীব ও বিশ্ব বিশ্বোত্তীর্ণ পরমার্থসতের অন্যোন্যাশ্রিত যুগ্ম বিভূতি। যদিও অবিদ্যাশাসিত জগতে এ-দুইয়ের মধ্যে বিরোধ ও অসঙ্গতি লেগেই আছে, তবুও একটা সর্বসমন্বয়ী সত্যের বন্ধনও যে তাদের মধ্যে আছে একথাও অনস্বীকার্য। আমাদের অন্ধ অহমিকা সর্বত্র আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত না করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বলেই দুইয়ের সত্যযোগের সূত্রটি আমরা খুঁজে পাই না। কিন্তু এই সূত্রটি আছে অতিমানস চেতনায়—তার দৈবী সম্পদের স্বাভাবিক সঞ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। কারণ অতিমানসই বিশ্বের সকল সম্বন্ধের নিয়ন্তা, এবং বিশ্বোত্তীর্ণের স্বরূপশক্তি বলে তার সে-নিয়মনও স্ব-তন্ত্র ও নিরঙ্কুশ। মনোময়-চেতনায় বিশ্বচেতনার আবেশে অহংভাব অভিভূত হয়ে তুরীয়ের সংবিতেও যদি স্ফুরিত হয়, তবু বিশ্ব ও জীবের অন্যোন্য-দ্বন্দ্বের একটা সার্থক সমাধান না-ও দেখা দিতে পারে। কেননা চিদ্‌বাসিত চিত্তের বিমুক্তিতেও ব্যাবহারিক জীবনে বিশ্বগত-অবিদ্যার ঘোর কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না—একমাত্র মনোবীর্য দিয়ে অবিদ্যাকে অভিভূত করা সম্ভব নয় বলেই। কিন্তু অতিমানস চেতনা শুধু নিষ্ক্রিয় জ্ঞানশক্তি নয়। তার মধ্যে আছে কবিক্রতুর দিব্য ঐশ্বর্য—আছে বিশ্বোত্তীর্ণের 'ঋতংজ্যোতিঃ'। অতএব অবিদ্যার পূর্ণরূপান্তর-সাধনের বীর্যও তার আছে। অতিমানস-পুরুষে আছে বিশ্বাত্মভাবের অদ্বয়-অনুভব—কিন্তু তাবলে তাঁর মধ্যে অবর রূপায়ণে অতিযক্ত বিশ্ব-প্রকৃতির অবিদ্যাশক্তির বন্ধন নাই। বরং অবিদ্যার 'পরে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার অমোঘ প্রবর্তনাকে সঞ্চারিত করবার সামর্থ্যই তাঁর আছে। অতএব বিজ্ঞানঘন-বিগ্রহ অতিমানস অতিমানবে ফুটবে বিশ্বরূপে আত্মরূপায়ণের উদার মহিমা-ফুটবে বিশ্বাত্মভাবের সর্বাবগাহী অনুত্তর ছন্দঃসুষমা।

অতিমানস-পুরুষের অমৃতসত্তায় হিল্লোলিত হবে অখণ্ড-চিন্ময় সত্তার বহুভঙ্গিম বিচিত্রবীর্যের ঋতময় বিচ্ছুরণ—অদ্বৈতের বহুভাবনার আনন্দ আন্দোলন। বিজ্ঞানীর জীবন হবে চিৎসত্তার সত্যসম্ভূতির আনন্দচ্ছটা। তাঁর

গতি-প্রকৃতিতে চিন্ময় সত্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে চিন্ময় আনন্দ—সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপের ঘনবিগ্রহ হবে তাঁর আত্মপ্রতিমা, তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতীক। অবিদ্যাকবলিত জীবও ব্রহ্মস্বরূপ, কিন্তু তার আত্মপ্রতিষ্ঠার ধারা স্বতন্ত্র। সে অহংসর্বস্ব, বিবিক্তবৃত্ত, অপরের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি অমনোযোগী উদাসীন বা বিদ্বিষ্ট। কিন্তু অতিমানস-পুরুষ তাদাত্ম্যবোধে সবার সঙ্গে যোগযুক্ত, তাই আত্ম-পরের ভেদ তাঁর মধ্যে নাই। চিৎস্বরূপের আনন্দব্যঞ্জনা স্বকীয় আধারে তাঁর যতখানি কাম্য, পরকীয় আধারেও তা-ই, বিশ্বের আনন্দ তাঁর অন্তরে উথলে উঠে অমোঘবীর্যে সঞ্চারিত হয় সবার নাড়ীতে-নাড়ীতে, সবার উদ্বেল আনন্দে সার্থক হয় তাঁর স্বরূপানন্দের উপচয়। মুক্তপুরুষ পরের সুখ-দুঃখকে আপন করে নেন, তিনি 'সর্বভূতহিতে রতঃ'—এমন কথা আমরা শুনেছি। অতিমানস-পুরুষকে বিশ্বজনীন হতে গিয়ে আত্মবিলোপের সাধনা করতে হবে না, কেননা বিশ্বজনীনতার সাধনা যে তাঁর আত্মসম্পূর্তির স্বভাবযোগ, ঘটে-ঘটে সেই এককেই উপচে তোলবার অতন্দ্র ব্রত। তার মধ্যে তো আত্মহিত ও পরহিতে কোনও বিরোধ কি সংঘর্ষের সম্ভাবনা নাই। বিশ্বের সঙ্গে সমবেদনায় এক হতে গিয়ে অবিদ্যাকবলিত জীবের সুখদুঃখকে আপন করে নেবার বিশিষ্ট সাধনা তাঁকে করতে হবে না, কেননা বিশ্ববেদনার অনুভূতি যে তাঁর অন্তরঙ্গ স্বরূপানুভূতির অঙ্গীভূত, অতএব ব্যষ্টিচেতনায় বিবিক্তভাবে সুখ-দুঃখের অবরকোটিকে ভোগ করবার প্রয়োজন বা সার্থকতা এক্ষেত্রে কোথায় ? যে-বেদনাবোধ তাঁর স্বরূপানুভবের কুক্ষিগত, তাকে অতিক্রম করেও নীলকণ্ঠের মহিমায় তিনি বিরাজিত—আর এই মহিমার বীর্যেই তিনি জগতের শরণ এবং সুহৃৎ। তাঁর বিশ্বব্যাপী সাধনা ও ভাবনা তাঁর স্বরূপেরই স্বতঃস্ফূর্ত ব্যঞ্জনা—চিন্ময় স্বয়ম্ভাবের আনন্দ-উদ্বেলন। তার মধ্যে সংকীর্ণ অহং বা বাসনার স্থান নাই, ক্ষুদ্র অহং কি কামনার তর্পণের সুখ বা ব্যর্থতার বেদনা নাই। এই প্রাকৃত আধারের সংকীর্ণ পরিসরে আপেক্ষিক ও পরতন্ত্র হর্ষশোকের যে অতর্কিত আলোড়ন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তাঁর চেতনাকে তা স্পর্শও করে না—কেননা এ-বিক্ষোভ অবিদ্যাক্লিষ্ট অহন্তার ধর্ম, চিৎস্বরূপের ঋতভৃৎ স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নাই।

বিজ্ঞানঘন-পুরুষ বস্তুতই সত্যসংকল্প। সত্যজ্ঞানদ্বারা উদ্ভাসিত এবং অমোঘসিদ্ধির সামর্থ্যে অনুপ্রাণিত তাঁর সংকল্প—অতএব যা দুর্ঘট বা অসম্ভাবিত, তার স্থান তাঁর সংকল্পে নাই, কেননা তাঁর কর্ম তো অবিদ্যার কর্ম নয়। আবার তাঁর কর্মযোগে ফলের আকাঙ্ক্ষা বা পরিণামের ভাবনাও নাই। তাঁর মধ্যে আত্মসত্তার স্ফুরত্তা ধরে সহজ কর্মের রূপ, তাই তাঁর আনন্দ চিৎ-সত্তার স্বভাবস্থিতিতে, চিৎসত্তার সর্বশুক্র কর্মস্পন্দে, চিৎসত্তার নিরঞ্জন রসোদ্গারে। বিশ্বোত্তীর্ণ স্থাণুচেতনায় যেমন তিনি নিত্য আপ্তকাম এবং সর্বাধার তেমনি বিশ্বে লীলায়িত জঙ্গমচেতনায় তিনি স্বাতন্ত্র্যে উচ্ছল—

কর্মের নর্মবিলাসের প্রতি পর্বে ফুটে ওঠে তাঁর আত্মসম্পূর্তির আনন্দ। তাঁর বিশ্বতশ্চক্ষুর দৃষ্টিতে কর্মের আদি-অন্ত সকলই ভাসছে বলে, তার প্রত্যেকটি পর্বের অর্থকে তিনি জ্যোতির্ময় সমগ্রভাবনার সঙ্গে যুক্ত দেখতে পান। অতএব কর্মক্ষেত্রে তাঁর প্রতি পদক্ষেপ হয় অন্তদৃষ্টির আনন্দদ্যোতনায় সমুজ্জ্বল। এমনি করে সমগ্রদর্শনের রসে নিত্যসঞ্জীবিত হয়ে কর্ম করাই অতিমানস-চেতনার বিশেষত্ব—তার মধ্যে অবিদ্যার অন্ধতাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে অজানার পথে পা-বাড়ানোর ক্লিষ্টতা নাই। সমগ্রবোধের ভাস্বর চেতনায় বিজ্ঞানী পুরুষ যেমন সত্তার স্বরূপস্থিতিতে তেমনি তার পরিস্পন্দেও পূর্ণ এবং আপ্তকাম। অতএব তাঁর গতিতে ক্রমাভিসারী খণ্ডিতচেতনার কুণ্ঠিত প্রচার নাই—আছে প্রতি পদ-ক্ষেপে সমগ্রভাবনার সহস্রদল পূর্ণতার দিগন্তলীন ব্যঞ্জনা। বিজ্ঞানীর সত্তায় এবং আনন্দে বিশ্বম্ভর বিরাটের সত্তা ও আনন্দের উচ্ছলন আছে, অতএব জীবনের প্রতিটি বিবিক্ত স্পন্দে তাঁর মধ্যে বিশ্বচেতনার সমগ্র-বিপুলতার দ্যুতি স্ফুরিত হয়। তাঁর কোনও বৃত্তিতেই খণ্ডিত স্বানুভবের কুণ্ঠা অথবা পরাহত স্বরূপানন্দের ছিন্ন সুর নাই—কিন্তু আছে অখণ্ড সদ্‌ভাবের সমগ্র পরিস্পন্দের সংবেদন, অখণ্ড আনন্দ-স্বরূপের আপূর্যমাণ উচ্ছলতা। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের যে-বিজ্ঞান অনায়াস কর্মে রূপায়িত হয়, তা অবিদ্যাবাসিত মনের কল্পনা নয় কিন্তু অতিমানসের সে সত্যভাবনা বা সদ্‌ভূত-বিজ্ঞান, পরা-সংবিতের স্বরূপ জ্যোতির বিচ্ছুরণ। অতএব তাঁর বিজ্ঞানে ব্রহ্মের স্বয়ম্ভূভাব ও পরিভূভাবনার ষোড়শকল স্বয়ংজ্যোতি অজস্রধারায় উছলে পড়ে, তাঁর প্রতিটি কর্ম এবং প্রবৃত্তিকে আপূরিত করে সেই দিব্যজ্যোতির স্বয়ম্ভাবের অখণ্ড-নির্মল আনন্দসংবিৎ। কারণ, যে আনন্ত্যের চেতনায় তাদাত্ম্য-বিজ্ঞানের স্বরসবাহী প্রত্যয় অবিনাভূত হয়ে আছে, তার প্রত্যেকটি বিশিষ্ট বৃত্তিতে স্ফুরিত হয় 'একমেবা দ্বিতীয়ম্'-এর আনন্দময় অনুভব—প্রতিটি সান্তের সংবেদনে জাগে অনন্তের স্বরূপাবির্ভূতির উল্লাস।

বিজ্ঞানঘন-চেতনার আবির্ভাবে আমাদের জাগতিক চেতনায় ও জাগতিক ব্যবহারে অভিনব একটা রূপান্তর দেখা দেয়। সে যে আমাদের অন্তর্জগৎকেই দিব্যসংবিতের বীর্যে অনুষিক্ত করে তা নয়—তার বৈদ্যুতী আমাদের বহি-শ্চেতনা ও জগৎবোধকেও আপ্লুত করে। অবিপ্লুত চিৎসত্তার বীর্যময় অনুভবে জারিত ও সমাহৃত হয়ে অন্তর-বাহির দুইই তখন এক নতুন ছাঁচে গড়ে ওঠে। এই রূপান্তরে আমাদের চিরাভ্যস্ত জীবনধারার আমূল বিপর্যয় ঘটে—তার অন্তর্গূঢ় অভীপ্সার ফল্গুপ্রবাহে চিরপ্রত্যাশিত সিদ্ধির বিপুল প্লাবন নামে। বস্তুত আমরা একটা দোটানার মধ্যে আছি। আমাদের একদিকে জড় ও প্রাণের বহির্জগৎ—আজপর্যন্ত সে-ই আমাদের গড়ে এসেছে। আবার আরেক দিকে রয়েছে উন্মিষন্ত চিৎশক্তির আকর্ষণ—তারই ইশারায় জগৎকে আমাদের নতুন করে গড়তে হবে। তাই আমাদের জীবন জুড়ে রয়েছে প্রাণশক্তি ও জড়ের

কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উদ্যত বিদ্রোহের একটা দ্বন্দ্ব। আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাতন্ত্র্য আমাদের প্রথম থেকেই ফোটে না। প্রথমত বহিঃ-প্রকৃতির অভিঘাতে সাড়া দিতে গিয়ে আমরা অন্তরে একটা মনের জগৎ গড়ে তুলি—যদিও এই জগৎ-গড়ায় আমাদের স্বাতন্ত্র্য থাকে খুবই কম। অধিকাংশ মানুষের জীবন পরিবেশ ও বহিঃপ্রকৃতির দেওয়া আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় যতটা রূপ নেয়, স্ব-তন্ত্র বুদ্ধি বা জীবচেতনার জাগ্রত অভীপ্সার সংবেগে ততটা নয়। কিন্তু এর মধ্যেই আমাদের অধ্যাত্মপ্রগতির লক্ষ্য থাকে—অন্তর্যামীর দিব্যজ্ঞান ও দিব্যসামর্থ্যকেই ব্যাবহারিক জীবনের বাহ্যপরিবেশে নিজের স্বভাবছন্দে মূর্ত করা। অন্তর্যামীর এই সাধনার পূর্ণসিদ্ধি ঘটে বিজ্ঞানঘন প্রকৃতির আবির্ভাবে। তখন অন্তরের সিদ্ধসত্তাই জ্যোতি ও শক্তির পূর্ণবিগ্রহে বহির্জীবনে রূপায়িত হয়। এই হল বিজ্ঞানঘন পুরুষের জীবনায়ন। জড় ও প্রাণের জগৎকে তিনি অঙ্গীকার করেন বটে, কিন্তু সত্যপ্রতিষ্ঠার বীর্যে তাঁর আত্মবিভাবনার অনুকূলে তাদের অভিনব রূপান্তর ঘটান। জীবন তাঁর কাছে চিন্ময় স্ব-ভাবের মূর্তবিগ্রহ, কেননা চিন্ময় সৃষ্টির সিদ্ধি তাঁর করায়ত্ত সাযুজ্যের আবেশহেতু অন্তর্যামীর সিসৃক্ষার সঙ্গে তাঁর নিত্যযোগ রয়েছে। এমনি করে বাইরে-ভিতরে নিজের জীবনকে চিন্ময় করে তোলবার সিদ্ধিতে তাঁর মধ্যে ফোটে দিব্যসৃষ্টির প্রথম ছন্দ। এই শক্তিই আবার বিসর্পিত হয় বিজ্ঞানঘন সংঘজীবনের চেতনাতে। দিব্যসংঘে চেতনার সঙ্গে চেতনার নিবিড় যোগে এক অখণ্ড বিজ্ঞানঘন চিৎসত্তা ও পরমা প্রকৃতির উল্লাস স্ফুরিত হয়। সমগ্র সংঘের বিগ্রহে তারই আত্মস্বরূপ এবং আত্মবীর্যের সার্থক রূপায়ণ।

অধ্যাত্মজীবনের প্রত্যেক পর্বে গুহাশায়ী হবার প্রয়োজনটা সবার বড়। চিন্ময় মানুষকে সবসময় নিজের মধ্যে ডুবতে হয়। অবিদ্যার জগৎ সহজ রূপান্তরের বিরোধী বলে তার তামস-শক্তির অতর্কিত আক্রমণ ও ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তাঁকে যেন কতকটা পৃথক থাকতে হয়। তাই সংসারে থেকেও যেন তিনি তার বাইরে। সংসারে শক্তিসঞ্চার করতে হলেও তিনি তা করেন অন্তরের চিন্ময় ভাবনার দুর্গে থেকে—যেখানে চেতনার মণিকোঠায় জীব ও শিবের যুগনদ্ধ সামরস্যের গম্ভীরাতে পরম-সন্মাত্রের সঙ্গে তাঁর সত্তা অবিনাভূত। কিন্তু বিজ্ঞানঘন জীবন এমন অন্তরাবৃত্ত হলেও তার মধ্যে অন্তরে-বাইরে বা আত্মা-অনাত্মায় বিরোধের কোনও ছায়া থাকবে না। অন্তরের নিবিড়তম গহনে তাঁর সঙ্গে একা-একা এক হয়ে থাকা, শাশ্বত-সদ্‌ভাবে সমাপন্ন হয়ে আনন্ত্যের অতলগভীরে নিঃশেষে তলিয়ে যাওয়া, তার লোকোত্তর রহস্যের তুঙ্গশিখরে জ্যোতির্ময় অতলান্তে স্বচ্ছন্দে অবগাহন করা—এ-সমস্তই হবে বিজ্ঞানঘন পুরুষের সহজ সিদ্ধি। বাইরের কোনও বিক্ষোভ কি অভিঘাত তাঁর সে-গম্ভীরায় পৌঁছবে না, তাঁকে স্বমহিমার তুঙ্গতা হতে নামিয়ে আনবে না-তাঁর কর্ম পরিবেশ বা জগৎ কিছুই তাঁকে বিচলিত করবে না। তাঁর জীবনে

এই হল বিবেকসিদ্ধির লোকোত্তর মহিমা—এ না হলে তাঁর মুক্তস্বরূপের সম্যক স্ফূর্তি হয় না। জগৎ-প্রকৃতির সঙ্গে অবিবেকবশত যে তাদাত্ম্যের অনুভব, তা আনে বন্ধনের সংকীর্ণতা, প্রমুক্ত তাদাত্ম্যভাবনার উল্লাস নয়।...কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে বিজ্ঞানঘন-পুরুষের এই অন্তঃশীল সাযুজ্যভাবনাই আবার ফুটবে পরমপুরুষের প্রীতি ও রতির রূপে এবং আধারে উপচীয়মান সে প্রেম ও আনন্দ ছড়িয়ে পড়িয়ে জড়িয়ে ধরবে বিশ্বজগৎকে। হৃৎশয় পুরুষোত্তমের সুগভীর প্রশান্তি বিজ্ঞানীর বিশ্বানুভবে সর্বগত সমদর্শনের অবিচল প্রত্যয়ে প্রকটিত হবে। অথচ তার মধ্যে নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের স্তব্ধতা থাকবে না, থাকবে আত্মসমাহিত বীর্যের স্ফুরত্তা। তাদাত্ম্যভাবনা হতে জাত তাঁর স্বচ্ছন্দ প্রশান্ত-বাহিতা তাই যা-কিছুর সংস্পর্শে আসবে তাকেই অভিভূত করবে, যে-কেউ তাতে অবগাহন করবে সে-ই হবে শান্ত ও অচঞ্চল—তাঁর অধ্যুষিত জগতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হবে ওই অক্ষোভ্য প্রশান্তির অনতিবর্তনীয় প্রশাসন। অন্ত গূঢ় তাদাত্ম্য ও সাযুজ্যের ভাবনা হতে তাঁর কর্মের প্রেরণা এবং ব্যাবহারিক জীবনের ছন্দ উৎসারিত হবে। তাই তাঁর কাছে অনাত্মীয় বলে কেউ থাকবে না· সবাই হবে তাঁর আত্মস্বরূপ, তাঁর অদ্বৈতসত্তার তরঙ্গভঙ্গ, তাঁর বিশ্বাত্মভাবনার চিন্ময় বিলাস। এই চিন্ময় প্রতিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্যের আনন্দে নিত্য উল্লসিত থাকেন বলে নিখিল বিশ্বকে বুকে তুলে নিয়েও তিনি আত্মারাম, শিবস্বরূপ· অবিদ্যার জগতে নেমে এলেও তিনি 'শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্'।

বিজ্ঞানঘন-পুরুষের মধ্যে বিশ্বাত্মানুভব ফুটবে আত্মসমাহিত বিন্দু চেতনায়—এই তাঁর প্রাকৃত রূপ। এই রূপে তিনি বিশ্বের একজন। কিন্তু যুগপৎ সেই অনুভবই আবার অদ্বৈতবাসিত আত্মবিচ্ছুরণের যোগৈশ্বর্যে নিজের মধ্যেই অনায়াসে বহন করবে নিখিল বিশ্বের ভূতগ্রামকে। এই আত্ম প্রসার শুধু একাত্মতার নির্বিশেষ অনুভব অথবা ধ্যানচেতনার দ্বারা বিশ্ব-বৈচিত্র্যের অদ্বৈতবাসিত আস্বাদনমাত্র নয়। তাঁর হৃদয়ের বেদনায়, ইন্দ্রিয়ের সংবেদনে, এমন-কি দৈহ্যচেতনার নিবিড়তা দিয়ে বিজ্ঞানঘন-পুরুষ সবার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার প্রমুক্ত সংবিৎ অনুভব করেন। বিশ্বাত্মভাবনায় জারিত তাঁর চেতনা বেদনা ও সংবিৎ যা-কিছু পরাক-বৃত্ত তাকেই প্রত্যক্ অনুভবের অঙ্গীভূত করবে এবং তা-ই দিয়ে ঘটে-ঘটে তিনি পারেন সেই পুরুষোত্তমেরই আ-ভাস অনুভব দর্শন শ্রবণ ও স্পর্শন। তাঁর আত্মসত্তার বিরাট সায়রে নিখিলের চিত্তস্পন্দ অগণিত বীচিভঙ্গে হিল্লোলিত হবে—তাঁর চেতনা বেদনা ও সংবিতে নিত্য অপরোক্ষ হবে বিশ্বহৃদয়ের সকল স্পন্দন। শুধু বাইরের জীবন দিয়ে নয়, অন্তর্জীবনের নিবিড় যোগেও তিনি বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। বাহ্যসন্নিকর্ষ দিয়েই যে জগতের এই বহিরঙ্গ রূপকে তিনি স্পর্শ করবেন, তা নয়—অন্তর্যোগে সর্বভূতের অন্তরাত্মার সঙ্গেও তিনি হবেন নিত্যযুক্ত। সর্বভূতের অন্তরে-বাইরে প্রাণচেতনার যে-স্পন্দন, তার প্রত্যেকটি

তাঁরও চেতনায় রণিত হবে। অন্তর্যামিরূপে তিনি জীবহৃদয়ের সকল রহস্যের বেত্তা—যে-রহস্য তাদের প্রাকৃত-বুদ্ধির অগোচর। নিখিলের ভাবগ্রাহী বলে সবার তিনি শাস্তা শরণ এবং সুহৃৎ—তাদাত্ম্যভাবনায় সবার সঙ্গে এক, অথচ সবার সংস্পর্শে এসেও স্ব-তন্ত্র ও নির্বিকার। তাঁর শক্তি জগতে চিন্ময় ভাবনার নিগূঢ় বীর্য নিয়ে কাজ করবে। তাঁর অতিমানস সিদ্ধচেতনার ভাবরাশি চিন্ময় প্রাণসংবেগে বিশ্বে রূপায়িত হবে সবার অগোচরে। তাঁর অনুচ্চারিত মধ্যমা বাক্, তাঁর হৃদয়ের অবন্ধ্য আকূতি, তাঁর অমরপ্রাণের অপরাজিত বৈদ্যুতী, তাঁর সর্বাত্মভাবের অকুণ্ঠ বীর্য সবার মধ্যে অনুবিদ্ধ ও পরিব্যাপ্ত হবে- -তাঁর বাইরের ক্রিয়ামুদ্রা হবে এই অন্তর্নিবিষ্ট সাবিত্রী দ্যুতির একটা ছটা, তাঁর সুবিপুল সমগ্রভাবনা ও আত্মবিচ্ছুরণের একটা প্রান্তিক আ-ভাস মাত্র।

আবার বিজ্ঞানঘন-পুরুষের বিশ্বব্যাপ্ত অন্তশ্চেতনা তার অন্তর্ব্যাপ্তির সংবেগে শুধু যে জড়বিশ্বকে গ্রাস করবে, তা নয়। লোক-লোকান্তরের সঙ্গে অধিচেতনার যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ রয়েছে, তার সম্যক অনুভব তাঁর চেতনাকে জড়োত্তীর্ণ করবে। এই জড়বিশ্বের 'পরে লোকান্তরের নিগূঢ় বীর্য ও অনুভাবের স্পন্দ তাঁর অন্তরের তারে সহজেই ঝঙ্কৃত হবে। তাই তাঁর যোগদৃষ্টি বিশ্বব্যাপারের শুধু বহিরঙ্গ দিকটা দেখবে না—পার্থিব জড়ক্রিয়ার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে শক্তির সংবেগ, তারও তাৎপর্যকে প্রত্যক্ষ করবে। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের মধ্যে শুধু যে এই জড়জগতের 'পরে সিদ্ধচেতনার ঋতচিন্ময় প্রশাসনের অধিকার থাকবে, তা নয়। তাঁর নিরঙ্কুশ সামর্থ্য প্রাণলোক ও মনোলোকের পূর্ণবীর্যকেও জড়বিশ্বের অভ্যুদয়ের সাধনায় উন্মোচিত ও নিয়োজিত করবে। এমনি করে প্রজ্ঞার বিপুলতর বীর্য দিয়ে বিশ্বের সকল শক্তিকে আয়ত্ত করে তাঁর পরিবেশকে এমন-কি জড়প্রকৃতির জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করবার অকুণ্ঠ ঈশনা বিজ্ঞানঘন-পুরুষের চেতনায় কূল ছাপিয়ে উথলে উঠবে।

পরমার্থ-সৎ স্বয়ম্ভূ আপ্তকাম আনন্ত্যের স্বরূপসত্তামাত্র। স্বয়ম্ভাব ছাড়া তাঁর সত্তার আর-কোনও তাৎপর্য নাই, আত্মসংবিৎ ছাড়া তাঁর চিতি-শক্তির আর-কোনও প্রবৃত্তি নাই, তাঁর আনন্দে স্বরূপানন্দের উল্লাস ছাড়া আর-কোনও আকূতি নাই। অতিমানস এই স্বয়ম্ভূ সৎ-চিৎ-আনন্দেরই ঋতচিন্ময় উচ্ছলন-মাত্র। অতিমানস-ভূমিতে বিসৃষ্টি বা সম্ভূতির মধ্যেও এই প্রত্যঙ্মুখী বৃত্তি রয়েছে। সেখানে শুদ্ধ-সন্মাত্রের প্রত্যক্‌চেতন প্রবৃত্তিতে আত্মসম্ভূতির বহুধা বৈচিত্র্য আছে—স্বয়ম্ভূ স্ব-তন্ত্র ভাবনার ছন্দে। এক অখণ্ড চেতনাই আত্মানুভবের বিচিত্র ব্যঞ্জনায় সেখানে রূপায়িত, এক চিন্ময়ী পরা শক্তিই সন্ধিনীশক্তির বহুধাবৃত্ত ঐশ্বর্য এবং সুষমায় হিল্লোলিত, এক আনন্দসংবেগই অফুরন্ত আনন্দরূপের বিভাবনায় সমুৎসারিত। অতিমানস-সত্ত্বের সত্তা এবং চেতনা জড়ের আধারে স্ফুরিত হলেও তার স্বভাবধর্মের কোনও ব্যত্যয় হবে না বটে। তবু, পার্থিব ভূমিতে নিজের ব্যক্তবিভূতি নিয়ে কাজ করবার সময় অতিমানসের

মধ্যে এমন কতগুলি অবান্তর বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে, যাদের অস্তিত্ব তার স্বধামে অসম্ভাবিত ছিল। জড়ের ভূমিতে আছে সত্তার পরিণাম, চেতনার পরিণাম, আনন্দের পরিণাম। অবিদ্যার চেতনা যেখানে সাক্ষাৎ সৎ-চিৎ-আনন্দের চেতনায় রূপান্তরিত হবে, সেই দিব্যপরিণামের একটি বিশিষ্ট পর্বে বিজ্ঞানঘন পুরুষের আবির্ভাব হবে। অবিদ্যার মধ্যে আমরা অভ্যুদয়ের অপেক্ষায় আছি—জ্ঞান ও কর্মের সাধনায় কোনও-একটা ভূমিতে পৌঁছবার কিংবা একটা-কিছুকে সিদ্ধরূপ দেবার তাগিদ আছে আমাদের মধ্যে, একথা অনস্বীকার্য। আমরা অপূর্ণ, তাই আমাদের সবখানি জুড়ে শুধু অতৃপ্তির ব্যাকুলতা। কৃচ্ছ্র-সাধনার দ্বারা নিরন্তর চাইছি, যা আমরা নই তারই মধ্যে নিজেকে আরও বৃহৎ করে পেতে। আমরা যে অজ্ঞান, তার বেদনা আমাদের চিত্তকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। তাই আমরা এমন-একটা ভূমিতে পৌঁছতে চাই যেখানে নিঃসংশয়ে অনুভব করতে পারি—আমরা জেনেছি। অশক্তির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে আমরা বল ও বীর্যের নিরঙ্কুশ সিদ্ধির জন্যে ছটফট করছি। দুঃখের দহনে দগ্ধ হয়ে আমরা এমন-কিছু ঘটিয়ে তুলতে চাই -যা আমাদের জীবনে আনবে একটুখানি সুখের ঝলক, একটুখানি বাস্তবসিদ্ধির তৃপ্তি। আপন অস্তিত্বকে বজায় রাখবার প্রয়াস এবং প্রয়োজনই আমাদের কাছে মুখ্য বটে—কিন্তু তাকেও বলব জীবনসাধনার আদিপর্বমাত্র। কারণ দুঃখজর্জরিত অস্তিত্বের বোঝাকে কোন-রকমে বয়ে বেড়ানোই কখনও আমাদের কাম্য হতে পারে না। বিশ্বের মূলে যে আনন্দ ও বীর্যের উল্লাস অন্তঃশীল হয়ে আছে, আমাদের অবিদ্যাচ্ছন্ন চেতনায় তা ফুটে উঠেছে এই টিকে-থাকবার সহজ আকূতিতে, এই সুখৈষণার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে। একটা-কিছু করবার কি হবার তাগিদ সেই এষণাকেই স্ফুটতর করে। কিন্তু কী হব বা কী করব, তার কোনও স্পষ্ট ধারণা আমাদের নাই। তাই যতটুকু যেখানে কুড়িয়ে পাই, জ্ঞান বল বীর্য শুদ্ধি ও আনন্দের ততটুকু সঞ্চয় আমরা আহরণ করি এবং তা-ই দিয়ে একটা-কিছু হবার আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করতে চাই। অথচ এই আকূতি প্রয়াস এবং তজ্জনিত স্বল্প-সিদ্ধিই আবার আমাদের বন্ধনজাল হয়। উপকরণসঞ্চয়কে আমরা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ভাবি। নিজেকে জেনে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার 'পরেই যে জীবনের বনিয়াদ গড়ে উঠবে, একথা ভুলে গিয়ে আমরা মেতে যাই বাইরের বিদ্যা জোটাতে, বাইরের সঞ্চয় দিয়ে জ্ঞানের কাঠামো গড়তে। বাইরের কর্ম কিংবা স্থূল আরাম ও আনন্দের সিদ্ধিই তখন হয় আমাদের একমাত্র ঈপ্সিত। নিজেকে যিনি খুঁজে পেয়েছেন, তাঁকেই বলি চিন্ময় মানুষ। তিনি আত্মবান আত্মস্থ আত্মচেতন ও আত্মরতি—তাঁর নিজের মধ্যেই রয়েছে সকল রসের উৎস, তাই বাইরের উপকরণ তাঁর কাছে বাহুল্যমাত্র। বিজ্ঞানঘন-পুরুষেরও জীবনের প্রতিষ্ঠা এই ভূমিতে। কিন্তু তিনি আরও বড় গুণী, কেননা অবিদ্যা-পরিণামকে বিদ্যাপরিণামের ভাস্বর মহিমায় ও সিদ্ধবীর্যে রূপান্তরিত

করবার রহস্য তাঁর জানা আছে। সকল বিদ্যাকেই তিনি আত্মসমাহিত আত্ম-বিদ্যার বিভূতিতে পরিণত করেন, তাঁর সকল বীর্যে ও কর্মে সন্ধিনীশক্তির স্বত-উৎসারিত বীর্যের স্ফুরণ, তাঁর সকল আনন্দ স্বরূপসত্তার বিশ্বব্যাপ্ত আনন্দের উচ্ছলন। আসক্তি বা বন্ধন তাঁর মধ্যে থাকবে না, কেননা প্রতি পদক্ষেপে প্রত্যেক কুবস্তুতে তিনি অনুভব করবেন আপ্তকাম স্বয়ম্ভূসত্তার পূর্ণ-রতি, চিন্ময় স্বয়ংজ্যোতির স্বচ্ছন্দ বিকিরণ, প্রত্যক্‌বৃত্ত স্বরূপানন্দের অবন্ধন উল্লাস। এমনি করেই বিদ্যাপরিণামের প্রত্যেক পর্বে সত্তার সিদ্ধবীর্য ও সত্য-সঙ্কল্পের সংবেগ স্ফুরিত হবে, স্বরূপস্থিতির আনন্দ উছলে পড়বে, আনন্ত্যের ভূমিকায় দেখা দেবে আত্মবিভাবনার অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্য--ব্রাহ্মী স্থিতির রসানুভূতিতে যা সান্দ্র, অনুত্তরের শক্তিপাতে যা প্রভাস্বর।

অতিমানস রূপান্তর ও অতিমানস পরিণামে দেহ-প্রাণ-মনের যে-উদয়ন সিদ্ধ হবে, তাতে তাদের স্বভাব ও সামর্থ্যের নিগ্রহ কি উচ্ছেদ ঘটবে না কিন্তু আপনাকে ছাড়িয়ে গিয়েই আপনাকে তারা আরও পূর্ণ করে পাবে। কারণ, অবিদ্যারাজ্যের সকল পথই চিৎসত্তার আত্মৈষণার পথ হলেও তারা আঁধারে ছাওয়া, কিংবা উপচীয়মান আলোকের অনতিস্ফুটতায় আচ্ছন্ন। কিন্তু বিজ্ঞানঘন-পুরুষের জীবন চিন্ময় প্রভায় সমুজ্জ্বল—সেখানে নিজের বিভূতিবৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়াই সকল সিদ্ধির চরম। অতএব সেখানে সকল এষণার বৃহত্তর সার্থকতা ঘটে নিত্যসিদ্ধ স্বরূপসত্যের ব্যক্ত-চেতনার দীপনীতে। মন চায় আলো, চায় জ্ঞান। যাকে জানলে সব-কিছুই জানা যায়—বিষয়-বিষয়ীর সেই সারতত্ত্বকেও যেমন সে জানতে চায়, তেমনি জানতে চায় একের বহুভঙ্গিম বৈচিত্র্যকেও। কোন্ পরিবেশে, বিচিত্র প্রবৃত্তির কি ছন্দে ও রূপে, স্পন্দ ও রূপায়ণের কোন্ রীতিতে একের মধ্যে এই প্রকাশ ও বিসৃষ্টির মেলা দেখা দিল, আমাদের মন তার সকল খবর খুঁটিয়ে জানতে চায়। মননশীল চিত্তের এই তো ধর্ম, এই তো আনন্দ। মননের সন্ধানী-আলো ফেলে সৃষ্টির সকল রহস্য আবিষ্কারের নেশায় সে মাতাল। মনের বিজ্ঞানময় রূপান্তরে এই আকৃতির পূর্ণ চরিতার্থতা ঘটবে—কিন্তু তার ধরন হবে অভিনব। অজানাকে আবিষ্কার করে নয়—কিন্তু জানাকে প্রকট করেই মনন তখন সার্থক হবে। 'আত্মার দ্বারা আত্মাতে আত্মাকে' আবিষ্কার করাই তখন হবে জানার স্বরূপ। কারণ বিজ্ঞানঘন-পুরুষের আত্মবোধ তো মনোময় অহন্তার বোধে পর্যবসিত নয়—তাঁর আত্মা যে সর্বভূতেরও আত্মভূত। তাই তাঁর জ্ঞানময় দৃষ্টিতে এ-জগৎ চিন্ময় জগৎ। 'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান'-এর অর্থই হল অদ্বয়স্বরূপ হয়ে অদ্বয়ভাবকে সর্বত্র আবিষ্কার করা, অদ্বয়-সত্যকে সর্বত্র দর্শন করা—অদ্বয়ভাবনার বিভূতি প্রবৃত্তি ও সম্বন্ধের বৈচিত্র্যকে সর্বত্র অনুধাবন করা। বিচিত্র পরিবেশে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বহুভঙ্গিম রূপ-কল্পনায় সৃষ্টির যে-উল্লাস, বিজ্ঞানঘন-পুরুষের আত্মবোধি তার মধ্যে অনুভব

করবে এক অদ্বয়ভাবনার বিচিত্র সত্যের অফুরন্ত ঐশ্বর্য, তার আত্মস্বরূপের চিত্রবিভূতি ও চিত্রবীর্য, বহুধাবৃত্ত অগণিত রূপায়ণের অপরূপ উচ্ছলনে এক অদ্বৈতভাবের অন্তহীন ব্যঞ্জনা। সবার সঙ্গে এক হয়ে সবার মধ্যে আবিষ্ট হয়ে, অধ্যাত্মস্পর্শের নিবিড় সংবিতে নিজেকেই সবার মধ্যে খুঁজে পাবার চকিত দীপ্তিতে, ঘটে-ঘটে আত্মপ্রত্যভিজ্ঞার বিদ্যুৎস্ফুরণে জাগে এই সুগভীর তাদাত্ম্যবোধ—যে-বোধ মনঃকল্পনারও অগোচর অথচ বোধির নিঃসংশয় বৃহৎ জ্যোতির প্রভায় সমুজ্জ্বল। আবার শুধু বোধির দ্বারা সত্যের অনুভব নয়, অনুভূত সত্যকে ব্যবহারের জগতে মূর্ত করবার দিব্য প্রতিভাও জাগে বিজ্ঞানীর মধ্যে। বোধির অসঙ্কুচিত উন্মেষে তিনি হন সত্যকার জীবনশিল্পী। সিদ্ধভাবনাকে জড়ে ও জীবনে রূপায়িত করে তুলতে চিৎস্বরূপের চিন্ময় বাহনরূপে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়চেতনার যখন ডাক পড়ে, তখন তাদের তদ্‌গত প্রবৃত্তির প্রত্যেকটি পর্বে তাঁর অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ আত্মবোধ হয় তাদের দিশারী।

বিজ্ঞানঘন-পুরুষের জ্ঞানের বৃত্তি এবং ক্রিয়া হবে একান্তভাবে অতিমানস তাদাত্ম্যানুভূতির আশ্রিত। তাঁর জ্ঞানে বুদ্ধির এষণার জায়গায় দেখা দেবে তাদাত্ম্যসম্পুটের মর্মাবগাহী এক সম্বুদ্ধ চেতনা—যা সহজেই অনুভব করবে একের মধ্যে বহুর স্বাভাবিক সংস্থান। এক সর্বানুস্যূত চৈতন্যজ্যোতির প্রভাসে তাঁর জ্ঞানের প্রত্যেকটি পর্ব এবং প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হবে—তাই জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ত্রিপুটী রূপান্তরিত হবে এক অখণ্ডানুভবের রসায়নে, চিন্ময় কর্তার চিন্ময় সাধন ও চিন্ময় কর্মও হবে চিৎশক্তির এক অবিভক্ত স্পন্দন। অথচ এ-সবার ঊর্ধ্বে মহেশ্বররূপে থাকবে এক সাক্ষিচৈতন্যের অধিষ্ঠান—যা চিৎস্পন্দনের এই অখণ্ড বিভাবনাকে আত্মভাবের আবেশে একচ্ছন্দ আত্মরূপায়ণের অনবদ্য লীলারূপে সিদ্ধ করে তুলবে। প্রাকৃত মন বিষয় হতে নিজেকে বিবিক্ত রেখে অবেক্ষণ ও যুক্তির দ্বারা জ্ঞেয়বস্তুর স্বরূপ নিরূপণ করতে চায়। বিষয়কে স্ব-তন্ত্র অনাত্মতত্ত্বরূপে দেখাই তার পক্ষে সত্যকার দেখা, যে-দেখার মধ্যে ব্যক্তিগত কল্পনা কি আত্মভাবের কোনও খাদ মেশানো নাই। কিন্তু বিজ্ঞানঘন-চেতনা বিষয়কে আত্মসাৎ করে এবং তাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাদাত্ম্যবোধদ্বারা আরও অন্তরঙ্গভাবে তার স্বরূপকে জানে। তার সর্বাবগাহী সংবিৎ জ্ঞেয়বস্তুকে সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করেও ছাপিয়ে পড়ে। আত্মসত্তার কোনও অংশ বা স্পন্দকে সে যেমন করে জানে, তেমনি করে বিষয়কেও জানে তার নিজের অবিনাভূত অংশরূপে। অথচ সে-তাদাত্ম্যভাবনায় নিজেকে তার সঙ্কুচিত করতে হয় না, কিংবা বিষয়ের বেষ্টনীর মধ্যে মননকে অবরুদ্ধ করে সে বিদ্যার কঞ্চুক সৃষ্টি করে না। এই আন্তর সংবিতে বস্তুর সত্যরূপটি অন্তরঙ্গ প্রত্যক্ষের অসঙ্কুচিত প্রত্যয়ে নিখুঁত হয়ে ফোটে, অতএব তার মধ্যে প্রমাদী অহং-মানসের কোনও ছলনা থাকে না- কেননা চেতনা এখানে বিশ্বপ্রজ্ঞ বিরাট-

পুরুষের চেতনা, অহংকারবিমূঢ়াত্মার সংকীর্ণ চেতনা নয়। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের সর্ববিজ্ঞান সত্যের সঙ্গে সত্যের ঠোকাঠুকি দিয়ে একটা নিরেট চরম সত্য আবিষ্কারের প্রয়াস নয়। এক সর্বাবগাহী সম্ভূতিসংবিতের আলোকে খণ্ডসত্যের পূর্ণ পরিচয়টি চেতনায় উজ্জ্বল করে তোলাই তাঁর বিজ্ঞানের স্বরূপ। তাঁর ভাবনা আত্মবিজ্ঞানের স্বতঃসমাহারী উদার ভাবনা, তাঁর দর্শন অন্তরাবৃত্তচক্ষুর স্বরূপদর্শন, তাঁর প্রত্যক্ষ সম্প্রসারিত আত্মস্বরূপের অন্তরঙ্গ প্রত্যক্ষ। জ্যোতির মধ্যে মূর্ছিত জ্যোতির অভিঘাতে সত্যস্বরূপের স্বকৃৎ সৌষম্যের স্ফুরণ—এতেই তাঁর অবিভক্ত জ্ঞানবৃত্তির নিটোল পূর্ণতার পরিচয় ফোটে। উন্মেষের লীলা তারও মধ্যে আছে, কিন্তু সে তো আঁধার চিরে আলোর উন্মেষ নয়—সে যেন আলোর মধ্যেই আলোর ছলকে ওঠা। এই উন্মেষণে অতিমানসচেতনা আত্মসংবিতের সঞ্চয়কে যদি অংশত সংবৃতও করে, তবু তার মধ্যে কোনও ক্রমায়ণের দায় কি অবিদ্যার প্রবর্তনা থাকে না। সে-ক্ষেত্রে সিদ্ধ-চেতনার নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য নিয়েই কালাতীত বিজ্ঞানকে সে কালকলনায় তরঙ্গায়িত করে মাত্র। অচিৎকে চিদালোকদ্বারা উদ্ভাসিত করবার প্রয়াস হল প্রাকৃত-জ্ঞানের ধারা। কিন্তু অতিমানস প্রকৃতিপরিণামে প্রত্যয়নের রীতি হল চিজ্জ্যোতির আত্মবিচ্ছুরণ—আলো হতেই আলো ঠিকরে পড়ার মত।

মন যেমন আলো চায়, চায় জ্ঞানের নূতন তন্ত্র এবং তাই দিয়ে অর্জন করতে চায় ঈশনার অধিকার—তেমনি প্রাণও চায় আত্মশক্তির বিকাশদ্বারা স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। সে চায় অভ্যুদয় জয়শ্রী ও সম্পদ, কামনার তর্পণ ও সিসৃক্ষার সার্থকতা, আনন্দ প্রেম ও সৌন্দর্যের নির্ঝর। বিচিত্ররূপে নিজেকে ফুটিয়ে তোলা, সিসৃক্ষার বহুমুখী প্রেরণায় নিজেকে উৎসারিত ও সমৃদ্ধ করা, সম্ভোগের আনন্দে আত্মবীর্যের তীব্র উন্মাদনায় মাতাল হওয়া—এতেই তার উল্লাস। বিজ্ঞানঘন-চেতনায় এ-উল্লাস পূর্ণতার চরম শিখরে উঠবে বটে, কিন্তু তার মধ্যে মনোময় ও প্রাণময় অহন্তার অভ্যুদয় তর্পণ কি সম্ভোগের কোনও আয়োজন থাকবে না। শুধু নিজের মধ্যে কুণ্ডলিত থেকে ভোগৈশ্বর্যের উদগ্র কামনায় অপরকে আঁকড়ে ধরা, আত্মপ্রতিষ্ঠার অতৃপ্ত উন্মাদনায় কেবলই নিজেকে ফাঁপিয়ে তোলা—প্রাণের এই মূঢ় আকূতিতে বিজ্ঞানঘন-চেতনার সায় নাই। কেননা, চিন্ময় সিদ্ধি ও পূর্ণতা কোনকালেই স্ফীতকায় অহংকে আশ্রয় করে নেমে আসতে পারে না। নিজের আধারে এবং বিশ্বের আয়তনে ঘটে-ঘটে অধিষ্ঠিত রয়েছেন যে দিব্য-পুরুষ, বিজ্ঞানীর জীবন তাঁরই কাছে উৎসৃষ্ট নৈবেদ্যের ডালা। পরমপুরুষের সত্তা জ্যোতি শক্তি প্রীতি রতি ও কান্তির দ্বারা জীব ও বিশ্বের সত্তা উত্তরোত্তর আবিষ্ট হ'ক—বিজ্ঞানঘন-পুরুষের কাছে এই একমাত্র পুরুষার্থ। বিশ্বে দিব্যজ্যোতির এই উপচয়ের উত্তরোত্তর সার্থকতাতে ব্যক্তিজীবনেরও সার্থকতা। অতএব বিজ্ঞানঘন-পুরুষের শক্তি নিয়োজিত হবে পরমা প্রকৃতির সিদ্ধবীর্যের বাহনরূপে—তাঁকে আশ্রয় করে

এখানে ঘটবে মহাপ্রাণ মহাপ্রকৃতির উদ্বোধন ও সম্প্রসারণ। অজানার বুক হতে জয়শ্রীকে ছিনিয়ে আনবার যে সাধনা এবং সিদ্ধি তাঁর, তার একমাত্র লক্ষ্য বিশ্বের হিত—বিশেষ-কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অহমিকার চরিতার্থতা নয়। প্রেম তাঁর কাছে আত্মায়-আত্মায় বিদ্যুন্ময় সম্প্রয়োগের শিহরন, অদ্বৈত-রসানুবিদ্ধ সত্তার অন্যোন্যবিনিময়—চেতনার সঙ্গে চেতনার, চিৎসত্তার সঙ্গে চিৎসত্তার, অদ্বৈতস্বরূপের সঙ্গে অদ্বৈতস্বরূপের তাদাত্ম্যবোধনিবিড় আশ্লেষের বীর্যময় রসায়ন, একীভূত চেতনার আনন্দবিগলিত বিশ্বতোমুখ বিচ্ছুরণ। রূপে-রূপে একেরই অন্তঃশীল আত্মরূপায়ণের উল্লাস, বহুবিচিত্র আসঙ্গের মধ্যে একেরই অদ্বৈতবোধময় ব্যতিষঙ্গের আনন্দ—এরই হিরণ্যরাগে বিজ্ঞানঘন চেতনায় ফুটে ওঠে জীবনের অখণ্ড তাৎপর্য। তাঁর সিসৃক্ষার সংবেগেও আছে এই আনন্দের প্রেতি—এখন সে-সিসৃক্ষা জড়ে প্রাণে মনে রসচেতনার যে-প্রেরণা নিয়েই সার্থকতার পথ খুঁজুক না কেন। তাই তাঁর সকল সৃষ্টিই শাশ্বত শক্তি দীপ্তি শ্রী ও তত্ত্বভাবের সার্থক রূপায়ণ—তার রূপ ও কায়ার, গুণ ও বিভূতির ঋতম্ভরা সুষমা, তারই চিদ্‌ঘনবিগ্রহে সকল বিগ্রহের অতীত অরূপসুষমার দ্যোতনা।

পূর্বেই বলেছি, অতিমানস ভূমিতে ঊর্ধ্বস্রোতা চেতনার যে সম্যক রূপান্তর ঘটে, তাতে জড়-প্রাণ-মনের সঙ্গে চিৎসত্তার একটা নতুন সম্পর্ক দেখা দেয়—পূর্ণতাসিদ্ধির একটা নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে। এই উজানধারার প্রেতি, এই অভিনব সিদ্ধির ব্যঞ্জনা বিজ্ঞানঘন-পুরুষের স্থূল দেহেও সংক্রামিত হয় এবং তার ফলে তাঁর দেহাত্মবোধ হয় এক লোকোত্তর সিদ্ধচেতনার বাহন। প্রাকৃত-জীবনে জীবচেতনা প্রাণ ও মনের সহায়ে আপনাকে যথাসম্ভব প্রকাশ করতে চাইছে—যদিও সে-প্রকাশে স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে কুণ্ঠার পীড়নই বেশী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেকে শুধু আধাররূপে রেখে প্রাণ-মনকেই সে স্বাতন্ত্র্যের অধিকার দিয়েছে। আমাদের স্থূলদেহ চেতনার এই কুণ্ঠিত প্রবৃত্তির বাহন। কিন্তু দেহ জড় সাধন বলে প্রাণ-মনের অনুবর্তী হয়েও তার সুচিরসঞ্চিত তামসিক সংস্কারের সঙ্কোচ দিয়ে তাদের আত্মপ্রকাশের সামর্থ্যকে বিশিষ্ট এবং সঙ্কুচিত করেছে। তাছাড়া দৈহ্যবৃত্তির একটা স্বধর্ম আছে—যার মধ্যে সন্ধিনীশক্তির অবচেতন বা অর্ধচেতন একটা স্পন্দবৃত্তি অথবা তার একটা অস্পষ্ট আকূতি সংবেগ বা প্রেতি স্পন্দিত হচ্ছে। এই আচ্ছন্ন দৈহ্যচেতনাকে প্রভাবিত করা বা পালটে দেওয়া প্রাণ-মনের পুরাপুরি সাধ্য নয়। অদলবদলের যেটুকু ক্ষমতা তাদের আছে, প্রায়ই তার ক্রিয়া হয় পরোক্ষে—অপরোক্ষে নয়। যেখানে অপ-রোক্ষে ক্রিয়া হয়, সেখানেও সচেতন সঙ্কল্পের কোনও বালাই নাই—আছে শুধু অবচেতনার প্রবর্তনা। কিন্তু বিজ্ঞানঘন-পুরুষের জীবন-ধারায় এ-ব্যবস্থা পালটে যেতে বাধ্য। সেখানে দেহের সকল ধর্ম

ও বৃত্তি চিৎসত্তার সংকল্পদ্বারা অপরোক্ষভাবে শাসিত ও প্রবর্তিত হবে। বস্তুত দেহধর্মের মূল রয়েছে অবচেতনায় বা অচিতিতে। কিন্তু বিজ্ঞানঘন-পুরুষে, অতিমানসের শাসনে থেকে তার জ্যোতি ও শক্তির দ্বারা অনুবিদ্ধ হয়ে অবচেতনাও সচেতন হয়ে উঠবে। অতিমানসের উন্মেষে অচিতির তমসাচ্ছন্ন দ্বৈধভাব বা মন্থর সত্ত্বোদ্রেকের বাধা রূপান্তরিত হবে অবরার্ধে নিগূঢ় অতিচেতন আধারশক্তিতে। উত্তর-মানস বোধি-মানস বা অধিমানসের আবির্ভাবেই দৈহ্যচেতনায় এমনিতর রূপান্তরের সূচনা দেখা দেয়। তখন হতেই ভাব ও সংকল্পশক্তির প্রভাবে অপরোক্ষত সাড়া দেবার মত সচেতনতা দেহের পক্ষে অনায়াস হয়। তার ফলে, আজ যেখানে দেহের 'পরে মনের ক্রিয়া নিতান্ত এলোমেলো অপরিস্ফুট এবং প্রায়শই অনিচ্ছিত, সেখানে মনের মধ্যে দেখা দেয় স্থূল আধারের 'পরে অবন্ধ্য ঈশনার একটা সংবেগ। কিন্তু অতিমানস-পুরুষের বেলায় কিছুই তাঁর প্রশাসনের বাইরে থাকতে পারে না। তাঁর মধ্যে সদ্ভূত-বিজ্ঞানের চিদ্‌বীর্যই আধারের সর্বময় প্রভু। এই সদ্ভূত-বিজ্ঞানে আছে স্বতঃপরিণামী সত্যদর্শনের প্রৈষা। কেননা সদ্ভূত-বিজ্ঞান অপরোক্ষবৃত্ত চিৎসত্তারই সিদ্ধভাব ও সিদ্ধসংকল্প—তাই সত্তার মর্মমূলে সত্যভাবনার যে-আন্দোলন সে জাগিয়ে তোলে, তা ব্যক্তভাব ও ব্যক্তকর্মের অমোঘসিদ্ধিতে পর্যবসিত হয়। ঋত-চিতের এই চিন্ময় সম্ভূতির অপ্রতিহত সংবেগ বিজ্ঞানঘন-পুরুষের আধারে আপন অনুত্তর ঐশ্বর্যের জাগ্রত মহিমা ও সচেতন সামর্থ্য নিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই তার ক্রিয়া এখনকার মত আপাত-অচিতির আড়ালে থেকে স্বরচিত যন্ত্রমূঢ়তার কুণ্ডলীতে আবর্তিত হয়ে চলে না—তার মধ্যে ফুটে ওঠে স্বয়ম্ভূ স্বরাট তত্ত্বভাবের স্বকৃৎ ছন্দ। অখণ্ড জ্ঞান ও অবন্ধ্য বীর্য নিয়ে ঋত-চিতের এই চিন্ময়ভাবনা তখন জীবনের প্রশাস্তা হয়, সুতরাং জড়-দেহের ক্রিয়া এবং ব্যাপ্রিয়া তারই অনুশাসন মেনে চলে। অধ্যাত্মচেতনার বীর্যে অনুষিক্ত হয়ে এই জড়দেহ তখন হয় চিৎস্বরূপের একান্ত অনুগত ও অনবদ্য চিন্ময় সাধন।

দেহাত্মবোধের এই নতুন ভঙ্গিতে জড়প্রকৃতিকে নিরাকৃত না করে তাকে স্বচ্ছন্দে ও নিঃশেষে অঙ্গীকার করবার সম্ভাবনা এবং সামর্থ্য দেখা দেয়। অধ্যাত্মচেতনাকে মুক্ত করবার জন্য সাধনার প্রথম পর্বে প্রকৃতি হতে পরাঙ্মুখ হয়ে তার অবিবেক বা অঙ্গীকারের সকল প্ররোচনাকে ব্যর্থ করবার একটা স্বাভাবিক দায় নিশ্চয় ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানঘন-পুরুষের সিদ্ধ চেতনাতেও সে-ভাবকে আঁকড়ে থাকবার কোনও সার্থকতা নাই। 'আমি দেহ নই' এই ভাবনায় দৈহ্যচেতনার বন্ধন হতে মুক্তি পাওয়া একটা সুপরিচিত ও সপ্রয়োজন সাধনাঙ্গ। তাতে হয় আত্মার মুক্তি ঘটে, নয়তো পূর্ণতাসিদ্ধিতে প্রকৃতির 'পরে তার বশীকার জন্মায়। কিন্তু বিদেহভাবনায় একবার সিদ্ধ হয়ে আবার

চিৎশক্তির জ্যোতির্ময় প্লাবনে এই দেহকেই আপ্লুত ও উজ্জীবিত করা চলে—নতুন করে মহেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে জড়প্রকৃতির পারার্থ্যকে অংগীকার করা চলে। প্রাকৃত জগতে জড়প্রকৃতিই ঈশ্বরী—চিৎস্বরূপের সে তিরস্করণী। যদি চিৎ ও জড়ের এই ব্যতিষঙ্গের বিপর্যয় ঘটে, তাহলে জড়প্রকৃতিকেও চিন্ময়ী করে তোলা সম্ভব হয়। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উদারদৃষ্টিতে দেখি, অন্নও ব্রহ্ম—জড়শক্তি ব্রহ্মেরই স্বরূপশক্তি, জড়ও ব্রহ্মরূপ এবং ব্রহ্মধাতু। জড়ে অন্তর্গূঢ় চেতনার সংগে একাত্মক হয়ে বিজ্ঞানীর চিতিশক্তি জড়কেও ব্রহ্মদৃষ্টিতে আপন অংগীভূত করে চিদ্‌বিলাসের সাধনরূপে গ্রহণ করতে পারে। জড়ের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাকে সর্বত্র ব্রতোপাসনার অংগ মনে করা কিছুই অসম্ভব নয়। গীতাতে আহার্যগ্রহণকেও বর্ণনা করা হয়েছে দ্রব্যযজ্ঞরূপে—সে যেন 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্'। বিজ্ঞানঘন-পুরুষও এমনি করে চিৎ-জড়ের সকল সম্বন্ধকে চিন্ময়-ভাবনার দ্বারা অনুভাবিত করতে পারেন। সর্বভূতের যোগক্ষেমের জন্য চিৎস্বরূপ নিজেকে জড়ের রূপে পরিণামিত করেছেন—নিজেকে আহুতি দিয়েছেন বিশ্বহিতের মহাসত্রে। বিজ্ঞানী পুরুষ তাই জড়কে জড়বাসনার ও প্রাণবাসনার সংস্পর্শশূন্য অনাসক্ত চিত্ত নিয়ে ব্যবহার করেন। কেননা তিনি জানেন, যে-রূপেই হ'ক, জড় চিৎসত্ত্বেরই রূপায়ণ, অতএব জড়ের ব্যবহারে ঘটছে চিৎস্বরূপেরই আত্মব্রতের উদ্‌যাপন। তাই জড়বস্তুর প্রতিও তাঁর একটা সুগভীর শ্রদ্ধা থাকবে—কেননা জড়ের অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তিতে রয়েছে যে সেবিকার মৌন আকূতি, সে তো তাঁর উপেক্ষণীয় নয়। জড়ের উপযোগে তাই তিনি শৈবী তনুর পূজারী—সংসারযাত্রার এই চিন্ময় উপকরণের নিখুঁত ব্যবহার করতে কোথাও তাঁর শৈথিল্য নাই। জড়ের জীবনে, জড়ের উপাসনায় তাঁর চিত্তবীণায় ধ্বণিত হয় সত্যের ছন্দ, অনবদ্য শ্রী ও ঋতসুষমার মূর্ছনা।

এই অভিনব দেহাত্মবোধের অনুধ্যানের ফলে বিজ্ঞানঘন-চেতনা অন্নময়-পুরুষের মধ্যেও চিন্ময়ভাবনার পরিপূর্ণ সার্থকতা আনবে—প্রাণ ও মনের মত দেহও হবে চিদ্‌বিলাসের দিব্য আধার। প্রাকৃত-দেহের মধ্যে আছে নানা ক্ষুণ্ণতা, তামসিকতা ও সংকুচিত সামর্থ্যের দৈন্য—কিন্তু তবু দৈহ্যচেতনা আত্মার অনুগত ভৃত্যের মত। যে বিপুল শক্তির সঞ্চয় তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, সুকৌশল প্রয়োগে তার দ্বারা জীব অসাধ্য সাধন করতে পারে। অথচ এই সেবার বিনিময়ে দেহ চায় শুধু আয়ু স্বাস্থ্য বল আরোগ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য—চায় অন্নময় আধারের পূর্ণতা ও আনন্দ। এ-চাওয়ার মধ্যে অসংগতি অন্যায় বা হীনতার কিছুই নাই। কেননা এ কেবল চিৎস্বরূপের সার্থক আত্মরূপায়ণের সহজ উল্লাসকে জড়ের ভাষায় রূপ দেওয়া—চিন্ময় বিগ্রহের পূর্ণতায় ও ধাতু-প্রসাদের দীপ্তিতে চিৎসত্ত্বের বীর্য এবং আনন্দকে মূর্ত করা। বিজ্ঞানঘন-

চেতনার শক্তি দেহের মধ্যে নেমে এলেই এমনিতর কায়সম্পৎ সিদ্ধ হতে পারে। প্রাকৃত-দেহের পঙ্গুতার মূলে আছে জড়াশ্রয়ী প্রাণ-মন ও নাড়ীতন্ত্রের 'পরে এবং স্থূল কায়সংস্থানের 'পরে বাহ্যশক্তির একটা চাপ—যাকে আমরা ঠেকাতে জানি না কিংবা সুকৌশলে তার মোড় ঘুরিয়ে বীর্যলাভের অনুকূলে প্রয়োগ করতে পারি না। তাইতে দৈহ্যচেতনার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তমোভাবের একটা আচ্ছন্নতা—যা তার ছন্দকে বিকৃত করে এবং বাহ্যশক্তির প্রতিক্রিয়ারূপে ভুল সাড়া দেয়। কিন্তু অতিমানসের স্বকৃৎ ও স্বতঃপরিণামী সংবিৎ এবং বিদ্যা-শক্তি অশক্ত অবিদ্যার এই দৈন্যকে দূর করে, দেহের কুণ্ঠাবিকৃত বোধিজ-সংস্কারের মধ্যে মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য আনে, চিন্ময় প্রবৃত্তির দীপ্তিতে তাদের উজ্জ্বল ও বীর্যবত্তর করে। এই রূপান্তরের ফলে আধারে প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় বিষয়ের স্থূল প্রত্যক্ষেরও একটা ঋতম্ভরা বৃত্তি, বাহ্যবস্তু ও বাহ্যশক্তির সঙ্গে একটা ঋতময় যোগাযোগের সামর্থ্য, দেহে নাড়ীতন্ত্রে ও চিত্তে একটা ঋতময় ছন্দঃসুষমার হিল্লোল। বিশ্বচেতনার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে, তার বিপুল সঞ্চয়ের অংশভাক্‌রূপে এই দেহের মধ্যেই তখন একটা ঊর্ধ্বতর চিন্ময় সামর্থ্য এবং প্রাণশক্তির বিপুলতর সংবেগ উৎসারিত হবে। জড়প্রকৃতির সঙ্গে এই স্থূলদেহও তখন জ্যোতির্ময় সৌষম্যের ছন্দে বাঁধা পড়বে—এক শাশ্বত প্রযত্নশৈথিল্যের বিপুল প্রশান্তির স্পর্শে দেহের অণুতে-অণুতে সঞ্চারিত হবে দিব্যসামর্থ্যের অনুদ্বেল আনন্দ। সবচেয়ে বড় কথা, অতিমানস-রূপান্তরে সমস্ত আধার যখন চিৎশক্তির অনুত্তর বীর্যের প্লাবনে প্লাবিত হবে, তখন চার-দিক হতে দেহের 'পরে বাহ্যশক্তির চাপকে আত্মসাৎ করে ওই চিৎশক্তিই এই দেহে শক্তিসৌষম্যের বিপুল মূর্ছনা জাগিয়ে তুলবে। বলা বাহুল্য, দেহের এই চিন্ময়-পরিণামেই আধারের আমূল রূপান্তরের অনতিবর্তনীয় আকূতি সার্থক হবে।

প্রাকৃত-জগতে দেহ-প্রাণ-মনের আধারে চিৎশক্তির প্রকাশ অপূর্ণ এবং কুণ্ঠাহত। আধারের 'পরে বিশ্বশক্তির অভিঘাতকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ-বর্জন করবার কিংবা তাদের আত্মসাৎ করে সৌষম্যের ছন্দে গেঁথে তোলবার স্বাতন্ত্র্য তার নাই। আমাদের মধ্যে পীড়া ও সন্তাপের সৃষ্টি হয় এইখানেই। জড়ের রাজ্যে প্রকৃতির অভিযান শুরু হল চেতনার অন্ধ অসাড়তা হতে। প্রাণলীলার আদিপর্বে—পশুতে, এমন-কি মানুষের আদিম অথবা অসংস্কৃত অবস্থাতে—স্পষ্টই দেখতে পাই, আধারে একটা অসাড়তার ঘোর লেগেই আছে, কিংবা তার মধ্যে দেখা দিয়েছে বোধশক্তির একটা ক্ষুণ্ণ আভাস অথবা বেদনাবোধ সম্পর্কে একটা অসধারণ তিতিক্ষা ও কাঠিন্যের পরিচয়। কিন্তু মানুষের প্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে তার বোধশক্তিও তীব্রতর হয়, দেহ-প্রাণে-মনে দেখা দেয় বেদনাবোধের তীক্ষ্ণতর সামর্থ্য। আধারে চেতনার উপচয়ের অনুপাতে মানুষের

শক্তির উপচয় ঘটে না। তার দেহের উপাদান ও গ্রহণশক্তি সূক্ষ্মতর হয় বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে শক্তির বহিঃপ্রকাশের সামর্থ্য আগেকার মত আর নিরেট থাকে না। মানুষকে তখন মনের জোরে সংকল্পশক্তির তীব্রতা দিয়ে নাড়ীতন্ত্রকে মার্জিত নিয়ন্ত্রিত ও বীর্যশালী করে তুলতে হয়, জোর করেই তাকে নিয়োজিত করতে হয় নিজের সংকল্পিত কৃচ্ছ্রসাধনায়, অথবা দুঃখ-বিপদের অভিঘাতে অনম্য থাকবার দীক্ষা দিতে হয়। অধ্যাত্মপ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে আধারের 'পরে চিন্ময় বীর্য ও সংকল্পের প্রশাসন নির্বারিত হয়, দেহ নাড়ীতন্ত্র ও বহির্মনের 'পরে চিৎসত্ত্ব ও অন্তর্মনের নিয়ন্ত্রণসামর্থ্য হয় অপরিমেয়। প্রথমত চেতনায় জাগে একটা প্রশান্ত-বিপুল সমতার বোধ, বহির্জগতের সকল স্পর্শ ও অভিঘাতে অবিচলিত থাকবার ক্ষমতা স্বভাবগত হয়, ক্রমে এই সমত্ববোধ মন হতে প্রাণময়-কোশের সর্বত্র সঞ্চারিত হয়—এক সুবিপুল ও সদাবৃত্ত প্রশান্তির বীর্যে প্রাণকে করে উদার ও স্বচ্ছন্দ। এমন-কি পরিশেষে তা দেহে সংক্রামিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে দুঃখ-শোক-সন্তাপের সকল অভিঘাতে দেহকে সুমেরুবৎ অচল অটল রাখে। এ-অবস্থায় ইচ্ছামাত্র দৈহ্যচেতনার নিরোধ কিংবা সর্ববিধ পীড়ার অভিঘাত হতে মনকে স্বেচ্ছায় বিযুক্ত করবার সামর্থ্যও দেখা দিতে পারে। তাইতে প্রমাণ হয়, আমাদের মধ্যে দৈহ্য-আত্মার পক্ষে জড়প্রকৃতির চিরাভ্যস্ত সাড়ার কাছে অবশভাবে আত্মসমর্পণ করবার যে-রীতি চলিত আছে, তা অনতিবর্তনীয় বা অপরিবর্তনীয় নয়। চিতিশক্তির বিশেষ মহিমা ফোটে চিন্ময়-মানস বা অধিমানসের ভূমিতে—যখন আমাদের দুঃখের স্পন্দনকে আনন্দের ঝঙ্কারে রূপান্তরিত করবার ক্ষমতা জন্মায়। এ-ক্ষমতা সবার পক্ষে সবসময় নিরঙ্কুশ না হলেও এতে বোঝা যায় যে, চেতনার প্রতিক্রিয়ার যে সাধারণ রীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটানো নিতান্ত অসম্ভব নয়। তাছাড়া প্রকৃতির যে-অভিঘাতকে রূপান্তরিত করা কি সয়ে যাওয়া কঠিন, তার থেকে অন্তত আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতাও এতে অর্জিত হয়। বিজ্ঞানঘন-পরিণামের বিশেষ-একটা পর্বে এই অ-প্রাকৃত বিপর্যয় ও আত্মরক্ষার শক্তি এতই সম্পূর্ণ ও সহজ হবে যে, দেহের অণুতে-অণুতে উপচিত অব্যাহত প্রশান্তবাহিতা ও দুঃখনির্মুক্তির আকূতি সেদিন সার্থক হবে এবং তার মধ্যে উদ্গত হবে শুদ্ধসত্তার নিঃসীম আনন্দসম্ভোগের অকুণ্ঠিত সামর্থ্য। চিন্ময় আনন্দের সৌম্যধারায় এই দেহ প্লাবিত হতে পারে—তার প্রতিটি কোষ অনুষিক্ত হতে পারে। সে লোকোত্তর আনন্দের জ্যোতির্ময় সংমূর্ছনে জড়প্রকৃতির বিকল বা প্রতীপ সংবিতের নিরবশেষ রূপান্তর ঘটতে পারে—এ কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়।

শুদ্ধতত্ত্বের অনুত্তর ও অখণ্ড আনন্দকে সম্ভোগ করবার অভীপ্সা এবং অধিকারবোধ আমাদের আধারের মর্মে-মর্মে নিগূঢ় হয়ে আছে। কিন্তু তাকে

ঢেকে আছে আধারের গূহদ্বন্দ্ব—তার বিভিন্ন বৃত্তির বিভিন্নমুখী আকৃতি। তাদের কুণ্ঠাহত সামর্থ্য তাই শুধু সুখাভাসের কল্পনা ও সম্ভোগ নিয়েই তৃপ্ত থাকে। সুখৈষণার কত বিচিত্র রূপ। দৈহ্যচেতনায় সে ফুটেছে দেহরতির পিপাসা হয়ে। প্রাণে সে দেখা দিয়েছে প্রাণরতির আকুলতা নিয়ে—যার মধ্যে আছে নিত্য-নতুনের চমকভরা বহুবিচিত্র উল্লাসের তীক্ষ্ম শিহরণ। মনের মধ্যে সে ধরেছে মনোময় আনন্দমেলার সহজ স্বীকৃতির রূপ। আরও ঊর্ধ্বে অধ্যাত্মচেতনায় সে হয়েছে প্রশান্তি ও লোকোত্তর নির্বৃতির আকৃতি। এই সুখৈষণার মূলে রয়েছে সত্তামাত্রের মর্মসত্যের প্রেরণা। কেননা আনন্দই ব্রহ্মসত্তার স্বরূপ—সর্বগত পরমার্থসতের সে-ই তো পরমা প্রকৃতি। বিসৃষ্টির অবরোহক্রমে দেখি আনন্দ হতে অতিমানসের উন্মেষ, আবার ঊর্ধ্বপরিণামের আরোহক্রমে আনন্দেই তার নিমেষ। কিন্তু নিমেষের অর্থ নির্বাণ বা বিনাশ নয়। শুদ্ধ-সন্মাত্রের আনন্দে যে স্ব-সংবিৎ ও স্বকৃৎ-পরিণমনের উল্লাস রয়েছে, তার সঙ্গে অবিনাভূত হয়ে নিত্যস্থিতিই নিমেষের তাৎপর্য। অতিমানসের অবসর্পিণী সংবৃত্তি বা উৎসর্পিণী বিবৃত্তি দুয়েরই মূলে আছে অনাদি স্বরূপানন্দের অধিষ্ঠান, এবং সেই আনন্দ হতে উৎসারিত হচ্ছে তার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সকল স্পন্দন। চৈতন্য অতিমানসের চিদাত্মিকা আদ্যা শক্তি বটে, কিন্তু আনন্দ তার সেই ব্রহ্মযোনি—যাহতে সে জীবচেতনাকে অভিব্যক্ত করে। আবার এই আনন্দে বিধৃত রেখে অবশেষে চিন্ময় পরমস্থিতিতে আনন্দের মধ্যেই তাকে সে নিবেশিত করে। অতিমানস ঊর্ধ্বপরিণামের স্বয়ম্ভূলীলার প্রথমা সিদ্ধি হবে আনন্দঘন ব্রহ্মের প্রকাশ—বিজ্ঞানঘন-পুরুষ ফুটবেন আনন্দ-ঘনবিগ্রহ হয়ে, বিজ্ঞানঘন-সত্তার রূপায়ণ স্বভাবতই পরিণত হবে হ্লাদিনীসত্তার রূপায়ণে। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের জীবনে হ্লাদিনীশক্তির কোনও-না-কোনও বিভূতি দেখা দেবেই—অতিমানস স্বানুভবের অবিনাভূত এবং পরিতোব্যাপ্ত ব্যঞ্জনারূপে। অবিদ্যার কবল হতে প্রমুক্ত জীবের চেতনায় প্রথম ফোটে প্রশান্তির স্তব্ধতা—শাশ্বত আনন্ত্যের প্রপঞ্চোপশম নৈঃশব্দ্য। কিন্তু চিৎ-শক্তির উদয়নে আধারে আবির্ভূত সিদ্ধবীর্যের অকুণ্ঠ বিভাবনা মুক্তচেতনার এই প্রশান্তিকে রূপান্তরিত করে শাশ্বত দিব্যরতির পূর্ণকল অনুভব ও আস্বাদনের আনন্দে, শাশ্বত অনন্তস্বরূপের নিত্যোচ্ছলিত রসোদ্‌গারে। এই আনন্দ জগদানন্দরূপে বিজ্ঞানঘন চেতনায় সমবেত থাকে এবং বিজ্ঞানঘন প্রকৃতির উপচয়ে উপচিত হয়।

সাধারণত অধ্যাত্মসাধনায় আনন্দ বা রসাস্বাদকে নিকৃষ্ট এবং অচিরস্থায়ী একটা পর্বরূপে গণ্য করে ব্রহ্মনির্বাণের পরমপ্রশান্তিকেই সাধকের কাছে নিত্যস্থায়ী পরমপুরুষার্থরূপে ধরা হয়। চিদ্‌বাসিত মনের ভূমিতে একথা সত্য হতে পারে—কেননা চিন্ময় সমাপত্তির প্রথম পর্বে যে-আনন্দ সাধকের

চেতনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তার মধ্যে প্রায়ই চিৎশক্তির দ্বারা আপ্যায়িত প্রাণের খানিকটা রসাবেশ হয়তো মেশানো থাকে। সাধকের চিত্ত তখন অতর্কিত আনন্দের উচ্ছলনে উদ্বেল ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে, হৃদয় তীব্রতর সুখের অসহ্য পীড়নে বিহ্বল হয়ে পড়ে—আত্মার গভীর গহনে জাগে সে কী অনির্বচনীয় স্পর্শরতির বেদনা! এই সুদুর্লভ অনুভূতিকে চলতি-পথের ঐশ্বর্য বা উৎসর্পিণী শক্তির উল্লাস বলে স্বীকার করেও বলব—অধ্যাত্মচেতনার পরমা প্রতিষ্ঠা এতেই নয়। চিন্ময় আনন্দের তুঙ্গতম শিখরে এমনিতর কূল-ভাঙা উচ্ছ্বাস নাই, উন্মাদনা নাই। সেখানে আছে শুধু শাশ্বত সদ্‌ভাবের অচলপ্রতিষ্ঠায় নিহিত শাশ্বত আনন্দসংবিতের অমেয়-গহন অনুভব—এক শাশ্বতী প্রশান্তির আনন্দ-চিন্ময় স্তব্ধতা। শান্তি আর আনন্দে সেখানে প্রভেদ নাই। অতিমানসের দিব্যচেতনায় সকল বৈচিত্র্য ও সকল বিরোধের চরম সমাধানে শান্তি ও আনন্দের সামরস্য সেখানে সহজ হয়। সর্বাত্মভাবের উদার প্রশান্তি ও গভীর আনন্দ অতিমানস আত্মোপলব্ধির প্রথম সোপান বটে। কিন্তু এই লোকোত্তর চেতনায় সে আনন্দ আর প্রশান্তি এক অসমোর্ধ্ব রসমাধুর্যে অবিনাভূত হয়ে ফোটে এবং অনন্তস্বরূপিণী শাশ্বতী হ্লাদিনীশক্তির নিত্যোল্লাসে তার পর্যবসান ঘটে। বিজ্ঞানঘন-চেতনার যে-কোনও ভূমিতেই স্বরূপসত্তার এই চিন্ময় সহজানন্দের অনুভব মর্মগহন হতে অনায়াসে উৎসারিত হয়। শুধু তা-ই নয়, সে-আনন্দ আত্মপ্রকৃতির সকল প্রবৃত্তিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে দেহ ও প্রাণের সকল ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় বিচ্ছুরিত হয়—তখন আনন্দের প্রশাসনকে লঙ্ঘন করবার কারও সাধ্য থাকে না। এমন-কি বিজ্ঞানঘন গোত্রান্তরের প্রাক্কালেও এই সহজানন্দের উন্মেষে আধারে অপরূপ আনন্দসুষমার বাসন্ত-উৎসব ফুটতে পারে। মনের মধ্যে সে-আনন্দ উল্লসিত হয়ে ওঠে চিন্ময় অনুভব দর্শন ও বিজ্ঞানের সুতীব্র অথচ অনুচ্ছ্বসিত মাধুরীতে। হৃদয়ে তা ফোটে বিশ্বসাযুজ্য এবং বিশ্বব্যাপ্ত প্রেম ও মৈত্রীর কখনও-উদার কখনও-গহন কখনও-বা উচ্ছ্বসিত আবেগের আন্দোলনে—সর্বজীব ও সর্বভূতের অন্তর্নিহিত আনন্দের নিগূঢ় স্পর্শে চেতনা কণ্টকিত হয়। তেমনি সঙ্কল্পের প্রবেগে ও প্রাণের আকূতিতে সে-আনন্দের অনুভূতি জেগে ওঠে এক দিব্যপ্রাণের নিত্য-স্পন্দিত বীর্যোল্লাসরূপে। সর্বত্র অদ্বৈতসত্তার প্রত্যক্ষে ও স্পর্শে নিখিল ইন্দ্রিয়ের অনুত্তর পরিতর্পণ ঘটে, প্রতি বস্তুতে প্রপঞ্চোল্লাসের এক সর্বগত মাধুরী ও অন্তর্গূঢ় সৌষম্যের আস্বাদন তাদের প্রবৃত্তির সহজসুন্দর ধর্ম হয়—অথচ আমাদের মনে বিশ্বের সে-সৌন্দর্যলহরী ক্বচিৎ হয়তো অতিপ্রাকৃত অনুভবের মৃদুমন্দ একটা শিহরন জাগায়। দেহে সে-আনন্দ জাগে চিন্ময়ের তুঙ্গতা হতে নির্ঝরিত মহানন্দার নিরন্ত নির্ঝরে অমৃতরসে সঞ্জীবিত চিদ্‌ঘনবিগ্রহের শান্তরতিতে ফোটে দৈহ্যসত্তার অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুরী।

এমনি করে ত্রিপুরসুন্দরীর অবাঙ্মানসগোচর মহিমা বিজ্ঞানঘন-চেতনায় আপনাকে প্রকটিত করে প্রতি বস্তুর অন্তর্গূঢ় রূপরেখা ও প্রাণস্পন্দনের, তার বীর্যবিভূতি ও নিহিতার্থ সৌষম্যের অভিব্যঞ্জনায়। তখন এ-জগৎ যে ব্রহ্মের আনন্দরূপ—এই পরম অনুভবে চিত্ত নিত্যনন্দিত হয়।

অতিমানস-প্রকৃতির স্ফুরণে আধারে যে চিন্ময়-রূপান্তর ঘটে, এই হল তার প্রাথমিক মহাসিদ্ধির পরিচয়। কিন্তু শুধু অন্তরগহনে সৎ-চিৎ-আনন্দের পরিপূর্ণ উপচয় নয়, পুরুষের জীবনে ও কর্মেও যদি তার ষোড়শকল মহিমা ফোটাতে হয়, তাহলে আমাদের প্রাকৃত-মনের তরফ থেকে দুটি গুরুতর প্রশ্নের সমাধান হওয়া প্রয়োজন। জীবনসাধনার অংগাবিচারে মানুষের বুদ্ধি এ-দুটি প্রশ্নকে গুরুত্বপূর্ণ এমন-কি প্রমুখ একটা মর্যাদা দিয়েছে। প্রথম প্রশ্ন : বিজ্ঞানঘন-চেতনায় ব্যক্তিসত্তার স্থান আছে কি না। প্রাকৃত জীবনে ব্যক্তিসত্তার যে-ধরনের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, দিব্য-জীবনে কি তার স্থিতি ও নির্মিতির আমূল রূপান্তর ঘটবে ? দ্বিতীয় প্রশ্ন : বিজ্ঞানঘন-পুরুষের যদি ব্যক্তিত্ব থাকে, তাহলে তাঁর কৃতকর্মের দায়ও থাকবে। সে-ক্ষেত্রে বিজ্ঞানঘন-প্রকৃতিতে ধর্মবোধের স্থান কি হবে এবং তার চরম পরিণতিই-বা কি আকার ধারণ করবে ? সাধারণত আমরা বিবিক্ত অহংকেই আত্মা বলে কল্পনা করি। অতএব বিশ্বচেতনায় কি তুরীয়চেতনায় যদি অহন্তার প্রলয় ঘটে, তাহলে সেইসংগে ব্যক্তির জীবন ও কর্মেরও অবসান ঘটবে। কারণ ব্যক্তির তিরোধানে এক নৈর্ব্যক্তিক চেতনা বা বিশ্বাত্মাই অবশিষ্ট থাকতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিত্বের নিঃশেষ পরিনির্বাণে শূন্যতা ছাড়া কিছুই যখন থাকে না, তখন ব্যক্তির কর্মদায় কি ধর্মবোধের পরিণতির প্রসংগই তো সেক্ষেত্রে উঠতে পারে না।...কোনও-কোনও মতে চিন্ময় সিদ্ধপুরুষের বিনাশ হয় না—কিন্তু নিত্যশুদ্ধ নিত্য-মুক্তরূপে চিন্ময়ধামে তাঁর নিত্যবাস ঘটে। সিদ্ধিলাভের পরেও সিদ্ধপুরুষ মর্ত্যভূমিতে থাকেন। অথচ কল্পনা করা হয়, অহন্তার নির্বাণে তাঁর মধ্যে এক বৈশ্বানর চিন্ময় ব্যক্তিসত্ত্ব আবির্ভূত হয়েছে, যাকে বলতে পারি বিশ্বোত্তীর্ণ সত্তার একটা বিন্দুঘন বিভূতি মাত্র। এহতে অনুমান করা চলে বিজ্ঞানঘন বা অতিমানস পুরুষ অপুরুষবিধ পুরুষ মাত্র—তাঁর আত্মসত্তা আছে, কিন্তু ব্যক্তিসত্তা নাই। এমনিতর একাধিক সিদ্ধপুরুষ জগতে থাকতে পারেন। কিন্তু স্বরূপ এবং প্রকৃতিতে সবাই তাঁরা এক—ব্যক্তিসত্তার কোনও বৈশিষ্ট্য নাই তাঁদের মধ্যে। এক শুদ্ধ-সন্মাত্রের শূন্যতা হতে ব্যাবহারিক চৈতন্যের বৃত্তি এবং ক্রিয়া সেখানে বুদ্বুদের মত ফুটছে। আমাদের বহিশ্চেতনায় বিবিক্ত ব্যক্তিসত্ত্বের যে-বৈচিত্র্যকে আত্মভাব বলে জানি, তার কোনও আভাস সেখানে নাই। অহন্তার প্রলয়েও ব্যক্তিসত্তার স্বরূপাবস্থান সম্ভব কিনা, তার জবাবে এই হবে প্রাকৃতমনের

নৈতিমূলক সমাধান। কিন্তু অতিমানস দৃষ্টির সমাধান সম্পূর্ণ বিপরীত। অতিমানস-চেতনায় ব্যক্তি-সত্তা আর নৈর্ব্যক্তিক-সত্তায় বিরোধ নাই—দুটিই সেখানে এক অখন্ডতত্ত্বের অন্যোন্যসম্পৃক্ত বিভাবমাত্র। এই তত্ত্বভাব পুরুষেই আছে—অহন্তাতে নাই। স্বরূপপ্রকৃতিতে সে-পুরুষ বিশ্বাত্মক এবং নৈর্ব্যক্তিক হয়েও আত্মপ্রকৃতি হতে ব্যক্তিসত্ত্বের বিভূতি গড়ে তোলেন—যা প্রাকৃতপরিণামের ভূমিকায় ফোটায় তাঁর আত্মভাবনার বৈচিত্র্য।

অপুরুষবিধতা স্বরূপত অনাদি বিশ্বাত্মক একটা ভাব। তাকে বলতে পারি শুধু একটা সত্তা শক্তি বা চৈতন্য—যা বহুধা তার আত্মভাবের তপঃশক্তিকে রূপায়িত করে চলেছে। তার তপঃশক্তি বীর্য সংবেগ বা গুণের যে-কোনও ব্যাকৃতি সামান্যাত্মক নৈর্ব্যক্তিক ও সর্বগত হলেও জীবব্যক্তি তাকে নিজের ব্যক্তিসত্তার উপাদানরূপেই গ্রহণ করে। অনাদি নির্বিশেষ তত্ত্বভাবের দিক থেকে বলতে পারি—অপুরুষবিধতা পুরুষেরই স্বরূপধাতুর শুদ্ধ ব্যঞ্জনা মাত্র। কিন্তু সক্রিয় সবিশেষ তত্ত্বভাবের দিক থেকে দেখলে বুঝি, ওই অপুরুষবিধতাই নিজের অখন্ডশক্তিকে বহুধাবিকল্পিত করে খন্ডশক্তির অন্যোন্যসমাহারে ব্যক্তিসত্ত্বের বিভূতি গড়ে তোলে। প্রেম প্রেমিকের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, শৌর্যেই যোদ্ধার স্বভাব ফুটে ওঠে। কিন্তু স্বরূপত প্রেম কি শৌর্য বিশ্বগত একটা নৈর্ব্যক্তিক শক্তি অথবা মহাশক্তির লীলাবিভূতি—চিৎপুরুষেরই বিশ্বভাবন সত্তা ও প্রকৃতির বীর্য তারা। এই অপুরুষবিধতাকে আত্মপ্রকৃতিরূপে নিজের মধ্যে ধারণ করে আছেন যিনি, তিনিই পুরুষ। সেই পুরুষই 'প্রেমিক' বা 'যোদ্ধা'। পুরুষের পুরুষবিধতা বা ব্যক্তিসত্ত্ব তাঁর আত্মপ্রকৃতিগত স্থিতি ও কৃতির স্ফুরণ মাত্র। কিন্তু আদি-অন্ত বিচার করলে এই স্ফুরণকেও তিনি তাঁর স্বয়ম্ভূ স্বরূপসত্তার মহিমায় ছাপিয়ে আছেন। ব্যক্তিসত্ত্বের স্ফুরণে তাঁর প্রকৃতি-স্থ সিদ্ধসত্তাকে তিনি প্রকট করেন মাত্র। জীবব্যক্তির সীমিত বিগ্রহে তাই দেখি পুরুষের অপুরুষবিধ সত্তার পুরুষবিধ বিভূতি অর্থাৎ তার আত্ম-ভাবনার একটা বিশিষ্ট প্রকাশ—যা বিসৃষ্টির লীলায় তাকে সার্থক আত্ম-রূপায়ণের উপাদান যোগায়। অসীম অরূপ স্বরূপে তিনি স্বরূপপুরুষ মাত্র এবং তা-ই তাঁর তত্ত্বরূপ। সেখানে তিনি বিভূতিপুরুষ নন—অন্তহীন সর্বগত পুরুষভাবনার তিনি বীজাধার। চিদ্‌ঘন আদিপুরুষরূপে পুরুষভাবনার প্রত্যেকটি বীজে তিনি তাঁর স্বকল্পিত বৈশিষ্ট্যের সংবেগ আহিত করেন এবং তাইতে সৃষ্টিলীলায় বহুর প্রত্যেকে এক দিব্য-পুরুষেরই আত্মস্বরূপের অদ্বিতীয় বিভাবনা ফোটে। শাশ্বত অমূর্ত দিব্য-পুরুষ আপনাকে প্রকটিত করলেন সত্তার চৈতন্যে ও আনন্দে—প্রজ্ঞা বিদ্যা প্রীতি ও কান্তিতে। তাঁর এইসব সর্বগত নৈর্ব্যক্তিক আত্মবিভূতিকে আমরা তাঁর স্বরূপপ্রকৃতি ভাবতে পারি—বলতে পারি ব্রহ্ম প্রেমস্বরূপ, ব্রহ্ম প্রজ্ঞাস্বরূপ অথবা ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ কি

ঋতস্বরূপ। কিন্তু ব্রহ্ম তো শুধু অপুরুষবিধ ভাবমাত্র নন, কিংবা ভাব বা গুণের অব্যক্ত নিষ্কর্ষ নন। তিনি যে আবার পুরুষবিধ—যুগপৎ বিশ্বোত্তীর্ণ বিশ্বাত্মক ও জীবভূতও যে তিনি। এই দৃষ্টিতে দেখলে নৈর্ব্যক্তিকতা ও ব্যক্তি-ভাবের সহভাব বা একীভাবকে কোনমতেই মনে হয় না স্বতোবিরুদ্ধ অসম্ভব কি অসঙ্গত। যিনি অপুরুষবিধ, তিনি পুরুষবিধ হয়ে প্রকট হয়েছেন। তাঁর দুটি বিভাবই অন্যোন্যভূত অন্যোন্যসঞ্জীবিত এবং অন্যোন্যবিগলিত—অথচ কি করে যেন তারা একই তত্ত্বভাবের দুটি অন্ত দুটি ধারা বা এপিঠ-ওপিঠ-রূপে দেখা দেয়। বিজ্ঞানঘন-পুরুষ দিব্য-পুরুষের আত্মভূত, অতএব তাঁর মধ্যে অনায়াসে অস্তিভাবের এই অনির্বচনীয় রহস্যরূপ ফুটে ওঠে।

বিজ্ঞানঘনবিগ্রহ অতিমানবকে চিন্ময়-পুরুষ বলতে পারি বটে, কিন্তু তবু তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বের একটা নির্দিষ্ট ছক কল্পনা করতে পারি না। কারণ তাঁর মধ্যে বিশ্বাত্মক ও বিশ্বোত্তীর্ণ স্বরূপের চিন্ময় ব্যঞ্জনা নিত্যপ্রকট রয়েছে বলে কতগুলি নির্দিষ্ট ধর্মের একটা স্থাণু সমাহার বা চারিত্রের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকে সীমিত করা সম্ভব নয়। অথচ তাঁর সত্তা যে বন্ধনহীন নৈর্ব্যক্তিকতার লীলাবিভূতিরূপে ব্যক্তিবিগ্রহের যেমন-খুশি ঢেউ তুলে চলেছে কালের প্রবাহে, তাও নয়। সত্তার গভীরে কোনও কেন্দ্রচেতনায় যাদের পৌরুষেয়-বোধ সংহত হয়নি, অতএব সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসের প্ররোচনায় যাদের ব্যক্তিসত্ত্ব বিক্ষিপ্ত হয়ে বহুরূপীর আকার ধারণ করে, তাদের পক্ষে অমনতর একটা অব্যবস্থিততা অসম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞানঘন-চেতনায় আছে বৃহৎসামের ছন্দ—আছে সুপ্রবুদ্ধ আত্মবিদ্যা ও আত্ম-ঈশনার বীর্য। সুতরাং তার মধ্যে কোথাও ছন্দোভঙ্গ ঘটতে পারে না। ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রের মৌলিক উপাদান কি, তা নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। কারও মতে, কতগুলি সুনিরূপিত ধর্মের একটা নির্দিষ্ট কাঠামোতে পুরুষের স্বরূপশক্তির যে-প্রকাশ, তা-ই হল ব্যক্তিত্ব। আবার কেউ-কেউ ব্যক্তিত্ব আর চারিত্রে ভেদ কল্পনা করে বলেন—ব্যক্তিত্ব হল পুরুষের আত্মরূপায়ণের জঙ্গম দিক, বাইরের অভিঘাতে যার স্পর্শাতুর চেতনায় নিত্য নতুনের সাড়া জাগে। আর চারিত্র হল তার প্রকৃতি-নিরূপিত অন্তর্নিহিত স্থাণুরূপটি। কিন্তু এমনি করে স্বভাবের স্থাণুত্ব বা জঙ্গমত্ব দিয়ে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয় করা নিরাপদ নয়। কারণ সকল মানুষের মধ্যেই দুটি বিভাব আছে। একটি তার সত্তা বা স্বভাবের জঙ্গম দিক, যা তার ব্যক্তিসত্ত্বের অব্যক্ত অথচ সীমিত উপাদান; আরেকটি ওই জঙ্গমধর্ম হতে আবির্ভূত ব্যক্তিসত্ত্বের একটা ব্যক্তবিগ্রহ। এই ব্যক্তবিগ্রহ কখনও আড়ষ্ট-কঠিন হয়, আবার কখনও তার মধ্যে নিত্য নবায়ন ও পুষ্টির অনুকূল একটা নমনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রেও অব্যাকৃত জঙ্গম-ধর্মের ভাণ্ডার হতেই রূপায়ণের উপাদান সংগ্রহ করতে হয়। প্রায়ই এই

রূপায়ণ ব্যক্তিসত্ত্বের কাঠামোর পরিবর্তন সম্প্রসারণ বা নবীকরণমাত্র। অতএব তার মধ্যে সাধারণত প্রাক্তন বিগ্রহের উচ্ছেদ করে একটা নতুন বিগ্রহ স্থাপন করবার প্রচেষ্টা দেখা যায় না—যদিও অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত সংযোগবশত ব্যক্তিত্বের রূপান্তরও অসম্ভব নয়। কিন্তু স্বভাবের এই স্থাণু ও জঙ্গম বিভাব ছাড়াও ব্যক্তির রূপায়ণে আছে গুহাহিত পুরুষের অন্তর্গূঢ় প্রেরণা। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বস্তুত তাঁর আত্মরূপায়ণ মাত্র। যুগযুগান্তর ধরে তাঁর যে সম্ভূতির নাট্যলীলা, তার মধ্যে এ-জীবনের ব্যক্তিসত্তা একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা শুধু। কিন্তু স্বরূপপুরুষ বিভূতিপুরুষের চাইতে বৃহৎ—তাই কখনও-কখনও তাঁর অন্তঃশীল বৃহত্ত্ব বাইরের আয়তনকে ছাপিয়ে ওঠে। তার ফলে পুরুষের স্বমহিমার একটা অভূতপূর্ব প্রকাশ ঘটে—যাকে নিরূপিত ধর্মের ছক দিয়ে, নিখুঁত রূপরেখার লিখন দিয়ে, একটা স্বাভাবিক স্থায়িভাবের সংজ্ঞা দিয়ে অথবা রূপায়ণের কোনও বৈশিষ্ট্য দিয়ে পরিচিত করবার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। অথচ তাকে অগ্রাহ্য অব্যাকৃত কুহেলিকার একটা চঞ্চল মায়াও বলতে পারি না। তার স্বরূপকে চিনতে না পারলেও তার ক্রিয়ামুদ্রার একটা বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়, অন্তরের শুদ্ধবোধদ্বারা তার অনুভব ও অনুবর্তনও করা চলে—যদিও বচন দিয়ে তার অভিজ্ঞানের স্বরূপ-রচন হয় না। বস্তুত এধরনের চিন্ময় প্রকাশ সন্ধিনীশক্তির একটা ব্যঞ্জনামাত্র—বিগ্রহ নয়। প্রাকৃত জীবের সীমিত ব্যক্তিসত্ত্বকে তার স্বভাবধর্মের বৈশিষ্ট্য দিয়ে বোঝা যায়—যার ছাপ তার ভাবে কর্মে ও জীবনে, তার বাহ্যব্যাকৃতি ও আত্মরূপায়ণের ঐকান্তিক ভঙ্গিমায় মুদ্রিত হয়ে আছে। তার মধ্যে অব্যক্ত বলে যেটুকু আমাদের নজর এড়িয়ে যায়, সেটুকুতেও ব্যক্তির সামান্য পরিচয়গ্রহণে কোনও বাধা হয় না। কেননা প্রায়ই অলক্ষিত বিভাবটি হয়তো ব্যক্তিসত্ত্বের একটা অব্যাকৃত বাষ্পতরল উপাদানমাত্র—এখনও যা রূপায়ণের কটাহে ফুটছে, কিন্তু ব্যক্তবিগ্রহের আকারে দানা বাঁধবার অবকাশ পায়নি। কিন্তু অ-প্রাকৃত পুরুষের গুহাহিত স্বরূপ-শক্তি যখন উপচে পড়ে, তার অন্তর্গূঢ় দেববীর্যকে ব্যাবহারিক জীবনের বহিরঙ্গনেও উথলে তোলে, তখন প্রাকৃত ব্যক্তিত্বের এই মানদণ্ডে তাঁর পৌরুষেয় বিভূতির ষড়ৈশ্বর্যের পরিমাপ হয় না। পুরুষের সে-আত্ম-সম্ভূতিকে আমরা অনুভব করি এক চিন্ময় মহাজ্যোতির, এক বিপুল সামর্থ্য ও তপোবিভূতির 'অর্ণব সমুদ্র'রূপে—আমাদের চেতনা যার গুণ-ক্রিয়ার অবন্ধন তরঙ্গোচ্ছ্বাসকে তলিয়ে বুঝতে পারে, কিন্তু তার স্বরূপকে নিরূপিত করতে পারে না। অথচ সেখানেও চেতনায় ব্যক্তিসত্তার একটা আভাস, এক মহাশক্তিমান পুরুষের অনতিবর্তনীয় প্রত্যয় জাগে। মনে হয়, এ যেন অনুত্তর অনুপম মহাবীর্যাধার একটা-কিছু—এ তো জীবভাব নয়, এ যে অনির্বচনীয় অথচ বুদ্ধিগ্রাহ্য চিদ্‌ঘনবিগ্রহ দিব্য পুরুষের বিদ্যোতনা। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের

ব্যক্তিভাবনায় অন্তরপুরুষ এমনি করে তাঁর স্বয়ংসংবৃত্ত মহিমাকে অনাবৃত করেন—বাইরের আধারে আর অন্তরের গহনে তাঁর একরস স্বানুভবের দীপ্তি সমান উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে। প্রাকৃত জীবের মত তাঁর ব্যক্তিসত্ত্ব অর্ধ-আবরিত নয়, গুহাহিত পুরুষের অনতিস্ফুট অভিব্যক্তিমাত্র নয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব সমুদ্রবৎ—সমুদ্রের তরঙ্গ সে নয় শুধু। অমূর্ত দিব্য-পুরুষেরই স্বপ্রকাশ মূর্তবিগ্রহ তিনি, অতএব প্রাকৃত ব্যক্তিত্বের কৃত্রিম মুখোসে নিজেকে প্রকাশ করবার তাঁর প্রয়োজন হয় না।

বিজ্ঞানঘন-পুরুষের স্বভাব তাহলে এই। এক অনন্ত বিরাট্-পুরুষ তাঁর শাশ্বত আত্মভাবকে প্রকাশ করছেন কালাবচ্ছিন্ন ও জীবোপাধিক আত্ম-রূপায়ণের ব্যঞ্জনাশক্তির সহায়ে ব্যক্তবিগ্রহের আকারে। অন্তরের শুদ্ধবোধে আমরা পাই তাঁর প্রকাশবান রূপের পরিচয়, আর অবিদ্যাচ্ছন্ন মন দিয়ে দেখি তাঁর আভাসরূপটি শুধু। কিন্তু তাঁর জীবপ্রকৃতির অভিব্যক্তিতে ফুটবে তাঁর বিশ্বতোমুখী পূর্ণাহন্তার একটা দ্যোতনামাত্র—তার সবখানি নয়। সে-দ্যোতনা কখনও হবে অকম্পিত তুলির টানে সুস্পষ্ট রেখায় আঁকা, কখনও-বা তার মধ্যে বহুভঙ্গিম পুরুরূপের সুষম বৈচিত্র্য থাকবে। কিন্তু ওই জীব-প্রকৃতির অন্তরাল হতেই আবার তাঁর অন্তহীন অনির্বাচ্য পূর্ণাহন্তার বুদ্ধি-গ্রাহ্য ব্যঞ্জনা বিচ্ছুরিত হবে। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের চেতনাও হবে আত্ম-রূপায়ণের অফুরন্ত উল্লাসে স্ফুরিত অনন্ত চেতনা—যার মধ্যে রয়েছে অবন্ধন আনন্ত্য ও বিশ্বাত্মভাবের অটুট সংবিৎ। সে-সংবিতের বীর্য ও ব্যঞ্জনা তাঁর খণ্ডভাবনারও রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অনুবিদ্ধ হবে—অথচ তাকে ছাপিয়ে ক্ষণান্তরের আত্মভাবনায় নিজেকে স্বচ্ছন্দে স্ফুরিত করতেও তার বাধবে না। তবুও চেতনার এই স্বাচ্ছন্দ্যকে একটা ছন্দোহীন জঙ্গমধর্মের অবোধ্য বিলাস বলব না—তাকে বলব আত্মরূপায়ণের ছন্দে স্বরূপশক্তির অন্তর্নিহিত সত্যের বিভাবনা। সুতরাং অনন্তের যে-কোনও বিসৃষ্টির মূলে যে সৌষম্যের স্বাভাবিক প্রেতি আছে, এখানেও তার অসদ্ভাব নাই।

বিজ্ঞানঘন-পুরুষের সকল ক্রিয়া-মুদ্রাই তাঁর বিজ্ঞানঘন ব্যক্তিসত্ত্বের সহজ ও স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি। অতএব তার মধ্যে ধর্মাধর্মবোধের বা ভালমন্দের কোনও দ্বন্দ্ব কি সমস্যার কথা ওঠে না। তাঁর জীবনে সমস্যার কোনও অবকাশই নাই, কেননা সমস্যা দেখা দেয় একমাত্র অবিদ্যাচ্ছন্ন জিজ্ঞাসু মনের মধ্যে। যাঁর চেতনায় স্বয়ম্ভূবিদ্যার নিত্যস্ফুরণ এবং তারই প্রেরণায় ক্রিয়ার স্বতঃ-উৎসারণ, চিন্ময় স্বপ্রকাশ স্বরূপসত্যের সিদ্ধসত্তা যাঁর কর্মের প্রবর্তিকা, তাঁর মধ্যে সমস্যার স্থান কোথায়? চিন্ময় সর্বগত স্বরূপসত্য যেখানে আপন স্বভাবের মুক্তচ্ছন্দে এবং চিৎশক্তির স্বতঃস্ফুরণে আপনাকে অনায়াসে ফুটিয়ে তুলছে, যেখানে সত্যের অন্তহীন বিভাবনাতেও সর্বত্র রয়েছে এক স্বরূপ-

সত্যের অদ্বৈতভাবসম্পুটিত পরম প্রত্যয়—সেখানে সত্যের অভিব্যক্তি হবে সর্বগত শিবস্বরূপের অভিব্যক্তি। সেখানে আপন স্বভাবের মুক্তচ্ছন্দে এবং চিৎশক্তির স্বতঃস্ফুরণে এক শিবময় সত্তাই স্ফুরিত হবে—সর্বগত এবং সার্বজনীন এক কল্যাণশক্তিই বিচ্ছুরিত হবে কল্যাণবৃত্তির অনন্তবিচিত্র বর্ণচ্ছটায়। শাশ্বত স্বয়ম্ভাবের নিরঞ্জনতা বিজ্ঞানঘন-পুরুষের সকল প্রবৃত্তিকে অনুষিক্ত করবে এবং তার স্পর্শে তাঁর জগতের সব-কিছুই হবে স্ফটিকস্বচ্ছ এবং অপহতপাপ্মা। তাঁর অবিদ্যানির্মুক্ত প্রবৃত্তিতে অনৃতসংকল্প বা প্রমাদের প্ররোচনা থাকবে না—বিবিক্ত অহমিকার অন্ধতা ও বিরুদ্ধবুদ্ধির দরুন নিজের কি পরের অনিষ্টসাধনের সম্ভাবনা থাকবে না। নিজের কি পরের দেহ-প্রাণ-মন-আত্মার অসুষ্ঠু উপযোগদ্বারা জগতে অনর্থের সৃষ্টি করা একান্তই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ হবে। পাপ-পুণ্য শুভাশুভের ঊর্ধ্বে ওঠা বৈদান্তিক মুক্তিসাধনার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। মুক্তির অর্থ যদি হয় চিন্ময় আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, তাহলে সে-ভূমিতে সমস্ত কর্ম হবে ওই উত্তর-সত্যের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মরূপায়ণ, অতএব স্বভাবত সেখানে অবিদ্যাকল্পিত পাপ-পুণ্যাদির কোনও দ্বন্দ্ব থাকবে না। আধারের অপূর্ণতাহেতু আমাদের বৃত্তিসমূহে যেমন একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাকে অতিক্রম করে সদাচারের একটা আদর্শভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়াস। ধর্মশাস্ত্রের বিধান-মতে এই প্রয়াসের অনুকূল কর্মকে আমরা বলি পুণ্য, আর বিপরীত কর্মকে বলি পাপ। ধর্মবুদ্ধির প্রেরণায় আমরা কল্পনা করি প্রেমের বিধান, ন্যায়ের বিধান, সত্যের বিধান—এমনি কত-কি বিধান, যাদের মেনে চলা কঠিন, খাপ-খাইয়ে চলা আরও কঠিন। কিন্তু চিন্ময় সিদ্ধপ্রকৃতির ধর্মই যদি হয় সর্বাত্ম-ভাব বা সত্যের সঙ্গে তাদাত্ম্য, তাহলে প্রেম কি সত্য সম্পর্কে একটা বিধান জারি করবার প্রয়োজন সেখানে আছে কি? আমাদের অপরা প্রকৃতির 'পরে বিধিনিষেধের শাসন অপরিহার্য হয়েছে এইজন্য যে, মানুষের মধ্যে ক্রিয়া করছে বিবিক্তবোধ বৈষম্য বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের একটা বিরুদ্ধশক্তি, অপরকে শত্রু কল্পনা করবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। অবিদ্যাজনিত বৃত্রশক্তির কবলিত যে-প্রকৃতি, তার মধ্যে কল্যাণপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস হতে ধর্মানুশাসনের উদ্ভব। কিন্তু যে পরমাপ্রকৃতিতে সমস্ত পরিণাম চিন্ময় স্বরূপসত্তার ঋতময় স্ফুরণ, তার মধ্যে পুরুষার্থ এবং তার সাধনা কিংবা পাপ-পুণ্যের কোনও দ্বন্দ্ব থাকতেই পারে না। প্রেম সত্য ও ন্যায়ের প্রদীপ্ত বীর্য নিশ্চয়ই সেখানে আছে—কিন্তু আছে আত্মপ্রকৃতির স্বরূপধাতুরূপেই, মনঃকল্পিত কোনও বিধানরূপে নয়। তাই সমগ্র আধারের হিরণ্ময় অভঙ্গপরিণামহেতু কর্ম-মাত্রেই সেখানে ধর্ম হতে প্রজাত এবং ধর্মময়। এমনি করে স্বরূপপ্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, অদ্বৈতভাবনার চিন্ময়সত্যে নিরূঢ় হওয়া—এই হল চিন্ময়-

পুরুষের মুক্তির সাধনা। বিজ্ঞানঘন-পরিণাম এই স্বরূপে ফিরে যাবার সিদ্ধিকেই নিখুঁতভাবে সহজ এবং বীর্যময় করে। একবার এ-সিদ্ধি আয়ত্ত হলে মনঃকল্পিত ধর্মের শাসন সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হয়। কেননা যেখানে প্রমুক্তচেতনার ঋতভৃৎ স্ব-ধর্মের স্ফুরণ হয়েছে, সেখানে কল্পিত আচার-ধর্মের স্থান হবে কেমন করে? বিজ্ঞানীর সমস্ত প্রবৃত্তি তাই তাঁর চিন্ময় স্ব-ভাবের ধর্মময় স্বতঃস্ফুরণ ছাড়া আর-কিছুই নয়।

অবিদ্যাচ্ছন্ন মনোময় জীবন আর বিজ্ঞানঘন প্রকৃতির স্ফুরণে প্রভাস্বর দিব্য-জীবনের মধ্যে যে গভীর পার্থক্য, তার স্বরূপ এইখানে ধরা পড়ে। নিখিল সংবেদনের অভঙ্গসমাহারে বিজ্ঞানঘন-পুরুষ পূর্ণপ্রজ্ঞ—স্বরূপসত্তার পূর্ণসত্য তাঁর অধিগত। সেই সত্যসংবিৎকে তিনি নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যের ছন্দে চিৎস্পন্দনে রূপায়িত করছেন—তাই কোনও কল্পিত বিধিনিষেধের দাস তিনি নন, অথচ তাঁর জীবনে ঋতম্ভরা বিশ্ববিভূতির সকল বিধান পূর্ণসার্থক হয়ে উঠছে। আর অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাকৃত জীবনে রয়েছে খণ্ডিতচেতনার যত দ্বিধা। স্বরূপসত্যের এষণা তার আছে, কিন্তু তার সম্যক উপলব্ধি নাই—তাই অসম্পূর্ণ দর্শনের কল্পিত বিধান দিয়ে নিরন্তর সে ছকে-বাঁধা একটা জীবনাদর্শ গড়তে চাইছে। সত্যের বিধান পরমার্থসতের ঋতময় স্পন্দবিভূতি; তার মধ্যে স্বরূপশক্তির সমুল্লাসে স্বয়ম্ভূসত্যের স্বতোনিহিত পরিস্পন্দের উচ্ছলন আছে। কখনও সে-বিধান অচেতন, যন্ত্রবৎ আপাতমূঢ় তার আবর্তন—জড়প্রকৃতির বিধানে আমরা তার পরিচয় বা আভাস পাই। আবার কখনও-বা সে-বিধান চিৎশক্তির আত্মস্বাতন্ত্র্যের বিধান, গুহাহিত পুরুষের শাশ্বত ঋতম্ভরা প্রবর্তনার দ্বারা বিধৃত। অন্তরপুরুষ তাঁর মর্মসত্যের সম্ভাবিত স্বতঃপ্রকাশের সকল ভঙ্গিমাই জানেন—অখণ্ডদৃষ্টি দিয়ে সমগ্রভাবে যেমন জানেন, তেমনি প্রতিমুহূর্তের ভাবনায় খুঁটিয়ে জানেন সেই সত্যের ভূতার্থ-সাধনার সকল পর্ব। চিন্ময় বিধানের স্বরূপ এই। চিৎসত্তার নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যে, নিজেরই অনতিবর্তনীয় স্বভাবস্পন্দের ছন্দে এক স্বয়ম্ভূ প্রকৃতির আত্মপরিণামের স্ব-প্রতিষ্ঠ স্ব-কৃৎ বিলাস—এই হল বিজ্ঞানঘনা পরমা প্রকৃতির নিত্যলীলার পরিচিতি।

সত্তার চরমশিখরে আছেন নির্বিশেষ ব্রহ্ম—আনন্ত্যের স্বাতন্ত্র্যে নিরঙ্কুশ। নির্বিশেষ সত্য তাঁর স্বরূপ, কিন্তু সেই সত্যেও আছে তাঁর সন্ধিনীশক্তির বিভূতিবীর্য। পরমা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত চিৎপুরুষেও ফুটে ওঠে এই দুটি বিভাব। তাঁর জীবনের সকল প্রবৃত্ত পরমাত্মভূত পরমেশ্বরের পরমা প্রকৃতির ঋতম্ভরা প্রবৃত্তি। তার মধ্যে ব্রহ্মের কূটস্থ সদ্ভাবের সত্য আর সে-সত্যের সঙ্গে অবিনাভূত ঈশ্বরের সত্যসঙ্কল্পের সত্য—এই দ্বিদল সত্যই পরস্পর জড়িয়ে আছে। প্রত্যেক

বিজ্ঞানঘন-পুরুষের জীবনে তাঁর পরমা প্রকৃতির স্বধর্মানুযায়ী এই যুগল-সত্যের প্রকাশ। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের জীবন্মুক্ত স্বরূপের তাৎপর্য তাঁর চেতনার প্রমুক্তিতে, তাঁর স্বরূপসত্যের সার্থক বিভাবনায়, তাঁর স্বরূপশক্তির সার্থক উচ্ছলনে; এই তাঁর জীবনযজ্ঞ। কিন্তু তাঁর আত্মপ্রকৃতির এ-যজ্ঞসাধনা সর্বতোভাবে অনুসরণ করে চলেছে তাঁর আধারে প্রকটিত ব্রহ্মের ঋত-চিৎকে, সর্বাত্মভূত পরমেশ্বরের কবিক্রতুকে। এক বা একাধিক বিজ্ঞানঘন বিগ্রহে, কিংবা যে চিন্ময় সর্বযোনিতে তাঁরা বিধৃত তার মধ্যে—সর্বত্রই অখণ্ড হয়ে অনুস্যূত রয়েছে সর্বাবগাহী এই কবিক্রতু। প্রতি বিজ্ঞানঘন-পুরুষে এই ক্রতু জেগে আছে তাঁর সংকল্পের সঙ্গে একীভূত হয়ে। আবার সেইসঙ্গে তাঁর চেতনায় জাগছে আধারে একই কবিক্রতুর, একই শিব-শক্তির বিচিত্র বিলাসের অপরোক্ষ অনুভব। যে বিজ্ঞানঘন সংবিৎ ও সংকল্প এমনি করে বহু বিজ্ঞানঘন বিগ্রহের চেতনায় আপন তাদাত্ম্যকে অনুভব করছে, আপন সহস্রদল বৈচিত্র্যের সংহত তাৎপর্যকে অনুভব করছে নিজের সমগ্রতার ছন্দঃসুষমায়, তার মধ্যে নিশ্চয় রণিত হয়ে উঠেছে বৃহৎসামের অপূর্ব সুরসংগতি এবং তার অনুরণনে নিখিল ব্যূহেরও প্রবৃত্তিতে জেগেছে অন্যোন্যসংগত ঐকতানের সৌষম্য। সেইসঙ্গে ব্যষ্টি আধারের তন্ত্রীতেও সমস্ত শক্তি ও বৃত্তির সমন্বয়ে বেজে উঠেছে এক অদ্বৈত-সুষম সুরসংগতির ঝংকার। আধারের সকল শক্তিই নিজেকে ফোটাতে চায়--অভিব্যক্তির চরমে চায় আত্মসম্পূর্তির পরমকোটিতে পৌঁছতে। বিজ্ঞানঘন বিগ্রহে তাদের সে-এষণা সার্থক হয় পরমাত্মভাবের সমাপত্তিতে। সেইখানে তারা খুঁজে পায় তাদের চরম নিয়তি, তাদের সকল আত্মবিরোধের পর্যবসান—অতিমানস-বিজ্ঞানের স্বতঃপরিণামী স্বাতন্ত্র্যের এক সর্বদর্শী ও সর্বসমন্বয়ী বীর্যে তারা বাঁধা পড়ে একাত্মবোধের পরম সৌষম্যে, তাদের সমূহ আত্মরূপায়ণের সাধনায় দেখা দেয় অন্যোন্যসংগতির উদার ছন্দ। আত্মসংবিতের প্রকাশ স্বতোবিবিক্ত হলেই আত্ম-অনাত্ম-বিবেকের কথা ওঠে—ভূতে-ভূতে তখন দেখা দেয় অন্যোন্যবিরোধ। এমন-কি তখন সর্বাত্মভূত সত্তার সঙ্গে বিশিষ্ট ভূতচেতনার আপাতবিরোধও দেখা দিতে পারে—ভূতসত্তা বিদ্রোহও ঘোষণা করতে পারে বিশ্বের মঞ্চে কোনও পরমসত্যের প্রকাশের বিরুদ্ধে। ঠিক এই ব্যাপারটি ঘটে অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তিচেতনার বেলাতে, কেননা আপন বিবিক্ত ব্যক্তিভাবনার 'পরে দাঁড়িয়ে আরসবাইকে সে অনাত্মীয়ের কোঠায় ঠেলে দেয়। বিশ্বে অথবা ব্যক্তিতে সত্তার সত্য শক্তি গুণ বীর্য বা বিভাব যখন বিভিন্নমুখী হয়ে কাজ করে, তখন সর্বত্র দেখা দেয় এমনিতর একটা সংঘর্ষ ও বৈষম্যের বিক্ষোভ। জগতের সর্বত্র কেবল দ্বন্দ্ব--দ্বন্দ্ব আমাদের নিজের মধ্যে, দ্বন্দ্ব আমাদের পরিবেশের সঙ্গে। মানুষের বেসুরা জীবনে, তার অবিদ্যাচ্ছন্ন বিবিক্ত চেতনায় এই দ্বন্দ্ব-কোলাহলই বুঝি স্বভাবের অপরি-

হার্য নিয়তি। কিন্তু বিজ্ঞানঘন-চেতনায় ছন্দোবৈষম্য কোথাও নাই—কেননা সেখানে ব্যষ্টি প্রমাতা যেমন আপন অখণ্ড আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎ পান, তেমনি সমষ্টি প্রমাতাও নিজেদের স্বরূপসত্যের সঙ্গে সবার বিভিন্ন চিৎস্পন্দের একটা অপূর্ব সুরসঙ্গতি অনুভব করেন—এক সর্বাধার লোকোত্তরের চিত্র-বিভূতিরূপে। বিজ্ঞানঘন জীবনে তাই প্রমাতার স্ব-তন্ত্র আত্মরূপায়ণের সঙ্গে বিশ্বের পরমসত্যের স্বভাবছন্দের প্রতি তাঁর স্বচ্ছন্দ আনুগত্যের এতটুকুও বিরোধ নাই। ব্যষ্টির ছন্দ তাঁর চেতনায় একই সত্যের অন্যোন্য-সম্পৃক্ত দুটি বিভাবমাত্র। এক পরমা প্রকৃতির উদার পরিবেশে তাঁর স্বরূপ-সত্যের লোকোত্তর বিভূতি আত্মার সত্য আর বিশ্বের সত্যের অখণ্ড সামরস্যে নিজেকে স্ফুরিত করছে—এই অনুভব তাঁর মধ্যে নিত্যজাগ্রত। তাঁর জগৎ একই অখণ্ডসত্তার বহুবিচিত্র শক্তিলীলার সমাবেশে সৃষ্ট অনির্বচনীয় সুর-সঙ্গতির জগৎ। আমাদের মনশ্চেতনা আপাতিক ছন্দোবৈষম্যের দরুন যেখানে সংঘর্ষের সূচনা দেখতে পায়, তাঁর চিন্ময় দৃষ্টি সেখানে সৃষ্টি করে অন্যোন্যসঙ্গতির স্বাভাবিক সৌষম্য। অকারণ প্রত্যেক বৃত্তির স্বরূপ-সত্যের সঙ্গে তার ব্যাবহারিক সত্যের যে-সঙ্গতি, বিজ্ঞানঘন পরমা প্রকৃতিতে তা স্বপ্রতিষ্ঠ এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

অতএব অতিমানস বিজ্ঞানঘন প্রকৃতিতে প্রাকৃত-মনের আড়ষ্টতা বা বিধি-বিধানের বজ্র-আঁটুনি থাকবে না। মনের দৃষ্টি একচোখা—তার কাছে জীবন সত্যের একটিমাত্র রূপ। তাই সে জীবনকে আদর্শবাদের খোপে পোরে, তার 'পরে বাঁধাধরা একটা রীতের বোঝা চাপায়—নির্দিষ্ট একটা তন্ত্র বা ছকের আনুগত্য ছাড়া কল্যাণের পথ সে দেখতে পায় না। কিন্তু মনঃকল্পিত সংকীর্ণ কাঠামোর মধ্যে জীবনের সমগ্র সত্যকে তো কোনোমতেই ধরানো যায় না। বিশ্বজীবনের প্রৈষাকে কিংবা ঊর্ধ্বপরিণামের প্রেতিকে মনের আড়ষ্ট আদর্শবাদ স্বচ্ছন্দ হয়ে স্বীকার করবে কেমন করে? নিজের বেড়াজাল পার হতে গেলেই হয় তাকে মরতে হবে, নয়তো ছন্নছাড়া হতে হবে—সমস্ত অন্তঃ-প্রকৃতিতে সৃষ্টি করতে হবে তুমুল একটা বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ। মনের দৃষ্টি এবং সামর্থ্য স্বভাবত সঙ্কুচিত বলেই জীবনকে বিধি-নিষেধের চাপে আড়ষ্ট করে রাখা ছাড়া তার উপায় নাই। কিন্তু বিজ্ঞানঘন-পুরুষ জীবনের সবখানি তুলে ধরেন লোকোত্তর মহিমার জ্যোতির্লোকে। তাঁর জীবন পূর্ণকল, এক বৃহৎ সত্যের সহস্রদল স্বতঃস্ফুরণে হিরণ্ময়—সে-সত্য এক হয়েও বহুধা বিচিত্র, তার মধ্যে ঐক্যের আনন্ত্য বৈচিত্র্যের আনন্ত্যের সঙ্গে যুগনদ্ধ হয়ে আছে। অতএব বিজ্ঞানঘন-পুরুষের জ্ঞান ও কর্ম অনন্ত স্বাতন্ত্র্যের সাবলীল ঔদার্যে সমুচ্ছল। তাঁর জ্ঞান জ্ঞেয়বস্তুকে সমগ্রদর্শনের উদার ভূমিকায় গ্রহণ করে, বস্তুর অখণ্ড মর্মসত্যে বিশ্বতোমুখ সমগ্র সত্যের যে-বীজভাব নিহিত

রয়েছে, শুধু তার উপাধিকেই সে স্বীকার করে—মনের কোনও প্রাক্তন বিকল্প সংস্কার কি প্রতীকের আড়ষ্টতাকে নয়। অথচ এই প্রাক্তন সংস্কারের ফাঁদে পা দেয় বলেই মন তার জ্ঞানবৃত্তির স্বাতন্ত্র্য হারায়। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের অখণ্ড কর্মপ্রবৃত্তিও তেমনি বিধি-নিষেধের কঠিন নিগড়ে জড়িত নয়, কিংবা অতীত কর্ম কি কর্মফলের দুশ্ছেদ্য বন্ধনে সে বাঁধাও পড়েনি। তাঁর কর্মে ক্রমপরিণাম অবশ্য আছে। কিন্তু সে শুধু অনন্তের সান্ত বিভূতির মধ্যে তার স্ব-তন্ত্রিত ও স্বতঃপরিণামী সাবলীলতার অপরোক্ষ সংক্রমণ। এই শক্তিসংক্রমণ নির্ঘাত বা ক্ষণভঙ্গের অনৈশ্চিত্য সৃষ্টি করে না—সত্যের অধৃষ্য প্রকাশকেই সে সৌষম্যের ছন্দে মুক্তি দেয়। তাই বিজ্ঞানঘন-পুরুষের প্রবৃত্তিতে ফোটে বশবর্তিনী চিন্ময়ী স্বীয়া প্রকৃতিতেই চিন্ময় পুরুষের স্ব-তন্ত্র আত্মবিভাবনার উল্লাস।

আনন্ত্যের চেতনা ফুটলে পরে ব্যক্তিচেতনা যেমন বিশ্বচেতনাকে খণ্ডিত বা বলয়িত করে না, তেমনি বিশ্বচেতনাও অনুত্তর চেতনাকে বাধিত করে না। তাই বিজ্ঞানঘন-পুরুষের আনন্ত্যচেতনা ব্যক্তির বিগ্রহে নিজেকে যেমন ঘনীভূত করে, তেমনি সেই চিদ্‌ঘনবিগ্রহে সৃষ্টি করে বিশ্বাত্মক চেতনার পরবিন্দু, এবং বিশ্বোত্তীর্ণ চেতনার মহাবিন্দুও। বিজ্ঞানঘন-পুরুষকে তাই বলতে পারি 'বৈশ্বানর পুরুষ'। তাঁর ব্যক্তিগত সমস্ত কর্ম বিশ্বকর্মের সূত্রে বাঁধা, অথচ স্বরূপে তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ বলে সে-কর্মে কালাবচ্ছিন্ন অবরপ্রকৃতির বৃত্তিসঙ্কোচ কিংবা স্বৈরিণী বিশ্বশক্তির কোনও পীড়ন থাকে না। তিনি বিশ্বরূপ বলে বিশ্বগত-অবিদ্যাও তাঁর বিরাট স্বভাবের কুক্ষিগত হবে, কিন্তু অবিদ্যার মর্মাবগাহী হয়েও তিনি তার দ্বারা অপরামৃষ্ট থাকবেন। তাঁর প্রকৃতি তাঁরই বিশ্বোত্তীর্ণ ব্যক্তিস্বভাবের বৃহৎ ঋতকে অনুসরণ করবে এবং তাঁর জীবনে ও কর্মে ফুটিয়ে তুলবে তার চিন্ময় সত্য। তাঁর জীবন আত্মবিভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত লীলাসুষমা। কিন্তু যেহেতু আত্মসংবিতের চরমকোটিতে তাঁর সত্তা ভাগবতী সত্তার অবিনাভূত, অতএব তাঁর পরমাত্মভূত মহেশ্বর ও পরমা প্রকৃতিরূপিণী মহেশ্বরীর দিব্য প্রশাসনে তাঁর জীবনধারা অনায়াসে তন্ত্রিত হবে—তাঁর জ্ঞানে কর্মে ও জীবনে ফুটবে অবন্ধন বৃহৎ ঋতের নিরঙ্কুশ ছন্দ। তাঁর জীবপ্রকৃতি স্বচ্ছন্দে শিবপ্রকৃতির অনুগত হবে এবং সেই আনুগত্যে সার্থক হবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য, কেননা এ যে তাঁর আত্মভাবের অনুত্তর মহিমার কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া—তাঁর নিখিল সত্তার উৎসমূলের প্রেতিকে জাগ্রত জীবনে বহন করা। তাঁর জীবপ্রকৃতি তখন বিবিক্ত একটা ধর্ম নয়—তাঁর পরমা প্রকৃতিরই সে একটা ধারা মাত্র। পুরুষ-প্রকৃতির যে অতর্কিত বিরোধ ও বৈষম্য এতদিন অবিদ্যাশাসিত প্রকৃতিকে কণ্টকিত করে রেখেছিল, তার চিহ্নমাত্রও তখন অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা প্রকৃতি তখন

পুরুষের আত্মশক্তির উচ্ছলন, পুরুষেও লোকোত্তরা পরমা প্রকৃতির মুক্তধারা—মহেশ্বরের অতিমানস সন্ধিনীশক্তির উন্মিষন্ত বিভূতি। আত্মস্বরূপের এই পরমসত্য, এই অন্তহীন সৌষম্যের ছন্দ বিজ্ঞানঘন-পুরুষের চিন্ময় স্বাতন্ত্র্যের বিলাসকে করবে অমোঘবীর্য স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল।

অবরপ্রকৃতির বেলায় দেখি—তার জগদ্‌বিলাসে স্বতঃক্রিয়ার যন্ত্রাচার আছে, নিয়মের বাঁধনে কোথাও তার শৈথিল্য নাই, চিরক্ষুণ্ণ পথের রেখা তার একান্তই অলঙ্ঘনীয়। সেখানেও চিৎশক্তির লীলা চলছে, কিন্তু সে-লীলায় দেখা দিয়েছে প্রকৃতিপরিণামের একটা বাঁধা ছক, প্রকৃতির প্রবৃত্তিতে অভ্যস্ত সংস্কারের একটা দুর্মোচন দাসত্ব। বুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যহীন জীবকে বাধ্য হয়ে তখন জীবনের ওই গতানুগতিক আদর্শ, কর্মের ওই ছাঁচে-ঢালা রীত মেনে চলতে হয়। মানুষের মধ্যে মনের অভিযান প্রথম শুরু হয় এই ছকবাঁধা গতানুগতিকতার দাসত্ব দিয়ে। কিন্তু চেতনার উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে সে প্রকৃতির আড়ষ্ট পরিকল্পনার মুক্তি চায়, অচেতন বা অর্ধচেতন যন্ত্রলীলার মূঢ় বিধানকে স্বচ্ছন্দ করতে চায় আত্মসচেতন ভাবনা এবং ব্যঞ্জনাবহুল জীবনাদর্শের স্বীকৃতি দিয়ে, অথবা যন্ত্রের ছককে বাতিল করে বুদ্ধির ছক দিয়ে জীবনকে জাগ্রত চিত্তের লক্ষ্য প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে গড়তে চায়। সত্য বলতে মানুষের এত যত্নে গড়া জ্ঞানের ইমারত বা জীবনের ইমারত কোনটাই কিন্তু পাকা নয়। তবু চিন্তায় বিদ্যায় জীবনে আচারে কি ব্যক্তিত্বের সাধনায়—জেনে হ'ক বা না জেনে হ'ক—একটা অল্পাধিক পূর্ণ আদর্শ খাড়া না করে সে পারে না। এই আদর্শ হয় তার জীবনের ভিত্তি—অন্তত এই তথাকথিত স্বধর্মের ভাবনায় জীবনকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে সে কসুর করে না। কিন্তু চিন্ময় জীবনের আদর্শ হল চেতনার প্রমুক্তি—কোনও বৈধমার্গের মূঢ় অনুবর্তন নয়। নিজেকে পেতে গিয়ে মানুষের চিৎসত্ত্ব বিধি-নিষেধের সকল বাঁধন ছিন্ন করে। আত্মপ্রকাশের কোনও দায় যদি তার থাকেও, তাহলেও তার প্রকাশ হবে স্বরূপের অকুণ্ঠ প্রকাশ, মুখোস-ঢাকা কৃত্রিম প্রকাশ নয়। অর্থাৎ চিদ্‌বিলাসের সত্যলীলা অনায়াসে তার জীবনে উছলে উঠবে। 'ছাড় সব ধর্ম—জীবন ও কর্মের বাঁধা-ধরা যত নিয়মকানুন, একমাত্র আমারই শরণ নাও' —এই হল সাধকের প্রতি দিব্য-পুরুষের জীবন-গীতার চরম অনুশাসন। এই-যে স্বাতন্ত্র্যের এষণা, বৈধমার্গের বন্ধন হতে চিন্ময় রাগমার্গের স্বাচ্ছন্দ্যে এই-যে আত্মার প্রমুক্তি, মনের শাসনকে ছুঁড়ে ফেলে এই-যে চিন্ময় সত্যের শাসনকে মেনে চলা, মনোবিকল্পের কৃত্রিম সত্যকে বর্জন করে লোকোত্তর স্বরূপসত্যের প্রেতিকে বরণ করা—এ-সাধনার পথেও অবশ্য স্তরের ভেদ আছে। প্রথমত স্বাতন্ত্র্যের চেতনা জাগে অন্তরে, কিন্তু বাইরে তার ছন্দ ফোটে না। সাধক তখনও প্রকৃতির দোলায় দুলতে থাকে—কখনও 'বিড়াল-

ছানার মত', কখনও 'ঝড়ের মুখে এ'টোপাতের মত', কখনও-বা বহির্দৃষ্টিতে 'উন্মত্তবৎ কি পিশাচবৎ'। কখনও হয়তো কিছুকালের জন্য সাধক চিন্ময় আত্মরূপায়ণের বিশেষ-কোনও একটা ছন্দে এসে পেঁছয়। হয়তো কিছুদিনের মত কি এ-জীবনের মত ওই তার সাধ্যের সীমা। হয়তো-বা তার আধারে নিজের সংস্কারানুযায়ী আত্মরূপায়ণের একটা বিশিষ্ট বিভূতি ফোটে—যার মধ্যে চিন্ময় সত্যের এযাবৎ-অর্জিত সিদ্ধির সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটেছে। তবু চিৎশক্তির তীব্রসংবেগে সাধক আবার স্বচ্ছন্দে নিজেকে রূপান্তরিত করে চলে বৃহত্তর সত্যের সাধ্য-বিভূতির আকর্ষণে। কিন্তু বিজ্ঞানঘন-পুরুষ চেতনার যে-ভূমিতে অধিষ্ঠিত, সেখানে জ্ঞান স্বয়ম্ভূত এবং তার প্রকাশও পরমা প্রকৃতিতে নিহিত কবিক্রতুর স্বতঃপ্রশাসিত ছন্দে বিধৃত। এই স্বয়ম্ভূজ্ঞানের স্বতঃপ্রশাসন আধারে অবরপ্রকৃতির যন্ত্রাচার ও মনঃকল্পিত আদর্শবোধের দায় ঘুচিয়ে দেয়—সত্তার অণুতে-অণুতে ফুটিয়ে তোলে স্ব-চিৎ ও স্ব-কৃৎ সত্যের স্বতঃস্ফুরণ।

বিজ্ঞানঘন-পুরুষের মধ্যে জ্ঞানের এই স্বতঃপ্রশাসনী বৃত্তি তার ঐকান্তিক স্বভাবধর্ম। অথচ তাঁর জ্ঞান যুগপৎ আত্মসত্যের ও অখণ্ড সন্মাত্রের সত্যের অনুশাসনকে আপন স্বাতন্ত্র্যকে অকুণ্ঠ রেখেই মেনে চলেছে। তাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা আর সংকল্প এক বলে দুয়ে কোনও বিরোধ নাই। চিৎস্বরূপের সত্য আর জীবনের সত্যও তেমনি তাঁর কাছে একই সত্যের দুটি বিভাব, অতএব তাদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব নাই। তাঁর আধার স্বরূপের স্বতঃপরিণামের ছন্দোময় বাহন, অতএব শরীরস্থ ভূতগ্রাম তাঁর আত্মপ্রকাশের কোনও দ্বন্দ্ব বৈষম্য কি বিরুদ্ধবৃত্তির বাধা সৃষ্টি করে না। প্রাকৃত মন ও প্রাণের জগতে স্বাতন্ত্র্য আর নিয়মে প্রতি পদে বিরোধ এবং অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। অথচ এ-বিরোধের কোনও সম্ভাবনা থাকত না, যদি স্বাতন্ত্র্যের মূলে থাকত প্রজ্ঞার অনুশাসন, আর নিয়মের পিছনে থাকত স্বরূপপ্রকৃতির স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু বিজ্ঞানঘন-পুরুষের অতিমানস-চেতনায় স্বাতন্ত্র্য আর নিয়ম অন্যোন্যসঞ্জাত—এমন-কি স্বরূপত তারা এক। কারণ তারা উভয়ে তাঁর অন্তর্গূঢ় চিন্ময় সত্যের অবিনাভূত বিভূতি, অতএব তাদেরও প্রবর্তনার মূলে আছে এক অখণ্ড চিৎশক্তির প্রেরণা। একই তাদাত্ম্যভাবনা হতে সঞ্জাত বলে তারা অন্যোন্য-সমবেত, সুতরাং তাদের বৃত্তিতেও তাদাত্ম্যভাবের সহজ সুষমাই ফুটে ওঠে। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের ভাবনায় কি কর্মে নিয়তিকৃত নিয়ম দেখা দিলেও তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র স্বাতন্ত্র্যহানি ঘটে না, কেননা সে-নিয়ম তাঁর স্ব-ভাবের স্বতঃ-স্ফুরণ—তাঁর প্রমুক্তি আর প্রমুক্তির নিয়ম সত্তার একই সত্যের দুটি বিভাব মাত্র। তাঁর প্রজ্ঞার স্বাতন্ত্র্য অসত্য বা প্রমাদসেবনের স্বাতন্ত্র্য নয়, কেননা সত্যকে জানতে মনের মত ভুলের পথে হাতড়ে-হাতড়ে তাঁকে চলতে হয় না।

এমনতর অন্ধের চলনে বিজ্ঞানঘন স্বরূপের পূর্ণৈশ্বর্য হতে তাঁর অবস্খলনই সূচিত হবে—সে হবে তাঁর স্বরূপসত্যের তনুকৃতি, তাঁর শুদ্ধসত্তায় আরোপিত বিজাতীয় অনিষ্টের মালিন্য। তাঁর প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা—অনৃতের ছায়া তাকে স্পর্শও করতে পারে না। অতএব প্রজ্ঞার স্বাতন্ত্র্য তাঁর মধ্যে জ্যোতির স্বাতন্ত্র্য, আঁধারের স্বেচ্ছাচার নয়। তেমনি তাঁর কর্মের স্বাতন্ত্র্যেও অনৃত-সংকল্প বা অবিদ্যার প্রেতিকে অনুবর্তন করবার কামচার নাই। কেননা তাও তাঁর শুদ্ধসত্তার পক্ষে বিজাতীয় হবে—তাতে তার সংকোচ ও খর্বতাই ঘটবে, প্রমুক্তি নয়। তাঁর বিশ্বব্যাপ্ত চেতনায় অসত্য ও অনৃত সংকল্পকে সার্থক করবার উগ্র আকূতি কখনও-কখনও তিনি অনুভব করবেন, কিন্তু তাকে জানবেন চিৎসত্ত্বের প্রমুক্তির প্রতি বলাৎকার বলে—স্বাতন্ত্র্যের সাধনা বলে নয়। তাঁর পরমা প্রকৃতির 'পরে এই আক্রমণও অধ্যারোপ, বিজাতীয় প্রকৃতির এই অত্যাচার তাঁর অবন্ধ্য ক্ষাত্রবীর্যকেই সমিন্ধিত করবে।

অতিমানস-চেতনা স্বরূপত ঋত-চিন্ময়—স্বরূপসত্য ও বস্তুসত্য দুয়েরই অনুভব তার পক্ষে অপরোক্ষ এবং সহজ। আনন্ত্যের যে প্রজ্ঞা ও সত্য-সম্ভূতির বীর্য সান্তের ভাবনাকে রূপায়িত করে, বিরাটের যে প্রজ্ঞা ও সত্যসম্ভূতির বীর্য অখণ্ডের ভাবনা হতে খণ্ডকে রূপ দেয়, ব্রহ্মাণ্ডের ভাবনার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলে পিণ্ডের ভাবনা—অতিমানস-চেতনায় দেখা দেয় সেই বীর্যের সহজ প্রকাশ। তাই সত্য তার স্বরূপের বিত্ত, সুতরাং অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের মত তাকে পথে-বিপথে সত্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হয় না। বিজ্ঞান-ঘন সিদ্ধপুরুষ অনুত্তর ও বিরাটের এই ঋত-চিতের জ্যোতির্লোকে অবগাহন করেন এবং তার প্রশাসনে বিধৃত হয়ে চলে তাঁর ব্যক্তিচেতনার অন্তরে-বাইরে জ্ঞান ও ক্রিয়ার সকল বৃত্তি। বিশ্বের সঙ্গে একাত্মভূত তাঁর চেতনা, অতএব স্বভাবত তাঁর বিজ্ঞান দর্শন বেদনা সংকল্প সংবিৎ ও প্রবর্তনা সমস্তই ঋত-চিন্ময়—সমস্তই তাঁর ব্রহ্মতাদাত্ম্য বা সর্বাত্মভাবের অন্তরঙ্গ বিভূতি। চিন্ময় প্রমুক্তির ঔদার্যে সহজ ও স্বচ্ছন্দ তাঁর জীবন—তার মধ্যে প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের কামনা বা ভাবনার মূঢ়সংস্কার কিংবা আড়ষ্ট জীবনপরিবেশের কুণ্ঠা নাই। তাঁর জীবনে ও কর্মে ভাগবতী দিব্যপ্রজ্ঞা ও দিব্যক্রতুর ঋত-চিন্ময় প্রশাসনের সর্বতোভাবী প্রবর্তনা ছাড়া আর-কোনও বিধি-নিষেধের সংকোচ নাই। প্রাকৃত-জীবনে বাহ্যিক বিধি-নিষেধের সার্থকতা অবশ্যই আছে। কেননা অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষ সেখানে অহমিকার ভেদদর্শী সংকীর্ণতার দ্বারা পীড়িত, অপরকে আক্রমণ ও আত্মসাৎ করেই তার নিজের পুষ্টি—অতএব সংঘর্ষ প্রমত্ততা ও অহমিকাজনিত বিক্ষেপদ্বারা একটা লণ্ডভণ্ড ব্যাপার সৃষ্টি করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বিজ্ঞানঘন জীবনে এমনতর অসাম্যের স্থান নাই। অতিমানস-পুরুষের বিজ্ঞানঘন ঋত-চিন্ময় আধারে, চেতনার সমস্ত

বিভাগে ও প্রবৃত্তিতে অন্যোন্যসম্বন্ধের একটা ছন্দোময় সত্যের লীলা অবশ্যই আছে—এখন সে-চেতনার দীপ্তি ব্যষ্টিতে কেন্দ্রিত থাকুক অথবা বিজ্ঞানঘন গোষ্ঠীতে ছড়িয়ে পড়ুক। অতিমানস-চেতনার সমস্ত স্পন্দনে, অতিমানস-জীবনের সমস্ত প্রবৃত্তিতে তাই এক স্বতঃস্ফূর্ত অখন্ড ও অদ্বৈত ভাবনার প্রভাস্বর মহিমা ফোটে। সেখানে আধারের এক অঙ্গের সঙ্গে অপর অঙ্গের কোনও বিরোধ নাই। কেননা এই অখন্ড-অদ্বৈতের অভঙ্গ সৌষম্যের ছন্দে সেখানে প্রজ্ঞা ও সংকল্পের চেতনার সঙ্গে হৃদয় প্রাণ ও দেহের চেতনা বাঁধা পড়ে—আমাদের দেহ-প্রাণ-হৃদয়ের অসাম সেখানে রণিত হয়ে ওঠে বৃহৎসামের মূর্ছনায়। এখানকার ভাষায় বলতে পারি, দেহ-প্রাণ-মন-হৃদয়ের 'পরে বিজ্ঞানঘন-পুরুষের অতিমানস কবিক্রতুরও একটা অকুণ্ঠ প্রশাসন আছে। কিন্তু প্রশাসনের কথা ওঠে অতিমানস-রূপান্তরের আদিপর্বে শুধু—যখন পরমা প্রকৃতির বীর্য আধারের সমস্ত অঙ্গ-উপাঙ্গকে হিরণ্ময় করে তুলছে। একবার রূপান্তর সিদ্ধ হলে পর আর কোথাও প্রশাসনের প্রয়োজন থাকে না, কেননা তখন সমস্ত চেতনাই যে অখন্ডৈকরস—অতএব অভঙ্গ-অদ্বৈতের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যঞ্জনায় অখন্ডভাবে স্পন্দমান।

বিজ্ঞানঘন-পুরুষে অহন্তার আত্মপ্রতিষ্ঠা আর পরাহন্তার প্রশাসনে কোনও বিরোধ নাই। জীবনসাধনায়, নিজের স্বরূপসত্যকে যেমন তিনি ফুটিয়ে তোলেন, তেমনি পরমপুরুষের সত্যসংকল্পকেও রূপায়িত করেন—কারণ তিনি জানেন পরমপুরুষই তাঁর আত্মার স্বরূপ, তাঁর চিন্ময় ব্যক্তিসত্ত্বের উৎস এবং উপাদান। অতএব তাঁর চেতনায় জীবশক্তি আর শিবশক্তিতে কোনও বিসংবাদ নাই—একই পরমা শক্তির অবিনাভূত এই যুগলশক্তির ভান্ডার হতে তাঁর প্রত্যেকটি কর্মের প্রেরণা আসে। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের বিশিষ্ট কর্মে এই প্রবর্তিকা শক্তির প্রেতি যখন ফোটে, তখন প্রত্যেক পরিস্থিতিতে সে হয় ওই পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত সত্যের অনুকূল, প্রত্যেক ভূতের সম্পর্কে তার নিজস্ব প্রকৃতি ব্যবহার ও প্রয়োজনের অনুরূপ, প্রত্যেক ব্যাপারে তার অন্তর্গূঢ় দিব্যসংকল্পের প্রযোজনার অনুবর্তী। এ-জগতে যা-কিছু ঘটছে, তার মূলে আছে এক পরমা শক্তির বহুমুখ সংবেগের গ্রন্থিনিবিড় সমাহার। বিজ্ঞানঘন-চেতনার সত্যসংকল্প ওই শক্তিব্যূহের ব্যষ্টি ও সমষ্টি বিভাবনার তত্ত্ব জেনে, প্রত্যেক ব্যূহে অনুকূল কি প্রতিকূল ততটুকু প্রেতি নিয়োজিত করবে, যা বিজ্ঞানঘন-পুরুষকেই নিমিত্ত করে দিব্য-পুরুষের সংকল্পিত সিদ্ধিকে মাত্র মূর্ত করবে। তাদাত্ম্যভাবনার অবিপ্লুত বীর্য সর্বত্র ছেয়ে আছে—তার প্রশাসনে সব কিছু বিধৃত রয়েছে, তার সৌষম্যের ছন্দে সকল বৈচিত্র্য বাঁধা পড়েছে। অতএব চিজ্‌জগতে বিশিষ্ট অহংএর বিবিক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার কোনও স্থান থাকতে পারে না। তাই বিজ্ঞানঘন-পুরুষের সংকল্প ঈশ্বরেরই

সত্যসংকল্প—বিবিক্ত ও প্রতীপচারী অহন্তার কামসংকল্প নয়। কর্মের আনন্দ ও কর্মফলের সম্ভোগ তাঁর থাকবে—কিন্তু অহন্তার দাবি কর্মের আসক্তি কি ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। শুধু ভাগবতী প্রেরণার অনুবর্তনে যা ভবিতব্য তাকে সফল করবার তিনি সচেতন নিমিত্ত মাত্র হবেন। প্রাকৃত-পুরুষ নিজেকে কবিক্রতু দিব্য-পুরুষ হতে বিবিক্ত দেখে; তাই তার মনোময় প্রকৃতিতে আত্মপ্রয়াস আর ঈশ্বরেচ্ছার আনুগত্যের মাঝে একটা বিরোধ ও অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। কিন্তু বিজ্ঞানঘন-চেতনায় আত্মপুরুষ পরমপুরুষের চিদ্‌ঘন বিগ্রহ, অতএব ইচ্ছার সংঘাত কি বৈষম্য সেখানে থাকতেই পারে না। সিদ্ধ-পুরুষের কর্ম জীববিগ্রহে শিবস্বরূপেরই কর্ম, অখণ্ড-চিন্ময়ের বহুভঙ্গিম লীলার একটি 'ফুট'। অতএব বিবিক্ত কামসংকল্পের প্রবর্তনা বা স্বাতন্ত্র্যের অভিমানের স্থান সেখানে কোথায়?

পরমপুরুষের প্রজ্ঞা এবং বীর্য অর্থাৎ তাঁর লোকোত্তরা পরমা প্রকৃতি বিজ্ঞানঘন-পুরুষকে আত্মলীলায়নের পূর্ণসহায়রূপে অংগীকার করে জগতে কাজ করে যায়। এই অদ্বৈতচেতনা সিদ্ধপুরুষের স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি, এই অনুভবই তাঁর জীবনে প্রমুক্ত চেতনার উদ্দীপনা আনে। চিন্ময়পুরুষ যে বিধি-নিষেধ এমনকি ধর্মাধর্মেরও অতীত—এই উক্তি এবং অনুভবের মূলে আছে জীবসংকল্পের সংগে শিবসংকল্পের অবিনাভাবের উপলব্ধি। আদর্শ-বোধের কোনও তাগিদ কি প্রয়োজন থাকে না বলে আদর্শের সকল বাঁধন তাঁর মন থেকে খসে পড়ে, এবং তার স্থানে দেখা দেয় ব্রহ্মাদ্বৈত ও সর্বাত্মভাবের নিরংকুশ অনুভবের লোকধর্মোত্তর প্রেরণা। স্বার্থপরতা কি পরার্থপরতার কোনও প্রশ্নই তাঁর বেলায় ওঠেনা—কেননা যেখানে 'সর্বম্ আত্মৈবাভূৎ', সেখানে কোথায় আত্ম-পরের ভেদ? বিজ্ঞানঘন-পুরুষের সকল ব্রত শিবস্ব-রূপের সত্যসংকল্পের উদ্‌যাপন মাত্র। তাঁর কর্মপ্রবৃত্তিতে আছে এক সহজ বিশ্বব্যাপ্ত মৈত্রী করুণা ও একাত্মবোধের উদার অনুভব, যা শুধু প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে না—তাঁর কর্মকে অনুবিদ্ধ অনুরঞ্জিত ও প্রাণময় করে তোলে। তাঁর এই প্রেমময় অনুভবে বস্তুধর্মের বৃহত্তর সত্যের বিরুদ্ধে সংকীর্ণ কোনও স্বার্থবৃত্তির প্ররোচনা, অথবা শিবসংকল্পের ঋতম্ভরা প্রেতি হতে বিচ্যুত কামসংকল্পের কোনও তাড়না নাই। এমনিতর বিদ্রোহ বা প্রমাদ অবিদ্যার জগতেই সম্ভব, কেননা প্রজ্ঞা এবং বীর্য হতে বিচ্যুত হয়ে প্রেম কি অন্য-কোনও সাত্ত্বিক ভাবের বিকার সেখানেই দেখা দিতে পারে। কিন্তু অতিমানস-বিজ্ঞানে চেতনার সকল বৃত্তি অন্যোন্যসমবেত, অতএব তাদের ক্রিয়াও এক-মুখী। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের কর্মপ্রবৃত্তিতে আধারের সকল শক্তি ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার প্রবর্তনা ও প্রশাসনে সংহত হয়ে চলে। অতএব তাঁর আত্মপ্রকৃতিতে বৃত্তির কোনও বিরোধ বা বৈষম্য থাকতেই পারে না। তাঁর সকল কর্মে স্বরূপ-

সত্তার আত্মবিভাবনার অবন্ধ্য প্রেরণা থাকে। সৎস্বরূপে যে-সত্য নিগূঢ় রয়েছে তাকে ফুটিয়ে তোলা, কিংবা যে-সত্য ফুটছে তার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যকে প্রকট করা, অথবা প্রকট সত্যের স্বয়ংসিদ্ধ বীর্যের উল্লাসকে আস্বাদন করা--এই হল তাঁর কর্মযোগের তাৎপর্য। প্রাকৃতচেতনায় অবিদ্যার আলো-আঁধারি আছে, সুতরাং শক্তি সেখানে মূর্ছিত। তাই কর্মের প্রবর্তিকা শক্তি সেখানে অন্তর্গূঢ় নয়তো অর্ধস্ফুট—অতএব সিদ্ধির অভিযানও অসার্থক দ্বন্দ্বসংকুল এবং অংশত পর্যুদস্ত। কিন্তু বিজ্ঞানঘন-পুরুষের জীবনে ফোটে চিন্ময় প্রেতির অন্তরঙ্গ অনুভব – অন্তশ্চেতনার গাঢ়ানুভূত আন্দোলনকেই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত করেন। অন্তরের বহুবিচিত্র প্রেতির সকল সম্ভাবনাই তাঁর মধ্যে স্বচ্ছন্দ লীলায়নের অধিকার পায় এবং অবশেষে পরিবেশের সত্যের সঙ্গে সমঞ্জস হয়ে পরমা প্রকৃতির সত্যসংকল্পের প্রশাসনে বাস্তবে মূর্তি ধরে। প্রজ্ঞাদৃষ্ট কর্মের চরিতার্থতাই বিজ্ঞানঘন-পুরুষের কর্মযোগ -তাই তাঁর যোগে অনৈশ্চিত্যের দ্বন্দ্ব বা বিভিন্নমুখী ক্রিয়াশক্তির পীড়ন নাই। আধারে বৈষম্যের বেদনা বা চেতনার বৃত্তিতে বিরুদ্ধক্রিয়ার সংঘাত তাঁর মধ্যে স্থান পায় না। কর্ম যেখানে ঋতম্ভরা প্রকৃতির স্বতঃস্ফুরণ, সেখানে বহিশ্চর চিত্তের কল্পিত গতানুগতিক বিধি-নিষেধেরই কি কোনও প্রয়োজন আছে? তাই বিজ্ঞানঘন-পুরুষের কর্মে আছে সৌষম্যের ছন্দ, শিবসংকল্পের উদ্‌যাপন, বস্তুর স্বরূপ-সত্যের অবন্ধ্য প্রেতির ভাবনা। এই তাঁর সমগ্র জীবনের স্বধর্ম ও স্বভাব-স্পন্দের পরিচয়।

তাদাত্ম্যসংবিতের সহায়ে যোড়শকল পুরুষের বিভূতিকে দিব্যসাধনের ঐশ্বর্যে রূপান্তরিত করাই অতিমানস জীবনের মুখ্য সিদ্ধি। বিজ্ঞানঘন-চেতনার অন্যান্য স্তরে যদিও চিন্ময় সত্তা ও চেতনার সত্যই স্বতঃস্ফূর্ত হয়, তবু পুরুষের জীবনসাধনার উপকরণ হয় আরেক থাকের। উত্তর-মনোময় পুরুষ ঋতময় মনন বা ভাবনার সত্যকে সাধনরূপে গ্রহণ করে তাকেই জীবনের কর্মে ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু অতিমানস বিজ্ঞানভূমিতে মনন একটা জন্য বৃত্তিমাত্র। সেখানে সে ঋতদৃষ্টির একটা বিভাবনা—সত্তার মুখ্য বা নিয়ামিকা শক্তি নয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানভূমিতে মনন হবে বিদ্যার প্রকাশের সাধন—প্রাপ্তির সাধন নয়। এমন-কি তাকে কর্মপ্রেরণার উৎসও বলা চলে না। হয়তো বা তাদাত্ম্যসংবিতের কবিক্রতুর একটা সূচীমুখরূপে ক্রিয়াশক্তিতে সে আবির্ভূত হয়—এইটুকুই তার সার্থকতা। তেমনি বিজ্ঞানভূমির প্রভাস্বর চেতনায় ক্রিয়াশক্তির উৎস হল ঋতদৃষ্টি। আর বোধিচেতনায়, অপরোক্ষ ঋতস্পর্শ ও ঋতসংবিতের দৃক্‌শক্তিই হল ক্রিয়ার প্রয়োজক। অধিমানসে থাকে বস্তুসত্যের এবং প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপসত্যের ও তার ক্রিয়াপরিণামের একটা সর্বতোগ্রাহী অপরোক্ষ ধৃতি। তাইতে প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও দিব্যমননের যে

বিপুল প্রসার ঘটে, তা-ই হয় অধিমানস-পুরুষের জ্ঞান ও কর্মের মৌলিক সাধন। সত্তা জ্ঞান ও ক্রিয়ার এই অমিতবৈপুল্যের মূলে অন্তঃশীল তাদাত্ম্য-চেতনারই বিলাস থাকে—কিন্তু তবু তাদাত্ম্যবোধ সেখানে পুরাপুরি চেতনার স্বরূপধাতু বা ক্রিয়ার স্বরূপশক্তিরূপে দেখা দেয় না। কিন্তু অতিমানস বিজ্ঞানভূমিতে ঋতসংবিৎ ঋতদৃষ্টি ও ঋতমনন অর্থাৎ বস্তুসত্যের জ্যোতির্ময় অপরোক্ষ ধৃতির সকল সাধন ফিরে যায় তাদাত্ম্যচেতনারূপ উৎসমূলে এবং সেখানে তার সিদ্ধবিজ্ঞানের অখণ্ড বিভূতিরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদাত্ম্য-চেতনা সেখানে সমস্ত চিদ্‌বৃত্তির প্রবর্তক এবং আধার। এই তাদাত্ম্য নিত্যসিদ্ধ সংবিৎরূপে সত্তার স্বরূপধাতুর অণুতে-অণুতে ফোটে আত্ম-সম্পূর্তির স্বতঃসিদ্ধ সংবেগ নিয়ে এবং ব্যবহারের জগতে তা-ই হয় বিশিষ্ট দিব্যচেতনা ও দিব্যকর্মের নিয়ামক। নিত্যসিদ্ধ তাদাত্ম্যসংবিৎ হল অতি-মানস-বিজ্ঞানের স্বরূপ এবং বিভূতি। এ-সংবিৎ স্বয়ংপূর্ণ, সুতরাং কোনও বিগ্রহে বা বিভূতিতে নিজেকে রূপায়িত করবার দায় তার নাই। তবু তার মধ্যে চিজ্‌জগতের দিব্যদর্শন দিব্যমনন প্রভৃতি জ্যোতির্ময় লীলাবিলাসের কখনও অভাব হয় না। চিদ্‌বিলাসের এই ঐশ্বর্য সেখানে ফোটে প্রমুক্ত স্ফুরণশক্তির প্রভাস্বর উচ্ছলতায়, দিব্যবিভূতির সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যের উদ্বেলনে, আত্মবিভাবনার বিশ্বতোমুখ আনন্দবিচ্ছুরণে, অসীমের অন্তহীন শক্তি-সমুচ্ছ্বাসের উল্লাসে। বিজ্ঞানঘন-চেতনার অবরভূমিতে দিব্য-পুরুষের পরমা প্রকৃতি চিত্রবিভূতির নানান কলায় ফুটতে পারে। তার মধ্যে চিন্ময় জীবনের কত-যে লীলায়ন—কখনও অকৈতব প্রেমের মাধুরীতে, কখনও ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার জ্যোতির্মহিমায়, কখনও-বা মহেশ্বরের সাম্রাজ্যসিদ্ধি ও সিসৃক্ষার লোকোত্তর বীর্যে। কিন্তু অতিমানসভূমিতে ঘটে এই অগণিত চিত্রবিভূতির এক সহস্রদল সমন্বয়—সত্তার সত্য ও জীবনসত্যের এক অনুত্তম অভঙ্গ-সমাহার। এক অখণ্ড-সত্তার সকল বিভাব ও সামর্থ্যের আনন্দজ্যোতির্ময় সমাহারে ও নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তিতেই বিজ্ঞানঘন জীবনের সর্বার্থসিদ্ধি।

অতিমানস-বিজ্ঞানের ঋত-চিন্ময় বিলাসের দুটি দল আছে—একটি নিরূঢ় আত্মজ্ঞানের সহজসিদ্ধি, আরেকটি আত্মা ও জগতের তাদাত্ম্যবোধ হতে প্রজাত জগৎজ্ঞানের অন্তরঙ্গ স্ফুরণ। এই অবাধিত আত্মজ্ঞান ও জগৎজ্ঞানেই বিজ্ঞান-ঘন-চেতনার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ফোটে। বলা বাহুল্য, এ-জ্ঞান যে মননধর্মী সামান্যজ্ঞান মাত্র, তা নয়। প্রাকৃতচেতনার মত ভূয়োদর্শন দ্বারা সামান্যজ্ঞান আহরণ করে ব্যবহারে তার বিশিষ্ট চরিতার্থতা ঘটানোর কুণ্ঠাচার এর মধ্যে নাই। এ-জ্ঞান চেতনার স্বরূপজ্যোতির দীপনী, সদ্‌ভাব ও সম্ভূতির অশেষতত্ত্ব-প্রকাশিকা স্বয়ম্প্রভা, শুদ্ধসন্মাত্রের আত্মবিভাবনা আত্মব্যাকৃতি ও আত্মনিরূপণার ঋতময় ধৃতি। বিসৃষ্টির চরিতার্থতা 'হওয়াতে'—'জানাতে'

নয়। জানা সেখানে চিদ্‌বিলাসের একটা গৌণ সাধন মাত্র। এই বিসৃষ্টির চরম সিদ্ধি—পৃথিবীতেই বিজ্ঞানঘন-বিগ্রহের আবির্ভাবে। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের জীবন ঋত-চিন্ময় সত্তার বিসৃষ্টি অথবা বিলাস। সর্বাত্মভাবের পূর্ণসংবিতে স্ফুরিত তাঁর আত্মসচেতনতার অকুণ্ঠ দীপ্তি। প্রাকৃতপুরুষের মত রূপ ও কর্মের প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলে আত্মবিস্মৃত বা অর্ধসচেতন জীবন তিনি যাপন করেন না। প্রমুক্ত চেতনার অমোঘ বীর্যে রূপ ও কর্মকে তিনি পরিপূর্ণ আত্মরূপায়ণের নিরঙ্কুশ সাধনায় প্রয়োজিত করেন। অচিতি ও অবিদ্যার স্পর্শ হতে তিনি নির্মুক্ত, অতএব বিস্মৃত বা প্রচ্ছন্ন জীবনসত্যের এষণায় তাঁকে হাতড়ে বেড়াতে হয় না। স্বরূপের সত্য ও বীর্য সম্পর্কে পূর্ণচেতন বলে আত্মবিভাবনার প্রত্যেকটি সুর তাঁর তুর্যাতীত তত্ত্বভাবের স্বচ্ছন্দ সম্ভূতির লয়ে বাঁধা—তাঁর সম্বুদ্ধ জীবন জুড়ে স্বরূপধাতুর লীলাবিলাস, তাঁর আত্মচেতনা আত্মশক্তি ও আত্মানন্দের বন্ধহারা উচ্ছলন।

বিজ্ঞানঘন প্রকৃতির পরিণামে চেতনা শক্তি ও আনন্দের নানা স্থিতি ভঙ্গিমা ও সুষমবৃত্তির একটা অফুরন্ত বৈচিত্র্য দেখা দেবে। অতিমানস-চেতনার ঊর্ধ্বপরিণামের কখনও ইতি হতে পারে না—অতএব কালান্তরে তার মধ্যে আরও-কত তুঙ্গশৃঙ্গের অভ্যুদয় ঘটবে। কিন্তু এই ঊর্ধ্বায়নের মধ্যেও বিকাশের একটা সর্বসাধারণ ছন্দ অটুট থাকবে। আত্মসম্ভূতির সকল রহস্য জেনেও চিৎস্বরূপ নিজের সবটুকু তাঁর রূপ ও কর্মের ব্যাকৃত লীলায়নে ফুটিয়ে তোলেন না। তাঁর বিসৃষ্টিতে আত্মরূপায়ণের যে সার্থক ছন্দ এবং পরিমিতি রয়েছে, তাকে উপেক্ষা করে যে-কোনও ব্যাকৃত রূপের মধ্যে নিজের অখণ্ড বিভূতিকে প্রকাশ করতে তিনি বাধ্য নন। তাই তাঁর আত্মরূপায়ণের বহির্বাটিতে অখণ্ডের একটিমাত্র পাদ ফোটে, আর তার ত্রিপাদকে গুহাহিত রেখে চলে অব্যাকৃতির আত্মগূঢ় আনন্দের সম্ভোগ। কিন্তু অখণ্ডের সে-গুহাশয়নের আনন্দচেতনা বহির্ব্যক্তিতেও নিজেকে উৎসারিত জানবে, নিজের নিত্যসদ্‌ভাব ও পূর্ণকল আনন্ত্যের বোধদ্বারা বিসৃষ্টির অংশ-কলাকেও অনুষিক্ত এবং স্বপ্রতিষ্ঠ করবে। এমনি করে গুহাহিত থেকেই পুরঃক্ষিপ্ত রূপায়ণকে সন্ধিনীশক্তির অন্তর্গূঢ় বীর্যের দ্বারা স্বচ্ছন্দে বহন করা—একে অবিদ্যাশক্তির ক্রিয়া না বলে বলব আত্মবিদ্যার বিভূতি। এ হবে অতিচিতির জ্যোতির্ময় আত্মবিভাবনা—অচিতির উৎক্ষেপ নয়। অতএব মর্তভূমিতে বিজ্ঞানঘন চেতনা ও জীবনের উন্মেষ সার্থক ও সুন্দর হবে অফুরন্ত বৈচিত্র্যের সুষম ছন্দে। যে অবিদ্যা-মনের মেলা অথবা বিজ্ঞানঘন পরিণামের অবর পর্ব-রাজি অতিমানস জীবনকে ঘিরে থাকবে, তাদের মধ্যেও অনায়াসে সঞ্চারিত হবে অতিমানসের স্বরূপসত্যের এই নিরূঢ় বিভূতির স্পন্দবেগ। তুর্যাতীতের

জ্যোতির্ময়ী চেতনায় অতিমানসের ঋতচ্ছন্দের সঙ্গে অবিদ্যারও অন্তর্গূঢ় ঋতচ্ছন্দের সহজযোগ সাধিত হবে। সবার মধ্যে চিন্ময় তাদাত্ম্যের অনুভবই অতিমানসের সেই অচ্ছিন্ন যোগসূত্র, যাতে অখণ্ড সৌষম্যের ছন্দে গাঁথা হয় বিভূতিবৈচিত্র্যের মণিমালা। বিশ্বের প্রত্যেক ব্যাপারে যে সম্বন্ধবৈচিত্র্যের সমাবেশ এবং ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যতিহার, বিজ্ঞানঘন-চেতনার আলোকে তার অন্তর্নিহিত ঋতসুষমার রূপটি ফোটে। সেইসঙ্গে তার দেববীর্য বা দিব্য অনুভাব প্রাকৃত জীবনের উচ্চাবচ পরিণামের মধ্যে অন্যোন্যসম্বন্ধের একটা ঋতময় সৌষম্য আনে এবং জগতের অবরভূমির অসামের মধ্যে বৃহৎসামের প্রেতিকে প্রতিষ্ঠিত করে।

অধিমানস হতে উদ্‌গত হয়ে, চিন্ময়-পরিণামের মুক্তধারা যেখানে অতি-মানস বিজ্ঞানভূমিতে উত্তীর্ণ হল, সেই পর্বসন্ধি পর্যন্ত আমাদের মানস কল্পনার অভিযান। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের স্বরূপ জীবন ও কর্মের এই-যে অপূর্ণ বিবৃতি, এ সেই অভিযানের ফল। বিজ্ঞানঘন পুরুষসমূহেরও ব্যষ্টি বা সমষ্টি জীবন এই বিজ্ঞানময়ী প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। কারণ বিজ্ঞান-ঘন-পুরুষ যেমন ঋত-চিতের ঘনবিগ্রহ, বিজ্ঞানঘন গোষ্ঠীও তেমনি ঋত-চিতের ঘনব্যূহ। এই গোষ্ঠী বা সংঘেও ফুটবে জীবন ও কর্মের সামরস্যের ছন্দোময় প্রবৃত্তি, অদ্বৈতসত্তার নিত্যজাগ্রত সিদ্ধ অনুভব, নিবিড় একাত্ম-বোধের সহজ উল্লাস, ঋতদৃষ্টি ও ঋতসংবিতে স্ফুরিত সর্বাত্মভাবের অন্যোন্য-চেতনা, সমষ্টির সঙ্গে সমষ্টির বা ব্যষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির ব্যবহারেও ঋতাচারের অন্যোন্যাবগাহী ছন্দোদোলা। বিজ্ঞানঘন সংঘের সত্তায় ও কর্মে প্রকাশ পাবে একটা চিদ্‌ঘন ব্যূহের নিটোল পূর্ণতা—যন্ত্রচালিত একটা যৌথবৃত্তি নয় শুধু। বিজ্ঞানঘন প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য শাসনে সংঘজীবনে স্বাতন্ত্র্য এবং নিয়মের মণিকাঞ্চনযোগও দেখা দেবে। সংঘান্তর্গত প্রত্যেক চিন্ময় বিগ্রহে অখণ্ড অনন্তের লীলাবৈচিত্র্য যেমন হবে সে-স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ, তেমনি সর্বাত্মভাবের জাগ্রত চেতনা হবে অতিমানস আনন্ত্যের স্বতঃস্ফূর্ত নিয়তির প্রয়োজক। প্রাকৃত-মন একত্ব বলতে বোঝে একাকার হওয়া। তাই মনোময়-বুদ্ধির একত্বসাধনা সার্থক হয় সবকিছুকে এক ছাঁচে ঢালতে পারলে, যাতে সর্বনাশা একত্বের মধ্যে অবান্তরভেদের একটা আলতো পোঁছ শুধু জেগে থাকবে। কিন্তু বিজ্ঞানঘন জগতে একত্বের ঐশ্বর্য ফোটে বহুধাবৃত্তির অন্ত-হীন সমারোহে। বিজ্ঞানঘন-চেতনায় ভেদবৃত্তি বিরোধের সৃষ্টি না করে সবার রঙে রং মেশাবার সহজ নৈপুণ্য জাগায়। সেখানে অপরের বৈচিত্র্য নিজের ষোড়শকল মহিমার পরিপূরক হয়। সংঘের মধ্যে একটি সহস্রদল সত্যকে বহুজীবনের বিচিত্র প্রয়াসে ফুটিয়ে তোলবার সাধনা চলে। তাই বহুধাবৃত্তি সেখানে ঐক্যভাবনার অপঘাত ঘটায় না। প্রাকৃত চিত্তে ও জীবনে ভেদবুদ্ধি

জাগে অহন্তার প্ররোচনায়—অভঙ্গকে ভগ্নাংশে পরিকীর্ণ করে সে নানা বিরুদ্ধ ও অসমঞ্জস বৃত্তির প্রতীপতা সৃষ্টি করে। সেখানে অভেদের চাইতে ভেদভাব বড় হয়ে দেখা দেয় এবং ক্রমশঃ তা পরিণত হয় চিত্তের প্ররূঢ় সংস্কারে। বিচিত্র ভেদের মধ্যে অভেদের যোগসূত্রটি হয় অজ্ঞাত নয়তো অবজ্ঞাত থেকে যায়। প্রাকৃত জগতে তাই মিলনের সাধনা চলে আপোস-রফা কি বলাৎকারে অথবা কৃত্রিম একত্বের আয়োজনে। অবশ্য একটা ঐক্যের সূত্র সর্বত্রই প্রচ্ছন্ন আছে এবং প্রকৃতির লক্ষ্যও হল একত্বভাবনার নানান ছাঁদে তাদের ফুটিয়ে তোলা। বিবিক্ত অহংবোধের মত সামাজিক বোধ ও সংঘচেতনাও প্রকৃতির মধ্যে প্রবল এবং তার জন্যে তার আছে আসঙ্গস্পৃহা, সমবেদনা, স্বার্থ প্রয়োজন ও রুচির সাম্য, আত্মীয়তাবোধ এবং প্রয়োজন হলে বলাৎকার দ্বারা ঐক্যপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা। কিন্তু অহংশাসিত জীবনধর্মের তাগিদ তত্ত্বহিসাবে গৌণ এবং আরোপিত হলেও সবাইকে সে ছাপিয়ে ওঠে এবং একত্বভাবনাকে আচ্ছন্ন করে তার সকল সাধনাকেই অপূর্ণত্ব এবং অনৈশ্চিত্যের দ্বারা বিড়ম্বিত করে। তাছাড়া প্রাকৃত জীবনে বোধিচেতনা এবং অপরোক্ষ অন্তর্যোগের অভাব বা অপূর্ণতাহেতু প্রত্যেক জীব প্রত্যেক জীবের কাছে স্বতন্ত্র—তাই অপরের মর্মে অনুপ্রবেশ করবার পথে তাদের বিপুল বাধা। পরস্পরকে বুঝে প্রাণে-প্রাণ-মেশানোর সাধনা আমাদের করতে হয় বাইরে থেকে—অন্তরের অন্তঃপুরে ঢুকে অপরোক্ষপ্রত্যয়ের সহায়ে নয়। তাই আমাদের ভাব ও প্রাণ-বিনিময়ের সকল প্রয়াস অবিদ্যাপ্রভাবে ব্যাহত কিংবা অহমিকার সংস্পর্শে কলুষিত হয়। এক্ষেত্রে অপূর্ণতা এবং অনৈশ্চিত্য যে সকল সাধনার চরম নিয়তি হবে, সে কি আর বলতে হবে? কিন্তু বিজ্ঞানঘন সংঘজীবনে ফোটে সর্বাবগাহী ও সর্বসমন্বয়ী ঋতসংবিৎ, ফোটে চিদ্‌ঘন প্রকৃতির অদ্বৈতসুষমাবাহী বিভূতি। তাই সেখানে সমস্ত বৈচিত্র্য এক অখণ্ড প্রকৃতির আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্যরূপে অনুভূত হয়, এবং ব্যক্তির বিচিত্র ভাবনা বেদনা ও প্রবৃত্তি এক জ্যোতির্ময় সহস্রদল জীবনের কর্ণিকায় সংহত হয়। এই হল ঋত-চিতের স্বরূপাবিভূতির তত্ত্ব এবং তার সর্বাত্মভাবনাময় চিন্ময় পরিস্পন্দের অপরিহার্য পরিণাম। জীবনের পূর্ণসিদ্ধি এই সর্বাত্মভাবের অনুভব হতে আসে। কিন্তু প্রাকৃত-মনের ভূমিতে এ-সিদ্ধি সহজ নয়—কিংবা এ-সিদ্ধি এলেও তাকে সংহত ও প্রাণময় করা আরও কঠিন। অথচ বিজ্ঞানঘন জীবনের সকল সৃষ্টিপ্রবৃত্তিতে সর্বাত্মভাবের সিদ্ধ অনুভব প্রাণময় প্রেতির স্বভাবছন্দে এবং সংহত রূপায়ণের স্বতঃস্ফূর্ত সুষমায় হিল্লোলিত হয়ে ওঠে।

যদি কল্পনা করি, বিজ্ঞানঘন-পুরুষেরা অবিদ্যার সকল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে একটা বিবিক্ত জীবনের রসাস্বাদে বিভোর রয়েছেন, তাহলে তাঁদের পূর্ণতার

এই পরিচিতি হয়তো খুব দুর্বোধ ঠেকে না। কিন্তু প্রকৃতিপরিণামের সহজ ধারাতে বিজ্ঞানঘন-চেতনার উন্মেষ বিশ্বজীবনের পটভূমিকায় একটা বিশেষ ঘটনা—যদিও সে-ঘটনা যে ক্রান্তিকারী, একথা অনস্বীকার্য। অতএব এই উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে জীবন ও চেতনার অবরভূমিরও অনুবৃত্তি চলবে। এখানে, যেমন থাকবে অবিদ্যার জগৎ, তেমনি থাকবে শুদ্ধবিদ্যা এবং অবিদ্যার মাঝামাঝি আরেকটা জগৎ। বিসৃষ্টির পরাবর দুটি ধারাই পাশাপাশি বা ওতপ্রোত হয়ে থাকবে। এখন না হ'ক, পরিশেষে শুদ্ধবিদ্যাই যে সর্বজয়ী হবে—এ-প্রত্যাশা অবশ্য অসঙ্গত নয়। তখন চিন্ময় মানসের ঊর্ধ্বভূমির সঙ্গে অতিমানস তত্ত্বের যোগ প্রকট এবং প্রত্যক্ষ হবে—তাই অচিতি ও অবিদ্যার মূঢ় পরিবেশ অতিমানসের আবেশ ও বিধৃতিতে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। চিন্ময় মানসের বিভূতিসমূহে অনুত্তর স্বরূপসত্যের বিশিষ্ট এবং কুণ্ঠিত রূপায়ণ ঘটে। অতএব অতিমানস-বিজ্ঞানের উন্মেষে সে-ই হবে তাদের সকল দীপ্তি ও শক্তির নির্মুক্ত উৎস—তার করণশক্তির উদার আবেশে তারা হবে আপ্যায়িত। তারা যে পরা সংবিতের সাধনবীর্য, এই চেতনা তাদের মধ্যে প্রস্ফুট হবে। নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় স্বরূপধাতুর পরিপূর্ণ প্রেতির অনুভব এখনও দেখা না দিলেও অবিদ্যার তমোধাতু তাদের সাধনবীর্যকে খণ্ডিত আচ্ছন্ন ব্যামিশ্র বা স্তিমিত করবে না। অধিমানসে বোধিমানসে প্রভাস-মানসে বা উত্তরমানসে অবিদ্যার ছায়া যদি কখনও পড়েও, তবু সে-ছায়া তাদের আলোর ছোঁয়ায় জ্যোতির্বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে আপন সংবৃত্ত সত্তাকেই ফুটিয়ে তুলবে। মুক্তির মন্ত্রে সে-ছায়া রূপান্তরিত হবে সত্তা ও চেতনার নবীন বিভূতিতে এবং চিন্ময় উত্তরশক্তিরাজির সগোত্র হয়ে অতিমানস উত্তরায়ণের যোগ্যতা লাভ করবে। সেইসঙ্গে অতিমানস-বিজ্ঞানের সংবৃত্ত শক্তি বিবৃত্ত হয়ে নিত্যজাজ্বল্যমান তীব্রসংবেগে নিজেকে বিচ্ছুরিত করবে—আর সে অপরা প্রকৃতির মধ্যে কাজ করবে না শুধু গুহ্যশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনা নিয়ে বা সর্বভূতের অজানা আধাররূপে অথবা ক্বচিৎ-প্রকাশের দীপ্তিতে স্ফুরিত হয়ে। অচিতি ও অবিদ্যার যা-কিছু অবশেষ থাকবে, এই বিবৃত্ত শক্তির বিচ্ছুরণ তাকেও আপন সৌষম্যের অমোঘবীর্যে জারিত করবে। তখন অচিতি-ও অবিদ্যাতে অন্তর্গূঢ় বিজ্ঞানশক্তির বিধৃতি ও প্রবর্তনার বীর্য আরও রুদ্র-বেগে স্ফুরিত হবে এবং আধারে তার আবেশ হবে আরও স্বচ্ছন্দ ও বিদ্যুন্ময়। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডলের ছোঁয়া পেয়ে, পার্থিব প্রকৃতিতে উন্মেষিত অতিমানস সত্তা ও শক্তির সিদ্ধবীর্যে অনুষিক্ত হয়ে, প্রাকৃত-পুরুষের অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তে আত্মসচেতনতার বিপুল সাড়া জাগবে। মনুষ্যজাতির যে-অংশে অতিমানস-রূপান্তর দেখা দেবে না, সেখানেও মনোময় মানুষের একটা নতুন থাক আবির্ভূত হবে—বৃহত্তর একটা আভিজাত্য নিয়ে। সাধারণের মধ্যে

বিজ্ঞানবাসিত মনোময় মানুষের উন্মেষ না হ'ক, বোধিমানস কি প্রভাসমানসের অপরোক্ষ বা আংশিক স্ফুরণ নিয়ে অথবা উত্তর মনোভূমির সঙ্গে সাক্ষাৎ বা অংশত যোগযুক্ত হয়ে, প্রকৃতিপরিণামের স্বাভাবিক রীতিতেই তখন মনোময়-সত্ত্বের উন্মেষ ঘটবে। ক্রমে এই নতুনধরনের মানুষের সংখ্যা বাড়বে, আত্মোন্মেষের সহজ বিধানে ক্রমেই তারা স্বধর্মে সুপ্রতিষ্ঠ হবে। হয়তো এই পৃথিবীতেই তারা হবে অপ্রাকৃত মানবতার বাহন নতুন একটা সিদ্ধজাতি-সর্বভূতকে এক অদ্বিতীয় দিব্য পুরুষের প্রকাশ জেনে, যথার্থ বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধে অনুপ্রাণিত হয়ে নিম্নাধিকারী মানবকে তারা উত্তরায়ণের পথে পরিচালিত করবে। এমনি করে চেতনার অবরভূমির সাধ্যানুরূপ সিদ্ধির ভাবনা পরমপুরুষার্থের অনুত্তম সিদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলবে। প্রকৃতিপরিণামের উত্তরমেরুতে তখন দেখা দেবে অতিমানসের তুঙ্গশিখরের সোপানায়িত পরম্পরা—পরব্রহ্মের নিরঞ্জন সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বভাবের অনির্বচনীয় অনুত্তর বিভাবনার ব্যঞ্জনা নিয়ে।

প্রশ্ন হবে, বিশ্বে বিজ্ঞানঘন পরিণামের যুগান্তর যদি দেখা দেয়, বিজ্ঞানভূমিতে আরূঢ় চেতনা যদি ঊর্ধ্বপরিণামের প্রবেগে স্বভাবতই অনুত্তরের দিকে ধাবিত হয়, তাহলে অচিতি হতে চিন্ময়-পরিণামের প্রয়োজনও কি নিঃশেষিত হয়ে যাবে না? কারণ পরিণামের সিদ্ধধারার আবির্ভাবের পর, বিশ্বব্যাপারে অচিতির মূঢ় প্রবর্তনাকে জিইয়ে রাখবার কোনও কারণই তো অবশিষ্ট থাকবে না। এর অনুষঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন জাগে: অচিতি আর অতিচিতির দুটি মেরুর মাঝে এই-যে পরিণামের দোলা, এ কি জড়বিসৃষ্টির কোনও নিত্যবিধান, না নৈমিত্তিক একটা ব্যাপার শুধু? একে নৈমিত্তিক বলতে বাধে এইজন্যই যে, অচিতির ভিত্তিতে সমগ্র জড়বিশ্বের বনিয়াদকে এমনই ব্যাপক এবং পাকাপোক্ত করে গড়া হয়েছে যে শক্তির এই প্রচণ্ড প্রবেগকে কিছুতেই সাময়িক একটা বিক্ষেপ বলে মনে করতে পারি না। অচিতিই ঊর্ধ্বপরিণামের আদিবিন্দু। সুতরাং অচিতির পূর্ণবিপর্যয় বা মূলোচ্ছেদ হলে, তার বিশ্বব্যাপী বিরাট ভূমিকার সর্বত্রই অন্তর্গূঢ় ও সংবৃত্ত চিৎশক্তির যুগপৎ স্ফুরণ ঘটবে। পার্থিবপরিণাম বিশ্বপরিণামের একটা বিশেষ ধারা মাত্র। এখানকার প্রকৃতির বিশিষ্ট-কোনও রূপান্তরের ফল যে বিশ্বব্যাপী হবে, এমন কল্পনাকে যুক্তিসিদ্ধ ভাবতে পারি না। পার্থিব প্রকৃতিতে বিসৃষ্টির যে বিশেষ ধারাটি প্রকাশ পেয়েছে, তার সম্যক চরিতার্থতা কিসে ঘটবে, শুধু তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সুতরাং সবদিক ভেবে আমরা কেবল এইটুকু বলতে পারি—এই পার্থিব ভূমিতে চিদুন্মেষের শেষ পর্বে চিৎসত্তার পরম পরার্ধ যখন অবরার্ধের ত্রয়ীতে মূর্ত হবে, তখন মর্ত্যপরিণামের পর্বপরম্পরার বা স্বাভাবিক সংবেগের তারতম্যে কোনও বিপর্যয় ঘটবে না—

শুধু তার মধ্যে ফুটবে সৌষম্যের ছন্দ, একত্বের সহস্রদল লীলায়ন ও সহস্রের একত্বভাবনার শাশ্বত বিধান। ঊর্ধ্বপরিণামের পথ আর সংঘর্ষে কণ্টকিত হবে না তখন—তার পর্ব হতে পর্বান্তরে উত্তরণের সাধনায় ঋতসুষমার প্রবর্তনা থাকবে, জ্যোতি আর উত্তরজ্যোতির দিকে প্রগতির অভিযান চলবে, চিৎসত্তার আত্মোন্মীলনের লীলায় থাকবে শক্তি ও কান্তির সিদ্ধভাবনার ক্রমিক উপচয়। অনন্তস্বরূপের অনির্বচনীয় আত্মবিভাবনার প্রেতি অচিতির গহনে চিৎসত্তার অবগাহনের মূলে আছে: এই প্রেতিকে সার্থক করবার জন্য কোনও কারণে আয়াস ও সন্তাপের কৃচ্ছ্রবিধানই যদি অপরিহার্য একটা সাধন হয়, তাহলেই ঊর্ধ্বপরিণামের সাধনাকে সৌষম্যের ছন্দবর্জিত রাখবার কথা ওঠে। কিন্তু মনে হয়, পার্থিব-প্রকৃতিতে অচিতির সম্পুট বিদীর্ণ করে একবার অতিমানস-বিজ্ঞানের উন্মেষ হলেই আর এই কাপণ্যোপহত কৃচ্ছ্রসাধনার কোনও প্রয়োজন থাকবে না। বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠ আবির্ভাবেই দেখা দেবে পার্থিব প্রকৃতিতে গোত্রান্তরের সূচনা; এবং অতিমানস-পরিণামের পূর্ণ-সিদ্ধিতে, অর্থাৎ অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দের অনুত্তর প্রকাশের ষোড়শকল মহিমায় অতিমানসী সিদ্ধির উত্তরণে, এই গোত্রান্তরই পর্যবসিত হবে রূপান্তরে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

দিব্য-জীবন

ত্বমগ্নে বৃজিনবর্তনিং নরং সক্মন্ পিপর্ষি বিদথে বিচর্ষণে।

ঋগ্বেদ ১।৩১।৬

হে অগ্নি, হে সর্বদর্শী, কুটিল পথে চলে যে-মানুষ, তাকে তুমি পার ক'রে নিয়ে যাও নিত্যস্থিতিতে—নিয়ে যাও বিদ্যার ভূমিতে।

—ঋগ্বেদ (১।৩১।৬)

উভে পুনামি রোদসী ঋতেন।

ঋগ্বেদ ১।১৩৩।১

ঋতের দ্বারা পূর্ণ করি আমি দ্যুলোক আর ভূলোককে।

—ঋগ্বেদ (১।১৩৩।১)

সো মদঃ . . . . ।
দ্বা জনা যাতয়ন্নন্তরীয়তে নরা চ শংসং দৈব্যং চ ধর্তরি ॥

ঋগ্বেদ ৯।৮৬।৪২

যে তাঁর ধারক, তার মাঝে তাঁর উন্মাদনা দুটি জন্মকে করে প্রস্ফুরিত— একটি নরের আত্মখ্যাতি আরেকটি দিব্য প্রকাশ, এবং এই দুটির মাঝে সে করে আনাগোনা।

—ঋগ্বেদ (৯।৮৬।৪২)

তে অস্য সন্তু কেতবোঽমৃত্যবোঽদাভ্যাসো জনুষী উভে অনু।
যেভির্নৃম্ণা চ দেব্যা চ পুনতে ॥

ঋগ্বেদ ৯।৭০।৩

তাঁর বোধি-চেতনার অদ্ভুত কিরণেরা থাকুক সেখানে অমৃতের পিপাসা নিয়ে— দুটি জন্মকে ব্যাপ্ত করে; তাদের দিয়েই যুগপৎ তিনি বইয়ে দেন নরের বীর্য আর দেবতার বিভূতি।

– ঋগ্বেদ (৯।৭০।৩)

আদিৎ তে বিশ্বে ক্রতুং জুষন্ত শুষ্কাদ্ যদ্ দেব জীবো জনিষ্ঠাঃ।
ভজন্ত বিশ্বে দেবত্বং নাম ঋতং সপন্তো অমৃতমেবৈঃ ॥

ঋগ্বেদ ১।৬৮।২

তোমার ক্রতুকে স্বীকার করুক বিশ্বজন—শুষ্ক তরু হতে জীবন্ত হয়ে, হে দেবতা, যখন প্রজাত হও তুমি; দেবত্বের অধিকার লভুক বিশ্বজন, তোমারই বিচিত্র অয়নদ্বারা পাক্ তারা ঋত ও অমৃতের অধিকার।

—ঋগ্বেদ (১।৬৮।২)

জড়ের জগতে চেতন-জীবরূপে আমরা আবির্ভূত হয়েছি; আমাদের এই মর্ত্যজীবনের তত্ত্ব এবং তাৎপর্য কী ? একবার যদি সে-তাৎপর্য ধরতে পারি, তাহলে কোন্‌দিকে কতদূর পর্যন্ত তার ইশারা আমাদের চালিয়ে নেবে— কোন্ অনাগত মানবীয় বা দিব্য নিয়তির দিকে ? এতক্ষণ ধরে আমরা এই প্রশ্নেরই সমাধান করবার চেষ্টা করেছি। হতে পারে, আমাদের মর্ত্যজীবন জড়ভূতের কিংবা জড়কৃৎ কোনও শক্তির অর্থহীন একটা খেয়ালমাত্র, অথবা

কোনও চিৎশক্তিরই দুর্বোধ লীলায়ন। অথবা হয়তো এ শুধু বিশ্ববহির্ভূত কোনও বিধাতৃপুরুষের খেয়ালখুশির একটা ঢেউ: সেক্ষেত্রে এর কোনও মর্ম-নিহিত তাৎপর্য থাকতে পারে না। আর এ-খেয়ালের মূলে যদি জড় বা অচিৎ-শক্তির লীলা থাকে, তাহলে তো তাৎপর্যসন্ধানের কোনও কথাই ওঠে না: তখন একে যদৃচ্ছা-শক্তির অতর্কিত একটা কম্বুরেখার বিসর্প বলব, নয়তো বলব অন্ধনিয়তির পাষাণে-আঁকা কুটিল লিপি। আর এ যদি চিৎসত্তার একটা প্রমাদের নিদর্শন হয়, তাহলে মহাশূন্যের বুকে একদিন মিলিয়ে যাবে এর কল্পিত তাৎপর্যের বিজৃম্ভণ। বিধাতার চেতনায় আমাদের মর্ত্যজীবনের একটা-কিছু অর্থ হয়তো আছে; কিন্তু তাঁর দিব্যক্রতুকে আমাদের কাছে স্বেচ্ছায় প্রকাশ করলেই আমরা তাকে ধরতে পারি, নইলে বস্তু-স্বভাবের স্বতঃস্ফূর্ত পরিচয় হতে তার তত্ত্ব পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।...কিন্তু মর্ত্যের জীবন যদি কোনও স্বয়ম্ভূ পরমার্থ-তত্ত্বের বিভূতি হয়, তাহলে মানতে হয়, সেই সৎস্বরূপের কোনও অন্তর্গূঢ় সত্যের স্বকৃৎ পরিণাম এখানে ঘটছে এবং সেই সত্যের স্ফুরণই আমাদের মর্ত্যস্থিতি ও জীবনায়নের মর্মকথা। পরমার্থসতের স্বরূপ যা-ই হ'ক, আমাদের চেতনায় তা ভাসছে অন্তহীন কাল-কালনারূপে, অখন্ড-সম্ভূতির লীলারূপে,—কেননা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতে নিহিত রয়েছে রূপকৃৎ অতীতের অন্যথাকৃত ও রূপান্তরিত বীর্য, আবার আমাদের অতীতে ও বর্তমানে নিহিত ছিল এবং এখনও আছে তাদেরই ভবিষ্য-পরিণামের অব্যক্ত অতএব অদৃশ্য কলল। মর্ত্যজীবনের তাৎপর্যই আমাদের অনাগতের নিয়তি নিরূপিত করবে; সেই নিয়তি আমাদের মধ্যে সত্যসম্ভবের অমোঘ সিদ্ধবীর্যরূপে আমাদের সত্তার অন্তর্গূঢ় অথচ ক্রমোন্মিষৎ তত্ত্বভাবের অবন্ধ্য প্রেতিরূপে গুহাহিত হয়ে আছে, এই অব্যাকৃত তত্ত্বভাবের নিরঙ্কুশ ব্যাকৃতিই আমাদের জীবনসত্য। এই নিয়তি এবং ব্যাকৃতি আজও সিদ্ধরূপ গ্রহণ না করলেও, জগৎ-বিসৃষ্টির সাম্প্রতিক ইতিহাস এযাবৎ তাদেরই রূপায়ণের ব্যঞ্জনা বহন করে এনেছে। এক স্বয়ম্ভূ-সতের নিত্যসম্ভবৎ লীলায়নকে যদি মানি, বিসৃষ্টিকে যদি শুদ্ধসন্মাত্রের তত্ত্বভাবের কালকলিত রূপায়ণ বলি,—তাহলে সেই স্বয়ম্ভূ তত্ত্বভাবের অন্তর্গূঢ় স্বরূপ-সত্যই আমাদের সম্ভূতির সাধ্য এবং এই সত্যের সিদ্ধিই আমাদের মর্ত্য-জীবনের তাৎপর্য।

এই বিশ্বরূপা কালকলনার মূলে আছে প্রাণ ও চেতনার প্রেতি; তাদের বাদ দিলে জড় ও জড়ের জগৎ হয়ে পড়ে একটা অর্থহীন প্রতিভাসমাত্র—যার মূলে আছে যদৃচ্ছার খেয়াল, নয়তো নিশ্চেতন নিয়তির তাড়না। কিন্তু প্রাকৃত প্রাণ ও প্রাকৃত চেতনা তা বলে বিশ্বরহস্যের সবখানি নয়—কেননা স্পষ্টই দেখছি আজও তারা পরিণামের শেষ পর্বে পৌঁছয়নি, আজও তারা চলতি-পথের

পথিক। আমাদের মধ্যে চেতনা মনের রূপ ধরেছে, কিন্তু সে-মন অজ্ঞান ও অপূর্ণ—চিৎপরিণামের সেই একটা অবান্তর ব্যাপার মাত্র, আজও তার অসমাপ্ত অভ্যুদয়ের লক্ষ্য রয়েছে স্বোত্তরণের দিকে। চেতনার কত অবরভূমি মনের আগে তারি উৎসরূপে ফুটেছিল; অতএব এবার তার অভিযান হবে উত্তরায়ণের পথে—চেতনার ঊর্ধ্বভূমির দিকে। আমাদের মননশীল বুদ্ধিযুক্ত বিচারপ্রবণ মনের আগে যে-চেতনার উন্মেষ হয়েছিল, তাতে প্রাণ ও সংজ্ঞা ছিল কিন্তু মনন ছিল না;তারও আগে গেছে অবচেতনা ও নিশ্চেতনার যুগ। অতএব স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে, আমাদের পরে কিংবা আমাদেরই অনাগত আত্মভাবের ব্যাকৃতিতে এক স্বয়ংজ্যোতি বৃহত্তর চেতনার আবির্ভাব উদ্যত হয়ে আছে—যার সংবিৎ প্রাকৃত-মনের কৃত্রিম-ভাবনার নিরপেক্ষ হবে। আমাদের অপূর্ণ ও অজ্ঞান মননধর্মী চিত্তেই যে চেতনার চরম বিভূতির প্রকাশ, একথা নিশ্চয় সত্য নয়। কারণ আত্মসংবিত্তি ও বিষয়সংবিত্তি চেতনার স্বধর্ম এবং স্বরূপদৃষ্টিতে এই ধর্মের প্রকাশ হবে অব্যাহত ও স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু আমাদের মধ্যে দেখছি, সংবিতের ক্রিয়া পরোক্ষ ব্যাহত অসিদ্ধ ও কৃত্রিম সাধনসাপেক্ষ, —কেননা এখানে চেতনার উন্মেষ হচ্ছে অনাদি-অচিতির সম্পুটকে দীর্ণ করে, সুতরাং সহজেই সে অচিতি-সুলভ অবিদ্যাতামসের জালে জড়িয়ে যায়। কিন্তু অব্যাহত উন্মেষের অবন্ধ্য বীর্য যে তার আছে, আত্মস্বরূপের পূর্ণ-মহিমায় নিজেকে প্রকট করাই যে তার অনুত্তরণীয় নিয়তি—একথাও সুনিশ্চিত। চৈতন্যের স্বরূপ হল বিষয়ের পূর্ণ সংবিত্তি এবং তার মুখ্যতম বিষয় 'আত্মা' বা চিৎ-সত্ত্ব—প্রাকৃত-আধারে যার চেতনার ঊর্ধ্বপরিণাম ঘটছে; আর আমরা যাকে বলি অনাত্মা তাই হল তার গৌণবিষয়। কিন্তু অখণ্ডভাব যদি সত্তার তত্ত্ব হয়, তাহলে অনাত্মাও স্বরূপত আত্মাই। অতএব সংবিত্তির অখণ্ডপূর্ণতা হবে উন্মিষন্ত চেতনার চরম নিয়তি, অর্থাৎ তার আত্মসংবিত্তির ও সর্বসংবিত্তিতে কোথাও ফাঁক থাকবে না। চেতনার এই স্বাভাবিক পূর্ণতাসিদ্ধি আমাদের কাছে মনোবাণীর অতীত একটা অতিচেতনস্থিতি; তাই প্রাকৃত-মন সহসা সেখানে উৎক্ষিপ্ত হলে প্রথমত বিকল হয়ে পড়ে—অথচ এই অতিচেতনার দিকেই চলেছে আমাদের উন্মিষন্ত চিৎসত্ত্বের অভিযান। কিন্তু মর্ত্যচেতনার আধাররূপিণী অচিতিও স্বরূপত যদি অতি-চিতিরই একটা সংবৃত্ত বিভূতি হয় তবেই অতিচেতনা বা স্বরূপচেতনার দিকে প্রাকৃত-চেতনার উত্তরায়ণ সম্ভব হবে; কেননা স্বয়ম্ভূ-তত্ত্বের সম্ভূতি-লীলায় আমাদের মধ্যে সদ্ভূত হয়ে যা দেখা দেবে, পূর্ব হতেই তার বীজ-ভাব ঐ অচিতির মধ্যে অন্তর্গূঢ় সূচীমুখরূপে নিহিত থাকা চাই। অচিতিকে এমনি সংবৃত্ত ভাব বা শক্তি বলতে কোনও দ্বিধা হয় না—যখন গভীর অভিনিবেশের ফলে এই তথাকথিত অচিৎ-শক্তির জড়-

বিসৃষ্টিতেও দেখি এক গুহাহিত বিশালবুদ্ধির অনন্ত-বিচিত্র মন্থর-জটিল সাধনা এবং আমাদেরও মধ্যে অনুভব করি ঐ সংবৃত্ত-বুদ্ধিরই পূর্ণস্ফুট আত্মপ্রকাশের নিরন্ত প্রয়াস। স্পষ্টই দেখি আধারে উন্মিষন্ত চেতনার অভিযান পথের কোনই বাধা মানতে চায় না, যতক্ষণ তার অন্তঃসংবৃত সত্যের পূর্ণবিবৃতি না ঘটেছে—আত্মবিৎ ও সর্ববিৎ পূর্ণপ্রজ্ঞার ষোড়শকল মহিমায় তার নিরঙ্কুশ প্রকাশ না হয়েছে। এই অখণ্ড আত্মসংবিৎ ও সর্বসংবিৎকে আমরা অতিমানস বা বিজ্ঞানঘন চেতনা বলেছি। ঐ চেতনাই আমাদের গুহাহিত পরমার্থসৎ, স্বয়ম্ভূ-তত্ত্ব বা চিৎস্বরূপের আত্মচেতনা এবং আধারে তার মন্থর অভিব্যক্তিই আমাদের নিয়তি; আমরা স্বয়ম্ভূ-তত্ত্বেরই আত্মসম্ভূতি এবং তার পূর্ণস্বভাবে ফুটে ওঠা আমাদের মর্ত্যজীবনের তাৎপর্য।

চৈতন্য যদি জড়াশ্রয়ী সত্তার মর্মরহস্য হয়, তাহলে প্রাণে তার বহির্ব্যঞ্জনা কিংবা তার অর্থক্রিয়ার শক্তি বা সাধনবীর্য ফুটেছে, কেননা প্রাণই চৈতন্যকে জড়ের কবল হতে মুক্ত করে, শক্তিবিগ্রহে তাকে রূপায়িত করে এবং তার আত্মপরিণামকে জড়ের ক্রিয়ায় ফুটিয়ে তোলে। আত্মবিভূতিকে জড়ের আধারে প্রকট করা যদি উন্মিষন্ত চিৎপুরুষের অন্নময়-কোশ পরিগ্রহণের চরম লক্ষ্য হয়, তাহলে তাঁর সে আবিঃ-সাধনার সুস্পষ্ট বহির্ব্যক্তি আমরা দেখতে পাই প্রাণের জঙ্গমলীলায়। কিন্তু প্রাকৃত-প্রাণ অভিব্যক্তির চরমে পৌঁছয়নি এখনও; প্রাণের সার্থক ব্যূহনে ও পূর্ণতায় যেমন চেতনার উপচয় ঘটে, তেমনি প্রাণের পরিস্ফুরণে চেতনারও অভ্যুদয় সহজ হয়—অর্থাৎ চেতনার প্রসার সূচিত করে প্রাণের প্রসার। মনোময় জীব হয়েও মানুষ প্রাণের দৈন্যে কুণ্ঠিত, কেননা মনেই পরমার্থ-সতের চিৎশক্তির পূর্ব্য এবং অনুত্তম প্রকাশ নয়; এমনকি মনের অভিব্যক্তি নিখুঁত হলেও চিৎপরিণামের অনেক অনভিব্যক্ত পর্বের সাধনা তবুও অসমাপ্ত থেকে যায়। কারণ জড়ের গুহায় অন্তর্গূঢ় রয়েছে যে, সে চিৎসত্তা—মন নয়; কিংবা মনকে তার চিদ্‌বিলাসের স্বাভাবিক বিভূতি বলা চলে না। চিৎসত্তার স্বাভাবিক স্ফুরত্তা প্রকাশ পায় অতিমানসে বা বিজ্ঞানঘন-চেতনার বৈদ্যুতীতে। অতএব প্রাণের সাধনা যদি চিৎ-স্বরূপের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়, তাহলে তার সিদ্ধি হবে এই মর্ত্য-আধারেই চিন্ময়-পুরুষের আবির্ভাবে এবং প্রকৃতি-পরিণামের রহস্যভার-মন্থর আকূতির চরিতার্থতা ঘটবে চিন্ময়-পুরুষের বিজ্ঞানঘন বা অতিমানস শক্তিকূটে আবির্ভূত সিদ্ধচেতনার দিব্য জীবনায়নে।

অধ্যাত্মজীবনের যে-কোনও ধারার তাৎপর্য হল জীবনের দিব্যমহিমাকে ফুটিয়ে তোলা। কোথায় যে মনোরাজ্যের শেষ আর দিব্যজীবনের শুরু, তা বলা কঠিন, কেননা জীবনের এ-দুটি পর্বের অন্যোন্যপ্রসর্পণের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে এক দীর্ঘায়িত ছায়াতপের লীলা। অধ্যাত্মসংবেগের তীব্র তাড়নায়

জীবন যদি একান্তই ইহবিমুখ না হয়, তাহলে এই অন্তরিক্ষলোকের অনেকখানি জুড়ে থাকে মর্ত্যজীবনেরই উত্তরায়ণের সাধনা। চিজ্জ্যোতিতে বারবার অবগাহন করে প্রাণ-মনে যে দিব্য-মহিমার প্রভাস ফোটে লোকোত্তরের অব্যক্ত ছটার ছোঁয়াচ পেয়ে, তারি ক্রমিক উপচয়ে তরলিত অন্তরিক্ষের আড়াল ভেঙে অবশেষে সমস্ত আধার হয়ে ওঠে চিৎশক্তির পূর্ণজ্যোতিতে অখণ্ড-জ্যোতিষ্মান। কিন্তু ঊর্ধ্বপরিণামিনী মহাপ্রকৃতির আকূতিকে নিঃশেষে চরিতার্থ করতে হলে এই জ্যোতির্ময় গোত্রান্তরের সংবেগ আধারের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া চাই—দেহ-প্রাণ-মনের সবখানিকে নতুন করে গড়া চাই। শুধু অন্তরে পরমদেবতার উপলব্ধিতে নয়, উপলব্ধির বীর্যে অন্তর-বাহিরের অকুণ্ঠ নবায়নেই ফুটবে জীবনের পরম সার্থকতা: আবার এ-মহাসিদ্ধি শুধু ব্যক্তির জীবনে মূর্ত হবে না, বিজ্ঞানঘন-পুরুষমণ্ডলীর সংঘজীবনেও তার প্রতিষ্ঠা আনবে এই পার্থিব-প্রকৃতিতেই চিন্ময়ী মহাসম্ভূতির সিদ্ধবীর্যের অবন্ধ্য প্রেতি। তার জন্য সাধকের জীবনে যেমন চাই অন্তরের আত্মসমাহিত স্থিতিতে চিৎসত্ত্বের সহস্রদল স্ফুরণের সিদ্ধি তেমনি চাই তাঁর সন্ধিনী-শক্তির বহিরুল্লাসে, এই সিদ্ধির আবির্ভাবে এবং তার নিরঙ্কুশ স্ফুরত্তার প্রয়োজনে আত্মসমাহিত চেতনার কৌস্তুভ-দীপ্তিকে বিশ্বজীবনে পরিব্যাপ্ত করবার বীর্য এবং সাধনেরও উন্মেষ চাই।

আধ্যাত্মিকতা যে অন্তরের বস্তু, বৈকুণ্ঠ যে আমাদেরই হৃদয়ে, বহির্জীবনের কোনও সূত্র কি সাধনের 'পরে যে তার নির্ভর নয় কিংবা সেখানে তার অভিব্যক্তিও যে অপরিহার্য নয়—এ-কথা সত্য। আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে অন্তর্জীবনেরই মূল্য বেশী, এবং অন্তরের সত্যকে রূপ দেয় বলেই বাইরের যা-কিছু কদর—তাও মানি। সিদ্ধপুরুষ যে-ভাবেই বিচরণ করুন, তাঁর ক্রিয়ামুদ্রাতে গীতার ভাষায় বলতে গেলে 'স সর্বথা ময়ি বর্ততে'; চিন্ময়-সত্তার বেত্তা তিনি, অতএব পরমপুরুষই তাঁর একান্ত বিহারভূমি। চিদাত্মস্বরূপের ভাবনায় তন্ময় যে চিন্ময়-পুরুষ, বাইরে-ভিতরে সর্বত্র তিনি অনুভব করেন দিব্য-পুরুষেরই দীপ্ত অনুভাব,—অতএব তাঁর অন্তর দিব্য-জীবনের নিত্য-আস্বাদনে জ্যোতির্ময় এবং তাঁর বাইরের ব্যবহারেও নিশ্চয় তার ছটা ফুটবে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তার মধ্যে মর্ত্যপ্রকৃতিসুলভ মানুষী ভাবনা বা ক্রিয়ার সাধারণ ব্যাপার ছাড়া অলৌকিক কোনও শক্তির লীলা থাকবে না। অধ্যাত্মসত্যের এই হল প্রথম পাঠ এবং তার বীজমন্ত্রও বটে; কিন্তু তাহলেও চিন্ময়-পরিণামের দিক থেকে বিচার করলে এ শুধু ব্যক্তি-চেতনার সিদ্ধি এবং বিমুক্তি—এতে তার পরিবেশের মধ্যে কোনও পরিবর্তন এল না। কিন্তু মর্ত্যপ্রকৃতিতেই গোত্রান্তরের বৃহৎ চেতনাকে স্ফুরন্ত করতে হলে, চাই জীবন ও কর্মের সমগ্র স্বরূপ ও সাধনধারার চিন্ময় গোত্রা-

ন্তর, এই পৃথিবীর বুকে চাই এক নবীন দেবজাতির আবির্ভাবে মর্ত্য-জীবনেরও নবায়ন; ভাগবত-সংকল্পের এই অমোঘসিদ্ধির প্রত্যাশাই আমাদের ভাবনায় জ্বলে ওঠা চাই। তাই প্রকৃতির বিজ্ঞানঘন-পরিণামকে আমরা সবার উপরে ঠাঁই দিই; লক্ষ যুগ ধরে প্রকৃতির প্রাক্তন যত সাধনা তার এই হিরণ্য-বর্তনি আমূল-রূপান্তরেরই সাধনা ও আয়োজনমাত্র। বিজ্ঞানঘন-চেতনার বীর্যে স্পন্দিত প্রাণ পৃথিবীর বুকে দিব্যজীবনের সার্থক মহিমা ফোটাবে; সে-জীবনায়নে বিশ্ববিদ্যা ও বিশ্বকর্মের অনুকূল লোকোত্তর করণ-শক্তির উন্মেষে এই পার্থিব আধারে অবন্ধ্য-চেতনার স্ফুরদ্‌বীর্য প্রকট হবে এবং এই জড়-প্রকৃতিরই বিভাবনা চিন্ময়ী-প্রকৃতির জ্যোতির্ভাবনায় রূপান্তরিত হবে।

কিন্তু সর্বত্রই বিজ্ঞানঘন-জীবনের সমগ্র ভিত্তি স্বভাবত রচিত হবে অন্তরে—বাইরে নয়। চিন্ময়-জীবনে অন্তরাধিষ্ঠাত্রী চিৎশক্তিই অধীশ্বরী, দেহ-প্রাণ-মন তারই বিসৃষ্ট করণশক্তি বা সাধনমাত্র; ভাবনা বেদনা কি কর্ম কিছুরই সেখানে স্ব-তন্ত্র সত্তা নাই, কেননা চিজ্‌জগতে তারা কেউ লক্ষ্য নয়—উপলক্ষ্য শুধু; আমাদের অন্তর্নিহিত চিন্ময় তত্ত্বভাবের ব্যঞ্জনাকেই বাইরে তারা ফুটিয়ে তোলে নিমিত্তমাত্র হয়ে। অন্তর্মুখীনতা ছাড়া, দিব্যভাবনার প্রবর্তনা ছাড়া শুধু বহির্মুখ চেতনা কি বাহ্য উপকরণদ্বারা জীবনকে কখনও দিব্য বা মহত্তর করা যায় না। আমাদের বর্তমান প্রাকৃত-জীবনে, আমাদের পরাক্‌বৃত্ত বহিশ্চর-ভাবনায় মনে হয় আমরা যেন প্রকৃতির হাতে-গড়া পুতুল; কিন্তু অধ্যাত্মজীবনের শুরুতে নিজেকে এবং নিজের জগৎকে সৃষ্টি করবার ভার নিতে হয় আমাদেরই। সৃষ্টির এই নববিধানে অন্তর্জীবনই মুখ্য, আর-সব তার প্রকাশ বা পরিণাম মাত্র। সত্য বলতে পূর্ণতার সকল তপস্যার মূলে আছে এই অন্তরাবৃত্তির প্রেরণা—নিজের প্রাণ-মন-চেতনাকে, জাতির জীবনকে আমরা এরই প্রবর্তনায় সিদ্ধ ও সার্থক করে তুলতে চাই। আমাদের প্রাকৃত-জগৎ অবিদ্যার অন্ধতামসে আচ্ছন্ন অপূর্ণ জড়ের জগৎ; আমাদের বহিশ্চর চেতন-সত্ত্বও এই নির্বাক বিপুল অন্ধতমিস্রার বিক্ষেপ ও প্রৈষাতে সৃষ্ট তারই নির্মাণশক্তির একটা নিদর্শন মাত্র। এখানে এসেছি আমরা স্থূলজন্মের দুয়ার দিয়ে, পরিবেশের চাপে ও জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে আমাদের অভ্যুদয়ের সাধনা চলছে; অথচ প্রকৃতির বশে অবশ হয়েও আমরা আমাদের মধ্যে অন্তর্গূঢ় আরেকটা কিছুর অস্পষ্ট সত্তা বা আকৃতি অনুভব করি—যেন এই প্রাকৃত-বিধানেরও বাইরে আছে এই আধারেই গুহাহিত এক স্বারাট ও স্বয়ম্ভু চিৎসত্তা, যে আমাদের আত্মপ্রকৃতিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে তার রহস্য-নিবিড় পূর্ণতার বা সিদ্ধভাবনার রূপায়ণের অভিমুখে। এই প্রেরণায় সাড়া পেয়ে কে যেন জেগে ওঠে আমাদের মধ্যে—নিজেকে সে গড়তে চায় কোন্ অজানার চিন্ময় রূপাদর্শে; সেইসঙ্গে তার বহির্জগতের অভ্যস্ত পরিবেশকেও

সে ফোটাতে চায় উদ্যত চিত্তের অক্লান্ত সাধনায় আরও সুন্দর ও বৃহৎ করে—তারই উপচিত প্রাণ-মন-চেতনার কল্পছবির মত। আমাদের চিত্তে যে-কল্পনা জাগে, চেতনার গভীর হতে উৎসারিত হয় যে স্বতোরূপায়ণের চিন্ময় সংবেগ, তার আদর্শে জগৎকে আমরা অহরহ গড়তে চাইছি অপূর্বতার অনুপম সৌষম্যে নিখুঁত করে।

অথচ আমাদের মনশ্চেতনা তমসাচ্ছন্ন, পক্ষপাতী ধারণায় দুষ্ট, বাইরের বিরোধাভাসে বিমূঢ় ও অযথাচালিত, ভব্যার্থের বাহুল্যে বিভ্রান্ত। তাই তার সাধনশক্তিকে সে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় নিয়োজিত করে তিনটি বিভিন্ন লক্ষ্যের অভিমুখে। কখনও তত্ত্ববস্তুর সন্ধানে সে ঝুঁকে পড়ে অধ্যাত্মজীবনের পুষ্টি ও সিদ্ধির দিকে: তখন ব্যক্তির অন্তর্জীবনের অভ্যুদয় ছাড়া আর-কিছু তার কাম্য থাকে না। আবার কখনও সে ঝুঁকে পড়ে বহির্জীবনের ব্যক্তিগত পরিপুষ্টির দিকে: তখন মননের ঐশ্বর্য ও বহির্জগতে কর্মযোগের সিদ্ধি কিংবা ব্যক্তিমনের কল্পিত কোনও আদর্শের রূপায়ণ তার আকাঙ্ক্ষিত হয়। আবার কখনও সে বাইরের জগতের দিকে বিশেষ করে ঝুঁকে পড়ে; তখন নিজের ভাব রুচি সংস্কার বা আদর্শকল্পনা অনুযায়ী জগতের উন্নতি-সাধনা তার ব্রত হয়। এমনি করে একদিকে আমাদের কানে ব্রহ্মাত্মভূত লোকোত্তর চিন্ময় সত্যস্বরূপের উদাত্ত আহ্বান বেজে ওঠে—সে আমাদের টানে জগতের বন্ধন ছিঁড়ে বিশ্বোত্তর তত্ত্বভাবের অবিচল স্বপ্রতিষ্ঠার দিকে; আর-এক দিকে নিখিল বিশ্ব আমাদের 'পরে তার দাবি পাঠায়, কেননা সেও তো পরমপুরুষেরই বিরাট আত্মরূপায়ণ, বিশ্বোত্তীর্ণ তত্ত্বভাবেরই ছদ্মবিভূতি। তারও পরে আছে আমাদের প্রাকৃতসত্ত্বের দ্বৈধ বা দ্বিধাগ্রস্ত দাবি; বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের 'পরে তার নির্ভর হলেও সে যেন দুয়ের মধ্যে সংযোগের সেতু। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সে যেন বিশ্বপ্রকৃতির একটা বিক্ষেপ; অথচ তার সত্যকার বিধাতা আমাদেরই আধারে অধিষ্ঠিত আছেন—তার সম্পর্কে বিশ্ব-ব্যাপারের আপাত-কর্তৃত্ব তাঁরই একটা প্রাথমিক প্রয়োজনমাত্র। বস্তুত আমাদের প্রকৃতি-স্থ পুরুষ হৃদিস্থিত চিন্ময় উত্তর-পুরুষেরই ব্যাকৃতি বা ছদ্মবিভূতি। এই প্রাকৃত-পুরুষের প্রেতি আমাদের অধ্যাত্ম-সিদ্ধি বা আত্ম-মুক্তির তপস্যা ও বিশ্বহিতব্রতের মধ্যে কাজ করে তটস্থাশক্তিরূপে এবং উভয়ের সামঞ্জস্যবিধানদ্বারা সৃষ্টি করে মহত্তর বিশ্বে মহত্তর ব্যক্তিত্বের আদর্শ। কিন্তু পরমার্থ-তত্ত্বকে খুঁজতে হবে আমাদের অন্তরের গহনে—সেইখানে সিদ্ধজীবনের উৎস এবং প্রতিষ্ঠা আবিষ্কার করতে হবে; বাইরের জীবন তখনই সত্য ও সুন্দর হবে, যখন অন্তর হতে সত্য-স্বরূপের উপলব্ধি যোগাবে তার প্রেরণা।

চিৎস্বরূপের উপলব্ধিতেই দিব্যজীবনের উন্মেষ এবং প্রতিষ্ঠা। উপ-

নিষদের ভাষায়, আপন শরীর হতে অর্থাৎ অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় কোশের কঞ্চুক হতে অনেক ধৈর্যে এই চিৎস্বরূপকে উদ্ধৃত প্রকাশিত ও উন্মেষিত করতে না পারলে—এককথায় অন্তরে চিন্ময়-জীবনের প্রতিষ্ঠা না হলে ব্যাবহারিক জীবনকে কখনও দিব্য করে তোলা সম্ভব নয়। এমন-কি দিব্য-জীবন বলতে চিন্ময় ভাগবত-জীবন না বুঝে যদি বুঝি মনোময় বা প্রাণময় দেবতাদের আদর্শ, তাহলেও আমাদের ব্যষ্টি মনোময়-সত্ত্ব বা সকাম শক্তিসাধনায় উপচিত প্রাণময়-সত্ত্ব যতক্ষণ অনুরূপ দেববীর্যদ্বারা আপূরিত না হচ্ছে, ততক্ষণ তথাকথিত দিব্য-জীবনের এই অবর-সাধনাও আমাদের সিদ্ধ হবে না—মনোময় দেবভাব কি প্রাণময় অসুরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অবচিন্ময় অতিমানবের অধিকারও আমরা দাবি করতে পারব না। তাই দিব্য-জীবনের ভূমিকারূপে প্রথমেই অন্তরে চিন্ময়-জীবনের প্রতিষ্ঠা চাই; তারপর তারই বীর্যে সমগ্র বহিশ্চর-সত্তার রূপান্তর ঘটানো, সমস্ত ভাবনা বেদনা ও কর্মকে ঐ অন্তশ্চেতনার মন্ত্রশক্তিতে পরিণত করা--এই হল সাধনার দ্বিতীয় পর্ব। আধারের যে-অংশে শক্তির উল্লাস, সেখানে যদি চিন্ময় প্রাণের মহত্তর ও গভীরতর সংবেগ আনতে পারি, তাহলেই জীবনকে ও জগৎকে গড়া যায় নতুন করে- হয়তো প্রাণ ও মনের কোনও সিদ্ধবিভূতির দ্বারা, নতুবা চিৎসত্ত্বের ষোড়শকল মহিমার বৈদ্যুতিতে। অসিদ্ধ জনগোষ্ঠীর চেষ্টায় কখনও সিদ্ধজগৎ গড়ে উঠতে পারে না। শিক্ষা-দীক্ষা আইন-কানুন সমাজ-ধর্ম বা রাষ্ট্রতন্ত্র দিয়ে যদি আমাদের সমস্ত কর্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়ন্ত্রিত করি, তাহলেও তার ফলে আমরা পাব শুধু ছককাটা একটা মানস-তন্ত্র ও জীবন-সাধনা কি আচারের গতানুগতিকতা। কিন্তু নিয়মতন্ত্র দিয়ে কখনও গোত্রান্তর সিদ্ধ হয় না, মানুষকে অন্তর হতে সৃষ্টি করা যায় না—এমন-কি এতে হৃদয়ধর্ম মনস্বিতা কি প্রাণের ঐশ্বর্য কোনদিক দিয়েই একটা নিখুঁত মানুষ গড়া চলে না। কারণ মানুষের হৃদয় প্রাণ মন তার সত্তারই বীর্যবিভূতি বলে তারা দল মেলে মুক্তির আনন্দে, তাই তাদের ছাঁচে ঢেলে কখনও তৈরী করা যায় না; বাইরের তন্ত্র আর যন্ত্র তাদের আত্মপ্রকাশের সহায়মাত্র হতে পারে, কিন্তু সৃষ্টি ও পুষ্টির মন্ত্র তো তাদের জানা নাই। কলে ফেলে মানুষের জীবনে কখনও অভ্যুদয়ের সাড়া জাগানো যায় না; সে-সাড়া জাগে উত্তম-পুরুষের নিরপেক্ষ শক্তিপাতে, তাঁরই হৃদয়-প্রাণ-মনের বীর্যময় সমাবেশে। কিন্তু তখনও অন্তর হতেই অভ্যুদয়ের গতিপ্রকৃতি নিরূপিত হয়—বাইরে থেকে নয়; সাধকের গুহাহিত চেতনাই জানে শক্তিপাতে কী ভাবে সে সাড়া দেবে। আমাদের সৃষ্টির তপস্যা ও অভীপ্সাকেও সবার আগে এই সত্যের দীক্ষা দিতে হবে, নইলে মানুষের সকল সিসৃক্ষা ব্যর্থতার আবর্তে প্যাক খেয়ে মরবে এবং তার সিদ্ধি হবে শুধু অসিদ্ধিরই চাকচিক্যময় বঞ্চনা।

নিখিল প্রকৃতি জুড়ে চলেছে সত্ত্বাপত্তি ও সম্ভূতির তপস্যা—একটা-কিছুর রূপায়ণের আকূতি। আমাদের জ্ঞানে বেদনায় ও কর্মে শুধু স্বরূপশক্তির গৌণ-পরিচয় মেলে; পুরুষের আংশিক আত্মরূপায়ণের সাধনায় তার যে ভূতার্থের প্রকাশ, আর তার উদ্যত অভীপ্সায় যে অসিদ্ধ ভব্যার্থের আকূতি, পুরুষের ভাবনা বেদনা ও কর্ম তার অনুকূল সাধনমাত্র—এই তাদের সার্থকতা। কিন্তু ধর্ম শীলাচার আজীব সমাজ ও রাষ্ট্রকে অবলম্বন করে আত্ম-সুখ বা পরহিতের এষণায় মানুষের ভাবনা-বেদনা-কর্মের যত আন্দোলন, শুধু দেহ-প্রাণ-মনের চরিতার্থতা খুঁজে তার জীবনাদর্শের যত সমৃদ্ধ কল্পনা --তাতেই কি তার পুরুষার্থের চরম পরিচয়? বস্তুত মানুষের এসমস্ত বৃত্তি তো তার অন্তর্নিহিত সন্ধিনী-শক্তি বা সম্ভূতি-শক্তির উল্লাস, তার শরীরী-আত্মার বিসৃষ্টি, আপন অর্থ খুঁজে পেয়ে তাকে রূপ দেবার সাধনমাত্র। কিন্তু মানুষের জড়াশ্রয়ী-মনের দৃষ্টি অন্যথাবৃত্ত, বস্তু-সত্যের বিভাবনাকে বিপর্যস্ত আকারে দেখতে সে অভ্যস্ত,—কেননা প্রকৃতির আপাতপ্রতীয়মান বহিশ্চর শক্তিকে সে আদ্যাশক্তির আসন দিয়েছে। প্রাকৃত শক্তিস্ফুরণের যে-বাহ্যক্রম, তাকেই সে সৃষ্টিব্যাপারের নিষ্কর্ষ মনে করে; কিন্তু এই বহিরঙ্গ-প্রবৃত্তির অন্তরালে যে-রহস্যক্রম প্রচ্ছন্ন রয়েছে, সেখানে তার দৃষ্টি পৌঁছয় না। রূপ ও বিভূতির বৈচিত্র্যে অন্তর্গূঢ় সত্তার স্বরূপবীর্যকে প্রকট করা প্রকৃতির রহস্যক্রম; তার বাইরের চাপ শুধু সংবৃত্ত সত্তার এই আত্মপরিণাম ও আত্ম-রূপায়ণের আকূতিকে জাগিয়ে তোলবার একটা কৌশলমাত্র। প্রকৃতির স্থূল-পরিণাম যখন চিন্ময়-পরিণামের পর্যায়ে উন্নীত হয়, তখন এই রহস্যক্রম হয় সৃষ্টির একমাত্র প্রেতি; শক্তির সমস্ত কঞ্চককে ভেদ করে অন্তর্গূঢ় চিৎ-কলাকে বিদ্যুৎস্পর্শে উদ্বুদ্ধ করাই তখন সকল সাধনার চরম। আমাদের পরম পুরুষার্থ আত্মস্বরূপ হওয়া বা নিজেকে পাওয়া; কিন্তু আধারে আত্মা আছেন গুহাহিত হয়ে,—তাঁকে পেতে দৈহ্যআত্মা প্রাণ-আত্মা ও মন-আত্মাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে, তবেই আমরা পৌঁছব ঋতম্ভরা আত্মসত্তার চিন্ময় পরম-পরার্ধে এবং তার প্রকাশ ও বিমর্শের বৈভবকে স্বতঃস্ফূর্ত দেখব। গুহাচর হয়ে অন্তরাবৃত্ত-চেতনার উন্মেষ-দ্বারাই আমরা স্বরূপ-সত্যের অপরোক্ষ-অনুভব পাব; একবার এ-সাধনায় সিদ্ধ হলে, মহাশক্তি-নিরূপিত একমাত্র চরম সাধ্য আমাদের হবে—অন্তরের ঐ চিদ্‌বিন্দু হতে চিন্ময় দেহ-প্রাণ-মনরূপী দিব্যকলার রূপায়ণ এবং সেই লোকোত্তর ভাবনার বীর্যে এই মর্ত্যেরই বুকে গড়ে তোলা দিব্য-জীবনের অমৃত-পরিবেশ। অতএব প্রত্যেকেই অন্তরাবৃত্ত হয়ে ব্যষ্টিবিগ্রহে চিন্ময় আত্মস্বরূপকে আবিষ্কার করবে এবং সমগ্র আধারে ও সকল ব্যবহারে তার বিদ্যুন্ময় দীপ্তি ফোটাবে—এই হল মানুষের সাধনার আদিপর্ব। অন্তর্গূঢ় তত্ত্বভাবের বহির্ব্যক্তি হল সৃষ্টিলীলার

তাৎপর্য, সুতরাং শুরুতেই অন্তর দিব্যভাবের বাহন না হলে বাইরে কিছুতেই তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটতে পারে না; তাই দিব্য-জীবনের সাধনা প্রথমত এবং মুখ্যত অন্তরাবৃত্তিরই সাধনা। আধারের চিৎকেন্দ্রে ব্রহ্ম-সদ্‌ভাবের শাশ্বতী চেতনা গুহাহিত হয়ে আছে; এই শাশ্বত চিদাত্ম-স্বরূপের অনুভাব যদি মানুষের মধ্যে উদ্যত না থাকত, তাহলে কোথায় থাকত তার স্বোত্তরণের আকূতি বা জীবনসাধনায় প্রচেতনার তপস্যা?

নিরঙ্কুশ সত্ত্বাপত্তির পূর্ণসিদ্ধিই আমাদের পরা-প্রকৃতির আকূতি; কিন্তু পূর্ণ সত্ত্বাপত্তির অর্থ নিজের সম্পর্কে পূর্ণচেতন হওয়া। অচেতনা অর্ধ-চেতনা বা খিল-চেতনার মধ্যে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মবীর্যের অকুণ্ঠ প্রকাশ নাই; তাকে সত্তা বলতে পারি, কিন্তু সন্ধিনী-শক্তির অখণ্ড বিভাবনা বলতে পারি না। আত্মস্বরূপের এবং আধারের সমগ্র সত্যের অখণ্ড সম্যক্‌-সংবিৎ ছাড়া নিরঙ্কুশ সত্ত্বাপত্তির সাধনা কখনও সিদ্ধ হতে পারে না। এই আত্মসংবিৎই যথার্থ অধ্যাত্মবিদ্যা—স্বরসবাহী স্বয়ম্ভূ-সংবিৎই অধ্যাত্মবিদ্যার স্বরূপ: তার সমস্ত জ্ঞানবৃত্তিতে, এমন কি তার যে-কোনও বৃত্তিতে ঐ স্বয়ম্ভূসংবিতের আত্মরূপায়ণের উল্লাস চলে। এছাড়া বিদ্যার আর-সমস্ত বৃত্তিতে ফোটে চেতনার নিজেকে ভুলে আবার নিজের তত্ত্ব ও তথ্যের সংবিতে ফিরে যাবার প্রয়াস; অতএব তাকে বলতে পারি আত্ম-অবিদ্যার নিজেকে আবার আত্ম-বিদ্যায় রূপান্তরিত করবার মন্থর সাধনা।

আবার দেখি, সংবিৎ-শক্তির সঙ্গে সন্ধিনী-শক্তির সংবেগ জড়িয়ে আছে: সুতরাং পরিপূর্ণ সত্ত্বাপত্তির অর্থ হল আধারস্থ সন্ধিনী-শক্তির অখণ্ড-বিচ্ছুরণের সহজ অধিকারকে ফিরে পাওয়া, অর্থাৎ আত্মশক্তির পূর্ণসামর্থ্যকে অধিগত করে তার নিঃসঙ্কোচ প্রয়োগে সিদ্ধ হওয়া। অশক্ত বা অর্ধশক্ত থেকে কিংবা খিলশক্তির পঙ্গুতাকে স্বীকার করে সংবিৎ-সিদ্ধির অভিমানকে বহন করা একধরনের আত্মবঞ্চনামাত্র: এমনি করে অস্তিত্বের ক্ষুণ্ণতা কি ন্যূনতাকে লালন করাও আত্মসত্তার একটা বিভাব। কিন্তু তাকে পরিপূর্ণ সত্ত্বাপত্তি কিছুতেই বলতে পারি না। সন্ধিনী-শক্তিকে আত্মচেতনায় স্থাণুবৎ সমাহিত রেখে স্বরূপস্থিতিতে অবস্থান অবশ্য সম্ভব; কিন্তু স্ফুরত্তা আর নিত্য-স্থিতির, সম্ভূতি আর অসম্ভূতির অবিনাভাবেই সত্তার সম্যক চরিতার্থতা। আত্মার ঐশ্বর্য আত্মার দিব্যভাবেরই প্রতীক; শক্তিহীন চিৎসত্তা চিৎসত্তাই নয়। কিন্তু অধ্যাত্মচেতনা যেমন স্বয়ম্ভূ ও স্বরসবাহী, তেমনি অধ্যাত্মশক্তিও আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত স্বরসবাহী বীর্য—সেও স্বকৃৎ এবং স্বয়ম্ভূ। এমন-কি তার প্রকাশেরও সাধন তারই অঙ্গীভূত—সে-সাধন বহিরঙ্গ সাধন হলেও তাকে আত্মভূত এবং আত্মভাবের ব্যঞ্জনাবহরূপেই সে ব্যবহার করে। চিৎস্পন্দনে সন্ধিনী-শক্তির যে-প্রকাশ, তা-ই হল ইচ্ছা সংকল্প বা

ক্রতু; অতএব চিৎসত্তার যে-কোনও চিন্ময় সংকল্প সম্ভূতি কি অসম্ভূতি যে-আকারেই ফুটুক না কেন, সমগ্র সত্তায় তা ছন্দসুষমায় সার্থক হয়ে উঠবেই। যে কর্মে বা ক্রিয়াশক্তিতে এই স্বচ্ছন্দস্ফুরণের স্বাতন্ত্র্য নাই বা কর্মের সাধন-তন্ত্রের 'পরে আধিপত্য নাই, এই ন্যূনতাহেতুই সে সূচিত করে সন্ধিনী-শক্তির খিলবীর্য, চেতনার দ্বৈধভাবজনিত পঙ্গুতা এবং সত্তার আত্মপ্রকাশের কুণ্ঠা।

পরিশেষে, পরিপূর্ণ সত্ত্বাপত্তি স্বরূপানন্দের পরিপূর্ণ আস্বাদন আনবে। যে-আত্মভাবে স্বরূপোপলব্ধি ও সর্বাত্মভাবের আনন্দ নিরংকুশ হয়ে ফুটে ওঠেনি, তার উদাসীন বা ঊনীকৃত সত্তাকে অস্তিভাব বলতে পারি—কিন্তু কোনমতেই অখণ্ড সত্ত্বাপত্তি বলতে পারি না। আবার এই স্বরূপানন্দও স্বরসবাহী স্বকৃৎ ও স্বয়ম্ভূ—তার কোনও অর্থব্যপাশ্রয় নাই; তার আস্বাদনের সকল উপকরণ তার স্বাঙ্গীভূত, তারই বিশ্বাত্মভাবের বিভাবনা। দুঃখসন্তাপ ও নিরানন্দ অসিদ্ধি ও অপূর্ণতার নিদর্শন; তাদের উৎপত্তি সত্তার খণ্ডিত বোধ হতে, চেতনার সংকোচ হতে, সন্ধিনী-শক্তির কুণ্ঠা হতে। সন্ধিনী সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির পূর্ণ উপচয়ে আত্মসম্ভূতির যে নিরংকুশ সিদ্ধি, তার সহস্রদল পূর্ণতায় নিরন্তর বিহার করাই দিব্য-জীবনের মর্মরহস্য।

আবার বিশ্বাত্মভাবেই সত্ত্বাপত্তির পূর্ণ চরিতার্থতা। শুধু নিজের ক্ষুদ্র অহংএর মাঝে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকাও অস্তিত্বের একটা রূপ বটে, কিন্তু তার মধ্যে স্বরূপসিদ্ধির পূর্ণবীর্য নাই; কেননা স্বভাবতই চেতনা সেখানে সংকুচিত, শক্তি কুণ্ঠিত এবং আনন্দও মূর্ছিত। নিজেকে এমনি করে পুরোপুরি পাওয়া যায় না কখনও; তাইতে দুঃখ দৈন্য আর অজ্ঞান আমাদের জীবনকে ছেঁকে ধরে। দৈবী-সম্পদের অতর্কিত আবেশে যদিই-বা এদের হাত ছাড়ানো যায়, তাহলেও চেতনা শক্তি ও আনন্দের কুণ্ঠিত প্রকাশহেতু জীবনের পূর্ণ-প্রসার তাতে ঘটতে পারে না। একই সত্তা সর্বত্র অনুস্যূত; অতএব নিজেকে পেতে হলে সবাইকে পেতে হবে। সবার সত্তায় নিজেকে অনুভব করা এবং নিজের সত্তায় সবাইকে আবৃত করা, সবার চেতনায় চিন্ময় হওয়া, বিশ্বশক্তির সঙ্গে যুক্ত হওয়া শক্তিযোগের পূর্ণতায়, বিশ্বের কর্ম ও অনুভবকে নিজের মধ্যে বহন করা নিজেরই কর্ম ও অনুভবরূপে, সর্বভূতাত্মভূতাত্মা হয়ে সবার আনন্দকে আত্মানন্দের ব্যঞ্জনারূপে আস্বাদন করা—দিব্য-জীবনের সম্যক্-সিদ্ধির এই হল অপরিহার্য সাধন।

কিন্তু নিরূঢ় বিশ্বচেতনার পূর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিশ্বাত্মভাবের এই সাধনা বিশ্বোত্তীর্ণ ভাবনার সিদ্ধিতে সার্থক হতে পারে। আনন্ত্যের অনুভবেই আত্মসত্তার চিদ্‌ভাবের পরিপূর্ণতা। কালাতীত শাশ্বত-সত্তার অনুভব যদি আমাদের না থাকে, স্থূলদেহ কি তার আশ্রিত প্রাণ-মনের 'পরে কিংবা বিশিষ্ট-কোনও লোকসংস্থানের 'পরে—এমনকি আধার-শক্তির বিশেষ-কোনও

সংস্থানের 'পরে যদি আমাদের সত্তার নির্ভর হয়, তাহলে তাকে আত্মার তত্ত্বভাব বা চিন্ময়-সত্তার পূর্ণমহিমা কোনমতেই বলতে পারব না। কেবল শারীর-আত্মারূপে কিংবা একান্ত দেহ-নির্ভর হয়ে বেঁচে থাকার অর্থ শুধু অশাশ্বত জীবভাবকে অঙ্গীকার করে মৃত্যু ও কামনা, দুঃখ ও সন্তাপ এবং ক্ষয় ও ক্ষতির কবলিত হওয়া। দেহের সংকীর্ণ আধারে দৈহ্যশক্তির দ্বারা অভিভূত না হয়ে শারীর-চেতনাকে ছাড়িয়ে উঠতে পারি যদি, দেহকে যদি জানি আত্মার একটা বহির্বৃত্তি গৌণ রূপায়ণ অতএব আত্মশক্তির অবান্তর একটা সাধনমাত্র, তাহলে এই বিদেহভাবনাই হবে আমাদের দিব্যজীবন-সাধনার প্রথম পাঠ। তার দ্বিতীয় পাঠ হল,—অবিদ্যালাঞ্ছিত মনের সঙ্কুচিত চেতনার ঊর্ধ্বে ওঠা, অমনীভাবের ভূমিতে থেকে মনকে ব্যবহার করা যন্ত্রের মত অর্থাৎ আত্মার বহিরঙ্গ বিভূতিজ্ঞানে মনের শাস্তা হওয়া। প্রাকৃত-প্রাণের 'পরে নির্ভর ক'রে তার সঙ্গে জড়িয়ে না গিয়ে, তার ঊর্ধ্বে চিদাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রাণকে আত্মার বিভূতি ও সাধনরূপে প্রশাসন ও পরিচালন করা হল দিব্যভাবনার তৃতীয় পাঠ। এমন-কি আমাদের দৈহ্য-সত্তার স্বভাবেরও পূর্ণস্ফূর্তি হয় না, যদি না চেতনা দেহকে ছাড়িয়ে অনন্তসমাপত্তির ভাবনায় জড়ময়-জগতের সঙ্গে একাত্মক হয়ে যায়। প্রাণ-চেতনার বেলাতেও তাই: ব্যক্তিপ্রাণের সীমিত লীলায়নকে অতিক্রম করে প্রাণ যদি না বিশ্বপ্রাণকে আপন জেনে সমস্ত প্রাণবিভূতির সঙ্গে এক হয়ে যায়, তাহলে আধারে প্রাণময়-সত্তার স্বভাবের পূর্ণস্ফূর্তি হয় না। মানস-চেতনারও পরিপূর্ণ উন্মেষ কিংবা তার আত্মবৃত্তির নিরংকুশ স্ফুরণ হয় না, যতক্ষণ না ব্যক্তি-মনের সংকীর্ণ সংস্কার ছাড়িয়ে আমাদের মন বিশ্বমনের সাযুজ্যলাভ করছে এবং নিখিল মনের বিচিত্র ঐশ্বর্যের বিলাসে আস্বাদন করছে নিজেরই চেতনার সহস্রদল সৌষম্য।...কিন্তু এমনি করে শুধু ব্যক্তি-ভাবনাকে নয়, বিশ্ব-ভাবনাকেও আমাদের ছাড়িয়ে যেতে হবে—তবেই আমাদের দিব্য-ভাবনায় ব্যক্তি ও বিশ্বের স্বরূপসিদ্ধি ছন্দিত হয়ে উঠবে বৃহৎ-সামের অখণ্ড-মূর্ছনায়। কারণ, ব্যক্তি ও বিশ্বের বহির্বৃত্ত রূপায়ণে বিশ্বোত্তীর্ণের অপূর্ণ বিভূতি ফুটেছে এবং বিশ্বোত্তীর্ণের সত্যই তাদের স্বরূপের সত্য,—অতএব ঐ স্বরূপসত্যের চেতনাতে অবগাহন করেই ব্যক্তিচেতনা কি বিশ্বচেতনা তার তত্ত্বভাবের অখণ্ড-পূর্ণতা ও নিরংকুশ স্বাতন্ত্র্য পেতে পারে। এ নইলে ব্যষ্টি-জীব বিশ্বস্পন্দের পরতন্ত্র হয়ে তার বৃত্তি ও উপাধির দ্বারা আত্মস্বাতন্ত্র্যের সমগ্রতাকে প্রতি-মুহূর্তে খণ্ডিত করবে। চিন্ময় অনুত্তর ব্রহ্মসদ্ভাবে অবগাহন করে, পরম-সাম্যের অনুভবে তাতেই নিত্যবিলসিত থেকে নিজেকে তার আত্মবিভূতি বলে অনুভব করা—এই তো জীবের পরমা নিয়তি। তার দেহ-প্রাণ-মনের সবখানি রূপান্তরিত হবে পরম-পুরুষের পরমা-প্রকৃতির লীলাবিভূতিতে; তার ভাবনা-

বেদনা-কর্ম হবে পরা-শক্তির প্রশাসনে বিধৃত তারই আত্মরূপায়ণ এবং আত্ম-স্বরূপ। এমনি করে অবিদ্যা হতে বিদ্যায় উত্তরণে এবং বিদ্যার সহায়ে পরা সংবিতের স্ফুরত্তা ও অনুত্তর আনন্দলীলায় অবগাহনে জীবের পরমপুরুষার্থের সম্যক চরিতার্থতা ঘটে। কিন্তু চিন্ময়-পরিণামের প্রথম পর্বেই এই মহাভাবের স্বরূপশক্তি ও তার দুর্ধর্ষ সংবেগ খানিকটা সঞ্চারিত হয় সাধকের জীবনে এবং বিজ্ঞানঘন পরমা-প্রকৃতির উন্মেষে তার সার্থক পর্যবসান ঘটে।

কিন্তু অন্তরাবৃত্ত হয়ে বাঁচতে না জানলে এসব সিদ্ধির কিছুই ফুটবে না। বহিশ্চেতনার মুখ সবসময়ে বাইরের দিকে ফেরানো আছে- সত্তার বহিরঙ্গনে থেকেই বিশ্বের সঙ্গে তার একমাত্র বা মুখ্য কারবার; এই চেতনাকে আঁকড়ে থেকে চিন্ময়-জীবনের পথ কোনকালেই আমরা খুঁজে পাব না। জীবকে তার আত্মা বা স্বরূপসত্যের পরিচয় জানতে হবে; তার জন্যে তাকে অন্তর্মুখ হতে হবে—গুহাচর হয়ে বাস করতে হবে, সেই অন্তস্তল হতে নিজেকে উৎসারিত করতে হবে। অন্তশ্চেতনা হতে বিযুক্ত বাইরের জীবন-চেতনা অবিদ্যার লীলাভূমি শুধু; তার কবল হতে নিষ্কৃতি মেলে কেবল অন্তরাত্মার মহাবৈপুল্যে জীবনকে প্রসারিত করে। আমাদের মধ্যে যদি বিশ্বাত্মবের অনুভাব নিহিত থেকে থাকে, তাহলে ঐ গুহাহিত অন্তরাত্মার স্তব্ধতাতে সে আছে; বাইরে শুধু আছে উপাধি ও নিমিত্তের দ্বারা কল্পিত প্রাকৃতভাবের ক্ষণবিভ্রম। আত্মভাবের এমন-কোনও বিরাট মহিমা যদি থেকে থাকে, যা স্বচ্ছন্দে বিশ্বচেতনার উদার ব্যাপ্তিতে অবগাহন করতে পারে, তাহলে তারও প্রতিষ্ঠা আমাদের ঐ অন্তরের মণিকোঠায়; বহিশ্চর ভূতচেতনা শুধু দেহ-প্রাণ-মনের ত্রিবৃৎ রজ্জুতে বাঁধা আড়ষ্ট ব্যক্তিচেতনামাত্র। অন্তরাবৃত্ত না হয়ে কেবল বহির্মুখ সাধনায় বিশ্বচেতনার উন্মেষ ঘটাতে চাইলে, আমরা হয় ব্যক্তির অহংকেই স্ফীত করে তুলব, নয়তো অব্যাকৃত গণচেতনায় তাকে তলিয়ে দিয়ে কিংবা গণচেতনার অধীন করে ব্যক্তিসত্ত্বের প্রলয় ঘটাব। স্বাতন্ত্র্যের সিদ্ধবীর্যে বিশ্বে এবং বিশ্বাতীতে নিজেকে প্রসারিত করতে গেলে অন্তরাবৃত্ত হয়ে সুসমিদ্ধ অন্তরাগ্নিকে উৎশিখ করে তুলতে হবে। অন্তরপুরুষই আমাদের 'ঈশানো ভূতভব্যস্য'—কিন্তু আজ তিনি কঞ্চুকের আবরণে আবৃত বা অর্ধচ্ছন্ন, তাই মনে হয়, বহিশ্চেতনাই বুঝি আমাদের সত্তার মূলাধার এবং সকল প্রবৃত্তির উৎস। এ-ধারণার আমূল পরিবর্তন চাই; বাহির হতে সত্তার কেন্দ্রকে টেনে আনা চাই হৃদিস্থ চিদ্‌বিন্দুতে এবং সেইখান থেকে উৎসারিত করা চাই তার আত্মবিভাবনার স্ফুরন্ত প্রবেগকে—তবেই মর্ত্যের আধারে দিব্য-জীবনের সাধনা সহজ হবে। উপনিষদের ঋষি বলেন, 'চেতনার দুয়ারকে স্বয়ম্ভূ কেটে বার করেছেন বাইরের দিকে, তাই সাধারণ মানুষ বাইরেটাকেই দেখে শুধু; কিন্তু অন্তরাবৃত্তচক্ষু হয়ে কেউ-কেউ তাকায় ভিতর পানে, আত্মাকে জেনে তারাই

অর্জন করে অমৃতের অধিকার'। অতএব অপরা প্রকৃতির রূপান্তর দ্বারা দিব্য-জীবনের অধিকার পেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিজেকে জানা, নিজের মাঝে ডুবে যাওয়া, অহরহ আত্মস্থ হয়ে বাস করা।

নিজের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে অন্তরগহনে বাস করা মানুষের প্রাকৃত-চেতনার পক্ষে দুঃসাধ্য একটা সাধনা; কিন্তু স্বরূপোপলব্ধিরও 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে।' বহিরাবৃত্ত আর অন্তরাবৃত্ত চিত্তের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করে জড়বাদী বহিরাবৃত্ত স্বভাবকেই নিরাপদ অতএব উপাদেয় বলে সমর্থন করেন। তাঁর মতে: ভিতরে ঢোকার অর্থ হল শূন্যতার অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলা; তাতে আমাদের চেতনা ঘুলিয়ে যায়, চিত্তব্যাধির শুরু সেইখানেই; অন্তরজীবনকে মানুষ তার সাধ্যমত গড়ে তুলছে বাইরের উপকরণ দিয়ে, অতএব বাইরের পুষ্টিকর উপাদানের 'পরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারলেই অন্তরের স্বাস্থ্য অটুট থাকবে; বহির্জগতের বাস্তবতার 'পরে ব্যক্তির জীবন ও চিত্তের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হলে তাদের ভারসাম্য বজায় থাকে, কেননা জড়জগতের সত্যই হল বিশ্বের একমাত্র মৌলিক তত্ত্ব।...অন্নময় মানুষ বহিরাবৃত্ত হয়ে জন্মেছে; সুতরাং এধরনের সিদ্ধান্ত তার ভাবনার অনুকূল হতে পারে, কেননা নিজেকে সে বহিঃপ্রকৃতির সৃষ্টজীব বলে ভাবতে অভ্যস্ত। বহিঃপ্রকৃতি তার জননী এবং ধাত্রী, তাই অন্তররাজ্যে ঢুকতে গেলে সে তো দিশাহারা হয়ে যাবেই; এইজন্য তার কাছে অন্তর্জগৎ বা অন্তর্জীবন বলে কিছুই নাই। কিন্তু আধুনিক মনোবিদের অন্তরাবৃত্ত মানুষও সত্যকার অন্তর্জীবনের কোন সন্ধান রাখে না। অন্তরের দিকে চোখ ফিরিয়ে অন্তর্জগৎ বা অন্তরপুরুষকে সে দেখতে পায় না; সংকীর্ণ মনোময়-মানুষের উপরভাসা দৃষ্টি নিয়ে সে তার প্রাকৃত প্রাণ-মনের অহংকে দেখে—অ-প্রাকৃত আত্মপুরুষকে নয়, এবং এই স্বল্পবীর্য বামনপুরুষের ক্লিষ্ট প্রকৃতির অনুধ্যানে নিজেকেও ক্লিষ্ট ও বিকার-গ্রস্ত করে। চিরকাল যার বাইরে কেটেছে, অন্তর্জীবনের কোনও সিদ্ধ অনুভূতি যার নাই, ভিতরের দিকে তাকাতে গিয়ে সে যে প্রথমে আঁধার ছাড়া আর-কিছুই ভাববে না বা দেখবে না, এ কিছু অসম্ভবও নয়,—কেননা প্রাকৃত-মনের ভিতর-দেখার পুঁজি বাইরে-দেখার কৃত্রিম সংস্কার দিয়েই গড়া। কিন্তু অল্পাধিক অন্তরাবৃত্ত থাকবার সামর্থ্য যাদের আধারে সঞ্চিত হয়েছে, ভিতরে ঢুকে যোগস্থ হয়ে থাকতে গিয়ে তারা কখনও একটা অন্ধকার বা শূন্যতার আলুনী অনুভবই সেখানে পায় না; তাদের সমাহিত অনুভবে জাগে অভিনব চেতনা-বেদনার একটা অতর্কিত প্রসার, একটা উদারতর দৃষ্টি, একটা বিপুলতর সামর্থ্য, অন্নময় প্রাকৃতমানুষের স্বকল্পিত জীবনায়নের দৈনন্দিন ক্লিন্নতা হতে মুক্ত অথচ তার চেয়ে অনন্তগুণে বাস্তব ও বিচিত্র একটা জীবনের অমেয় বিস্তার। তাকে ঘিরে তখন এক উচ্ছল আনন্দের মহাপারাবার হিল্লোলিত হয়ে ওঠে—যে-আনন্দের

সঙ্গে প্রাকৃতজগতের কোনও আনন্দেরই তুলনা হতে পারে না, বহিরাবৃত্ত প্রাণাত্মবাদী তার প্রাণশক্তির স্ফুরন্ত সংবেগ দিয়ে কিংবা মনোময় মানুষ তার বহির্মুখ চিত্তের অকল্পনীয় সূক্ষ্মতা ও প্রসার দিয়েও যে-আনন্দের নাগাল পায় না। বিপুল—অমেয়—অন্তহীন মহাশূন্যতার নৈঃশব্দ্যে অবগাহন, এ-ও অন্তরাবৃত্ত চিন্ময়-অনুভবের একটা বিভাব। কিন্তু জড়াশ্রয়ী মন এই নৈঃশব্দ্য ও শূন্যতাকে ডরায়, মননধর্মী বা প্রাণময় চিত্তের বহিশ্চর সংকুচিতবৃত্তি তাকে বিরাগভরে এড়িয়ে যেতে চায়; কারণ প্রাকৃত-মন নৈঃশব্দ্যকে ভাবে প্রাণ-মনের জড়ত্ব, শূন্যতাকে ভাবে নিরোধ বা বিনাশ। কিন্তু বস্তুত এই নৈঃশব্দ্যই চিদ্‌বীর্য—লোকোত্তর জ্ঞান শক্তি ও আনন্দের উৎস; আর ঐ শূন্যতা প্রাকৃত-আধারেরই রিক্ততা—বিষয়াসবের সকল কলুষ ঢেলে ফেলে ব্রাহ্মী-চেতনার অমৃতরসে তাকে ভরে তোলবার আয়োজন, অতএব তার প্রলয়ে অস্তিত্বের নিমজ্জন নয়—মহত্তর ভূমিতে তার উত্তরণ। এমন-কি অন্তরাবৃত্ত পুরুষের নিরোধাভিমুখী বৃত্তিও অসতের বুকে অত্যন্তবিনাশের সূচনা আনে না, নির্বিশেষের অবাঙমানসগোচর অতিচেতনায় ঝাঁপ দেওয়াই তাঁর নিরোধ—সে-ও চিন্ময় সদ্‌ভাবের তুরীয়স্থিতির মহাবৈপুল্য মাত্র।

সত্য বলতে, এমনিতর অন্তরাবৃত্ত হবার অর্থ ব্যক্তি-সত্ত্বের কারাগারে বন্দী থাকা নয়—বরং বিশ্বচেতনায় উত্তরণের এই হল প্রথম ধাপ; অন্তরে ঢুকে তবে আমরা অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের মর্মসত্যের পরিচয় পাই। এই যোগস্থ জীবনই নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্বের জীবনকে জড়িয়ে ধরতে পারে; সবার প্রাণকে স্পর্শ কর বিদ্ধ করে গ্রাস করে তার মধ্যে বৃহত্তর ভাবনার যে-বৈদ্যুতী সে সঞ্চার করতে পারে, তার বাস্তবতা বহিশ্চর-চেতনার কল্পনারও অগোচর। বহির্মুখ চিত্ত নিয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার সর্বোত্তম সাধনাও আমাদের একটা অক্ষম পঙ্গু প্রচেষ্টামাত্র; বেশ বুঝি, এ শুধু মেকীর কারবার—মনকে শুধুই চোখ-ঠারা ছাড়া আর-কিছুই নয়, কেননা বহিশ্চর-চেতনায় বিবিক্ত আত্মবোধ এবং উগ্র অহমিকার নাগপাশে আমরা জড়িয়ে আছি। তাই আমাদের নিঃস্বার্থপরতাও অনেক সময় সূক্ষ্ম স্বার্থপরতার আঁকারে অহংকেই পুষ্টতর করে মাত্র; বিশ্বহিতের অজুহাতে আমরা যে ব্যক্তি-প্রাণ ও ব্যক্তি-মনের ভাবনা ও সংস্কারসমেত নিজেকে চাপিয়ে দিচ্ছি পরের ঘাড়ে, অপরকে গ্রাস করে নিজের অহংকে পুষ্ট করব বলে যে তাদের টেনে আনছি প্রসারিত বাহুর বন্ধনে—পরার্থপরতার অভিমানে অন্ধ বলে এই আত্মবঞ্চনার দিকে মোটেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। পরের জন্য আমাদের বেঁচে থাকার মধ্যে যেখানে কোনও বাহানা নাই, সেখানে রয়েছে মৈত্রী ও করুণার অন্তর্গূঢ় চিন্ময় সংবেগ; কিন্তু এই সংবেগকে সার্থক করবার বীর্য ও অধিকার দুইই আমাদের মধ্যে ক্লিষ্ট, কেননা চৈত্যপুরুষের প্রেতি আমাদের চিত্তে অখণ্ড হয়ে পৌঁছয় না।

অপরের সঙ্গে হৃদয় ও মনের যোগে কথঞ্চিৎ যুক্ত হলেও, অধ্যাত্মযোগদ্বারা সবাইকে আত্মসাৎ করতে পারিনি বলে প্রায়ই আমাদের আন্তরিক কর্মপ্রেরণাও প্রমাদের হেতু হয়। অপরের সঙ্গে বাইরের একাত্মতা একটা বাইরের জোড়া-তালির ব্যাপার; তাতে একটা সামাজিক যৌথ-চেতনার উন্মেষ হয় শুধু, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তার কাজ কাঁচা থেকে যায়। যৌথ-জীবনের অন্তর্ভুক্ত সবার হিতে আমরা হৃদয়-মন ঢেলে দিতে পারি বটে; কিন্তু জীবনের বহিরঙ্গকেই যেখানে সমাজচেতনার ভিত্তি করেছি, সেখানে পরস্পরের অপরিচয় অহমিকার সংঘর্ষ প্রাণ-মন-হৃদয়ের দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের সংঘাতকে যথাসম্ভব এড়াতে পারলেও অন্তরের কৃত্রিম একাত্মভাব একটা অপূর্ণ এবং অনিশ্চিত বহিঃসিদ্ধিই শুধু হয়। অধ্যাত্মচেতনার শিল্পচাতুরী ঠিক এর বিপরীত; সেখানে সমাজ-জীবনের ভিত্তি হল অন্তরের অনুভবে—সর্বাত্মভাবের অন্তরঙ্গ অদ্বৈত-চেতনাতেই সেখানে সমাজচেতনার প্রতিষ্ঠা। সর্বাত্মভাবের সংবিৎই তখন অধ্যাত্মচেতার অন্তরে আত্মার কাছে আত্মার দাবির অপরোক্ষ অন্তরঙ্গ-অনুভব ফোটায়—অপরের অভাবের সুস্পষ্ট চেতনা হতে যোগায় মৈত্রী ও করুণার সাধনায় ভূতহিতের সার্থক কল্পনা। বিশ্বব্যাপ্ত এক চিন্ময় একাত্মতার বোধ, ভূতে-ভূতে একই আত্মার অনন্ত-সদ্‌ভাবের নিগূঢ় চেতনা হতে প্রজাত সত্যের স্ফুরদ্‌বীর্য—একমাত্র এই দিব্যভাবনাকেই আমরা দিব্য জীবনায়নের প্রতিষ্ঠা এবং প্রশাস্তা বলতে পারি।

দিব্য পুরুষের বিজ্ঞানঘন জীবনচেতনায় আছে সবারই আত্মভাবের অখণ্ড-নিবিড় চেতনা—এমন-কি তাদের দেহ-প্রাণ-মনের সম্পর্কেও তাঁর চেতনা আত্মবোধেরই মত সজাগ। অতএব তাঁর ব্যবহারের মূলে এই অন্তরঙ্গ অদ্বৈতানুভব-বাসিত সুনিবিড় অন্যোন্যচেতনারই প্রবর্তনা থাকে—প্রাকৃত-চিত্তের তথাকথিত মৈত্রী ও করুণা কিংবা অনুরূপ কোনও ভাবোচ্ছ্বাস নয়। তাঁর জাগতিক সকল কর্মের ভূমিকারূপে আছে কর্তব্য সম্পর্কে অভ্রান্ত দর্শনের ঋতজ্যোতি, আত্ম-পর সর্বত্র নিহিত একই দিব্য-পুরুষের কবিক্রতুর প্রদীপ্ত অনুভব; অতএব তাঁর কর্মযোগ ঘটে-ঘটে বিশ্বেশ্বরেরই অর্চনামাত্র। পরা-সংবিতের আলোক সর্বসত্তের দিব্যক্রতুকে যে-রূপে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই রূপকেই পরমাপ্রকৃতির সিদ্ধবীর্যের দ্বারা ঋতের ছন্দে ছন্দিত ও মূর্ত করে তোলা—এই হল তাঁর কর্মসাধনার রহস্য। সত্য বটে, বিজ্ঞানঘন-পুরুষের আত্মসিদ্ধিতে ঘটে দিব্য-পুরুষের সত্ত্ব ও সংকল্পের অমোঘসিদ্ধি—কিন্তু যুগপৎ সকলের সিদ্ধিতে তাঁর আত্মসম্পূর্তির চিন্ময় তপস্যা সিদ্ধ হয়; বিশ্বচেতন বৈশ্বানররূপে নিখিলের প্রগতিতে তিনি বিশ্বরূপেরই উত্তর-সম্ভূতির প্রেতি অনুভব করেন। সর্বত্রই তিনি দেখেন এক চিন্ময়ী মহাশক্তির লীলা; এই সমষ্টিভূত দেবলীলায় তাঁর অন্তর্জ্যোতির সত্যসংকল্প ও ঋত-

সংবেগের যে-আবেশ, তা-ই তাঁর কর্ম। কোনও বিবিক্ত অহংএর প্রবর্তনা তাঁর মধ্যে নাই; তাঁর বৈশ্বানর ব্যক্তিভাবনায় বিশ্বাত্মা ও বিশ্বোত্তীর্ণের সংবেগই বিশ্বকর্মে লীলায়িত হয়ে ওঠে। যেমন তাঁর বিবিক্ত অহংচেতনার কোনও দায় নাই, তেমনি নাই সামাজিক অহংচেতনারও দায়; তাঁর হৃদয়ে যে-পরমপুরুষ, বিশ্বমানবে যে-পরমপুরুষ, বিশ্বের ভূতে-ভূতে যে-পরমপুরুষ—তাঁর মাঝে থেকে তাঁরি কাজে তাঁর জীবন উৎসৃষ্ট। সর্বাত্মভাবের ভূমিকা হতে সহস্রাক্ষ কবিক্রতুর এই যে বিশ্বতোমুখী প্রবৃত্তি—এই হল দিব্য-জীবনের ঋতময় ছন্দ।

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আছে আপনাকে অন্তর হতে ষোড়শকলায় পূর্ণ করে তোলবার যে-অভীপ্সা, তার চিন্ময়ী-সিদ্ধি দিব্যজীবন-সাধনার প্রথম পাঠ। মর্ত্যভূমিতে সিদ্ধজীবনের এই হল অপরিহার্য আদ্য আয়োজন; অতএব অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষে ব্যক্তিজীবনের যথাসম্ভব পূর্ণতাসাধনকে যে আমরা প্রথম পুরুষার্থ মনে করি, তা অসঙ্গত নয়। তার পরের পাঠ হল, ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের আধ্যাত্মিক ও ব্যাবহারিক যোগাযোগকে সর্বদিক দিয়ে পূর্ণ করে তোলা: এ-তপস্যা সার্থক হয় বিশ্বময় আত্মচেতনার অখণ্ড ব্যাপ্তিতে—সর্বাত্মভাবের সিদ্ধিতে। বিজ্ঞানঘন চেতনা ও প্রকৃতিতে উত্তীর্ণ হবার পথে সাধকের মধ্যে এ-ভাব স্বভাবতই ফুটে উঠবে। কিন্তু তারও পরে বাকী থাকে সাধনার তৃতীয় পাঠ: চাই এক নতুন জগৎ, চাই বিশ্বমানবের জীবনধারার গোত্রান্তর - অন্তত এই পার্থিব-প্রকৃতিতে অভিনব সিদ্ধ জীবনের একটা সংঘচেতনা ফুটিয়ে তোলা চাই। তার জন্যে বর্তমানের প্রাকৃত-পরিবেশের মধ্যেই অ-প্রাকৃত জীবনগঠনের ব্যক্তিগত প্রয়াস যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন বহু বিজ্ঞান-ঘন-বিগ্রহ পুরুষের সংহতিতে মানবসমাজে একটা নতুন থাকের প্রতিষ্ঠা, যাকে দিয়ে বর্তমান ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের চাইতে উৎকৃষ্টতর একটা অভিনব সংঘজীবন গড়ে উঠবে পৃথিবীতে। বিজ্ঞানঘন-জীবনের ব্যক্তিগত আদর্শ এই সংঘজীবনেরও আদর্শ হবে। আজপর্যন্ত মানুষের মধ্যে সংঘচেতনার যে-রূপ ফুটেছে, তার মূল আছে শুধু স্থূল ব্যাবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে একটা বহির্মুখ সামাজিক-বোধ জাগানোর প্রয়াস; তাতে রয়েছে স্বার্থের সাম্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐক্য, সামাজিক আচার ও মানসিক শিক্ষা-দীক্ষার মিল, জীবিকানির্বাহের একটা যৌথপ্রয়াস। এই নিয়ে যে গোষ্ঠী-অহং গড়ে উঠেছে, তার সমস্ত ভাবনা বেদনা ও কর্মের মধ্যে ব্যষ্টির বিশিষ্ট অহং অনুস্যূত আছে যোগসূত্রের মত। আবার ঐক্যের চেয়ে বিরোধের ভাবই প্রবল যেখানে, সেখানে শুধু যৌথ জীবনযাপনের দায়ে একটা চেষ্টাকৃত আপোস-রফা কিংবা বাইরের প্রয়োজনে খাপ-খাইয়ে চলবার ব্যবস্থাকে চালু রাখা হয়েছে; তাতে সমাজদেহে যে পর্বপরম্পরার সৃষ্টি হয়েছে, তার কতকটা কৃত্রিম, কতকটা

হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু এ-সবার কোনটাই বিজ্ঞানঘন-সংঘের জীবনাদর্শ নয়; কারণ মানুষ সেখানে দানা বাঁধবে প্রাকৃত-জীবনের দায় হতে উদ্ভূত কাজচলা-গোছের সামাজিক সংহতিবোধের তাগিদে নয়—কিন্তু ঐক্যের অন্তরঙ্গ-চেতনাই সেখানে ব্যাবহারিক-জীবনের সংহতিকে সুপ্রতিষ্ঠ করবে। সে-চেতনা তাদের মধ্যে প্রবর্তিত করবে জীবনের একটা নতুন ধারা ব্যক্তির মধ্যে ঋত-চিতের স্ফুরণেই তারা সহজ আত্মীয়তায় গোষ্ঠীবন্ধ হবে; যাতে নিজেদের তারা এক পরমাত্মারই চিদ্‌ঘনবিগ্রহরূপে অনুভব করবে এক সে-চেতনা তাদের মধ্যে প্রবর্তিত করবে জীবনায়নের একটা নতুন ধারা. পরমার্থসতেরই সত্ত্ব-তনুরূপে। এক অখণ্ড পূর্ব্য প্রজ্ঞার প্রদীপ্ত প্রৈষা, এক অখণ্ড প্রজ্ঞার সংকল্প ও বেদনার প্রবর্তনা তাদের সত্যবাহ চিন্ময়-জীবনে স্ফুরিত হয়ে জ্যোতির্ময়ী সম্ভূতির সহজ ঐশ্বর্যে তাকে মণ্ডিত করবে। ক্রমবন্ধও থাকবে তাদের মধ্যে, কেননা স্বভাবেরই নিয়মে একত্বের সত্য পর্বায়িত হয় সহজ-ক্রমে। তেমনি তাদের মধ্যে এক বা একাধিক জীবনবিধানও থাকবে; কিন্তু সমস্ত বিধানই সেখানে স্বয়ং-তন্ত্র হবে—কেননা সংঘের সকল বিধানে প্রকাশ পাবে অদ্বৈতচেতনায় প্রতিষ্ঠিত এক চিন্ময় জীবনসংহতির স্বরূপসত্য। সমগ্র সংঘই হবে বিশ্বতোমুখ চিৎশক্তিরাজির স্বতঃস্ফুরৎ একটা স্বয়ম্ভূবিগ্রহ; ব্যক্তির অন্তরগহন হতে উৎসারিত চিৎশক্তির সে-প্রেরণা এক সার্থক কবিক্রতুর স্বভাবছন্দে বাইরে রূপায়িত বা লীলায়িত হবে।

প্রাকৃত-মন সংঘ গড়তে গিয়ে সবাইকে এক ছাঁচে ঢালতে চায়—জীবনাদর্শের একটা যন্ত্রাবর্তনের মধ্যে সে বন্দী করতে চায় প্রাণের আনন্দলীলাকে; কিন্তু দিব্যসংঘে জীবনায়নের আদর্শ তা নয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানঘন গোষ্ঠীতে থাকবে স্বাতন্ত্র্যের প্রভূত বৈচিত্র্য,—অখণ্ড-চিন্ময় জীবনের বিগ্রহকে প্রত্যেকে তারা আপন-আপন বৈশিষ্ট্য দিয়ে গড়ে তুলবে, আবার প্রত্যেক গোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেও থাকবে আত্মপ্রকাশের নিরংকুশ অথচ ছন্দোময় বৈচিত্র্য। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের স্বাতন্ত্র্যে অসাম বা নির্ঋতির কোনও আভাস থাকবে না; কেননা অখণ্ড প্রজ্ঞার সত্যে বা জীবন-সত্যে আছে অন্যোন্যসঙ্গতির সৌষম্য—অন্যোন্যবিরোধের বিক্ষোভ নয়। বিজ্ঞানঘন-চেতনায় বিবিক্ত অহংএর রেষারেষি নাই, স্বার্থসিদ্ধির কলরব নাই, আপন ভাব বা সংকল্পকে জাহির করবার মূঢ় উগ্রতা নাই; বিভিন্ন আধারে ও চেতনায় একই পরমাত্মার প্রতীক সবাই. একই সত্য বিচিত্র হয়ে রূপ ধরেছে সবার মধ্যে—একত্বের এই অন্তরঙ্গ অনুভব হতে বিজ্ঞানঘন-পুরুষ স্খলিত কখনও হন না। বিশ্ববিভূতি যে একেরই বহুধাবিচিত্র আত্মরূপায়ণ, বহুর মধ্যে এককে ফুটিয়ে তোলা যে ঋতচিতের স্বভাব-সত্যের সহজবিধান—এই অপরোক্ষ-অনুভব তাঁর মধ্যে সবার রঙে রং মেশাবার সাবলীলতা জাগিয়ে রাখবে। দিব্যসংঘের সবাই এক অখণ্ড চিৎ-

শক্তির নিমিত্তরূপে নিজেকে অনুভব করবে,—অতএব সেই অখণ্ডেরই প্রেরণা ছন্দোময় ঋতের সুষমা আনবে সবার কর্মে। বিজ্ঞানঘন-পুরুষ ব্যষ্টির জীবনবৈচিত্র্যে একই পরমা-প্রকৃতির শক্তিবৈচিত্র্যের অখণ্ড রাগিণী অনুভব করবেন; তারি একটা সুর তাঁর মধ্যে ফুটিয়ে তুলছে দিব্য-কর্মের চিদ্‌বীর্যময় প্রেরণা; সে-প্রেরণায় সাড়া দিতে গিয়ে নিজের অহংকে কখনও তিনি অপরের অহংএর প্রতিস্পর্ধীরূপে অনুভব করবেন না, কিংবা তাঁর আধারে স্ফুরিত জ্ঞান ও বীর্যকে অপরের আধারে স্ফুরিত জ্ঞান-বীর্যের বিরুদ্ধে উদ্যত রাখবার কোনও দুর্বার তাড়নাও তাঁর মধ্যে জাগবে না। কারণ যিনি চিদাত্ম-স্বরূপ, তাঁর হৃদয়ে আছে অব্যাহত আনন্দ ও পূর্ণতার অচলপ্রতিষ্ঠা—আছে স্বরূপসত্যের অখণ্ড আনন্ত্যের জাগ্রতবোধ; বাইরে তার রূপায়ণ যা-ই হোক্ না কেন, এই সহস্রদল ভাবনার পূর্ণসংবিৎ হতে তিনি কোনকালেই বিচ্যুত নন। বস্তুত অন্তর্নিহিত চিৎ-সত্ত্বের সত্য বিশেষ-কোনও রূপায়ণের 'পরে একান্ত-নির্ভর নয়, অতএব আত্মরূপায়ণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বিশেষ-কোনও বাহ্যিক রীতিকে আঁকড়ে ধরবার আয়াসও তার নাই: তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতায় রূপের আবির্ভাব হয়—অপরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমগ্র রূপায়ণের ছন্দে সে তার নিজের ছন্দ মিলিয়ে দেয়। বিজ্ঞানঘন সত্ত্ব ও চেতনার সত্য স্বপ্রতিষ্ঠ হবে পরিবেশের সকল সত্ত্বেরই সত্যের সঙ্গে সৌষম্যের আনন্দে। বিজ্ঞানঘন চিন্ময়-পুরুষ যে-ভূমিকাতেই থাকুন, বিজ্ঞানঘন জীবন-পরিবেশের সঙ্গে কোথাও তাঁর বিরোধ হয় না। তিনি জানেন এই অভিনবের জগতে কোথায় তাঁর স্থান; সেই অনুসারে যেমন তিনি শাস্তা বা নায়ক হতে পারেন, তেমনি পারেন অধীন হতে। দুটি ভূমিকাতেই তাঁর সমান আনন্দ; কেননা চিৎসত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য শাশ্বত স্বয়ম্ভূ এবং অব্যভিচারী বলে, স্বেচ্ছাসেবকের অধীনতায় ও অপরের ছন্দোনুবর্তনে যতখানি উল্লাস তার, ঠিক ততখানি উল্লাস শক্তি ও ঈশনার নিরংকুশ স্ফুরণে। চিজ্‌জগতে পরমার্থত সবাই যেমন এক, তেমনি বিভূতি-বৈচিত্র্যে অধিকারের উচ্চাবচতাও সম্ভব সেখানে; বিজ্ঞানঘন-চেতনা অন্তরে নির্মুক্ত বলে এই উভয় সত্যেরই স্বীকৃতিতে স্বাতন্ত্র্যের আনন্দ অনুভব করে। সত্যের মধ্যে আছে একটা স্বত-ঋতায়নের ছন্দ, চিৎ-সত্ত্বের আছে স্বাভাবিক ক্রমায়ণের একটা বাঁধুনি; সংঘজীবনে বিজ্ঞানঘন-চেতনার উন্মেষে এই পর্বভেদই শক্তি ও অধিকারের তারতম্যে দেখা দেয়। কিন্তু তাহলেও একত্বভাবনা বিজ্ঞানঘন-চেতনার মূলসুর; বহুর মধ্যে একত্বের অপরোক্ষসংবিৎ হতে স্বাভাবের নিয়মে সে-ভাবনায় জাগে অন্যোন্যভাবের চেতনা এবং তার শক্তি-পরিণামের অধৃষ্য বীর্য স্বভাবত সৌষম্যের সহস্রদল ঐশ্বর্যে স্ফুরিত হয়। অতএব একত্ব, অন্যোন্যভাব ও সৌষম্য—এই হল সর্বসাধারণ বা সংঘবন্ধ বিজ্ঞানঘন-জীবনের অনুত্তরণীয় স্বভাবধর্ম। বৈশিষ্ট্যের কোন্ রূপ ফুটবে

সে-জীবনে, তা নির্ভর করবে পরমা প্রকৃতির স্বতঃপরিণামী কবিক্রতুর 'পরে—কিন্তু সামান্যের রূপে ও রীতিতে থাকবে ভাবনার এই মূল ছন্দটিই।

অবিদ্যার কবলে থেকেও জীব যে নিরন্তন মুক্তি সিদ্ধি ও আত্মসম্পূর্তির জ্বালাময়ী অভীপ্সা বহন করছে, তার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা ঘটতে পারে একমাত্র অবিদ্যা-প্রকৃতির সম্পূর্ণ উচ্ছেদে এবং বিদ্যা-প্রকৃতির অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতে; অন্ন-মনোময় স্থিতি ও জীবন হতে অতিমানস-চিন্ময় স্থিতি ও জীবনে উত্তীর্ণ হবার নিয়তিকৃত নিরূঢ়-বিধানের মূলে এই ভাবনারই প্রেরণা আছে। বিদ্যা-প্রকৃতিতে আছে আত্মজ্ঞান ও জগৎজ্ঞানের অসংকুচিত চিন্ময়-প্রত্যয়; আমরা একেই বলেছি পরমা প্রকৃতি, কেননা জীবের সহজাত চেতনা ও সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে, তার অপরা প্রকৃতির অধিকারের বাইরে এর স্থান। অথচ এই প্রকৃতিই তার স্বীয়া প্রকৃতি, এতেই তার স্বভাবের পূর্ণতম ও তুঙ্গতম অভিব্যক্তি—একে আত্মসাৎ করেই তার আত্মস্বরূপের উপলব্ধি এবং আত্মসম্ভূতির সাধনা পূর্ণায়ত হয়। প্রকৃতিতে যা-কিছু ঘটছে, তা প্রকৃতিরই পরিণাম অর্থাৎ তার অন্তর্নিহিত বীজভাবের অপরিহার্য বিপাক ও রূপায়ণ। অচিতি ও অবিদ্যার মধ্যে চলছে অপূর্ণ বিজ্ঞানসিদ্ধির কৃচ্ছ্রতপস্যা এবং সত্ত্ব ও চেতনার অপূর্ণ রূপায়ণ; এই অচিতি এবং অবিদ্যাই যদি আমাদের আত্মপ্রকৃতির স্বরূপ হয়, তাহলে আমরা এখন যা আছি, চিরকাল তা-ই থাকব—আমাদের আধারে জীবনে ও কর্মে ফুটবে শুধু প্রকৃতির অর্ধসিদ্ধির অনৈশ্চিত্য, মানুষের দেহে প্রাণে ও মনে চিরন্তন অপূর্ণতার বিড়ম্বনা। এমন-একটা বিদ্যার প্রস্থান বা জীবনতন্ত্র আমরা রচতে চাই, যাকে ধরে মর্ত্যস্থিতির একটা সার্থকতায় আমরা পৌঁছতে পারি—দেহ-প্রাণ-মনের সার্থক ও সুন্দর সাধনায় ব্যাবহারিক জীবনে ঋতচ্ছন্দের সুষমা ফোটাতে পারি। কিন্তু আমাদের সাধনা পর্যবসিত হয় অর্ধসিদ্ধিতে : যা-কিছু আমরা গড়ে তুলি, সমস্তই 'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য'—শিব-সুন্দরের সঙ্গে অশিব ও অসুন্দরের সাংকর্য ঘটিয়ে। একে তো আমাদের সকল কৃতিই দোষদুষ্ট, তারপর মানুষের প্রাণ-মনের এষণারও বিরতি নাই; তাই আমাদের কৃতির পরম্পরা বিকল ও ক্ষীণবীর্য হয়ে কেবলই ধুলায় লুটিয়ে পড়ে, আর তাদের ছেড়ে আমরা ছুটি নতুন কল্পনার পিছনে; অথচ শেষপর্যন্ত সে-কল্পনার সৃষ্টিও হয়তো সার্থক বা স্থায়ী হয় না, যদিও-বা কোনও-না-কোনও দিক দিয়ে সে সমৃদ্ধ এবং পূর্ণতর অথবা অধিকতর যুক্তিসম্মত হয়। আমাদের সাধনা এমনি করে ব্যর্থ হতে বাধ্য, কেননা আত্মপ্রকৃতির অধিকার ছাড়িয়ে কোনও-কিছুকে আমরা গড়তে পারি না। আমরা স্বভাবত অপূর্ণ বলে বুদ্ধি-কৌশলের চরম চমৎকার দিয়ে বাইরের যান্ত্রিক-সিদ্ধিকেই শুধু রূপ দিতে পারি—কিন্তু পূর্ণতার অখণ্ড-বিভূতিকে ফুটিয়ে তুলতে পারি না। তেমনি অবিদ্যোপহত বলেই আমরা

আত্মবিদ্যা বা বিশ্ববিদ্যার সর্বতোভাবে সত্য এবং সার্থক একটা প্রস্থান সৃষ্টি করতে পারি না : আমাদের তথাকথিত বিজ্ঞান নানা সূত্র ও কলাকৌশলের একটা বিপুল সংযোজন; প্রকৃতির কৃতির তত্ত্বকে সে খুঁটিয়ে জানে, যন্ত্র-নির্মাণের নৈপুণ্যেও তার অতুলন—কিন্তু আত্মা বা বিশ্বের স্বরূপতত্ত্বের কোনই খবর সে রাখে না; তাই মানুষের আত্মপ্রকৃতিকে উন্মেষিত করতে পারে না বলে তার জীবনেও সে পূর্ণতার সুষমা আনতে পারে না।

প্রাকৃত-জীবনে আমরা কেউ কাউকে জানি না, বিবিক্ত অহংবোধ দ্বারা গ্রস্ত হয়ে পরস্পর হতে আমরা অনেক দূরে সরে আছি; অথচ অবিদ্যাবিগ্রহ হয়েও পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের কোনও-না-কোনও সূত্র আমাদের আবিষ্কার করতেই হয়,—কেননা বিশ্বপ্রকৃতিতে মেলবার প্রেরণা যেমন আছে, তেমনি আছে তারই অনুকূলে প্রাকৃতশক্তির দূতীয়ালি। তার ফলে ব্যষ্টিতে এবং গোষ্ঠীতে পূর্ণতার ইতরবিশেষ নিয়ে সৌষম্যের নানা ছক গড়ে ওঠে, সামাজিক সংসক্তির একটা চেতনা দেখা দেয়; কিন্তু গণচিত্তে সহানুভূতির ন্যূনতায় পরস্পরকে ভাল করে না বোঝবার বা ভুল বোঝবার দরুন কিংবা বিবাদ-বিসংবাদ ও অস্বস্তির ঝামেলায় ঐক্যের সকল প্রচেষ্টাই উপহত হয়। চেতনার সঙ্গে চেতনার সত্যকার মিলন যতক্ষণ না ঘটবে ততক্ষণ ঐক্যসাধনা এমনি করে পণ্ড হবে; আর চেতনার মিলন সত্য হবে—যখন তার প্রতিষ্ঠা হবে আত্মবিজ্ঞান ও অন্যোন্যবিজ্ঞানের অন্তরঙ্গ অনুভবে, প্রাণের গহনে মানুষ যখন একাত্মবোধের ছন্দ খুঁজে পাবে, তার আধারে নিহিত এবং জীবনে লীলায়িত অন্তঃশক্তির সকল প্রবৃত্তিতে সুর-সৌষম্যের ঝঙ্কার বাজবে। সমাজগঠনে একত্ব অন্যোন্যভাব ও সৌষম্যের অন্তত আংশিক প্রতিষ্ঠার সাধনা আমরা করে থাকি, কেননা আমাদের সমাজ-জীবন এদের ছেড়ে পঙ্গু হয়ে পড়ে। কিন্তু এত করেও আমরা একটা কৃত্রিম একত্বের কাঠামো মাত্র গড়ি। আমাদের জোড়াতালির সমাজে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অহন্তার যোগাযোগ আচার ও আইনের হুমকিতে ঘটে। তাতে যে কৃত্রিম ক্রমবন্ধের সৃষ্টি হয়, তার দৌলতে সুযোগ পেলেই একপক্ষের স্বার্থ প্রবল হয়ে অপরপক্ষকে দাবিয়ে রাখে; তাতে খুশি আর জবরদস্তিতে জুড়ে মিলিয়ে সমাজের আধা-স্বাভাবিক আধা-কৃত্রিম সংহতিকে কোনরকমে জিইয়ে রাখা চলে মাত্র। তারও পরে আছে এক সমাজের সঙ্গে আরেক সমাজের গরমিলের দরুন গোষ্ঠী-অহংএর সঙ্গে গোষ্ঠী-অহংএর পরস্পর ঠোকাঠুকি। অথচ এইপর্যন্তই আমাদের সাধ্যের সীমা; ব্যবস্থার হাজার অদলবদল করেও আমাদের সমাজস্থিতি আজ মানুষের জীবনব্যবস্থার বৈকল্যকে দূর করতে পারেনি।

আমাদের বর্তমান প্রকৃতি যদি তার স্বাধিকারের সীমা ছাড়িয়ে আত্মবোধ অন্যোন্যভাব ও একাত্মপ্রত্যয়ে সমুজ্জ্বল পরা প্রকৃতির অধিকারে উত্তীর্ণ হয়,

তার মধ্যে সত্তার সত্য ও জীবনসত্যের অকুণ্ঠ প্রকাশ যদি ঘটে, তবেই আমাদের আধারে ও জীবনে দেখা দেবে ষোড়শকল পূর্ণতার উচ্ছলতা—একত্ব অন্যোন্য-ভাব ও সৌষম্যের নির্মুক্ত চেতনায়, সত্য শ্রী ও আনন্দের দীপ্তিতে এ-জীবন ফুটে উঠবে সহস্রদল কমলের মত। কিন্তু আমাদের প্রকৃতির বর্তমান রূপের আরকোনও পরিবর্তন যদি সম্ভব না হয়, আমরা যা হয়েছি, তাতেই। যদি প্রকৃতিপরিণামের ইতি হয়ে থাকে—তাহলে এই মর্ত্যভূমিতে থেকে পূর্ণসিদ্ধি বা শাশ্বত সত্যসুখের প্রত্যাশা করা আমাদের পক্ষে অযৌক্তিক। তখন, হয় আমাদের সুখ ও সিদ্ধির এষণা ছাড়তে হবে এবং মর্ত্যপ্রকৃতির অপূর্ণতাকে মেনে নিয়েই জীবনকে যথাসাধ্য ভরিয়ে তুলতে হবে, নয়তো আনন্দ ও সিদ্ধির সন্ধান করতে হবে মৃত্যুর ওপারে—লোকান্তরে; কিংবা সমস্ত এষণা ছেড়ে সম্ভূতির পরপারে যেতে হবে নির্বিশেষের অসম্ভূতিতে আত্মপ্রকৃতি ও অহন্তার পরিনির্বাণে—যে-নির্বিশেষ হতে এই অতৃপ্তিসংকুল অনির্বাচ্য আত্মভাবের উদ্ভব হয়েছে, তারই মধ্যে তার প্রলয় ঘটাতে হবে।...কিন্তু যদি বুঝি : আমাদেরই আধারে অন্তর্গূঢ় রয়েছে একে উন্মিষন্ত চিন্ময় সত্ত্ব, আমাদের প্রাকৃতস্থিতি যার অর্ধস্ফুট আ-ভাসনের নীহারিকা শুধু; অচিতির এক মহা-উত্তরায়ণের আদিবিন্দুমাত্র, কেননা তার মধ্যে সংবৃত রয়েছে এক অতিচেতনা পরমা প্রকৃতির আত্মসম্ভূতির উদাত্ত বীর্য; এক প্রাতিভাসিকী প্রকৃতির কঞ্চুকে আবৃত রয়েছে 'তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়ের' প্রতীক্ষায় সে-দিব্যচেতনার বৃহৎ জ্যোতি—অতএব জীব-সত্ত্বের চিন্ময় উন্মেষই প্রকৃতির শাশ্বত বিধান;—তাহলে আমাদের দৈবী অভীপ্সার পরমা সিদ্ধি শুধু কল্পলোকের কল্পনা নয়, বিশ্বপ্রকৃতির সে অবশ্যম্ভাবিনী নিয়তি। ঐ পরমা প্রকৃতিতে সম্ভূত হয়ে এই আধারেই তাকে স্ফুরিত করা—এই আমাদের অধ্যাত্মপরিণামের চরম পর্ব; কেননা ঐ পরমা প্রকৃতিই আমাদের অনুন্মিষিত অতএব আজও-গুহাহিত অখণ্ড আত্মস্বরূপের স্বীয়া-প্রকৃতি। একত্বভাবনায় সমিন্ধিত দিব্যপ্রকৃতির জীবনায়নে স্বভাবেরই নিয়মে দেখা দেবে ঐক্য সৌষম্য ও অন্যোন্যভাবনার উল্লাস। পূর্ণকল চেতনার দীপ্তিতে ও চিৎশক্তির অকুণ্ঠ বীর্যে যাঁর জীবন অন্তঃপ্রবুদ্ধ হয়েছে, সহজেই তাঁর মধ্যে উছলে উঠবে আত্মবিৎ সিদ্ধসত্ত্বের আতটপূর্ণতা; আপ্তকামের অনির্বচনীয় আনন্দ, সার্থক আত্মপ্রকৃতির পরম-সৌমনস্য।

বিজ্ঞানঘন-চেতনার স্বভাব ও পরমা প্রকৃতির মুখ্যবৃত্তি হল দৃষ্টি ও কর্মের সম্যগ্‌ভাব, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের সাযুজ্য, মনোদৃষ্ট আপাতবিরোধের সমাধান এবং প্রজ্ঞা ও সংকল্পের তাদাত্ম্যহেতু বস্তুর স্বভাবসত্যের ছন্দ অক্ষুণ্ণ রেখে কবিক্রতুর অদ্বৈধ প্রবর্তনা। পরমা প্রকৃতির এই সহজধর্মই হল একত্ব অন্যোন্যভাব ও সৌষম্যের মূলাধার। মনোময় মানুষের কৃত্রিম জ্ঞানবৃত্তির সঙ্গে

বস্তুর সমগ্র। বা স্বরূপ-সত্যের একটা বিসংবাদ আছে বলে তার অনুভূত সত্যও অনেক সময় বন্ধ্যা অথবা ব্যাহত। আজ যে-তত্ত্ব আবিষ্কার করি, কাল তাকে মিথ্যা বলে আমরা ছুঁড়ে ফেলি; আমাদের প্রমত্তচিত্তের উন্মাদনা সত্যের অর্থ-ক্রিয়াকে বিপর্যস্ত করে। প্রায়ই আমাদের কর্মপ্রবৃত্তির অবাঞ্ছিত পরিণাম ঘটে—যে লক্ষ্যের যৌক্তিকতাকে আমরা স্বীকার করতে চাই না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের কর্ম তারই সাধনার অঙ্গীভূত হয়; অথবা ভাবের সত্য হয়তো বাস্তব-সার্থকও হয়, তবু দুদিন পরে ক্ষণেকের সার্থকতা আশাভঙ্গের বেদনা দিয়ে সিদ্ধির অপ্রত্যাশিত নিয়তির কাছে পরাভূত হয়। কোথাও ভাবাদর্শ যদি নতুন প্রয়াসের আকূতি জাগায়—কেননা বস্তুসত্যের অখণ্ড সমগ্রদর্শন হতে বঞ্চিত একদেশীচিত্তের বিবিক্ত কল্পনাতে ভাবের পূর্ণছবি তো কিছুতেই ফুটতে পারে না। প্রাকৃতচিত্তের দৃষ্টি ও ধারণার সঙ্গে বস্তুস্বভাবের সমগ্র-সত্যের যে-বিসংবাদ, মনের বিকল্পবৃত্তির মধ্যে যে পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টির অগভীরতা, তারাই ভাবের অর্থক্রিয়ার এমনিতর অপঘাত ঘটায়। আবার কেবল-যে জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের এমনি বিসংবাদ, তা নয়; একই আধারে অনেক-সময় সংকল্পের সঙ্গে সংকল্পের যে বিচ্ছেদ ও বিবাদ ঘনিয়ে ওঠে, তাতে অনর্থ আরও পুঞ্জীভূত হয়। আমাদের জ্ঞান হয়তো পর্যাপ্ত এবং পরিপক্ব, কিন্তু সংকল্প তার বিদ্রোহী কি বীর্যহীন; আবার কখনও সংকল্প হয়তো দুর্ধর্ষ বীর্যশালী ও তীব্রসংবেগবশত ফলোন্মুখ, কিন্তু ঋতের পথে তাকে চালিয়ে নেবার মত জ্ঞানের দীপ্তি আমাদের নাই। আমাদের জ্ঞানে সংকল্পে সামর্থ্যে ক্রিয়াশক্তিতে ও ব্যবহারে এমনিতর অসামঞ্জস্য অবনিবনা ও অপূর্ণতার নিত্য ভিড় লেগেই আছে: তাইতে কি কর্মযোগে কি জীবনসাধনায়, আমাদের সকল প্রয়াস বৈকল্য বা অসিদ্ধির দ্বারা বিড়ম্বিত হয়। আধারের এই ন্যূনতা অসাম ও বিশৃঙ্খলা অবিদ্যাশক্তির স্বাভাবিক বৃত্তি; প্রাকৃত প্রাণমনের ঊর্ধ্ব হতে উত্তর জ্যোতির অবতরণ ছাড়া কিছুতেই এর ঘোর কাটাবার নয়। বিজ্ঞানঘন-ভূমির সকল দর্শন ও ক্রিয়ার সহজধর্ম হল সত্যের সঙ্গে সত্যের তাদাত্ম্যবোধ-নিবিড় সৌষম্যের নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা। যতই মন সে-ভূমির চেতনায় আবিষ্ট হয়, ততই তার দৃষ্টি এবং কৃতি বিজ্ঞানঘন জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ হয়; অথবা তারই আবেশে এবং প্রশাসনে তাদের মধ্যে বিজ্ঞানধর্মের সহজ স্ফুরণ ঘটে। তখন সংকুচিত প্রবৃত্তির ঘোর সম্পূর্ণ না কাটলেও ঐ সীমিত সামর্থ্যেরই মধ্যে তাদের চলনে পূর্ণতা ও অবন্ধ্য অর্থক্রিয়াকারিতার আরও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ দেখা দেয়; তাতেই আমাদের অশক্তি ও ব্যর্থকতার সকল নিদান ধীরে-ধীরে কর্শিত হয়ে অবশেষে শূন্যে মিলিয়ে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে নির্মুক্ত সত্তার উদারতর আবেশে মনের মধ্যে বিপুলতর চেতনা ও শক্তির অকুণ্ঠ সামর্থ্য সঞ্চারিত হয় এবং সন্ধিনী-শক্তির অভিনব ঐশ্বর্যের দুয়ার উন্মোচিত হয়।

প্রজ্ঞা চৈতন্যেরই বীর্য, কৃতি এবং সত্যসংকল্প সন্ধিনী-শক্তিরই চিন্ময় বিভূতি ও বিলাস; বিজ্ঞানঘন-চেতনায় এ-দুটি আমাদের অকল্পনীয় চরমকোটিতে পৌঁছয়—তাদের সংবেগে ও সাধনবীর্যে স্ফুরিত হয় বিপুলতর একটা ঐশ্বর্য; কেননা চেতনার উপচয় যেখানে, সেখানেই দেখা দেয় সত্তারও বীজীভূত সমর্থ্য ও অর্থক্রিয়াকারিতার নিরঙ্কুশ উপচয়।

জ্ঞান ও শক্তির পার্থিব-রূপায়ণে দুয়ের এই অন্যোন্যসম্বন্ধ খুব স্পষ্ট হয়ে ফোটে না; কেননা মর্ত্যভূমিতে চেতনা অনাদি-অচিতির গহনে সংবৃত বলে তার স্বরূপশক্তির ছন্দময় প্রকাশ অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপে ক্ষুব্ধ এবং কুণ্ঠিত হয়। অচিতি সে-রাজ্যের সর্বেশ্বরী, তারই বীর্য সেখানে প্রথমজ এবং স্বতঃপরিণামী—চেতন-মন তারই আশ্রিত ক্ষীণবল আয়াসক্লিষ্ট অনুচরমাত্র; কারণ মনের মধ্যে আছে ব্যষ্টিজীবের সীমিত প্রবৃত্তির সামর্থ্য, আর অচিতি হল বিশ্বচেতনারই প্রচ্ছন্ন অমেয় বিভূতি—অতএব তার বীর্যবত্তা মনকেও স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়ে যায়। জড়লীলার দুর্মোচন গুণ্ঠনে সংবৃত্ত হয়ে বিশ্বশক্তি তার সত্যস্বরূপকে আমাদের চোখের আড়ালে রেখেছে; তাই আমরা বুঝতে পারি না যে অচিতির খেলা বস্তুত গুহাহিত বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বমনের বিরাট লীলা, অন্তর্গূঢ় বিজ্ঞানঘন-চেতনারই সে ছন্নবিভূতি : এমনিতর চিৎশক্তির প্রবর্তনা যদি মূলে না থাকত, তাহলে তার কৃতিশক্তি বন্ধ্যা হত, তার নির্মাণ-কলায় থাকত না ঋতের ছন্দ। জড়জগতে দেখি মনের চাইতে প্রাণশক্তির বীর্য যেন সার্থকসৃষ্টিতে আরও স্ফুরন্ত: মনঃশক্তির নির্মুক্ত প্রকাশ শুধু ভাব ও প্রত্যয়ের রাজ্যে—তার বাইরে তার সংবেগ ও পরিণামশক্তিকে জড় ও প্রাণকে আশ্রয় করে কাজ করতে হয় এবং তাদের শাসন মেনে চলতে গিয়ে মনকে ব্যাহত ও বীর্যহীন হতে হয়। তাহলেও দেখি, মনোময় জীবের আধারশক্তি জড় প্রাণ ও চেতনাকে নিয়ে যত স্বচ্ছন্দে কাজ করে যায়, পশুর আধারে তেমনটি সে পারে না: আধারের এই উৎকর্ষের কারণ, চেতনা ও প্রজ্ঞার বীর্য এবং সন্ধিনী-শক্তি ও সংকল্পশক্তির উন্মেষ মানুষের মধ্যে যত নির্মুক্ত এমন আরকোথাও নয়। মানুষেরও সমাজে দেখি, মনোময় মানুষের চেয়ে প্রাণময় মানুষের কৃতিশক্তির সংবেগ আরও দুর্ধর্ষ, কেননা প্রাণশক্তির স্ফুরদ্বীর্য তার মধ্যে আরও উদ্দাম; বুদ্ধিজীবী মানুষে ভাবনার বীর্য অন্তরে সার্থক হলেও জগতে সে বন্ধ্যা, কিন্তু প্রাণোচ্ছল কর্মবীর সেখানে জীবনের অভিযানে দিগ্বিজয়ী। তবু তার এই উৎকর্ষকে সিদ্ধরূপ দিতে হলে চাই মনঃশক্তির কূট উপযোগ; অতএব শেষপর্যন্ত মনোময় মানুষই তার বিদ্যাশক্তি ও বিজ্ঞান দিয়ে বৈরাজ্যের অধিকারকে জড়াশ্রিত প্রাণের প্রাকৃতসিদ্ধিরও ওপারে প্রসারিত করে—এমন-কি ফলিতবিজ্ঞানের সঞ্চয়হীন প্রাণময়-মানুষের সম্মূঢ় প্রাণশক্তির সহজসিদ্ধিরও সীমা ছাড়িয়ে। কিন্তু বৃহত্তর চেতনার উন্মেষে যে বিপুলতর

শক্তির স্ফুরণ ঘটবে মানুষে, বৈরাজ্যের অধিকারে এবং প্রকৃতিজয়ের সামর্থ্যে তা মনঃশক্তির সকল ঐশ্বর্য এবং কীর্তিকে ছাপিয়ে উঠবে; কেননা মন আমাদের যত শক্তিশালীই হোক্, ব্যষ্টিভাবনার সঙ্কোচ ও সন্ধিনী-শক্তির কুণ্ঠিত প্রকাশ তার বৃত্তিকে কার্পণ্যোপহত করবেই।

নিজের ও জগতের উপর মনের ঈশনা যতই নিরঙ্কুশ হোক্, প্রাণ ও জড়ের কতকটা আনুগত্য শুরুতেই তাকে স্বীকার করতে হয়: মনোবীর্যের অপরোক্ষ প্রশাসনে প্রাণ ও জড়ের অন্ধ অবরপ্রবৃত্তিকে কিছুতেই আমরা স্ববশে আনতে বা মার্জিত করতে পারি না। কিন্তু মনের এই শক্তিদৈন্য একেবারে অপূরণীয় নয়। রহস্যবিদ্যার একটা কৃতিত্ব এই, মনের উপর জড়ের কিংবা চিৎসত্ত্বের 'পরে কুণ্ঠচার প্রাণধর্মের আপাতপ্রভুত্ব যে বিশ্ববিধানের স্বরূপসত্য কি প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য ও অপরিবর্তনীয় বিধান নয়, তার প্রমাণ নানাভাবেই সে দিয়েছে; অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলনে চিত্তে যে-বীর্য স্ফুরিত হয়, তাতেও এর সমর্থন আছে। মনঃশক্তি, বিশেষ করে চিৎশক্তি যে ভাবনীয় ও অভাবনীয় নানা উপায়ে জড় ও প্রাণকে সবরকমে স্ববশে আনতে পারে; শুধু জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অথচ বুদ্ধিগম্য দৃষ্টসাধনদ্বারা নয়, বুদ্ধির অগম্য অলৌকিক-শক্তির সাক্ষাৎ প্রয়োগে ও স্বভাবেরই নিয়মে যে জড় ও প্রাণের নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর—এই আবিষ্কারই মানুষের বৈজ্ঞানিক-সিদ্ধির চরম কীর্তি। বিজ্ঞানঘন পরমা প্রকৃতির উন্মেষ ঘটলে চেতনার এই অব্যবহিত বীর্যবিভূতি, সন্ধিনীশক্তির এই অনন্তরিত কৃতিমত্ত্ব, জড় ও প্রাণের 'পরে তার এই অকুণ্ঠ ঈশনা ও প্রশাসন চরমকোটিতে পৌঁছতে পারে। কারণ বিজ্ঞানঘন-পুরুষে সিদ্ধবিদ্যা শুধু বহিরঙ্গ-সাধন দিয়ে বিদ্যার সংকলন তো নয়: তার স্বরূপ চিৎশক্তির পরিণামবশত চেতনার একটা অপূর্ব বিপাক, আধারে তার অমোঘ-বীর্যের একটা অভাবনীয় স্ফুরণ। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের সম্বুদ্ধ চেতনায় তাতে অপরোক্ষজ্ঞানের বিচিত্র ঐশ্বর্য ফুটবে; পরিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ আত্মবিজ্ঞানের সংগে-সংগে জাগবে পরচিত্তের অপরোক্ষ বিজ্ঞান, বিশ্বের নিগূঢ় শক্তিরাজির প্রত্যক্ষ চেতনা, জড়-প্রাণ-মনের গুহাহিত সকল রহস্যের অকুণ্ঠ সাক্ষাৎকার—যা আমাদের প্রাকৃতমনের কল্পনারও অগোচর। অধ্যাত্মবিদ্যার এই প্রকাশ ও প্রবৃত্তির মূলাধার হবে প্রমেয় সম্পর্কে বিজ্ঞানঘন-পুরুষের অপরোক্ষ বোধিচেতনা এবং সেই চেতনা হতে প্রসূত অপরোক্ষ প্রশাসনের বীর্য। তাঁর চেতনার প্রাকৃতবৃত্তিতেই একটা অভিনব দৃষ্টি-সৃষ্টির সামর্থ্য ফুটবে—আজ যা আমাদের কাছে অতিপ্রাকৃত: তার ফলে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির অকুণ্ঠ প্রেতি নিখিল কর্মপ্রবৃত্তিকে অখণ্ড অমোঘসিদ্ধির দিকে সমগ্র এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে প্রচোদিত করবে। কারণ বিজ্ঞানঘন-পুরুষ বিশ্বমূলাধার চিৎশক্তির সংগে পরম সামরস্যে যোগযুক্ত রয়েছেন; অতএব তাঁর সিদ্ধদর্শন ও সিদ্ধসংকল্প

অতিমানস সদ্ভূত-বিজ্ঞানের স্বতঃ-পরিণামিনী ঋতম্ভরা শক্তির বাহন হবে। তাই তাঁর কর্ম সম্মূল্যে চিন্ময়ী আদ্যা-শক্তির বীর্যবিভূতির স্বচ্ছন্দ রূপায়ণ হবে—যাঁর বিশ্বতোমুখ ঈক্ষণ মনে-প্রাণে-জড়ে অভিনব ব্যাকৃতির সিদ্ধরূপ ফোটায়। অতিমানসের জ্যোতিঃশক্তিতে তাঁর চেতনা সমিদ্ধিত, অতএব তার ঈশনাও অকুণ্ঠিত; তাই বিজ্ঞানঘন-পুরুষ স্ব-তন্ত্র, চিৎশক্তিরাজির অধীশ্বর, প্রকৃতির শাস্তা ও প্রভু, জড়। ও প্রাণ-লীলার সূত্রধার। বিজ্ঞানঘন-চেতনার অবরস্তরে অর্থাৎ তার উত্তরায়ণের অন্তরিক্ষলোকে এই ঈশনা পূর্ণ হয়ে ফুটবে না সত্য; কিন্তু তাহলেও তার বীর্যের খানিকটা প্রকাশ সেখানেও হবে এবং চিন্ময় উদয়নের পর্বে-পর্বে আপনাকে সে সহস্রদল কমলের সহজ মহিমায় বিকসিত করবে।

এমনি করে মনের সীমা পেরিয়ে চিৎশক্তি যখন উত্তীর্ণ হবে জ্ঞানাশক্তি ও ক্রিয়া-শক্তির লোকোত্তর ভূমিতে, তখন তার অপরিহার্য পরিণামরূপে চেতনার নব-নব বিভূতির অভ্যুদয় আধারে দেখা দেবে। প্রাণ ও জড়ের 'পরে চিন্ময়-প্রাণের অনিরুদ্ধ সংকল্প ও সংবেগের এবং জড়-প্রাণ মনের 'পরে চিৎসত্তার অকুণ্ঠ প্রশাসনই হবে এইসব নববিভূতির স্বধর্ম, বিজ্ঞানঘন জীবনায়নের স্বচ্ছন্দ সিদ্ধির পক্ষে আধারের এমনিতর রূপান্তর হবে অপরিহার্য একটা আযোজন। কেননা বিজ্ঞানঘন দিব্য পুরুষের অখণ্ড জীবনলীলায় শুধু একটি ব্যষ্টি-জীবনের উপচিত উল্লাস নয়—আত্মজীবন সেখানে এক অদ্বৈতচেতনার পরম সামরস্যে পরের জীবনের সংগে তাদাত্ম্যসুষমার ছন্দে গাঁথা। তাই সে-জীবনের মুখ্য সাধনবীর্য ফুটবে একত্ব ও সৌষম্যের অকৃত্রিম স্বতঃস্ফূর্ত সহজ-ভাবনায়। এ সম্ভব হয়, যখন চিৎসত্ত্বের সাযুজ্যবশত দিব্যসংঘের প্রতিটি ব্যষ্টি-আধারে এক অখণ্ড সত্তা ও চেতনার তাদাত্ম্যপ্রত্যয় ফোটে, সংঘের সবাই যখন নিজেদের এক স্বয়ম্ভূ-সত্তার স্বরূপ-বিগ্রহ বলে অনুভব করে—অতএব তাদের ব্যবহারেরও মূলে এক অখণ্ড চিৎ-সংবেগের বিপুলতর প্রবর্তনা এবং আধারস্থ সন্ধিনী-শক্তির মহত্তর সমুল্লাস থাকে। এই তাদাত্ম্যচেতনা আনবে অপরোক্ষ অন্যোন্য-অনুভবের অন্তরঙ্গতা, পরস্পরের সত্তা ভাবনা বেদনা ও গতি-প্রকৃতির নিবিড় অনুভূতি,—মনের সংগে মনের, প্রাণের সংগে প্রাণের, হৃদয়ের সংগে হৃদয়ের, আধারশক্তির সংগে আধারশক্তির বীর্যময় অন্যোন্যসংগমে আত্মসত্ত্বের চিন্ময় বিনিময়। এমনিতর চিদ্‌বীর্যের জ্যোতির-ভিষেকে আপ্লুত না হলে সংঘের একাত্মবোধ কখনও সত্য ও সম্পূর্ণ হয় না—পরিবেশের সংগে ব্যক্তিচেতনার সত্তা ভাবনা বেদনা ও গতি-প্রকৃতির সর্বতোমুখ সত্য-সামঞ্জস্যের সহজ সুরটি বেজে ওঠে না। এককথায় বলতে গেলে, পূর্ণচেতন একপ্রাণতার উপচীয়মান ভিত্তিতে প্রাণের সাধনাই এই নবোন্মেষিত পূর্ণতর জীবনসাধনার মূলমন্ত্র হবে।

সৌষম্যই চিৎসত্তার ঋতময় স্বচ্ছন্দ বিধান; বহুর মাঝে একের, বৈচিত্র্যের মাঝে অখণ্ডতার অথবা অদ্বৈতের চিত্র-লীলায়নের এই তো স্বভাবছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিণাম। শুদ্ধ নির্বিষয় অদ্বৈতের মধ্যে সৌষম্যের কোনও অবকাশ নাই--কেননা কোনও বৈচিত্র্যই নাই যেখানে, সেখানে কাকে গাঁথা হবে সৌষম্যের সূত্রে? আবার বৈচিত্র্যের পরিকীর্ণতাই যেখানে প্রবল, সেখানে হয় আছে বৈষম্য, নয়তো গোঁজামিল দিয়ে গড়া সৌষম্যের কৃত্রিম একটা রূপ। কিন্তু বহুভাবনার মধ্যে বিজ্ঞানঘন-চেতনার যে-অদ্বৈতদৃষ্টি, সেখানে অদ্বৈতের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশরূপেই ফোটে সৌষম্যের ছন্দ এবং এই স্বতঃস্ফুরণ হতে বোঝা যায় এর মূলে আছে অপরোক্ষ অন্তরঙ্গসন্নিকর্ষ ও ব্যতিষঙ্গজনিত চেতনার অন্যোন্য-সংবেদন। অবুদ্ধির জগতে সৌষম্যের ভিত্তি হল ইতর-প্রাণীর প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির সহজাত একত্বে; ইন্দ্রিয়বুদ্ধি দ্বারা সেখানে পরস্পরের যে-যোগাযোগ, তার মাঝে আছে প্রাণজ-বোধির সহজ বা অপরোক্ষ প্রেরণা এবং পশু কি কীটের সমজে সহযোগিতা তাতেই সম্ভব হয়। বুদ্ধির জগতে, মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় ইন্দ্রিয়ের কি মনের দেখাতে ভাবের বিনিময় হয় ভাষা দিয়ে; কিন্তু এসব সাধন অসম্পূর্ণ বলে আজও মানুষের সমাজে সৌষম্য ও সহযোগিতার পূর্ণবিকাশ ঘটেনি। বিজ্ঞানঘন চেতনার জগৎ বুদ্ধির ওপারে--পরমা প্রকৃতির রাজ্যে; সেখানে পরস্পরের যোগাযোগ প্রসৃত ও নিবিড় হবে চিন্ময় সংহতিবোধের স্বতঃসংবিতে, স্বভাব ও স্বধর্মের আত্মসচেতন অন্যোন্যসংগমে। চেতনার সঙ্গে চেতনার অন্তরঙ্গ যোগের অভূতপূর্ব দিব্য সাধন ও বিভূতির উন্মেষ হবে সে-জগতে : তাইতে চেতনার সঙ্গে চেতনার, ভাবের সঙ্গে ভাবের, দর্শনের সঙ্গে দর্শনের, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের এমন-কি দৈহ্যসংবিতের সঙ্গে দৈহ্য-সংবিতের অপরোক্ষ অন্তরঙ্গতাই সেখানে হবে ভাববিনিময়ের স্বাভাবিক মুখ্য-সাধন। চেতনার এইসব নববিভূতি আধারের প্রাক্তন বহিঃকরণসমূহে আবিষ্ট হয়ে তাদের গৌণ-প্রবৃত্তিতেও বিপুল ও সার্থক বীর্যের সঞ্চার করবে এবং এই দিব্যবিভূতিযোগই হবে শুদ্ধসত্ত্ব ও জীবনায়নের গভীর সামরস্যের পরিবেষে চিৎপুরুষের স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশের যোগ্য বাহন।

চেতনার যেসব সহজবিভূতি এখনও অন্তর্লীন ও অবিকশিত অবস্থায় আছে, তাদের উন্মেষের সম্ভাবনাকে আধুনিক মন সত্য বলে মানতে চায় না; কেননা প্রকৃতিপরিণামের যে-পর্বে এসে আমরা পৌঁছেছি আজ, সেখানকার অজ্ঞদৃষ্টিতে এইসব কল্পনার মূলে প্রত্যক্ষের তেমন জোর নাই বলে তারা অতি-প্রাকৃত রহস্যময় প্রাতিহার্যেরই শামিল। আধুনিক চিত্তের সংকীর্ণ অনুভব ও অন্ধসংস্কার বলবে, বিশ্বলীলার মূলে আছে শুধু জড়শক্তির খেলা, সে-ই বিশ্বের জননী এবং ধাত্রী; তার গতিপ্রকৃতির যে-পরিচয়টুকু আমরা পেয়েছি,

তার বাইরে আর-কিছুকে মানতে আমরা বাধ্য নই। কিন্তু মানুষের প্রাকৃত-চেতনা যদি জড়শক্তির কোনও অভাবনীয় সাধনবীর্যের আবিষ্কার ও অনুশীলন-দ্বারা এমন-কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়ে তোলে যা প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণামে আজও জগতে ঘটেনি, তাহলে আধুনিক মন যে অত্যন্ত সহজভাবে তাকে শুধু গ্রহণ করে তা নয়—সে এই ভেবে উল্লসিত হয়ে ওঠে যে অভিনব আবিষ্ক্রিয়ার এমন সম্ভাবনার বাস্তবিক কোনও ইতি নাই। অথচ সেই মনই চেতনার কোনও অভাবনীয় সাধনবীর্যের উন্মেষ কিংবা প্রাণ-মনের কোনও সুপ্ত-শক্তির জাগরণের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেবে এই বলে যে, প্রকৃতি কি মানুষের সাধনায় আজও আমাদের চোখের সামনে এমন-কিছু তো গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এমনিতর নবশক্তির উন্মেষকে অলৌকিক প্রাতিহার্যের কোঠায় ফেলা চলে না কোনমতেই: বরং এই কথাই বলা চলে, জড় উদ্ভিদ ও পশুর পরে মনুষ্য-প্রকৃতির আবির্ভাবে —পরা বা পরমা প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক ধারার উন্মেষ ছাড়া যেমন অপ্রাকৃত কিছুই ঘটেনি, তেমনি দিব্যপ্রকৃতির আবির্ভাবও মনুষ্য-প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণামের একটা উত্তরকাণ্ড মাত্র। আজ আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে আশ্চর্য মননশক্তি, ফুটেছে বুদ্ধির খেলা, মনোময় বোধি ও অন্তর্দৃষ্টির আভাস, ফুটেছে ভাষা সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ও রসচেতনার লীলায়ন এবং তাই দিয়ে চলেছে আধারের গুহাহিত তত্ত্ব ও বীর্যের আবিষ্কার ও বশীকার : অথচ পশুচেতনার কুণ্ঠিত সামর্থ্যকে আঁকড়ে থাকলে এসব কিছুরই উন্মেষ কোন কালে সম্ভব হত না, কেননা পশুর মধ্যে এমন-কিছু দেখা দেয়নি যা হতে এই বিপুল প্রগতির এতটুকু আভাসও অনুমান করা চলে। অথচ ঐ পশুচেতনাতেই যে দুর্লক্ষ্য সূচনা ভবিষ্যের যে ভ্রূণ বা স্তম্ভিত সম্ভাবনা অন্তর্গূঢ় ছিল, তাহতেই স্ফুরিত হয়েছে যুক্তি ও বুদ্ধির রাজ্যে মানব-চেতনার বিস্ময়কর ঐশ্বর্য : কে জানত তুষারশৈলের স্তব্ধ-বুকে দুকূল-ছাপানো প্রাণের কল্লোল এমনি করে ঘুমিয়ে ছিল! আমাদের প্রাকৃত-চেতনাতেও বিজ্ঞান-ঘন পরমাপ্রকৃতির চিন্ময়ী বিভূতির অস্ফুট সূচনা তেমনি নিহিত রয়েছে—যবনিকার অন্তরাল হতে কদাচিৎ ফুটে ওঠে তার ক্ষণিক দীপ্তি। প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণাম এতখানি উঁচুতে এসে আজ যখন পৌঁছেছে, তখন পরের ধাপে তার অবন্ধ্যশক্তির প্রবেগ যে ঊষার অরুণ আভাসকে মধ্যাহ্নের খরদীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে তুলবে—এ-প্রত্যাশা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক নয়।

সাধনবলে বা অনায়াসে হোক্ কিংবা চিৎশক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণেই হোক্, অন্তশ্চেতনার কমল যখন ধীরে-ধীরে ফুটতে থাকে, মরমীরা জানেন কেমন করে তখন সাধকের আধারে বিচিত্র নববিভূতির উন্মেষ হয়। অন্তশ্চেতনার উন্মীলনে কি সাধকের আকূতিতে ঋদ্ধির এই স্ফুরণ এতই স্বাভাবিক যে, সাধনশাস্ত্রে সাধককে তার সর্ববিধ প্রলোভন থেকে দূরে থাকবার উপ-

দেশ দেওয়া প্রয়োজন হয়েছে। জীবন হতে সরে দাঁড়াতে চান যাঁরা, তাঁদের কাছে এই প্রত্যাখ্যানের সার্থকতা নিশ্চয় আছে: কেননা ঋদ্ধিকে অংগীকার করলে জীবনের দায় বাড়বেই, নির্জলা মুমুক্ষার পথে কাঁটা পড়বেই। ঈশ্বর-প্রেমিক ঈশ্বরকেই চান শুধু—ঋদ্ধির মত তুচ্ছ বস্তুর দিকে তাঁর লোভ নাই; তাই ঈশ্বরলাভ ছাড়া আর-সব পুরুষার্থের প্রতি উপেক্ষা তাঁর স্বাভাবিক, কেননা বিভূতির সর্বনাশা প্রলোভন তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে—এ-আশংকা অমূলক নয়। তেমনি কাঁচা সাধকও ঋদ্ধিকে নিঃস্পৃহ আত্মসংযম ও তপস্যার খাতিরে প্রত্যাখ্যান করবে; কেননা ঋদ্ধির অলৌকিকত্ব সহজেই তার কাঁচা আমিকে অযথা ফাঁপিয়ে তুলে সর্বনাশ ঘটাতে পারে। সিদ্ধির অভীপ্সা যাঁর মধ্যে, ঋদ্ধির প্রলোভন থেকে স্বভাবতই তিনি সরে থাকতে চাইবেন; কেননা ঋদ্ধি মানুষকে যেমন তুলতে পারে, তেমনি নামাতেও পারে—ওর অপপ্রয়োগ যত সহজ এমন আর-কিছুরই নয়। কিন্তু কেবল নিঃশ্রেয়স নয়, অভ্যুদয়ও যদি অধ্যাত্মসাধকের পুরুষার্থ হয়, প্রাণ ও চেতনার প্রসারে আধারে স্বভাবতই যদি অভিনব সামর্থ্যের উৎসারণ ঘটে—তাহলে শক্তিসঞ্চয় সম্পর্কে কোনও প্রতিষেধ খাটতে পারে না: কারণ পরমাপ্রকৃতিতে উত্তীর্ণ আধারে লোকোত্তর চিদ্‌বিভূতি ও প্রাণবীর্যের আবির্ভাব ঘটবেই—প্রজ্ঞা ও শক্তির অতিপ্রাকৃত সাধনসম্পদের স্বাভাবিক উপচয় হবেই। আধারে এমনিতর লোকোত্তর-শক্তির উন্মেষ অযৌক্তিক কি অবিশ্বাস্য কিছুই নয়, বা তার মধ্যে অলৌকিক প্রাতিহার্যের এতটুকু আভাসও নাই: কেননা মানসভূমি হতে বিজ্ঞানঘন বা অতিমানস ভূমিতে আমাদের উদয়নের সংগে-সংগে চেতনা ও তার শক্তিসমূহে স্বভাবেরই নিয়মে এমনিতর অভ্যুদয়ের সংবেগ সঞ্চারিত হবে। অতএব বিজ্ঞানঘন-চেতনায় উত্তীর্ণ পুরুষের আধারে পরমাপ্রকৃতির দিব্য-ঋদ্ধির উন্মেষ হবে তাঁর স্বাভাবিক আত্মোন্মেষেরই পরিণাম—তাঁর নবলব্ধ উত্তর-চেতনার সহজ ও স্বচ্ছন্দ প্রাকৃতলীলায়ন; মানুষের পক্ষে মননশক্তির উন্মেষ ও উপযোগ যেমন তার আত্মপ্রকৃতির স্বধর্ম, বিজ্ঞানঘন-পুরুষের অতিমানস জীবনায়নেও তেমনি বিজ্ঞানশক্তির স্ফুরণ ও প্রয়োগ তাঁর পরা প্রকৃতিরই স্বভাবছন্দ।

সিদ্ধজীবনের তুংগভূমিতে চিৎশক্তি কি চিদ্‌বিভূতির এমনিতর উপচয় শুধু স্বাভাবিক নয়—স্পষ্টত তা অপরিহার্যও বটে। সৌষম্যের স্থান মানুষের জীবনে আজও সীমিত, কেননা আজও তার মাঝে বাইরে-থেকে-চাপানো অনড় আইন-কানুনের কারসাজিই বেশি: সে-আইনও সাধারণ মানুষ মেনে নিয়েছে কতক স্বেচ্ছায়, কতক দায়ে পড়ে, কতক স্বার্থের প্ররোচনায়, কতক-বা জুলুমের বশে। হৃদয়ে-প্রাণে-মনে আলোর আভাস যেখানে রসের চেতনা এনেছে, সেইখানে মানুষ মিলেছে মানুষের সংগে—ভাবে আকাংক্ষায় বাসনার তর্পণে

কি পুরুষার্থের প্রেতিতে তারা বিচরণের একটা সাধারণ ভূমি মেনে নিয়েছে। কিন্তু গণমনের বেশির ভাগ জুড়ে আছে জীবনাদর্শ সম্পর্কে একটা ভাসা-ভাসা বোধ; সে-বোধকে বাস্তবে রূপ দেবার ক্ষমতা তাদের স্তিমিত—তাদের সংকল্পেও এমন তেজ নাই যে অবিপ্লুত সাধননিষ্ঠায় সিদ্ধিকে তারা মূর্তি-মতী করে তুলবে কিংবা জীবনকে আরও পূর্ণায়ত করবে। তারও পরে তাদের মধ্যে আছে কত দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য, কত অসার্থক বাসনা ও পরাহত সংকল্পের আড়ষ্টকঠিন ভার, কত অবদমিত অতৃপ্তির অবরুদ্ধ ধূমায়ন কিংবা অসমতৃপ্ত স্বার্থের জ্বালাময় বিস্ফোরণ; তাদের নিরূঢ় সংস্কারের 'পরে এসে পড়েছে নতুন ভাব ও জীবনাদর্শের অভিঘাত—তুমুল বিপর্যয় ছাড়া তাদের আপন করে নেবার কোনও উপায় নাই। আবার, প্রকৃতি ও পরিবেশের অব্যক্ত গহন হতে প্রাণশক্তির দুর্জয় প্লাবন উৎসারিত হচ্ছে—কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে মানুষের যত্নে-গড়া সকল কৃতি; প্রাণ ও মনের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে, বিশ্বপ্রকৃতির অতর্কিত বিক্ষোভে যে প্রলয়ংকর বিপর্যয় উত্তাল হয়ে উঠছে, তাকে স্তব্ধ পরাভূত করবার বীর্য তাদের নাই। একটি বস্তুর অভাবই এব মধ্যে সবার চাইতে স্পষ্ট—সে হল অধ্যাত্মজ্ঞান ও অধ্যাত্মশক্তির অভাব। তাই আত্মার বশীকার, সর্বাত্মভাবনার বীর্য, বিশ্বশক্তির উদ্ধত পরিমণ্ডলের 'পরে অকুণ্ঠ ঈশনা, জ্ঞানকে বাস্তবে রূপ দেবার পূর্ণজাগ্রত ও পূর্ণসন্নদ্ধ সামর্থ্য। এদেরই অভাব বা ন্যূনতা আমাদের প্রাকৃতজীবনে; আর বিজ্ঞানঘন-প্রকৃতির স্ফুরন্ত জ্যোতিতে আছে এই দিব্যভাবনারই নিরূঢ় আবেশ।

মানুষের সমাজে শুধু যে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতেই হৃদয় মন ও প্রাণের অবনিবনা হতে বিরোধের সৃষ্টি, তা নয়—প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণে ও মনেও কত বিসংবাদী শক্তির প্ররোচনা আছে; তাদের গুছিয়ে নেবার প্রয়াস যেমন আমাদের পংগু, তার চাইতে পংগু অমাদের যে-কোনও শক্তির অভংগ-ভাবনার সার্থকতাকে জীবনে রূপ দেবার সামর্থ্য। এই যেমন, প্রেম কি সমবেদনা আমাদের চেতনার স্বাভাবিক ধর্ম—চেতনার প্রসারের সংগে-সংগে আমাদের 'পরে তার দাবি বেড়ে চলে; কিন্তু তারও পরে বুদ্ধির দাবি আছে, আছে প্রাণসংবেগ ও প্রবৃত্তির তাগিদ এবং আরও কত-কী বৃত্তির প্রেষণা যারা ঠিক মৈত্রী-করুণার সংগে খাপ খায় না। এতগুলি বিরুদ্ধ বৃত্তিকে কী করে অখণ্ড জীবনধর্মের সংগে মানিয়ে নেওয়া যায় তা জানি না—এদের যে-কোনও একটিকে পুরাপুরি সার্থক ও ঈশনাযুক্ত করবার সুষ্ঠু উপায়ও আমাদের জানা নাই। সমগ্র আধারে এবং সমগ্র জীবনে এই শক্তিসংঘাতকে ছন্দময় ও সার্থক করতে হলে আমাদের অধ্যাত্মপ্রকৃতির পূর্ণতর উন্মীলন চাই এবং তারি ফলে জীবনে নামিয়ে আনা চাই সেই অখণ্ড চেতনার উদার জ্যোতি ও বীর্যের আবেশ—যার মধ্যে প্রজ্ঞায় ও শক্তিতে, প্রেমে ও প্রাণবাসনায় কোনও বিরোধ নাই, শুদ্ধচিত্তের

বহুমুখী বৃত্তি যেখানে সহজ প্রকাশের নিত্যছন্দে গাঁথা। আমাদের জীবনপথ তখন সেই সত্যের আলোকে আলোকিত হবে—যার স্বচ্ছ ও সহজ সংবিতে ফুটে ওঠে সাধ্য ও সাধনার অকুণ্ঠ স্বরূপ, যার বীর্য সত্যসংকল্পের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্‌যাপনে সার্থক হয়, যার চিন্ময় অনুত্তর সৌষম্যের স্বভাবছন্দে আধারশক্তির সকল জটিলতা স্বয়তঃস্ফূর্ত স্বরূপসত্যের অনুপম সংহতি পায় আর তারই উল্লাস ছাপিয়ে পড়ে প্রকৃতিপরিণামের পর্বে-পর্বে।

শুধু বুদ্ধির কসরত বা মনের কল্পনাচাতুরী দিয়ে জীবনের জটিলতায় ছন্দসুষমা ফুটিয়ে তোলা যায় না—একথা বলাই বাহুল্য; প্রবুদ্ধচেতনার বোধি ও আত্মসংবিৎই জানে জীবনের মালঞ্চে সৌষম্যের ফুল ফোটাতে। ষোড়শকল অতিমানস-পুরুষের এই তো স্বধর্ম—এই তো তাঁর জীবনবেদ; তাঁর অধ্যাত্মদৃষ্টি ও অধ্যাত্মবোধ আধারের সকল শক্তিকে সংহত করতে জানে এক অখণ্ডচেতনায় এবং ঋতময় কর্মের সহজপ্রবৃত্তিতে তাদের উৎসারিত করতে পারে। এই ঋতের সৌষম্যেই চিৎসত্তার সহজ প্রকাশ; আমাদের প্রকৃতিগত অনৃতের বৈষম্য অবিদ্যাচেতনার পক্ষে স্বাভাবিক হলেও বিজ্ঞানঘন-চেতনায় এতটুকু ছায়াও তার পড়ে না। বৈষম্য চিৎসত্তার স্বধর্ম নয় বলেই আমাদের প্রাকৃতজীবনের গুহাহিত বিজ্ঞানশক্তিতে বৃহত্তর সৌষম্যের অতর্পণ আকৃতি নিত্য জাগে। সমগ্র আধার জুড়ে সৌষম্যের একটা অপরাজিত ছন্দ বিজ্ঞানঘন-পুরুষে যেমন স্বাভাবিক, তেমনি তা স্বাভাবিক বিজ্ঞানঘন সংঘ-চেতনাতেও—কেননা জীবনের প্রতিষ্ঠা সেখানে সর্বাত্মভাব হতে উৎসারিত অন্যোন্যচেতনাতেই। সত্য বটে, বিজ্ঞানঘন জীবনায়ন পার্থিবপ্রকৃতির এক-দেশমাত্র অধিকার করবে, সুতরাং অপূর্ণস্ফুট জীবনচেতনার অভিযান মর্ত্যের বুকে তেমনই চলতে থাকবে; কিন্তু বিজ্ঞানঘন-জীবনের সম্যক-সম্বোধি আলো-ছায়ার এই সমগ্র রূপটিকে কখনও অস্বীকার করবে না—ছায়ার বুকে সে তার স্বত-উৎসারিত আলোরই ছন্দদোলা সাধ্যমত দোলাবে। মনে হতে পারে, এই বুঝি বিশ্বসৌষম্যের ছন্দ-নৃত্যে তালভঙ্গ হল—কেননা অবিদ্যা-চেতনা কখনও তাদাত্ম্যবোধের দ্বারা বিদ্যা-চেতনাকে আত্মসাৎ করতে পারবে না, তাই উভয়ের অন্যোন্যসম্পর্কের মধ্যে একটা ফাঁক থেকেই যাবে আত্ম-সংবিতের অন্যোন্যভাবনার অভাবহেতু; সুতরাং অবিদ্যা-প্রবৃত্তির সঙ্গে বিদ্যা-প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বই হবে তাদের সম্পর্কের স্বরূপ। সমস্যাটা আমাদের কাছে যত গুরুতর, বিজ্ঞানঘন-চেতনার কাছে কিন্তু তত নয়; কেননা বিশ্বকে আত্মসাৎ করবার দায় তারই বলে তার অকুণ্ঠ প্রজ্ঞায় আছে অবিদ্যা-চেতনারও মর্মসত্যের পূর্ণজ্ঞান,—অতএব সুপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানঘন-জীবনের পক্ষে এই মর্ত্য-প্রকৃতির অপরিস্ফুট জীবনের সঙ্গে সুর বাঁধবার আয়োজন কখনও উপহত হবে না।

পার্থিবপরিণামের এই যদি হয় চরম নিয়তি, তাহলে একবার দেখা

দরকার উত্তরায়ণের পথে আমরা এসে এতদিনে কোথায় দাঁড়িয়েছি। প্রগতির ধারা বয়ে চলেছে ঋজু পথে নয়; অনেক আবর্ত তার মধ্যে, কম্বুরেখার অনেক ধাঁধা—যদিও তির্যক চলনের বাঁকাচোরাতে মোটের উপর সে-ধারা এগিয়েই চলেছে। অদূর বা অনতিদূর ভবিষ্যতে বিশিষ্ট কোনও লক্ষ্যের দিকে তার ঝোঁক আছে কিনা—এই আমাদের প্রশ্ন। এতকাল ধরে মানবের অভীপ্সা শুধু যে ব্যক্তিগত কি জাতিগত জীবনের পূর্ণতারই দিকে ঝুঁকেছে, তাহতে অনাগত পরিণামের আভাস ও সাধনার খানিকটা পরিচয় মেলে বটে—কিন্তু আমাদের চিত্তের আলো-আঁধারিতে তার ছবি খুব স্পষ্ট নয়। তাই সত্য প্রগতির জন্য যা প্রয়োজন, তার সঙ্গে প্রগতিবিরোধী উপাদানের জটলা পাকিয়ে জীবনসমস্যার সমাধানের নামে আমরা স্তূপাকার করেছি ছেলেমানুষির নানা জঞ্জাল। এমনি করে আমরা খাড়া করেছি জীবনাদর্শের তিনটি ছক : আমরা হয় চেয়েছি মানুষের ব্যষ্টি-আধারের অন্যনিরপেক্ষ পুষ্টিতে ব্যক্তিজীবনের পূর্ণতা, কিংবা গোষ্ঠী-সত্তার সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিতে সমাজজীবনের পূর্ণতা, অথবা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের এবং সমাজের সঙ্গে সমাজের আদর্শ সমন্বয়—যদিও ব্যবহারের দিক দিয়ে এক্ষেত্রে সমন্বয়-সাধনার অবকাশ সংকীর্ণ-তর। আমাদের একান্ত বা বিশেষ ঝোঁক কখনও পড়ে ব্যক্তির 'পরে, কখনও গোষ্ঠী কি সমাজের 'পরে, কখনও-বা ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টি-মানবের সত্য ও সুষম সম্পর্কের 'পরে। কেউ বলেন, ব্যক্তিজীবনের স্বাতন্ত্র্য পূর্ণতা ও প্রাণোচ্ছলতাই আমাদের পরম পুরুষার্থ; কিন্তু এখানেও আদর্শের ভেদ আছে। ব্যক্তিবাদীদের কেউ চান ব্যক্তিসত্তার নিরঙ্কুশ আত্মপ্রকাশমাত্র, কেউ চান ভরা মন প্রচুর প্রাণ ও নিখুঁত শরীর নিয়ে ব্যক্তির জীবনে স্বারাজ্যসিদ্ধির একটি সম্পুট, কেউ-বা চান শুধু চিন্ময়ী সিদ্ধি ও আত্মার মুক্তি। এঁদের জীবন-দর্শনে সমাজ ব্যক্তির পুষ্টি ও প্রবৃত্তির জন্যেই; ব্যক্তির ভাবে কর্মে প্রগতিতে আত্মসম্পূর্তির সাধনায় কোনও আড়ষ্টতা কি উপায়বৈকল্য না থাকে, তার পুষ্টিমার্গের স্বাতন্ত্র্য বা দেশনা কোথাও ব্যাহত না হয়, তার আয়োজন করাই সমাজের কর্তব্য। আবার সমাজবাদীদের মত সম্পূর্ণ এর বিপরীত : তাঁদের কাছে গোষ্ঠী-জীবনই একান্ত বা মুখ্য—জাতির অস্তিত্ব ও পুষ্টিই সব, ব্যক্তি সমাজদেহের একটি কোষমাত্র, অতএব সমাজের বা মানবজাতির প্রয়োজনে নিজেকে বলি দেওয়া ছাড়া তার জীবনের আর-কোনও প্রয়োজন থাকতে পারে না—প্রকৃতির বুকে তার আবির্ভাবের এছাড়া আর-কোনই তাৎপর্য নাই। এদের মধ্যে আবার কেউ বলেন, জাতি সমাজ বা সম্প্রদায়ের একটা সংহত ও নিজস্ব জীবনসত্তা আছে—তার সংস্কৃতিতে প্রাণশক্তিতে জীবনাদর্শে কি আচারানুষ্ঠানে সেই বিশিষ্ট সত্তার রূপ ফোটে; ব্যক্তিকে সেই সংস্কৃতির ছাঁচে নিজেকে ঢালতে হবে, সব-কিছু গোষ্ঠীর প্রাণশক্তির সেবায় উৎসর্গ করতে হবে, তাকে

বাঁচতে হবে শুধু সমষ্টি-সত্তার বিধৃতির ও সার্থকতার সাধনরূপে। তৃতীয় মতে, মানুষের জীবনে পূর্ণতা আসে অপরের সংগে তার নৈতিক ও সামাজিক সম্বন্ধের উৎকর্ষ হতে। মানুষ সামাজিক জীব—অতএব তাকে বাঁচতে হবে পরার্থে, সমাজের প্রয়োজনে, জাতির জীবনযজ্ঞে আহুতিরূপে: মানুষের সমাজও তেমনি রয়েছে সার্বজনীন সেবার প্রতিষ্ঠানরূপে—সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষায় দীক্ষায় ব্যবহারে আজীবে ও জীবনসাধনায় ন্যায়সংগত সকলরকম সুযোগ করে দেওয়া তার কর্তব্য। প্রাচীন সংস্কৃতিসমূহে সব-চেয়ে বেশী জোর দেওয়া হত সমাজসত্তার 'পরে—সেখানে ব্যক্তির দায় ছিল সমাজের সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া: কিন্তু তারও মধ্যে ব্যক্তিজীবনের পূর্ণতার আদর্শ কোথাও-কোথাও পুরুষার্থের আসন পেয়েছে। প্রাচীন ভারতে ব্যক্তির অধ্যাত্মিক প্রগতি ছিল জীবনের মুখ্য সাধনা; কিন্তু তা বলে সমাজের গুরুত্বও কিছু কম ছিল না—কেননা সামাজিক শিক্ষাদীক্ষার আওতাতেই প্রথমত অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় সত্ত্বের সুষ্ঠু বিকাশে মানুষের সর্ববিধ লৌকিক এষণার তর্পণ হত, সদাচার ও বিদ্যার সাধনায় কৃতার্থ হয়ে মুমুক্ষু জীবনে সে পেত স্বরূপোপলব্ধি ও স্বাতন্ত্র্যের সত্য অধিকার। সাম্প্রতিক জগতে মানুষের ঝোঁক জাতীয় প্রগতির দিকে—সে এখন চায় আদর্শ সমাজ; তার মধ্যে অতি-আধুনিক আবার চায় বৈজ্ঞানিক বিধিনিষেধের যন্ত্রাচার দিয়ে নিখিল মানব-জাতিকেই এক ছাঁচে গড়ে তুলতে। তাই ব্যষ্টি-মানুষ ক্রমেই হয়ে উঠছে গোষ্ঠীর প্রত্যংগমাত্র; জাতিদেহের একটি কোষরূপে বিধিতন্ত্রিত সমাজের সার্বভৌম লক্ষ্য ও সমূহস্বার্থের নির্বিচার আনুগত্য ছাড়া তার মনোময় কি চিন্ময় সত্তার স্ব-তন্ত্র কোনও সার্থকতাই নাই। জীবনের এই আদর্শ এখনও সবজায়গায় কায়েম হয়নি বটে, কিন্তু দেখতে-দেখতে সে-ই যে সর্বত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তাতে কোনও ভুল নাই।

মানুষের চিন্তার জগতে তাহলে রয়েছে এই দ্বিধার আন্দোলন : একদিকে ব্যক্তির মধ্যে স্ব-তন্ত্র আত্মপ্রতিষ্ঠার, স্বকীয় রীতিতে দেহ-প্রাণ মনের পুষ্টিসাধনার ও ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসিদ্ধির প্রেরণা বা আমন্ত্রণ এসেছে; আর-এক দিকে এসেছে সমাজের প্রবৃত্তি ভাবনা সংকল্প আদর্শ ও স্বার্থের প্ররোচনাকে নিজস্ব জেনে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ দ্বারা নিজেকে তার কাছে নুইয়ে দেবার তাগিদ। প্রকৃতি তার মধ্যে সঞ্চারিত করেছে আত্মরতির এষণা—আত্মপ্রতিষ্ঠার নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা তার মজ্জগত; অথচ সমাজের মনঃকল্পিত আদর্শের দিক থেকে নিখিল মানবজাতির জন্যে কিংবা 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ' আত্মবলির ডাক এসেছে তার কাছে। একদিকে আত্মসুখৈষণা, আর-এক দিকে বিশ্বহিতৈষণা—এ-দুয়ের দ্বন্দ্বে আধুনিক চিত্ত সংকুল। রাষ্ট্র আজ দাবি করছে ঈশ্বরের আসন—সে চায় অনুগত সেবকের মত ব্যক্তি নিজের সর্বস্ব

বলি দিক তার বেদিমূলে; রাষ্ট্রের এই অত্যুগ্র দাবিকে ঠেকিয়েই ব্যক্তিকে তার ভাব আদর্শ ও চরিতার্থতা খুঁজতে হয়, নিজের বিবেককে মানতে গিয়ে হতে হয় রাষ্ট্রদ্রোহী।...আদর্শের এই দ্বন্দ্ব হতে প্রমাণ হয়, মানুষের অবিদ্যাচ্ছন্ন মন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে শুধু সত্যের সন্ধানে; সত্যের বিভিন্ন দিক হাতে ঠেকছে তার, কিন্তু সম্যক-জ্ঞানের অভাবে সৌষম্যের সূত্র সে তাদের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না। যে সর্বসমন্বয়ী একত্বভাবনা এই গোলকধাঁধায় সত্যের পথ খুঁজে পাবে, তার তত্ত্ব নিহিত রয়েছে আমাদের গুহাহিত চেতনায়—যেখানে একত্ব ও সম্যক্ত্ব প্রকৃতির সহজধর্ম। ঐ চেতনা যদি জীবনযজ্ঞের পুরোধা হয়, তবেই আমরা খুঁজে পাব বিশ্বরঙ্গে আমাদের অস্তিত্বের তাৎপর্য এবং তারই সঙ্গে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের সকল সমস্যার সত্য সমাধান।

বিশ্বের মূলে সর্বভূতের মর্মসত্যরূপী এক পরমথার্থসং রয়েছেন, যিনি তাঁর নিখিল বিভূতি ও বিসৃষ্টির চাইতে শাশ্বত ও মহান; সেই সত্যস্বরূপকে জেনে তাঁর মধ্যে বাস করে তাঁরই সর্বোত্তম বিভূতি ও বিসৃষ্টিকে জীবন-সাধনায় রূপ দেওয়া—এই হল ব্যক্তির কি সমাজের আদর্শসিদ্ধির মন্ত্র। এই পরামর্থসংই প্রতি বস্তুর হৃদিসন্নিবিষ্ট থেকে তাঁর প্রত্যেক বিভূতিতে আত্ম-বীর্যের আধানে তাঁর আত্মবিভাবনার প্রেতি সার্থক করছেন। বিশ্ব সেই সৎস্বরূপের বিসৃষ্টি—অতএব তার একটা স্বরূপ-সত্য ও শক্তি-বিগ্রহ আছে, যাকে বলতে পারি বিশ্বাত্মা বা বিশ্ব-চিৎ। মানবজাতিও তেমনি বিশ্বে প্রকটিত ব্রহ্মেরই একটা বিভূতি বা বিসৃষ্টি—অতএব বিশ্বমানবের একটা আত্মভাবের সত্য ও চিন্ময় ভাবনা আছে, মানবজীবনেরও আছে একটা বিশিষ্ট নিয়তি। এমনি করে ব্রহ্মের বিভূতিরূপে মনু-চিতের বিসৃষ্টিরূপে গোষ্ঠী-সত্তার আছে একটা স্বরূপসত্য, একটা আত্মভাব ও আত্মবীর্য। সবার শেষে, ব্যক্তিকে জানি ব্রহ্মেরই বিভূতিরূপে—জানি তারও আছে একটা স্বরূপসত্য, আছে একটা চিন্ময় আত্মভাবনা—দেহ-প্রাণ-মনের আধারে যার স্বাভাবিক স্ফুরণ ঘটলেও সেইখানেই তা নিঃশেষিত হয় না; এও জানি, দেহ-প্রাণ-মনের বেষ্টনী ছাড়িয়ে, এমন-কি মানবতারও উপাধি ছাপিয়ে তার আত্মবিভাবনার বিপুল বীর্য প্রসা-রিত হয়। কারণ মানবতাই ব্রহ্মের সমগ্র বা অনুত্তম আত্মবিভূতি কি অনু-ভা নয়; মানবের পূর্বে ব্রহ্ম যেমন আপনাকে ফুটিয়েছিলেন অব-মানবতায়, তেমনি এবার হয়তো মানুষের পরে কি মানুষেরই মাঝে নিজেকে ফোটাবেন অতি-মানবরূপে। অতএব সদ্রূপী বা চিদ্রূপী ব্যক্তিসত্ত্বের প্রকাশ মানবতা দিয়েই শুধু সীমিত নয়; অবমানবতা হতে মানবতায় আজ যে উত্তীর্ণ হয়েছে, এক-দিন সে মানবতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। বিশ্বকে আশ্রয় করে যেমন ব্যক্তির প্রকাশ, তেমনি ব্যক্তির ভিতর দিয়ে বিশ্বের স্ফূর্তি; কিন্তু ব্যক্তি আবার

বিশ্বেরও অতিষ্ঠা হতে পারে—কেননা আত্মসমাহিত হয়ে সে ডুবতে পারে বিশ্বাতীত অথচ বিশ্বগত তুর্যাতীতের নিবিড় গহনে। ব্যক্তির সত্তা সমাজের গণ্ডিতেও তেমনি বাঁধা নাই; একহিসাবে তার প্রাণ-মন সমাজের প্রাণ-মনের অঙ্গ, তবু এমন-কিছু তার আছে যা সমাজকেও ছাপিয়ে উঠতে পারে। আবার ব্যক্তিই সমাজের প্রতিষ্ঠা—কেননা ব্যক্তির দেহ-প্রাণ-মনের সমষ্টি নিয়েই তো সমাজের দেহ প্রাণ আর মন। ব্যক্তির উচ্ছেদ কি বিকলনে সমাজও উচ্ছন্ন যায় বা বিকল হয়ে পড়ে—যদিও সমাজচেতনার অব্যক্ত কোনও অংশকলা আবার নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারে নতুন ব্যক্তিতে। কিন্তু তাহলেও ব্যক্তি সমাজ-দেহের একটা কোষ নয় শুধু—কেননা সমাজব্যূহ হতে তাকে ছেঁটে ফেললেও তার আত্মবিলোপ ঘটে না। কারণ গোষ্ঠীভাবনা বা সমাজধর্মই মানবতার সব নয়—সমাজই জগৎ নয়; সমাজকে ছেড়ে জগতে ব্যক্তির বিবিক্ত সত্তা কি মানবতার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয় না। সমাজের বিশিষ্ট একটা প্রাণচেতনা আছে, যা দিয়ে ব্যক্তির জীবনকে সে শাসন করে; কিন্তু তাহলেও ব্যক্তি-জীবনের সব মহল তার অধিকারে নয়। সমাজ যেমন বাঁচতে চায় ব্যক্তির মধ্যে তার আদর্শকে রূপায়িত করে, ব্যক্তিও তেমনি চায় তার জীবনের বৈশিষ্ট্যকে সমাজের জীবনে ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু এখানেও সে স্ব-তন্ত্র; আত্মপ্রকাশের জন্যে সমাজ তার অপরিহার্য নয়—ইচ্ছা করলে ব্যক্তি আরেক ধরনের সমাজ-জীবনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, কিংবা বীর্য থাকলে প্রব্রজ্যা কি নিঃসঙ্গ জীবনও স্বীকার করতে পারে। হয়তো তখন অন্নময়-জীবনের সাধনা তার সম্পূর্ণ হবে না, কিন্তু চিন্ময়-জীবন তার সার্থক হবে স্বরূপ-সত্যের উপলব্ধিতে ও গুহাহিত আত্ম-সদ্ভাবের আবিষ্কারে।

বাস্তবিক জীবব্যক্তি হল প্রকৃতিপরিণামের মূলসূত্র—কেননা আত্মোপলব্ধি হয় জীবব্যক্তিরই, তারই মধ্যে ফোটে পরমার্থের চেতনা। সমষ্টির প্রগতি প্রায়শই অবচেতন পিণ্ডভাবের সামান্যস্পন্দ মাত্র; আত্মসচেতন হতে গেলে তাকে ব্যক্তির ভিতর দিয়ে খুঁজতে হয় আত্মরূপায়ণের পথ। সাধারণ গণচেতনা সর্বদাই তার অন্তর্গত অতিস্ফুট ব্যক্তিচেতনার চাইতে অপরিণত—তাই গণনায়ককে দিশারী করে পথ চলতে হয় তাকে, সমাজের মুষ্টিমেয় প্রাজ্ঞের অনুভাব ও প্রগতির 'পরেই তার প্রগতির নির্ভর। রাষ্ট্রের কাছেও ব্যক্তির সত্যকার কোনও দায় নাই, কেননা রাষ্ট্র একটা যন্ত্রমাত্র; সমাজেও ব্যক্তিজীবনের সবটুকু বৈশিষ্ট্য ফোটে না, তাই সমাজের কাছেও তার কোনও দায় নাই। ব্যক্তির দায় শুধু সত্যের কাছে, আত্মার কাছে, চিৎস্বরূপের কাছে—সর্বভূতান্তরাত্মা অন্তর্যামী যে-দেবতা তাঁরই কাছে। সম্মূঢ় গণচেতনার পায়ে আত্মবলি না দিয়ে, অন্তর্গূঢ় স্বরূপ-সত্যের উপলব্ধি ও প্রকাশের দীপ্তিতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও পূর্ণতাকামী সমাজ এবং মানবজাতির সাধনপথকে আলোকিত

করাই ব্যক্তির পরমপুরুষার্থ। কিন্তু ব্যক্তির জীবনে স্ফুরিত চিন্ময় সত্যের বীর্য সমাজকে কতখানি প্রভাবিত করবে, তা নির্ভর করবে ব্যক্তির আত্মপরিণতির 'পরে; যতক্ষণ তার চিত্ত অপরিণত, ততক্ষণ নানাভাবে মহত্ত্বের আনুগত্যস্বীকার তাকে করতেই হবে। আত্মপরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে সে পায় অধ্যাত্ম-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার; কিন্তু সে-স্বাতন্ত্র্য সর্বাত্মভাব হতে বিবিক্ত কোনও তত্ত্ব নয়, কেননা ব্যক্তির আত্মা এবং বিশ্বের আত্মা একই পরমাত্মার প্রকাশ বলে আত্মার প্রমুক্তিতে সর্বাত্মভাবের চেতনাই হয় আরও নিবিড়। গীতা বলেন, অধ্যাত্মচেতন মুক্তপুরুষ 'সর্বভূতহিতে রতঃ'; নির্বাণের পথ আবিষ্কার করে বুদ্ধ আবার জগতে ফিরে এলেন সত্তার স্বরূপ বা শূন্যতার সত্য হতে ভ্রষ্ট কল্পিত-আত্মভাবের মোহে আচ্ছন্ন জনগণের সামনে লোকোত্তরের পথ খুলে দিতে, নির্বিশেষের ডাকে উতলা হয়েও বিবেকানন্দ আবার ঝাঁপ দিলেন নর-বিগ্রহে প্রচ্ছন্ন নারায়ণের সেবায়—বিশ্বময় আর্ত ও পতিতের কণ্ঠে শুনতে পেলেন প্রবুদ্ধ আত্মার প্রতি অপ্রবুদ্ধ আত্মার ব্যাকুল আহ্বান। স্বরূপ-সত্যের উপলব্ধি এবং অন্তর্মুক্তির অন্তঃসিদ্ধির সাধনা উদ্বুদ্ধ পুরুষের প্রথম পুরুষার্থ; কেননা এমনিতর সত্যের আহ্বান তার চিন্ময় অন্তর্যামীরই আহ্বান এবং সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রমুক্তি ও পূর্ণতার সিদ্ধ অনুভবে সে খুঁজে পাবে তার জীবনায়নের মর্মসত্য। একমাত্র সিদ্ধব্যক্তির সংহতিই গড়তে পারে সিদ্ধসমাজ : আর সিদ্ধি তখনই আসে, যখন প্রত্যেকে তার চিন্ময়-স্বরূপের উপলব্ধিকে জীবনের ঋতছন্দে ফুটিয়ে তোলে এবং ব্যক্তিচেতনার সেই ছন্দ সমষ্টিতে সংহত হয় এক অখণ্ড সর্বগত চিন্ময় ও প্রাণময় তাদাত্ম্যচেতনায়। অন্তঃসমাহিত হয়ে জানতে হবে আত্মাকে এবং সেই জানার সত্যে চিন্ময় করে তুলতে হবে জীবনের সকল সাধন, সহস্রদল অখণ্ডতার সুষমা ঢালতে হবে তাদের 'পরে—তবেই আমাদের সিদ্ধি হবে সত্য এবং পূর্ণ। গুহাহিত চিন্ময় তত্ত্ব-ভাবের তিমিরবিদার অভ্যুদয় যেমন আমাদের মুক্তির সত্য, তেমনি আধারের অণুতে-অণুতে সেই সত্যের নিরঙ্কুশ আত্মরূপায়ণ আমাদের সিদ্ধিরও সত্য।

বিচিত্র জটিলতা আমাদের প্রকৃতিতে—সৌষম্যের বৃন্তে পূর্ণমহিমায় তাকে ফুটিয়ে তোলবার কৌশল আবিষ্কার করা হল আমাদের জীবনের মুখ্য সাধনা। অন্নময় জীবন হতে আমাদের যাত্রা শুরু, প্রকৃতিপরিণামের ঐ হল আদি; মানুষেরও তাই অন্নময় ও প্রাণময় কোশের পুষ্টিসাধনাই হল জীবনের আদিম তপস্যা। কিন্তু ঐখানে থেমে থাকলে তো তার চলবে না; তারও পরে তার মহত্তর তপস্যা হবে অন্নময় জীবনে মনোময় সত্তার মহিমাকে আবিষ্কার করা এবং তারই আদর্শে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কে সাধ্যমত সুন্দর করে গড়ে তোলা। এই ছিল প্রাচীন গ্রীসের সাধনা এবং তার উত্তরাধিকার পেয়েছে

ইউরোপের সভ্যতা; সংহত রাষ্ট্রশক্তির সাধনায় রোমান সভ্যতা সেই আদর্শকেই পুষ্ট—অথবা ক্লিষ্ট করেছিল। প্রগতির এই ধারা ধরে অবশেষে একদিন এল যুক্তিবাদ, যাকে বলা চলে বৈজ্ঞানিকের 'বুদ্ধিযোগ': তাতে জীবনের সকল সমস্যার যাচাই হয় যুক্তিশাণিত ব্যাবহারিকবুদ্ধির বিচার দিয়ে, বাস্তবের তাগিদে জীবনকে গড়ে তোলবার সাধনা চলে। প্রাচীনকালে সত্য-শিব-সুন্দরের এষণাই জীবনে ঊর্ধ্বস্রোতা সিসৃক্ষার সংবেগ আনত—তার আদর্শে দেহ-প্রাণ-মনকে পূর্ণতা ও সৌষম্যের ছন্দে ফুটিয়ে তোলাই ছিল মানুষের পুরুষার্থ। কিন্তু এই সাধনাকেও ছাপিয়ে মানসিক প্রগতির শেষ পর্বে মানুষের মনে জাগে অধ্যাত্মসাধনার আকুতি : সে চায় তার আধারের মর্ম-সত্যের সন্ধান, আত্ম-আবিষ্কার দ্বারা চিৎসত্তার সত্যে প্রাকৃত-প্রাণ ও মনের প্রমুক্তি—চিৎসত্তার বীর্যাধানে খোঁজে সে জীবনের সত্যকার সার্থকতা, এক অখণ্ড-চেতনার মধ্যে পেতে চায় নিখিলের সাথে অন্যোন্যভাবনায় নিবিড় একাত্মবোধের সংহত প্রত্যয়। প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ও তারি অনুরূপ অন্যান্য সংস্কৃতি এই প্রাচ্য আদর্শকে প্রতীচ্য এসিয়ার ও মিশরের উপকূলে নিয়ে যায়, এবং সেখান থেকে খৃষ্টধর্ম তাকে ইউরোপের নাড়ীতে সঞ্চারিত করে। কিন্তু ইউরোপের প্রাচীন সংস্কৃতি যখন বর্বরতার উৎপ্লাবনে তলিয়ে গেল, তখনও প্রাচী-র এই আধ্যাত্মিক আদর্শ ম্লান দীপশিখার মত শ্মশানের অন্ধকারে জেগে ছিল; আজ বিজ্ঞানের বিদ্যুৎ-আলোকে নিষ্প্রভ তার দীপ্তিকে কত সহজেই ভুলে গেছে মানুষের মুগ্ধচিত্ত। বৃত্তি-সংস্থানের ভিত্তিতে সমাজ-গঠন হল সাম্প্রতিক সংস্কৃতির আদর্শ,—কেননা লৌকিক স্বাচ্ছন্দ্যের নিখুঁত ব্যবস্থাই আধুনিক সভ্যতার লক্ষ্য। উপকরণবাহুল্যে সমৃদ্ধ সমাজে মানুষ হবে আদর্শ সামাজিক জীব—এই হল ব্যাবহারিক 'বুদ্ধি-যোগের' সাধ্য; তার সাধনাকে লোকায়ত করবার জন্যই আধুনিক জগতে যুক্তিশাসিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদীক্ষার যত আয়োজন। প্রাচীন আধ্যাত্মিক আদর্শের যেটুকু বেঁচে ছিল, যুগধর্মের তাগিদে তা হতে 'মানবতাবাদ' জন্ম নিল—যার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কোনও বালাই রইল না, মানুষের মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষসাধনা হল যার ব্রত; তার মতে স্ব-ধর্মের অনুশীলনের চেয়ে সমাজধর্মের নির্বিচার অনুবর্তনই হল বড়। এইখানে এসে আধুনিক সভ্যতা আর তার প্রথম ধাক্কার বেগ না সামলাতে পেরে ছন্নছাড়া বুদ্ধি ও জীবনের নৈরাজ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল—আর তারি সঙ্গে তার চিরপোষিত জীবনাদর্শের যত কল্পনা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল, সমাজব্যবস্থার আচার ও সংস্কৃতির তলা ফেঁসে গিয়ে তার যুগসঞ্চিত সকল আশ্রয় অতলে তলিয়ে গেল।

বস্তুত উপকরণ-বাহুল্য ও বৃত্তি-সৌকর্যকেই জেনেশুনে জীবনের মুখ্য সাধনা করে তোলা আবার সেই আদিম বর্বর যুগে ফিরে যাবার একটা সুসভ্য

অজুহাতমাত্র। আধুনিক মানুষ যে মনের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের অসাধারণ উন্নতি করেও আধ্যাত্মিকতার দিক হতে পিছু হটে জীবনের স্থূল-ভোগ নিয়ে মেতে উঠেছে—এই হয়েছে আরও বিপদ। মানবজীবনের বিপুল জটিলতার একটা অঙ্গ হিসাবে বৃত্তিসৌকর্য ও উপকরণ-সঞ্চয়ের পূর্ণতার দিকে এমনিতর ঝোঁকের মোটামুটি একটা সার্থকতা নিশ্চয় আছে; কিন্তু এই ঝোঁককেই একান্ত বা মুখ্য করলে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে, প্রকৃতিপরিণামের অব্যাহত গতির পক্ষে বিপদ ঘটবার আশঙ্কা আছে। প্রথম বিপদ, এমনি করে মানুষের মধ্যে আবার সেই অন্ন-প্রাণময় আদিম বর্বরতাই মাথা কাড়া দিয়ে উঠবে সভ্যতার মুখোস পরে। বিজ্ঞানের সাধনায় আমাদের হাতে যে প্রচুর শক্তি এসেছে তাতে কালজীর্ণ নিস্তেজ সভ্যতাকে আগের মত দুর্ধর্ষ বর্বরজাতির মার খেয়ে মরতে হবে না হয়তো; কিন্তু আমাদেরই সভ্যতার মাটি ফুঁড়ে যে বর্বরতার জন্ম হতে পারে, ভয় তো তাকেই,—আর আজ চারদিকে তারই সূচনা দেখছি। মানুষের মানসিক ও নৈতিক আদর্শের দীপ্ত-কঠিন বীর্য যদি ভিতরের অন্ন-প্রাণময় পশুটাকে বাগ মানাতে বা টেনে তুলতে না পারে, কিংবা অধ্যাত্মসিদ্ধির আদর্শ যদি নিজের-রচা বাঁধন খসিয়ে মানুষকে অন্তর্মুখী করতে না পারে, তাহলে শক্তি হাতে এলে তার অপপ্রয়োগ সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবেই। যদিও-বা বর্বরতার এই আবৃত্তিকে কোনরকমে এড়াতে পারি, তাহলেও আমাদের ভয় ঘুচবে না। যন্ত্রযুগের প্রগতিতে স্থূল আরামের ব্যবস্থা যদি পাকা হয় সমাজজীবনে, তাহলে সেই অনুপাতে অধ্যাত্ম-প্রগতির অভীপ্সাও মন্থর হবে—বর্তমানের বাইরে কোনও নতুন আদর্শ কি দৃষ্টিভঙ্গির তাগিদ আমাদের মধ্যে থাকবে না। শুধু বুদ্ধির কসরত দিয়ে জাতির প্রগতিকে বেশীদিন জিইয়ে রাখা যায় না, কেননা দেহ-প্রাণের চেয়ে বড় একটা অন্তর্গূঢ় তত্ত্বের দিকে বুদ্ধির মোড় ফেরানো থাকলেই তার দীপ্তি সতেজ থাকে। বুদ্ধির কোঠায় পৌঁছবার পরেও না-পাওয়াকে পাবার অন্তর্নিহিত চিন্ময় অভীপ্সাই মানুষের মধ্যে প্রগতির আকাঙ্ক্ষা ও অধ্যাত্মচেতনার প্রয়াস জাগিয়ে রাখে। মহত্তরের এই প্রেষণা যদি তার না থাকে, তাহলে হয় তাকে পিছু হটে আবার শুরুর পথ ধরতে হবে, নয়তো প্রকৃতির পরিণামসাধনায় ব্যর্থতার একটা পর্ব হয়ে তলিয়ে যেতে হবে—যেমন তারও আগে জীবনের অনেক রূপায়ণই পরিণামের প্রেতিকে বহন বা পোষণ করতে না পেরে এমনি করে তলিয়ে গেছে। আর মাঝারি-পরিণামের নিখুঁত নমুনা করে যদিই-বা প্রকৃতি তাকে অন্যান্য জানোয়ারের মত জিইয়ে রাখে, তাহলে তাকে পাশ কাটিয়েই আবার মহাশক্তির উত্তরায়ণের অভিযান চলবে।

মানুষ এসে আজ দাঁড়িয়েছে প্রকৃতিপরিণামের এক পর্বসন্ধিতে; এইবার তার পথ বেছে নেবার তাগিদ এসেছে। মানুষের মন আজ একটা বৈষম্যের

ফেরে পড়েছে: কোনও-কোনও বিষয়ে যেমন তার অসম্ভব উৎকর্ষ ঘটেছে, তেমনি আরেক দিকে সে রয়েগেছে কুণ্ঠচার—পথহারা উদ্‌ভ্রান্তের মত। নিত্যচঞ্চল প্রাণ-মনের দুর্বশ জটিলতার আর অন্ত নাই; দেহ-প্রাণ মনের সকল দাবি সকল ক্ষুধা মেটাতে, সমাজে রাষ্ট্রে বৃত্তিতে ও সংস্কৃতিতে সে অভাবনীয় বৈচিত্র্য এনেছে—দেহ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ও রসচেতনার তর্পণের জন্য সাধনসামগ্রীর বিপুল আয়োজন পুঞ্জিত করেছে। মানুষের মন ও বুদ্ধির সামর্থ্য সীমিত—আরও সীমিত তার ধর্মবোধ ও অধ্যাত্মচেতনার করণবীর্য; অথচ যে অতিকায় সভ্যতার সে সৃষ্টি করেছে, একে তার প্রমত্ত অহং ও ক্ষুধিত বাসনা কী করে যে সামাল দেবে বলা কঠিন। প্রাকৃত-জীবনের ঐশ্বর্য আজ উপচে পড়ছে; কিন্তু একেও আত্মসাৎ করে যে ক্রান্তদর্শী চিত্ত ও বিজ্ঞানময় বোধিচেতনা মহত্তর সার্থকতায় জীবনকে সমৃদ্ধ করবে, মানুষের আধারে তার কোথায় প্রকাশ? উপকরণের এই বিপুল সঞ্চয় দেহ-প্রাণের নিত্যবুভুক্ষার সকল দাবি মিটিয়ে মানুষের মনকে লোকোত্তর মহাসিদ্ধির অকুণ্ঠ এষণার পথে মুক্তি দিতে পারত; সত্য-শিব-সুন্দরের সার্থকতর সাধনায়, চিৎসত্তার দিব্যতর ও বিপুলতর আবেশে জীবন তখন সত্তার পরমোৎকর্ষের সাধনে রূপান্তরিত হত। কিন্তু তার জায়গায় উপকরণের প্রাচুর্য আজ অভাবের বাহুল্য এনেছে, গোষ্ঠীর স্ফীতকায় অহংকে পরস্বলোলুপ করে তুলেছে। বিশ্বশক্তির বহু বিভুতির সিদ্ধমন্ত্র আজ মানুষের আয়ত্তে এসেছে বিজ্ঞানের কল্যাণে—বিশ্বমানবের জীবনসত্তাকে সে স্থূলদৃষ্টিতে অখণ্ড করেছে; কিন্তু এই বিশ্বশক্তিকে যে ব্যবহার রয়েছে, সে হয়তো কোনও ব্যক্তিবিশেষ কি গোষ্ঠীবিশেষের সংকীর্ণ অহমিকা: তার জ্ঞানে কি চলনে বিশ্বচেতনার দীপ্তি নাই—মানবসমাজের এই বাহ্য-সংহতিকে অধ্যাত্মসংহতিতে কী করে রূপান্তরিত করা যায়, কী উপায়ে বিশ্বমানবের প্রাণ-মনকে সত্যকার একত্বভাবনার সূত্রে গাঁথা যায়, তার কোনও নিগূঢ় অনুভব কি সামর্থ্য তার নাই। জগৎ জুড়ে আজ দক্ষযজ্ঞের বিপ্লব চলছে: চারদিকে শুধু মনঃকল্পিত আদর্শের সংঘাত, ব্যষ্টি বা সমষ্টির বর্বর ক্ষুধার তাড়না, অন্ধ প্রাণাবেগের উদ্দাম কামনার প্রমত্ততা, ব্যক্তির শ্রেণীর কি জাতির স্বার্থৈষণার তুমুল কোলাহল, রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমাজদর্শনে ও বার্তাশাস্ত্রে নানা অদ্ভুত-বিচিত্র মতবাদের ছত্রাকলীলা; ভুয়ো আদর্শবাদের নামে চারদিকে কত জিগির উঠেছে, তার জন্য জুলুম করতে কি জুলুম সইতে মরতে কি মারতে মানুষের দ্বিধা নাই; আর নিজের মতকে মারণযন্ত্রের সহায়ে পরের গলার তলে ঠেলে দিয়েই মানুষ মনে করছে, এবার আদর্শলোকে পৌঁছবার রাস্তা মিলল! মানুষের প্রাণ-মনের স্বাভাবিক পরিণাম বিশ্বব্যাপ্তির দিকে; কিন্তু অহমিকাদুষ্ট বিভজ্যবৃত্ত মানসের কাছে ব্যাপ্তির পথ যেদিকেই খুলুক,—সে শুধু সৃষ্টি করবে

বেসুরা চিন্তা ও প্রবৃত্তির তুমুল বিসংবাদ, দুর্জয় শক্তি ও প্রমত্ত বাসনার অকূল প্লাবন। বৃহত্তর জীবনের সকল উপাদান তার হাতে এলেও, চিন্ময় কবিক্রতুর ছন্দসুষমা হারিয়ে তারা শুধু হবে অর্ধজীর্ণ ও ব্যামিশ্র অন্ন-প্রাণ-মনোময় উপকরণের জঞ্জাল; তাই জগৎজোড়া বিক্ষোভ আর বিপ্লবের কখনও শেষ হবে না—জীবনে বৃহৎ-সামের সুরসাধনাও তাই বারে-বারে ব্যর্থ হবে। অতীতের মানুষ ভাবের একটা সুমিত রূপায়ণে জীবনে সুষমা এনেছে; বিশেষ-বিশেষ সংস্কার বা আচারের ভিত্তিতে যেসব সমাজ সে গড়েছে, তাদের মধ্যে সংস্কৃতি বা জীবনাদর্শের নানা বৈশিষ্ট্যই অনন্য হয়ে ফুটেছে। মহাকালের বিপুল কটাহে আজ সেসব আদর্শ সংমিশ্র প্রাণের রসে জারিয়ে নিয়ে এক-সাথে ঢালা হয়েছে এবং তার 'পরে নিত্য-নতুন ভাব ও প্রেষণার, ভূতার্থ ও ভব্যার্থের প্রক্ষেপ পড়েছে; এদের পরিপাকে ভবিষ্যতে যে অনির্বচনীয় জীবন-রসায়নের সৃষ্টি হবে, প্রাণের সকল দ্বন্দ্ব মিটিয়ে তার সূচনাকে সার্থক করতে বৃহত্তর চেতনার দিব্য আবেশ চাই। যুক্তিবাদ আর জড়বিজ্ঞানের চাল যত সূক্ষ্মই হোক্, সব-কিছুকেই তারা ঢালতে চায় এক ছাঁচে—যন্ত্রাচারের কৃত্রিম ব্যবস্থা দিয়ে অন্নময়-জীবনের আড়ষ্ট ঐক্যসাধনাই তাদের স্বধর্ম। কিন্তু অখণ্ড-জীবনের বৃহত্তর ঐক্যসাধনা একমাত্র অখণ্ড-সত্তা অখণ্ড-জ্ঞান ও অখণ্ড-শক্তিরই উদারতর পরিশীলনে সার্থক হতে পারে।

অতীতে অপ্রবুদ্ধচিত্তের কৃত্রিম সংস্কার সমাজগঠনের ভিত্তি ছিল। দল-বাঁধার প্রেরণায় বিরোধকে গোঁজামিল দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে মানুষ তখন সমাজ গড়েছে; বাইরের চাপে অভাবের তাড়নায় বা অন্তর্নিহিত যূথ-সংস্কারের প্ররো-চনায় ব্যক্তিগত অহং ও স্বার্থের একটা জটলা কি রফা সে-সমাজগঠনের ভিত্তি ছিল। বলা বাহুল্য এমন জোড়াতাড়ার সংঘজীবনে একত্ব অন্যোন্যভাব ও সৌষ-ম্যের আদর্শ কিছুতেই পুরাপুরি ফুটতে পারে না; তার জন্যে জীবনসত্যের আরও গভীর ও ব্যাপক চেতনা চাই। এই সৌষম্যের আদর্শে জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলবার একটা অন্ধ আকূতি আজ নিখিল মানবের চিত্ত জুড়ে; এরই 'পরে যে তার সমস্ত অস্তিত্বের নির্ভর, এ-সম্পর্কে ধীরে-ধীরে সে সচেতন হয়ে উঠছে। প্রাণের আয়তনে মনঃশক্তির ক্রমিক উন্মেষে আজ তার প্রবৃত্তি এতদূর সংহত হয়েছে এবং জড়শক্তির নূতন উপযোগে জীবনের এতখানি প্রসার ঘটেছে যে, এখন মানুষের অন্তরে একটা আমূল পরিবর্তন না এলে এই অভিনব ঋদ্ধিকে তার সামলে চলা অসম্ভব হবে। দল বাঁধলেও মানুষের অহং মরতে চায় না,—অথচ একত্ব অন্যোন্যভাব ও সৌষম্যের নামে আজ তার 'পরে এসেছে যূথ-ধর্মের পুরা দাবি; এ-দুটি বিরুদ্ধ সংস্কারের সমন্বয় না হলে ব্যক্তি ও সমাজের জীবন অচল হবে। কিন্তু আধুনিক মানুষের 'পরে এর দায় যেন একটা বিপুল বোঝা; কেননা আজও মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বের প্রসার

ঘটেনি; আজও তার সংকীর্ণ মনের খোপে আদিম জৈবসংস্কারের ক্ষুদ্রতাই প্রবল। তাই আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও অন্তরের গোত্রান্তর তার পক্ষে সহজ নয়। এইজন্য আজও সে আগেরই মত অভিনব ঋদ্ধির বিপুল সঞ্চয়কে প্রজ্ঞাহীন বিচারমূঢ় প্রাণবাসনার চরিতার্থতায় ব্যবহার করছে। আসুরিক বীর্যের আবেশে উদ্দাম তার প্রাণপুরুষ বিজ্ঞান-তন্ত্র ও যন্ত্রারূঢ় জীবনায়নের যে-বিপুলতাকে আজ হাতে পেয়েছে, তাকে সামাল দেবার মত বুদ্ধি কি সঙ্কল্পের জোর তার নাই; তারই ফলে সমগ্র মানবজাতি আজ নিয়তির অন্ধতাড়নায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন যুগব্যাপী দুর্যোগের মাঝে সর্বনাশা সঙ্কটাবর্ত ও উত্তাল অনৈশ্চিত্যের অন্ধতমিস্রার দিকে প্রমত্তবেগে ছুটে চলেছে। সর্বনাশের এ করাল সম্ভাবনা যদি অচিরস্থায়ী কি আপাতপ্রতীয়মানও হয়, একে ঠেকিয়ে রাখবার কিংবা এর চন্ডবেগকে স্তিমিত করবার একটা সাময়িক উপায়ও যদি আবিষ্কৃত হয়, তবু শেষপর্যন্ত শৃঙ্কল নিয়তির হাত হতে মানুষকে বাঁচানো যাবে কি না সন্দেহ। কারণ আধুনিক জগতের এ-সমস্যা প্রকৃতিপরিণামের একটা গোড়ার সমস্যা: এর সত্যকার সমাধানের 'পরেই সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্য-সিদ্ধি, এমন-কি তার টিকে থাকবার যোগ্যতা নির্ভর করছে। মহা-প্রকৃতির অবন্ধ্য পরিণামের তপস্যা মর্ত্যজীবনেই বিশ্বশক্তির এক অভূতপূর্ব বিকাশ চাইছে—যার আধার হবে এক বৃহত্তর প্রাণময় ও মনোময় সত্তা, সমনী-ভাবের এক বিপুল বীর্য, জৈবসংস্কারমুক্ত এক চিন্ময় প্রাণ-পুরুষের উদার-মহিমা: আর তারই জন্যে সে এই মর্ত্যচেতনাতেই চিন্ময় আধার-পুরুষ ও অন্তর্যামী চিদাত্মার নিরাবরণ প্রকাশ চাইছে।

এই সংকটমুহূর্তে জীবনসমস্যার সমাধান করতে আধুনিক মানুষ বৈজ্ঞানিক যুক্তিশাসিত জড়বাদ ও প্রাণবাদ আশ্রয় করেছে; নিখুঁত বৃত্তি-সংস্থানযুক্ত সমাজতন্ত্র আর প্রাকৃত-জনের উপযোগী গণতন্ত্র তাকে অসান্ন সর্বা-নাশের হাত হতে বাঁচবে—এই তার ভরসা। এ-সমাধানের মধ্যে সত্য যতটুকু থাকুক, মানুষের ঈপ্সিত প্রগতির পক্ষে একেই যথেষ্ট মনে করা চলে না—কেননা মানুষ আজকের মত জড় ও প্রাণকেই তো চিরকাল আঁকড়ে থাকবে না; তার দিব্যনিয়তি প্রতিনিয়ত তাকে লোকোত্তর চিন্ময় সার্থকতার দিকে আকর্ষণ করছে। জগতের সর্বত্র একটা বিপ্লবের আন্দোলন এসেছে, জাতির প্রাণ-চেতনা এমন-কি সাধারণ মানুষেরও মন আজ কী এক অতৃপ্তি নিয়ে জেগে উঠেছে—সেও চায় অতীতের আদর্শ পালটে দিয়ে একটা নতুন আদর্শের নিশানা, চায় একটা নতুন ভিত্তির 'পরে জীবনকে দাঁড় করাতে। সমাজজীবনে ঐক্য চাই, সৌষম্য চাই, অন্যোন্যভাবনা চাই; কিন্তু কী তার উপায়?—যেমন করেই হোক্, বিবিক্ত অহংএর রেষারেষিকে দাবিয়ে দিয়ে ভেদজর্জরিত সমাজে অভেদসিদ্ধির একটা সহজ কৌশল জাগিয়ে তুলতে হবে। উদ্দেশ্য মহৎ, সন্দেহ

নাই; কিন্তু উপায় সুষ্ঠু কি না, সন্দেহ সেইখানেই। ভাবের সমস্ত প্রকাশকে ঠেকিয়ে রেখে শুধু বাছা-বাছা দুচারটি ভাবকে গায়ের জোরে বাস্তবে রূপ দেবার জিগির তোলা, ব্যক্তির স্বাধীন মননের টুঁটি চেপে ধরা, জীবনের মুক্ত-ধারাকে যন্ত্র-তন্ত্রের সংকীর্ণ খাতে বইয়ে দেওয়া, প্রাণ-শক্তির স্বচ্ছন্দ গতিতে আনা যন্ত্রচালিত একত্বভাবনার আড়ষ্টতা, মানুষকে বলি দেওয়া রাষ্ট্রের যূপে, ব্যক্তির অহংএর জায়গায় সম্প্রদায়ের অহংকে ঈশ্বর করা—এই হল জীবন-সমস্যা-সমাধানের অধুনাকল্পিত উপায়। সম্প্রদায়ের অহংকেই জাতির আত্মা বলে ঘোষণা করা একটা বিষম ভুল—যা শেষপর্যন্ত আনতে পারে 'মহতী বিনষ্টিঃ'। তথাকথিত বৃহত্তর গোষ্ঠীজীবনের খাতিরে ব্যষ্টি জীবন-মন-কর্মের সকল বৈচিত্র্যকে পিষে একাকার করে দেওয়াকে দেশাত্মার বেদিতে আত্মবলি-দান বলে প্রচার করা চলে; কিন্তু এই আচ্ছন্ন গোষ্ঠী-সত্তাই তো বাস্তবিক দেশ বা জাতির প্রাণপুরুষ কি আত্মা নয়। এ শুধু সমষ্টি অবচেতনার বিকার—যার অকালবোধন হয়েছে মূঢ় প্রাণের তাড়নায়; কিন্তু বুদ্ধির আলোকে এ যদি না পথ চিনে চলতে পারে, তাহলে অন্ধ আসুরীশক্তির প্ররোচনা একে কেবল জাতির সর্বনাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। অসুরের বীর্য আছে,—কিন্তু তার মূঢ়তা সচেতন প্রকৃতিপরিণামের প্রতিকূল; মানুষই এই পরিণাম-শক্তির বিশ্বস্ত আধার ও বাহন। কিন্তু মানুষের দিব্যনিয়তির সঙ্কেত তো এই মূঢ়তার দিকে নয়; মহাপ্রকৃতি বহুপূর্বেই এর বিড়ম্বনা চুকিয়ে এসেছে, সুতরাং আবার তার মাঝে ফিরে যাওয়া কখনও প্রগতির নিশানা হতে পারে না।

একটা বস্তুতন্ত্র 'সম্যক্-আজীব'-বাদ খাড়া করে মানুষের বৃত্তি-সমস্যা মেটালেই জীবনের সকল সমস্যা মিটে যাবে, এমন-একটা মত প্রচারিত হচ্ছে। তারও উপায় হল, সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টি প্রাণ-মনের কণ্ঠরোধ করে যন্ত্র-মূঢ় সমাজব্যবস্থার ঘাড়ে কৃত্রিম একত্বের একটা বোঝা চাপানো। মানুষের প্রাণ-মনকে পিষে একাকার করে ঐক্য এনে উইপোকার সমাজের মত একটা কর্মপটু স্থাণু-সমাজ নিশ্চয় গড়া চলে; তাতে কাজের গতানুগতিক শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, কিন্তু প্রাণের উৎস শুকিয়ে যাবে এবং তা-ই জাতিকে দ্রুত বা বিলম্বিত অবক্ষয়ের দিকে ঠেলবে। একমাত্র ব্যক্তি-চেতনার প্রসারে এবং ঐশ্বর্যে গোষ্ঠীর চিৎসত্ত্ব ও সাধনা আত্মসংবিৎ নিয়ে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। প্রাণ ও মনের প্রমুক্ত স্বাতন্ত্র্যই চেতনার উপচয় আনে,—কেননা উত্তর-সাধকের উন্মেষ না-হওয়া পর্যন্ত প্রাণ-মনই হল চিৎসত্ত্বের অনন্য সাধন; সুতরাং তাদের প্রবৃত্তিকে ব্যাহত এবং প্রকৃতিকে আড়ষ্ট ও অনম্য করে প্রগ-তির পথে বাধা সৃষ্টি করা আমাদের উচিত হবে না। প্রাণ-মনের স্বাতন্ত্র্যের স্ফুরণে যে জটিলতা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য-হরণ কখনও

তার সুষ্ঠু সমাধান নয়; বরং তাকে ব্যাপ্তির অবকাশ দিলে নিজেরই আলোতে সে আত্মশোধন ও আত্মসম্পূর্তির পথ খুঁজে পায়।

বর্তমান সমস্যার আরেকটা সমাধান হচ্ছে, সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ও সংকল্পকে শিক্ষাদীক্ষায় এমনি মার্জিত করে তোলা যে অভিনব সামাজিক-সংহতির শরিক হয়ে গোষ্ঠীজীবনের ঋতচ্ছন্দকে বজায় রাখতে স্বেচ্ছায় সে তার অহংকে বলি দিতে পারে। যদি প্রশ্ন হয় জীবনধারার এমন আমূল পরিবর্তন কী করে সম্ভব, তাহলে তার জবাবে দুটি পরিকল্পনা পাই : প্রথমত, সামাজিক জীব ও পৌরজন হিসাবে ব্যক্তিকে ব্যাবহারিক-তথ্যের তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে তার মনের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা এবং সুষ্ঠু ভাবনার কৌশলে তাকে দীক্ষিত করা; দ্বিতীয়ত, এমন-এক অভিনব সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন করা, যার মন্ত্রশক্তিতে চক্ষের নিমেষে মানুষ কলে-ছাঁটা আদর্শ জীব হয়ে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু মানুষের আশা ও কল্পনা যা-ই বলুক, বাস্তবের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, শিক্ষায় বুদ্ধির মার্জনা হলেই কারও হৃদয় বদলায় না—বরং বুদ্ধির উৎকর্ষে ব্যষ্টি কি সমষ্টি অহমিকাকে আরও নিপুণভাবে চরিতার্থ করবার কলাকৌশল তার আয়ত্ত হয় মাত্র; মানুষের অহং আগে যা ছিল এখনও তা-ই থেকে যায়, শুধু তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ আরও প্রশস্ত হয়। আবার, সমাজের কলে ফেলে আজও মানুষের প্রাণ-মনকে কোনও আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করা সম্ভব হয়নি—যদিও এমন তথাকথিত আদর্শও অনেক ক্ষেত্রে আসলেরই একটা নকল শুধু। জড়কে কলে ছাঁটা চলে—চিন্তাকেও চলে; কিন্তু জড়শক্তি আর চিন্তাশক্তি মানুষের আধারে আত্মশক্তি ও প্রাণশক্তির সাধনমাত্র। আত্মা আর প্রাণকে কখনও কলে ফেলে খুশিমত রূপ দেওয়া চলে না। কলে মানুষের আত্মা ও মনকে গায়ের জোরে অসাড় ও স্থবির করতে পারে—প্রাণ-শক্তি বহির্বৃত্তিকে নিয়মতন্ত্রে বাঁধতে পারে; কিন্তু এই বলাৎকারের সাধনায় সিদ্ধি পেতে হলে প্রাণ-মনকে জড়াতে হবে নাগপাশের দুশ্ছেদ্য বন্ধনে এবং তার ফলে মানুষের জীবনে সুনিশ্চিত স্থাণুত্ব বা অধঃপাত আসবে। বুদ্ধির মধ্যে ব্যাবহারিক যুক্তির শক্তি প্রবল; তাই মন-প্রাণকে নিয়মতন্ত্রের বাঁধনে আড়ষ্ট করা ছাড়া প্রকৃতির দ্ব্যর্থক ও জটিল লীলায়নকে আপন বশে আনবার আর-কোনও উপায় সে জানে না। কিন্তু তার সে-প্রয়াসের পরিণামে, বিদ্রোহী মানবাত্মার মধ্যে হয় জাগে যন্ত্রের ধ্বংস দ্বারা তার কবল হতে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও পুষ্টির স্বাচ্ছন্দ্যকে ছিনিয়ে নেবার আকৃতি, নয়তো জীবনবিমুখ হয়ে কূর্মের মত আত্মসঙ্কোচের প্রবৃত্তি। প্রমুক্ত আত্মশক্তির উদ্বোধনে অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তের যন্ত্রমূঢ়তাকে নির্জিত করে প্রাণ-প্রকৃতিকে স্বচ্ছন্দ করাই হল জীবন-সমস্যার সত্য সমাধান। কিন্তু যন্ত্রারূঢ় সমাজের রুদ্ধ আবহাওয়ায় আত্মোপলব্ধি ও অন্তরূপায়ণের অবাধ অবকাশ কোথায় আছে ?

জড়তন্ত্র জীবন সমাজের ক্লিষ্টতায় পীড়িত মানুষ আবার হয়তো ধর্মের মাঝে মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজবে,—যন্ত্রের শাসনের চেয়ে ধর্মের অনুশাসনকেই সে মনে করবে সামাজিক শ্রেয়োলাভের প্রকৃষ্টতর কৌশল। বৈধমার্গের আনুশাসনিক ধর্ম ব্যক্তির অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করে সাক্ষাৎভাবে কি প্রকারান্তরে তার অধ্যাত্ম-উন্মীলনের পথ করে দিয়েছে সত্য, কিন্তু মানুষের সমাজ ও জীবনধারাকে পুরাপুরি সেও বদলে দিতে পারেনি। তার কারণ, সমাজকে চালাতে গিয়ে প্রাণের অবরভাগের সঙ্গে তাকে অনেক জায়গায় রফা করতে হয়েছে,—তাই সমগ্র সমাজ-প্রকৃতির আমূল রূপান্তরের সামর্থ্য কি সুযোগ তার মেলেনি। বিশেষ কোনও ধর্মমতকে আঁকড়ে ধরে শাস্ত্রানুমোদিত শীলের পালন, তার বিধি-নিষেধ ও আচার-অনুষ্ঠানের অনুবর্তন—সামাজিক মানুষ সাধনার এই বহিরঙ্গটুকুই বোঝে; তার 'পরে ধর্মের দাবি এর বেশী আর এগোয় না। তাতে সমাজের গায়ে ধর্ম-কর্মের একটা আলতো পোঁছমাত্র পড়ে; আর অপরোক্ষ-অনুভবের দৃঢ়নিষ্ঠ একটা সাম্প্রদায়িক ধারা কোথাও যদি বেঁচে থাকে, তাহলে আধ্যাত্মিকতার একটা হালকা হাওয়া কখনও-বা সমাজের গায়ে লাগে। কিন্তু শুধু এইটুকুতেই জাতি-স্বভাবের রূপান্তর ঘটে না, কি মানুষের জীবনে নবীন বিভূতির অভ্যুদয় দেখা দেয় না। ব্যক্তি ও জাতির সমগ্র জীবনে ও সমগ্র প্রকৃতিতে চিৎশক্তির অকুণ্ঠ প্রেতিই মানুষকে তার স্বোত্তরভূমিতে নিয়ে যেতে পারে। মানুষ এমন প্রত্যাশাও করেছে : সমাজ যদি সিদ্ধ মহাজনের প্রদর্শিত পথে চলে, সমধর্মী বা সমপন্থীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কি একত্বের বোধ যদি জাগে এবং তাকেই ভিত্তি করে প্রাচীন জীবনব্যবস্থাকে ফিরিয়ে এনে কিংবা নতুন ব্যবস্থার সৃষ্টি করে আধ্যাত্মিকতার একটা আমেজ আনা যায় মানুষের জীবনে ও সমাজে—তাহলে হয়তো মানব-প্রকৃতির অভীষ্ট রূপান্তর আসতে পারে। কিন্তু মানুষের এমনিতর প্রচেষ্টাও এর আগে কোথাও সফল হয়নি। অতীতের একাধিক ধর্মের মূলে এই একাত্মবোধসৃষ্টির প্রেরণা ছিল; কিন্তু মানুষের নিরূঢ় অহমিকা ও প্রাণপ্রবৃত্তি এতই উদ্দাম যে, মনেরই সহায়ে মনের কানে গুঞ্জরিত 'ধর্মের কাহিনী'র সাধ্যে কুলায় না তাদের বাধাকে নির্জিত করা। একমাত্র জীবনচেতনার পরিপূর্ণ উন্মেষে, চিৎপুরুষের স্বরূপজ্যোতি ও স্বরূপশক্তির অকুণ্ঠ আবেশে এবং তারই ফলে অতিমানসী চিন্ময়ী পরমা প্রকৃতির বীর্যে এই প্রাণ-মনোময় অপরা প্রকৃতির ঊর্ধ্বায়ন কি রূপান্তরেই প্রকৃতিপরিণামের ঐ লোকোত্তর সিদ্ধি মর্ত্যের আধারে মূর্ত হতে পারে।

প্রকৃতির আমূল রূপান্তরের দিকে আমাদের এই ঝোঁক দেখে কারও হয়তো মনে হবে, মানুষের চিন্ময়ী সিদ্ধির আশা বুঝি তাহলে কোন্ সুদূরভাবী উত্তরায়ণের কল্পনা; কেননা এখন মানুষ যে-অবস্থায় আছে, তাতে তার প্রাকৃত-

স্বভাবকে ছাড়িয়ে ওঠা, তার দেহ-প্রাণ-মনের নিরূঢ় সঙ্কোচকে অতিক্রম করা বলতে গেলে একটা অতিকৃচ্ছ্র কি অসাধ্য সাধনার নামান্তর। অথচ জীবনকে সোনা করে তোলবার আর-কোনও উপায় তো নাই; মানুষের স্বভাব বদলাবে না অথচ জীবনের ধারা যাবে বদলে, এ শুধু জড়বাদীর অযৌক্তিক আশা, কিংবা একটা অস্বাভাবিক ও অবাস্তব অসম্ভব-কিছুর দাবি। কিন্তু রূপান্তরসিদ্ধি তো আমাদের আত্মপ্রকৃতির কাছে সুচিরসাধ্য অপ্রাকৃত কি অসম্ভব কিছুরই দাবি করে না; স্বভাবে যা অন্তর্গূঢ়, সে চায় তার বহিঃপ্রকাশ—বাইরের কিছুকে তো সে স্বভাবের 'পরে চাপাতে চায় না। প্রকৃতি-পরিণাম আমাদের মধ্যে স্বরূপোপলব্ধির তাগিদ জাগিয়েছে, আমাদের অন্তর্নিহিত চিৎস্বভাবের নির্মুক্ত প্রকাশের প্রেতি এনেছে; আত্মার যে প্রজ্ঞা বীর্য ও স্বাভাবিক সাধনসম্পদ সমাহিত হয়ে আছে আমাদের আধারে, সে তারই বিচ্ছুরণ চেয়েছে। এরই জন্য দীর্ঘযুগের পরিণাম-সাধনায় তার কত-না আয়োজন চলেছে; নিয়তির প্রতি সঙ্কট-আবর্ত পার হয়ে মানুষের সাধনা ক্রমেই এই পরমা-সিদ্ধির কূলে এগিয়ে এসেছে। অবশেষে তার প্রাণ-মনের ঊর্ধ্বায়নের তপস্যা আজ এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যেখানে তার বুদ্ধি ও প্রাণশক্তি উত্তারের সঙ্কট-সীমায় উত্তীর্ণ হয়েছে; এবার হয় তারা নিস্তেজ হয়ে স্তিমিত অবসাদের তলায় তলিয়ে যাবে কি প্রগতিহীন নিশ্চেষ্টতার কোলে ঢলে পড়বে, নয়তো বজ্রতেজে সকল বাধা বিদীর্ণ করেই উত্তরসিদ্ধির মহাভূমিতে এগিয়ে যাবে। একাধিক চিত্তে এই সঙ্কটের চেতনা পরিস্ফুট হয়ে উঠুক, এর সম্ভাবিত পরিণতির অপরিহার্যতা তাদের উদ্বুদ্ধ করুক, তাদের মধ্যে এই লোকোত্তর সিদ্ধির নবসাধন আবিষ্কারের প্রেরণা আনুক—এখন এই তো চাই। নিয়তির তাড়নায় মানব-জগতের ভবিষ্যৎ যতই সঙ্কুল হয়ে উঠছে, ততই এই দিব্য সম্ভাবনার আকূতি তার চিত্তকে মথিত করছে; একটা নিষ্কৃতি বা সমাধান চাই, আর অধ্যাত্ম-সমাধান ছাড়া সমনে আর-কোনও সমাধানের পথও খোলা নাই—এই চেতনাই সঙ্কটের করাল নিষ্পেষণে তার মধ্যে দিন-দিন সমিদ্ধ এবং অনিবর্তনীয় হয়ে উঠছে। মর্ত্য আধারের এই আকূতিতে পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির বুকে সাড়া যে জাগবেই, তাও কি আবার বলতে হবে?

হয়তো এই সাড়ায় শুরুতে ব্যক্তির চেতনায় ফুটবে পথের নিশানা; তারপরে বহু অধ্যাত্মচেতার আবির্ভাবে নবযুগের সূচনা দেখা দেবে এবং তারও পরে হয়তো সম্মূঢ় গণচেতনার অদিব্য পরিবেশেই এক কি একাধিক বিজ্ঞানঘন-পুরুষ আবির্ভূত হবেন—যদিও এ-আবির্ভাব কতটুকু সম্ভাব্য আর কতটুকু কল্পনা বলা কঠিন। এই নিঃসঙ্গ সিদ্ধচেতনা হয় বাইরের সকল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে অন্তরের দিব্যধামে আপনাকে গুহাহিত করে রাখবে; অথবা সুমঙ্গল

ভবিষ্যতের সুদূর সম্ভাবনাকে সাধ্যমত আসন্নতর করতে এই তন্দ্রাহত বিশ্বেরই 'পরে সবার অগোচরে ঢালবে তার অন্তরের দীপ্তি। বিজ্ঞানঘন-পুরুষ যদি সমানধর্মা অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে অন্তরের যোগে যুক্ত হয়ে লোকোত্তর-চেতনার একটা স্ব-তন্ত্র কি বিবিক্ত সংহতি অথবা অভিনব জীবনছন্দের উদ্‌গাতারূপী সিদ্ধপুরুষের একটা মণ্ডলী গড়তে পারেন, তাহলে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির এই নবায়ন ব্যাপ্তির পথ পাবে এবং তাতেই বিজ্ঞানঘন সংঘের সূচনা হবে। অন্তর্যামীর নিগূঢ় চিৎসংবেগ বা প্রেষণাকে সার্থক করতে জীবনের একটা অনুকূল ছন্দর্মিতি, একটা চিন্ময় পরিবেশ প্রয়োজন; তাই আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে সাধারণ সমাজ হতে বিবিক্ত একটা নবীন সংঘজীবন গড়বার প্রয়াস মানুষ চিরকাল ধরে করে এসেছে। সে-প্রয়াস কোথাও সন্ন্যাস-জীবনে, কোথাও-বা তারই অনুরূপ নানা অধ্যাত্মগোষ্ঠীর আকারে ফুটেছে। সন্ন্যাস-জীবনের লক্ষ্য সাধারণত পারত্রিক; সংঘবন্ধ হলেও সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্য থাকে একমাত্র নিজের মধ্যে তত্ত্বস্বরূপের উপলব্ধি, অতএব তাঁদের সংঘজীবনের বিধি-নিষেধ রচিত হয় সেই সাধনারই অনুকূলে। অনেকসময় দেখা যায়, জীবনায়নের একটা অ-প্রাকৃত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে জগতে একটা নতুন ধারার প্রবর্তন তাঁদের সাধনার অঙ্গ নয়। আমাদের ধর্মসাধনায় কি মনঃকল্পিত আদর্শবাদে এমনতর 'নববিধানের' সুদূর আলেখ্য কি প্রয়াসের সূচনা মাঝে-মাঝে ফুটে ওঠে বটে; কিন্তু মানুষের প্রাণময় প্রকৃতিতে নিরূঢ় অবিদ্যা ও অচিতির কাছে প্রতিনিয়তই তার পরাভব ঘটে—কেননা শুধু আদর্শের কল্পনা কি চিন্ময়ী অভীপ্সার মন্দসংবেগ এই পুঞ্জীভূত তামসিকতার মূঢ় বিদ্রোহকে চিরনির্জিত করে কখনও তার রূপান্তর ঘটাতে পারে না। এই পরাভবের মূলে কখনও থাকে সৃষ্টিবীর্যের দৈন্য, কখনও-বা বাহ্যজগতের ন্যূনতার অভিঘাত—যার ফলে বিশ্বহিতের আকূতি চিন্ময়ী কল্পনার জ্যোতিঃশিখর হতে দুদিন পরেই মর্ত্যের ধুলায় মেনে আসে, নবজীবনের এষণা প্রাত্যহিকতার আবর্জনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। অন্ন-প্রাণ-মনোময় সত্তার নয়—কিন্তু চিন্ময় সত্তারই প্রকাশ যে-সংঘজীবনের কাম্য, তার প্রতিষ্ঠা ও বিধৃতির মূলে প্রাকৃত-সমাজের অন্ন-প্রাণ-মনোময় বিত্তৈষণার চাইতে বৃহত্তর কোনও আদর্শের এষণা থাকবে; তা নইলে তাকে প্রাকৃত-সমাজের একটুখানি ইতরবিশেষ ছাড়া আর-কিছুই বলা চলবে না। বহু ব্যক্তিতে লোকোত্তর দিব্যচেতনার সমাবেশ চাই এবং তারই বীর্যে অন্ন-প্রাণ-মনোময় প্রাকৃতসত্তার এককথায় সমগ্র আধারের আমূল রূপান্তর চাই—পৃথিবীর বুকে নবজীবনের আবির্ভাব তবেই সম্ভব। আবার সমগ্র মানব-চেতনাতে এই রূপান্তরের আভাস সূচিত হলেই অভিনব সংঘজীবনের সার্থক উদ্‌যাপন সম্ভব হবে। প্রকৃতির পরিণাম-তপস্যা শুধু-যে তখন নতুন ধরনের মনোময় সত্ত্বের আবির্ভাবকে সঙ্কেতিত করবে তা নয়;

এই পৃথিবীতেই সে এমন-একটা অভিনব সত্ত্বের থাক গড়বে, যারা তাদের সমগ্র সত্তাকে বর্তমানের মননধর্মী পাশবতা হতে এই মর্তাপ্রকৃতিরই একটা তুঙ্গতর চিন্ময়ী-স্থিতিতে উন্নীত করবে।

বহুজনের মধ্যে মর্ত্যপ্রকৃতির এই পূর্ণরূপান্তর কখনও অতর্কিত সিদ্ধ হতে পারে না; পথের শেষে এসে প্রকৃতি যখন মোড় নিয়েছে নতুন দিকে, অভিনবের আবির্ভাব যখন সুনিশ্চিত, তখনও তার সামনে যুগব্যাপী কৃচ্ছ্র-সাধনার অগ্নিপরীক্ষা থাকে। চেতনার প্রাচীন ধারার আমূল পরাবর্তনে এক অভিনব চিদাবেশদ্বারা সমস্ত সত্তাকে জারিত করা—এই হল সাধনার প্রথম স্তর; কিন্তু তার জন্যে হয়তো সুদীর্ঘ আয়োজনের অপেক্ষা থাকে এবং রূপান্তর শুরু হলেও হয়তো পর্বে-পর্বে তার অভিযান চলে। একটা গ্রন্থি-ভেদের পর ব্যক্তিচেতনায় প্রগতির বেগ কখনও ক্ষিপ্র হয়—এমন-কি আকস্মিক উৎপ্লুতিতে আধারের একটা ক্রান্তিকারী পরিণাম সিদ্ধ হয়; কিন্তু একটি ব্যক্তির রূপান্তরেই তো সিদ্ধ-সত্ত্বের একটা নতুন থাক কি সংঘজীবনের একটা নতুন ধারা সৃষ্ট হয় না। কল্পনা করা যাক, জীবনের প্রাচীন পরিবেশেই রূপান্তরিত ব্যক্তিচেতনার ইতস্তত উন্মেষ প্রথম ঘটল,—তারপর তাদের সংঘ-বন্ধনে নবীন দেবজাতির অঙ্কুর উদ্গত হল। কিন্তু এ তো প্রকৃতিপরিণামের স্বাভাবিক রীতি নয়; তাছাড়া অবর-প্রকৃতির আবেষ্টনে ঘেরা থাকতে ব্যক্তির চেতনাতে কখনও পূর্ণ রূপান্তর আসতেও পারে না। তাই পরিণামের বিশেষ পর্বে চিরাগত প্রথামত একটা বিবিক্ত সংঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তার লক্ষ্য থাকবে দুটি : প্রথমত, সংঘের বিবিক্ত জীবনে এমন-একটি শরবৎ-তন্ময়তার আবহাওয়া সৃষ্টি করা—যা সবরকমে ব্যক্তিচেতনার দিব্য-পরিণামের অনুকূল হবে; দ্বিতীয়ত, সকল আয়োজন পূর্ণ হলে ঐ মন্ত্রপূত চিন্ময় পরিবেশেই অভিনব জীবনধারার রূপায়ণ ও উন্মেষ ঘটানো। সম্ভবত সাধনার এই একমুখীনতার ফলে রূপান্তরের বাধাগুলিও আরও জোরালো হয়ে ফুটে উঠবে; কারণ ব্যক্তিগতভাবে প্রতি সাধকের মধ্যে যেমন সংস্কার্য জগতের ভব্যার্থের সংবেগ থাকবে, তেমনি থাকবে তার অসিদ্ধ ভূতার্থের ব্যাঘাত,—নবজীবনের অনুকূল বৃত্তি ও সামর্থ্যের সঙ্গে প্রাচীন সংস্কারের প্রতিকূলতা জড়িয়ে থাকবে। তখন সঙ্কীর্ণ ও নিবিড় সংঘজীবনের পরিমিত আবেষ্টনের মধ্যে দুয়ের সংঘাতে বাধাগুলিই অপ্রত্যাশিত দুর্ধর্ষ হয়ে ঊর্ধ্বপরিণামের সমিদ্ধ ও একাগ্র বীর্যকেও বিপর্যস্ত করতে চাইবে। অতীতে প্রাণ-মনোময় প্রাকৃতজীবনকে ছাপিয়ে মনোময় মানুষ যতবার চেয়েছে একটা বৃহত্তর সত্যের ছন্দসুষমাকে রূপায়িত করতে, ততবারই তার ভরাডুবি হয়েছে এইখানে। কিন্তু মহাপ্রকৃতির সর্বতোমুখ প্রস্তুতির ফলে ঊর্ধ্বপরিণামের আশ্বাস যদি সুনিশ্চিত হয়, অথবা উত্তরভূমি হতে চিৎপুরুষের শক্তিপাত যদি

তীব্র এবং অবন্ধ্য হয়—তাহলে সকল বাধা লঙ্ঘন করে দিব্যপরিণামের এক বা একাধিক বিভূতির আবির্ভাব ঘটানো অসম্ভব হবে না।

জীবন হবে চিন্ময় সত্যের দীপ্তচ্ছটা, বৃহৎ-জ্যোতি ও কবিক্রতুর প্রশাসন হবে তার একান্ত নির্ভর—এই যদি দিব্য-ধর্মের শাশ্বত ছন্দ হয়, তাহলে তার জন্য এমন-একটা বিজ্ঞানঘন জগৎ চাই যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির চেতনাই স্বরূপত বিজ্ঞানঘন তত্ত্বের 'পরে প্রতিষ্ঠিত; সেখানে এক বা একাধিক বিজ্ঞানঘন গোষ্ঠীতে স্বভাবতই সহবেদন ও সৌষম্যের নীরন্ধ্র চেতনায় জীবনের সঙ্গে জীবন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যতিষক্ত থাকবে। কিন্তু এখানে বস্তুত বিজ্ঞানঘন-পুরুষের জীবনধারা অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবন-পরিবেশের অন্তরে কি সমান্তরে প্রবাহিত হবে এবং তাকে বিদীর্ণ কি উদ্দ্যোতিত করেই নিজেকে সে উন্মিষিত করতে চাইবে—অথচ পাশাপাশি দুটি জীবনায়নের আপাতবৈধর্ম্য হতে একটা হানাহানির ভাব যেন থেকেই যাবে। তখন অবিদ্যার ছোঁয়াচ বাঁচাতে বাধ্য হয়ে অধ্যাত্ম-সংঘজীবনকে সম্পূর্ণ গুহাহিত বা তার থেকে বিবিক্ত হতে হবে —নইলে হয়তো দুয়ের মধ্যে একটা রফার প্রয়োজন হবে। কিন্তু রফামাত্রেই মহত্তর জীবনে কলুষ এবং অপূর্ণতার ছোঁয়াচ আনে; দুটি বিভিন্ন ও অসমঞ্জস প্রকৃতির মধ্যে যোগাযোগ ঘটলে, বড়-র প্রভাব ছোট-র 'পরে পড়বে যদিও, তবু ছোটও বড়কে প্রভাবিত করতে ছাড়বে না,—কেননা পাশাপাশি থাকতে গেলেই মাখামাখি হওয়াটাও স্বভাবের একটা আইন। এমনও মনে হতে পারে, বিদ্যা আর অবিদ্যার এই গৃহস্থালিতে বিরোধ আর সংঘর্ষই প্রথমকার দস্তুর হবে,— কেননা অবিদ্যার মাঝে নিত্য স্ফুরিত হচ্ছে অন্ধতামিস্রার দুর্ধর্ষ দানবী-শক্তি, যা মানবী চেতনায় উত্তরজ্যোতির আবেশকে প্রাণপণে কলুষিত ব্যাহত ও বিধ্বস্ত করতে চাইবে। বৃত্রশক্তির এই অত্যাচার যুগে-যুগে পরা প্রকৃতির পরে হয়ে এসেছে : অবিদ্যার নিরূঢ় বিধানকে লঙ্ঘন করে যখনই কোনও নবচেতনা চেয়েছে প্রকাশের পথ, তখনই তার সামনে এই বৃত্রাসুর তাল ঠুকে দাঁড়িয়েছে এবং নির্মম অত্যাচারে তাকে নির্মূল করতে চেয়েছে; কখনও-বা অন্ধশক্তির অতর্কিত প্ররোচনা অভিনবের জয়শ্রীকে অনুবিদ্ধ করেছে—তখন প্রতিরোধের চেয়ে নবশক্তির স্বীকৃতিই জগতের পক্ষে আরও নিদারুণ হয়েছে এবং অবশেষে কলুষিত ছায়াপাতে নতুন ঊষার আলোর জয়ন্তী স্তিমিত ও বিপ্লুত হয়েছে। তাই যে নবশক্তি বা নবজ্যোতি মর্ত্যচেতনায় আমূল রূপান্তর এনে আজ তার দায়ভাগকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে, তার বিরুদ্ধে বৃত্রের অভিযান হয়তো দুর্বারতম হবে, হয়তো বিপর্যাসের আশঙ্কা হবে নিবিড়তম। কিন্তু এ-ও সত্য, নবালোকের পূর্ণচ্ছটা নবশক্তিরও অমোঘসিদ্ধির বীর্য সঙ্গে আনবে। সেইজন্যই জগতে তাকে হয়তো সম্পূর্ণ বিবিক্ত হয়ে থাকতে হবে না; বিশ্বে হয়তো নিজেকে সে পুঞ্জে-পুঞ্জে ছড়িয়ে দেবে এবং সেখান হতে

ব্যামিশ্র চেতনার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হবে, অভ্যাসের জীর্ণতার 'পরে প্রদীপ্ত প্রাণের বৈদ্যুতী আনবে, মানুষের জীবনতন্ত্রে এক নবীন অভীপ্সার উন্মাদনা জাগিয়ে তুলবে যা একদিন স্বাগত-মন্ত্রে এই অভিনবের আবির্ভাবকে বন্দনা করবে।

কিন্তু এ-সমস্তই উদ্যোগপর্বের সমস্যা; অর্থাৎ মহাশক্তির জয়ন্তী সিসৃক্ষা নিরঙ্কুশভাবে উজানধারায় না বইতে পারছে যতদিন, যতদিন এই পার্থিব-কল্পে বিজ্ঞানময় সত্ত্ব মনোময় সত্ত্বেরই মত সুপ্রতিষ্ঠ না হচ্ছে—ততদিন ধরে প্রকৃতি-পরিণামের এমনিতর কৃচ্ছ্রতপস্যাই এখানে চলবে। কিন্তু বিজ্ঞানঘন-চেতনা মর্ত্যজীবনে একবার অচলপ্রতিষ্ঠার আসন নিলে তার প্রজ্ঞা ও বীর্যের সঞ্চয় স্বভাবতই মনোময় মানুষের প্রজ্ঞা-বীর্যকে ছাপিয়ে যাবে। তখন বিজ্ঞানঘন-সংঘের বিবিক্ত জীবন সহজেই বৃত্রশক্তির সকল অভিঘাত এড়িয়ে যাবে, যেমন মানুষের সমাজ-সংহতি ইতরপ্রাণীর অভিঘাত সম্পর্কে আজ নিঃশঙ্ক হয়েছে। বিজ্ঞানঘন-প্রকৃতির এই প্রজ্ঞাবীর্যে ও স্বভাবছন্দে শুধু-যে সংঘজীবনই একত্ব-ভাবনার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হবে তা নয়,—বিদ্যা ও অবিদ্যার জীবনদ্বন্দ্বেও সে সামঞ্জস্যের সর্বজয়া সুষমা ছড়িয়ে দেবে। বিজ্ঞানঘন-জীবনের প্রতিষ্ঠা হয়তো হাটের মধ্যে হবে না,—কিন্তু তাহলেও তার ছটামণ্ডলে চিন্ময় পথের পথিক ও উত্তরায়ণের যত অভিযাত্রী আশ্রয় পাবে; তার বাইরে যারা, তারা মনোময়ী প্রকৃতির প্রাচীন ধারাকে অনুসরণ করবে বটে, কিন্তু তাদের সকল সাধনার 'পরে তারা এক দিব্যপ্রজ্ঞার জ্যোতিঃসম্পাত স্পষ্ট অনুভব করবে এবং তারই প্রেরণা তাদের অভিনব মানবৌঘের অভূতপূর্ব সৌষম্যসিদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে।... ভবিষ্য-জগতের এই ছবি: কিন্তু এও শুধু মনঃকল্পিত আভাস: জগতীচ্ছন্দের কোন্ চিত্রলেখা অনাগতের বুকে ফুটবে, অতিমানসী পরমা প্রকৃতির ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই তা নিরূপিত করবে।

বিজ্ঞানঘনা পরমা প্রকৃতির স্বরূপ আমাদের অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাকৃত-বুদ্ধির অগোচর; মর্ত্যমনের কল্পিত আদর্শ অবিদ্যার বিসৃষ্টিমাত্র, অতএব তা দিয়ে পরমা প্রকৃতির প্রাণের ছন্দকে চেনা যায় না। অথচ আমাদের বর্তমান প্রকৃতিও পরমা প্রকৃতিরই বিভূতি এবং তাকে শুদ্ধ-অবিদ্যা না বলে বলা চলে অর্ধ-বিদ্যা: সুতরাং তার কল্পিত আদর্শ ও পুরুষার্থের অন্তরে কি অন্তরালে যে চিন্ময়-সত্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে, লোকোত্তর জীবনে সেও আবার ফুটে উঠবে—ঠিক আদর্শ-রূপে নয়, কিন্তু জ্যোতির্ময় অবিদ্যানির্মুক্ত জীবনের সত্য-সুষমার ছন্দবহ ও রূপান্তরিত উপাদানরূপে। চিন্ময় ব্যক্তিভাবনার বিশ্বরূপায়ণে ব্যক্তিসত্ত্বের সঙ্কীর্ণ অহন্তা যখন খসে পড়ে, মনোবাণীর অতীত পরমা প্রকৃতির প্রজ্ঞা-লোকে অন্তর উদ্ভাসিত হয়,—তখন যেমন আদর্শের যত দ্বন্দ্বাবিধুর মানস-কল্পনা শূন্যে মিলিয়ে যায়, তেমনি তার অন্তর্নিহিত সত্যও পরমা প্রকৃতির

জীবনসত্যরূপে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানঘন-চেতনায় আত্মসংবিৎ ও বিশ্ব-সংবিতের যোগযুক্ত প্রত্যয় ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ও সত্যাপত্তির উদার জ্যোতিতে সকল বিরোধ তিরোহিত বা বিগলিত হয়ে যায়। প্রাকৃতবুদ্ধির আদর্শবাদ বিজ্ঞান-ঘন-পুরুষকে বাঁধতে পাবে না; অহংএর সেবা যেমন তাঁর পুরুষার্থ নয়, তেমনি সমাজসেবা রাষ্ট্রের সেবা কি মানবসেবাও তাঁর ঐকান্তিক পুরুষার্থ নয়। কারণ এদের অর্ধসত্যকে ছাপিয়ে ভাগবত সত্যের দিব্য আবেশে তাঁর চেতনা আবিষ্ট, —বিশ্বোত্তীর্ণের কবিক্রতুর পরমজ্যোতিই তাঁর জীবনের দিশারী, অতএব নিজের মধ্যে সবার মধ্যে বিশ্বাত্মভাবের বেদনে তিনি সেই ক্রতুরই প্রেষণাকে জানেন। তাই আত্মপ্রতিষ্ঠা আর বিশ্বহিতৈষণায় তাঁর জীবনে কোনও বিরোধ নাই—কারণ বিজ্ঞানঘন-পুরুষের আত্মা সর্বভূতেই আত্মভূত; জীবনাদর্শের সাধনায় ব্যক্তি বড় কি সমাজ বড় এ-প্রশ্নও তাঁর কাছে নিরর্থক—কারণ দুয়েরই মধ্যে তিনি ভূমার বিভূতিকে দেখেন, অতএব শুধু পরমপুরুষের চিন্ময়-ক্রতুর ছন্দে ফুটে তারা তাঁর দৃষ্টিতে সার্থক। অথচ আদর্শের কল্পনায় প্রাকৃত-মনে সত্যের যে-ছায়া পড়ে, তাঁরই জীবনে তার সিদ্ধ-কায়া ফোটে; কেননা মানুষের চাওয়াকে তাঁর ভাবনা ছাড়িয়ে গেলেও বিশ্বমানব যে তাঁরই আত্মভূত—যদিও তাদের মত স্বার্থ সমাজ রাষ্ট্র বা মানবতাকে ভগবানের আসনে তিনি কোনকালেই বসাতে পারেন না। এইজন্যে তাঁর অন্তরে বিশ্বের ভাবনা মূর্তি ধরে—কেননা আত্মাতে এবং সর্বভূতে ব্রহ্মানুভবের অবন্ধ্য প্রত্যয় যেমন তাঁকে বিশ্বমানবের সঙ্গে বিশ্বভূতের সঙ্গে এবং নিখিল বিশ্বের সঙ্গে তাদাত্ম্যভাবনায় যোগযুক্ত করে, তেমনি সবার অন্তরে পরমসত্যের শাশ্বত অভ্যুদয়কে নিত্য-প্রচোদিত করাই হয় তাঁর জীবন-সাধনার একটা অঙ্গ। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা ও সত্যসংকল্পের প্রেরণায় এক অখণ্ড ও অনন্ত সত্যের প্রোতিতে তাঁর কর্ম হয়—অতএব মনঃকল্পিত বিশেষ-কোনও বিধি কি আদর্শের আড়ষ্টতা তার মধ্যে থাকে না; কেননা আনন্ত্যের প্রবৃত্তিতে খণ্ডিত সত্যের 'যথাতথ্যতঃ' বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রেখেও অখণ্ড সত্যধৃতির স্বাতন্ত্র্য যেমন আছে, তেমনি বিশ্বপরিণামের প্রতি পর্বে জগতের প্রত্যেক ব্যাপারে শক্তির যে-লীলায়ন ও উন্মিষন্ত চিৎ-তপসের যে-আকৃতি স্ফুরিত হয়ে চলেছে, তারও অবিকল্পিত বিজ্ঞান তার আছে।

বিজ্ঞানঘন-পুরুষের সিদ্ধচেতনায় সমস্ত জীবন হবে চিৎসত্তারই সিদ্ধ-সত্যের রূপায়ণ; আত্মপ্রকৃতির যা-কিছু রূপান্তরিত হয়ে ঐ মহত্তর সত্যের আয়তনে তার চিৎস্বরূপের সত্য খুঁজে পাবে এবং তারই সৌষম্যে ছন্দিত হবে—তাঁর জীবনে কেবল সেই চিদাবিষ্ট বৃত্তিরই স্থান হবে। এই করে বর্তমান প্রকৃতির কী যে অবশেষ থাকবে, মন তা বলতে পারে না; কেননা অতিমানস-বিজ্ঞান তার স্বরূপ-সত্যকে যখন এই আধারে নামিয়ে আনবে, তখন সেই সত্যই আমাদের প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের আদর্শে ও উপলব্ধিতে তার যে-আভাসটুকু

ছিল, তাকে উদ্দীপ্ত করে তুলবে। হয়তো আধারে সে-সত্যের প্রাক্তন রূপায়ণের কোনই নিশানা মিলবে না,—কেননা জীবনসত্যের নবীন প্রকাশের সঙ্গে তারা খাপছাড়া হবে, অতএব তাদের সেদিন ভেঙেচুরে নতুন করে গড়তে হবে; এমন-কি তাদের স্বরূপে কি বৃত্তিতে সত্য এবং শাশ্বত যা, টিকে থাকতে গেলে তারও হয়তো রূপান্তরের প্রয়োজন হবে। মানুষের জীবনে আজ যা নিতান্ত স্বাভাবিক, তার অনেক-কিছুই সেদিন থাকবে না: প্রাকৃত-মনের অনেক নন্দনকল্পনা, অনেক মনগড়া তত্ত্ব এবং তন্ত্র, মানুষের জীবনজোড়া যুগসঞ্চিত অনেক আদর্শের সংঘাত বিজ্ঞানঘন-চেতনার দৃষ্টিতে অশ্রদ্ধেয় কি মূল্যহীন হবে। এই চাকচিক্যময় বঞ্চনার আড়ালে কিছুমাত্র সত্য কোথাও যদি লুকিয়ে থাকে, তাহলে উদারতর সৌষম্যের উপাদানরূপে কেবল তারই ঠাঁই হবে বিজ্ঞানের জগতে। স্পষ্টই বোঝা যায়, বিজ্ঞানঘন জীবনে শুধু ঋতের ছন্দ ফুটবে; তার মাঝে যুদ্ধজনিত বিদ্বেষ বৈরিতা ও বর্বরতার বিষোদ্গার এবং ধ্বংস ও অত্যাচারের অন্ধ প্রমত্ততা থাকবে না; রাষ্ট্রচেতনায় থাকবে না অসাধুতা নীচতা অবিরাম রেষারেষি পরপীড়ন স্বার্থের সংঘাত বা অজ্ঞান ও অকর্মণ্যতার ফলে যত অনাসৃষ্টি সৃষ্টি। কলা ও শিল্প তখন প্রাণ-মনের স্থূলে প্রমোদলিপ্সা অবসর-বিনোদন কি শ্রান্তচিত্তের সাময়িক উত্তেজনার উপায় বলে গণ্য হবে না—কিন্তু তারা হবে চিন্ময় সত্যেরই বাহন এবং সাধন, জীবনের শ্রী ও আনন্দের প্রকাশ এবং উপকরণ। জীবনের পনের-অনা জুড়ে আজ যে অতৃপ্ত প্রাণ ও শরীরধর্মের জুলুম চলেছে, তখন তারা চিদ্বিলাসেরই বিভূতি ও সাধনরূপে রূপান্তরিত হবে। সেইসঙ্গে, দেহ আর জড়ের সত্যও যখন চিন্ময়-পুরুষের কাছে মর্যাদা হারাবে না, তখন জড়শক্তির প্রশাসন ও জড়বস্তুর ঋতময় উপযোগও মর্ত্যপ্রকৃতিতে উন্মিষিত চিন্ময় সিদ্ধ জীবনায়নের একটা অপরিহার্য অঙ্গ হবে।

অধ্যাত্মজীবন তপঃকৃচ্ছ্রতা ও অপরিগ্রহের জীবন, বলতে গেলে এ-ধারণা আমাদের মজ্জাগত; জীবনবিমুখ কর্মবৃত্তিই যদি হয় আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ এবং লক্ষ্য, তাহলে নিশ্চয় অপরিগ্রহই তার মুখ্য সাধনা। এ-আদর্শকে ঐকান্তিক বলে না মানলেও, অধ্যাত্মজীবনের ঝোঁক যে হবে অতিসারল্যেরই দিকে—এ-দাবি আমরা ছাড়তে পারি না; কেননা জীবনের ঐশ্বর্য যে কেবল প্রাণবাসনা ও স্থূল ভোগাসক্তির সাধন, এ-ধারণায় আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু দৃষ্টির প্রসার হলে মনে হবে, এও তো অবিদ্যাশাসিত মনের আদর্শবাদের জল্পনা; কামনাই অবিদ্যামনের মুখ্যবৃত্তি। সুতরাং অবিদ্যার অভিভব ও অহন্তার উচ্ছেদ করতে হলে কামনা ও তার সকলরকম ইন্ধনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ আবশ্যক—একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কামনার ঊর্ধ্বে যে-চেতনার প্রতিষ্ঠা, এ-আদর্শের, কি মনঃকল্পিত যে-কোনও আদর্শের বিধান তাকে বাঁধতে পারে না।

চারিত্রের অকলঙ্ক শুচিতা ও অখণ্ড আত্মসংযম নিষ্কাম পুরুষের সহজ স্বভাব —ঐশ্বর্যে কি দারিদ্র্যে তার কোনও বিপর্যয় ঘটে না; দারিদ্র্য যাকে ক্ষুব্ধ করে কিংবা ঐশ্বর্য যার বিকার আনে, বুঝতে হবে তার অকামতা অখণ্ড কি সত্য নয়। বিজ্ঞানঘন-পুরুষের একমাত্র পরিচয়—তাঁর জীবন চিৎসত্তারই স্বরূপ-বিভূতি, দিব্যপুরুষেরই সত্যসংকল্পের লীলা; সে-সংকল্প বা বিভূতি ফুটতে পরে যেমন অতিসারল্যে তেমনি অতিজটিলতায়, যেমন রিক্ততায় তেমনি ঐশ্বর্যে অথবা উভয়ের স্বাভাবিক সমন্বে,—কেননা শ্রী ও পূর্ণতায়, বিথেবর স্মিতহাস্যের গোপনমাধুরীতে, প্রাণোচ্ছ্বাসের সৌরকরোজ্জ্বল আনন্দহিল্লোলে সেই চিৎস্বরূপেরই শক্তি ও বৈভবের প্রকাশ। তিনি অন্তঃপ্রকৃতির একমাত্র দিশারী যেখানে সেখানে জীবনের পরিবেশ ও প্রকাশের ধারা নিরূপিত হবে তাঁরই পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশাসনে। কিন্তু তাঁর শাসনেও স্বাতন্ত্র্যের সাবলীলতা থাকবে; ছকের বাঁধুনী মনের গৃহস্থালিত যতই অপরিহার্য হোক্, চিন্ময়-জীবনে তার আড়ষ্টতা একেবারেই অচল। সোনে অন্তর্গূঢ় একত্বের ভূমিকাতেই আত্মরূপায়ণের বিপুল বৈচিত্র্য এবং স্বাতন্ত্র্য ফুটবে বটে, কিন্তু তারও মাঝে সর্বত্রই সৌষম্য ও ঋতের ছন্দ থাকবে।

অতিমানস উত্তরায়ণের অভিযানে বহু বিজ্ঞানঘন-পুরুষের জীবন যদি প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামের বাহন হয়, তবে তাতেই দিব্য জীবনের সত্য পরিচয় ফুটবে; কেননা সে-জীবনায়ন হবে শাশ্বত দিব্য-পুরুষের আত্মবিভূতি,—জড়-প্রকৃতিতে চিন্ময় দিব্য জ্যোতি শক্তি ও আনন্দের অবন্ধ্য রূপায়ণের সেই তো সূচনা আনবে। মানবের মনঃকল্পনার বাইরে এ-জীবনের মহিমা—অতএব তাকে বলতে পারি চিন্ময় অতিমানবতার প্রকাশ। কিন্তু অতীত ও বর্তমানের তথাকথিত অতিমানবতার সঙ্গে একে ঘুলিয়ে ফেললে চলবে না। মানসকল্পিত অতিমানবতা মানবতার রাজাধিরাজ সংস্করণমাত্র; তাতে মনশ্চেতনার রূপান্তর নাই, আছে তার ঐশ্বর্যের উপচয়—মন ও প্রাণশক্তির বিপুলতর উচ্ছ্বাসে, ব্যক্তি-সত্ত্বের স্ফীতিতে, অহমিকার বহুগুণিত অতিরঞ্জনে, এককথায় মানবের অবিদ্যা-শক্তিরই স্থূল বা মার্জিত অতিকায় উৎপ্লাবনে। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের মনে ক্লিষ্ট-স্তিমিত মানবতার 'পরে দুর্ধর্ষ অতিমানবতার নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্যের একটা ছবি ভেসে আসে। নীটসের অতিমানব এইধরনের জীব; এর অধিকার কায়েম হলে জগতে ফিরে আসবে দুর্ধর্ষ নির্মম বর্বরতার যুগ, সংসারে চলবে উচ্ছৃঙ্খল পাশবতার নিরঙ্কুশ আধিপত্য—এখন সে-পশু শ্বেত কৃষ্ণ কি কপিশ যে-বর্ণেরই হোক্ না কেন। কিন্তু একে কি সভ্যতার প্রগতি বলব, না বলব আদিম অসভ্যতার দুর্নিবার উৎক্ষেপ? স্বোত্তরণের অভিযাত্রী মানুষের উদগ্র শক্তি-সাধনার বিপর্যয়ে হয়তো এমনি করেই জগতে দেখা দেয় রাক্ষসী কি আসুরী শক্তির অভ্যুদয়। ক্ষুব্ধ প্রমত্ত স্ফীতকায় প্রাণ-বাসনা নির্মম ও উচ্ছৃঙ্খল আত্ম-

স্ভরিতার দুর্ধর্ষ শক্তি নিয়ে শুধু অহমিকার চরিতার্থতা খুঁজছে—এই হল রাক্ষসী অতিমানবতার রূপ। আমাদের মধ্যে ব্যাদত্তমুখ রাক্ষসটা এখনও মরেনি যদিও, তবুও সে আজ অতীতের ছায়াবশেষমাত্র: আবার যদি অতিকায় হয়ে এ-যুগে সে ফিরে আসে, তাহলে তাকে প্রকৃতিপরিণামের প্রতীপচারী বলব। অসুরের মধ্যে আছে সর্বাভিভাবী শক্তির দুর্ধর্ষতা, স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বনিরুদ্ধ এমন-কি কৃচ্ছ্রতপস্যায় শাণিত মনোবীর্য ও প্রাণশক্তির সংবেগ; মনোময় ও প্রাণময় অহং-এর চরম উচ্ছ্রয়ে তার পুঞ্জিত শক্তির তীক্ষ্ণ বৈপুল্য অকুণ্ঠ ঈশনার নিশ্চিত প্রত্যয় নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে প্রলয়ের কূলে। কিন্তু অসুরও মর্ত্যপরিণামের অতীত কীর্তি—তাকে আবার ফিরিয়ে আনলে শুধু অতীতেরই রোমন্থন চলবে; অসুরকে দিয়ে প্রকৃতির অনাগতসিদ্ধির কোনও সত্যকার সুরাহা হবে না, তার স্বোত্তরণের তপস্যাতে কোনও বীর্য আসবে না—এমন-কি আসুরী-শক্তির অতিপ্রাকৃত উপচয়েও কেবল তার প্রাচীন আবর্তন-কক্ষারই পরিধি সম্প্রসারিত হবে। যে-অভ্যুদয়ের আকূতি প্রকৃতি বহন করছে তার অন্তরে, তার সাধনা যেমন এর চাইতে কৃচ্ছ্রসাধ্য, তেমনি আবার এর চাইতেও সরল। চাই স্বরূপসিদ্ধির চেতনা ও চিদাত্মভাবের অচল প্রতিষ্ঠা, আত্মজ্যোতি আত্মবীর্য ও আত্মমাধুরীর প্রমুক্ত স্বাতন্ত্র্যে জীবচেতনার অনিরুদ্ধ তীব্র-সংবেগের বিচ্ছুরণ চাই; চাই না—তথাকথিত অতিমানবতার স্ফীত অহমিরা মন ও প্রাণশক্তির দুর্ধর্ষতায় নির্জিত রাখুক মানবের আত্মাকে, এ চাই না। দেহ-প্রাণ-মনের 'পরে চিৎস্বরূপের নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হোক, তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার চিন্ময় বীর্য সমগ্র জীবনকে জারিত করুক; মানুষের মধ্যে ফুটে উঠুক সেই নবচেতনার বৈদ্যুতী—যা তার অন্তর্নিহিত দিব্যভাবের প্রকাশ-ব্যাকুলতাকে আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে সার্থক করবে, যার প্রেতিতে নিজেকে ছাড়িয়েই নিজেকে সে পাবে সহস্রদল পূর্ণতার মহিমায়। এই হল একমাত্র সত্যকার অতিমানবতা—এই পথেই আছে প্রকৃতিপরিণামের আর-এক-ধাপ এগিয়ে যাবার একমাত্র সম্ভাবনা।

এই অ-পূর্ব স্থিতিতে মানবচেতনা ও মানবজীবনের বর্তমান ধারা পালটে যাবে, কেননা এতে প্রাকৃতজীবনের মর্মনিহিত অবিদ্যাতত্ত্বের পূর্ণ বিপর্যয় ঘটবে।...বলা চলে : অবিদ্যার অতর্ক্য লীলায়নের বিচিত্র আস্বাদন পেতেই পুরুষ অচিতির গহনে নেমে আপনাকে জড়বিগ্রহের ছদ্মরূপে সংবৃত করেছেন; আপনাকে হারিয়ে আবার ফিরে পাবার নর্মলীলাতেই তাঁর সৃষ্টির উল্লাস—তাইতে বিশ্ব জুড়ে জড়ের আধারে প্রাণ-মন-চেতনার অভাবনীয় উচ্ছলনের চকিত-চমকে দুঃসাহসের অভিযান চলছে—দিকে-দিকে অজানাকে জানবার ও অধরাকে ধরবার নিত্যনতুন উত্তেজনা ছলকে পড়ছে! এই তো প্রাণধর্মের সাধনা; যদি অবিদ্যার উচ্ছেদ হয়, তাহলে এ-সাধনাও তো চলবে না। অচিতির

তকশছন্ন অসাড়তার বুকে জড়প্রকৃতির নির্বর্ণ ঔদাসীন্য ফুটেছে; তারি পটভূমিকায় মানুষের সুখে-দুঃখে লাভে-ক্ষতিতে জয়ে-পরাজয়ে আলোয়-আঁধারে অবিদ্যার বর্ণরতিপ্রমোদের চিত্রলীলা নিত্য আবর্তিত হয়ে চলেছে। প্রাকৃতজীবনে যদি সিদ্ধি-অসিদ্ধির অভিঘাত ও হর্ষ-শোক সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব না থাকে দুর্দম প্রবৃত্তি বিপদের মুখে যদি না ঠেলে নিয়ে যায়, অনিশ্চিত নিয়তির সঙ্গে লড়াইয়ের নেশা মনকে না মাতাল করে; সিসৃক্ষার সংবেগ ও নিত্যনতুনের উন্মাদনা প্রাণকে যদি না পাঠায় অজানার অভিসারে;—তাহলে বৈচিত্র্যহীন জীবনে কোথায় রস, কোথায় চমৎকার? অবিদ্যা আছে বলেই দ্বন্দ্ব আছে জীবনে, আছে স্বাদ; দ্বন্দ্বহীন জীবন যেন অলক্ষণ শূন্যতার মরুভূমি, নির্বিকার সমত্বের অচলায়তন: এমন-কি মানুষের স্বর্গকল্পনাতেও সেই চিরন্তন একঘেয়েমি!...কিন্তু এ-ধারণা ভুল। অবিদ্যা হতে বিজ্ঞানঘন-চেতনায় উত্তীর্ণ হবার অর্থই হল আনন্ত্যের অমৃতলোকে প্রবেশ করা: স্বয়ম্ভূ সম্ভূতিশক্তির উল্লাসে অনন্তের যে অন্তহীন আত্মরূপায়ণ চলে, তার অফুরন্ত আনন্দবৈচিত্র্য ও বৈপুল্যের সঙ্গে সান্তের দ্বন্দ্ববিধুর সীমাঙ্কিত লীলাবিভূতির তুলনাই চলে না। শুদ্ধবিদ্যার অধিকারে প্রকৃতিপরিণামের লীলায়নে চলবে বিসৃষ্টির কান্ততর ও মহত্তর সমুল্লাস, সম্মুখে খুলে যাবে সম্ভাবিতের নিত্যোপচীয়মান বিপুল প্রসার—অবিদ্যাশাসিত পরিণামের সকল মহিমাকে ছাপিয়ে উঠবে তার অবন্ধ্য প্রেতির সুতীব্র সংবেগ। চিৎস্বরূপের' আনন্দ চিরন্তন ও নিত্যনবায়মান। তাঁর কান্তবিভূতির শেষ নাই, তাঁর দেবত্বের বৈভবে অজর যৌবনেব দীপ্তি, অফুরন্ত ও শাশ্বত রসোল্লাসে তাঁর আনন্ত্যের চেতনা নন্দিত। অতএব অবিদ্যার সিসৃক্ষার চেয়ে জীবনের বিজ্ঞানঘন লীলায়ন আরও পূর্ণ আরও সার্থক আরও রসোচ্ছল হবে—তার আনন্দ আর ঐশ্বর্য হবে বিশ্বজনের নিত্য-বিস্ময়।

জড়প্রকৃতিরও মধ্যে পরিণামের নিত্যধারা বইছে এবং সে-পরিণামের মৌল-বিভূতি ফুটছে প্রাণ ও চেতনার দ্বিদল উন্মেষে সত্তার নিত্যরূপায়নে —এই যদি সত্য হয়, তাহলে প্রাণ ও চেতনার পূর্ণবিকাশে জীবসত্তার পূর্ণতাসিদ্ধি হবে আমাদের চরম নিয়তি এবং চিৎশক্তির অকুণ্ঠ প্রেষণায় সেই নিয়তির পথেই চলেছে আমাদের উত্তরায়ণের নিরন্ত অভিযান—এও অনস্বীকার্য। জড় ও প্রাণের আদিম অচেতনা হতে চিদাত্মভাবের মন্থর উদয়ন ঘটছে; এই জড় আর প্রাণের বুকেই একদিন তার সত্তা ও চেতনার ষোড়শকল সত্য মহিমা স্ফুরিত হবে—অন্তর্গূঢ় সংবৃত্ত সংবৃত্ত আত্মস্বরূপের প্রমুক্ত চেতনায় আবার ফিরে যাবে। এই ফিরে-যাওয়া নির্বিশেষ-চৈতন্যে জীবচেতনার প্রলয়ও হতে পারে; কিন্তু তার পূর্ণ সার্থকতা জীবনের অপঘাতে নয়—এই জীবনের মধ্যেই তার স্বরূপশক্তির চিন্ময়ী পূর্ণতায়। আমাদের অবিদ্যাপরিণামের বিচিত্র

দ্বন্দ্ব, পাওয়া না-পাওয়ার আনন্দ-বেদনা, আত্মা ও বিশ্বের স্বরূপোপলব্ধির অশ্রান্ত প্রয়াস এবং তার কুণ্ঠাহত সার্থকতা—এ-সকলই শুধু চিন্ময়পরিণামের আদিপর্ব। শুদ্ধবিদ্যার পরিবেশে একে-একে মেলবে চেতনার দল, নিজের মধ্যে স্বমহিমায় চিৎস্বরূপ নিজেকে ফুটিয়ে তুলবেন,—আজ যা আমাদের অনধিগম্য, বিশ্বনিখিলে অন্তর্গূঢ় তাঁর সেই পরমা-প্রকৃতিরূপিণী স্বরূপ-শক্তিরই সত্যবীর্যে দিব্য-পুরুষ আপনাকে উন্মিষিত করবেন ঘটে-ঘটে—এই হল সেই চিন্ময়পরিণামের ধ্রুব নিয়তি।

সমাপ্ত

শব্দ-পরিচয়

[সংকেত : কর্তৃ—কর্তৃবাচ্যে। জৈ—জৈনদর্শন।
তু—তুলনীয়। দ্র—দ্রষ্টব্য।
ন্যা—ন্যা-বৈশেষিক। প্র—প্রতিতুলনীয়।
বি—বিশেষ্য। বিণ—বিশেষণ।
বে—বেদান্ত। বৈ—বৈষ্ণবদর্শন।
বৌ—বৌদ্ধদর্শন। ভাব—ভাববাচ্যে।
মী—মীমাংসা। শা—শাক্তদর্শন।
শৈ—শৈবদর্শন। সা—সাংখ্য-যোগ।
স্ম—স্মৃতিপ্রস্থান।]

অং**শকলা—খণ্ডিত এবং বিশিষ্ট প্রকাশ (স্মৃ); শক্তির আংশিক স্ফুরণ।

অংশ-ভাক্, -হর—শরিক।

অকল্প্যপরিণাম—যে 'পরিণামের' ফলে নতুনতর এমন-কিছুর উন্মেষ হয় যা আগে আন্দাজ করা যায়নি creative evolution।

অক্লিষ্টবৃত্তি—অসঙ্কুচিত শুদ্ধ চিত্তধর্ম।

অখণ্ড-ভাবনা—জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সমগ্রতা ও একত্বের বোধ। -সমাহরণ—একটা নিটোল সমগ্রতার মধ্যে সব-কিছুকে গ্রহণ বা স্থাপন করা। -সমাহার—সব-কিছুকে জড়িয়ে গোটা একটা-কিছু a single whole।

অক্ষরমালা—'অ' হতে 'ক্ষ' পর্যন্ত সমগ্র বর্ণমালা বা 'মাতৃকা' যাকে বিশ্বশক্তির প্রতীকরূপে ধরা হয় (শা)

অক্ষর—অবিচল, নির্বিকার (শ্রু)। -সমাপত্তি—বিশ্বাতীত অচলস্থিতিতে তল্লীন থকা। -স্থিতি—(চেতনার) নিস্পন্দ ভূমি।

অগোত্র—যা নিজেই নিজের মূল (শ্রু)।

অগ্রাহ্য—অনুভবের এলাকার বাইরে।

অগ্র্য—আদিম। ক্রমসূক্ষ্ম হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে যে (শ্রু)।...

অগ্র্যা-ধী, -বুদ্ধি—এখানকার অনুভবের সীমানা ছাড়িয়ে তত্ত্বের সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে যে-বুদ্ধি (শ্রু)।

অচিৎ-অদ্বৈতবাদ—'অচেতন জড়শক্তিই বিশ্বের একমাত্র মূল' এই মতবাদ।

অচিন্ত্য—চেতনায় বা বোধে না আনতে পারা (শ্রু)।

অজাতি—জন্মরহিত অবস্থা non-birth। -বাদ—'জগৎ নাই বা হয়নিও কোনও কালে' এই মতবাদ (বে)।

অজ্ঞেয়বাদ—'চরমতত্ত্বকে কেউ জানতে পারে না' এই মতবাদ agnosticism।

অণু-জীব—প্রাণের অতিসূক্ষ্ম অণুপ্রমাণ অভিব্যক্তি।

অতত্ত্ব—যার যথার্থ অস্তিত্ব নাই, অলীক।

অতিগামী—ছাপিয়ে যায় যা।

অতিচার—ছাড়িয়ে যাওয়া, অতিক্রম।

অতিচিতি, অতিচেতনা—চেতনার বিশ্বাতীত চরম ভূমি super-conscience।

অতিদেশ—গণ্ডির বাইরে প্রয়োগ extension (মী)।

অতিপ্রাকৃত—প্রকৃতি বা স্বভাবের বাইরে abnormal।

অতিব্যাপ্তি—লক্ষণের দোষ—যাতে অলক্ষিত বিষয়ও লক্ষণের মধ্যে এসে পড়ে too wide definition, illegitimate extension (ন্যা)।

অতিভাবী—ছাড়িয়ে যায় যে।

অতিমুক্তি—সবরকমের বিশেষণ বা দ্বন্দ্বভাব—এমন-কি বন্ধ-মোক্ষের ভাবনাকেও ছাড়িয়ে গেছে যে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য absolute freedom (শ্রু)।

অতিশয়—আরও বেশী-কিছু, অতিরেক something more and other।

অতিশায়ন—ছাপিয়ে চলা।

অতি-ষ্ঠা—সব-কিছুকে অতিক্রম করে আছে যা transcendent (শ্রু)।

অতিসত্তা—সত্তা বা অস্তিভাবেরও ওপারে যা super-existence।

অতিস্থিতি—সব-কিছুকে ছাপিয়ে থাকা transcendence।

অত্যন্ত-নাশ—সম্পূর্ণ নির্মূল করা, শূন্যে মিলিয়ে দেওয়া। -নিবৃত্তি—কোনও-কিছু অবশেষ না রেখে সম্পূর্ণ গুটিয়ে যাওয়া, সমস্ত ভাব ও ক্রিয়ার নিঃশেষে প্রলয় absolute withdrawal -ব্যাবৃত্ত—সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক totally exclusive।

অত্যয়ন—ছাড়িয়ে যাওয়া।

অদব্ধ—অলঙ্ঘনীয় (শ্রু)।

অদৃষ্ট—প্রাকৃত দৃষ্টির অগোচর occult। ব্যক্তির 'প্রারব্ধের' গোড়ায় রয়েছে যে নিগূঢ় শক্তির প্রবর্ত্তনা (ন্যা)।

অন্বয়তাদাত্ম্য—দুয়ের নিঃশেষ একাত্মতা।

অদ্বৈত-বাসিত—অদ্বৈতের ভাবনা জড়িয়ে আছে যার সঙ্গে। -সম্পুট—দুয়ে মিশে এক হয়ে আছে যে-আধারে। -হানি—'এক ছাড়া দুই নাই' প্রমাণ করতে গিয়ে সেই দুইকেই মেনে নেওয়া, অদ্বৈতভাব হতে বিচ্যুতি।

অধর্ম্য—ধর্মবোধের এলাকার নীচে কি বাইরে।

অধিক্ষিপ্ত—উপর হতে চাপানো।

অধিদৈবত—যে-দিব্যচেতনা অধিষ্ঠানরূপে সবাইকে ধরে আছে over-soul (স্মৃ)।

অধিপুরুষ—যে-দিব্যচেতনার অধিষ্ঠানবশত ব্যক্তি-চেতনা ও বিশ্বচেতনার স্ফুরণ হচ্ছে।

অধিবাস—অধিকার, পরিব্যাপ্তি, অধিষ্ঠান-রূপে আধারের সর্বত্র ছেয়ে থাকা।... বিণ. -বাসিত।

অধিভূত—বহির্জগৎ সম্পর্কিত (শ্রু)।

অধিরূঢ়—বিশিষ্ট ঊর্ধ্বভূমিতে পৌঁছেছে যা। (বৈ)।

অধিষ্ঠান—মূলাধার substratum; আশ্রিত বস্তুকে আবিষ্ট করে আছে যে সত্তা বা তত্ত্ব। আবেশ। -ধাতু—মূল আশ্রয় ও উপাদান।

অধ্যক্ষ—উপর থেকে সব দেখছেন যিনি।

অধ্যাত্মচেতা—আত্মবোধকে আশ্রয় করে অন্তর্মুখ হয়ে আছে যার চেতনা (স্মৃ)।

অধ্যারোপ—বাস্তবের 'পরে অবাস্তবকে চাপিয়ে দেওয়া (যেমন, দড়িতে সাপ দেখার বেলায়) imposition (বে)।

অধ্যাস—বিভিন্নধর্মী দুটি বস্তুর মধ্যে অভেদভাবের অরোপ; অবিবেক absorption, identification। আরোপ imposition। (বে)

অধ্বরগতি—অকুটিল পথে চলা (শ্রু)।

অননুগত—খাপছাড়া।

অনন্তসমাপত্তি—(দেহবোধের) ব্যাপ্তিবশত অনন্তে ছড়িয়ে পড়া (সা)।

অনন্যচেতন—নিজের ছাড়া আর-কিছুরই বোধ নাই যার।

অনন্যাশ্রয়—আর-কিছুর উপর নির্ভর নাই যার, স্ব-তন্ত্র।

অনবচ্ছিন্ন—যার কোনও সীমা বা বিশেষণ নাই unlimited, unqualified।

অনর্থ—মানুষের ইষ্ট বা প্রার্থিত নয় যা, অশুভ, অশিব evil।

অনর্পিতচর—পূর্বে যার অবতারণা করা হয়নি (বৈ)।

অনাত্মপ্রত্যয়—নিজের বাইরের বস্তুর জ্ঞান।

অনাদিস্থিত—এর আগে ধরবার-ছোঁবার কিছু নাই বলে বুদ্ধির খেই হারিয়ে যায় যেখানে।

অনাবৃত্তি—(এ-জগতে) আর ফিরে না আসা (বে)।

অনিয়ত—নিয়মের বাইরে, আকস্মিক।
অনিরুক্ত—কোনও বিশেষ ধর্ম বা লক্ষণ দিয়ে বিশেষিত হয়নি যা indeterminate। বিবৃতি বা ব্যাখ্যার অতীত।...বি. অনিরুক্তি। (শ্রু)।
অনির্দেশ্য—যার কোনও লক্ষণ বা বিশিষ্ট ধর্মের উল্লেখ করা যায় না indeterminable (শ্রু)।
অনির্বাচ্য—কোনও বিশেষ ধর্ম বা লক্ষণ দিয়ে বিশেষিত করা যায় না যাকে indeterminable। যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না।
অনীশ, অনীশ্বর—স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই যার (শ্রু)।
অনুকল্প—প্রতিনিধি।
অনুকূল-তর্ক—যে-বিচারের ফলে উপস্থাপিত সিদ্ধান্তের যুক্তিযুক্ততা পরিস্ফুট হয় (ন্যা)। -বেদনীয়—অনুভবধারার অনুকূল [যেমন, সুখ] positive to experience।
অনুগত—সঙ্গে গাঁথা, অনুস্যূত।
অনুগ্রহ—আনুকূল্য aid: পোষণ। .কর্তৃ. অনুগ্রাহক।
অনুচ্ছিষ্ট—মুখে বলা যায় না যার কথা incommunicable।
অনুত্তর—সবাইকে ছাড়িয়ে আছেন যিনি, যাঁর পরে আর কিছুই নাই Transcendent Reality (শৈ)।
অনুধ্যান—অবিচ্ছেদ ভাবনা।
অনুপযোগ—না খাটা, অসমঞ্জস হওয়া।
অনুপহিত—'উপাধি' বা কোনও বিশেষক ধর্মের আরোপ নাই যার মধ্যে; শুদ্ধ unconditional। অসঙ্কুচিত।
অনুপাখ্য—সর্ববিধ প্রমাণের অগোচর; অনির্বচনীয়।
অনুবিধান—অনুকূল ব্যবস্থা; অনুমোদন, সায়।
অনুবৃত্তি—জের টানা; ধারাবাহিকতা, জের continuity।
অনুবেধ—অনুপ্রবেশ penetration।...বিণ. -বিদ্ধ।
অনুব্যবসায়—বিষয়জ্ঞানের বেলায় 'আমি জানছি' এই আকারে জ্ঞানেরও জ্ঞান, বোধের অন্তর্মুখীনতাহেতু বোদ্ধারও বোধ (ন্যা)।
অনুব্যাকৃতি—অব্যাকৃতের 'ব্যাকৃত' বিভূতি হতে উৎপন্ন, ব্যাকৃতির আবার ব্যাকৃতি products of determinates।
অনুভব—বোধ বা জ্ঞানের অর্জন ও ধারণ, অভিজ্ঞতা experience। -সন্তান অনুভবের পরম্পরা বা ধারা flow of experience।
অনুভা—বিচ্ছুরিত আত্মদীপ্তি (শ্রু)।
অনুভাব—আকারে-ইঙ্গিতে চিত্তগত ভাবের বাইরে অভিব্যক্তি। ভাবের মহিমা-ব্যঞ্জক অভিব্যক্তি majesty। অন্তর্নিহিত ভাবের বিচ্ছুরণ; প্রভাব।
অনুমন্তা—প্রকৃতির কর্মে সায় আছে যে-পুরুষের (স্মৃ)। -মত—সমর্থিত, আশ্রিত।...ভাব. -মতি।
অনুশয়—চিত্তের পর্বার্জিত গভীর সংস্কার (সা)।
অনুষঙ্গ—একটার সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটা কিছুর হওয়া বা চলা, সহচরিত বৃত্তি বা ব্যাপার; সম্বন্ধ association।
অনুসিদ্ধান্ত—মূল সিদ্ধান্ত হতে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে এমন আর-একটি সিদ্ধান্ত corollary।
অনুস্রবণ—ধীরে-ধীরে চুঁইয়ে পড়া percolation।
অনৃত—ছন্দোময় শাশ্বতবিধানের অভাব বা ব্যতিক্রম disorder, wrong order (শ্রু)। -চেতনা—যে-চেতনা জীবন ও জগতের ছন্দকে উলটো বা এলোমেলো করে বোঝে। -শংসী—মিথ্যাকেই ব্যবহারে প্রকাশ করে যে (শ্রু)।
অনেকান্তবাদ—'কোনও-কিছুর তত্ত্বনিরূপণের বেলায় একপেশে একটা সিদ্ধান্তকেই একান্তভাবে আঁকড়ে থাকা উচিত নয়' এই মতবাদ (জৈ)।
অন্ত—কোনও-একটা বিশেষ দিক হতে যা চরম (জৈ)। সীমা।
অন্তঃ-পরিণাম—ভিতরের দিকে গুটিয়ে আসা involution। -প্রাণ—আধারের গভীরে নিহিত প্রাণসত্তা inner vital। -সংজ্ঞ—বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও ভিতরে-ভিতরে সংজ্ঞা বা বোধ আছে যার (স্মৃ)। -সংজ্ঞা—ভিতরে-ভিতরে বোধ, গভীরের চেতনা। -সংগত—ভিতরে-ভিতরে যোগাযোগ আছে যাদের co-ordinated।

অন্তরঙ্গ—ভিতরে-ভিতরে নিবিড়ভাবে সম্বন্ধ। -ভাবনা—চিত্তের যে-ব্যাপারে চিত্ত-ধর্মকে চিত্ত হতে প্রায় আলাদা করা যায় না [যেমন, ক্রোধময় চিত্তের বেলায়]।
অন্তরাধার—আধারের ভিতরের দিক, আন্তর সত্তা। inner being।
অন্তরা-প্রবন্ধ—মাঝখান থেকে জেগে-ওঠা।
অন্তরাবৃত্ত—ভিতরের দিকে মোড় ফেরানো যাঁর শ্রু)। ভাব. -বৃত্তি।
অন্তরাভব— মৃত্যু ও জন্মান্তরের মাঝে (স্মৃ)।
অন্তরাস্থিত—মাঝখানে রয়েছে যা।
অন্তর্দশা—ভাবসমাধির চরম ভূমি যা সব-কিছু ভুলিয়ে দেয় (বৈ); আপনভাবে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আসা যাতে নিজেকে বাইরে বিচ্ছুরিত করা সম্ভব হয়। চেতনার গভীরতম ভূমি।
অন্তর্-বৃত্ত—ভিতরে-ভিতরে কাজ চলে যার। -বৃত্তি—(চেতনার) আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া। -ব্যাপ্ত—ভিতরে-ভিতরে ছড়িয়ে পড়া। -ভাব--ভিতরে থাকা inclusion। -ভাবনা—ভিতরে রাখা।...বিণ. -ভাবিত।
অন্তর্যামিত্ব—অন্তরে আবিষ্ট থেকে নিয়-ন্ত্রিত করবার সামর্থ্য (শ্রু)।
অন্তশ্চিন্তিত—ভাবনার দ্বারা ভিতরে গড়ে তোলা হয়েছে যাকে (বৈ)। -স্বাভীষ্ট—নিজের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী এমনি করে গড়া হয়েছে যাকে (বৈ)।
অন্তশ্চেতনা—গভীরের অনুভব; ভিতরে-ভিতরে নিজের সম্পর্কে সুস্পষ্ট বোধ।
অন্ধতামিস্র—মোহাচ্ছন্নতার চরম ঘনিমা—অবস্থান্তরের কল্পনাও যেখানে আসে না inertia, swoon of concentration (সা)।
অন্নময়—অন্ন বা জড় যার উপাদান material (শ্রু)।
অন্যথাকার—অন্যরকম আকার দেওয়া।
অন্যথা-খ্যাতি—একে আর বলে ভুল জানা (ন্যা)। -গ্রহণ—ভুল বোঝা।
অন্য-ব্যাবর্তক—নিজের কাছ থেকে অপরকে আলাদা করে দেয় যে। -ব্যাবৃত্ত—অপর থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছে যে।...ভাব. -ব্যাবৃত্তি।
অন্যোন্যপরিণাম—একের অপরে রূপান্তরিত হওয়া। -প্রতিষেধ—পরস্পর কাটাকাটি হয়ে যাওয়া mutual cancellation। -বিপরিণাম—একের ধর্মে অপরের বদল। -ব্যঞ্জনা—একের পানে অপরের ইশারা, পরস্পর পরস্পরকে ফুটিয়ে তোলা। -ব্যাবৃত্ত—পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন mutually exclusive, contradictory।... ভাব. -ব্যাবৃত্তি। -ভেদ—পরস্পরের নিঃসম্পর্কতা। -ভাব, -ভাবনা—একের মধ্যে অপরের ভাবের বা সত্তার অনুপ্রবেশ mutual inclusion। -সংবিৎ—একের সম্পর্কে অপরের সহজ সচেতনতা mutual awareness। -সংসৃষ্ট—পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ interrelated। -সঙ্গম —পরস্পরের সঙ্গে সম্মিশ্রণ।...বিণ. সঙ্গত। -সন্নিকর্ষ—পরস্পরের যোগা-যোগ mutual contract। -সমবেত —স্বভাবের যোগে পরস্পর নিত্যসম্বন্ধ mutually inherent। -সম্ভাবন —পরস্পরের আপ্যায়ন (স্মৃ)।
অন্যোন্যাপেক্ষা— একের 'পরে অপরের নির্ভর interdependence।
অন্যোন্যাভাব—পরস্পরের একান্ত নিঃ-সম্পর্কতা (ন্যা)।
অন্যোন্যাসঙ্গ—পরস্পরের জড়াজড়ি বা সম্মিশ্রণ।
অন্বর্থক—অর্থের সঙ্গে নামের মিল আছে যেখানে।
অপবর্গ—প্রকৃতি হতে পুরুষের আলাদা হয়ে যাওয়া, মুক্তি (সা)।
অপর—'পরের' বিপরীত, নীচেকার। জীব-তত্ত্ব (শৈ)। -ব্রহ্মলোক—নিখিল দেব-শক্তির স্ফুরণরূপে পরব্রহ্মের বিভূতির প্রকাশ যে-লোকে Pantheon।
অপরামৃষ্ট—ছোঁয়াচের বাইরে, সম্পর্ক-শূন্য।
অপরার্ধ—(অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার) নীচের অর্ধেক।
অপরিগ্রহ—একান্ত প্রয়োজনীয় ছাড়া আর-কোনও ভোগ্যবস্তু গ্রহণ না করা (সা)।
অপরিণামী—পরিণাম বা অবস্থান্তর হয় না যার immutable (সা)।...বি. -ণাম।
অপরিচ্ছিন্ন—পরিচ্ছেদ বা সীমার ঘের নাই যার।
অপরোক্ষ-বৃত্তি—কোনও-কিছুকে মধ্যস্থ না রেখে সোজাসুজি সক্রিয় হওয়া।

-সংবিৎ—মাঝখানে ইন্দ্রিয়ব্যাপারের অপেক্ষা না রেখে সোজাসুজি সবকিছু জানা। -সন্নিকর্ষ—মাঝখানে কিছু না রেখে সোজাসুজি বিষয় এবং বিষয়ীর যোগাযোগ direct contact।

অপরোক্ষানুভব,-ভূতি—তত্ত্বের সাক্ষাৎকার—যেখানে আর-কিছুর মধ্যস্থতা নাই; চিত্তের প্রলয় ঘটিয়ে তত্ত্বকে জানা (বে)।

অপহতপাপ্মা—পাপের সংস্পর্শশূন্য, নিষ্পাপ (শ্রু)।

অপুরুষবিধ—বিশিষ্ট পুরুষের মত নয় যা, পুরুষ কিংবা পৌরুষেয় বলে ভাবা যায় না যাকে impersonal।

অপুরুষীয়—পুরুষের ধর্ম বা ক্রিয়া নাই যার মধ্যে impersonal।

অপৃক্ত—পরস্পর সম্পর্কহীন, একা-একা।

অপেরণ—ঠিক পথ ছেড়ে ভুল পথে চলা aberration।

অপ্রকেত—অস্পষ্ট, আচ্ছন্ন (শ্রু)।

অপ্রতর্ক্য—তর্কবুদ্ধির অতীত।

অপ্রমা—অযথার্থ অনুভব, ভুল করে জানা।

অপ্রমেয়—মাপের বাইরে যা। যা সাধারণ জ্ঞানের বাইরে।

অপ্রযুক্তত্ব—অপপ্রয়োগ।

অবকর্ষ—নীচমুখী টান।

অবকাশভূমি—(নিজের সত্তাকে) ছড়িয়ে দেওয়া যায় যার মধ্যে existence-field।

অবক্ষয়—ক্ষীণ হয়ে ঝিমিয়ে পড়া।

অবক্ষেপ—উপর হতে নেমে এসে নীচে জমা হওয়া [তলানির মত] precipitation।

অবগ্রহ—আটকে রাখা; স্তম্ভিত ভাব।

অবর্চিত—সাধারণ চেতনার নীচের স্তর, অবচেতনা subconscience।

অবচিন্ময়—চিন্ময়ভূমির নীচে অবস্থিত infra-spiritual।

অবচ্ছিন্ন—সীমিত, বিশেষিত limited, conditioned।... ভাব, অবচ্ছেদ।

অবতারী—সমস্ত অবতারের উৎসরূপী 'দিব্য-পুরুষ' (বৈ)।

অবদান—নির্মলতা, স্বচ্ছলতা taintlessness (বৌ)।

অবভাস—মৌলিক তত্ত্বের কোনও বিভূতি বা বিশিষ্ট রূপের আপাতদৃষ্ট স্ফুরণ (বে)।...বিণ, -ভাসিত।

অবম—সর্বনিম্ন (শ্রু)।

অবমানস—মনোভূমির নীচে যা submental।

অবয়ব—অংশ; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অনুমান-বাক্যের (syllogism) অংশবিশেষ steps of reasoning (ন্যা)।

অবয়বী—অনেক অবয়ব বা অংশ জুড়ে-জুড়ে গড়া হয়েছে যাকে aggregate (ন্যা)।

অবর—অধস্তন, নীচেকার (শ্রু)। -ভাগীয়—নীচের অংশের। -সৃষ্টি—বিশ্ব-প্রপঞ্চ—যা ব্রহ্মের অধস্তন ভাগ মাত্র।

অবরোহ—নীচে নামা। -ক্রম—ধাপে-ধাপে নীচে নামা; সামান্য বা সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে যাওয়া। -ন্যায়—সামান্য হতে বিশেষের অনুমান deduction।

অবষ্টম্ভ—নিজের আয়ত্ত বস্তুতে আত্ম-শক্তির আবেশন বা সঞ্চার।..বিণ অবষ্টব্ধ। (স্মৃ)।

অবসর্পণ—নীচের দিকে নেমে আসা। -সর্পিণী—(প্রকৃতির) যে ধারা নীচের দিকে নেমে আসছে (জৈ)।

অবস্তু-সৎ—বস্তুত না থাকলেও আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে যা unreal-real।

অবাঙ্মুখ—নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে যা।

অবান্তর—প্রধান ব্যাপারের অন্তর্গত, মধ্য-বর্তী intermediate (ন্যা)। গৌণ secondary, subordinate। -ব্যাপার—চরম পরিণামে পেঁছবার আগে মাঝ-খানে যা-কিছু ঘটে intermediate function (ন্যা)।

অবিকল্প, -কল্পিত—রূপের কি ভঙ্গির বদল নাই যেখানে, অব্যাহত nonvarying, absolute।...ভাব, -কল্পতা।

অবিকৃত-পরিণাম—স্বরূপের বিকার বা ন্যূনতা না ঘটিয়েও বিচিত্র ও সত্যরূপে রূপায়িত হওয়া [যেমন, সত্য জগৎ-রূপে ব্রহ্মের পরিণাম] (বৈ)।

অবিচ্ছেদ-প্রবৃত্তি, বৃত্তিতা—একটানা ব্যাপার বা চলন continuity, persistence।

অবিদ্যা-তামস—অজ্ঞানের ঘনীভূত অবস্থা Nescience। -শবল, -শবলিত—

অবিদ্যার ছোপ পড়েছে যার 'পরে।

অবিনাভাব—একের অপরকে ছেড়ে না থাকা, নিত্য-যোগ।......বিণ. -ভূত।

অবিপ্লুত—অব্যাহত, অবাধিত।

অবিবেক—একাত্মতার ভাবনা বা আরোপ identification (সা)। একাকার বোধ। অভেদভাব।...বিণ. অবিবিক্ত—বিজড়িত, একাকার।

অবিভাগ-প্রত্যয়—'সবার সঙ্গে সবার যোগ আছে, কেউ আলাদা হয়ে নাই' এই বোধ (স্মৃ)।

অবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্ত—যার মাঝে ভেজাল আছে, যার ক্ষয় আছে, যাকে নিয়ে রেষারেষি আছে (সা)।

অব্যক্ত—যার নিগূঢ় সত্তা কোনও বিশিষ্ট রূপে এখনও ফুটে ওঠেনি unmanifest (সা)। -প্রকৃতি—বিশিষ্টরূপে অভিব্যক্ত না হয়েও যা সবার উপাদান generic indeterminate।

অব্যপদেশ্য—অবর্ণনীয় (শ্রু)।

অব্যবসিত—অনিশ্চিত (স্মৃ)।

অব্যবহার্য—যার সঙ্গে ব্যাবহারিক জগতের সম্বন্ধ ঘটানো যায় না free from relation (শ্রু)।

অব্যভিচরিত, -চারী—ব্যতিক্রমশূন্য; নিত্য-যুক্ত।

অব্যয়াত্মা—ব্যয় বা বিনাশ নাই যে আত্মা-সত্তার (স্মৃ)।

অব্যাকৃত—বিশিষ্ট আকারে কি রূপে রূপায়িত নয় বলে যার মধ্যে ধর্মের ভেদ বা নিরূপণ সম্ভব হয় না indeterminate, indiscriminate; বিশ্বের এমনিতর মূল উপাদান (শ্রু)। অব্যাখ্যাত unexplained (বৌ)। -সামান্য—যা 'অব্যাকৃত' অথচ সর্বসাধারণ generic indeterminate। ...বি. -তি—বিশেষ-কোনও আকারের বোধ কল্পনা বা স্ফুরণ সম্ভব নয় যেখানে।

অব্যূঢ়—কাজের উপযোগী করে যথাযথ অঙ্গবিন্যাস হয়নি যার unorganised।

অভঙ্গ—সমস্ত অংশ বা বিভূতির সমাহারে পূর্ণ এবং নিটোল integral। -ভাবনা —অভঙ্গরূপে ফুটিয়ে তোলা integration।

অভাবপ্রত্যয়—ভাববস্তু হতে চিত্তকে সরিয়ে নেওয়ার ফলে সর্বশূন্যতার বোধ [যেমন, সুষুপ্তিতে] (সা)।

অভিজ্ঞা—অলৌকিক উপায়ে সূক্ষ্মতত্ত্বের জ্ঞান (বৌ)।

অভিনিবেশ—একান্তভাবে অনুপ্রবেশ। একটা কিছুর প্রতি একাগ্র অভিমুখীনতা। আত্মহারা তন্ময়তা। চিত্তের মূঢ় দুরাগ্রহ বা তন্ময়তা; ভূত-স্থিতিকে (*status quo*) আঁকড়ে থাকবার অন্ধ প্রবণতা যার ফলে জীবের মধ্যে দেখা দেয় আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এবং মরণভয় (সা)। 'ঐকান্তিক অভিনিবেশ'—আর সব কিছু ছেড়ে শুধু একটা দিকে ঝোঁক exclusive concentration।

অভিন্ননিমিত্তোপাদন—সৃষ্টির প্রবর্তক ব্রহ্ম আর তার উপাদানরূপিণী শক্তিতে ভেদ নাই যেখানে (বৈ)।

অভিব্যঞ্জনা—নিজেকে দিকে-দিকে ফুটিয়ে তোলা; বিচ্ছুরণ।

অভিমান—নিজের 'পরে একটা-কিছুকে টেনে আনা বা আরোপ করা, (ভুল) ধারণা (সা)।

অভিষঙ্গী—বিষয়ে আসক্ত (শ্রু)।

অভীদ্ধ—প্রজ্বলিত (শ্রু)।

অভীপ্সা—একটা কিছুকে পাবার জন্যে চিত্তের একাগ্র বেগ aspiration (শ্রু)।

অভ্যুদয়—জীবনসাধনায় সিদ্ধি (ন্যা)। সমুত্থান।

অভ্যুপগম—কোনও সিদ্ধান্তকে ধরে নেওয়া বা মেনে নেওয়া assumption, postulate।

অমনীভাব—চেতনার যে-ভূমিতে প্রাকৃত-মনের ক্রিয়া স্তব্ধ, মনোলয়ের অবস্থা। (বে)।

অমানব—পুরুষের ধর্ম বা ব্যক্তিত্ব নাই যার impersonal (শ্রু)।

অমুত্র—ওখানে, লোকান্তরে।

অমূল ভ্রম—ইন্দ্রিয়বোধের ভিত্তি ছাড়াই শূন্যে-শূন্যে যে-ভুল, কুহক hallucination।

অমেধ্য—অপবিত্র (শ্রু)।

অযথাস্থিতি—এলোমেলো হয়ে অবস্থান, বিশৃঙ্খল ব্যাপার।

অযুতসিদ্ধি—একটিকে ছেড়ে আর-একটির কোনমতেই থাকতে না পারা, নিত্য-যোগ inseparable coherence (ন্যা)।

অরূপধাতু—শুদ্ধতত্ত্বময় উপাদান যা বিশিষ্ট রূপায়ণের অপেক্ষা রাখে না।

অর্থ-ক্রিয়া—অর্থ বা প্রয়োজনকে লক্ষ্য করে চলছে যে ক্রিয়া বা ব্যাপার; ব্যাবহারিক কার্যকারিতা। -ক্রিয়াকারিতা—কোনও প্রয়োজনকে লক্ষ্য করে কাজ করবার স্বভাব বা সামর্থ্য (বৌ); ব্যাবহারিক জগতের উদ্দেশ্যসিদ্ধিমূলক ব্যাপার।...কর্তৃ. -কারী। -ব্যাপাশ্রয়—কোনওকিছুর 'পরে নির্ভর (স্মৃ)। -ব্যাপ্তি—যে-শব্দে যতটুকু বোঝায় connotation।

অর্থাপত্তি—কোনও ঘটনার অসংগতি নিবারণের জন্য একটা-কিছুর কল্পনা presumption (মী)।

অর্ণবৎ—ঢেউএর দোলা আছে যাতে (শ্রু)।

অর্বুদ—আব tumour।

অলক্ষণ—যার কোনও লক্ষণ বা পরিচায়ক ধর্মের উল্লেখ করা সম্ভব নয় indefinable, featureless (শ্রু)।

অলিংগ—বাইরের কোনও নিশানা নাই যার (সা)।

অলীক—অমূলক অতএব মিথ্যা (বে)।

অলৌকিক-সন্নিকর্ষ—বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে অতীন্দ্রিয় উপায়ে যোগাযোগ (ন্যা)।

অশক্ত—শক্তির ক্রিয়া নাই যার মধ্যে, নিস্পন্দ।

অশব্দযোগ—নৈঃশব্দ্যের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে চিত্তের মুক্তি (বে)।

অসংসৃষ্ট—নিঃসম্পর্ক।

অসংস্থিত—যথাযথ অংগবিন্যাসহেতু দানা বাঁধেনি যা unorganised।

অসংহত—দ্র. অসংস্থিত।

অসংকীর্ণ—বিভিন্ন ধর্মের মিশ্রণশূন্য, সাংকর্যহীন, পরিশুদ্ধ (সা); আলাদা-আলাদা।

অসপত্ন—প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, একচ্ছত্র।

অসমুচ্চয়—পৃথক্-পৃথক্ করে দেখা, একসংগে জড়িয়ে না নেওয়া (বে)।

অসমোর্ধ্ব—যার সমান বা যার উপরে কিছুই নাই; রহস্যার্থ—লোকোত্তর অনুভবের পথে চেতনার ক্রমিক অভিযান যাতে (বৈ)।

অসম্পৃক্ত—কারও সংগে সম্বন্ধ নাই যার।

অ-সম্ভব—সৃষ্টির স্পন্দন নাই যাঁর মধ্যে।

অসম্ভাবনা—কোনও তত্ত্ব বা মতের যুক্তিযুক্ত না হবার আশংকা (বে)।

অসম্ভূতি—সম্ভূতিরও ওপারে—কোনও ভাবের স্পন্দন নাই যেখানে, 'নেতি নেতি'র চরম অবস্থা non-being। সৃষ্টি-ব্যাপার স্তম্ভিত যেখানে। (শ্রু)

অসাম—সৌষম্যের অভাব, বেসুর discord (শ্রু)।

অস্তিপ্রত্যয়—'আছে' বা 'আছি' এই অনুভব।

অস্নাবির—স্নায়ু বা অংগ-প্রত্যংগের বন্ধন-রজ্জু নাই যার মধ্যে (শ্রু)।

অস্পর্শযোগ—জগতের ছোঁয়া থাকে না যে-যোগে, চিত্তের প্রলয়ে জগৎজ্ঞানও লোপ পায় যেখানে (বে)।

অহংশবলিত—অহংএর ছোপ লেগেছে যার মধ্যে।

আ

আকৃতি—আকার, রূপ। জাতি বা বর্গের পরিচয় হয় যে-রূপের দ্বারা type। আ-কৃতি—রূপায়ণ, বিগ্রহ form। -পরিণাম—ক্রমবিকাশে ধারায় রূপের বদল; (মূল প্রকৃতির) বিভিন্ন আকারের পরম্পরায় অভিব্যক্তি।

আক্ষেপ—দোষারোপ।

আচ্ছিন্ন—(বাস্তব হতে) আলাদা-করে-নেওয়া abstract। ছেঁটে-নেওয়া।

আজীব—জীবিকার ব্যবস্থা (বৌ)।

আজ্ঞা-বহা—ভিতরের প্রেরণাকে যা বাইরের দিকে নিয়ে যায় efferent (শা)। -সিদ্ধ—নির্বিবাদে ফলপ্রসূ।

আত্তীকরণ—জীর্ণ করে অংগীভূত করা assimilation।

আত্ম-অসূয়া—নিজের সম্পর্কে অকারণ খুঁতখুঁতি। গর্হণ—নিজেকে নিজের কাছে খাটো করা। -তাদাত্ম্য—(বিষয়ী নিজেকেই নিজের বিষয় করাতে) নিজের সংগে নিজের একত্ব অনুভব self-identity। -ধৃতি—নিজেকে অটুটভাবে ধরে থাকা। -নিগূহন—নিজেকে গোপন রাখা বা গুটিয়ে নেওয়া। -নিবিষ্ট—নিজের মধ্যে গুটিয়ে আছে যে। -নিরূঢ়ি—নিজের গভীরে

অচল হয়ে থাকা। -পরিচ্ছেদ—নিজেকে সীমিত করা self-limitation। -প্রতিষেধ—নিজেই নিজের স্বরূপকে নিরাকৃত করা self-contradiction। -প্রত্যভিজ্ঞা—নিজেকে আবার চিনতে পারা। -প্রত্যয়—নিজেকে কেন্দ্র করে অনুভবের পরম্পরা। -প্রসর্পণ—নিজেকে কোনও-কিছুর 'পরে ছড়িয়ে দেওয়া self-projection। -বিপরিণাম—নানা-ধরনে নিজের অবস্থান্তর self-modification। -বিভাবনা—নিজেকে বিশিষ্ট বা বিচিত্র রূপে ফুটিয়ে তোলা —যাতে সত্তার সংকোচ বা শক্তির উল্লাস দুয়েরই পরিচয় মেলে।...বিণ. -বিভাবনী। -বিভূতি—অব্যক্ত হতে ব্যক্তরূপে নিজেকে স্ফুরিত করা হয় যাতে self-expression; এমনিতর স্ফুরণ। -বিমর্শ—দ্র. স্ববিমর্শ। -বিশেষণ—নিজেকে বিশিষ্ট আকারে সীমিত করা self-determination।

-বিসৃষ্টি—বিচিত্র রূপায়ণে নিজেকে নির্ঝরিত করা. -বুভূষা—নিজেকে রূপে ফোটাবার ইচ্ছা। -ব্যাকৃতি—বিশেষ-কোনও ভঙ্গিতে নিজেকে বিশেষিত করা। -ব্যূহ—বিভিন্ন শক্তির সংকলনে রচিত আত্মসত্ত্ব organised self। -ভাব—আত্মার রূপে সত্তার প্রকাশ; আত্মসত্তার বোধ এবং সেই বোধের ধারাবাহিকতা। স্ব-ভাব। আত্মত্বের আপাতিক অতএব মিথ্যা-প্রতীতি (বৌ)। -ভাবনা—স্বরূপের বোধ। -রতি—নিজেকে ভালবাসা; নিজের দিকে ঝোঁক; নিজের সুখ খোঁজা hedonism। আত্মস্বরূপ আস্বাদনের আনন্দ; এমনিতর আনন্দ আছে যার (শ্রু)। -রূপায়ণ—নিজেকে রূপে ফুটিয়ে তোলা self-formulation। -লাভ—ব্যক্তিসত্তা নিয়ে ফুটে ওঠা coming into being।

স্ফুরণ। -সংবিৎ—স্বরূপের স্বচ্ছ ও সম্যক অনুভব।...ভাব. -বিত্তি। -সংহরণ—নিজেকে গুটিয়ে আনা। সদ্ভাব—নিজের সত্তাকে বজায় রাখা; আত্ম-সত্তার অক্ষুণ্ণ স্থিতি। -সমাধান—নিজের মাঝে নিজেকে তলিয়ে দেওয়া। -সম্ভূতি—বৈচিত্র্যের সমাহারে পর্বে-পর্বে নিজেকে বিকশিত করা self-becoming। -হা—নিজেকে বিনষ্ট করে যে, আত্মঘাতী (শ্রু)। -সারূপ্য—ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে নিজেকে একরূপ বলে অনুভব করা।

আত্যন্তিক—নির্বিশেষ, পরম absolute। -নিরোধ—নিঃশেষে প্রলয় ঘটানো annihilation।

আদি-ক্ষান্ত—অ' হতে শুরু করে 'ক্ষ'তে যার শেষ [দ্র. 'অক্ষমালা'] (শা)।

আদিব্যূহ—প্রথম সংকলন।

আদেশ—অলৌকিক সূচনা বা ইঙ্গিত (শ্রু)।

আধার-চেতনা, -চৈতন্য—সমস্ত অনুভবের মূলে থেকে তাকে ধরে আছে যে-চিৎ-শক্তি। -পুরুষ—সমগ্র প্রকৃতিকে ধারণ করে আছেন যে-পুরুষ। -শক্তি—প্রতি ব্যক্তিতে প্রাকৃতশক্তির পুঁজি force in one's being। -সত্ত্ব—আধারের মৌল উপাদান।

আধিদৈবিক—বিশ্বমূল চিন্ময়-জগতের 'পরে নির্ভর যার (শ্রু)।

আধিভৌতিক—ভূতসত্তা বা বহির্জগতের 'পরে নির্ভর যার (শ্রু)।

আধ্যাত্মিক—আত্মসত্তার 'পরে নির্ভর যার (শ্রু)।

আনুরূপ্য—ধ্বনের মিল।

আন্বীক্ষিকী—ন্যায়বিদ্যা logic।

আপূরণ—কমতিকে ভরে তোলা complementation (সা)।

আপ্ত-কাম—নিজের মধ্যেই নিজে পূর্ণ বলে কাম্যবস্তুকে বাইরে খুঁজতে হয় না যার (শ্রু)। -প্রামাণ্য—কোনও ধর্মের প্রবর্তক পুরুষ বা শাস্ত্রের বাণীকে প্রামাণিক বলে মেনে নেওয়া।

আবিঃ—প্রকাশ (শ্রু)।

আ-বৃত—চারদিক দিয়ে ঘেরা; আবিষ্ট (শ্রু)।

আবৃত্তি—ফিরে-ফিরে আসা, পৌনঃপুনিকতা। -নিত্যতা—অনন্তকাল ধরে ফিরে-ফিরে আসা।

আ-ভাস—তাত্ত্বিক বিচ্ছুরণ [যেমন, দীপশিখা হতে আলোর] emanation; কোনও মূলতত্ত্বের সত্য রূপায়ণ figuration (শা)। আভাস—অতাত্ত্বিক প্রতিবিম্ব (বে); অস্ফুট প্রকাশ। -আত্মা—

আত্মারূপে প্রতীয়মান সত্তা—আত্মার স্বরূপ না হলেও আত্মা বলে ভুল করা হয় যাকে phenomenal self। -চেতনা—প্রতিবিম্বিত (অতএব অতাত্ত্বিক) অনুভব।

আমর্শ—অখণ্ড সর্বগ্রাহী জ্ঞান (শৈ)। আমর্শন—নিবিড় ও ব্যাপক স্পর্শ দিয়ে পূর্ণভাবে জানা।

আম্নায়—আধ্যাত্মিক অনুভবের প্রামাণিক বিবৃতি।

আয়তন—আধার, আশ্রয়, বাহন vehicle (শ্রু)। বিস্তার, পরিসর extension (শ্রু)। মান dimension। ঘনমান mass, volume।

আয়স্ত—আয়াসযুক্ত, যা স্বচ্ছন্দ নয়।

আয়াম—প্রসারণ; দীর্ঘ করা।

আয়ুষ্য—প্রাণশক্তির অক্ষুণ্ণতা।

আরোহ—উপরপানে ওঠা। -ক্রম—ধাপে-ধাপে উপরে ওঠা; বিশেষ হতে সামান্যের দিকে যাওয়া। -ন্যায়—বিশেষ হতে সামান্যের অনুমান induction।

আর্জব—স্বভাবের ঋজুতা সোজা পথে চলবার স্বভাব, সরলতা (স্মৃ)।

আর্যসত্য—মূলসত্য বা প্রধানতত্ত্ব—সত্যের সাধককে যা আশ্রয় করতে হবে (বৌ)।

আলম্বন—যাকে ধরে জ্ঞান হয়, প্রত্যয় বা বোধের কারণ; বিষয়। ক্রিয়ার নিমিত্ত বা আশ্রয়। ভাবের উদ্বোধক। -জগৎ—ধরে-ধরে ওঠবার বা নামবার জন্য তৈরী হয়েছে যেসব লোক।

আলয়বিজ্ঞান—চেতনার সমুদ্র যাতে ক্ষণ-স্থায়ী 'বিজ্ঞানের' পরম্পরা উঠছে ডুবছে (বৌ)।

আলোচন-মন—ইন্দ্রিয়বোধের নির্বিশেষ অস্ফুট ক্রিয়া চলছে যেখানে [যেমন বিষয়জ্ঞানের প্রথম ক্ষণটিতে] (সা)।

আশয়—কোন-কিছুর স্ফুরণের প্রাক্‌কালীন আশ্রয়, বীজভাবের আধার matrix। চিত্তভূমিতে লীন সূক্ষ্ম সংস্কার ও তার প্রবেগ (সা)।

আশ্রয়—প্রেম আছে যার মধ্যে lover (বৈ)। (তু. 'বিষয়')।

আশ্রয়াশ্রয়িভাব—একক অবলম্বন করে অপরের অবস্থান।

আসঙ্গ—যোগাযোগ association।

আসেবন—দীর্ঘকাল ধরে অভ্যাস (সা)।

আস্তিক্য—'প্রাকৃত অনুভবের ওপারেও কিছু আছে' এই শ্রদ্ধা এবং বোধ।

আস্রব—বাইরে থেকে ভিতরে আসা influx (জৈ)।

ইঙ্গনা—ইশারা; আভাস।

ইতি-কার—ভাবাত্মক ধর্মের নির্দেশ positive affirmation। -প্রত্যয়—'একটা কিছু আছে' এমনিতর ভাব-রূপে বোধ।

ইতোনাস্তিবাদী—'এ ছাড়া আর-কিছুই নাই' এই যার মত।

ইদন্তা—বিশ্বভাব, বিশ্বসত্তা (শৈ, বে)।

ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞান—ইন্দ্রিয়ের সহায়ে বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান perception। -মানস—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান আহরণ করা যে-মনের স্বভাব sense-mind। -সন্নিকর্ষ—ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যোগ sense-contact। সংবিৎ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের প্রাথমিক বোধ 'সংজ্ঞা' sensation।

ঈক্ষণ, ঈক্ষা—নিয়ন্তার ভূমি হতে দেখা, (পুরুষের) দৃষ্টি ও সংকল্প; যে-দেখাতে অন্তর্গূঢ় সংকল্প রূপ ধরে, দৃষ্টির সৃষ্টিশক্তি (শ্রু)।...কর্তৃ ঈক্ষিতা।

ঈশনা—(ঈশ্বরীয়) অকুণ্ঠ সামর্থ্য (শৈ), আধিপত্য।

ঈষৎ-বিদ্যা—পুরোপুরি না জানা—বা 'অ-বিদ্যা'র স্বভাব (বে)।

উচ্চাবচ—উঁচুনীচু; নানাধরনের।

উচ্ছিষ্ট—আনুষঙ্গিকভাবে উৎপন্ন by-product।

উচ্ছ্রয়—উপরপানে ওঠা; উচ্চতা।...বিণ. উচ্ছ্রিত।

উৎক্রম, -ক্রমণ, -ক্রান্তি—(চেতনার) ধাপে-ধাপে উপরপানে ওঠা (শ্রু); ছাড়িয়ে ওঠা।

উৎক্ষেপ—ফুটে ওঠা, বেরিয়ে আসা।

উত্তমজ্যোতি—পরাৎপর বিজ্ঞানের দীপ্তি (শ্রু)।

উত্তর—আরও উপরে আছে যা higher (শ্রু)। -জ্যোতি—লোকোত্তর বিজ্ঞা-নের দীপ্তি (শ্রু)। -পক্ষ—বিপক্ষের সমস্ত আপত্তির জবাব দিয়ে পৌঁছনো

গেছে যে-সিদ্ধান্তে [প্র. 'পূর্বপক্ষ']। -সংক্রান্তি—নীচের ভূমিকে ছাড়িয়ে উপরের ভূমিতে উঠে যাওয়া।

উত্তরায়ণ—(চেতনার) ঊর্ধ্বমুখী ক্রমিক অভিযান [মকরক্রান্তিবিন্দু হতে সূর্যের উত্তরদিকে সরে যাওয়ার মত, যার ফলে ক্রমেই দিনের আলো বাড়তে থাকে] (শ্রু)।

উত্তার—উপরের দিকে যাওয়া, প্রাকৃতভূমি হতে চেতনার ঊর্ধ্বমুখী গতি।

উৎপাদ্য—যা আপনা থেকে হয় না কিন্তু অপর-কিছু থেকে জন্মায়, 'জন্য' derivative।

উৎপ্রেক্ষা—কল্পনার বাড়াবাড়ি।

উৎপ্লবন, -প্লুতি—লাফ দিয়ে পার হয়ে যাওয়া।

উদয়নীয়—সংবৎসরব্যাপী সোমযাগের অন্ত্য-পর্ব যা অমৃতচেতনায় যাজমানের উত্তরণ ঘটায় (শ্রু)।

উদ্ঘাত—চলবার সময় জমি উঁচু-নীচু বলে ধাক্কা দেওয়া jolting।

উদ্দেশ—বিচারের জন্য বিচার্য পদার্থের উল্লেখ (ন্যা)।

উদ্ভূতবীর্য—অব্যক্তদশা হতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে-সামর্থ্য।

উন্মনী—পরাসংবিতের উপকণ্ঠে ফুটে-ওঠা দিব্য-মননের শক্তি যার মধ্যে আছে অফুরন্ত স্বাতন্ত্র্যশক্তির উল্লাস (শা)।

উন্মেষ—শক্তির বিশ্বাকারে স্ফুরণ (শা)।

উপকারক—যার দরুন কোনও ক্রিয়া তাড়াতাড়ি ফলের দিকে এগিয়ে যায়, ফলোৎপাদনের অনুকূল (মী)।

উপচয়—বৃদ্ধি, উপচে ওঠা।...বিণ. -চিত।

উপচরিত—সংক্রামিত, আরোপিত।...বি. -চার—উপকরণ। গৌণ রূপ। আরোপ।

উপদ্রষ্টা—কিছু না করেও অবন্ধ্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যে (স্মৃ)।

উপধা—সব-শেষের ঠিক আগেরটি penultimate।

উপনয়—যে-বাক্য হতে সাধ্য-ব্যাপ্য 'হেতু'র অস্তিত্ব বোঝা যায় এবং তার ফলে অনুমান সহজ হয় [যেমন, 'গ্রামে আগুন লেগেছে' অনুমান করতে গিয়ে যদি বলা হয় 'গ্রামটি ধূম (হেতু)-বিশিষ্ট—যে-ধূম আগুন (সাধ্য) ছাড়া থাকতে পারে না'; এই বাক্যটি উপনয়]।

উপমান—যার সঙ্গে তুলনা করা হয়। -মেয়—যাকে তুলনা করা হয়।

উপযোগ—কাজে খাটানো, প্রয়োগ, ব্যবহার। ...কতৃ. -যোক্তা।

উপরাগ—কাছে থেকে রং ধরানো (স্ফটিকের কাছে রঙিন ফুল থাকলে যেমন হয়), প্রতিবিম্বন, এবং তার দরুন স্বভাবের মালিন্য বা বিকার (সা)।...বিণ. -রক্ত।

উপসর্গ—তত্ত্বজ্ঞানের বিঘ্ন (সা)।

উপসৃষ্টি—আনুষঙ্গিকরূপে উৎপন্ন by-product।

উপশম—স্পন্দহীন প্রশান্তির ভাব (শ্রু)। থেমে যাওয়া, নিবৃত্তি।...বিণ. -শান্ত।

উপসংক্রমণ, -সংক্রান্তি—একটি আধার বা আশ্রয় ছেড়ে কাছের আরেকটি আধারে যাওয়া।

উপসংখ্যানভূত—ন্যূনতাপূরণের জন্য আরও-কিছু জুড়ে দেওয়া হয়েছে যাতে supplementary।

উপসংহৃতি—নাটকের আখ্যানবীজের চরম পরিণতি development of a plot।

উপস্থাপনা—সামনে এনে হাজির করা।

উপহিত—'উপাধি'র দ্বারা সীমিত; বিশেষ গুণ বা ক্রিয়ার অধীন কিংবা তার দ্বারা পরিচিত conditioned। সঙ্কুচিত।

উপাদান—গ্রহণ, স্বীকরণ। মূল উপকরণ। -কারণ—মৌলিক উপকরণ (বে)। -বিগ্রহ—সৃষ্ট্যুপকরণের ঘনীভূত আকার substance-form।

উপাদেয়—যাকে গ্রহণ করতে কোনও বাধা নাই [প্র. 'হেয়']

উপাধি—স্বরূপের সঙ্কোচসাধক অথচ পরিচায়ক ধর্ম—যা বস্তুর একটা-কোনও দিক ধরে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে limitation, determination; অগন্তুক ধর্ম accidents। (বে)

উপায়-কুশলতা—যথাযথ উপায়প্রয়োগের নৈপুণ্য, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবার সামর্থ্য tact। -কৌশল্য—কার্যোপযোগী ব্যবস্থা expedient, device (বৌ)।

উভয়তঃপাশা রজ্জু—যে-দড়ির দুদিকেই ফাঁস অর্থাৎ যে-যুক্তির মধ্যে দুটি বি-

কল্পের কোনটিকেই মানা চলে না dilemma।

'উরৌ অনিবাধে'—সেই মহাবৈপুল্যের মাঝে যেখানে কোথাও কোনও বাধা নাই (শ্রু)।

ঊর্ধ্ব-ক্রান্তি—উপরপানে উঠে যাওয়া। -পরিণাম—উৎকৃষ্টতর ধর্মের আবির্ভাব ঘটে যে-পরিণামের ফলে [যেমন, জড় হতে প্রাণ, প্রাণ হতে মন ইত্যাদি]। -পাতন—তাপ দিয়ে হালকা করে উপরে উঠিয়ে নিয়ে আবার জমাট করা sublimation।

ঋত—(বিশ্বের মূলে) সত্য এবং সুশৃঙ্খল শাশ্বত-বিধান (cosmic) order and rhythm; সত্যের ছন্দ (শ্রু) (ব্যক্তির) স্বভাবে এবং আচরণে ধর্ম ও ন্যায়ের স্ফুরণ right, morality। -চিন্ময়—ঋতের প্রদীপ্ত অনুভব ছেয়ে আছে যাকে। -চেতনা—ঋতময় অনুভব, ঋতের অনুকূল বা সত্যাশ্রয়ী চেতনা। -প্রবৃত্তি—ঋতের অনুকূল চলন বা ব্যবহার ethical conduct। -বোধ —ধর্মাধর্মের চেতনা ethical sense। ভৃৎ—ঋতের ছন্দকে ধারণ ও পোষণ করে চলেছে যা (শ্রু)। -সংবিৎ —বিশ্বমূল ঋতের ছন্দ সম্পর্কে সর্ব-সমঞ্জস পূর্ণ জ্ঞান। -স্পৃক্—সত্যকে ছুঁয়ে আছে যা (শ্রু)।

ঋতম্ভরা—ঋতকে ধারণ বা পোষণ করছে যা (সা)।

ঋতাচার—ঋতের পূর্ণচেতনার দ্বারা নিয়-ন্ত্রিত ব্যবহার।

ঋতাবরী—ঋতময়ী (শ্রু)।

ঋতায়িনী—সত্যের ছন্দে চলা যে-শক্তির স্বভাব (শ্রু)।

ঋদ্ধি—সাধনলব্ধ অলৌকিক ক্ষমতা (বৌ)। ঐশ্বর্য।

একজীববাদ—'ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, জীব ব্রহ্ম, অতএব জীবও এক এবং অদ্বিতীয়—সুতরাং বহু জীব কল্পনা-মাত্র' এই মতবাদ (বে)।

একদেশী—একপেশে। -মত—অংশত পৃথক মত।

এক-বিজ্ঞান—একটি মূলতত্ত্বকে জেনে তার সকল বৈচিত্র্যকে জানা (বে)। -রস—সব ছাপিয়ে ও সব মিলিয়ে একটি ভাবের আস্বাদন হয় যাতে; আস্বাদনের বৈচিত্র্যহীন।

একাত্ম-প্রত্যয়সার—একমাত্র আত্মসত্তার নিবিড় অনুভব ছাড়া আর-কিছুই নাই যেখানে (শ্রু)। -সার—স্বরূপত এক।

একান্ত-প্রত্যয়—শুধু একটা দিককে আঁকড়ে থাকবার ঝোঁক আছে যে-অনুভবে। -বাদ—বিশেষ কোনও-একটি সিদ্ধান্ত-কেই একমাত্র তত্ত্ব বলে ঘোষণা করা exclusive view।

একীভাব—একাকার হয়ে থাকা; এককের মাঝে লীন হয়ে থাকা।

এষণা—খোঁজা, অন্বেষণ।

এ্যানিমিজ্ম্—'সজীব-নির্জীব সমস্ত বস্তু-তেই প্রাণাত্মার আবেশ আছে' এই বিশ্বাস।

ঐকান্তিক—সব ছেড়ে শুধু একটাকে আঁকড়ে থাকা যার স্বভাব বা ধরন। 'অনুকল্প'-হীন। আর-কিছুর ঠাঁই নাই যার মধ্যে exclusive।

ঐতদাত্ম্য—'এই আত্মাই সব-কিছুর আত্ম স্বরূপ'—'আত্মাই সব' এই অনুভব (শ্রু)।

ঐশ্বরযোগ—ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তির স্ব-তন্ত্র ও স্বচ্ছন্দ বিলাস (স্মৃ)।

ওষধি—অগ্নির জ্যোতি এবং শক্তি নিগূঢ় হয়ে আছে যার মধ্যে, উদ্ভিদ (শ্রু)।

কঞ্চুক—স্বরূপের আবরণ (শৈ)।

কথঞ্চিৎ-সত্তা—কোনও-এক ধরনের অস্তিত্ব যাকে আর খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

কদর্থনা—স্বাভাবিক বৃত্তির বিকার ঘটানো। ...বিণ. কদর্থিত।

কবিক্রতু—দিব্যদর্শনের সংগে যুক্ত সৃষ্টি-সামর্থ্য বা সংকল্পশক্তি যা কখনও নিষ্ফল হয় না seer-will। (শ্রু)।

কম্বুরেখা—শাঁখের মুখের প্যাঁচানো দাগ।

করণ—ক্রিয়াসিদ্ধির প্রধান সহায় [যেমন, দর্শনক্রিয়ার 'করণ' চোখ] . instru ment। -বৃত্তি—করণের স্বাভাবিক ক্রিয়া। -শক্তি—ক্রিয়া-নিষ্পাদনের সহা-য়ক বিশেষ শক্তি instrumental power। -হীন—কোনও-কিছুর সাহায্য না নিয়ে আপনা হতে ফুটেছে যে।

কর্তৃচেতনা—কাজ করে চলেছে যে-চিৎশক্তি active consciousness।

কর্ম-কর্তৃত্ব—কর্তার নিজেরই 'পরে নিজের কর্মের পরাবর্তন বা উল্টে আসা action upon oneself। -বিপাক —বিশেষ কর্মের বিশেষ ফল ফলা (সা)। -ব্যতিহার—পরস্পরের উপর ক্রিয়া reciprocal action। -সন্তান —কর্ম বা শক্তিস্পন্দের ধারাবাহিকতা (বৌ)। -সমাধি—কর্মের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে সম্পূর্ণ তন্ময় হয়ে যাওয়া।

কর্শন—কৃশ করা, ক্ষীণ করা।...বিণ. কর্শিত।

কলনা—গতি, চলন, প্রসরণ। ক্রিয়াশক্তির স্ফুরণ (শৈ)।

কলল—ভ্রূণের আদিম অবস্থা।

কলা—কৃতিশক্তির বিশিষ্ট স্ফুরণ (শৈ)। অংশ। -বিভূতি—কৃতিশক্তির বিচিত্র ভঙ্গিতে ফোটা।

কল্প—একাধিক সম্ভাবনার মধ্যে একটি alternative। কালদ্বারা সীমিত এবং স্রষ্টার ভাবনা দ্বারা নিরূপিত সৃষ্টির বিশেষ ধারা cycle of existence, scheme of creation। যুগব্যবস্থা world-order। মনোময় ভাবনা। -বীজ—যা ঘটবে বা ঘটতে পারে তার ভাবময় সূক্ষ্মরূপ potentialities। -রূপায়ণ—মনোময় ভাবনার দ্বারা রূপায়ণ mind-formation।

কল্পন—ভাবময় সত্য রূপের সৃষ্টি; ভাবের উপাদানে রূপ গড়া (শ্রু)।

কল্পনা—মানসিক সৃষ্টি imagination। -গৌরব—নিষ্প্রয়োজন তত্ত্বের কল্পনা।

কল্পনাপোঢ়—কল্পনার ছোঁয়া নাই যার মধ্যে।

কল্পাবর্তন—চক্রগতিতে একটির পর একটি 'কল্পের' আবির্ভাব।

কাম-কলা—সৃষ্টির সংকল্প ও তার স্ফুরণ হয় যে-শক্তিতে, ব্রহ্মযোনি (শা)। -চার—আপন খুশিতে চলা (স্মৃ)।

কায়-ব্যূহ—বিচিত্র কায বা বিগ্রহের রচনা এবং স্থাপনা (ন্যা)। কায়ে বা বিগ্রহে অবয়বাদির যথাযথ বিন্যাস (সা)। বহু বিচিত্র আকারের এককালীন অলৌকিক আবির্ভাব (স্মৃ)। -সংস্থান—শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিশেষ ধরনে সাজানো। physical organisation। -সম্পৎ —শরীরের রূপ লাবণ্য বল ও বজ্রদৃঢ়তা (সা)।

কারণসামগ্রী—বিভিন্ন কারণের সমষ্টি যাদের একত্র যোগে কার্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় assemblage of conditions।

কার্মণ—কর্মসম্বন্ধীয়। -যন্ত্রবাদ—'যন্ত্রের মত কর্মের চক্র আবর্তিত হয়ে চলেছে' এই মতবাদ।

কার্যানুমেয়—ফল দেখে যার অস্তিত্ব আন্দাজ করা যায়।

কাল-কঞ্চুক—সীমিত কালের বোধদ্বারা রচিত জ্ঞানের আবরণ limitation of temporal consciousness (শৈ)। -কলনা—কালের গতি, পরম্পরা, পরিমাপ বা পরিণমন। -দৃষ্টি—কালের পবদায় ভাসতে দেখা time-vision। -বিজ্ঞান—কালের বিশেষ বোধ। -ব্যাপ্তি —কালপ্রবাহের খানিকটা অংশ; কিছু-ক্ষণ ধরে বজায় থাকা duration। -মান—কালকে মাপা যায় যা দিয়ে [যেমন, দণ্ড পল ইত্যাদি]। -মূল—কালের গতির প্রতিষ্ঠা যে-ভিত্তিতে। -সংবিৎ—কালের সামান্যবোধ time-sense। -স্থিতি—কালের জ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে যার 'পরে, কালজ্ঞানের বিশেষ ধরন।

কালাত্মা—কালের অনুভবকে আশ্রয় করে স্ফুরিত আত্মচৈতন্য। কালরূপে অভিব্যক্ত পরমতত্ত্ব (স্মৃ)।

কালাবচ্ছিন্ন—কালদ্বারা বিশেষিত বা সীমিত, কালিক temporal। -চৈতন্যবাদ —'ব্যক্তিচেতনার সত্তা শুধু বর্তমান জীবনকালের মধ্যেই সীমিত' এই মতবাদ।

কালিক-প্রবৃত্তি—কালকে আশ্রয় করে চলছে যে-ক্রিয়া temporal activity।

কালোপহিত—কাল যার 'উপাধি' বা পরি-চায়ক বিশেষণ; কালের দিক হতে দেখা হচ্ছে যাকে, কালের অধীন।

'কিংস্বিদ্'—কী একটা যেন (শ্রু)।

কিয়ামৎ—পরলোকে শেষ বিচারের দিন।

কুশলাভিগামী—কুশল বা ধর্মবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কর্ম করা স্বভাব যার (বৌ)।

কুহক—অমূল প্রত্যক্ষ hallucination।

কূটস্থ—ঘাত-প্রতিঘাতেও নির্বিকার; প্রকৃতির ব্যাপারের ঊর্ধ্বে এবং তার দ্বারা অক্ষুব্ধ (সা)। কূট-স্থ—কূট

বা সমূহের অধিষ্ঠাতা এবং ভর্তা (বৈ)।

কৃতি—কোনও-কিছু গড়ে তোলবার সামর্থ্য executive or formative power। কাজের ধারা। রচনা।

কৈবল্য—(পুরুষের) নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত অবস্থান (সা)।

কোটি—চরম, অবধি extreme। আদর্শ। থাক।

কৌম্—উপজাতি; সম্প্রদায়।

কৌষিকী—একটিমাত্র কোষকে (cell) আশ্রয় করে আছে যে।

ক্রতু—সৃষ্টির ইচ্ছা বা সামর্থ্য; সংকল্প-শক্তি will (শ্রু)।

ক্রম-বন্ধ—নিয়মিত পরম্পরা, শ্রেণীবদ্ধ বিন্যাস। -মুক্তি—এক-একটি লোক বা ভূমিতে থেমে-থেমে মুক্তির অভিযান (বে)।

ক্রমায়ণ—পরম্পরায় ফুটিয়ে তোলা।

ক্রমায়মাণ—ক্রম বা পরম্পরা ধরে চলেছে যা progressive।

ক্রান্তদর্শী—দূরদূরান্তে দৃষ্টি যার।

ক্রান্তি—ছাড়িয়ে যাওয়া; বিপ্লব।

ক্রিয়া-কারক—শক্তির ক্রিয়াকে আশ্রয় করে কর্তা কর্ম করণ প্রভৃতি নানা সম্বন্ধ (বে)। -পরিণাম—ক্রিয়াশক্তির ক্রমান্বয়ে স্ফুরণ process; শক্তির ক্রিয়াশীলতা এবং তার ফল। -বিপাক—ক্রিয়ার সার্থক পরিণাম effectivity of action। -ব্যতিহার—পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়ার বিনিময় interaction। -মুদ্রা—চালচলন এবং ভাবভঙ্গি (বৈ)।

ক্রিয়াদ্বৈত—ক্রিয়া বা ব্যবহারে ভেদ না থাকা (স্ম)।

ক্লিষ্টবৃত্তি—সংকুচিত ব্যাপার বা ক্রিয়া limited functioning।

ক্ষণ-বৃত্তিতা—ক্ষণিক অস্তিত্ব। -ভঙ্গ কালকে ক্ষণে-ক্ষণে ভাগ করে দেখা। ক্ষণে-ক্ষণে স্পন্দিত হয়ে কালের চলন। বস্তুর উৎপত্তির অব্যবহিত পরেই তার বিনাশ হেতু ক্ষণস্থায়িত্বের পরম্পরা (বৌ)। -শাশ্বতী—কালের একটি ক্ষণের মধ্যেই তার অনন্ত প্রসারের অনুভব আছে যেখানে moment eternity। -সঙ্গী—এক-একটি ক্ষণের সঙ্গে আলাদা হয়ে যুক্ত। -সন্তান—একটির পর একটি বয়ে চলেছে যে ক্ষণের ধারা (বৌ)।

ক্ষর—বিকার বা রূপান্তর ঘটে যার mutable। -ভাব—বিকাশ, ধর্মের বদল mutation (স্ম)। -সত্য—সৃষ্টির লীলা-বৈচিত্র্যে স্ফুরিত বিশ্বের সত্য dynamic reality।

ক্ষেপণ-বিন্দু—যে-বিন্দু হতে শক্তির বিচ্ছুরণ শুরু হয়।

ক্ষেপিষ্ঠ—সবচেয়ে দ্রুতগামী (শ্রু)।

খণ্ডাপ্রতিভাস—টুকরো-টুকরো হয়ে সামনে ভাসছে যা। -বৃত্তি—বিক্ষিপ্ত ক্রিয়া বা চলন; এর্মানতর চলন যার। -ভাব, -ভাবনা—জীবনকে টুকরো-টুকরো দেখা এবং সেইভাবে চলা, সমগ্রতা বোধের অভাব।

খিল—সামর্থ্যে খর্ব, কুণ্ঠিত deficient। খিলীভূত—খর্বীভূত।

গণ—একধর্মাক্রান্ত সমূহ, বর্গ, শ্রেণী।

গতি-প্রকৃতি—চলন ও স্বভাব।

গুণাভাস—গুণক্রিয়ার সত্যকার স্ফুরণ (স্ম)।

গুণীভূত—গুণ বা ধর্মরূপে আবির্ভূত যা; আশ্রিত ; গৌণ, অপ্রধান।

গূঢ়বর্ত্মা—গোপন পথ ধরে চলছে যা।

গূঢ়োত্মা—সত্তার গভীরে নিহিত রয়েছে স্বরূপ যার (শ্রু)।

গোচরতা—অনুভবের বিষয় হবার সামর্থ্য objectivity।

গোত্র-ভূ—পূর্বের সমস্ত সম্বন্ধ ছেড়ে নতুন পরিবেশে আবির্ভূত (বৌ। -হীন কোনও সংজ্ঞা বা পরিচয় দেওয়া যায় না যার (শ্রু)।

গৌরী—বিশ্বের প্রাণরূপিণী শুদ্ধা চিৎ-শক্তি (শ্রু)।

গ্রন্থি-বিকিরণ—গাঁট খুলে দেওয়া; অবিদ্যার আড়ষ্টতাকে জ্ঞানের নির্মুক্ততায় রূপান্তরিত করা (শ্রু)। -ভেদ—চেতনার শক্তিতে জড়ের আবরণকে বিদীর্ণ করা (শা)।

গ্রহণ—ইন্দ্রিয়ের সহায়ে বিষয়ের অনুভব; অনুভবের 'করণ' বা সাধন। -মন—ইন্দ্রিয়ানুভবের সঙ্গে যুক্ত যে-মন sense-mind।

গ্রহীতা—বিষয়কে অনুভব করে যে, বিষয়ী subject।

গ্রহীতৃ-মন—বিষয়ের সুস্পষ্ট অনুভব হয় যে-মনের দ্বারা perceptive-mind।
গ্রাহক-সংবিৎ—বিষয়কে গ্রহণ বা অনুভব করে যে-বোধশক্তি।
গ্রাহ্য—অনুভবযোগ্য; ইন্দ্রিয়ানুভবের বিষয়।
ঘনবিগ্রহ—জমাট হয়ে আকার নিয়েছে যা।
ঘোরচেতনা—অন্ধ ও আচ্ছন্ন বোধ।
চক্রক—চাকার মত ঘুরে-ঘুরে চলে যে।
চতুষ্কোটি—বিরুদ্ধ দুটি ধর্মকে পর্যায়-ক্রমে স্বীকার করা (এই হল দুটি 'কোটি'), যুগপৎ স্বীকার করা (তৃতীয় 'কোটি'), আবার কোনটিকেই স্বীকার না করা (চতুর্থ 'কোটি') [যেমন 'ব্রহ্ম এক' 'ব্রহ্ম বহু', 'ব্রহ্ম এক এবং বহু দুইই', 'ব্রহ্ম এক বা বহু কোনটাই নন']। -বিনির্মুক্ত—যার সম্পর্কে 'থাকা' 'না-থাকা' 'থাকা ও না-থাকার যৌগপদ্য' কিংবা 'থাকা ও না-থাকা দুয়েরই অভাব' এই চারটির একটিও খাটে না; বাক্য-মনের অগোচর (বৌ)।
চমৎকার—(আত্ম-) রসের অনির্বচনীয় আস্বাদন (শৈ)। বিস্ময়। বিস্ময়কর পরিণাম।
• চর, চরিষ্ণু—চঞ্চল, জঙ্গম।
চর্বণা—বিচিত্র উপকরণের সমবেত আস্বাদনে আবির্ভূত অনুপম রসবোধ।
চর্যা—সাধনা, অভ্যাস culture (বৌ)।
চিতি—চেতনার ক্রিয়া: সচেতনভাব, বোধ। -ধাতু—চিৎশক্তির ক্রিয়া যে-উপাদানের স্বভাবগত conscious stuff।
চিৎ-কুণ্ডলী—আধারে সংহত হয়ে আছে যে-চিৎশক্তি। -কেন্দ্র—নিজের মধ্যে অনুভবের একটা মধ্যবিন্দু যেখানে থেকে বাইরে-ভিতরে সব-কিছু দেখা চলে। -ধাতু—ভাব বা বস্তুর গভীরে অনুভূত চিৎরূপী উপাদান spirit-substance। -পরিণাম—অন্তর্নিহিত চিৎশক্তির ক্রমিক স্ফুরণ spiritual evolution। -পুরুষ—চিৎসত্তার শুদ্ধবিগ্রহ। -প্রতিভাস—চিৎসত্তার বিচিত্ররূপে ফুটে ওঠা। -প্রভাস—চিজ্জ্যোতির সর্ব-প্রকাশক ছটা। -সত্ত্ব—চৈতন্যরূপ শুদ্ধ উপাদান, আধারের চিন্ময় সূক্ষ্ম উপাদান; এই উপাদানকে অবলম্বন করে স্থিতি। -স্পন্দ—চিৎশক্তির ক্রিয়া।
চিত্ত—মনশ্চেতনা। চিত্তের সামান্যরূপ types of consciousness (বৌ)। -আকৃতি—বিভিন্ন জাতের চিত্ত, চিত্তের সামান্যরূপ mind-type। -পরিণাম—অবস্থান্তরের ভিতর দিয়ে সমগ্র চিত্তের ক্রমিক পুষ্টি। -পুরুষ—যে-পুরুষ বা চিদ্‌বিগ্রহ চিত্তবৃত্তির আশ্রয় এবং ভর্তা। -বিমুক্তি—চিত্তের লয় হওয়াতে চিত্তবৃত্তিজনিত ক্লেশ ও সন্তাপ হতে নিষ্কৃতি (বৌ)। -বৃত্তি—চিত্তের ক্রিয়া এবং তার পরিণাম। -সত্ত্ব—বৃত্তির আকারে স্ফুরিত যে-চেতনা তার মূল উপাদান, চিত্তের ভাবময় উপাদান consciousness-stuff; এমনিতর শুদ্ধ-উপাদানময় চিত্তস্থিতি, চিত্তধর্মের শুদ্ধধর্মী; চিত্তময় সত্তা psychological being; চিত্তময় সত্তাতে আরোপিত ব্যক্তিত্বের অভিমান psychic individuality।
চিত্তি—চেতনা বা বোধ দিয়ে ধারণা করতে পারা (শ্রু)।
চিত্র-পুরুষ—একই আধারে বহু এবং বিচিত্র ব্যক্তিসত্তার সমবায়ে গঠিত পুরুষ multi-person।
চিদাকাশ—চিৎসত্তার অন্তহীন প্রসার ও দীপ্তি ফুটেছে যেখানে।
চিদাত্ম-ভাব—শুদ্ধচিৎরূপে আত্মসত্তার প্রকাশ। -স্বভাব—চিন্ময় আত্ম-স্বরূপের আপনাতে আপনি থাকা।
চিদাধার—চিন্ময় আশ্রয়।
চিদাবেশ—চিৎশক্তির অনুপ্রবেশ বা ওতপ্রোত-ভাবে নিহিত থাকা।...বিণ. -বিষ্ট।
চিদাভাস—রূপে বা বিগ্রহে চিৎসত্তার স্ফুরণ phenomenal consciousness; আধারে স্ফুরিত আত্মার বিশেষ রূপ soul-form।
চিদেকরস—চিন্ময় ভাবনার দ্বারা জারিত।
চিদ্‌-ঘনবিন্দু—চিৎশক্তি বীজের মত সংহত অথচ স্ফুরণোন্মুখ হয়ে আছে যার মধ্যে। -বিলাস—চৈতন্যের সত্তা ও শক্তির বিচিত্র লীলা বা বৃত্তি; চিৎ-শক্তির খেলা। -বৃত্তি—চিৎশক্তির সাক্ষাৎ ক্রিয়া বা পরিণাম।
চিন্তা-সংক্রামণ—ইন্দ্রিয়ব্যাপারের সহায় ছাড়া অলৌকিক উপায়ে ভাবের আদান-প্রদান telepathy।
চিন্ময়-পরিণাম—চিৎশক্তির ক্রমেই স্পষ্টতর

হয়ে ফুটে ওঠা।
চেতন-সত্ত্ব—জীবের আধারে নিহিত চিন্ময়-উপাদানে গড়া সত্তা।
চেতনা-বিভূতি—চিত্তের নানা আকার নেওয়া।
চেতা—সচেতন থেকে অনুভব করছে যে (শ্রু)।
চেতোগ্রাহ্য—চেতনাশক্তির সূক্ষ্মক্রিয়া দিয়ে জানা যায় যাকে।
চৈতস—চেতনার ক্রিয়াবশত ভাবরূপে স্ফুরিত conceptive; চিত্তগত, মনোময় subjective।
চৈতসিক—চিত্তের উপকরণভূত 'বৃত্তি', চিত্তের 'বিপরিণাম' mental modifications (বৌ)।
চৈত্য-সত্তা—জীবের গহনে নিহিত চিন্ময় সত্তা psychic entity। -সত্ত্ব—আধারে অন্তর্গূঢ় চিন্ময় জীবভাব psychic personality।
চ্যুতি—খসে পড়া। একটি জীবনের অন্তিম ক্ষয়মুহূর্ত যা আনে আর-একটি জীবনের সূচনা (বৌ)।
ছত্রাক—ব্যাঙের ছাতা।
ছন্দোনুবর্তন—অপরের ইচ্ছাকে মেনে চলা।
ছায়াতপ—আঁধার এবং আলো; মাঝখানে বর্তুল কালো ছায়াকে ঘিরে আলোর ছটা penumbra (শ্রু)।
জগতী—অখণ্ড জগৎসত্তা world-existence (শ্রু); তার ছন্দ (শ্রু)। -ছন্দ—বিশ্বশক্তির স্পন্দ ও দোলন।
জগদানন্দ—বিশ্ব জুড়ে নিরবচ্ছিন্ন হয়ে উছলে-ওঠা অনির্বচনীয় চিন্ময় আনন্দ (শৈ)।
জড়-ধাতু—জড়রূপী উপাদান material substance। -সামান্য—জড়ের সাধারণ ধর্ম; এই ধর্মাক্রান্ত জড়, বিশ্ব-জড় universal matter।
জড়াদ্বৈতবাদ—'জড়ই একমাত্র বিশ্বমূল তত্ত্ব' এই মতবাদ।
জড়ৈকব্রহ্মবাদ—'জড়ই একমাত্র বিশ্বমূল তত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব জড়ত্বে পর্যবসিত' এই মতবাদ।
জড়োত্তর-সন্নিকর্ষ—জড়জগতের ওপার থেকে অলৌকিক উপায়ে বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর যোগ।
জন্মকথন্তাসংবোধ—কী করে জন্ম হল তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান (সা)।
জন্য—অন্য কিছু হতে উৎপন্ন derivative।
জবন—'বৃত্তি'র দ্রুত পরম্পরায় চিত্তের স্পন্দন (বৌ)।
জল্প-বিতণ্ডা—কথার ছল ধরে হলেও পরের মতকে খণ্ডন করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা হল 'জল্প' আর তেমনি করেই শুধু পরের মত খণ্ডন করা 'বিতণ্ডা' (ন্যা)।
জাগ্রৎ-সমাধি—ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে নিরুদ্ধ না করেও আর একটা গভীর ভূমিতে সজাগ থাকা।
জাতি—জন্ম। সামান্যধর্মসংক্রান্ত সমূহ বা বর্গ class। -ধর্ম—জন্ম বা বর্গদ্বারা নিরূপিত সাধারণ ধর্ম congenital or typal property। -রূপ—বর্গের পরিচায়ক আদর্শ রূপ type।
জাত্যন্তরপরিণাম—এক জাতি হতে আর-এক জাতিতে পরিণত হওয়া (সা)।
জারণা—ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট থাকা।
জিজীবিষা—বেঁচে থাকবার ইচ্ছা (শ্রু)।
জীব—প্রাণশক্তি (শ্রু); প্রাণী; বিশ্বের অন্তর্গত বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তা individual। -ঘন—বিশ্বপ্রাণের ঘনীভূত রূপ যা অনন্ত জীবব্যক্তিতে প্রকাশমান (শ্রু)। -ধাতু—প্রাণময় জড়োপাদান living matter। -বিভূতি—জীবরূপে আপনাকে ফুটিয়ে তোলা। -ব্যক্তি—একক-সত্তা-বিশিষ্ট জীব, ব্যষ্টি জীব individual। -ব্রহ্ম—জীবরূপে প্রকটিত ব্রহ্মসত্তা। -ভাবনা—আধারে নিহিত সংবেগ যা জীবত্বকে ফুটিয়ে তুলছে। -সত্ত্ব—জীবভাবের চিন্ময় উপাদান soul-substance; জীবের স্বরূপসত্তা psychic entity; জীবের ব্যক্তিরূপে প্রকাশ individual being; জীবের ব্যক্তিস্বভাব individuality; জীব-ভাবের মূলাধার।
জীবত্বোপহিত—জীবভাব দ্বারা সঙ্কুচিত।
জীবনযোনিপ্রযত্ন—প্রাণের যে-ক্রিয়াকে আশ্রয় করে জীবন চলছে (ন্যা)।
জীবাত্মভাব—বহুজীবরূপে আপনাকে ফুটিয়ে তোলা।

জীবাধার—প্রাণক্রিয়ার আশ্রয় (স্মৃ)।
জীবিতেন্দ্রিয়—প্রাণক্রিয়ার বাহনরূপী ইন্দ্রিয় vital organs (বৌ)।
জীবোত্তীর্ণ—জীবভাবকে ছাড়িয়ে গেছে যা।
জুগুপ্সা—সংকোচে গুটিয়ে আসা (শ্রু)।
জৈত্ররথ—সব-কিছুকে জয় করে চলেছে যে-রথ।
জ্ঞান-তন্ত্র—পরস্পরসম্বন্ধ বিভিন্ন জ্ঞানের সমাহার system of knowledge। -বৃত্তি—জ্ঞানশক্তির নানা ভঙ্গিতে স্ফুরণ। -সাংকর্য—পাঁচমিশেলী জ্ঞানের একটা জটলা।
জ্ঞানাভাস—সত্য জ্ঞান নয় কিন্তু জ্ঞান বলে মনে হচ্ছে যা।
জ্ঞানা-শক্তি—(পরমার্থসতের) যে-বিভাবে জ্ঞান ফুটছে সার্থক ক্রিয়ার প্রবর্তনা নিয়ে (শা)।
জ্যোতিষ্টোম—আলোর সুরের স্তবক (শ্রু)।
টাবু—বিশেষ-কোনও বস্তুকে বা ব্যক্তিকে অতি-পবিত্র বা অতি-অপবিত্র জ্ঞানে অস্পৃশ্য করে রাখা।
টোটেমিজ্‌ম্—[বিশেষ কোনও বস্তু (সাধারণত জন্তু বা উদ্ভিদ) যার সঙ্গে অসভ্যেরা নিজের পরিবারের বা গোষ্ঠীর গোত্রসম্পর্ক আছে বলে বিশ্বাস করে তাকে বলে 'টোটেম'] টোটেমে বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের 'পরে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক আচার ইত্যাদি।
তটস্থ—কোনওদিকে যা হেলে পড়েনি balanced, poised; নিরপেক্ষ, উদাসীন neutral। দুয়ের মাঝামাঝি intermediate। -শক্তি—মধ্যবর্তী শক্তি; বিদ্যাশক্তি আর অবিদ্যাশক্তির মাঝামাঝি জীবশক্তি (বৈ)।
তৎ-স্বরূপ—ব্রহ্মের চরম ও পরম স্থিতি যেখানে তাঁকে 'তৎ' বা 'সেই' বলা ছাড়া আর-কোনও উপায়ে নির্দেশ করা যায় না। (শ্রু)।
তত্ত্ব-ভাব—স্বরূপের সত্য Reality; তার অনুভব (শ্রু)। নিজস্ব ভাব। সত্যতা। -সমীক্ষা—স্বরূপনির্ণয়ের জন্য খুঁটিয়ে বিচার (ন্যা।)
তত্ত্বাত্মা—সত্যকার আত্মা real self।
তত্ত্বাধিগম—সত্যের জ্ঞান অর্জন।
তথতা—যা যেমন ঠিক তেমনি থাকা; স্বরূপ-সত্তার অনির্বচনীয় নির্বিকার স্থিতি thatness, irreducible nature, absolute reality, (বৌ)।
তথাভূত—তাত্ত্বিক real।
তনু-ভা—স্বরূপ-জ্যোতির বিচ্ছুরণ (বৈ)।
তনূকৃতি—খাটো করা, ছোট করা।
তন্তু-চ্ছেদ, -বিচ্ছেদ—সূত্র ছিঁড়ে যাওয়া, একটানা ভাবের মধ্যে হঠাৎ ছেদ এসে পড়া (শ্রু)।
তন্ত্র—পরস্পরসম্বন্ধ বিষয়সমূহের একত্র সমাহার system। -সংস্থান—তন্ত্র বা ছক্ অনুসারে সাজানো থাকা। -সম্মত —'তন্ত্র' অনুযায়ী systematized।
তপঃ—(চিৎ-) শক্তি ও তার স্ফুরণ (শ্রু)।
তপোবিগ্রহ—শক্তির ঘনীভূত রূপ energy-form।
তমোভাগ—আঁধারে আছে যে-অংশটুকু (শ্রু)।
তর্ক—নিশ্চিত অনুমানের অনুকূল যুক্তি argument having cogency (ন্যা); যুক্তি।...বিণ. তর্কিত—যার অনুকূলে যুক্তি দেখানো যেতে পারে। -প্রস্থান—তত্ত্ববিদ্যার ভিত্তিতে গড়া দার্শনিক চিন্তার ধারা।
তর্কাভাস—যে 'তর্কে'র প্রামাণ্য সম্পর্কে সন্দেহ আছে conjeture (ন্যা)।
তাদাত্ম্য—পরস্পরের একাত্মতা বা অভেদভাব identity। -প্রত্যয়—অভেদভাবের প্রতীতি বা সুস্পষ্ট বোধ। -বিজ্ঞান —জ্ঞানের বিষয়কে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করার ফলে যে-জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ে ভেদ থাকে না knowledge by identity। -বিভূতি—অভেদভাবেরই বিচিত্র স্ফুরণ। -ভাবনা—একীভূত সত্তার ভাব; সবার সঙ্গে একাকার হয়ে থাকা।
তিরস্করণী—যা আড়াল করে রাখে, পর্দা।
তীব্রসংবেগ—লক্ষ্যের দিকে উৎসাহী চিত্তের দুর্দম অভিযান (সা)।
তুচ্ছত্ব—মিথ্যাত্ব, অবাস্তবত্ব (বে)।
তুরীয়, তুর্য—তিনের ওপারে। স্বপ্ন জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির অতীত আত্মার স্ব-প্রকাশ ভূমি; দেহ প্রাণ ও মন এই তিনটি ভূমির ওপারে; বিরাট্ হিরণ্য-গর্ভ ও ঈশ্বরের ওপারে (শ্রু)। বিশ্বা-তীত।

তুর্যাতীত—'তুর্য' ভূমিরও ওপারে পরম-শিবের সহজ ভূমি যা সবকে ছাড়িয়ে সবাইকে জড়িয়ে আছে (শৈ)।

তুলাবিদ্যা—ব্যষ্টি-জীবের মধ্যে আছে যে-অবিদ্যা ignorance in the individual [প্র. 'মূলাবিদ্যা'] (বে)।

তেজঃ—শক্তি ও তার স্ফুরণ (শ্রু)। জীবাত্মাতে নিহিত চিন্ময় শক্তি (শ্রু)।

তেজো-ধাতু—রূপায়ণের মূলে যে-ক্রিয়াশক্তি Energy।

তৈজস-রূপান্তর—চিন্ময় তেজঃ বা 'চৈত্য-সত্ত্বের' রূপান্তর psychic transformation।

ত্রিপুটী—তিনের সমাহার, তিনে এক trinity, tri-une aspect; একে তিন triplicity। জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সমাহার (বে)।

দায়ভাগ—উত্তরাধিকারের বণ্টন বা অংশ।

দিগ্‌বন্ধনমন্ত্র—কোও-কিছুর চারদিকে বেড়া দেওয়া হয় যে-মন্ত্রে (শা)।

দিতি—খণ্ডতা, খণ্ডবোধ (শ্রু)।

দিব্য-করণ—'দিব্য-সংবিৎ' গ্রহণেরও উপ-যোগী সাধন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়। -কৃত—পরমপুরুষের সংকল্প ও সৃষ্টি-বীর্য; চিন্ময় সংকল্প ও সামর্থ্য। -পুরুষ—উপনিষদ-বর্ণিত পরম পুরুষ ['দিব্য পুরুষ' তাঁরই বিভূতি] (শ্রু)। -ব্যূহ—দিব্য-পুরুষের সমগ্র বিভূতির পুঞ্জে-পুঞ্জে বিন্যাস। -সংবিৎ—শব্দাদি বিষয়ের অতীন্দ্রিয় বিভূতির সূক্ষ্ম ও অলৌকিক অনুভব (সা)। -সত্ত্ব—দিব্যভাবময় উপাদান দিয়ে গড়া বিগ্রহ।

দিব্যোন্মাদ—দিব্যভাবের আবেশজনিত অন্তরের অলৌকিক উন্মাদনা God-ecstasy (বৈ)।

দুরুপযোগ—ঠিকমত খাটাতে না পারা।

দৃক্‌শক্তি—বিশুদ্ধ নির্বিকল্প অনুভব (সা)।

দৃক্‌সিদ্ধ—প্রত্যক্ষ দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত verified।

দৃষ্ট-বিরোধ—স্বাভাবিক অনুভবের সঙ্গে অসামঞ্জস্য। -সাধন—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপায় বা উপকরণ।

দৃষ্টি—জগৎ ও জীবের তত্ত্বকে দেখবার বিশেষ ধরন view of existence, view of things (বৌ, জৈ)। -সৃষ্টি—অন্তশ্চক্ষে ভাবকে দেখেই তাকে রূপ দেবার শক্তি creative insight।

দেবগন্ধর্ব—বিশ্বসংগীতের আনন্দজ্যোতির্ময় সুরশিল্পী (শ্রু)।

দেবাত্মশক্তি—পরমপুরুষের সঙ্গে নিত্যযুক্ত স্বরূপশক্তি (শ্রু)।

দেশ—নিখিল মূর্তদ্রব্যের অমূর্ত আধার যা অবকাশধর্মী এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ দ্বারা পরিমেয় space। বিণ. দৈশিক -কাল—দেশের তিনটি এবং কালের একটি এই চারটি মানের সমবায় space-time। -কৃত—দেশসম্বন্ধদ্বারা নিরূপিত, দৈশিক spatial। -ভাবনা—দেশের সত্তাকে ফুটিয়ে তোলা। -সংস্থান—বিশেষ দেশে বিশেষ ধরনে বস্তুর বিন্যাস।

দেশনা—বিশেষ দিকে পরিচালিত করবার শক্তি; অলঙ্ঘনীয় অনুজ্ঞা imperative (বৌ)। অনুশাসন।

দেশোপহিত—দেশ যার 'উপাধি' বা পরি-চায়ক; দেশের দিক হতে দেখা হচ্ছে যাকে conditioned by space।

দেহান্তরসংক্রমণ—মৃত্যুর পর জীবাত্মার অন্য দেহ আশ্রয় transmigration।

দেহী—দেহে আবিষ্ট চিৎসত্তা embodied spirit (স্মৃ)।

দৈবী-সম্পৎ—দিব্য জীবনের অনুকূল ধর্ম এবং বৃত্তি (স্মৃ)।

দৈহ্য—দেহসম্পর্কিত corporeal। -আত্মা—আধারের সূক্ষ্মভূতময় সত্তায় অধি-ষ্ঠিত আত্মা subtle-physical being (স্মৃ)।

দৌর্মনস্য—মনের সন্তাপজনিত অশান্তি (সা)।

দ্রব্য—গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয়রূপী পদার্থ substance (ন্যা)।

দ্বিকোটিক—দুটি প্রান্তভূমিকে আশ্রয় করে পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে আছে যারা।

দ্বিধাবৃত্ত—দুভাগ হয়ে চলেছে যা।

দ্বৈতবাসনা—দ্বৈতভাবের ছোঁয়াচ।

দ্বৈধ-বাদী—জগৎকারণে অন্যোন্যবিরোধী ধর্মের আরোপকারী ইরানীয় প্রাচীন সম্প্রদায়। -বৃত্তি—দুভাগ হয়ে চলা double movement।

ধর্ম—বিশিষ্ট পরিবেশে কোনও-কিছুর

বিশেষ ধরনে চলবার ধারা law; **শাশ্বত** বিধান (শ্রু)। মানুষের পুণ্যাভিমুখী প্রবৃত্তি morality। বস্তুর বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য property। যা-কিছুর সত্তা আছে, বস্তুমাত্র existence (বৌ। তত্ত্ববস্তুকে অনুভব করবার এবং জীবনে ফলিয়ে তোলবার সাধনা; এরই অনুকূল বিধিবিধান। -চক্র-প্রবৃত্তি—নতুন করে সত্যধর্মের ধারাবাহিক প্রবহণ (বৌ)। -ধৃক্—বিশ্বের শাশ্বত বিধান প্রবর্তিত হয়েছে যা হতে। -বিপরিণাম—এক ধর্মের জায়গায় আরেক ধর্মের আবির্ভাবজনিত রূপান্তর modification of properties। -শূন্যতা—শূন্যই সমস্ত বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব এই বোধ (বৌ)।

ধর্মানুশাসন- ধর্মবোধ দ্বারা প্রবর্তিত বিধান ethical code or law।

ধর্মি-বিশেষ—বিশেষ-কোনও বস্তু যা একাধিক ধর্মের আশ্রয়। -ভাবশূন্য—কোনও ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের আধার হবার প্রবণতা নাই যার মধ্যে, বিশুদ্ধ (সত্তামাত্র)।

ধর্মী—ধর্মের আশ্রয়, আধার।

ধর্ম্য—ধর্মবোধ দ্বারা প্রবর্তিত ও পরিচালিত।

ধাতু—যা ধরে আছে; বস্তুর মৌল উপাদান ও তার গুণ প্রভৃতির আশ্রয় substance। -প্রকৃতি—ধাতুগত স্বভাব substantial nature। -প্রসাদ—উপাদানবস্তুর স্বচ্ছতা transparence or luminosity of substance (শ্রু); আধারের নির্মলতা। -বৈষম্য—আধারের উপাদানে স্বাভাবিক ক্রিয়ার সামঞ্জস্য নষ্ট হওয়া। -শূন্যতা—যে মহাশূন্যতার অনুভবে শুধু অহংএর প্রলয় হয় না—সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় বস্তুসত্তারও প্রলয় ঘটে void of Being (বৌ)।

ধূর্তি—কুটিল চলন (শ্রু)।

ধৃতি—বিশেষ-কোনও ভাবকে আঁকড়ে থাকা; মানসী ধারণা। দৃঢ়মূল দৃষ্টিভঙ্গী (স্মৃ)।

ধ্যানচিত্ত—স্বভাবতই যে-চিত্ত একাগ্রভূমিতে থাকে, যোগিচিত্ত (বৌ)।

ধ্যামলপ্রায়—উজ্জ্বল অথচ ধোঁয়া-ধোঁয়া smoky-luminous (শা)।

নচিকেতা—যে জানে না অথচ জানতে চায় (শ্রু)

নয়—একটা বিষয়ের নানাদিকই আছে এই-কথা মেনে নিয়ে তার বিশেষ-কোনও দিকের 'পরে আপাতত জোর দিয়ে মত প্রকাশ করা logical judgment expressive of a particular aspect of a thing (জৈ)।

নরাকার ব্রহ্মবাদ—দিব্য-পুরুষের 'পরে মানুষের রূপ গুণ ইত্যাদির আরোপ করা হয় যে-মতবাদে anthropomorphism।

নাড়ী—নার্ভ। -তন্ত্র—শরীরস্থ নাড়ীজাল nervous system। -পুরুষ—নাড়ীতন্ত্রে অধিষ্ঠিত চিন্ময় সত্ত্ব। -সংবেদনময়—নাড়ীর প্রতিক্রিয়াহেতু অস্পষ্ট বোধে ছাওয়া।

নানা—বহুরূপ the Many; **বহুত্ব** multiplicity। (শ্রু)।

নিঃশ্রেয়স—পরমপুরুষার্থ, মোক্ষ।

নিঃসত্ত্ব—সত্তার স্বাভাবিক ধর্ম যে 'অর্থ-ক্রিয়াকারিতা' তাও নাই যেখানে, শূন্য nonentity, void।

নিঃসত্ত্বাসত্ত্ব—'সত্ত্ব' বা ব্যক্তিভাবের অস্তিত্ব এবং অভাব দুয়ের দ্বন্দ্বের বাইরে ব্যক্তিভাব নাইও আবার আছেও যার মধ্যে impersonal-personal।

নিঃস্বভাব—আপন অস্তিত্বের কোনও উপাদান আশ্রয় বা লক্ষণ নাই যার without substance of being (বৌ)।

নিকায়—বিভিন্ন অবয়বের সুশৃঙ্খলা ও কার্যকরী বিন্যাস দ্বারা গঠিত অবয়বী organised being, organisation।

নিগমন—ন্যায়ের চরম অবয়ব—যেখানে যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত সিদ্ধান্তের উল্লেখ থাকে conclusion of a syllogism (ন্যা)।

নিগৃহীত—চেপে-রাখা repressed।

নিত্য-সত্ত্ব—শুদ্ধ অস্তিরূপে যিনি বিশ্বের চিরন্তন মূলাধার। -সমবেত—অনন্তকাল ধরে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত eternally inherent। -সিদ্ধ—অনন্তকাল ধরে পূর্ণস্ফুটরূপে অবস্থিত।

নিদিধ্যাসন—ধ্যেয়বস্তুর গভীরে ডুবে গিয়ে তার তত্ত্বসাক্ষাৎকার।

নির্বর্তিকা—ভিতরের দিকে গুটিয়ে আসছে যা।

নিমিত্ত—কারণ এবং তার ব্যাপার causality (বে)। উপাদান ছাড়া কার্যোৎপত্তির অন্যান্য কারণ causal determinants, conditions; কার্যের প্রয়োজক বা প্রবর্তক agent। কার্যোৎপত্তির সাধন instrument। ঘটনা ঘটবার অন্যতম হেতু occasion। -আত্মা—অন্তর্যামীর শাসনে তাঁর যন্ত্র হয়ে চলেছে যে-আত্মা instrumental self। -কারণ—যার প্রবর্তনায় কার্যের উৎপত্তি efficient cause। -চেতনা—বাইরের যে-চেতনা অন্তরের গোপন শাসনে যন্ত্রের মত চলছে। -পরিবেশ—ভাব বা কর্মের উৎপত্তির পারিপার্শ্বিক কারণ circumstances। -প্রবাহ—কার্যকারণের পরম্পরা chain of causation। -সামান্য—সর্বসাধারণ কারণসমূহ।

নিমেষ—শুদ্ধ সন্মাত্রে শক্তির তল্লীন হয়ে থাকা (শা)।

নিয়ত-পূর্ববর্তী—কার্যোৎপত্তির আগে সবসময় যাকে দেখতে পাওয়া যায় antecedent (ন্যা)। -ভাব—একটা নির্দিষ্ট ধারায় একভাবে অবস্থান persistence।

নিয়তি—নিয়ম law। কার্য-কারণের অলংঘ্য ব্যাপার যার ফলে কোথাও কারও স্বাতন্ত্র্য আছে বলে ভাবা যায় না necessity (শ্রু, শা); বিধাতার নির্দিষ্ট বিধান।

নিয়ামক—ক্রিয়ার ধারাকে নির্দিষ্ট খাতে বইয়ে দেয় যে determinant।

নিরাধিষ্ঠান—যার কোনও ভিত্তি বা আশ্রয় নাই।

নিরুক্তি—বিশেষ-কোনও ধর্ম বা লক্ষণ দিয়ে পরিচিত করা determination। ভেঙে বলা, ব্যাখ্যা, বিবৃতি।

নিরুচ্ছ্বাস—রুদ্ধশ্বাস, নিষ্ক্রিয়।

নিরুপাখ্য—যার কোনও সংজ্ঞা বা পরিচয় দেওয়া যায় না।

নিরুপাধিক—যার কোনও 'উপাধি' বা পরিচায়ক বিশেষ ধর্ম নাই; অসংকুচিত (বে)।

নিরূঢ়—গভীরে যার মূল রয়েছে, স্বভাবতই যা নিত্যযুক্ত inherent।

নিরোধ—চিত্তের বৃত্তিশূন্য অবস্থা (শ্রু, সা)। -সমাপত্তি—একাগ্রচিত্তের অবশেষে বৃত্তিশূন্য অবস্থায় লয় trance of exclusive concentration। -স্থিতি—নিরুদ্ধভূমির নিস্তরংগতায় অবস্থান।

নির্ঋতি—বিশ্বের ছন্দোময় বিধানের বিপরীত অবস্থা (শ্রু)।

নির্গ্রন্থ—কোনও জটপাকানো নাই যার মধ্যে, সরল (স্মৃ)।

নির্ণয়—যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত logical conclusion (ন্যা)।

নির্ধর্মক—বৈশিষ্ট্যহীন, নির্বিশেষ।

নির্ধূত—ঝেড়ে ফেলা হয়েছে যাকে (শ্রু)।

নির্বহণ—নাট্যবস্তুকে ফুটিয়ে তুলে তার চরম পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া denouement।

নির্বাণ—বিনাশ—অবশ্য সমগ্র সত্তার নয়, শুধু আমাদের প্রাকৃত সত্তার; অহন্তা বাসনা ও অহংবুদ্ধিপ্রণোদিত মনোবৃত্তি ও কর্মের লয় (বৌ)।

নির্বিকল্প—চিত্তের বিকল্প বা দ্বৈতবৃত্তি নাই যেখানে, ত্রিপুটীর বা জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়ের লয় যেখানে (বে)।

নির্বিশেষ—কোনও বিশেষণের আরোপ বা বৈশিষ্ট্যের ভাবনা চলে না যার মধ্যে Absolute [প্র. 'সবিশেষ']

নির্বৃতি—ভারহীন মুক্তচিত্তের আনন্দ।

নির্মাণ-কায়—আপন ইচ্ছায় রচিত শরীর; কৃত্রিম মূর্তি (বৌ)। -রূপ—আপন খুশিতে গড়া জিনিস, মনগড়া বস্তু। -স্বাতন্ত্র্য—আপন খুশিমত নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার সামর্থ্য।

নিষ্কর্ষ—সার বস্তু।

নিষ্কল—অখণ্ড absolute।

নিসর্গ-ধর্ম, -বৃত্তি—প্রাণিমাত্রের স্বভাবে রয়েছে যে বিচারহীন অথচ বিশিষ্ট ফলাভিমুখী প্রবৃত্তি instinct।

নিস্পন্দনিত্যতা—অনন্তকাল ধরে স্পন্দহীন হয়ে থাকা।

নৈমিত্তিক—'নিমিত্তের' আশ্রিত বা অংগীভূত। বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশ হতে

উৎপন্ন। 'নিমিত্ত' বা কারণ হতে জাত, কার্য effect।

নৈর্ঘৃণ্য—নিষ্ঠুরতা (বে)।

নৈষ্কর্ম্য—কর্মস্পন্দের অভাব passivity (স্মৃ)।

নৈষ্ঠিক—ধর্মসাধনায় কঠোর নীতিচর্চার পক্ষপাতী।

ন্যায়—তর্কশাস্ত্র logic। যুক্তিবাক্যের পরম্পরা syllogism। সুবিচার justice। -প্রবৃত্তি—ন্যায়ের বিধানের প্রয়োগ। -প্রস্থান—যে-দর্শনে ন্যায় বা যুক্তি দিয়ে তত্ত্ব নির্ণয় করা হয়।

ন্যূনসত্তাক—অপরের সত্তার 'পরে নির্ভর করে যার সত্তা (বে)।

পঞ্চস্কন্ধ—রূপ (sense-data), বেদনা (feeling), সংজ্ঞা (perception), সংস্কার (tendencies) এবং বিজ্ঞান (consciousness) —জীবব্যক্তিতে এই পাঁচটির সমাহার (বৌ)।

পঞ্চাবয়বী—প্রতিজ্ঞা হেতু প্রভৃতি পাঁচটি 'অবয়বের' বা বাক্যের কাঠামো আছে যে-যুক্তিতে syllogism (ন্যা)।

পর—উপরকার; শিবতত্ত্ব [প্র. 'অপর'] (শৈ)।

পরতঃপ্রমাণ—যার প্রামাণ্য সিদ্ধ করতে সাক্ষাৎদর্শন ছাড়াও আর-কিছুর দরকার হয়।

পরবিন্দু—বিশ্বের মর্মনিহিত চিৎসত্তার নিজের মধ্যে কুণ্ডলিত হয়ে থাকা (শা)।

পরমসাম্য—দ্বন্দ্ব বা বিকারের লেশমাত্রও নাই যেখানে (শ্রু)।

পরমার্থ-সৎ—চরম তত্ত্ব যার সত্যতা অখণ্ডনীয় এবং যার উপলব্ধি সাধনার সর্বোত্তম লক্ষ্য।

পরাক্—বাইরের দিকে মোড় ফেরানো যার externalised (শ্রু); বিষয়গত objective। -কৃত—বিষয়রূপে উপস্থাপিত objectivised। -চেতনা—বহির্মুখ চেতনা। -দৃষ্টি—বাইরের বোধ। -প্রবৃত্তি—বহির্মুখ ক্রিয়া। -বৃত্ত—যার ক্রিয়ার ধারা বহির্মুখে বা সামনের দিকে objective, frontal। বহিঃস্থিত।...ভাব. -বৃত্তি।

পরাপর—'পর' (শিব) এবং 'অপরের' (জীবের) মাঝামাঝি শক্তিতত্ত্বের ভূমি (শৈ)।

পরাবর—উপর এবং নীচ; উপর-নীচ দুটিকেই একসঙ্গে জড়িয়ে (শ্রু)।

পরাবর্তন—পিছনদিকে ফিরে আসা regression।... বিণ. -বৃত্ত।

পরা-বাক্—বাক্ বা ব্রহ্মের প্রকাশশক্তির আদিভূমিকা (শা)। -সংবিৎ—শৈবী-চেতনার অনুত্তর ভূমি—যা সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়ে আবার জড়িয়ে থাকে (শৈ)।

পরামর্শ—সম্পর্ক, ছোঁয়াচ।...বিণ. -মৃষ্ট—স্পৃষ্ট, লিপ্ত।

পরায়ণ—আধার; শেষ আশ্রয়।

পরার্ধ—অখণ্ড-সত্তার উপরের ভাগ, সৎ চিৎ আনন্দ ও অতিমানস। একের পিঠে সতেরটি শূন্য দিলে যে-সংখ্যা হয়।

পরাহন্তা—পরমশিবের অহংবোধ (শৈ)।

পরিকল্পিত—মনগড়া (বৌ)।

পরিগন্তা—চারদিকে বেড়ে আছে যে (শ্রু)।

পরিচেতন—চেতনার ব্যাপ্তিবশত আশপাশ-কেও নিজের মধ্যে জানে যে circumconscient।...বি. -চেতনা।

পরিচ্ছেদ—সীমা আঁকা; সীমার ঘের limitation।

পরিণাম—প্রকৃতির অন্যথাভাব বা অবস্থান্তর-প্রাপ্তি transformation, change। অবস্থান্তরের ধারা বা ধারাবাহিকতা process, becoming। অবস্থান্তরের ভিতর দিয়ে মূলপ্রকৃতির পরিপাক development (জৈ)। অবস্থান্তরের চরম পর্বে পৌঁছানো effectuation।

পরিতোগ্রহণ—চারদিক থেকে ঘিরে ধরা envelopment।.. কর্তৃ. -গ্রাহী।

পরিবেশ—ক্ষেত্র field। -বেষ—ছটামণ্ডল halo।

পরিবৃত্তি—(অবস্থার) বদল।

পরিভাষা—বিশেষ অর্থ বোঝায় যে-শব্দ technical term। সাধারণ বিধি বা ধারা canon।

পরিভূ—বিচিত্র হয়ে চারিদিকে ফুটে উঠছেন যিনি (শ্রু)। -ভবন—দিকে-দিকে নিজেকে ফুটিয়ে তোলা becoming।

পরিস্পন্দ—সত্তার স্বাভাবিক শক্তিবিচ্ছুরণ dynamis (শৈ)।

পরিস্রব—চারদিক থেকে ঝরে পড়া।

পরোক্ষ-বৃত্ত—গৌণভাবে কাজ করে চলেছে যা। -বাসিত—গৌণ আবাস-রূপে পরিকল্পিত inhabited in-directly। -সন্নিকর্ষ—সোজাসুজি নয় কিন্তু অন্যকিছুর মধ্যস্থতায় বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞাতার যোগ indirect contract।

পর্ব-সংক্রান্তি—এক ধাপ ছাড়িয়ে আরেক ধাপে যাওয়া। -সন্ততি—ধাপের পর ধাপ।

পর্যায়—অবস্থাবিশেষের বৈচিত্র্য বা পরম্পরা mode (জৈ)। 'কল্প' alternative। পালা।

পশ্যন্তী—বাক্ বা ব্রহ্মের প্রকাশ জ্যোতির দ্বিতীয় ভূমিকা—যেখানে বাইরে ফোটবার ঝোঁক থাকলেও দৃক-দৃশ্যের ভেদ নাই বলে শক্তি যেন নিজের মধ্যে গুটিয়ে আছে (শা)।

পাত্র—ব্যক্তি person [যেমন, দেশ-কাল-পাত্র]।

পারত্রিক—পরলোক বা পরকাল সম্পর্কিত।

পারার্থ্য—ঊর্ধ্বচেতনার কাছে নিজেকে তুলে ধরা; তাকে লক্ষ্য করেই শক্তির বিলাস (সা)।

পারিমাণ্ডল্য—পরমাণুর পরিমাণ (ন্যা)—যাব চাইতে ছোট মাপ আর হতে পারে না।

পার্থিব-পরিণামবাদ—'প্রকৃতির পরিণাম শুধু এই পৃথিবীর গণ্ডিতেই সীমিত' এই মতবাদ।

পিণ্ড—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপী জীবব্যক্তি microcosm [প্র. 'ব্রহ্মাণ্ড'] (স্মৃ)। ডেলা lump। -তাদাত্ম্য—প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকা। -দেহ—ব্যক্তিগত জীবশরীর। -পাত—দেহ খসে পড়া, মৃত্যু। -ব্যক্তি—বস্তুর আলাদা-আলাদা ডেলা। -ব্রহ্মাণ্ড—ব্যক্তি জীব ও বিরাট্ বিশ্ব microcosm and macrocosm। -ভাব—ডেলা পাকানো।

পিপ্পলাদ—বিচিত্র অনুভবের আস্বাদন-কারী অন্তরপুরুষ (শ্রু)।

পুরঃক্ষেপ—সামনের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া projection; এমনি করে সামনে ভাসছে যা।...বিণ. -ক্ষিপ্ত।

পুরাকল্প—প্রাকৃতিক আবর্তনের কোনও প্রাচীন যুগ (স্মৃ)।

পুরু—বহুর সমাহারে নিটোল (শ্রু)।

পুরুষ—ব্যক্তি person। আধারের অধিষ্ঠাতা চিৎসত্ত soul, being; শুদ্ধ আত্মা self (শ্রু, সা) -বিধ—পুরুষের ধর্ম বা ব্যক্তিত্ব আছে যাঁর personal (শ্রু)।...ভাব. -বিধতা। -বিশেষ—সাধারণ পুরুষ হতে আলাদা অথচ পৌরুষেয় ধর্মযুক্ত ঈশ্বর (সা)।

পুরুষার্থ—মানুষে জীবনের লক্ষ্য aim of existence।

পুষ্টিমার্গ—জীবনকে ভরাট্ করে তোলবার সাধনা।

পূর্ণতাহানি—শিবত্বের অখণ্ড নিটোল বোধ হতে বিচ্যুতি (শৈ); অপূর্ণতা।

পূর্ণাহন্তা—ব্যক্তি-অহংএর বিশ্বময় বিস্তার (শৈ)।

পূর্ব-চিতি—আদি বিজ্ঞান First Idea (শ্রু)। -পক্ষী—দার্শনিক বিচারের বেলায় যিনি প্রশ্ন সংশয় বা আপত্তি তোলেন [প্র. 'উত্তরপক্ষ']।

পূর্ববৎ অনুমান—কারণ হতে কার্যের অনুমান [যেমন, মেঘের ঘটা থেকে বৃষ্টির] (ন্যা)।

পূর্বাভাস—কিছু ঘটাবার আগে আভাসে তার অনুভব।

পূর্বা—আগে থেকেই নিরূপিত বা নির্ধারিত predestined; আদিম original (শ্রু)। -ব্রত—আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে যে বিশেষ সংকল্প predetermination (শ্রু)।

পৌরুষেয়—'পুরুষের' আশ্রিত বা সম্পর্কিত। মানবীয় human। -বিভূতি—পুরুষভাবের বিচিত্র প্রকাশ manifestation of Personalities। -বোধ—শুদ্ধ আত্মার অনুভব cognition of true self (সা)। চিন্ময় ব্যক্তিসত্তার অনুভব। -সংবিৎ—চিৎসত্তার মাঝে নিত্য জেগে আছে যে-সচেতনতা spiritual awareness। -সত্তা—পুরুষচৈতন্যের অন্তর্গূঢ় অস্তিত্ব। সত্ত্ব—ব্যক্তিভাবের আশ্রিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমবায় personality।

প্রকল্প—সিদ্ধান্তের প্রাথমিক কল্পন hypotheis।
প্রকার—জ্ঞানের বিশিষ্ট রূপ mode of knowledge (ন্যা)। বিশেষ আকার ধরন বা ভঙ্গি form, mode।
প্রকাশ—বিশ্বাতীত স্বয়ংজ্যোতির ভাবময় স্ফুরণ (শৈ)।
প্রকৃতি—মূলতত্ত্ব; মূল উপাদান।
প্রক্ষোভ—হৃদয়ের উদ্বেলিত অবস্থা emotion।
প্রচয়—পুষ্টি development। জোট বাঁধা aggregation (ন্যা)।
প্রচলদ্-রূপ—মূল হতে বেরিয়ে-আসা নতুন রূপ।
প্রচার—চলন।
প্রচেতনা—চেতনার ক্রমবিপুল অগ্রাভিযান (শ্রু)।
প্রচোদনা—প্রেরণা, প্রবর্তনা (শ্রু)।
প্রচ্ছুরণ—(শক্তির) সামনের দিকে বিকিরণ projection।
প্রজ্ঞপ্তি—বাস্তবের আধারশূন্য কল্পিত নাম বা ভাব (বৌ)।
প্রজ্ঞান—শুদ্ধবুদ্ধির ভূমি হতে বৈচিত্র্যকে বিষয় করে স্ফুরিত জ্ঞান (শ্রু)।
প্রজ্ঞাবাদ—জ্ঞানের বুলি (স্মৃ)।
প্রণিধান—অন্তরে পরমপুরুষের নিত্যজাগ্রত অনুভব (সা)।
প্রতিকূলবেদনীয়—স্বাভাবিক প্রত্যাশিত অনুভবের বিপরীত [যেমন, দুঃখ]।
প্রতিক্ষেপ—কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ক্রিয়া বা শক্তির ধারার আবার মূল উৎসের দিকে ফিরে আসা reflex action।
প্রতিঘাতী—আঘাত পেয়ে উলটে আঘাত করে যে, প্রতিক্রিয়াশীল reactive।
প্রতিজ্ঞা—যুক্তি দিয়ে যা প্রতিপন্ন করতে হবে তার প্রাথমিক নির্দেশ ennunciation (ন্যা)। -হানি—তর্কস্থলে প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রমাণ করতে গিয়ে তার বিপরীত বিষয়কেই মেনে নেওয়া (ন্যা)।
প্রতিবর্তী—কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আবার পিনদিকে ফিরে আসে যা reflex।
প্রতিবেদন—খবর সরবরাহ communication; সামনে হাজির করা খবর message।
প্রতিবোধ—সাধারণ জ্ঞানের উপরের ভূমিতে জেগে ওঠা awakening, enlightenment; বোধিজাত অনুভব intuitional experience।
প্রতিভাস—আপাত-স্ফুরণ; প্রতীয়মান স্ফুরণ; চোখের উপরে যা ভাসছে appearance, phenomenon।।
প্রতিযোগী—সংশ্লিষ্ট অথচ বিরোধী, বিরুদ্ধ-সম্বন্ধযুক্ত।
প্রতিরূপ—ছবির মত সামনে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যাকে; প্রতিচ্ছবি (শ্রু)। সদৃশ।
প্রতিলোম—উল্টোমুখী reverse।
প্রতিষেধ—(অস্তিত্বের) অস্বীকার negation। .. বিণ. -ষিদ্ধ।
প্রতিষ্ঠা—মূল তত্ত্ব যার উপরে এবং যাকে আশ্রয় করে একটা-কিছু দাঁড়িয়ে থাকে [তু. 'অতিষ্ঠা'] (শ্রু)।
প্রতীত্যসমুৎপাদ—'জগতের সব-কিছুই কোনও প্রত্যয় বা কারণকে আশ্রয় করে উৎপন্ন অতএব কারও স্বয়ংসিদ্ধ কোনও সত্তা নাই' বৌদ্ধদর্শনের এই সিদ্ধান্ত—যার পর্যবসান অনিত্যবাদ ও দুঃখবাদে।
প্রতীপ—স্রোতের উলটোদিকে চলছে যা, স্বভাবের বিপরীত perverse। . ভাব. প্রতীপতা।
প্রত্যক্—ভিতরের দিকে মোড় ফেরানো যার introvert (শ্রু); বিষয়িগত subjective। -অনুভব—অন্তর্মুখ বোধ; স্বরূপের বোধ। -আত্মা—অন্তর্মুখ অনুভবে ফোটে আত্মার যে-স্বরূপ (শ্রু)। -কংপন, -কল্পনা—আত্মচেতনার আধারেই চিৎশক্তির বৃত্তির স্ফুরণ self-conception। -চেতনা—অন্তর্মুখ অনুভব। -দৃষ্টি—নিজেকে নিজে দেখা self-vision। -পুরুষ—অন্তরশায়ী চিন্ময় পুরুষ। -বৃত্ত—যার ক্রিয়ার ধারা অন্তর্মুখে subjective। ...ভাব. -বৃত্তি। -ব্যাপার—অন্তশ্চেতনার ক্রিয়া subjective action। -সত্তা—অন্তর্জগতে স্ফুরিত আত্মসত্তা subjective existence।
প্রত্যভিজ্ঞা—'এ তো তাই' বলে আগের জানা বিষয়কে আবার চিনতে পারা recognition।
প্রত্যয়—বোধ, অনুভব, প্রতীতি (সা)। মূল

কারণের সঙ্গে যুক্ত আনুষঙ্গিক কারণের সমূহ conditions (বৌ)। চিত্তভাবজনিত শারীর বিকার outward expression of mental activity (সা)। -সার—তত্ত্ববস্তুর গভীর অনুভব (শ্রু)।

প্রত্যয়ন—কোনও-কিছুকে প্রতীতি বা অনুভবের গোচর করা cognition।

প্রত্যয়াধিরূঢ়, প্রত্যয়ারূঢ়—যা জানা গেছে, জ্ঞানের বিষয়ীভূত cognised।

প্রত্যয়াভাস—অস্ফুট বোধ।

প্রত্যাহার—ফিরিয়ে আনা, ফিরিয়ে নেওয়া। বাইরের বিষয় হতে ইন্দ্রিয়কে ভিতরের দিকে গুটিয়ে আনা (সা)।

প্রদ্যোতনা—সামনের দিকে ছড়িয়ে-পড়া আলোর ছটা (শ্রু)।

প্রধানাদ্বৈতবাদ—'প্রধান বা প্রকৃতিই বিশ্বমূল অদ্বয়তত্ত্ব' এই মতবাদ।

প্রপঞ্চ—বাইরে দেখা যাচ্ছে যে জগৎবৈচিত্র্য। . বিণ. প্রাপঞ্চিক।

প্রপঞ্চাতীত—দৃশ্য বিশ্বকে ছাড়িয়ে আছে যা transcendent।

প্রপঞ্চোপশম—যে নিস্তরঙ্গ অনুভবে জগৎবোধ বিলুপ্ত (শ্রু)।

প্রপঞ্চোল্লাস–শক্তির জগদ্বৈচিত্র্যরূপে আনন্দে ছড়িয়ে পড়া।

প্রপত্তি—শরণাগতের নির্ভরতা (বৈ)।

প্রবর্তক—ক্রিয়াকে প্রথম চালু করে যে initiating agent ।...ভাব· প্রবর্তনা —একটা-কিছুকে চালু করবার জন্য প্রথম ধাক্কা; প্রেরণা। ক্রিয়ার নিয়ন্তা হয়ে তাকে চালিয়ে নেওয়া। শুরু।

প্রবাহনিত্যতা—অনন্তকাল ধরে চলা।

প্রবিবিক্ত—যে-ভূমিতে বিষয়-বিষয়ীর ভেদ এত সূক্ষ্ম যে নাই বললেই হয় (শ্রু)। -ভুক্—এই অবস্থার অনুভাবিতা।

প্রবৃত্তি—ক্রিয়া function, activity (সা); ক্রিয়াজনিত অবস্থান্তরের ধারা process। চলন। ঝোঁক। -সামর্থ্য —ইন্দ্রিয়জ্ঞানের প্ররোচনায় আরব্ধ ক্রিয়ার অনুরূপ সার্থকতা [যেমন, দূরে জল দেখে কাছে গিয়ে তাকে ব্যবহার করতে পারা যায় যদি তবেই জলের জ্ঞান 'প্রবৃত্তির সামর্থ্যে' সার্থক হল; মরীচিকাতে জলজ্ঞান এইজন্যই অসার্থক] verification of percepts or concepts (ন্যা)। fulfilled activity।

প্রবেশক—গোড়ার পর্ব।

প্রব্রজ্যা—ঘুরে-ঘুরে বেড়ানো। সন্ন্যাস।

প্রভবিষ্ণু—ক্রিয়াশক্তিতে স্ফুরিত dynamic।

প্রভুশক্তি—শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা।

প্রমা—যথার্থ জ্ঞান বা অনুভব।

প্রমাণ—যথার্থ অনুভবের উপায় method of right knowledge।

প্রমাদী—ভুল করা যার স্বভাব।

প্রমাপক—সত্য বলে প্রমাণিত করে যে verifier।

প্রমিতি—যথার্থ জ্ঞান বা অনুভব; তার ব্যাপার বা প্রক্রিয়া।

প্রমুক্তি—বন্ধন ছাড়িয়ে-ছাড়িয়ে চলা; মুক্তির ক্রমিক অভিযান (শ্রু)।

প্রমেয়—যথার্থ জ্ঞানের বিষয় object of right knowledge।

প্রযতি—দিব্য-সংকল্পের প্রবর্তনা (শ্রু)।

প্রযত্নশৈথিল্য—শরীর আলগা করে ছেড়ে দেওয়ার ভাব [যেমন, ধ্যানাসনে] (সা)।

প্রযোজক—গোড়াতে যার প্রেরণায় ও অধ্যক্ষতায় কাজ চলে; প্রবর্তক। প্রবর্তক হয়েও নির্লিপ্তভাবে কাজে ভাগ নেয় যে (বৈ)। প্রবর্তক হেতু initiating and determining agent। একটা-কিছু ঘটিয়ে তোলে যে।...ভাব· প্রযোজনা।

প্রশান্তবাহিতা—বৃত্তিহীন চিত্তের নিস্তরঙ্গ হয়ে বয়ে চলা (সা)।

প্রসাদ—চিন্ময় আবেশহেতু জড়ে আবির্ভূত স্বচ্ছতা (বৌ)।

প্রসৃতি—সামনের দিকে এগিয়ে চলা।

প্রস্তার—ছক করে সাজানো array। ভিন্ন বস্তুকে যথাসম্ভব বিভিন্ন আকারে সাজানো permutation [অগ্র-পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি রেখে সাজানো 'প্রস্তার', নইলে 'সংযোগ' (combination)] (জৈ)। তারতম্য অনুসারে সাজানো gradation।

প্রস্থান—দার্শনিক চিন্তার বিশিষ্ট ধারা বা 'তন্ত্র' school or system of thought।

প্রাকৃত-পুরুষ—বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে জড়িত পুরুষ surface-being।

প্রাকৃতিক-নির্বাচন — পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে ব্যক্তি-জীবেরা লোপ পেয়ে যায় প্রকৃতির যে-রীতিতে natural selection।

প্রাক্-সত্তা—পূর্বকালীন অস্তিত্ব pre-existence। -সিদ্ধ—আগে থেকেই অস্তিত্ব ছিল যার।

প্রাগ্-অনুভব—যা ঘটবে তা আগে থেকেই দেখতে পাওয়া বা জানতে পারা। -অভাব—উৎপত্তির পূর্ববর্তী অভাব, আগে না থাকা prior non-existence (ন্যা)। -ভাবী—আগেও অস্তিত্ব ছিল যার, পূর্বসিদ্ধ pre-existent।

প্রাণ-ধাতু—প্রাণময় উপাদান life-material। -পরিণামবাদ—'প্রকৃতিতে শুধু প্রাণশক্তিরই বিকাশ হয়ে চলেছে বিচিত্র রীতিতে' এই মতবাদ। -মানস—প্রাণশক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট এবং তার আশ্রয়ে প্রকটিত মনঃ-শক্তি। -সত্ত্ব—প্রাণময় উপাদানের 'পরে নির্ভর করছে যার অস্তিত্ব vital being।

প্রাণন—প্রাণশক্তির ক্রিয়া। -মন—প্রাণের ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে যে-মন।

প্রাণাত্মা—(বহির্মুখ) প্রাণশক্তিতে স্ফুরিত আত্মভাব vital being।

প্রাতিভ—অলৌকিকভাবে অন্তরে ফুটে-ওঠা, অতীন্দ্রিয় (সা)। -জ্ঞান, -দর্শন—এখনও যা ঘটেনি তা জানতে পারা। -মনন—ঘটনা ঘটবার আগেই তার আভাস পায় মনের যে-ক্রিয়া pre-monition।

প্রাতিভাসিক—আপাতপ্রতীয়মান (বে)।

প্রাতিহার্য—অপ্রাকৃত ব্যাপার miracle (বৌ)।

প্রামাদিক—প্রমাদ বা ভুল হতে উৎপত্তি যার।

প্রারব্ধ—সঞ্চিত কর্মফলের যতটুকু পুঁজি করে বর্তমান জীবনধারার শুরু (বে)।

প্রেত্যভাব—আত্মার এক শরীর ছেড়ে আর-এক শরীর গ্রহণের নিয়ত পরম্পরা, জন্মান্তরপ্রবাহ (ন্যা)।

প্রেমসেবোত্তরাগতি—ভগবানকে ভালবেসে সিদ্ধদেহে তাঁর সেবায় অনন্তকাল অতিবাহন (বৈ)।

প্রেষণা—সামনের দিকে ঠেলে নেওয়া (শ্রু); (আদি) প্রবর্তনা initiative, urge; অনুপ্রাণনা।...বিণ· প্রেষিত।

প্রেতি—সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া (শ্রু)। অনুকূল প্রেরণা impulsion।

প্রৈষমন্ত্র—আদেশ বা প্রেরণার বাণী (শ্রু)।

প্রৈষা—দ্র· 'প্রেষণা'। চাপ। (শ্রু)।

ফলোপধায়ক—বিশিষ্ট ফলের উৎপাদক, সার্থক।

ফেটিশিজ্‌ম—'ফেটিশ' বা চেতনাধিষ্ঠিত জড়বস্তুতে বিশ্বাস এবং তার আরাধনা।

বজ্রসত্ত্ব—বজ্রের বীর্য ও দৃঢ়তা আছে যার মধ্যে।

'বন্ধুরাত্মা'—আত্মারূপে আপন যিনি (স্মৃ)।

বর্গীকরণ—বর্গ বা সজাতীয় সমূহে ভাগ করা classification।

বর্তনি—পথ মোড় নিয়েছে যেখান থেকে turning point (শ্রু)।

বশিত্ব—(প্রকৃতির 'পরে) সার্বভৌম কর্তৃত্ব (শ্রু)।

বশীকার—সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা (সা)।

বস্তু-কৃতি—ভাবকে বস্তুর আকারে ফুটিয়ে তোলা executive dynamism। -ঘন—বস্তুর আকারে জমাট-বাঁধা objectivised। -বিভূতি—বাস্তব রূপায়ণ real manifestation। -শূন্য—বস্তুর সঙ্গে যোগ নাই যার abstract (সা)। -সৎ—বাস্তব সত্তা আছে যার, পরমার্থ-তত্ত্ব Real Being। -স্থিতি—বস্তুর যথাযথ সন্নিবেশ, বাস্তবতা।

বহিঃ-করণ—বাইরের কাজ করবার সাধন বা যন্ত্র [প্র· অন্তঃকরণ] outer instrumentation। -সংবাদী—বাইরের সঙ্গে যা মিলে যায় verifiable or verified। -সত্তা—আত্মসত্তার বাইরের দিক surface being।

বহির-অঙ্গ—বাইরের, বাহ্যিক। -আবৃত্ত—বাইরের দিকে মোড় যার। -বৃত্ত—যার বৃত্তি বা ক্রিয়ার গতি বাইরের দিকে, বহির্মুখ। -ভাস—বাইরে ফুটে ওঠা।

বহিশ্চর—বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়ানো স্বভাব যার; উপরভাসা।

বহুধা-চিতি—সচেতনতার নানা ধরন। -বিকল্পিত—নানাধরনের রূপকৃতির

সমাবেশ হয়েছে যার মধ্যে multi-form। -বিসৃষ্টি—নানা আকারে নিজেকে উৎসারিত করা। -বৃত্ত—নানা ভঙ্গিতে চলেছে যা; নানাধরনের ক্রিয়া যার।

বহু-পুরুষবাদ—'প্রকৃতি এক কিন্তু তার ভোক্তা পুরুষ বহু এবং ভিন্ন-ভিন্ন' এই মতবাদ (সা)। -ভাবনা—বহুরূপে ফুটে ওঠা manifold becoming।

বাক্-বৈখরী—বাক্‌শক্তির চতুর্থভূমি—মানুষের শব্দময় ভাষায় যার প্রকাশ (শা)। -মধ্যমা—শব্দময় ভাষার চেয়ে সূক্ষ্ম মনোময় বাক্‌শক্তি (শা)।

বাঙ্‌ময়—কথায়-গাঁথা। কথার বাঁধুনি, নিবন্ধ।

বাচক—ভাষা দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে।

বাচ্যার্থ—কথার সোজা মানে [তু. 'ব্যঙ্গার্থ']।

বাদ—তত্ত্ব বোঝবার জন্য ধীরভাবে বিচারের প্রয়োগ (ন্যা)।...কর্তৃ· বাদী।

বাধ -একটি অনুভব দিয়ে আর-একটি অনুভবের খণ্ডন [যেমন, জাগ্রৎ দিয়ে স্বপ্নের] (বে)।...বিণ· বাধিত।

বার্তাশাস্ত্র—'বৃত্তি' বা জীবিকার্জন ও ভোগোপকরণ-সঞ্চয়ের বিদ্যা economics।

বাসিত—অধিষ্ঠান-চৈতন্যের আভাস যার মধ্যে ensouled (শ্রু)। আবিষ্ট, অনুষিক্ত।

বিকর্ম—কর্মের ভুল ধারা, ভুল কাজ (স্ম্)।

বিকলন—পুঞ্জিত অবস্থা থেকে আলাদা করা বা হয়ে পড়া disaggregation।

বিকল্প—শুধু ভাষাকে অবলম্বন করে কোনও বিষয়ের অবাস্তব ও অস্ফুট প্রতীতি unreal mental construction (সা); অবাস্তব কল্পনা। অবাস্তব রূপায়ণ। একাধিক বা অন্যতর রূপ alternative। -বৃত্তি—চিত্তের যে-ক্রিয়াতে বিকল্পের সৃষ্টি হয়।

বিকল্পন—ভাবময় রূপসৃষ্টি (শ্রু)। -কল্পনা —'বিকল্পবৃত্তির' সহায়ে মনগড়া কল্পনা mental construction। অবাস্তব রূপসৃষ্টি unreal creation।

বিকৃতি—(প্রকৃতি বা মূলবস্তুর) বিভিন্ন রূপ variable forms(মী); বিকার, রূপান্তর mutation; উৎপন্ন ধর্ম derivative phenomenon (সা)। বি-কৃতি—(রূপের) বৈচিত্র্য।

বিক্ষেপ—শক্তির বিচ্ছুরণ ও ব্যবস্থাপন action and distribution of energy; বিচ্ছুরণ (শা)। অবিদ্যার প্রভাবে বিকৃত রূপের অবতারণা; অবিদ্যাজনিত বিকৃত রূপ (বে)। -শক্তি—বিকৃত রূপের সৃষ্টি হয় অবিদ্যার যে-শক্তি থেকে distorting power of ignorance (বে)।

বিগ্রহ—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সজ্জা ও সমবায়ে গড়ে-তোলা সমগ্র মূর্তি বা রূপ structure; বিশিষ্ট আকৃতি form।

বিচার—তত্ত্বদর্শনের অনুকূল অন্তর্মুখী ভাবনা (সা)। ধ্যানচিত্তের দ্বিতীয় অবস্থা -যখন ধ্যেয় বিষয়ের গভীরে ডুবে গিয়ে তার সামান্যরূপের সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় (সা, বৌ)।

বিজাতীয়-ভেদ—ভিন্নজাতীয় বস্তুর মধ্যে পরস্পরের ভেদ।

বিজ্ঞান—মনের ওপারে চেতনার সর্বতোভাস্বর ভূমি (শ্রু)। ভাব. idea। চেতনা, চিত্তবৃত্তি, বোধ consciousness and its functions (বৌ)। -ঘন—'বিজ্ঞান' বা অতিমানস চেতনা জমাট বেঁধেছে যার মধ্যে gnostic (শ্রু)। -চেতনা—মনের ওপারের দিব্যভূমির অনুভব gnosis -ধাতু—বিজ্ঞানরূপী বিশ্বের মৌল উপাদান। 'বিজ্ঞান' অর্থাৎ বিভিন্ন জ্ঞানের আকারে স্ফুরিত চেতনারূপী আধার বা আশ্রয় consciousness as substratum (বৌ)। -বাদ—'বিজ্ঞান বা ভাবই সত্য, বস্তু তার ছায়ামাত্র' এই মতবাদ Idealism। -বৃত্তি—'বিজ্ঞান'-শক্তির ক্রিয়া। -সন্তান—ক্ষণস্থায়ী চিত্তবৃত্তির প্রবাহ (বৌ)।

বিতর্ক—ধ্যানচিত্তের প্রথম অবস্থা—যখন ধ্যেয় বিষয়কে বিভিন্ন দিক হতে দেখবার সংস্কার প্রবল থাকে (সা, বৌ)।

বিত্তৈষণা—ভোগের উপকরণ খুঁজে বেড়ানো (শ্রু)।

বিদেহ-ভাবনা—দেহাত্মবোধরূপী সীমিত চেতনাকে ছাড়িয়ে ওঠবার সাধনা।

বিদ্যা-কঞ্চুক—বিদ্যা বলে মনে হলেও

আসলে যা বিদ্যা নয়, সীমিত জ্ঞান (শৈ)।

বিদ্যাভীপ্সা—তত্ত্বজ্ঞানলাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তার প্রতি অভিযান (শ্রু)।

বিদ্যোতনা—বিদ্যুন্ময় ঝলক (শ্রু)।

বিধৃতি—আশ্রয়রূপে ধরে আছে যে-শক্তি; এমনি করে ধরে থাকা (শ্রু)।

বিনশ্যৎ-স্বভাব—শূন্যে মিলিয়ে যাবার প্রবণতা।

বিনাশ—আত্মভাবের প্রলয়, সর্বশূন্যতা (শ্রু, বৌ)।

বিনিগমক—বিশিষ্ট ফলসিদ্ধিতে পর্যবসান যার; নিশ্চায়ক।

বিন্দুচেতনা—সমস্ত চেতনাকে গুটিয়ে আনবার ফলে অনুভবের যে-তীব্রতা।

বিপচ্যমান—পরিপাক ঘটছে যার, ফলোন্মুখ।

বিপথচারণা—ভুলপথে নিয়ে যাওয়া।

বিপরিণাম—তত্ত্বের বিশেষ-কোনও বিকার বা অবস্থান্তর mutation, modification।

বিপর্যয়—যা আসলে যা নয় তাকে তাই বলে জানা, বস্তুর অযথাভূত মিথ্যাজ্ঞান (সা)। বিপরীত জ্ঞান।

•বিপাক—পুষ্টির ফলে ঘটে যে চরম পরিণতি। কর্মফলের পরিপুষ্টি—যা থেকে নতুন জন্মের পত্তন হয় (সা)।

বিবর্ত—তত্ত্ববস্তুর ভাবময় 'পরিণাম' conceptual evolution of an entity, conceptive becoming। প্রতিভাস phenomenal becoming (বে)। ..বিণ· বিবর্তিত—প্রতিভাসিত। ভাব· বিবর্তন।

বিবিক্ত—নিঃসম্পর্ক, পৃথক, আলাদা। -বৃত্ত—সবার থেকে আলাদা হয়ে চলছে যে। -ভাবনা—আলাদা হবার বা থাকবার ঝোঁক separative attitude। -মুখী—অলাদা হয়ে চলেছে যা। -সংবিৎ—নিজের থেকে আলাদা করে' অনুভব।

বিবিচ্য-বৃত্ত—বিষয়কে) আলাদা করে ভেঙে-ভেঙে চলে যা separative, analytic।

বিবৃত—বীজভাব হতে ক্রমান্বয়ে যা ফুটে উঠছে। ব্যাখ্যাত।...বি· বিবৃতি।

বিবেক—আলাদা-আলাদা করে বা চিরে-চিরে দেখা discrimination (সা); আলাদা করা বা আলাদা থাকা। -খ্যাতি—'বিবেক' হতে উৎপন্ন চরম জ্ঞান (সা)।

বিবেচনশক্তি—আলাদা করে বেছে নেবার সামর্থ্য।

বিভঙ্গ—নানান আকারে ভেঙে-ভেঙে পড়া; পরিবর্তমান রূপ, নানা ভঙ্গি mutable forms। বিশিষ্ট ধরন।

বিভজনধর্মী—ভেঙে-ভেঙে চলা বা দেখা স্বভাব যার।

বিভজ্য-দর্শী, -বাদী—তত্ত্বসন্ধানের বেলায় বিশ্লেষণপন্থী। -বৃত্ত—ভেঙে-ভেঙে চলা স্বভাব যার separative।

বিভাতি—বহু-বিচিত্র প্রকাশ বা স্ফুরণ (শ্রু)।

বিভাব—একই তত্ত্বের নানান দিক aspect। আলাদা-আলাদা ভঙ্গি।

বিভাবনা—বিচিত্র 'ভাবনা'। বিচিত্র রূপে রূপায়িত করা manifold manifestation, deployment; তদনুকূল প্রবৃত্তি বা ঝোঁক; এমনিতর বিচিত্র রূপ। পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য থাকা বা পার্থক্য রেখে চলা differentiation। (তত্ত্বের) নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি বা তার হেতু determinate manifestation, determinant।.. ....বিণ. বিভাবিত।

বিভাস—বিশিষ্ট স্ফুরণ।

বিভু—সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে যা, বিশ্বব্যাপী (বে)।

বিভূতি—বিচিত্র হয়ে ফুটে ওঠা manifold becoming (শ্রু); বিচিত্র বা বিশিষ্ট রূপ; এমনিতর রূপায়ণের সামর্থ্য। ঐশ্বর্য, শক্তিবিশেষ। অলৌকিক শক্তিবিশেষ (সা)। -পুরুষ—পূর্ণের অংশকলারূপে আবির্ভূত পুরুষ part-self। মূল হতে আ-ভাসরূপে আবির্ভূত পুরুষ phenomenal person। -বর্গ—পরম-পুরুষের লোকোত্তর ঐশ্বর্য প্রকট হয়েছে যে-পুরুষসমূহের মধ্যে master-beings of the universe (বৈ)। -বিস্তর—(ব্রহ্মের) বহু-বিচিত্ররূপে নিজেকে ফুটিয়ে তোলা (স্মৃ)। -সংবিৎ—চেতনার যে-ভূমিতে দৃক্‌শক্তিরই অধিষ্ঠানে দৃশ্যরূপে ফোটে রূপায়ণের

বৈচিত্র্য apprehensive movement of the supermind।
-স্পন্দ—রূপায়ণী শক্তির ক্রিয়া।

বিভ্রম—সমূল অবাস্তব প্রতীতি [যেমন, দড়িতে সাপ দেখা; অমূল হলে 'কুহক'] illusion।.. ...ভাব- বিভ্রমণ।

বিমর্শ—একাগ্রভাবনা। স্বপ্রকাশতত্ত্বের রূপ-ক্রিয়াময় বিচ্ছুরণ, শিবের আত্মভূত শক্তির চিন্ময় লীলা (শা)। নাট্য বা আখ্যান বস্তুর পরিণত অবস্থা।

বিযোজন—আলাদা করে নেওয়া dissociation।

বিরাট্—বহু-বিচিত্ররূপে স্ফুরিত the Many; বিশ্বরূপে প্রকটিত (শ্রু)। -পুরুষ—বিশ্বরূপে আবির্ভূত চিৎসত্তা cosmic Being। -প্রকৃতি—বিশ্ব-প্রকৃতি cosmic Nature। -ভাব —বিশ্বসত্তা world-being।

বি-রূপ—পরস্পরের মধ্যে রূপের ভেদ বা বৈচিত্র্য আছে যাদের [প্র. 'স-রূপ']।

বিলাস-বিবর্ত—চিদ্‌বিভূতির তাত্ত্বিক অথচ বিপরীতভাবের আভাসযুক্ত স্ফুরণ (বৈ)।

বিশরণ—আলগা হয়ে ছড়িয়ে পড়া dispersion।

বিশিষ্ট-প্রত্যয়—ভাসা-ভাসা নয়—কিন্তু নিবিড়ভাবে বস্তুর বিশেষ বোধ [প্র- 'সামান্য-প্রত্যয়']।

বিশেষ—ভেদসাধক ধর্ম differentia। -দর্শন—অস্পষ্ট সামান্য-অনুভবের সুস্পষ্ট পরিণামের ফলে বিষয়ের বিশিষ্ট জ্ঞান perception। -দর্শী—ইন্দ্রিয়ের সহায়ে বিষয়ের একটা বিশেষ দিককে স্পষ্ট করে জানা স্বভাব যার। -ধর্মী—বিশিষ্ট অনুভব জন্মাতে পারে এমন ধর্ম বা সামর্থ্য আছে যার concrete।

বিশেষণ—স্বরূপত যা নির্বিশেষ তাকে বিশিষ্ট বা নিরূপিত আকার দেওয়া particularisation, determining; এমনিতর বিশিষ্ট আকার বা ভঙ্গি determination। ভাবের দিক দিয়ে সীমা রচনা।

বিশেষাবগাহী—বিষয়ের বিশিষ্ট ধর্মের মধ্যে ডুবতে পারে যা।

বিশ্রম্ভ—গোপন বিষয়—যা বিশ্বাস করে আপন জনকেই বলা চলে।

বিশ্রান্তি—পরমতত্ত্বের সঙ্গে এক হওয়ার আনন্দময় নিস্তরঙ্গ অনুভব।

বিশ্ব-ক্রতু—সমস্ত জগতের মূলে রয়েছে যে দিব্য-ইচ্ছার প্রেরণা All-Will। -চিৎ—বিশ্বে নিবিষ্ট ও পরিব্যাপ্ত চৈতন্য। -চেতন—জগতের সব-কিছুর অখণ্ডবোধ আছে যার মধ্যে। -জড়—বিশ্বব্যাপ্ত জড় উপাদান cosmic matter। -বিগ্রহ—সমষ্টি বিশ্বের আকারে মূর্তি ধরছেন যিনি Cosmic Purusha -ভাব—পরমার্থসতের জগৎরূপে অবস্থান cosmic being। -ভাবন—জগৎকে যে ফুটিয়ে তুলছে (স্মৃ)।...ভাব- -ভাবনা। -ভূত—বিশ্বরূপে আবির্ভূত যা-কিছু তার সমষ্টি universal existence (শ্রু)। -রতি—জগতের সব-কিছুতে রসের সম্ভোগ। -সৎ—বিশ্বের আধার ও তার অন্তর্নিহিত সত্তা।

বিশ্বাত্ম-ভাব, -ভাবনা—আত্মাকে জগন্ময় বলে অনুভব করা।

বিশ্বাত্মা—জগতের মূলে অধিষ্ঠিত এবং জগৎরূপে প্রকটিত আত্মস্বরূপ cosmic self।

বিশ্বোত্তীর্ণ—জগৎভাবকে যা ছাড়িয়ে গেছে transcendent (শৈ)।

বিষম-ব্যাপ্ত—পরস্পর সমান-সমান হয়ে ছড়িয়ে পড়েনি যা of unequal extension।

বিষয়—জ্ঞেয় বস্তু object of knowledge। যার প্রতি প্রেম জন্মে Beloved (বৈ)। -বতী প্রবৃত্তি —দিব্য শব্দ-স্পর্শ ইত্যাদির অলৌকিক অনুভব হয় যে-চিত্তবৃত্তিতে (সা)। -বিমর্শ—বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত একাগ্র ভাবনা।

বিষয়াকারা বৃত্তি—বিষয়ের অনুভব সবখানি জুড়ে আছে যে-চিত্তস্পন্দের।

বিসংবাদ—অনমিবনাও, গরমিল।

বিসর্প—আকস্মিক বিচ্ছুরণ। -সর্পণ —দিকে দিকে ছড়িয়ে যাওয়া।

বিসৃষ্টি—(শক্তির) বিচিত্র রূপ ফুটিয়ে দিকে-দিকে ছলকে পড়া; শক্তির নির্ঝরণ

(শ্রু)। নিজের ভিতর থেকে রূপ ফোটানোর সামর্থ্য, উৎসারণ।

বিস্রস্তি—আলগা হয়ে ছড়িয়ে পড়া disintegration (শ্রু)।

বীজ-ঘন—বীজের আকারে জমাট হয়ে আছে যা। -ভাব—বীজের মত দানা-বাঁধা অথচ ফোটবার জন্য উন্মুখ অবস্থা potentiality।

বুদ্ধিযোগ—বুদ্ধির ব্যবহার। শুদ্ধ বুদ্ধির সাধনা বা আবেশ (স্মৃ)।...বিণ· -যুক্ত।

বুদ্ধ্যারূঢ়—বুদ্ধির বিষয়ীভূত।

বুভূষা—(বহু) হবার আকাঙ্ক্ষা will-to-become (শৈ)।

বৃত্তচাপ—বৃত্ত বা মণ্ডলের এক অংশ arc।

বৃত্তি—ক্রিয়া, ব্যাপার activity, function; চলন movement, পরিণাম। চিত্তের ধর্ম সামর্থ্য বা স্পন্দন mental faculty or function (সা)। জীবিকা। -চৈতন্য—'বৃত্তির' আকারে স্পন্দমান চেতনা। -নিরোধ—চিত্তক্রিয়ার লয় (সা)। -পরিণাম—মনোময় ক্রিয়ার পরম্পরা বা ফল। -বিচ্ছেদ—ভাবপদার্থের বোধ হতে চিত্তবৃত্তির আলগা হয়ে পড়া। -যোজনা—বিভিন্ন মনোধর্মকে যথাযথভাবে সাজানো। -সংস্থান, -সৌকর্য—জীবিকার সুব্যবস্থা। -সঙ্কোচ—ক্রিয়াশক্তিকে সীমিত বা কুণ্ঠিত করা। -সারূপ্য—চিত্তবৃত্তির সঙ্গে চেতনপুরুষ একাকার হয়ে যান যে-অবস্থায় (সা)।

বৃহৎসাম—দ্যুলোকের অন্তহীন সুরলীলা যার মধ্যে সমস্ত বৈচিত্র্যের সমন্বয় (শ্রু)।

বেদনা—সুখ দুঃখ প্রভৃতি চিত্তের প্রক্ষোভময় বৃত্তি feeling, emotion (বৌ)।

বৈকৃত—মূল প্রকৃতি হতে স্খলিত [প্র· প্রাকৃত] abnormal।

বৈক্লব্য—পঙ্গুতা, শক্তিহীনতা।

বৈখরী—দ্র· 'বাক্ বৈখরী'। সুস্পষ্ট; প্রাকৃতভূমিতে স্ফুরিত।

বৈজাত্য—প্রকৃতিপরিণামের ফলে জাতের ভেদ।

বৈতণ্ডিক—তর্কের সহায়ে কোনও-কিছুকে প্রতিষ্ঠা না করে যা-কিছু সামনে আসে তাকেই খণ্ডন করে চলে যে-তার্কিক (ন্যা)।

বৈধমার্গ—সাধনায় বিধিনিষেধ মেনে চলবার পথ [প্র· 'রাগমার্গ'] (বৈ)।

বৈনাশিক—কোনও সৎ পদার্থ নয় কিন্তু বিনাশ বা শূন্যই চরম তত্ত্ব যাঁদের মতে (বৌ)।

বৈন্দবাসনা—ঘনীভূত অথচ স্ফুরণোন্মুখ পরমচেতনায় অধিষ্ঠিত যিনি (শা)।

বৈন্দবী-সত্তা—সংহত ও কেন্দ্রীভূত অবস্থা।

বৈভব—বীর্য ও বিভূতির লীলা powers and aspects and their manifestations, *numen* (বৈ), বিচিত্র ঐশ্বর্য।

বৈরাজসাম—প্রজাপতির চিন্ময় সুরলীলা—যাতে ফোটে বিশ্বের রূপ (শ্রু)।

বৈরাজ্য—বিশ্বের 'পরে আধিপত্য (শ্রু)।

বৈরূপ্য—রূপের বিকৃতি।

বৈশারদ্য—স্বচ্ছতা; শুদ্ধবুদ্ধির স্বচ্ছ প্রবাহ (সা)।

বৈশিষ্ট্যাবগাহী—বৈশিষ্ট্য বা ভেদভাবকে আশ্রয় করে আছে যা।

বৈশ্বানর—ব্যক্তিচেতনাতে স্ফুরিত বিশ্ব-চেতন সত্তা universal individual (শ্রু)।

বোধন—বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ, বোঝা understanding।

বোধি—প্রাকৃত মন-বুদ্ধির ঊর্ধ্বস্থিত চেতনার স্বচ্ছ ও সহজ প্রকাশ intuition। -চিত্ত—যে মন-বুদ্ধিতে 'বোধির' লীলাই প্রধান mind of intuitional intelligence। -সত্ত্ব—'বোধিই' যাঁর স্বভাব ও চারিত্রের উপাদান।

বৌদ্ধ—বুদ্ধিজাত, বুদ্ধিসম্পর্কিত intellectual।

ব্যক্ত-ব্রহ্ম—বিশ্বরূপে প্রকটিত ব্রহ্মসত্তা। -মধ্য—আদি আর অন্ত বাদ দিয়ে শুধু মাঝের অংশটুকু পরিস্ফুট যার (স্মৃ)। -সৎ—পরমার্থসতের যেদিকটা বিশ্বের রূপ নিয়েছে। -সামান্য—ক্রিয়া বা গুণের বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বৈচিত্র্যের সাধারণ আশ্রয় general determinate।

ব্যক্তি—বিশিষ্ট গুণ ও ক্রিয়ার আধার যে পুরুষ individual, person। -ভাব—বৈশিষ্ট্য। পুরুষের ব্যক্তিগত স্ব-তন্ত্র বৈশিষ্ট্য personality।

-ভাবনা--'ব্যক্তিভাবের' ক্রমিক পরিণতি ও বিশিষ্ট রূপায়ণ growth of personality-structure। -সত্তা—ব্যক্তির আকারে স্ফুরিত চিৎসত্তা, ব্যক্তিত্বের মূল আধার individual being। -সত্ত্ব—'ব্যক্তিভাবের' মূল উপাদান essence of personality।

ব্যঙ্গ্যার্থ—কথার সোজা মানের আড়ালে অথচ তারই সঙ্গে জড়িত আর-কিছুর ইঙ্গিত suggested meaning [প্র· 'বাচ্যার্থ']।

ব্যতিরেকমুখী—বিপরীতদিকে সরে যাচ্ছে যা।

ব্যতিষঙ্গ—নিবিড় অন্যোন্যসম্পর্ক mutuality। ...বিণ. ব্যতিষক্ত—ওতপ্রোত।

ব্যতিহার—(ক্রিয়া প্রভৃতির) অন্যোন্য-বিনিময় reciprocity।

ব্যবস্থিত—নিরূপিত, নির্দিষ্ট fixed। নির্দিষ্ট ধরনে ও বিভিন্ন অবস্থানে সাজানো arranged in spatial relations, distributed in space। ... বিণ. ব্যবস্থিতি—নির্দিষ্ট নিয়ম। দৈশিক অবস্থানের বিশেষ ধরন।

ব্যবহার—পরস্পরের সম্বন্ধ এবং তদাশ্রিত আচরণ; লোকযাত্রা।...বিণ· ব্যাব-হারিক।

ব্যভিচার—একসঙ্গে না থাকা want of concomitance [প্র· 'সহচার'] ব্যতিক্রম। ভ্রষ্টতা।

ব্যষ্টি—পৃথক-পৃথক ভাব individuality [প্র. 'সমষ্টি']। আলাদা-আলাদা। -বিগ্রহ—'ব্যষ্টি' জীব-সত্তায় মূর্তি ধরেছেন যিনি individualising Purusha [প্র·' 'বিশ্ব-বিগ্রহ']। -বিভূতি—পৃথক সত্তা নিয়ে ফুটে উঠেছে যা। -ভাবনা—পৃথক হয়ে ফুটে ওঠা বা পৃথক করে ফুটিয়ে তোলা individual becoming, individualisation।

ব্যাকৃতি--বিশেষ আকার দেওয়া বা নেওয়া formulation; বিশিষ্ট রূপ distinct form; বিচিত্র বা বিশিষ্ট রূপায়ণ। বিশেষিত করা determination; বিশিষ্ট ধর্মের আধার বা প্রবর্তক determinate। বিশেষণ।...বিণ· ব্যাকৃত—বিশেষ আকারে স্ফুরিত; নানা আকারে রূপায়িত। আকারিত, স্পষ্টীকৃত, অভিব্যক্ত। -সামান্য—স্বয়ং বিশিষ্টধর্মযুক্ত হয়েও যা বহু ব্যক্তি-বৈচিত্র্যের সাধারণ আশ্রয় generic determinate।

ব্যাপার—ফলাভিমুখী প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া effective working।

ব্যাপ্তি—সাধ্য ও হেতুর মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ যার ফলে হেতু থেকে সাধ্যের অনুমান সহজ হয় [যেমন, আগুন (সাধ্য) আর ধোঁয়ার (হেতু) মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকলে তবেই ধোঁয়া দেখে আগুনের অনুমান করা চলে] (ন্যা)। -ধর্ম—ছড়িয়ে পড়ার ভাব।

ব্যাপ্রিয়া—ব্যাপার, ক্রিয়া operation।

ব্যাবর্তক—সব-কিছু থেকে আলাদা করে নেয় যে, ভেদক excluding, distinguishing।

ব্যাবৃত্ত—আলাদা-করে-নেওয়া, নিঃসম্পর্ক exclusive। ...ভাব· ব্যাবৃত্তি।

ব্যামোহ—বোঝবার গোল, গোলমেলে ভাব।

ব্যাসঙ্গ—আলাদা করে নেওয়া, সম্পর্কচ্ছেদ dissociation [প্র· 'অনুষঙ্গ', 'আসঙ্গ']।

ব্যাহৃতি—সৃষ্টির বীজমন্ত্র (শ্রু)।

ব্যুত্থান—মগ্নদশা থেকে আবার ভেসে ওঠা (সা)।...বিণ· ব্যুত্থিত।

ব্যূহ—বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যথারীতি সাজিয়ে নিয়ে রূপ দেওয়া হয়েছে যাকে organic structure। পৃথক-পৃথক করে সাজানো [প্র· 'সমূহ'] (শ্রু)। বহুর সমবায় assemblage, collection। মূলতত্ত্বের ক্রমিক অথচ সংহত রূপায়ণ (বৈ)।...ভাব· ব্যূহন—'ব্যূহের' আকারে সাজানো organisation। বিণ· ব্যূঢ়, ব্যূহিত। -চিৎ—ব্যষ্টি চিন্ময়সত্ত্বের ব্যূহ বা সমবায় collective spiritual units।

ব্রত—বিশেষভাবে বরণ করে নেওয়া কর্ম বা গতির একটি ধারা chosen line of action, law (শ্রু)।

ব্রহ্ম-জ—ব্রহ্ম হতে ব্রহ্মের ভাব নিয়ে আবির্ভূত (শ্রু)। -বিহার—ব্রাহ্মী-চেতনার পূর্ণতা নিয়ে অকুণ্ঠভাবে চলাফেরা

করা। -সদ্‌ভাব—ব্রহ্মসত্তার অখণ্ড ব্যাপ্তি; তার অনুভব (স্ম)।

ব্রহ্মাকারা বৃত্তি—অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার অনুভব ফোটে চিত্তের যে-পরিণামে (বে)।

ব্রাহ্ম-ন্যায়—ব্রহ্মের প্রজ্ঞায় দেখা দেয় লৌকিক বুদ্ধির অতীত যে যুক্তির বিধান absolute reason, logic of the Infinite।

ভব—হওয়া; হওয়া এবং থাকা, অস্তিভাব existence। হওয়ার বা জন্মাবার আকাঙ্ক্ষা (বৌ)। -চক্র—অস্তিভাবের আবর্তন, জন্ম-জন্মান্তর cycle of existences। -নিরোধ —আর জন্ম না হওয়া (বৌ)। -প্রত্যয় —জন্মের আকাঙ্ক্ষারূপ 'হেতু' যা হতে জন্ম ও তজ্জনিত বন্ধন (বৌ)। -সন্তান—কামনার প্ররোচনায় জন্মের পরম্পরা। -স্রোত—অস্তিত্বের প্রবাহ; জন্মজন্মান্তরের ধারা।

ভবদ্‌-রূপ—একটা-কিছু হবার দিকে প্রবণতা রয়েছে যার—এমনিতর বিশেষ-কোনও ভঙ্গি বা ধারা dynamic form।

ভবন—কিছু হওয়া বা ঘটা।

ভব্য—যার ঘটবার সম্ভাবনা বা সামর্থ্য আছে possible (শ্রু)। -রূপ—সম্ভাবিত রূপ।

ভব্যার্থ—'ভব্য' বিষয় possibles, potentialities [তু· 'ভূতার্থ']।

ভাতি—প্রকাশ, স্ফুরণ (শ্রু)।

ভান—প্রতিভাত হওয়া, প্রতিভাস appearance।

ভাব—সত্তা, অস্তিত্ব being, existence; যা-কিছুর সত্তা আছে (বৌ)। অস্তিতার ধর্ম দিয়ে নির্দেশ করা যায় যাকে positive। অবস্থা। মানসিক ব্যাপার ও তার বিশিষ্ট পরিণাম thought, concept। বিষয়ের চিত্তগত রূপ idea; চিন্ময় ভাবনা ও তার রূপ (বৈ)। আস্বাদন-যোগ্য চিত্তবিকার feeling, emotion; এমনিতর চিত্তের সাত্ত্বিক বিকার (বৈ); প্রেম (বৈ)। -কান্তি—অন্তর্নিহিত ভাবের অনির্বচনীয় হয়ে বাইরে ফুটে ওঠা (বৈ)। -চিত্ত—বিশুদ্ধ ও সামান্য আন্তরভাবনাই যে-চিত্তক্রিয়ার উপজীব্য thought-mind। -চ্ছায়া—ভাবনা দিয়ে গড়া ছবি representation। -প্রত্যয়—অস্তিত্বের প্রতীতি বা বোধ idea of existence; বস্তুর 'ভাব' বা অস্তিত্বকে সহজেই স্বীকার করে নেওয়া হয় যে-বোধে। -বস্তু—বাস্তব অস্তিত্ব আছে যার। -বাসিত-মনোময় ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত ideational। -বিকার—শুদ্ধসত্তার নানা পরিণাম processes of becoming (শ্রু)। -রূপ—বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে ফুটে উঠেছে যা। -লোক—চিন্ময় জগৎ (বৈ)। -সৎ—শুদ্ধ চৈতন্যের শুদ্ধ বিষয়রূপে বাস্তব এবং সত্য যা Real-Idea। -সত্ত্ব—শুদ্ধ ভাব দিয়ে গড়া আন্তর সত্তা। -সামান্য—বিষয়ের বিশেষজ্ঞানের আধাররূপে তারই সাধারণ জ্ঞান general concept।

ভাবক—অতীন্দ্রিয় তত্ত্ববস্তুর সন্ধানী ও রসিক mystic (বৈ)...ভাব. ভাবকালি।

ভাবনা—কোনও-কিছু হওয়ার দিকে প্রবণতা, রূপায়ণের অনুকূল ব্যাপার বা ক্রিয়া becoming, manifesting, making, working out (মী, স্ম); ফুটিয়ে তোলা, রূপায়ণ। চিৎশক্তির অন্তর্মুখ বা অন্তঃশীল বৃত্তি কি ক্রিয়া; অনুভবের ধারা, ধারাবাহিক বোধ। চিত্তের ক্রিয়া, চিন্তন thought-movement; চিন্তা, ধারণা, প্রত্যয়। মানসিক অভ্যাস mental practice।

ভাবাদ্বৈত—'ভাব' বা স্বরূপসত্তার দিক থেকে অভেদবোধ identity of being (স্ম)।

ভাবাধিরূঢ়—চিন্ময় ভাবনার দ্বারা আবিষ্ট এবং পরিচালিত।

ভাসক—(বিষয়কে) যা উদ্ভাসিত বা আলোকিত করে তোলে।

ভূত—'ভাব' হতে রূপে ফুটেছে যা (শ্রু)। স্থূল সৃষ্টির উপাদান elements। জীব, সত্ত্ব being। -গ্রাম—বিশিষ্ট 'সত্ত্বের' সমূহ class of beings (স্ম); পঞ্চভূতের সমূহ। -চেতনা—স্থূল-ভূতময় সত্তার অন্তর্নিহিত চেতনা physical consciousness। -জয় —পঞ্চভূতের গুণ ও ক্রিয়ার 'পরে আধিপত্য (সা)। -পরিণাম—বিশ্বের জড় উপাদানের যন্ত্রচালিতবৎ অবস্থান্তর

mechanical evolution of matter। -প্রকৃতি—যা রূপে ফুটেছে তার মূলে আছে যে জননী-শক্তি। স্থূলভূতের আধাররূপী শক্তিতত্ত্ব principle of physical energy (স্ম)। স্থূলভূতের মৌল উপাদান primordial matter। -ভাবন—সর্বভূতকে ভাব হতে রূপে ফোটান যিনি। -সূক্ষ্ম—স্থূলভূতের অন্তর্নিহিত তার সূক্ষ্মতর রূপ inner physical।

মণ্ডূকপ্লুতি—ব্যাঙের মত লাফিয়ে যাওয়া, আকস্মিক উল্লম্ফন।

মতুয়ার—গোঁড়ার মত একটা মতকে আঁকড়ে থাকে যে dogmatic।

মধ্যমা—দ্র· 'বাক্ মধ্যমা'।

মধুদ—মধু বা প্রত্যেক অনুভবের গভীরের আনন্দকে সম্ভোগ করেন যিনি (শ্রু)।

মন-আত্মা—(আধারের) মনোময় সত্তায় অধিষ্ঠিত আত্মভাব (বে)।

মনন—মনের ক্রিয়া; মানসিক অভ্যাস (শ্রু)।

মনীষা—মনের ঊর্ধ্বে চেতনার যে দীপ্তি ও ব্যাপ্তি (শ্রু); বিজ্ঞান। সূক্ষ্মবুদ্ধি।

মনু-চিৎ—মনু বা বিশ্বমানব-সত্তার নিহিত চিন্ময় তত্ত্ব।

মনো-ধাতু—(আধারের) মনোময় উপাদান। -বাসিত—মনের ধর্মদ্বারা আবিষ্ট ও অনুপ্রাণিত mentalised। -বিকলন মনের তলায় যা আছে তার বিশ্লেষণ psycho-analysis। -বিকল্প—মনগড়া একটা-কিছু। -বিগ্রহ —বিচিত্র মনোধর্মের সংহত রূপ psychological organisation।

মন্তব্য—মনের ক্রিয়ার যা বিষয় (শ্রু)।

মন্তা—মনের ক্রিয়া চলছে যাঁর মধ্যে (শ্রু)।

মন্ত্রবর্ণ—বেদের মন্ত্রমালা।

মন্দসংবেগ—ঢিমে চলন (সা)।

মরমী—দ্র· 'ভাবক'।

মহদ্‌ব্রহ্ম—বিশ্বমূল শক্তিরূপে আবির্ভূত ব্রহ্ম (স্ম)।

মহা-কুণ্ডলী—বিশ্বোত্তীর্ণ চিন্ময়ী মহাশক্তির আত্মকেন্দ্রিত অবস্থান (শা)। -নিষ্ক্রমণ—মর্ত্যভাব হতে চরম নিষ্কৃতি। -বিন্দু—পরাসংবিতের আত্মকেন্দ্রিত অবস্থান (শা)। -বিষুব—সূর্যের উত্তরায়ণগতির মধ্যবিন্দু যার পর থেকে দিনের আলো ক্রমেই বেড়ে চলে।

মাতৃকা—উৎসমূল, গর্ভাশয় source, matrix। বিশ্বে স্ফুরিত যাবতীয় শক্তির প্রতীকরূপিণী বর্ণমালা (শা)।

মাত্রাস্পর্শ—বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগ —যাতে বিষয়ের আংশিক জ্ঞান মাত্র হয় (স্ম)।

মান—মাপা যায় যা দিয়ে measure, unit।

মানবৌঘ—দিব্যভাবে ভাবিত মানুষের ব্যূহ বা সমষ্টি (শা)।

মায়োপহিত—মায়া তার মিথ্যার আবরণ দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যার স্বরূপকে (বে)।

মিত—মাপে-বাঁধা।

মিথুনীভূত—জোড়া-বাঁধা।

মিথ্যাদৃষ্টি—জগৎ ও জীবের তত্ত্বকে ভুল করে দেখা (বৌ)।

মীমাংসা-পরিভাষা—তত্ত্বব্যাখ্যার বিশেষ রীতি canon of interpretation।

মুখ্যপ্রাণ—চিন্ময় মূল প্রাণশক্তি (শ্রু)।

মূলা-অবিদ্যা—সৃষ্টির মূলে রয়েছে যে-অজ্ঞান-শক্তি; সমষ্টি অজ্ঞান (বে)। -প্রকৃতি—সৃষ্টির মূল উৎসশক্তি ও উপাদান।

মৈত্রীভাবনা—সমগ্র জগৎকে বন্ধুর মত আপন মনে করা (বৌ)।

মৌল-বিভাবনা—মূল কোনও তত্ত্ব হতে নানা আকারে ফুটে ওঠা।

যদৃচ্ছা—আকস্মিক ঘটন chance (শ্রু)।

যন্ত্রতন্ত্রণা—যান্ত্রিক ব্যবহার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ।

যাথাতথ্য—যার যেমনটি হওয়া দরকার তেমনটি হওয়া (শ্রু)।

যুগনদ্ধ—জোড়া-বাঁধা (বৌ)।

যুগপদ্‌বৃত্তি—একসময়ে একসঙ্গে আছে যারা simultaneous।

যোগজ-সন্নিকর্ষ—যোগশক্তির দ্বারা অলৌকিক উপায়ে বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ (ন্যা)।

যোগ-নিদ্রা—সুষুপ্তির গভীরে সমস্ত অনুভবকে আকর্ষণ করে' তারই মধ্যে জেগে থাকা; অপ্রাকৃত নিদ্রা (স্ম)। -ভূমিকা—যোগযুক্ত চেতনার ভূমি (শৈ)। -মায়া—ব্রহ্মের নিত্যযুক্ত প্রজ্ঞার রূপায়ণী শক্তি যার মধ্যে ভাবের সৃষ্টি আর বস্তুর সৃষ্টি একাকার হয়ে

আছে (স্ম)। -যুক্তি—অন্তরের যোগাযোগ হেতু নিবিড় সম্বন্ধ।

যোগ্যতা—কার্যবিশেষ উৎপাদনের সামর্থ্য (ন্যা)।

যোজনা—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথাযথ সমাবেশ।

যৌগপদ্য—একসময়ে একসঙ্গে থাকা।

রতি—আনন্দ। ভালবাসা (বৈ)।

রয়ি—শক্তির বেগ (শ্রু)।

রস—আস্বাদনযোগ্য চিত্তপরিণাম emotion, feeling; চিত্তাকর্ষক গুণের আস্বাদন aesthetic enjoyment। ..ভাব· রসন—আস্বাদন। -রতি—চিন্ময় ভালবাসার দুটি দিক [পরমপুরুষের 'রস' পরমা-প্রকৃতির 'রতি'] (বৈ)।

রসাস্বাদ—(ধ্যানজনিত) আত্মহারা আনন্দের অনুভব ecstasy (বে)।

রসোদ্গার—পরমানন্দের উছলে পড়া (বৈ)।

রহস্যক্রম—সাধারণ জ্ঞানের অগোচর ক্রিয়ার ধারা occult process।

রাগমার্গ—অন্তরের অনুরাগই সাধনার দিশারী যে-পথে [প্র. 'বধমার্গ'] (বৈ)

রূপ-চৈতন্য—বাইরের রূপকে ধরে আছে যে নিগূঢ় চিৎশক্তি form-consciousness। -ধাতু—রূপায়ণের মূল উপাদান substance। -সামান্য—বহু ব্যক্তিতে সাধারণভাবে ফুটে উঠেছে যে-রূপ।

রূপাদর্শ—যে-রূপের অনুকরণে অন্যান্য রূপ গড়া যায় pattern।

রূপাবচর—ধ্যানচিত্তগম্য সূক্ষ্মলোক যেখানে স্থূলদেহের ভার নাই (বৌ)।

লক্ষ্যাভিসারী—বিশেষ কোনও লক্ষ্যের অভিমুখে গতি যার teleological।

লিঙ্গ—চিহ্ন, নিশানা। অনুমানের 'হেতু' ন্যো)। -দেহ—সূক্ষ্মশরীর (বে)।

লোক-ধাতু—বিভিন্ন লোক বা ভুবনের উপাদান ধর্ম ও আয়তন (বৌ)। -বাহ্য—বিশ্বজগতের বাইরে extra-cosmic। -সংক্রমণ—একটি ভুবন হতে আরেকটি ভুবনে যাওয়া। -সংগ্রহ—সমষ্টিভাবে সমগ্র জগতের হিতসাধনা (স্ম)। -সংস্থান—বিভিন্ন ভুবনের সুবিন্যস্ত পরম্পরা systems of worlds (স্ম)।

লোকাদি—বিশ্বভুবনের অভিব্যক্তির গোড়ায় আছে যে।

লোকায়ত—সাধারণ লোকের মধ্যে যা ছড়িয়ে পড়ে বা ছড়িয়ে আছে। -তিক—চার্বাকপন্থী দার্শনিক যিনি বাহ্য-প্রত্যক্ষগোচর সত্য ছাড়া আর-কিছুর প্রামাণ্য স্বীকার করেন না।

লোকালোক—পুরাণবর্ণিত বিশ্ববেষ্টনকারী পর্বতবিশেষ যার ভিতর দিকটা লোক বা আলো আর বাইরের দিকে অলোক বা আঁধার (স্ম)।

লোকীয় ভাব—ঐহিক সত্তা world-existence।

লোকৈষণা—ইহলোকের ওপারে ঊর্ধ্বতন অন্যান্য লোকের সন্ধানে ফেরা (শ্রু)।

লোকোত্তর—চেতনার সাধারণ ভূমিকে যা ছাড়িয়ে যায়। রূপ-অরূপের ওপারে ধ্যান-চিত্তের চরম ভূমি, নির্বাণ (বৌ)।

শাক্ত—শক্তিমান।

শক্তি-কূট—শক্তি পুঞ্জিত হয়ে আছে যেখানে পরমাশক্তি (শা)। -ধাতু—বিশ্বের শক্তি-রূপ উপাদান energy-substance। -পরিণাম—পর্বে-পর্বে শক্তির নিজেকে স্ফুরিত করা। -পাত—ঊর্ধ্বভূমি হতে শক্তির অবতরণ ও আবেশ descent (শৈ)। -সংক্রমণ—এক ভূমি বা আধার হতে শক্তির আরেক ভূমি বা আধারে যাওয়া। -সঙ্গম—বিভিন্ন শক্তির একত্র যোগাযোগ। -যোগ্যতা—শক্তির কার্যবিশেষ উৎপাদনের সামর্থ্য potentiality।

শঙ্কিত—যার সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

শব্দ-ব্রহ্ম—মহাকাশে সৃষ্টির আদিস্পন্দ; প্রণব (স্ম)।

শমথ—চিত্তের প্রশান্ত অবস্থা (বৌ)।

শারীর—দেহসম্পর্কিত। দেহে অধিষ্ঠিত embodied (বে)।

শাশ্বত-ধাতু—সমস্ত সত্তা ও অনুভবের চরম আধাররূপী 'নির্বাণ' (বৌ)। -বাদ—'দেহাতীত নিত্য আত্মা আছে' এই মত (বৌ)।

শাস্তা—যে চালিয়ে নেয়, নিয়ন্তা।

শিব-বিন্দু—আধারের মধ্যবিন্দু বা শক্তির ক্রিয়ার প্রবর্তক (শা)।

শীল—চারিত্রবিশুদ্ধির আদর্শ ও তার সাধনা (বৌ); -ব্রত—আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নানা নিয়ম ব্রত ইত্যাদির অনুষ্ঠান (জৈ)।

শুদ্ধ-বিদ্যা—মায়ার আবরণ উন্মোচনে

আবির্ভূত শুদ্ধসত্তার জ্যোতিঃশক্তির প্রথম ছটা (শৈ)। -সত্ত্ব—প্রকৃতি বা চিত্তের যে-উজ্জ্বলতায় রজোগুণের চাঞ্চল্য বা তমোগুণের আবরণের লেশমাত্র সম্ভাবনা থাকে না (সা); বিশুদ্ধ স্বভাব।

শূন্য-বাদ—'বিশ্বের মূলতত্ত্বকে কোনও বিশেষণেই বিশেষিত করা যায় না, এমনকি তার অস্তিত্বও তার পরিচায়ক বিশেষণ হতে পারে না' এই মতবাদ (বৌ)।

শ্রুতি—দিব্য বাক্। বেদ। সঙ্গীতের দুটি স্বরের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম স্বরাংশ।

শ্রৌতমীমাংসা—বুদ্ধির এলাকা ছাড়িয়ে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা দিয়ে তত্ত্বের নিরূপণ।

সংক্রমণ, -ক্রান্তি—এক অবস্থা হতে আর-এক অবস্থায় যাওয়া transition।

সংখ্যৈকত্ব—সব-কিছুর সমাহারে নয় কিন্তু শুধু সংখ্যায় গুনে-পাওয়া একত্ব [যেমন 'ব্রহ্ম এক, তিনি বহু নন' এই মতবাদে]।

সংঘাত—নানা অবয়ব বা উপাদানের সংযোগ (ন্যা)। জমাট বাঁধা। হানাহানি। -রূপ—নানা উপাদানের সংযোগে উৎপন্ন আকারবিশেষ (ন্যা)।

সংজ্ঞা—সচেতনতা awareness; বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগজনিত সাধারণ বোধ sensation (শা)। বিশিষ্ট নাম designation, term। -বহা—বাহ্য বিষয়ের বোধকে ভিতরে বয়ে নিয়ে যায় যে afferent (শা)।

সংজ্ঞান—সমগ্রের সম্যক্ ছন্দোময় জ্ঞান comprehension (শ্রু)।

সংবরণ—ভিতরের দিকে গুটিয়ে আনা involution।

সংবিৎ—আত্মসমাহিত অথচ সর্বাবগাহী পরিপূর্ণ জ্ঞান (শ্রু)। সচেতনতা awareness [তু· সম্বিৎ]...ভাব· -বিত্তি; কর্তৃ. -বেত্তা। -শক্তি—ব্রহ্মের পূর্ণবিজ্ঞানরূপিণী স্বরূপশক্তি (বৈ)। -শূন্যতা—'আত্মভাবের' অভাব যেখানে (বৌ)। -সিদ্ধি—পরিপূর্ণ আত্ম-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া (বে)।

সংবিন্ময়ী কলা—'সংবিৎশক্তির' বিশেষ স্ফুরণ বা ঝলক (শা)।

সংবৃত্ত—বীজাকারে অন্তর্গূঢ় involved (শ্রু)।...ভাব. -ত্তি। সংবৃত্তি-পরিণাম—ক্রমে-ক্রমে বীজভাবে গুটিয়ে আসা involution।

সংবেগ—(সাধনপথে) তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবার জন্য চিত্তের দৃঢ়তা ও উন্মুখী-নতা (সা)। লক্ষ্যসিদ্ধির অভিমুখে প্রযুক্ত বেগ। কোনও-কিছুর দিকে ঝোঁক।

সংবেত্তা—দ্র· 'সংবিৎ'।

সংবেদন—ইন্দ্রিয়সংযোগজনিত সাধারণ বোধ sensation। অনুভবের সাড়া response। সাধারণ বোধ, সচেতনতা awareness।

সংযোগ—ভিন্ন বস্তুকে যথাসম্ভব বিভিন্ন আকারে সাজানো combination [দ্র. 'প্রস্তার'] (জৈ)।

সংযোজন—বিশেষ প্রয়োজনে একজায়গায় জোটানো।

সংসক্তি—নিবিড় হয়ে পরস্পর লেগে থাকা cohesion।

সংসৃষ্টি—নানা ধরনের বস্তুর মিশ্রণ।

সংস্কার—অতীতের ছাপ; তার ফলে গড়ে-ওঠা বৃত্তি। চিত্তের অবিদ্যাজনিত কল্পনা thought-construction। বিচারহীন ধারণা। কোনও-কিছুতে নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটানো।... বিণ· সংস্কৃত (শ্রু, মী)। ধর্মশাস্ত্র-বিহিত বিশেষ অনুষ্ঠান যার ফলে আধ্যাত্মিক বা সামাজিক অধিকার জন্মায় sacrament (স্মৃ)। -শেষ—'সংস্কার' বা বীজাকারে অনুস্যূত অনুভবের অবশেষ (সা)।

সংস্কার্য—পুরানো ধর্মকে বাতিল করে' নতুন ধর্মের আবির্ভাব ঘটাতে হবে যার মধ্যে (বে)।

সংস্থান—সম্যক্ স্থাপনা; সমগ্রের দিকে দৃষ্টি রেখে অবয়ব বা উপাদানকে বিশেষ রীতিতে সাজানো organisation। অবয়ব-সজ্জার বৈশিষ্ট্য structure। বিশেষ বিন্যাস arrangement। পরিকল্পনা plan, design।

সংহনন—জমাট বাঁধা।

স-কল—'কলা' বা ক্রিয়াশক্তিতে খণ্ডভাবে স্ফুরিত (শা)।

সঙ্কর্ষণ—সত্তা বা চেতনাকে উপরের দিকে

বা গভীরে টেনে নেয় যে যোগ-শক্তি (স্ম, বৈ)।
সংকল্প—ইচ্ছার বেগ will (শ্রু)।
সংকল্পনা—বস্তুনিষ্ঠ সংগত কল্পনা [প্র. 'বিকল্পনা']। 'সংকল্প' বা ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াভিমুখী প্রবেগ।
সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ—অনন্ত সত্তা চেতনা ও আনন্দ জমাট হয়ে রূপ ধরেছে যাঁর মধ্যে (বৈ)।
সজাতীয়-ভেদ—একই জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের মধ্যে পরস্পর ভেদ।
সত্তাদ্বৈত—'শুদ্ধ সত্তার অনুভবে দুয়ের বা ভেদের স্থান নাই' এই মত।
সত্ত্ব—সত্তা বা অস্তিত্বের বিশেষ ধরন mode of being। স্ব-ভাব, আত্মভাব essential being, entity। মৌল উপাদান [যেমন, 'জীব-সত্ত্ব'] substance। সারবস্তু essence। যে-কোনও লোকের অধিবাসী জীব an organised being। ব্যক্তিভাব personality। প্রকৃতির প্রকাশ-ধর্মযুক্ত গুণ (সা)। -তনু—রজের চাঞ্চল্য ও তমের মূঢ়তা হতে নির্মুক্ত শুদ্ধ-সত্ত্বের দ্বারা রূপায়িত বিগ্রহ (স্ম)। -নিকায়—ব্যক্তিভাবের বিগ্রহ organised individuality। -বীর্য—মৌল উপাদানের ক্রিয়াশক্তি substance-energy। -সমুদ্রেক—প্রকাশধর্মের উদ্বোধন; কোনও-কিছুর সাড়ায় চেতনার ঝিলিক হানা (সা)।
সত্ত্বানুরূপ—স্ব-ভাবের অনুযায়ী।
সত্ত্বাপত্তি—নিজস্ব অস্তিভাবে বা আত্মসত্তার গভীরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া to be; জ্ঞানের চতুর্থ ভূমি (বে)।
সত্ত্বাভাস—আত্মভাবের উপরভাসা রূপ surface-being।
সত্ত্বোদ্রেক—অন্তর্নিহিত ভাবের জাগরণ; চাপের জবাবে সাড়া response (সা)।
সত্যধৃতি—সত্য সম্পর্কে চেতনার অচঞ্চল বৃত্তি ও সুনিরূপিত ধারণা (শ্রু); সত্যের নির্দিষ্ট ছন্দ।
সদসৎ—একদিক দিয়ে দেখলে আছে আবার আরেক দিক দিয়ে দেখলে নাই যা; অনির্বচনীয় (বে)।
সদাখ্যতত্ত্ব—চিৎশক্তির আবেশে বিসৃষ্টির আদিপর্বে স্ফুরিত শুদ্ধসত্তা principle of primal pure existence (শৈ)।
সদায়তন—এক অখণ্ড সত্তারূপী আধার বা আশ্রয়; এমনিতর আশ্রয় যার (শ্রু)।
সদৃশ-পরিণাম—যেখানে 'পরিণামের' পরম্পরা আছে কিন্তু তার দুটি পর্বের মধ্যে ভেদ নাই (সা)।
সদ্-বিদ্যা—দ্র· 'শুদ্ধবিদ্যা'। -ভাব—বিশুদ্ধ সত্তামাত্র—যেখানে গুণ বা ধর্মের বোধ নাই; শুদ্ধ অস্তিতা। অবিলোপ্য সত্তা। -ভূত—সৎস্বরূপ Real; অবিচল সৎস্বরূপে অবস্থিত। নিশ্চিতভাবে সত্য। -রূপ—বিশিষ্ট সত্তা আছে যার Existent।
সদ্‌ভূত-বিজ্ঞান—যা যুগপৎ তাত্ত্বিক-বস্তু এবং ভাবের-সত্য দুইই Real-Idea।
সদ্যোভেদ—বর্তমান অবস্থায় ভেদ, সাম্প্রতিক পার্থক্য।
সন্তান—পরম্পরা, প্রবাহ series।
সন্ধাভাষা—নিগূঢ় ইঙ্গিতবাহী উক্তি cryptic saying (বৌ)।
সন্ধি—জোড়। নাট্যবস্তুর বিশেষ পর্ব।
সন্ধিনীশক্তি—পরমপুরুষের যে-শক্তি শুদ্ধ-সত্তারূপে আধার হয়ে সবাইকে ধরে আছে force of being (বৈ)।
সন্নিকর্ষ—পাশাপাশি থাকা, সান্নিধ্য juxtaposition; যোগাযোগ contact (ন্যা)।
সন্নিপাত—যেন উড়ে এসে পড়া; একত্র সমাবেশ।
সন্মাত্র—'আত্মসত্তায় পূর্ণ হয়ে আছেন' এইমাত্র বোধ হয় যাঁর সম্পর্কে (শ্রু); শুধু অস্তিত্বের নির্গুণ ও নির্ধর্মক ভাব বা বোধ; শুদ্ধসত্তা। -ধাতু—বিশ্বের শুদ্ধসত্তারূপী চরম উপাদান existence-substance।
সন্মূল—এক অখণ্ডসত্তারূপী ভিত্তি; এমনিতর ভিত্তি যার (শ্রু)।
সবিকল্প—বিশেষের বোধ হয় যাতে; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বোধ থাকে যেখানে (বে)। বিচিত্র বৃত্তিতে স্ফুরিত।
সবিশেষ—অপরের সঙ্গে সম্বন্ধহেতু বৈশিষ্ট্যের প্রতীতি হয় যাতে differentiated and hence relative। বৈশিষ্ট্যযুক্ত। -ভাবনা—বিশিষ্ট ধর্ম নিয়ে ফুটে ওঠবার সামর্থ্য relativity।

সমগ্র-বহুত্ব—সমষ্টি ও ব্যষ্টি দুয়েরই যুগপৎ স্থিতি।
সমজ—ইতরপ্রাণীর সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রা।
সমঞ্জসা-রতি—যে-ভালবাসায় দেওয়া-নেওয়ার ভাব আছে বলে সম্ভোগতৃষ্ণাও জাগে কখনও [যেমন, শ্রীকৃষ্ণমহিষীর] (বৈ)।
সমনী—মহাশূন্যে দিব্যমননের ভূমিবিশেষ যেখানে সমস্ত তত্ত্বের জ্ঞান সহজে ফুটে ওঠে, 'উন্মনীর' নীচের ভূমি (শা)।
সমন্বয়ী-বৃত্তি—যে-ক্রিয়া একাধিক বিষয়কে পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে অন্বিত বা সম্বন্ধ করে যার ফলে তারা একার্থক হয় co-ordinating faculty।
সমবায়—একত্র যোগ, মেলন। নিত্য সম্বন্ধ inherence (ন্যা)।...বিণ· -বেত।
সমব্যাপ্ত—সমান-সমান হয়ে পরস্পরকে ছেয়ে আছে যারা of equal extension। সব-কিছুকে আবৃত করে সমভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে যা।... ভাব· -ব্যাপ্তি।
সমর্থ—স্ফুরণের শক্তিযুক্ত। অনুরূপ। বাস্তব প্রামাণ্যের সম্ভাবনা আছে যার verifiable (ন্যা)। -প্রবৃত্তি—যে-ক্রিয়ার ফলে অনুভবের সত্যতা প্রমাণিত হয় [দ্র. 'প্রবৃত্তি-সামর্থ্য']।
সমর্থা-রতি—যে আত্মহারা ভালবাসায় সম্ভোগেচ্ছা আলাদা না ফুটে তাদাত্ম্যভাবে পর্যবসিত হয় [যেমন, ব্রজ-গোপীর] (বৈ)।
সমর্পিত—কেন্দ্রীকৃত বা কেন্দ্রীভূত converging (শ্রু)।
সমষ্টি—সমূহ, সাকল্য। -ভাবনা—সমগ্র বিশ্বকে যুগপৎ ফুটিয়ে তোলা।
সমাকলন—নানা বিষয়ের সমবায়ে গড়ে তোলা।
সমাখ্যা—অন্বর্থ সংজ্ঞা বা নাম।
সমাধান—একাগ্র ও সমাহিত ভাবনা (সা)।
সমাধি—চিত্তের চরম একাগ্রতা যাতে অবশেষে চিত্ত শূন্যবৎ হয়ে যায় (সা)। -পরিণাম—সমাহিত চিত্তের একতান প্রবহমানতা। -সংস্কার—অভ্যাসহেতু সমাহিত থাকবার দিকে চিত্তের প্রবণতা।
সমানয়ন—ভেদধর্মকে জীর্ণ করে একধর্মাক্রান্ত করা assimilation (শ্রু)।
সমাপত্তি—ধ্যেয়বিষয়ে একাগ্রচিত্তের তল্লীনতা (সা, বৌ)। কোনও ভাবের সঙ্গে একাকার বা তন্ময় হয়ে যাওয়া। ...বিণ· -পন্ন।
সমাবেশ—আধারে ঊর্ধ্বসত্যের স্বচ্ছন্দ ও পরিপূর্ণ অবতরণ (শৈ)।
সমাহরণ, -হার—বহুর সমাবেশে একটি অখণ্ড সত্তারূপে গড়ে তোলা integration। ...কর্তৃ· -হর্তা।
সমীক্ষা—তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও বিশ্লেষণ critical analysis (ন্যা)।
সমুচ্চয়—একসঙ্গে নেওয়া; সংকলন। ...বিণ· সমুচ্চিত।
সমূঢ়—বহুর সমবায়ে গঠিত।
সমূহ—বহুর একত্র সমাবেশে গঠিত সমুদয়, সমষ্টি aggregate [প্র· 'ব্যূহ']। ...বিণ· 'সমূঢ়'; ভাব· সমূহন। -প্রত্যয়—সব জড়িয়ে একটি বোধ। -ভাবনা—বহু বৈশিষ্ট্যের সমবায়ে গড়ে-ওঠা মনোময় রূপ।
সম্প্রজ্ঞান—বিষয়ের পুরাপুরি জ্ঞান।
সম্প্রত্যয়—নিশ্চিত বোধ।
সম্প্রয়োগ—বিশেষ যোগ [যেমন, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের] (মী)। নিবিড় মিলন।
সম্বন্ধ-তত্ত্ব—পরমপুরুষের আশ্রয়ে বিশ্বভাব ও বিশ্বভূতের অন্যোন্যসম্পর্কের সত্যতা, ব্রহ্ম জীব ও জগতের পরস্পর সম্বন্ধের বাস্তবতা relativities viewed as real (বৈ)। -বৈকল্য—ভুল সম্পর্ক।
সম্বোধি—সর্ববিষয়ের স্বতঃস্ফূর্ত সম্যক্ বিজ্ঞান comprehensive spiritual intuition (বৌ)।
সম্ভবৎ—যা ক্রমে হয়ে চলেছে বা ফুটে উঠছে।
সম্ভূতি—বিচিত্র রূপের সমাহারে অখণ্ড ও 'সম্যক' রূপায়ণ total becoming (শ্রু); সর্বদিক দিয়ে ফোটা, পূর্ণ রূপায়ণ; এমনিতর রূপায়ণের সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি। বিশ্বরূপের গর্ভাশয় বা মহাপ্রকৃতি যার থেকে রূপের আবির্ভাব সম্ভাবিত (শ্রু)। -সংবিৎ—যে-বিজ্ঞানে 'সম্ভূতির' পূর্ণসত্যটি ফুটে ওঠে comprehensive knowledge।
সম্মুগ্ধ—অস্ফুটরূপে অনুভূত [যেমন

ইন্দ্রিয়বোধের আদিক্ষণে বিষয়ের প্রতীতি] (সা)। -প্রত্যয়, -বোধ—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগজনিত অস্পষ্ট প্রাথমিক অনুভব (সা)। sensation -বৎ—নিষ্ক্রিয়ের মত, আচ্ছন্নের মত। -সংবিৎ—অস্পষ্ট আদিম চেতনা।

সম্মূর্চ্ছন—দানা বাঁধা, জমাট হয়ে রূপ নেওয়া।

সম্মূঢ়—অস্ফুট, আচ্ছন্ন।

সম্যক—সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমাহারহেতু সম্পূর্ণ, 'অভঙ্গ' integral। -আজীব—জীবিকানির্বাহের সুষ্ঠু ও ধর্মসঙ্গত উপায় (বৌ। -কর্ম—তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সুসমঞ্জস সত্য কর্ম (বৌ)। -দর্শন—সমস্ত আপাতবিরোধের সমন্বয় ঘটিয়ে সার্বভৌম অখণ্ড-দৃষ্টিতে দেখা integral view। -প্রত্যয—সব জড়িয়ে সব গুছিয়ে নিয়ে পরিপূর্ণ বোধ। -ভাব—অখণ্ড পূর্ণতায় সুডোল হওয়া। -সঙ্কল্প—তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সুসমঞ্জস এবং সত্যপূত ইচ্ছা (বৌ)। -সমাধি—চেতনার সমাহিত অথচ সর্বাবগাহী ভূমি integral concentration (বৌ)। -সম্বোধি—'সর্বধর্মের সম্যক্ বোধ', সর্ববিষয়ের অখণ্ড জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞানের চরম ভূমি (বৌ)।

সরূপ—একই রূপ যাদের [প্র· 'বি-রূপ'] (শ্রু)।

সর্জনা—সৃষ্টির বেগ।

সর্ব-নিবেশনী—সব-কিছুকে গ্রাস করে যে (শ্রু)। -নিষেধ—(ব্রহ্মের মধ্যে) কোনও ধর্মের সত্তাকে স্বীকার না করা। -বিজ্ঞান, -বিদ্যা—সব-কিছুকে জানা, পূর্ণজ্ঞান All-Knowledge (শ্রু)। -ব্রহ্মবাদ—'এই যা-কিছু সমস্তই ব্রহ্ম' এই দর্শন ও মতবাদ (শ্রু)। 'ব্রহ্ম এই সব-কিছু হয়েই নিঃশেষিত হয়েছেন' এই মতবাদ Pantheism। —ভাব—বিশ্ব-সত্তা। -ভাসক—যার আলোতে সব-কিছু ভাসছে। -সৎ—সকলের মূলে ও সকলকে নিয়ে অখণ্ড সত্তারূপে প্রকটিত All-existence। ...ভাব. -সত্তা। -সম্ভব—সব-কিছুর উৎপত্তি যা হতে। -সম্ভূতি—সমস্ত বৈচিত্র্যের সমগ্র আধার এবং উৎস।

সর্বাতিগ—সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে যা।

সর্বাত্মভাব—'আত্মাই হয়েছেন সব-কিছু' এই অনুভব, আত্মসত্তার চরম ব্যাপ্তি, আত্মার বিশ্বরূপতা (শ্রু)।

সর্বাধিবাস—সবার মধ্যে অন্তর্যামী হয়ে বাস করছেন যিনি (শ্রু)।

সর্বানুবেধ—সবার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকা।

সর্বান্তর্ভাবী—সব-কিছুকে নিজের মধ্যে পুরে নেয় যে।

সর্বান্বয়ী—সবার মধ্যে সুতোর মত গাঁথা।

সর্বেশনা—সবার 'পরে অকুণ্ঠ আধিপত্য।

সর্বেশ্বরবাদ—'ঈশ্বর জগৎ হয়েই ফুরিয়ে গেছেন' এই মতবাদ Pantheism।

সহচার—একসঙ্গে চলা বা থাকা concomitance। ...বিণ· -চারিত।

সহজ—শিক্ষা বা বিচার ছাড়া আপনা হতে জন্মেছে যা, সহজাত instinctive [এমনিতর 'ধর্ম', 'প্রত্যয়', 'প্রবৃত্তি', 'বুদ্ধি', 'বৃত্তি']

সহবেদন—একসঙ্গে ও অবিরোধে অনুভব (শ্রু)।

সহভাব—একসঙ্গে থাকা co-existence।

সাংবৃতিক সত্য—যা ব্যবহারেই সত্য শুধু —পরমার্থত সত্য নয় (বৌ।

সাংসিদ্ধিক—স্বাভাবিক (ন্যা)।

সাংস্থানিক—আধারের সংস্থান বা উপাদান-গত বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করে আছে যা constitutional।

সাকূত—একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে যার মধ্যে, সাভিপ্রায় purposeful।

সাক্ষি-চৈতন্য—চেতনার যে-অংশ তটস্থ থেকে অপর অংশকে দেখে যায়। -জীব—প্রাকৃত জীবভাবের অন্তর্নিহিত সত্যজীবরূপে বিষয়ের দ্রষ্টা psychic witness। -ভাস্যতা—দ্রষ্টৃ-পুরুষের চেতনায় ফুটে ওঠবার যোগ্যতা (বে)।

সাক্ষী—বিষয়ের নিরপেক্ষ ও নির্বিকার দ্রষ্টা (শ্রু, বে)।

সাক্ষ্য—'সাক্ষীর' দৃষ্টিতে ফুটছে যে-জগৎ objective world (বে)।

সাঙ্কর্য—বিজাতীয় বস্তু কি ভাবের পরস্পর অনুপ্রবেশ বা মিশ্রণ।

সাজাত্য—জাতের মিল।

সাত্ত্বিক-পরিণাম—'সত্ত্ব' বা উপাদানের অবস্থান্তর।

সাধন—কার্যসিদ্ধির প্রকৃষ্ট কারণ, 'করণ' instrument। -সম্পদ্—ঊর্ধ্ব-চেতনাকে ধারণ বা বহন করবার উপযোগী করণের সঞ্চয় (স্ম্)। -সামগ্রী—করণের সমূহ বা সংকলন complete instrumentation; (জ্ঞানোৎপত্তির অনুকূল তথ্যসমূহের) সংগ্রহ collection of data।

সাধর্ম্য—ধর্মগত সাদৃশ্য; একটা জাতির বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মৌলিক ধর্মের মিল। -মুক্তি—পরমপুরুষের দিব্য-ভাবের স্বীকরণজনিত মুক্তি (স্ম্)।

সাধ্য-সাধন—প্রতিপাদ্য বস্তু যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন (ন্যা)।

সাপেক্ষত্ব—অন্যোন্যসম্বন্ধ; পরস্পরের 'পরে নির্ভর।

সামরস্য—পরস্পরের ভাবনায় একই রসের উচ্ছলন এবং তজ্জনিত একাত্মতা বোধ (শা)।

সামাজিক—কলারসিক; কাব্যপাঠ অভিনয় প্রভৃতির শ্রোতৃ- বা দ্রষ্টৃ-বর্গ।

সমানাধিকরণ্য—একাধিক পদার্থের একই আধারে অবস্থান co-existence।

সামান্য—বহু ব্যক্তিতে অনুস্যূত সাধারণ ধর্ম general property [প্র· 'বিশেষ']। সর্বসাধারণ universal। -গ্রাহী—বিশেষকে ছাপিয়ে সাধারণকে নিয়ে কারবার যার। -ধর্মী—ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হতে আলাদা-করে-নেওয়া সাধারণ ধর্মের বোধ হয় যাতে abstract। -প্রকৃতি—বিকৃতির পরম্পরার মূলে এক সর্ব-সাধারণ আদিম প্রকৃতি; মূলা প্রকৃতি। -প্রত্যয়—সাধারণ ধর্মের প্রতীতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে যে-ভাব concept, general notion [প্র· বিশেষ-প্রত্যয়]; নির্বিশেষ অথচ ব্যাপক বোধ। -ব্যাকৃতি—বিশিষ্ট আকার থাকা সত্ত্বেও বহুতে অনুস্যূত একটা সাধারণ ধর্ম আছে যার general determinate। -রূপ—বহু ব্যক্তিতে দেখা যায় যে সাধারণ রূপ—যাকে আদর্শ বলে ধরা যেতে পারে type।

-স্পন্দ—শক্তির অবিশিষ্ট ক্রিয়া বা স্ফুরণ indeterminate dynamis।

সাম্রাজ্য—বিশ্বচেতনার নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা এবং ঐশ্বর্য (শ্রু)।

সাযুজ্য—অব্যবহিত যোগ; পরমসাম্য, নিবিড় যোগে দুয়ে মিলে এক হয়ে যাওয়া communion (শ্রু); অভেদভাব।

সার্ষ্টিত্ব—সমান শক্তির অধিকার (শ্রু)।

সালোক্য—যে-মুক্তিতে পরমপুরুষের অনুত্তর সত্তায় অবগাহন করে তাঁর সংগে একই চিন্ময় লোকে অবস্থান ঘটে (শ্রু)।

সিসৃক্ষা—সৃষ্টি করবার ইচ্ছা।

সুখাবতী—অনুত্তর সহজ আনন্দের ভূমি (বৌ); আনন্দধাম।

সুনৃত—সৌষম্যের কল্যাণী শক্তি (শ্রু)।

সূরি—সত্যের আলো-কে দেখেছেন যিনি, বিজ্ঞানী (শ্রু)।

সৃতি—লোকলোকান্তরে যাতায়াত (শ্রু)।

সোপাধিক—'উপাধি' বা বিশেষ-কোনও পরিচায়ক লক্ষণ আছে যার (বে)।

সৌমনস্য—চিত্তের প্রসন্নতা।

স্কন্ধ—উপাদানের ব্যূহ বা সমবায় (বৌ)।

স্তোম—সুরের স্তবক; স্তুতিগান (শ্রু)।

স্থায়িভাব—চিত্তক্ষেত্রকে অধিকার করে আছে যে মূলভাবের পরিমণ্ডল।

স্থূলভুক—জেগে থেকে স্থূলবিষয়কে গ্রহণ করেন যিনি (শ্রু)।

স্পন্দ—ক্রিয়াশক্তির স্ফুরণ activity, movement (শৈ)। -বীর্য—ক্রিয়া-শক্তির অকুণ্ঠ সামর্থ্য।

স্ফুরত্তা—ধ্রুবিন্দু হতে বিচ্ছুরণের স্বভাব; চৈতন্যের স্বাভাবিক স্পন্দন (শৈ)। পরিস্পন্দ। ক্রিয়াশক্তির বিচ্ছুরণ dynamism।

স্ফুরদ্-বৃত্তি—মনের স্পন্দমান ও সক্রিয়-ভাব। -রূপ—চিন্ময় স্পন্দনের আকারে ফুটছে যা।

স্মৃতি-সংযম—স্মৃতিকে আশ্রয় করে সমাধি আনা (সা)।

স্যাদ্বাদ—'বস্তুর তত্ত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে একান্তভাবে কিছুই বলা চলে না' এই জৈন মতবাদ non-Absolutism।

স্রোতাপত্তি—চিন্ময় ভাবনার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া (বৌ)।

স্ব-কৃৎ—অপরের অপেক্ষা না রেখে আপ-

নাকে রূপায়িত বা পরিণামিত করে যে self-formative, self-operative। -তন্ত্র—নিরপেক্ষ, স্বাধীন [স্বতন্ত্র—পৃথক্]। -বিমর্শ—নিজেকে নিজের জ্ঞানের বিষয় করা dwelling on one's own self; এমনিভাবে লোকাতীত শৈবীভাবনার চিন্ময় আত্ম-বিচ্ছুরণ (শৈ)। -সংবেদ্য—নিজের কাছে আপনা হতেই প্রকাশিত যা (বে)। -সৃৎ—স্বতঃস্ফূর্ত (শ্রু)।

স্বগত—নিজেরই মাঝে রয়েছে যে, স্বভাব-গত, নিজস্ব। -ভেদ—নিজেরই মধ্যে অবয়বের বৈচিত্র্যহেতু যে-ভেদ [যেমন, গাছের মধ্যে ডাল পাতা ফুল ইত্যাদির ভেদ]। -সংবিৎ—নিজের মধ্যে নিজের বোধ self-consciousness।

স্বতঃ-পরিণামী—নিজেই নিজের পরিণাম বা সার্থক অবস্থান্তর ঘটিয়ে চলেছে যে। -প্রামাণ্য—প্রমাণের জন্য অপর-কিছুর 'পরে নির্ভর না থাকা, স্বতঃসিদ্ধতা। -সংবিৎ—কিছুর অপেক্ষা না রেখে আপনা হতে ফুটে-ওঠা বোধ self-awareness। -সম্ভবী—নিজেই নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ফুটিয়ে চলেছে যে।

স্বত-অনুষক্ত—আপনা হতেই অপরের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগ ঘটিয়েছে যে।

স্বতো-দেশনা—স্বতঃস্ফূর্ত পরিচালন self-direction। -ব্যাকৃতি—নিজেই নিজেকে বিশেষিত করা বা বিশেষ আকার দেওয়া self-determination, self-formulation।

স্বধা—নিজেকে নিজের মধ্যে ধরে রেখে সেইখান থেকে শক্তির বিচ্ছুরণ; স্ব-প্রতিষ্ঠার ভাব ও ধর্ম (শ্রু)।...বিণ· -বান্।

স্বভাব-স্থিতি—আপন ভাবে থাকা, নিজের ধর্ম আঁকড়ে থাকা।

স্বয়ং-তন্ত্র—নিজেই নিজেকে চালিয়ে নেয় যে self-regulating, automatic। -প্রজ্ঞ—নিজেই নিজেকে জানেন যিনি self-conscient। -সংবিৎ—আপনার মাঝে অপনাকে পরিপূর্ণরূপে জানা।

স্বয়ম্ভু—অন্য-কিছু হতে উৎপন্ন নয় যা। ...বি· -ভাব।

স্বরসবাহী—স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বয়ংচল।

স্বরূপ—নিজস্ব রূপ, সত্যকার প্রকৃতি। -খ্যাতি—স্বরূপের বস্তুভূত অনুভব positive experience of reality or essence। -ধাতু—স্বরূপের উপাদান stuff, substance। -নিষ্ঠ—নিজস্ব প্রকৃতিতে রয়েছে যা inherent in nature। -পুরুষ—নিজের অখণ্ডস্বভাবে প্রকটিত যে-পুরুষ। -প্রকৃতি—অবিকৃত নিজস্ব স্বভাব (বৈ)। -প্রত্যয়—নিজস্ব প্রকৃতির সাক্ষাৎ জ্ঞান self-perception। -বিভূতি-স্বভাব-গত রূপের সার্থক রূপায়ণ concrete manifestation of essential nature, self-deployment। -বিশ্রান্তি—নিজস্ব প্রকৃতিতে নিশ্চল প্রতিষ্ঠা।...বিণ· -বিশ্রান্ত। -যোগ্যতা—নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেও স্বভাবনিহিত কার্যজনন-শক্তি potential force (ন্যা)। -লক্ষণ—বাইরের কোনও কিছুর সাহায্য না নিয়ে একেবারে স্বভাবধর্ম দিয়ে বস্তুর পরিচয় (বে)। -শক্তি—চিন্ময় আত্মভাবের সঙ্গে অভেদে অবস্থিত এবং ক্রিয়াশীল শক্তি self-power (বৈ)। -সত্তা—নিজস্ব ভাবে তন্ময় থাকা; নিজস্ব ভাব। -স্থিতি—আপনাতে আপনি থাকা। -হানি—নিজস্ব প্রকৃতি হতে বিচ্যুতি; স্বভাবের প্রতিষেধ বা খণ্ডন essential contradiction।

স্বাতন্ত্র্য—বন্ধন বা মুক্তির ভাবনার অতীত শিবত্বের সহজ চেতনা—ক্রিয়াশক্তির স্ফুরণ যাতে অব্যাহতই থাকে (শৈ)।

স্বারসিক—স্বাভাবিক, স্বত-উচ্ছল।

স্বারাজ্য—আত্মচেতনার নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা এবং ঐশ্বর্য (শ্রু); স্বাতন্ত্র্য।

স্বৈর—আপন খুশিতে চলা।

স্বোত্তর—নিজেকে ছাপিয়ে আছে যা। ...ভাব· স্বোত্তরণ।

হান—বর্জন, ত্যাগ। -উপাদান—বর্জন ও গ্রহণ।

হিরণ্য-গর্ভ—বিশ্বভাবন ও বিশ্বের অধিষ্ঠাতা চিন্ময় পুরুষ, জগদাত্মা cosmic-self (শ্রু); সমষ্টি-জীবাত্মরূপী পুরুষ—যাঁর দৃষ্টিতে জগৎ-স্বপ্ন ভাসছে (বে)। -বর্তনি—আধারের হিরণ্ময় রূপান্ত-

রের দিশারী; হিরন্ময়জ্যোতির দিকে চেতনার মোড় ফেরা (শ্রু)।

হেতু—কারণ; মূলকারণ (বৌ); প্রবর্তক কারণ agent। যার অস্তিত্ব থেকে অপর-কিছুর অস্তিত্ব অনুমান করা যায় [যেমন, গ্রামে 'আগুন' লেগেছে কেননা 'ধোঁয়া' দেখা যাচ্ছে—এখানে 'ধোঁয়া' হেতু]; ন্যায়ের যে 'অবয়ব'-বাক্যে হেতুর উল্লেখ থাকে (ন্যা)। -প্রত্যয়—মূল এবং আনুষঙ্গিক কারণেই সমষ্টি cause and conditions (বৌ)। -প্রশ্ন—কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা (বে)।

হ্লাদিনী—পরমপুরুষের আনন্দরূপিণী স্বরূপশক্তি।

বিষয়-সূচী

[মন্তব্য ঃ মূল বিষয়গুলি বর্ণানুক্রমে এবং অনুচ্ছেদগুলি যথাসম্ভব ভাবের অনুক্রম অনুসারে সাজানো। অনুচ্ছেদের গোড়ায় '—' মূল বিষয়টিকে বোঝাচ্ছে। পরে '...' অনুবৃত্তি, '*' পাদটীকা। তু·=তুলনীয়, দ্র·=দ্রষ্টব্য।]